উপন্যাস সমগ্র

হুমায়ূন আহমেদ

অষ্টম খণ্ড

সমকালীন কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে হুমায়ূন আহমেদ এখন জনপ্রিয়তার শীর্ষে। গ্রন্থজগতের পরিসংখ্যান বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ এই সত্য প্রতিষ্ঠিত করছে। অনতিতরুণ এই কথাশিল্পীর পাঠকমনোরঞ্জনের ক্ষমতা ইতোমধ্যেই প্রায় কিংবদন্তিতুল্য।

কিশোরবয়সী থেকে বৃদ্ধ স্বল্পশিক্ষিত থেকে বুদ্ধিজীবী পণ্ডিত—সকলেই তাঁর উপন্যাসের আগ্রহী পাঠক, অথবা টেলিভিশনের পর্দায় তাঁর কাহিনীর নাট্যরূপায়ণের বিমুগ্ধ দর্শক। কোন ক্ষমতায় এভাবে সকলকে কাছে টানেন হুমায়ূন আহমেদ? চিত্রল গতিময় সহজ ভাষাবিন্যাস। অভাবনীয় ঘটনা বিশ্বাসযোগ্যভাবে ঘটানোর মনোহারী কৌশল। কল্পনা হার মেনে যায় এমন অকল্পনীয় বিদ্যুন্নিভ সংলাপ। এবং তাঁর কাহিনীতে ছড়ানো জীবন কখনোই আমাদের চেনা মধ্যবিত্ত সমাজসত্যের বাইরে ছোটাছুটি করে না। মধ্যবিত্ত-জীবনের আশা নিরাশা অনিশ্চিতি এবং দোলাচলপ্রবণ মূল্যবোধ, তাঁর সামান্য লাভ ও সামান্য ক্ষতির বন্ধনে আততিময় অস্তিত্ব। হুমায়ূন আহমেদের যে-কোনো উপন্যাস ধারণ করে আছে তাঁর সৃজনীসত্তার মনন-কল্পনার এ-সকল উপাদান। সাধারণ মানুষের কাতর জীবন চূর্ণকণায় ছড়িয়ে থাকে তাঁর লেখায়।

প্রথম উপন্যাস 'নন্দিত নরকে' যখন বেরোয়, তখন প্রথিতযশা অধ্যাপক ডক্টর আহমদ শরীফ লিখেছিলেন, "হুমায়ূন আহমেদ বয়সে তরুণ, মনে প্রাচীন দ্রষ্টা, মেজাজে জীবনরসিক, স্বভাবে রূপদর্শী, যোগ্যতায় দক্ষ রূপকার। ভবিষ্যতে তিনি বিশিষ্ট জীবনশিল্পী হবেন – এই বিশ্বাস ও প্রত্যাশা নিয়ে অপেক্ষা করব।" এ-ভাবেই যাত্রা শুরু হয়েছিল হুমায়ূন আহমেদের। তারপর ক্রমাগত পথচলার প্রবাহে তিনি উপন্যাস, গল্প, নাটক, কল্পবিজ্ঞান,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুমায়ূন আহমেদের জন্ম নেত্রকোনা জেলার মোহনগঞ্জ গ্রামে, ১৯৪৮ সালের ১৩ই নভেম্বর তারিখে। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ডাকোটা স্টেট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পলিমার কেমিস্ট্রিতে গবেষণা করে ১৯৮২ সালে পি-এইচডি ডিগ্রি অর্জন করেছেন, বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নশাস্ত্রে অধ্যাপনারত। লেখক-জীবনে সাফল্যের প্রথম উল্লেখযোগ্য স্বীকৃতি পেয়েছিলেন অপেক্ষাকৃত নবীন বয়সে, ১৯৮১ সালে, 'বাংলা একাডেমী পুরস্কার' প্রাপ্তির মাধ্যমে। এ ছাড়াও তিনি পেয়েছেন একুশে পদক, শিশু একাডেমী ও লেখক-শিবির পুরস্কার সহ আরো অনেক পুরস্কার।

রম্যরচনা এবং শিশু কিশোর গ্রন্থ-সমূহ ক্রমাগত উপহার দিয়ে চলেছেন এ-দেশের পাঠকসমাজকে। পণ্ডিত সমালোচক ও হৃদয়বান গল্পপ্রেমিক উভয়েরই প্রত্যাশা তিনি পূরণ করে চলেছেন। একই সঙ্গে অতিপ্রজ অথচ শিল্পরুচিময় লেখক তাঁর মতো আর কেউ এই মুহূর্তে আছেন কিনা সন্দেহ। প্রতি বৎসর অব্যাহত গতিতে তাঁর ফসলের ডালা ভরে উঠছে। প্রতীক প্রকাশনা সংস্থার আনন্দ ও গর্ব যে, হুমায়ূন আহমেদের উপন্যাসসমগ্র বিভিন্ন খণ্ডে ক্রমান্বয়ে প্রকাশ করার দায়িত্ব সে নিতে পেরেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপন্যাসসমগ্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপন্যাস
সমগ্র
৮

হুমায়ূন আহমেদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৬
দ্বিতীয় মুদ্রণ জানুয়ারি ২০১০
তৃতীয় মুদ্রণ জানুয়ারি ২০১৩
চতুর্থ মুদ্রণ আগস্ট ২০১৭

প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ৩৮/২ক বাংলাবাজার (দোতলা), ঢাকা-১১০০'র পক্ষে
নূর-ই-মোনতাকিম আলমগীর কর্তৃক প্রকাশিত এবং
নিউ পুবালি মুদ্রায়ণ, ৪৬/১, ৪৬/২ হেমেন্দ্র দাস রোড
সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০ কর্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য ৪৫০.০০ টাকা মাত্র

ISBN 984-446-025-5

UPANYAS SAMAGRA (A Collection of Novels) Vol-VIII by Humayun Ahmed
Published by PROTIK PROKASHANA SANGSTHA.
38/2ka Banglabazar (1st floor), Dhaka-1100
Fourth Edition August 2017 Price Taka 450.00 Only

একমাত্র পরিবেশক অবসর প্রকাশনা সংস্থা
বিক্রয়কেন্দ্র ৩৮/২ক বাংলাবাজার (দোতলা), ঢাকা-১১০০

যোগাযোগ
৪৭১১৫৩৮৬, ৪৭১১৯৩১১
০১৭৪৩৯৫৫০০২, ০১৬২৬০২৪০৯০

বিকাশ পেমেন্ট
০১৭২০৩০৪০৭২, ০১৭১১৫৪২০০৭

Website **www.abosar.com, www.protikbooks.com**
Facebook www.facebook.com/AbosarProkashanaSangstha
e-mail protikbooks@yahoo.com, protikbooks@gmail.com
abosarprokashoni@yahoo.com

Online Distributor
www.rokomari.com/abosar, Phone 16297, 01519521971
www.rokomari.com/protik, Phone 16297, 01519521971
www.sorbonam.com, Phone +88 01511008877

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ

রমাপদ চৌধুরী
শ্রদ্ধাস্পদেষু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অষ্টম খণ্ডের সূচি

কৃষ্ণপক্ষ/১
আয়নাঘর/৫৫
জলপদ্ম/১০৬
হিমু/১৬৯
মেঘের ছায়া/২২৯
তুমি আমায় ডেকেছিলে ছুটির নিমন্ত্রণে/২৯১
পোকা/৩৪৩
জল জোছনা/৪০৯
নবনী/৪৫৬

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কৃষ্ণপক্ষ

১

'নোটটা বদলাইয়া দেন আফা, ছিঁড়া নোট।'

অরুর গা দিয়ে শীতল স্রোত বয়ে গেল। কুড়ি টাকার একটা নোটই তার কাছে আছে। ছেঁড়া নোট বদলাবে কোত্থেকে? অরু গলার স্বর স্বাভাবিক রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করতে করতে বলল, 'কই দেখি নোটটা?' রিকশাওয়ালার মুখে অহংকার মেশানো বিজয়ীর হাসি। ছেঁড়া নোট আবিষ্কার করে সে খুব খুশি। যেন সে ক্রিস্টোফার কলম্বাস। আমেরিকা আবিষ্কার করে ফেলেছে।

অরু বলল, 'কই আমি তো ছেঁড়া দেখছি না।'

রিকশাওয়ালা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করে বলল, 'নজর দিয়া দেহেন।'

অরু 'নজর' দিয়ে দেখল। হ্যাঁ ছেঁড়া। ছিঁড়ে দুখণ্ড করা। স্কচ টেপ দিয়ে এত সাবধানে জোড়া লাগানো যে রিকশাওয়ালা ছাড়া অন্য কারো বোঝার উপায় নেই।

'কি আফা বিশ্বাস হইল?'

অরু ক্ষীণ গলায় বলল, 'শোন, আমার কাছে আর কোনো টাকা নেই। এই একটাই নোট। তুমি এক কাজ কর পুরোটাই নিয়ে যাও।'

'ছিঁড়া নোট দিয়া ফায়দা কী?'

'ফায়দা আছে। গুলিস্তানে ছেঁড়া নোট বদলে দেয়। দুটাকা বাটা রাখবে। কুড়ি টাকার বদলে তুমি পাবে আঠার টাকা। দশ টাকা লাভ।'

'আমার লাভের দরকার নাই।'

'এখন আমি টাকা পাব কোথায়? বলেছি না আমার কাছে একটাই নোট!'

'টাকা-পয়সা না নিয়া রিকশাতে উঠেন ক্যান?'

'ভুল করে উঠি। তুমি ভুল কর না? মাঝে মাঝে বৃষ্টির দিনে প্লাস্টিকের পর্দা ছাড়া চলে আস না?'

যুক্তি রিকশাওয়ালাকে কাবু করল না। সে ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইল। অরু তাকে বলল, 'আচ্ছা ঠিক আছে তুমি মিনিট দশেক অপেক্ষা কর। তোমাকে ভালো নোট দেব। রিকশার সিটে বসে আরাম করে চা খাও।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফ্লাস্কে করে এক ছেলে ঘুরে ঘুরে চা বিক্রি করছে। অরু তাকে ডেকে বলল, 'তুমি এই রিকশাওয়ালাকে এককাপ চা দাও।' রিকশাওয়ালা খানিকটা হকচকিয়ে গেল। এই জাতীয় পরিস্থিতির মুখোমুখি সে এর আগে হয় নি।

অরু ঘড়ি দেখল — চারটা সাত।

কাঁটায় কাঁটায় চারটার সময় তার আসার কথা, সে তাই এসেছে। মুহিবের খোঁজ নেই। সে মনে হয় আজো দেরি করবে। আজকের দিনটিতেও সে কি সময়মতো আসবে না?

কুড়ি একুশ বছরের একটি মেয়ের পক্ষে একা একা অপেক্ষা করা যে কী যন্ত্রণা তা কজন জানে? সেজেগুজে একা দাঁড়িয়ে থাকা মেয়ের দিকে সবাই খানিকটা কৌতূহল, খানিকটা করুণা এবং খানিকটা তাচ্ছিল্য নিয়ে তাকায়। বুড়োরা এমন ভঙ্গি করে যেন দেশ রসাতলে যাচ্ছে। সংসদ ভবনের এই রাস্তাটা এখন বলতে গেলে বুড়োদের দখলে। সকাল বিকাল এদের দেখা যায় হাঁটাহাঁটি করছে। স্বাস্থ্য রক্ষা। যে করেই হোক আরো কিছুদিন বাঁচতে হবে। সমাজের অনাচার দেখে নাক সিঁটকাতে হবে। কিছুতেই মরা চলবে না।

রিকশাওয়ালা চা খেতে খেতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অরুকে দেখছে। এও এক যন্ত্রণা! এক জন কেউ তাকিয়ে থাকলে কিছুতেই স্বাভাবিক হওয়া যায় না। অরু আবার ঘড়ি দেখল — মাত্র পাঁচ মিনিট পার হয়েছে। সময় কি পুরোপুরি থেমে আছে? না ঘড়ি বন্ধ?

মুহিবকে এতক্ষণে দেখা গেল। লম্বা লম্বা পা ফেলে ছুটতে ছুটতে আসছে। কোনো দিকে তাকাচ্ছে না। অরু ডাকল, 'অ্যাই।' মুহিব থমকে দাঁড়াল। যেদিক থেকে শব্দ এসেছে সেদিকে না তাকিয়ে সে অন্য দিকে তাকাচ্ছে। কী যে অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা! রাগে অরুর গা জ্বলে যাচ্ছে। আজকের দিনে সে এমন বিশ্রী পোশাক পরে এল কী করে? কে বলেছে তাকে পাঞ্জাবি পরতে? কটকটে হলুদ রঙের সিল্কের পাঞ্জাবিতে তাকে যে কী বিশ্রী দেখাচ্ছে তা বোধহয় সে নিজেও জানে না। আয়না দিয়ে নিশ্চয়ই নিজেকে দেখে নি। অরু গলা উঁচিয়ে ডাকল, 'অ্যাই-অ্যাই।'

মুহিব তাকাল এবং হেসে ফেলল। সেই হাসি এতই সুন্দর যে অরু তার দেরি করে উপস্থিত হবার অপরাধ অর্ধেক ক্ষমা করে দিল। কটকটে হলুদ পাঞ্জাবি পরার অপরাধ অবশ্যি এখনো ক্ষমা করা যাচ্ছে না।

'তাড়াতাড়ি আসতে গিয়ে দেরি হয়ে গেল। ভেবে রেখেছিলাম আজ অন্তত এক ঘণ্টা আগে উপস্থিত হব। গাড়ি জোগাড় করতে গিয়ে....'

'কে তোমাকে গাড়ি জোগাড় করতে বলেছে?'

'কেউ বলে নি। ভাবলাম..'

'কোথায় তোমার গাড়ি?'

'তেল নেবার জন্যে পেট্রোল পাম্পে থেমেছিল—তারপরে আর স্টার্ট নিচ্ছে না।'

'ঐখান থেকে দৌড়াতে দৌড়াতে এসেছ?'

'হুঁ। খুব দূর না। আসাদগেট পেট্রোল পাম্প।'

'ভাংতি টাকা আছে তোমার কাছে?'

'আছে।'

'দেখি আমাকে দশটা টাকা দাও। আর ঐ চাওয়ালা ছেলেটাকে এককাপ চায়ের দাম দাও।'

অরু টাকা নিয়ে রিকশাওয়ালার দিকে এগিয়ে গেল। হাসিমুখে বলল, 'এই নাও দশ টাকা। আট টাকা রিকশা ভাড়া। দুটাকা ওয়েটিং চার্জ।'

তার ইচ্ছা ছিল কিছু কঠিন কথা রিকশাওয়ালাকে বলে। বলা হল না। আজ একটা শুভ দিন। আজ তাদের বিয়ে। এই দিনে কঠিন কথা বলা সম্ভব না। তার একুশ বছর জীবনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেক কথাই সে পরবর্তী সময়ে মনে করতে পারবে না। কিন্তু আজকের দিনের সব কথা মনে থাকবে। কী দরকার আজ ঝগড়া করার ? বরং রিকশাওয়ালার নাম জিজ্ঞেস করা যাক। এই রিকশায় করেই না হয় কাজী অফিসে যাওয়া যাবে। যে রিকশায় করে তারা বিয়ে করতে গেল সেই রিকশাওয়ালার নাম জানা রইল। এটা মন্দ কী ?

'তোমার নাম কি ?'

'আমারে জিগান ?'

'হ্যাঁ।'

'আমার নাম সুরুজ মিয়া।'

'সুরুজ মিয়া, আমরা খিলগাঁও কাজী অফিসে যাব। আজ আমাদের বিয়ে। তুমি কি নিয়ে যাবে আমাদের ?'

রিকশাওয়ালা হ্যাঁ-না কিছুই বলছে না। মনে হচ্ছে সে গভীর সমস্যায় পড়ে গেছে। এতক্ষণ যাকে তুমি তুমি করে বলছিল এখন অরু তাকে কী মনে করে যেন আপনি বলল, 'আপনি চিন্তা করে একটা ডিসিশানে আসুন। বেশি সময় নেবেন না। আমরা দেরি করতে পারব না।'

অরু মুহিবের দিকে এগিয়ে গেল। মুহিব সিগারেটের দোকান থেকে সিগারেট কিনছে। সে কখনো একটার বেশি কিনে না। আজ এক প্যাকেট কিনে ফেলল। সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, 'অরু, তুমি কি তোমাদের বাড়ির কাউকে বিয়ের ব্যাপারে কিছু বলেছ?'

অরু বলল, 'না। তবে রাত দশটা নাগাদ সবাই জেনে যাবে। একটা চিঠি লিখে খামের মুখ বন্ধ করে বড় আপার টেবিলে রেখে এসেছি। আপা বিয়েবাড়িতে গেছে। দশটা নাগাদ ফিরবে। তারপর হৈচৈ বেধে যাবে। বাবার স্ট্রোক না হলেই হয়।'

'কী লিখেছ চিঠিতে ?'

'তিন লাইনের চিঠি—আজ বিয়ে করছি তাই লেখা —'

'কীভাবে লেখা — ল্যাংগুয়েজটা কী ?'

'তিন লাইনে তো খুব কাব্যিক ল্যাংগুয়েজ হয় না। তবু যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি।'

'কাকে বিয়ে করছ এইসব কিছু লেখ নি তো?'

'না। শুধু লিখলাম — একটি বেকার এবং আপাতদৃষ্টিতে অপদার্থ যুবককে বিয়ে করছি। আমার মনে হচ্ছে না আমি কোনো অপরাধ করছি। তারপরেও ক্ষমা প্রার্থনা করছি — আপা, তুমি বাবা-মাকে শান্ত করবে এবং বুঝিয়ে বলবে।'

মুহিব শুকনো গলায় বলল, 'তোমার বাবা-মা'র রিঅ্যাকশান কী হবে ?'

'কী করে বলব কী হবে! তাঁদের কোনো মেয়ে তো এর আগে কাউকে কিছু না জানিয়ে বিয়ে করে নি। এই প্রথম এবং এই শেষ। চল, রওনা হওয়া যাক।'

তারা রিকশায় উঠল। মুহিব বলল, 'হুড তুলে দেব ?'

'না।'

'খারাপ লাগছে অরু ?'

'খারাপও লাগছে না আবার ভালোও লাগছে না। মনে হচ্ছে একটা ঘোরের মধ্যে আছি। জ্বরজ্বর লাগছে। দেখ তো জ্বর কিনা ?'

'না জ্বর নেই।'

অরু হাসতে হাসতে বলল, 'জ্বর নেই বলে হাত সরিয়ে নিলে কেন ? লজ্জা লাগছে ?'

'হুঁ, আজ কেন জানি অন্যদিনের চেয়ে অনেক বেশি লজ্জা লাগছে। আজ মনে হচ্ছে পৃথিবীর সবাই তাকিয়ে আছে আমার দিকে।'

'তাকিয়ে আছে তো বটেই। তাকিয়ে আছে তোমার হলুদ পাঞ্জাবির জন্যে। তুমি দয়া করে আজ রাতেই এই পাঞ্জাবি পুড়িয়ে ফেলবে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আচ্ছা।'

অরু হালকা গলায় বলল, 'বিয়ের পর আমরা যাব কোথায় ?'

'বাসর কোথায় হবে এই কথা জিজ্ঞেস করছ ?'

অরু অস্পষ্ট স্বরে বলল, 'হুঁ।'

'বজলুর বাসায়।'

'বজলু কে ?'

'আমার স্কুল জীবনের বন্ধু, অতি ভালো ছেলে। গত বৎসর বিয়ে করেছে। তার বৌটা তার চেয়েও ভালো। ওরা একটা ঘর আমাদের জন্যে ছেড়ে দিয়েছে। ফুলটুল দিয়ে সাজিয়ে হুলস্থূল করেছে।'

'অপরিচিত কারোর বাসায় উঠতে আমার ইচ্ছে করছে না।'

'ওদের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বললেই তোমার মনে হবে এরা অপরিচিত না। খুবই পরিচিত। তাছাড়া আমার আর কোনো জায়গাও নেই যেখানে তোমাকে নিয়ে যেতে পারি।'

'তুমি তোমার আপাকে সব খুলে বলবে বলেছিলে—বলেছ ?'

'না।'

'বল নি কেন ?'

'কাল বলব। আপাকে একটা সারপ্রাইজ দেব।'

'উনি রাগ করবেন না ?'

'পাগল, আপার রাগ করার ক্ষমতাই নেই।'

'আবার একটা সিগারেট ধরিয়েছ, একটু আগেই না একটা খেলে।'

'টেনশান বোধ করছি।'

অরু ছোট্ট নিশ্বাস ফেলে বলল, 'এই যে তোমার পাশে বসেছি—শেষবারের মতো বন্ধুর পাশে বসেছি। এরপর বসব স্বামীর পাশে।'

'স্বামী কি বন্ধু না ?'

'গল্প-উপন্যাসে বন্ধু। বাস্তবে না। বাস্তবের স্বামীরা যতটা না বন্ধু তার চেয়েও বেশি অভিভাবক।'

মুহিব গম্ভীর গলায় বলল, 'তুমি ভুল করছ অরু। আমি তোমার বন্ধুই থাকব।'

অরু ছোট্ট নিশ্বাস ফেলে বলল, 'থাকলে তো ভালোই।'

'তোমার মনে কোনো সন্দেহ আছে ?'

'আছে। হুডটা তুলে দাও। আসলেই সবাই আমাদের দিকে তাকাচ্ছে। সবচে' বেশি তাকাচ্ছে আমাদের রিকশাওয়ালা। যেভাবে সে পেছন ফিরে ফিরে রিকশা চালাচ্ছে মনে হয় অ্যাকসিডেন্ট করবে।'

মুহিব হুড তুলে দিল। অরু বলল, 'আজ কত তারিখ বল তো ?'

'এগারই ডিসেম্বর।'

'বাংলা কত ?'

'জানি না বাংলা কত।'

অরু ছোট্ট নিশ্বাস ফেলে বলল, 'আজ আমাদের বিয়ে আর আজকের বাংলা তারিখটা তোমার জানার ইচ্ছা হল না ? আজ ২৬শে অগ্রহায়ণ।'

'ও আচ্ছা ২৬শে অগ্রহায়ণ।'

'আর আমাদের রিকশাওয়ালার নাম হচ্ছে সুরুজ মিয়া। তার নামটাও মনে রাখা দরকার। তার রিকশায় করে বিয়ে করতে যাচ্ছি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুহিব কিছু বলল না। অরু বলল, 'ভালো করে দেখ তো জ্বর কিনা। এত খারাপ লাগছে কেন? মাথা ঘুরছে। ভুলে জরদা দিয়ে পান খেলে যেমন লাগে তেমন লাগছে।'

'কিছুক্ষণের মধ্যেই সব ঠিক হয়ে যাবে। ধর আর আধ ঘণ্টা।'

অরু ঘড়িতে দেখল তাদের বিয়ের পুরো অনুষ্ঠান শেষ হতে মাত্র ১৬ মিনিট লাগ া। কাজী সাহেবের কাছে অনুষ্ঠানটা হয়তো খুব 'বোরিং' লাগছে। তিনি কয়েকবার হাই তুললেন এবং যন্ত্রের মতো বললেন, 'এইখানে সই করেন। তারিখ দেন।' অরু গোটা গোটা করে লিখল, অরুণা চৌধুরী। বিয়ের অনুষ্ঠান শেষ। কী আশ্চর্য! কটকটে হলুদ পাঞ্জাবি গায়ে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটা এখন তার স্বামী। এই জীবনের সবচে' কাছের মানুষ। কোনো ভুল হয় নি তো? প্রচণ্ড বড় কোনো ভুল! যে ভুল এই জীবনে আর শোধরানো যাবে না। অরুর পানির পিপাসা পেয়ে গেল। কাজী সাহেবকে সে কি বলবে পানির কথা? নাকি মুহিবকে বলবে? মুহিবের সঙ্গে কথা বলতে লজ্জা লাগছে। মুখের দিকে তাকাতেও লজ্জা লাগছে। মুহিবকেও অন্য রকম লাগছে। ও আচ্ছা, এখন বোঝা গেল — বাবু চুল কেটেছেন। নতুন হেয়ার স্টাইল।'

বজলু এগিয়ে এসে বলল, 'ভাবী, চলুন যাওয়া যাক।'

ভাবী ডাকটা কী অদ্ভুত শোনাচ্ছে। গা শিরশির করে। অরু নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরুল। মুহিবের অন্য বন্ধুরা কেউ এখনো তাকে কিছু বলে নি। একজন শুধু তাকে বলেছে — 'কনগ্র্যাচুলেশন্‌স ভাবী। বলে হাতে একটা গোলাপ ফুল দিয়েছে। ফুলটার দিকে তাকাতেও কেন জানি লজ্জা লাগছে।'

গোলাপ ফুল দেয়া মানুষটা বলল, 'কোথাও বসে এককাপ চা কিংবা কোল্ড ড্রিংকস খাওয়া যাক। কাছেই একটা ভালো কনফেকশনারি দোকান আছে। যাবে ?'

বজলু বলল, 'না না — স্ট্রেইট আমার বাসায় চল। কেক কেনা আছে। কেক কাটা হবে। রেনুকে চা রেডি রাখতে বলেছি। গাড়িতে ওঠ সবাই। গাড়িতে ওঠ। মুহিব তুই ভাবীকে নিয়ে ড্রাইভারের পাশে বস। আমরা সবাই পেছনে আছি।'

অরুর প্রচণ্ড পানির পিপাসা পাচ্ছে। মনে হচ্ছে এক গ্লাস পানি খেতে না পারলে সে মরে যাবে। বজলু নামের মানুষটার বাসায় তার যেতে একেবারেই ইচ্ছা করছে না। এমন কোথাও যেতে ইচ্ছা করছে যেখানে একটা মানুষও নেই। খুব নির্জন কোনো জায়গা, যেখানে শুধু সে এবং মুহিব থাকবে। আর কেউ থাকবে না। কেউ না।

বজলুর স্ত্রী রওশন আরাকেও অরুর পছন্দ হল না। মেয়েটা এক সেকেন্ডের জন্যে না থেমে কথা বলে যাচ্ছে। ক্রমাগত কথা। ছোটাছুটিও করছে অকারণে। এই সামান্য সময়ে একটা গ্লাস ভেঙেছে, টেবিল ক্লথের উপর পায়েস ফেলে দিয়েছে। সামান্য চা দেয়া নিয়ে সে যে কথাগুলো বলল তা হচ্ছে —

'ও মা। এখনো চা দিলাম না। ঠাণ্ডা হয়ে গেছে বোধহয়। ঠাণ্ডা হলেও ঠাণ্ডা চা খেতে হবে। আমি আবার গরম করতে পারব না। সারাক্ষণ চুলার পাশে বসে থাকলে গল্প করব কখন? চায়ে কিন্তু চিনি দেই নাই। যার যার দরকার নিয়ে নেবেন। সরি সরি, চিনি বোধহয় দেয়া হয়েছে। আগে চেখে দেখবেন। এখানে ডায়াবেটিসওয়ালা কেউ আছে ? থাকলে আওয়াজ দিন। আর শুনুন, চায়ের কাপে সিগারেট ফেলবেন না। চায়ের কাপে সিগারেট ফেললে ঐ চা জোর করে খাইয়ে দেব। মাই গড, চামুচ দেয়া হয় নি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুহিব অরুকে বলল, 'একটু বারান্দায় এস তো।'

অরু বারান্দায় এসে ক্লান্ত গলায় বলল, 'সবাই এত কথা বলছে — আমার একেবারে মাথা ধরে গেছে।'

'এরা বেশিক্ষণ থাকবে না, চলে যাবে। তুমি কি কিছুক্ষণ রেস্ট নেবে ? রেস্ট নিতে চাইলে পাশের ঘরে চলে যাও — তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে শরীর খারাপ করেছে।'

'প্রচণ্ড মাথা ধরেছে। আর শুধু পানির পিপাসা হচ্ছে। তিন গ্লাস পানি খেয়েছি তবু পিপাসা মিটছে না।'

'মাথা ধরা কি খুব বেশি ?'

'হুঁ।'

'দাঁড়াও, প্যারাসিটামল এনে দিচ্ছি। শোন অরু, আমাকে ঘণ্টা খানিকের জন্যে একটু বাইরে যেতে হবে।'

অরু হকচকিয়ে গেল। গম্ভীর গলায় বলল, 'কেন ?'

'আমার দুলাভাই বলে রেখেছেন যেন ঠিক সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় অফিসে তাঁর সঙ্গে দেখা করি। তাঁর কথা তো তোমাকে বলেছি — দেখা না করলে — স্ট্রেইট বলবে, বের হয়ে যাও।'

অরু দুঃখিত গলায় বলল, 'আজকের দিনটা তুমি আলাদা রাখতে পারলে না ? বলতে পারলে না যে তোমার কাজ আছে ?'

মুহিব অস্পষ্ট স্বরে বলল, 'না অরু বলতে পারি নি। দুলাভাইকে এটা বলা সম্ভব না। তাছাড়া আমার ক্ষীণ সন্দেহ কি জান চাকরির কোনো ব্যাপার। উনি হয়তো কিছু ব্যবস্থা করেছেন। ইচ্ছা করলে তো তিনি পারেন। তুমি ঘণ্টা খানিক থাক, আমি চলে আসব।'

'এই বাড়িতে আমার এক সেকেন্ডও থাকতে ইচ্ছা করছে না। তোমার বন্ধুপত্নীকে আমার অসহ্য বোধ হচ্ছে।'

'ও কিন্তু খুব ভালো মেয়ে অরু। কথা বেশি বলে। কিন্তু মেয়ে চমৎকার। আমার একটা জেনারেল অবজারভেশন কি জান? যারা কথা বেশি বলে তারা মানুষ ভালো হয়। যাও, তুমি ভেতরে গিয়ে বস। এক ঘণ্টার বেশি আমি এক সেকেন্ডও দেরি করব না। অনেস্ট।'

'এক ঘণ্টার বেশি আমাকে যদি এ বাড়িতে থাকতে হয় — আমি দমবন্ধ হয়ে মারা যাব — ঐ মহিলাটিকে আমার অসহ্য বোধ হচ্ছে।'

কথা শেষ হবার আগেই বারান্দায় রওশন আরাকে দেখা গেল। সে চেঁচিয়ে বলল, 'কাজ-কারবার এর মধ্যেই শুরু হয়ে গেল? সারা রাত তো ভাই পড়েই আছে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে ভাল-বাসাবাসি না করলে হয় না?'

অরুর অসহ্য বোধ হলেও সে হাসার ভঙ্গি করল। এই মহিলা কিছুক্ষণ আগে তাকে ভয়ংকর গা-জ্বালা ধরানোর মতো কিছু কথা বলেছেন। অরুর ইচ্ছা করছিল গলা চেপে ধরতে। রওশন আরা ভালো মানুষের মতো তাকে ডেকে পাশের ঘরে নিয়ে গেছে। গায়ে হাত রেখে কথা বলা শুরু করেছে —

'এই দেখ ভাই তোমাদের বাসরঘর। পছন্দ হয় কিনা দেখ।'

অরুর পছন্দ হল। ঘরটা আসলেই সুন্দর করে সাজানো। বালিশের ওয়ার এবং বিছানার চাদর হালকা গোলাপি। চাদরে বেলি ফুল এবং গোলাপ দিয়ে নানান রকমের নকশা করা। খাটের পাশে সাইড টেবিলে ফুলদানি ভরতি গোলাপ। ঘরের অন্য প্রান্তে একটা টেবিলে পানির জগ এবং গ্লাস। একটা ফ্লাস্ক এবং চায়ের কাপও দেখা যাচ্ছে। ঘরের চার কোনায় চারটা ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'অরু ভাই শোন, প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়েছি। বাসর রাতে ঘর কখনো অন্ধকার করতে নেই। এই জন্যেই প্রদীপ। প্রদীপ নেভাবে না। ভয়ের কিছু নেই, তোমরা কী করছ বা করছ না আমরা দেখতে আসব না। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে — ফ্লাস্কে চা আছে, টিফিন বক্সে কেক বিসকিট এবং লাড্ডু আছে। গল্প করতে করতে রাত তিনটা সাড়ে তিনটার দিকে ক্ষিধে পেয়ে যাবে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। আমাদের কী হয়েছে শোন — এমন ক্ষিধে পেয়ে গেল। হি-হি-হি। পেটের ক্ষিধে কী আর চুমু খেলে মিটে ? কি ভাই ঠিক না ? তোমাদের জন্যে এই কারণেই সব খাবারদাবার দিয়ে দিয়েছি। সবচে' ইম্পর্টেন্ট জিনিস রেখেছি তোমার তোশকের নিচে। ইম্পর্টেন্ট জিনিসটা কী বল তো ?'

'জানি না।'

'বিয়ের রাতেই তুমি নিশ্চয়ই প্রেগনেন্ট হতে চাও না ? যাতে না হতে হয় সেই ব্যবস্থা। এটাও ভাই আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফসল। এখন তুমি আমাকে অসভ্য ভাবছ। পরে আমাকে থ্যাংকস দেবে। বুঝলে ?'

অরু কোনো কথা বলে নি। কথা বলতে ইচ্ছে করে নি। মুহিব যে এক ঘণ্টা থাকবে না সেই এক ঘণ্টা তার কী করে কাটবে ভেবেই অস্থির লাগছে। তাছাড়া মাথা ধরাটা বাড়ছে। নির্ঘাৎ জ্বর এসে গেছে। বমি বমি ভাবও হচ্ছে।

মুহিব তার দুলাভাই ইস্ট এশিয়াটিক লিমিটেড-এর জেনারেল ম্যানেজার শফিকুর রহমান সাহেবের ঘরের দরজা ফাঁক করে মাথা ঢুকাল।

শফিকুর রহমান বললেন, 'অপেক্ষা কর। আমি তোমাকে ডাকব।' বলেই তিনি হাতঘড়ির দিকে তাকালেন। সাতটা পাঁচ বাজে। মুহিবকে সাতটায় আসতে বলেছিলেন। সে পাঁচ মিনিট দেরি করে এসেছে।

শফিকুর রহমান সাহেবের এই অফিস ঘরটি বেশ জমকালো। ওয়াল টু ওয়াল কার্পেট। বিশাল আকৃতির সেক্রেটারিয়েট টেবিলে তিনটা টেলিফোন। একটা টেলিফোনের রং লাল। মনে হয় কোনো মিনিস্টারের ঘর। এয়ারকুলার আছে। এই শীতেও এয়ারকুলার চালু করা। বিজবিজ শব্দ হচ্ছে। মাথার উপর খুব আস্তে ফ্যান ঘুরছে। শফিকুর রহমান মাঝে মাঝেই রাত নটা দশটা পর্যন্ত অফিস ঘরে থাকেন। তিনি মানুষটা ছোটখাটো তবে তাঁকে দেখলেই মনে হয় ঈশ্বর এ জাতীয় মানুষদের একজিকিউটিভ বস বানানোর জন্যে বিশেষ করে তৈরি করেছেন। তাঁদের গলার স্বর এয়ারকুলারের হাওয়ার মতোই শীতল। মেজাজও শীতল, তবে সেই শীতল মেজাজের সামনে এসে দাঁড়ালে বুকের রক্তও শীতল হয়ে যায়।

ঠিক সাতটা কুড়ি মিনিটের সময় শফিকুর রহমান বেল টিপলেন। মুহিব দরজা খুলে ঢুকল। তিনি বিরক্ত গলায় বললেন, 'তোমাকে ডাকি নি, তুমি বস। যথাসময়ে ডাকব। বেয়ারাকে ডেকেছি চা দেবার জন্যে।'

'একটা কাজ ছিল দুলাভাই।'

'আমিও তোমাকে কাজেই ডেকেছি। অকাজে ডাকি নি। অপেক্ষা কর।'

মুহিব ঘর থেকে বের হয়ে ওয়েটিং রুমে বসল।

শফিকুর রহমান তাঁকে কফি দেয়ার নির্দেশ দিয়ে টেলিফোন নিয়ে বসলেন। বিদেশে টেলিফোনে যোগাযোগের জন্যে এই সময়টাই উত্তম। কিছু জরুরি ট্রানজেকশন টেলিফোনের মাধ্যমেই হবে। এলসি সংক্রান্ত কিছু জটিলতা দেখা দিয়েছে।

রাত আটটায় মুহিব আবার উঁকি দিল। ক্ষীণ গলায় ডাকল, 'দুলাভাই।'

শফিকুর রহমান ফাইল দেখছিলেন। ফাইল থেকে চোখ তুললেন না। মুহিব বলল, 'আমার খুব জরুরি একটা কাজ ছিল।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শফিকুর রহমান শীতল গলায় বললেন, 'তোমার সঙ্গে জরুরি কথা আছে বলেই তোমাকে আসতে বলেছি। গসিপ করার জন্যে ডাকি নি। তারপরেও তুমি যদি মনে কর তোমার কাজ অসম্ভব জরুরি তাহলে চলে যেতে পার। তোমাকে বেঁধে রাখা হয় নি।'

তিনি টেলিফোন তুলে ডায়াল করা শুরু করলেন। মুহিব ফিরে গেল আগের জায়গায়। তার মুখে থুতু জমতে শুরু করেছে, অসম্ভব রাগ লাগছে। ইচ্ছা করছে পুরো অফিসটা পেট্রোল দিয়ে পুড়িয়ে দিতে। তার সামনেই এসট্রে তবু সে ইচ্ছা করে কার্পেটে সিগারেটের ছাই ফেলছে।

অফিস অ্যাটেনডেন্ট রফিক মিয়ার অবস্থাও তার মতো। সাহেব অফিসে আছেন বলে সেও যেতে পারছে না। শুকনো মুখে বারান্দায় হাঁটাহাঁটি করছে। কিছু করার নেই বলেই বোধহয় মুহিবকে এসে জিজ্ঞেস করল, 'এই বৎসর শীত কেমন বুঝতেছেন স্যার ?' মুহিব কোনো কথা বলল না। যদিও তার বলতে ইচ্ছা করছে — কাছে আস রফিক মিয়া, তোমার গালে একটা চড় দেই। চড় খেলে বুঝবে শীত কত প্রকার ও কি কি ?

মুহিবের ডাক পড়ল রাত দশটায়। শফিকুর রহমান হাই তুলতে তুলতে বললেন, 'সরি, অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখলাম। তোমাকে কি কফি দেয়া হয়েছে ?'

'জ্বি।'

'দাঁড়িয়ে আছ কেন, বোস।'

মুহিব বসল। মনে মনে বলল, আপনাকে কোনো কালেই পছন্দ করি নি। ভবিষ্যতে কখনো করব, সে সম্ভাবনাও অত্যন্ত ক্ষীণ। আপনি অতি কুৎসিত একটি প্রাণী। মাকড়সা দেখলে মানুষের যেমন গা ঘিনঘিন করে — আপনাকে দেখলেও আমার অবিকল সেই রকম গা ঘিনঘিন করে। এখন আপনাকে দেখাচ্ছে একটা মাকড়সার মতো। মেয়ে মাকড়সা। যে পেটে ডিম নিয়ে ঘুরে বেড়ায়।

'মুহিব।'

'জ্বি।'

'তোমাকে চিটাগাং যেতে হবে।'

মুহিবের গা দিয়ে শীতল স্রোত বয়ে গেল। বুক ধক ধক করতে লাগল। মনে হচ্ছে মাকড়সাটা এখন বলবে — আজ রাতেই যেতে হবে। তূর্ণা নিশীথায়।

মুহিব চাপা গলায় বলল, 'কখন যেতে হবে ?'

'দি আর্লিয়ার, দি বেটার। ভোরের ট্রেনে যেতে পার। কিংবা দুপুরের দিকে যেতে পার। দুপুরে অফিসের একটা গাড়ি চিটাগাং যাবে। যেটা তুমি প্রেফার কর। তোমার জন্যে চাকরির ব্যবস্থা করা হয়েছে। কি চাকরি বেতন কত সব চিটাগাং গেলেই জানবে। টেলিফোনে কথা বলে রেখেছি। আজ দুপুরেই কনফার্ম করা হয়েছে। ছয় সাত হাজার টাকা বেতন হবার কথা। তারচে বেশিও হতে পারে। সবচে যেটা ভালো সেটা হচ্ছে — কোয়ার্টার আছে। যতদূর শুনেছি ভালো কোয়ার্টার। বিদেশে ট্রেনিঙের সুযোগ পাবে। সব সুযোগ কাজে লাগাতে পারলে অল্প সময়ে ভালো উন্নতি করবে।'

মুহিবের হৃৎপিণ্ড এমন লাফাচ্ছে যে মনে হচ্ছে গলা দিয়ে বের হয়ে আসবে। গলার ফুটো ছোট বলে বেরুতে পারছে না। এটা স্বপ্নদৃশ্য নয় তো ? চেয়ারে বসে সে হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে। মাঝে মাঝে স্বপ্নদৃশ্য খুব বাস্তব হয়। দুলাভাই তার দিকে তাকিয়ে আছেন। স্বপ্নদৃশ্য হলেও এই মানুষটাকে ধন্যবাদ-সূচক কিছু বলা উচিত। মুহিব ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল, 'থ্যাংকস দুলাভাই।'

'আমাকে থ্যাংকস দেবার দরকার নেই। তুমি আমাকে পছন্দ কর না তা আমি জানি। আমিও যে তোমাকে পছন্দ করি তাও না। যাই হোক, কাজকর্ম ঠিকমতো করবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রেসপনসিবিলিটি নামক ব্যাপারটি আত্মস্থ করার চেষ্টা করবে। ঠিক আছে, এখন তাহলে যাও।'

মানুষটাকে এখন আর মাকড়সার মতো লাগছে না — বরং সুন্দর লাগছে। সুন্দর।

ঘর থেকে বেরুবার সময় দরজায় ধাক্কা খেয়ে কপালের একটা অংশ ফুলে গেল। ব্যথা লাগছে। এটা তাহলে স্বপ্ন নয়। স্বপ্নে শারীরিক ব্যথা বোধ থাকে না।

মুহিব আশঙ্কা করছিল রাত এগারটায় সে যখন উপস্থিত হবে অরু অসম্ভব রাগ করবে। কেঁদে-টেঁদে একাকার করবে। সে রকম কিছু হল না। অরু হাসিমুখে বলল, 'আমি ভাবলাম তুমি পালিয়ে গেছ, প্রচণ্ড ক্ষিধে লেগেছে। এস খেতে বসি। আদর্শ বাঙালি স্ত্রীদের মতো না খেয়ে বসে আছি।'

মুহিব বলল, 'ওরা কোথায়?'

অরু হাসতে হাসতে বলল, 'তুমি চলে যাবার কিছুক্ষণ পরই তোমার অন্য বন্ধুরা চলে গেল। তারপর মজার একটা ব্যাপার হল — তোমার প্রিয় বন্ধু বজলু এবং রওশন আরা ভাবী অকারণে তুমুল ঝগড়া শুরু করলেন। সে এক দেখার মতো দৃশ্য। আমি হতভম্ব। এত অল্প সময়ে ঝগড়া ক্লাইমেক্সে চলে যেতে পারে তা আমার জানা ছিল না। রওশন আরা ভাবী কাঁদতে কাঁদতে বললেন, আমি থাকব না তোমার সঙ্গে। তোমার বন্ধু বললেন, আমি কি নাইলনের দড়ি দিয়ে তোমাকে বেঁধে রেখেছি ? গো এওয়ে। তুমি চলে গেলে আমি প্রাণে বেঁচে যাই। তুমি আমার লাইফ হেল করে দিয়েছ। তারপরই ভাবী উল্কার বেগে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। আমি তোমার বন্ধুকে বললাম, আপনি দেখছেন কী — উনাকে আটকান।'

বজলু সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, 'আমি আটকাব কেন ? আমার কীসের দায় ? আপদ বিদেয় হয়েছে ভালো হয়েছে।' তার আধঘণ্টা পরই বজলু সাহেবের মাথা ঠাণ্ডা হল। উনি নরম গলায় বললেন, 'আমার মিসটেক হয়েছে। খুবই খারাপ লাগছে। কী করা যায় বলুন তো ? ও গেছে তার ভাইয়ের বাড়ি, নিয়ে আসি — কী বলেন ?' আমি কিছু বলার আগেই উনিও উল্কার মতো বের হয়ে গেলেন। সেই থেকে আমি একা বসে আছি।'

'সে কী! আর কেউ নেই ?'

'একটা কাজের মেয়ে আছে। সে বলল, 'সপ্তাহে এই ঘটনা দু থেকে তিনবার হয়। সাধারণত হয় সন্ধ্যার দিকে। বেগম সাহেব তার ভাইয়ের বাসায় চলে যান। সাহেব যান তাঁর পিছু পিছু। রাত বারটা-একটার দিকে ভাই গাড়ি করে দুজনকে পৌছে দিয়ে যান।'

'তার মানে কি এই যে এ বাড়িতে আমরা এখন মাত্র দুজন ?'

'কাজের মেয়েটি আছে।'

'সে ঘুমিয়ে পড়েছে নিশ্চয়ই। কোনো কাজকর্ম না থাকলে এরা অতি দ্রুত ঘুমিয়ে পড়তে পারে।'

অরু হাসতে হাসতে বলল, 'ও ঘুমাচ্ছে। দাঁড়াও ওকে ডেকে দিচ্ছি, খাবার গরম করুক।'

'ডাকতে হবে না। খাবার যা গরম করার তুমি কর। আমি পাশে দাঁড়িয়ে ডিরেকশন দেব। তোমার মাথা ধরা সেরেছে?'

'হুঁ। ঘর ফাঁকা হওয়ামাত্র মাথা ধরা চলে গেল।'

অরু রান্নাঘরে ঢুকল। অরুর পেছনে পেছনে গেল মুহিব। অরু থালা-বাসন, হাঁড়ি-কুড়ি এমনভাবে নাড়ছে যেন এই রান্নাঘর তার দীর্ঘদিনের চেনা। তার নিজেরই যেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাড়িঘর। মুহিব বলল, 'একটা থালায় খাবার গরম করে দাও — রান্নাঘরে দাঁড়িয়েই খেয়ে ফেলি।'

অরু বলল,'একসেলেন্ট আইডিয়া।'

'মেনু কি?'

'পোলাও-টোলাও করে হুলস্থূল করেছেন।'

মুহিব বলল, 'নিজেরা বোধহয় না খেয়ে আছে।'

অরু প্লেটে খাবার বাড়তে বাড়তে বলল, 'বিয়ের রাতে আমি তোমার সঙ্গে ঝগড়া করব না। শুধু জানতে চাচ্ছি কী মনে করে তুমি এত দেরি করলে ?'

'ইচ্ছা করে করি নি।'

'ইচ্ছা করে যে কর নি তা অনুমান করতে পারছি। তোমার দুলাভাই তোমাকে আটকে ফেলেছিলেন, এই তো ব্যাপার ? তুমি তার হাত থেকে বের হয়ে আসতে পারলে না। একটি রাতের জন্যে কি এই সাহস দেখানো যেত না ?'

মুহিব বলল, 'তুমি কিন্তু ঝগড়ার সুরে কথা বলা শুরু করেছ। আজ ঝগড়া করলে সারাজীবন ঝগড়া হবে। এস — আজ রাতটা হেসে হেসে পার করে দি। আমি এগারটা হাসির গল্প রেডি করে রেখেছি। শুনবে আর হাসতে হাসতে ভেঙে পড়বে। এগারটা গল্পের মধ্যে পাঁচটা ভদ্র গল্প আর দুটা হচ্ছে মিডনাইট স্পেশাল। রাত বারটার পর বলা যায়।'

অরু বলল, 'খবরদার কোনো অশ্লীল গল্প বলবে না। অশ্লীল গল্প বললে আমি কিন্তু খুব রাগ করব।'

'পৃথিবীর সবচে' মজার গল্পগুলো হচ্ছে অশ্লীল গল্প।'

'আমি পৃথিবীর সবচে' মজার গল্পগুলো শুনতে চাচ্ছি না। তুমি বরং কম মজার গল্পগুলো বল। এখনি শুরু কর। তার আগে জানতে চাচ্ছি কপাল ফাটালে কী করে?'

মুহিব বলল, 'দুঃখে মানুষের কপাল ফাটে আমারটা ফেটেছে আনন্দে। পরে তোমাকে গুছিয়ে বলব, এখন শোন স্টোরি নাম্বার ওয়ান। স্যার ক্লাসে পড়াচ্ছেন। শেরশাহ্ প্রথম ঘোড়ার ডাকের প্রচলন করেন। এক ছাত্র তাই শুনে অবাক হয়ে বলল, সে কী স্যার! শেরশাহ্র আগে কি ঘোড়া ডাকতে পারত না?'

অরু হাসতে হাসতে বিষম খেল। হাসির শব্দে ঘুম ভেঙে কাজের মেয়েটি উঠে এসেছে। সে দুজনকে রান্নাঘরে দেখে বেশ অবাক হল। অরু বলল, 'অ্যাই শোন, তোমার তো খাওয়া হয়ে গেছে। তোমার ঘুম পেলে ঘুমিয়ে পড়। থালা-বাসন কিচ্ছু ধুতে হবে না। আমি দরজা-টরজা খুব ভালোমতো বন্ধ করে ঘুমাতে যাব।'

মুহিব বলল, 'সময় নষ্ট করার কোনো মানে হয় না — দ্বিতীয় গল্পটি শোন। রোগশয্যায় শায়িতা স্ত্রী কাঁদো কাঁদো গলায় স্বামীকে বলছে, আমি জানি আমি মারা গেলেই তুমি বাঁচ, তাই না?'

স্বামী স্ত্রীর মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলল, 'এমন নির্মম সত্য কথা এভাবে বলতে নেই লক্ষ্মী সোনা। একটু ঘুমানোর চেষ্টা কর।'

অরু এই গল্পে হাসল না। বিরক্ত স্বরে বলল, 'মেয়েদের ছোট করা হয় যেসব গল্পে সেসব শুনতে আমার ভালো লাগে না।'

'এই গল্পে কোথায় মেয়েদের ছোট করা হল?'

'ছোট করা হয়েছে। তুমি বুঝবে না।'

'কোথায় ছোট করা হয়েছে বুঝিয়ে বল। আমি একটা সহজ রসিকতা করলাম। এখানে মেয়েদের কোথায় ছোট করা হল — ?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অরু বলল, 'আলাপ আলোচনা আবার কিন্তু ঝগড়ার দিকে টার্ন নিচ্ছে।'

'আমি মজার কিছু গল্প বলার চেষ্টা করছি। তুমি যদি সেগুলো ঝগড়ায় নিয়ে যাও আমি কী করব?'

'গল্প বলা বন্ধ করে চল ঘুমাতে যাই। অসম্ভব ঘুম পাচ্ছে।'

মুহিব বলল, 'আজ তো ঘুমানোর কথা না। পৃথিবীতে এমন কোনো স্বামী-স্ত্রী পাবে না যারা বাসর রাত ঘুমিয়ে কাটিয়েছে।'

অরু বলল, 'আমরা তাহলে হব ব্যতিক্রম। আমরা বিছানায় যাওয়ামাত্র ঘুমিয়ে পড়ব। এক ঘুমে রাত কাবার করে দেব।'

'আমি তোমাকে এক সেকেন্ডের জন্যেও ঘুমাতে দেব না। দরকার হলে গায়ে সিগারেটের ছ্যাঁকা দেব।'

'দ্যাট রিমাইন্ডস মি। শোবার ঘরে তুমি কিন্তু সিগারেট ধরাতে পারবে না। ফুলের গন্ধে ঘর ম ম করছে। তুমি সিগারেটের ধোঁয়ায় ঘর দুর্গন্ধ করে ফেলবে তা হতে দেব না। দয়া করে সিগারেট যা খাওয়ার এই রান্নাঘরে খেয়ে যাও। আর গা থেকে পাঞ্জাবিটা খুলে দাও। আমি এখন এটা পোড়াব।'

'সত্যি পোড়াবে ?'

'হ্যাঁ, সত্যি। খোল। এক্ষুনি খোল।'

'কী পাগলামি করছ!'

'কোনো পাগলামি করছি না। যা বলছি সুস্থ মাথায় বলছি। আমি তোমার পাঞ্জাবি পোড়াবই। এটা হবে আমাদের জীবনের একটা ইন্টারেস্টিং ঘটনা। কেউ যদি আমাকে জিজ্ঞেস করে — বাসর রাতে কী করেছ? আমি বলব, স্বামীর পাঞ্জাবি পুড়িয়ে ছাই বানিয়েছি।'

'যে পাঞ্জাবি পরে বিয়ে করেছি সেই পাঞ্জাবি আমি পোড়াতে দেব না। যত্ন করে তুলে রাখব। আমার ছেলে এই পাঞ্জাবি পরে বিয়ে করতে যাবে।'

পাঞ্জাবি পোড়ানো হল না। তারা এক সঙ্গে শোবার ঘরে ঢুকল। অরু বলল, 'তুমি শুয়ে পড়, আমি শাড়ি পাল্টে আসছি। সিল্কের শাড়ি পরে আমি ঘুমাতে পারব না। রওশন আরা ভাবীর কাছ থেকে আমি একটা সুতির শাড়ি রেখে দিয়েছি।'

মুহিব বলল, 'শাড়ি পাল্টে আসতে চাচ্ছ আস, কিন্তু খবরদার ঘুমের নাম মুখে আনবে না। সারা রাত জেগে থাকতে হবে।'

'আচ্ছা যাও, সারা রাত জেগে থাকব।'

'হাই তুলতে পারবে না, এবং বলতে পারবে না যে ঘুম পাচ্ছে।'

'আচ্ছা বাবা যাও, বলব না।'

শাড়ি পাল্টে এসে অরু দেখে মুহিব ঘুমাচ্ছে। গাঢ় ঘুম। অরু তাকে জাগাল না। মাথার কাছে বসে মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে অসংখ্যবার বলল, 'আমি তোমাকে কতটুকু ভালবাসি তা তুমি কোনো দিনও জানবে না। তোমার পক্ষে জানা সম্ভব নয়। পৃথিবীতে আজ এই মুহূর্তে আমার চেয়ে সুখী মেয়ে কেউ নেই। তার চোখে পানি এসে গেল।

ঘরের চার কোনায় ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলছে। ফুলের গন্ধে বাতাস সুরভিত। শেষ রাতে আকাশে চাঁদও উঠল। প্রদীপের আলোর সঙ্গে চাঁদের আলো মাখামাখি হয়ে নতুন এক ধরনের আলো তৈরি হল। অরুর খুব ইচ্ছা করছে ঘুম ভাঙিয়ে মুহিবকে এই অদ্ভুত আলো দেখায়। কিন্তু বেচারা ক্লান্ত হয়ে ঘুমাচ্ছে। আহা! বেচারা ঘুমাক। অরুর জেগে থাকার কথা, সে জেগে থাকবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২

শফিকুর রহমান বাড়ি ফিরলেন রাত সাড়ে দশটায়।

সাড়ে দশটা হচ্ছে তাঁর বাড়ি ফেরার শেষ লিমিট। এপার্টমেন্ট হাউস। এগারটার সময় কলাপসেবল গেট বন্ধ হয়ে যায়। যারা গভীর রাতে বাড়ি ফেরে তাদের স্ত্রীদের চাবি হাতে বসে থাকতে হয়। শফিকুর রহমান তাঁর স্ত্রী জেবাকে এই ঝামেলা পোহাতে দেন না। তিনি আরো কিছু কাজ করেন যা স্ত্রীরা পছন্দ করেন, যেমন উঁচু গলায় কখনো জেবার সঙ্গে কথা বলেন না। খাওয়াদাওয়া নিয়ে তাঁর কোনো খুঁতখুঁতানি নেই। রান্না কেমন হল, ভালো না মন্দ তা নিয়ে কথা বলা অপ্রয়োজনীয় মনে করেন। রাতে শোবার আগে একটা সিগারেট খান, তাও বারান্দায়। ঘর সিগারেটের ধোঁয়ায় অন্ধকার করেন না।

শফিকুর রহমান ঘরে ঢোকামাত্র জেবা বলল, 'মুহিব সেই যে সকালে বাসা থেকে বের হয়েছে এখনো ফেরে নি। খুব চিন্তা লাগছে।'

তিনি কাপড় ছাড়তে ছাড়তে বললেন, 'চিন্তা লাগার কী আছে। ও তো কচি খোকা নয়।'

'কোনো খোঁজ না দিয়ে সারাদিন বাইরে। আমার খুব অস্থির লাগছে।'

শফিকুর রহমান বাথরুমে ঢুকে পড়লেন। তিনি স্ত্রীর অস্থিরতা কমাতে বলতে পারতেন—'মুহিব ভালোই আছে। দেখা হয়েছে কিছুক্ষণ আগে।' তা বললেন না। অকারণ অস্থিরতা তার ভালো লাগে না। জেবার অনেক কিছুই তাঁর ভালো লাগে না। তা তিনি প্রকাশ করেন না। তিনি ঝামেলাবিহীন সংসার পছন্দ করেন। অফিসে অনেক ঝামেলা সহ্য করতে হয়। সংসার ঝামেলাশূন্য হওয়া সে জন্যেই এত দরকার। নিজের বিরাট বাড়ি ছেড়ে তিনি এপার্টমেন্ট হাউসে উঠে এসেছেন ঝামেলা কমানোর জন্যে। ছোট্ট সংসার, ছবির মতো গোছানো এপার্টমেন্ট থাকবে। কাজের লোক বা বাড়তি লোকের যন্ত্রণা থাকবে না। বাড়তি মানুষের যন্ত্রণা তাঁকে বলতে গেলে প্রায় সারাজীবন সহ্য করতে হয়েছে। মুহিব আছে তাঁর বিয়ের পর থেকেই। নিজের বাড়িতে যখন ছিলেন মুহিবের উপস্থিতি তেমন চোখে পড়ে নি। এখানে চোখে পড়েছে। তাঁর মেয়ে 'সারা'-কে নিয়ে সে যেসব আহলাদী করে তাও তাঁর পছন্দ নয়। পরশু রাতে অফিস থেকে ফিরে দেখেন বারান্দায় মুহিব লম্বা হয়ে শুয়ে আছে। তার সমস্ত শরীরে সাদা চাদর পেঁচানো। সারা বারান্দায় টেবিলে দাঁড়িয়ে আছে। ভয়ে কাঁপছে।

তিনি বললেন, 'কী ব্যাপার, সারা?'

সারা বলল, 'মামা কুমির সেজেছে। কী ভয়ংকর তাই না বাবা?'

এক জন বয়স্ক মানুষ বারান্দায় গড়াগড়ি খাচ্ছে—এই ধারণাটাই তার কাছে রুচিকর মনে হয় নি। তার উপর দশ বছরের একটা বাচ্চাকে ভয় দেখানোরও কোনো মানে হয় না।

শফিকুর রহমান বাথরুম থেকে বের হয়ে সরাসরি খাবার টেবিলে চলে গেলেন। চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, 'সারা খেয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

তিনি লক্ষ করলেন শুধু তাকেই প্লেট দেয়া হয়েছে। জেবা খেতে বসে নি। ভাইয়ের জন্য অপেক্ষা। দুপুরে তিনি বাসায় খান না। রাতে একবেলা খান। সঙ্গত কারণেই আশা করেন রাতে জেবা তাঁর সঙ্গে খেতে বসবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জেবা বলল, 'কী যে দুশ্চিন্তা লাগছে। সকালে হঠাৎ আমাকে বলল, আপা আমাকে কি তুমি...'

জেবা কথা শেষ করল না। কারণ তার মনে হল মানুষটা কিছু শুনছে না। জেবা বলল, 'আর এক চামচ ভাত দেই?'

শফিকুর রহমান বললেন, 'আরেক চামচ ভাত লাগলে আমি নিয়ে নেব। তোমাকে দিতে হবে না।'

খাওয়া শেষ করে তিনি মেয়েকে দেখতে গেলেন। মেয়েটার সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা বলতে পারলে ভালো লাগত। কথা বলা যাবে না। সারা নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছে। দশটার পর সে এক সেকেন্ড জেগে থাকতে পারে না।

শফিকুর রহমান ঘরে ঢুকে বাতি জ্বালাতেই সারা বিছানায় উঠে বসল। কোমল গলায় বলল, 'কেমন আছ বাবা?'

'ভালো আছি মা। তুমি ঘুমাও নি?'

'উহুঁ। ঘুম আসছে না।'

'দুপুরে ঘুমিয়েছিলে?'

'না।'

মশারি তুলে শফিকুর রহমান বিছানায় বসলেন। সারা কেমন গম্ভীর ভঙ্গিতে বসে আছে। মেয়েটা দেখতে তার মা'র মতো সুন্দর হয় নি। তাঁর মতো হয়েছে। চিবুক, চোখ সবই তাঁর মতো। গায়ের রংও শ্যামলা। কী ক্ষতি ছিল মেয়েটা যদি তাঁর মা'র গায়ের রঙের খানিকটা পেত।

'বাবা!'

'কি মা?'

'তুমি এত গম্ভীর কেন?'

'আমি তো সব সময়ই গম্ভীর। তুমি গম্ভীর কেন?'

'মামার জন্যে আমার মন খারাপ। মামা আসছে না কেন?'

'তোমার মামা এক জন বয়স্ক মানুষ। সে যদি সারাদিন নাও আসে তা নিয়ে এত চিন্তার কিছু নেই। আসবে। তাছাড়া আজ রাতে তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে।'

'ও।'

'ঘুমাতে যাও মা।'

শফিকুর রহমান নিজের ঘরে চলে গেলেন। খানিকক্ষণ কাগজ পড়লেন। রাত বারটার দিকে ঘুমাতে যাবার আগে শেষ সিগারেট খাবার জন্যে বারান্দায় এসে দেখেন জেবা বসে আছে। হাতে কলাপসিবল গেটের চাবি। ভাইয়ের জন্যে প্রতীক্ষা। এখনো সে না খেয়ে অপেক্ষা করছে। শফিকুর রহমান স্ত্রীকে কিছুই বললেন না।

জেবা একা একা বসে আছে। বারান্দার আলো নিভিয়ে দেয়া হয়েছে। আধো আলো, আধো আঁধারে একা একা বসে থাকতে অদ্ভুত লাগে। মুহিব আজ সকালে তার কাছে চারশ টাকা চেয়েছিল। সে দিতে পারে নি। সংসারের টাকা তার কাছে থাকে না। বেচারা কোনোদিন তার কাছে টাকা-পয়সা কিছু চায় নি। আজই চেয়েছিল— সে দিতে পারে নি। জেবার চোখ ভিজে উঠছে। এই ভাইটি তার বড়ই আদরের।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩

রাগে "হাত কামড়াতে" ইচ্ছা করছে। এই বাগধারা কার সৃষ্টি কে জানে। মুহিবের এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে এরচে' সঠিক বাগধারা বাংলা সাহিত্যে আর নেই। সত্যি সত্যি তার হাত কামড়াতে ইচ্ছা করছে। চিটাগাং যাবার জন্যে তৈরি হয়ে সে ভোর আটটায় চলে এসেছে। কারণ তার দুলাভাই মানুষটি অফিসে আসেন কাঁটায় কাঁটায় আটটায়। অফিসে এসে তিনি যেন দেখেন মুহিব উপস্থিত আছে। এই কারণেই মুহিব ছুটে এসেছে অরুর কাছ থেকে। ঠিকমতো বিদায়ও নেয়া হয় নি। কেন সে চিটাগাং যাচ্ছে, কবে ফিরবে কিছুই বলা হয় নি। তারচেয়েও বড় কথা সে অরুকে বাসায় একা ফেলে এসেছে। বজলু এবং তার স্ত্রী ফেরে নি। ওদের ব্যাপারটা কী সেই খোঁজও নেয়া হয় নি। চলে আসবার সময় গরম চায়ের কাপে ফুঁ দিতে দিতে শুধু বলেছে, 'তোমার সঙ্গে দেখা হবে দুদিন পরে। এই দুদিন আমি কোথায় যাচ্ছি কী করছি —কিছু জিজ্ঞেস করবে না।'

অরু বলেছে, 'জিজ্ঞেস করব না। ফর গডস সেক এইভাবে চা খেও না। মুখ পুড়বে।'

'মুখ অলরেডি পুড়ে গেছে। উপায় নেই। সকাল আটটার আগে অফিসে উপস্থিত থাকতে হবে। শোন অরু, আমি যদি পিরিচে ঢেলে চা-টা খাই তাহলে কি তোমার সূক্ষ্ম রুচিবোধ খুব আহত হবে?'

'হবে। তবে আজকের জন্যে অনুমতি দেয়া গেল। পিরিচে ঢেলেই খাও।'

মুহিব পিরিচে চা ঢালতে ঢালতে বলল, 'কাল রাতের ব্যাপারটার জন্যে আমি দুঃখিত।'

'কোন ব্যাপার?'

'এত প্ল্যান-প্রোগ্রাম করেও শেষটায় শুয়ে লম্বা ঘুম। বুঝলে অরু, এত আরামের ঘুম আমি কোনোদিন ঘুমাই নি। সরি, ভুল বললাম। আরেকবার ঘুমিয়েছিলাম। এসএসসি পরীক্ষার রেজাল্টের পর। অঙ্ক খুব খারাপ হয়েছিল। ধরেই নিয়েছিলাম পাস করব না। রেজাল্ট হবার পর দেখি সেকেন্ড ডিভিশন। এমন ঘুম দিলাম! ঘুম ভেঙেছে পরদিন সকাল দশটায়। আনন্দে এবং দুঃখে মানুষের নাকি ঘুম হয় না। আমার মেকানিজম সম্পূর্ণ উল্টো। আনন্দ এবং দুঃখ এই দুই ব্যাপারেই আমার ঘুম বেড়ে যায়। বাবার মৃত্যুর কথা কি তোমাকে বলেছি? বাবার শ্বাসকষ্ট শুরু হবার পর বাবাকে হাসপাতালে নেয়া হল। ভয়াবহ অবস্থা! সবাই ছোটাছুটি করছে। মৃত্যুর আগে আগে বাবা কী মনে করে জানি আমাকে দেখতে চাইলেন। কান্নাকাটি.... হুলস্থূল। আমাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। হঠাৎ আবিষ্কার করা হল — আমি হাসপাতালের বারান্দার বেঞ্চিতে শুয়ে মরার মতো ঘুমাচ্ছি।'

অরু বলল, 'ঘুমের মধ্যে তোমার কি কথা বলার অভ্যাস আছে?'

'আছে। কথা বলার অভ্যাস আছে, নাক ডাকার অভ্যাস আছে, বিছানা থেকে গড়িয়ে পড়ে যাবার অভ্যাস আছে। আরেকটা অভ্যাস খুব ছোটবেলায় ছিল — তোমার সূক্ষ্ম রুচির কারণে বলতে পাচ্ছি না। অভয় দিলে বলি...'

'বলার দরকার নেই।'

'বুঝতে পারছ বোধহয় জলঘটিত ব্যাপার।'

'আহ্ চুপ কর তো। সাতটা একুশ কিন্তু বাজে।'

'কী সর্বনাশ!'

'এরকম ছটফট করবে না তো। চুপ করে বস। জলে ভেসে যাক তোমার এপয়েন্টমেন্ট। আই ডোন্ট কেয়ার।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আচ্ছা যাও বসলাম।'

'এখন বল আমাকে বিয়ে করে তুমি কি সুখী হয়েছ ?'

মুহিব হাসতে হাসতে বলল, 'বিয়ে যে করেছি তাই বুঝতে পারছি না। এখনো তোমাকে প্রেমিকার মতো লাগছে। স্ত্রীর মতো লাগছে না।'

'কী করলে স্ত্রীর মতো লাগবে?'

'একটু ঝগড়া কর তো।'

মুহিব হাসছে। শব্দ করে হাসছে। অরুর মনে হল — এত সুন্দর করে একটা মানুষ কীভাবে হাসে?

খুব যেদিন তাড়া থাকে সেদিন বেবিট্যাক্সি পাওয়া যায় না। যদিও পাওয়া যায় সেই বেবিট্যাক্সির স্টার্ট কিছুক্ষণ পর পর বন্ধ হয়ে যায় এবং সেদিন রাস্তায় সবচে' বেশি জাম থাকে।

মুহিবের বেলায় কোনোটাই ঘটল না। সে কাঁটায় কাঁটায় আটটার সময় অফিসে উপস্থিত হল। সে বেবিট্যাক্সি থেকে নামার কিছুক্ষণ পরে এলেন শফিকুর রহমান। মুহিবকে যথাসময়ে উপস্থিত দেখে তিনি আনন্দিত হলেন কিনা বোঝা গেল না। শুকনো মুখে বললেন, 'আমার পিএ-কে চিঠি টাইপ করতে দিয়েছি। ওর কাছ থেকে চিঠি নিয়ে যাও।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'একটা পিক-আপ যাবে চিটাগাং। ড্রাইভার এলেই রওনা হয়ে যাবে।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'কাল রাতে কোথায় ছিলে? বাসায় ফের নি কেন ? তোমার আপা দুশ্চিন্তা করছিল। যেদিন বাসায় ফিরবে না বলে আসবে।'

মুহিব তৃতীয়বারের মতো বলল, 'জ্বি আচ্ছা।'

'তাকে একটা টেলিফোন করে জানাও যে তুমি ভালো আছ এবং চিটাগাং যাচ্ছ। কী কারণে যাচ্ছ তাও জানাতে পার। সে খুশি হবে।'

মুহিব বাসায় টেলিফোন করল না। সবাই খানিকটা দুশ্চিন্তা ভোগ করুক। চাকরি হবার পর সে দেখা করবে। আপাকে সালাম করে বলবে — আপা, তুমি হচ্ছ এই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মহিলা। তোমার মতো ভালো মেয়ে এই পৃথিবীতে আগে জন্মায় নি, ভবিষ্যতেও জন্মাবে না।

এই কথাগুলো আপাকে অনেকবার বলতে ইচ্ছা হয়েছে—কখনো বলা হয় নি। এই ধরনের নাটুকে কথা বলা মুশকিল। তাছাড়া নাটুকে কথা শুনে আপা হেসে ফেলে বলতে পারে — এক চড় খাবি।

পিক-আপের ড্রাইভার সকাল দশটায় এসে উপস্থিত হল। বিরস মুখে বলল, 'গাড়ির ব্রেকে গণ্ডগোল আছে। ব্রেক ঠিক না করে গাড়ি বের করা যাবে না।'

মুহিব বলল, 'ব্রেক সারাতে কতক্ষণ লাগবে ?'

'এই ধরেন এক ঘণ্টা। ওয়ার্কশপে না নিলে বুঝব না।'

সে যদি বলত ঘণ্টা দুই লাগবে তাহলে বজলুর বাসা থেকে ঘুরে আসা যেত। অরু নিশ্চয়ই এখনো যায় নি। মুহিব বলল, 'আমরা তাহলে এগারটার দিকে রওনা হচ্ছি ?'

'জ্বি।'

এক ঘণ্টা সময় কাটানোই সমস্যা। আপাকে একটা টেলিফোন করলে অবশ্যি অনেকটা সময় কাটবে। আপা আধ ঘণ্টার আগে টেলিফোন ছাড়বে না। মুহিব শুধুমাত্র সময় কাটানোর জন্যেই টেলিফোন করল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আপা ?'

জেবা টেলিফোনেই প্রচণ্ড ধমক দিল — 'কাল রাতে তুই কোথায় ছিলি? নিচে কলাপসিবল গেট আটকে দেয়, আমি রাত সাড়ে বারটা পর্যন্ত চাবি হাতে বসা...'

'একটা কাজে আটকা পড়ে গিয়েছিলাম।'

'কীসের তোর এত রাজকার্য ? তোর কাজ তো একটাই—টো টো করে শহরে ঘোরা। কাল রাতে না এসে ভালো করেছিস। এলে শক্ত করে গালে চড় বসিয়ে দিতাম। কোথায় রাত কাটিয়েছিস ?'

'আমার এক ফ্রেন্ডের বাসায়।'

'একটা টেলিফোন কি সেখান থেকে করা যেত না ?'

'গরিব ফ্রেন্ড আপা, ওর টেলিফোন নেই।'

'ওর নেই, অন্যদের তো আছে। যে কোনো দোকানে গিয়ে দুটা টাকা দিলে টেলিফোন করতে দেয়।'

'একটা ফার্মেসি থেকে টেলিফোন করেছিলাম আপা। লাইন ছিল এনগেজড।'

'খবরদার মিথ্যা বলবি না। তুই মিথ্যা কথা বললে আমি টের পাই।'

'আচ্ছা আপা যাও আর মিথ্যা বলব না। সত্যি কথাই বলছি — কাল বিয়ে করেছি আপা। মেয়ের নাম অরু। হ্যালো আপা, শুনতে পাচ্ছ ? হ্যালো ?'

অনেকক্ষণ পর জেবা বলল, 'তোর কথার ধরনে মনে হচ্ছে সত্যি বিয়ে করেছিস! আসলেই কি করেছিস ?'

'হুঁ।'

'আমার গায়ে হাত দিয়ে বল।'

'তোমার গায়ে হাত দেব কী করে ? তুমি পাঁচ মাইল দূরে বসে আছ।'

'বিয়ে তাহলে সত্যি করেছিস?'

'হুঁ।'

'কোর্টে ?'

'কোর্টে না—কাজীর অফিসে।'

'আমাকে বললে কি আমি ব্যবস্থা করে দিতাম না

'অবশ্যই দিতে, তবে দুলাভাই তাতে রাগ করতেন। আমি তাঁকে রাগাতে চাই নি।'

'আর আমি যে রাগ করলাম সেটা কিছু না ?'

'আমার উপর তুমি রাগ করতে পারবে না। তোমার পক্ষে তা সম্ভব না।'

'সম্ভব না কেন ?'

'কারণ এই পৃথিবীতে যত মেয়ে জন্মগ্রহণ করেছে এবং ভবিষ্যতে যত মেয়ে জন্মগ্রহণ করবে তুমি তাদের সবার উপরে।'

'আমাকে খুশি করার চেষ্টা করছিস ?'

'তা করছি তবে সেই সঙ্গে সত্যি কথা বলছি।'

'আমার এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না তুই বিয়ে করেছিস।'

'আমার নিজেরই বিশ্বাস হচ্ছে না।'

'মেয়েটা দেখতে কেমন ?'

'মোটামুটি।'

'মোটামুটি মানে ?'

'মোটামুটি মানে অসম্ভব সুন্দর।'

'কালো না ফর্সা ?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'মুখটা ফর্সা কিন্তু হাত দুটি সেই তুলনায় কালো। হাতে মনে হয় ক্রিম-ট্রিম ঘষে না।'

'হাইট কত ?'

'কে জানে কত।'

'পাশাপাশি যখন দাঁড়াস তখন সেকি তোর কান পর্যন্ত আসে ?'

'আসে বোধহয়।'

'তাহলে পাঁচ ফুট তিন। ওজন কত ?'

'আরে কী মুশকিল! আমি কি তাকে দাঁড়িপাল্লা দিয়ে মেপেছি ?'

'মেয়েটা আছে কোথায় এখন ?'

'কেন ?'

'আমি দেখা করব। বাসায় নিয়ে আসব।'

'অসম্ভব আপা। মেয়ে গোপনে আমাকে বিয়ে করেছে। এটা এতক্ষণে নিশ্চয়ই বাড়িতে জানাজানি হয়েছে। ওদের বাড়িতে এখন কেয়ামত হচ্ছে।'

'হোক কেয়ামত। তুই ঠিকানা বল।'

'ঠিকানা বলতে পারব না আপা। টেলিফোন নাম্বার দিতে পারি। কিন্তু তোমার পায়ে পড়ছি, ওকে সামলে নিতে সুযোগ দাও। আজ টেলিফোন করবে না।'

'বেশ করব না। তুই বাসায় চলে আয়।'

'না, আমি এখন বিদেয় হচ্ছি। তোমার সঙ্গে দেখা হবে পরশু। রাখি আপা।'

'রাখি মানে ? টেলিফোন নাম্বার দে।'

মুহিব টেলিফোন নাম্বার দিল। জেবা বলল, 'মেয়েটার মুখ লম্বা না গোল ?'

মুহিব বিরক্ত বিরক্ত হয়ে বলল, 'মুখ লম্বা না গোল তা দিয়ে কী হবে ?'

'দরকার আছে। গোল মুখের মেয়েরা ভাগ্যবতী হয়।'

'তোমার মুখ তো গোল। তুমি কি ভাগ্যবতী ?'

জেবা খানিকক্ষণ চুপ থেকে বলল, 'বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গোল মুখের মেয়েরা ভাগ্যবতী হয়। মাঝে মাঝে একসেপশন হয়। যখন একসেপশন হয় তখনকার অবস্থা ভয়াবহ...মেয়েটার গালে কি তিল আছে ? ডান গালে ?'

'বড় যন্ত্রণা করছ তুমি আপা।'

'যন্ত্রণা করছি কেন জানিস ? আমি একবার স্বপ্ন দেখেছিলাম তোর বিয়ে হয়েছে গোল মুখের একটা মেয়ের সঙ্গে। সেই মেয়েটার ডানদিকের গালে তিল।'

'অরুর ডানদিকের গালে তিল আছে।'

'সত্যি বলছিস ?'

'হ্যাঁ সত্যি। আপা এখন আমি যাই। ড্রাইভার ব্যাটা দুলাভাইয়ের মতো কঠিন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাচ্ছে।'

জেবা খিলখিল করে হেসে ফেলল।

মুহিব ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমরা এখন রওনা হব নাকি ভাই ?'

ড্রাইভার বলল, 'না।'

'না কেন ?'

'খাওয়াদাওয়া করে স্টার্ট করব। চিন্তার কিছু নাই। উড়াইয়া নিয়া যাব।'

'ভাই আপনার নাম কি ?'

'মহসিন।'

'মহসিন সাহেব, উড়ায়ে নেয়ার দরকার নেই। ধীরে সুস্থে যাবেন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'যে রকম বলবেন সে রকম যাব। আপনারে একটা কথা বলি ভাই সাহেব যদি কিছু মনে না করেন।'

'না কিছু মনে করব না, বলে ফেলুন।'

'আমার কয়েকজন আত্মীয় যাবে চিটাগাং। যদি অনুমতি দেন এরারে গাড়ির পিছনের সিটে বসায়ে নিয়ে যাই।'

'আমার দিক থেকে কোনো অসুবিধা নেই। শুধু সত্যি কথাটা বলুন এরা আপনার আত্মীয় নাকি ভাড়ার বিনিময়ে কিছু প্যাসেঞ্জার নিয়ে যাচ্ছেন?'

মহসিন উত্তর দিল না। হাই তুলল। মুহিব বলল, 'প্যাসেঞ্জার কোথা থেকে তুলবেন ?'

'সায়েদাবাদ। বাস স্টেশনের কাছে।'

'গাড়ি ভর্তি করে প্যাসেঞ্জার নিয়ে নিন, শুধু লক্ষ রাখবেন আমার বসার জন্য যেন জায়গা থাকে। গাড়িতে উঠেই ঘুম দেব। সারারাত ঘুমাই নি। ঘুমাতে ঘুমাতে এবং স্বপ্ন দেখতে দেখতে যাব।'

ড্রাইভার হেসে ফেলল।

গাড়ি রওনা হল দুপুর একটায়। মুহিব বসেছে ড্রাইভারের পাশের সিটে। সিটটা ঢালু, বসে আরাম পাওয়া যাচ্ছে না। গাড়ি ভর্তি মানুষ। দুটি পরিবার মালামাল নিয়ে উঠেছে। হৈচৈ, চেঁচামেচি হচ্ছে। সবার জায়গাও হচ্ছে না। ছসাত বছরের একটা বালিকা ক্রমাগত বলছে, 'সামনে বসব, সামনে বসব।' বাধ্য হয়ে মুহিবকে বলতে হল, 'আস সামনে আস।' মেয়েটিকে কোলে নিয়ে মুহিবকে বসতে হয়েছে। মেয়েটি তার গলা জড়িয়ে বসেছে। কথাবার্তা এমনভাবে বলছে যেন মুহিব দীর্ঘদিনের পরিচিত।

'কি নাম তোমার খুকি ?'

'আমার নাম লীনা। আমি ক্লাস টুতে পড়ি।'

'বাহ্।'

'আমরা এই রকম একটা গাড়ি কিনব।'

'এত বড় গাড়ি কিনবে?'

'এর চেয়েও বড় কিনব। লাল রঙের।'

'খুব ভালো।'

'আব্বু কিনে দিবে। আব্বুর অনেক টাকা আছে।'

পেছনের সিটে বসা লীনার আব্বু বিরক্ত হয়ে ধমক দিল, 'চুপ কর লীনা। বেশি কথা বলে। আব্বু টাকার গাছ পুঁতেছে।'

লীনা সাময়িকভাবে চুপ করল। লীনার বাবা মুহিবের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'স্যার একটা সিগারেট খাবেন? বেনসন আছে।'

মুহিব বলল, 'এখন ইচ্ছা করছে না।'

'যখন ইচ্ছা করে আমাকে বলবেন। লম্বা জার্নি, সিগারেট ছাড়া হয় না। আমি দশটা বেনসন কিনেছি হা-হা-হা। আর স্যার মেয়ে যদি বেশি বিরক্ত করে চড় দিবেন ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। বিচ্ছু মেয়ে। সাথে নিয়ে বের হই না। বাধ্য হয়ে ঢাকায় গিয়েছিলাম। আমার ছোট শ্যালকের বিবাহ ছিল। পরিবার নিয়ে যেতে হল। তিন হাজার টাকা গচ্চা। হাত একেবারে খালি। স্যারের গাড়ি পাওয়ায় রক্ষা হয়েছে।'

মুহিব লক্ষ করল লীনার বাবারও কথা বলা রোগ আছে। মেয়ে সম্ভবত বাবার কাছ থেকেই কথা বলার বিদ্যা আয়ত্ত করেছে।

'আমার শ্যালক ব্যাংকে কাজ করে। আরব-বাংলাদেশ ব্যাংক।'

'তাই নাকি ?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'জ্বি স্যার। আর মেয়ের বাড়ি মেহেরপুর। অবশ্যি এখন তারা ঢাকায় সেটলড্। মেয়ে আপনার এমএ পাস।'

'খুবই ভালো।'

'লীনা ঘুমিয়ে পড়েছে নাকি একটু দেখেন তো স্যার। ঘুমিয়ে পড়লে মুখের লালায় শার্ট ভিজিয়ে দেবে। একটু কেয়ারফুল থাকবেন স্যার।'

গড়ি প্রায় উড়ে চলেছে। মহসিন একের পর এক গাড়ি ওভারটেক করছে। এখন পাল্লাপাল্লি চলছে একটা ট্রাকের সঙ্গে। ট্রাক কিছুতেই সাইড দিচ্ছে না। ট্রাকের পেছনে লেখা 'মায়ের দোয়া'।

৪

অরুদের বাড়ির নাম রূপ নিলয়।

দশ কাঠা জায়গা নিয়ে বেশ বড় বাড়ি। সামনে বাগান আছে। উল্লসিত হবার মতো বাগান না, বরং বিরক্ত হবার মতো বাগান। যে কেউ এই বাগান দেখে ভুরু কুঁচকে বলবে এত সুন্দর জায়গাটাকে গর্ত-টর্ত খুঁড়ে এসব কী করেছে ? আপাতদৃষ্টিতে যেগুলোকে গর্ত বলে মনে হচ্ছে তার কোনোটাই গর্ত নয়—জলাধার। অরুর বাবা জামিল সাহেব এইসব জলাধারের পরিকল্পনা করেছেন, যেখানে ফুটে থাকবে জলপদ্ম। একেকটা জলাধার ঘিরে থাকবে মিনি ফুলের বাগান। বাড়ি ঢেকে রাখবে নীল পাতার বাগান বিলাসে। বিশেষ ধরনের আকাশী নীল রঙের বাগান বিলাসের চারা আনা হল শ্রীলংকা থেকে। চার বছরের মাথায় পাতা বেরুলে দেখা গেল পাতার রং নীল নয় গোলাপি। জামিল সাহেব মালীকে ডেকে বললেন, 'গাছ তিনটা কেটে ফেল।' অরু বলল, 'সে কী বাবা! এত বড় গাছ কেটে ফেলবে ?'

জামিল সাহেব ভারি গলায় বললেন, 'অবশ্যই কাটব। এ জাতীয় গাছে বাংলাদেশ ভর্তি। নীল পাতা চেয়েছিলাম — এগুলো কি নীল ?'

'এখন নীল না, পরে হয়তো নীল হবে।'

জামিল সাহেব আগের চেয়েও ভারি গলায় বললেন, 'হয়তো শব্দটা আমি অপছন্দ করি। হয়তো বলে পৃথিবীতে কিছু নেই। ইয়েস অথবা নো। তুমি যদি বল এই গাছের পাতা অবশ্যই নীল হবে, আমি মালীকে কাটতে নিষেধ করব।'

অরু চুপ করে গেল। তিনটা গাছই কেটে ফেলা হল।

জলপদ্মের বেলাতেও এই ব্যাপার। জলাধারে জলপদ্ম ফুটল না। বিশেষজ্ঞ হর্টিকালচারিস্ট বললেন, 'পানির গভীরতা কম বলেই পদ্ম ফুটছে না। আরো দুফুট গভীর করে দিন। তাহলেই হবে।'

জামিল সাহেব জলাধার আরো দুফুট গভীর করলেন। পদ্ম ফুটল না। হর্টিকালচারিস্টকে আবার ডেকে আনা হল। তিনি বললেন, 'বেশি গভীর হয়ে গেছে।'

'বেশি গভীর হয়েছে ?'

'জ্বি, অবশ্যই বেশি হয়েছে।'

'জলপদ্মের বিষয়ে আপনি জানেন তো ?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'জানব না মানে? কী বলছেন আপনি!'

'আমার ধারণা আপনি একজন মহামূর্খ। জলপদ্ম কেন কোনো পদ্ম সম্পর্কেই আপনি কিছু জানেন না। যেহেতু এটা মূর্খের দেশ সেহেতু করে খাচ্ছেন। আপনি দয়া করে বিদেয় হোন।'

জলপদ্ম প্রজেক্ট বাতিল হয়ে গেল। জলাধারের চারপাশে মিনি বাগানের প্রজেক্টও বাতিল। জামিল সাহেব এখন পুরো বাগান নিয়ে নতুন করে চিন্তাভাবনা করছেন। চিন্তাভাবনা শেষ হয় নি বলে বাগান শুরু হয় নি। যেহেতু মালী এক জন আছে — নিয়মিত বেতন নিচ্ছে, সেহেতু সে এলোমেলোভাবে কিছু গাছ লাগিয়েছে। বেশিরভাগই গোলাপ। গোলাপ জামিল সাহেবের অপছন্দের ফুল। কিন্তু তাঁর ছোট মেয়ে গোলাপ-পাগল বলে তিনি গাছগুলো এখন পর্যন্ত সহ্য করে যাচ্ছেন।

জামিল সাহেবের বয়স পঁয়ষট্টি। স্বাস্থ্য শুধু যে ভালো তা না অতিরিক্ত রকমের ভালো। দারোগা হয়ে চাকরিতে ঢুকেছিলেন, ডিআইজি হয়ে রিটায়ার করেছেন। সারদা পুলিশ একাডেমিতে ট্রেনিং নিতে যাবার আগের দিন তাঁর বাবা নবীগঞ্জ হাইস্কুলের অ্যাসিসটেন্ট হেডমাস্টার মুত্তালেব হোসেন তাঁকে নিয়ে বাড়ির পেছনে চলে গেলেন। সেখানে জামিল সাহেবের মায়ের কবর।

মুত্তালেব সাহেব বললেন, 'তুমি তোমার মায়ের কবর ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা কর যে চাকরি জীবনে সৎপথে কাটাবে। এমন চাকরিতে ঢুকছ যেখানে সৎ থাকা খুবই কঠিন। প্রতিজ্ঞা কর।'

জামিল সাহেব বললেন, 'প্রতিজ্ঞা করার প্রয়োজন নেই।'

'জানি প্রয়োজন নেই। তবু কর।'

তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন। এই প্রতিজ্ঞা রিটায়ার করার দিন পর্যন্ত বহাল রেখেছেন। বেতনের প্রতিটি পয়সা হিসেব করে খরচ করেছেন। রিটায়ার করার পর জীবনের সমস্ত সঞ্চয় দিয়ে বাড়ি করলেন। দোতলা করার ইচ্ছা ছিল। একতলা করতেই সব শেষ হয়ে গেল। ভাগ্যিস সস্তার সময়ে দশ কাঠা জায়গা কেনা ছিল।

জামিল সাহেবের আর্থিক অবস্থা এখন মোটেই সুবিধার না। সঞ্চয় কিছু নেই। পেনশনের অর্ধেক বিক্রি করে দিয়েছেন বলে প্রতি মাসে যা পান তার পরিমাণ নগণ্য। জামিল সাহেবের স্ত্রী রাহেলা একটি কলেজে অধ্যাপনা করেন। এই টাকাটা সংসারে লাগে।

মোটামুটি অভিজাত এলাকায় একটা চমৎকার বাড়ি। বাড়ির সামনে বাগান এবং চব্বিশ ঘণ্টার এক জন মালী দেখে এই পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে যে কেউ বিভ্রান্ত হতে পারে। বিভ্রান্ত হবার কিছু নেই। পরিবারটির অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয়। জামিল সাহেবের ছোট মেয়ে অরুর বিয়ে ঠিক হয়ে আছে। সেই বিয়ে কীভাবে দেয়া যাবে তা জামিল সাহেব ভেবে পাচ্ছেন না। তাঁর মেজাজ খুব খারাপ হচ্ছে। তাঁর ভয়ংকর মেজাজে বাড়ির সবাই আতঙ্কগ্রস্ত। কারণ মানুষটির এর আগে দুবার স্ট্রোক হয়েছে। তৃতীয়বারের ধাক্কা সইতে না পারারই কথা।

অরু রিকশা থেকে খুব ভয়ে ভয়ে নামল।

বাসায় কী হচ্ছে কে জানে! ভয়ংকর কিছু নিশ্চয়ই হচ্ছে, কিংবা হয়ে গেছে। বাবা খুব সম্ভব হাসপাতালে। মীরু তার ছোট বোনের গোপনে বিয়ে করার খবর বাবাকে দেবে আর তিনি স্বাভাবিক থাকবেন এই আশা দুরাশামাত্র।

বাড়িতে কাল রাতে কী ঘটেছে তা অরু খুব ভালো কল্পনা করতে পারছে। আপা বিয়েবাড়ি থেকে ফিরল রাত নটায়। মা'র সঙ্গে গল্প-টল্প করে রাত দশটায় ঘুমাতে গেল। তখন তার হাতে চিঠি পড়ল। চিঠি পড়ার পর খানিকক্ষণ মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পর সে একটা বিকট চিৎকার দিল। মা ছুটে এসে বললেন, 'কী হয়েছে?' সে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'কিছু না মা—ঘুমাও।' মা বললেন, 'হাতে কার চিঠি?'

মা চিঠি পড়লেন। বাবা পড়লেন। বাবার স্ট্রোক হল। তাঁকে নিয়ে দুপুর রাতে সবাই গেল হাসপাতালে। এখনো সবাই হাসপাতালে, কেউ ফেরে নি। এই কারণেই বাড়ি খালি। মালী মতি ভাইকেও দেখা যাচ্ছে না। সকালবেলা খুরপি হাতে মতি ভাই সব সময়ই বাগানে থাকে। আজ কেন থাকবে না?

অরু গেট খুলে বাগানে ঢুকল। মতি ভাইকে দেখা যাচ্ছে। ঝাঁঝরি করে পানি নিয়ে আসছে। অরু ভয়ে ভয়ে বলল, 'মতি ভাই বাসার খবর সব ভালো?'

মতি বলল, 'হ।'

তার মানে সে কিছুই জানে না। মতিকে কিছু জিজ্ঞেস করাই ভুল হয়েছে। বাগান ছাড়া সে অন্য কিছু জানে না। জানার আগ্রহও নেই। এ বাড়ির একটা মানুষ মরে গেলে সে যতটা কষ্ট পাবে তারচে' অনেক বেশি কষ্ট পাবে একটা গোলাপ গাছ মরে গেলে।

'মতি ভাই বাসায় কি কেউ নেই ?'

'আছে। খালি আম্মা গেছে কলেজে।'

'বাবা আছেন ?'

'হ।'

তার মানে কী? চিঠি পড়েও বাবা নিজেকে সামলে নিয়েছেন? অপেক্ষা করছেন তার জন্যে ? বিশ্রী অবস্থাটা এড়াবার জন্যে মা চলে গেছেন বাইরে ?

অরু কলিং বেল টিপল। আজ কলিং বেলটাও যেন অন্য রকম করে বাজছে। কান্নার মতো শব্দ হচ্ছে।

দরজা খুললেন জামিল সাহেব। তাঁর হাতে খবরের কাগজ। তিনি মেয়েকে কিছু না বলে আগের জায়গায় ফিরে গেলেন। অরু ভয়ে ভয়ে বলল, 'কেমন আছ বাবা ?'

তিনি বিরক্ত গলায় বললেন, 'যেমন সব সময় থাকি তেমন আছি। ভালো থাকার মতো কিছু ঘটে নি, আবার খারাপ থাকার মতো কিছু ঘটে নি। আজকের কাগজ পড়েছিস ?'

'না বাবা।'

'মন দিয়ে পড়।'

'কী আছে কাগজে ?'

'কী আছে সেটা জানার জন্যেই তো পড়তে বলছি। নে কাগজটা হাতে করে নিয়ে যা।'

কাগজ হাতে অরু বাড়ির ভেতর ঢুকল। বোঝাই যাচ্ছে বাবা এখনো কিছুই জানেন না। আপা তাকে বলে নি। বুদ্ধিমতীর মতো চেপে গেছে। মীরু বারান্দায় মোড়ায় বসে ছেলেকে ডিমপোচ খাওয়াবার চেষ্টা করছে। চেষ্টার ফল হয়েছে ভয়াবহ। সারা মুখে, গায়ে, মেঝেতে ডিমের ছড়াছড়ি। মীরু বলল, 'তুই না বললি দুপুরের দিকে আসবি, এখন চলে এলি যে ?'

'ভালো লাগছিল না। আপা তুমি কি চিঠিটা পড়েছ ?'

'কোন চিঠি ?'

'তোমার টেবিলের উপর একটা চিঠি ছিল না ?'

'ছিল নাকি ? কই দেখি নি তো। কার চিঠি ?'

জবাব না দিয়ে অরু মীরুর ঘরে ঢুকে গেল। চিঠি সরিয়ে ফেলতে হবে। দুএক দিন পরে জানালেও কোনো ক্ষতি নেই। ঘুমে তার শরীর ভেঙে আসছে। অরু ঠিক করল গরম পানি দিয়ে সে দীর্ঘ একটা শাওয়ার নেবে। তারপর পর পর দুকাপ চা খেয়ে টানা ঘুম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেবে। তার আগে অবশ্যি খবরের কাগজটা পড়ে ফেলা দরকার। বাবা জেরা করবেন।

'কলম্বোয় একদিনের সার্ক শীর্ষ বৈঠক।'

'বাকেরগঞ্জ ৫ আসনে আজ ভোট। ত্রিমুখী লড়াই।'

'সোভিয়েট ক্ষমতাকেন্দ্রগুলো ইয়েলৎসিনের দখলে।'

'৪৮ ঘণ্টার ধর্মঘট পালন করুন : স্কপ নেতৃবৃন্দ।'

'বগি লাইনচ্যুত। সাত জন যাত্রী আহত।'

হেডিং পড়ার পর আর কিছু পড়তে ইচ্ছা করে না। হেডিং পড়তে গেলেই হাই ওঠে, খবর পড়বে কী!

অরু ময়নার মাকে গরম পানি করতে বলে আবার বারান্দায় এল। আপা ডিম খাওয়ানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। নতুন আরেকটা ডিম পোচ দেখা যাচ্ছে। আবীরের মুখের সামনে চামচ ধরে মীরু বলছে — 'একটু হাঁ কর বাবু। একটু হাঁ কর। আম্মু তোমার লাল টুকটুক ছোট্ট জিভটা দেখতে চায়। আমার বাবুর মতো সুন্দর জিভ এই পৃথিবীতে আর কারোরই নেই।'

অরু বলল, 'কেন যন্ত্রণা করছ আপা ? ছেড়ে দাও না।'

'নিজের চোখে দেখছিস না স্বাস্থ্যের হাল, তারপরেও বলছিস ছেড়ে দিতে ?'

'জোর করে খাওয়াবে, তারপর বমি করে সবটা ফেলে দিবে।'

'ফেলুক। তোর বাচ্চাকে তুই তোর থিওরি মতো মানুষ করিস।'

'খেতে চাচ্ছে না তবু তুমি জোর করে খাওয়াবে। তোমাকে কেউ জোর করে খাওয়ালে ভালো লাগত ?'

'তুই আমার সামনে থেকে যা তো।'

চিঠির ব্যাপারটা মীরু উল্লেখ করল না। কিছু জিজ্ঞেস করলে বানিয়ে বানিয়ে একগাদা কথা বলতে হত। অল্প কথায় মিথ্যা বলা যায় না। সামান্য মিথ্যাও অনেক ফেনিয়ে ফানিয়ে বলতে হয়।

মীরু বলল, 'কাল বিয়ে বাড়িতে দারুণ মজার একটা ব্যাপার হয়েছে—আমি হাসতে হাসতে...'

'কী হয়েছে ?'

মীরু 'কী হয়েছে' তা বলা বন্ধ রেখে বাবুকে ডিম খাওয়ানোয় ব্যস্ত হয়ে গেল। 'খাও লক্ষ্মী সোনা, খাও। হাঁ কর। দেখি আমার বাবুর লাল টুকটুকে জিভটা ?'

অরু বলল, 'কাল বিয়ে বাড়িতে কী হয়েছিল ? ওমা গো কী সুন্দর আমার বাবু।'

'দেখছিস না বাবুকে খাওয়াচ্ছি, কেন বিরক্ত করছিস ?'

'আচ্ছা আচ্ছা আর বিরক্ত করব না।'

'তুই বাবাকে এক কাপ চা দিয়ে আয় তো। আমার কাছে চা চেয়েছিলেন, আমি বাবুর খাওয়া নিয়ে আটকা পড়ে গেলাম।'

'ছাড়া পাবে কখন ?'

'কি জানি কখন। এ তো হাঁ করছে না।'

'ঠাশ করে একটা চড় দাও। চড় খেলে হাঁ করবে। তখন মুখে ডিম ঢুকিয়ে আরেকটা চড় দাও। ভয় পেয়ে ডিম গিলে ফেলবে।'

মীরু কঠিন চোখে তাকাল। অরু চলে গেল রান্নাঘরে বাবার জন্যে চা বানাতে। ময়নার মা চা বানানোর কাজটা ভালোই পারে কিন্তু তার চা বাবা মুখে দেবেন না। তার রান্নাকরা খাবার খেতে কোনো অসুবিধা নেই, শুধু চা খাওয়া যাবে না।

অরু বাবার সামনে চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে বলল, 'বাবা চা।' জামিল সাহেব চোখ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বন্ধ করে আধশোয়া হয়ে আছেন। তিনি চোখ খুললেন না। চোখ বন্ধ রেখেই বললেন — ‘বোস মীরু।’

‘মীরু না বাবা, আমি অরু।’

‘তোকে তো চা বানাতে বলি নি। মীরুকে বলেছিলাম। দায়িত্ব ট্রান্সফার করে দেবার যে বদভ্যাস মীরুর হয়েছে তার ফলাফল সুদূরপ্রসারী। তাকে যখন যা করতে বলি তখনি সে তা অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়। এক সেকেন্ড দেরি করে না। কাল তাকে বললাম শার্ট ইস্ত্রি করে দিতে। সে সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে বলল, মা বাবার শার্ট ইস্ত্রি করে দাও।’

‘বাবুকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে।’

‘তাই দেখছি। তুই বোস।’

‘আমি এখন গোসল করব বাবা। পানি গরম করা হয়েছে, দেরি করলে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।’

‘গোসল ঠাণ্ডা পানি দিয়েই করতে হয়। শীতকালে গোসল করতে হয় বরফশীতল পানি দিয়ে।’

‘গরমকালে ফুটন্ত পানি দিয়ে?’

‘গরমকালে লিউকওয়ার্ম পানি দিয়ে। খবরের কাগজ পড়তে বলেছিলাম, পড়েছিস ?’

‘হুঁ।’

‘চোখে পড়ার মতো কী পেয়েছিস ?’

‘তেমন কিছু পাই নি।’

‘তোদের সমস্যা কী জানিস? তোদের সমস্যা হচ্ছে তোরা নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত। আশপাশে কী হচ্ছে না হচ্ছে সেদিকে কোনো লক্ষ নেই। উৎসাহও নেই। আজকের খবরের কাগজের ফ্রন্ট পেজে এক জন কুষ্ঠরোগীর কথা ছাপা হয়েছে। সে আসলে কুষ্ঠ রোগী নয়। মেকাপ নিয়ে রোগী সাজত। ফার্মগেটের ওভার ব্রিজে শুয়ে ভিক্ষা করত। সে ধরা পড়েছে। সমস্ত কাগজের ফ্রন্ট পেজে তার ছবি, বিশাল নিউজ।’

অরু ক্ষীণ স্বরে বলল, ‘ভেরি ইন্টারেস্টিং।’

জামিল সাহেব কড়া গলায় বললেন, ‘মোটেই ইন্টারেস্টিং নয়। এক জন অসহায় মানুষ রোগী সেজে মানুষকে ধোঁকা দিচ্ছে সেই খবর দেশের সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠার সংবাদ হতে পারে না।’

‘তা তো বটেই।’

‘তুই কোনো কিছু না বুঝেই বললি, তা তো বটেই।’

‘গোসল করতে যাই বাবা। পানি ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।’

জামিল সাহেব জবাব দিলেন না। বিরক্ত মুখে চায়ের কাপে চুমুক দিতে লাগলেন।

অরু গোসল শেষ করে এসে দেখল, বাবুর ডিম ভক্ষণ পর্ব শেষ হয়েছে। এখন চলছে দুধপান পর্ব। দুধও ডিমের মতো চামচে করে খাওয়ানো হচ্ছে। চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে অরু বলল, ‘আপা একটা কাজ কর, ফুটবলের পাম্পার কিনে আন। তারপর সেই ফুটবল পাম্পারে দুধ ভরে বাবুর মুখে পাম্প করে দাও।’

মীরু বলল, ‘এইসব রসিকতা আমার ভালো লাগে না।’

‘তোমার তো এখন পৃথিবীর কোনো কিছুই ভালো লাগে না।’

মীরু বলল, ‘তুই সব সময় আমার পেছনে লাগিস না তো অরু, আমার অসহ্য লাগে। আর শোন আজ বিকেলে বাসায় থাকবি — আবরার সাহেব টেলিফোন করেছিলেন। কথার ভঙ্গি দেখে মনে হল বিকেলে আসবেন।’

‘আসবেন বলেছেন?’

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সরাসরি বলেন নি। জিজ্ঞেস করছিলেন তোর কথা। আমি বললাম, বন্ধুর বাড়িতে গেছে। রাতে থাকবে। সেই বন্ধুর টেলিফোন আছে কিনা জিজ্ঞেস করছিলেন।'

'ও।'

'তুই আজ বিকেলে বাসায় থাকবি কিনা জানতে চাচ্ছিল। আমি বলেছি থাকবে। আপনি আসতে চাইলে আসুন।'

'কী বললেন, আসবেন?'

'কিছু বলেন নি। আসবেন তো বটেই। তুই বিকেলে বাসায় থাকিস।'

'আমি বাসায়ই থাকব। যাব আর কোথায়?'

গোসল করে এক কাপ গরম চা খাবার পর পর অরুর ঘুম কেটে গেল। একটু আগে ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছিল — এখন ঘুম নেই। শরীরে কোনো ক্লান্তিবোধও নেই। সে ঠিক করল, আবরারকে লেখা চিঠিটা শেষ করে ফেলবে। আজ যদি আসেন তাঁকে হাতে হাতে দেবে। না এলে বাসায় গিয়ে দিয়ে আসবে। সে বিয়ের জন্যেই অপেক্ষা করছিল। বিয়ে হয়ে গেছে আর অপেক্ষা করার কিছু নেই।

অরু দীর্ঘ চিঠি লিখতে পারে না। অনেক কিছু লেখার জন্যে সে কাগজ-কলম নিয়ে বসে, খানিকটা লেখার পর মনে হয় সব লেখা হয়ে গেল। সেই অর্থে আবরারকে লেখা তার চিঠিটা বেশ দীর্ঘ বলা যেতে পারে। চিঠিতে সম্বোধন নেই। কী সম্বোধন দেয়া যায় অনেক ভেবেও সে বের করতে পারে নি — সুজনেষু, প্রিয়জনেষু, শ্রদ্ধাস্পদেষু... কোনোটাই মানায় না। তাছাড়া চিঠি যতটুকু লিখে রেখেছে তার কাছে ভালো লাগে নি। মনে হয় পুরো ব্যাপারটা আরো সুন্দর করে আরো গুছিয়ে লেখা যেত।

'আপনি নিশ্চয়ই আমার এই দীর্ঘ চিঠি দেখে আঁতকে উঠে ভাবছেন, ব্যাপারটা কী? হাতের লেখা দেখেও নিশ্চয়ই বিরক্ত হচ্ছেন। ভাবছেন এই মেয়েটার হাতের লেখা এত বাজে কেন? এ জীবনে আমি যত বকা খেয়েছি তার শতকরা ৬০ ভাগ হচ্ছে খারাপ হাতের লেখার জন্যে। এসএসসি এবং এইচএসসি-তে আমি কোনোমতে টেনেটুনে ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েছি। আমার ধারণা, আমি আরো ভালো করতাম। একজামিনাররা হয়তো আমার হাতের লেখা পড়তেই পারেন নি। আপনিও পড়তে পারছেন কিনা জানি না। পুরো চিঠি যদি না পড়েন তাহলে একজামিনারদের মতো আপনিও আমাকে অনেক কম নম্বর দেবেন। দয়া করে পড়ুন।

বুধবার আমার বিয়ে হবার কথা। আজ সোমবার। বিয়ের এখনো দুদিন দেরি। আমি ঠিক করে রেখেছি চিঠি শেষ করে রাখব, আপনাকে দেব না। আপনাকে দেয়া হবে বিয়ের এক দিন পর। যেহেতু আপনি এখন চিঠি পড়ছেন, আপনি ধরে নিতে পারেন যেদিন বিয়ে হবার কথা ছিল সেদিনই হয়েছে। যার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে আপনার তুলনায় সে অতি নগণ্য মানুষ, কমনার। এমএ পাস করেছে — কোনোমতে একটা সেকেন্ড ক্লাস জোগাড় করেছে। চাকরির সন্ধানে ঘুরছে শিকারি কুকুরের মতো। যেখানেই তার মনে হয়েছে চাকরির সম্ভাবনা আছে সেখানেই সে উপস্থিত হয়েছে। আপনি শুনলে নিশ্চয়ই হাসবেন চাকরির জন্যে সে ময়মনসিংহের মদনের এক পীর সাহেবের মাজার জিয়ারত করে এসেছে। এখনো কিছু হয় নি। চট করে যে হবে সে সম্ভাবনাও ক্ষীণ। দেশের চাকরি-বাকরি এখন পীর-ফকিরদের হাতে না। যাদের হাতে তারা মুহিবকে চাকরি দেবে না।

বুঝতেই পারছেন ওর নাম মুহিব। যেসব জিনিস মেয়েরা পছন্দ করে না তার সবই মুহিবের মধ্যে আছে। রুচি এক বস্তু তার নেই। এমন সব কুৎসিত শার্ট পরে সে আসে যা সুস্থ মাথায় কোনো মানুষ কিনতে পারে না। একবার সে গোলাপি রঙের এক হাওয়াই শার্ট পরে উপস্থিত হয়েছিল। সিল্কের শার্ট। সেকেন্ড-হ্যান্ড মার্কেট থেকে তেত্রিশ টাকায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিনেছে এবং তার ধারণা হয়েছে এত সুন্দর শার্ট সে তার জীবনে আগে কখনো পরে নি। সে অসম্ভব ভীরু। একদিন তাকে নিয়ে আমি পাবলিক লাইব্রেরির সামনের রাস্তা দিয়ে হাঁটছি হঠাৎ বদ টাইপের এক আধবুড়ো লোক ইচ্ছা করে আমাকে ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে গেল। আমি থমকে দাঁড়িয়ে বললাম, 'ঐ বুড়োটাকে ডেকে জিজ্ঞেস কর তো সে এটা কেন করল।' মুহিব বলল, 'আহা বাদ দাও না। পথ চলতে ধাক্কা লাগে না?'

আমি কঠিন গলায় বললাম, 'পথ চলতে ধাক্কা এটা নয়। তুমি এক্ষুনি গিয়ে বুড়োকে ধরে আন।'

মুহিব সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, 'আমি নাটক করতে পারব না। বুড়ো যদি ইচ্ছা করে ধাক্কা দিয়েই থাকে তাহলে আমি এখন বললে তো ধাক্কা ফেরত চলে যাবে না।'

'তা যাবে না—তবে সে সাবধান হবে।'

'তাকে সাবধান করার দায়িত্ব নিতে ইচ্ছা করছে না। তুমি পুরো ব্যাপারটা ভুলে যাও তো। তুচ্ছ জিনিস মনে ধরে রাখলে চলে না।'

রাগে আমার গা জ্বলে গেল। তার কাছে সবই তুচ্ছ জিনিস। সে থাকে তার বোনের সঙ্গে। তার দুলাভাই তাকে দিন-রাত অপমান করে। অপমানের দুএকটা নমুনা শুনে আমার মাথায় আগুন ধরে গেছে। সে নির্বিকার—তার কাছে এসব হচ্ছে তুচ্ছ জিনিস।

তার টাইপ সম্পর্কে বুঝবার জন্যে একটা ঘটনার শুধু উল্লেখ করি। আপনি অসম্ভব বুদ্ধিমান। একটি ঘটনা থেকে তার চরিত্র ধরে ফেলতে পারবেন। বেশিদিন আগের কথা না, মাস তিনেক হবে। তার সঙ্গে গল্প করতে করতে আসছি। সে হঠাৎ বলল, 'এক সেকেন্ড দাঁড়াও, বাথরুম সেরে আসি।'

আমি হতভম্ব হয়ে বললাম, 'কোথায় বাথরুম সারবে?'

সে নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল, 'রাস্তার পাশে। ড্রেন আছে তো। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝামেলা চুকিয়ে ফেলব। নো প্রবলেম।'

আমি বললাম, 'রাস্তায় শত শত লোক যাচ্ছে এর মধ্যে তুমি বাথরুম সারবে?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি কি প্রায়ই এরকম কর?'

'আমার মতো যুবক, যাদের কাজই হচ্ছে সারাদিন শহরে ঘুরে বেড়ানো — বাথরুম সারার কাজ তাদের এভাবেই করতে হয়। এটা তো সানফ্রানসিসকো শহর নয় যে রাস্তার মোড়ে মোড়ে পাবলিক টয়লেট থাকবে।'

'তুমি যদি সত্যি এরকম কর তাহলে আমি কিন্তু চলে যাব। আর কখনো আমার দেখা পাবে না।'

'তুমি চাও আমি ব্লাডার ফেটে মারা যাই?'

'এই বলে সে আমাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে রাস্তার পাশের একটি আম গাছের দিকে এগিয়ে গেল। এ থেকে আপনি নিশ্চয়ই ওর মানসিক গঠন বুঝতে পারছেন...'

আপনার সঙ্গে ওর কোনোই মিল নেই...

চিঠি এই পর্যন্ত পড়েই অরুর ঘুম পেয়ে গেল। ময়নার মা ঘরে ঢুকে বলল, 'আফা আপনেরে বড় আফা ডাকে।' অরু বিরক্ত মুখে বলল, 'কেন?'

'বাবু বমি করতেছে।'

'বমি করবে তা তো জানা কথাই — এতক্ষণ কেন যে করে নি তাই ভেবে আশ্চর্য হচ্ছি। আপাকে গিয়ে বল আমি যেতে পারব না। আমি এখন ঘুমাব। খবরদার দুপুরে আমাকে ডাকতে পারবে না। ভাত খাওয়ার জন্যেও ডাকবে না। যদি টেলিফোন আসে বলবে আমি বাসায় নেই।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ময়নার মা চলে যাবার পর পর মীরু দরজা ধরে দাঁড়াল। রাগী গলায় বলল, 'বাবু বমি করছে আর তুই আসছিস না। তুই তো দিন দিন অমানুষ হয়ে যাচ্ছিস অরু!'

অরু বলল, 'আমি ঘুমাচ্ছি আপা। আমাকে ডিসটার্ব কোরো না। বমি করে বাবুর পেট খালি হয়ে গেছে। ওকে আবার ডিম-দুধ খাওয়াও।'

'তুই এমন হয়ে যাচ্ছিস কেন ?'

'কেমন হয়ে যাচ্ছি ?'

'এক জন ইনসেনসেটিভ মানুষ। দয়ামায়া নেই...।'

'আমার দয়ামায়া দেখানো ঠিক হবে না আপা। আমি দয়ামায়া দেখাতে গেলেই সবাই বলবে মায়ের চেয়ে মাসির দরদ বেশি। এটা ঠিক হবে না।'

'তোর দুলাভাই গত মাসে তোকে চিঠি লিখেছে। তুই জবাব দিয়েছিস?'

'না।'

'না কেন ?'

'সবাইকে কি চিঠি লিখতে ইচ্ছে করে? চিঠি লেখা যায় খুব সিলেকটেড কজনকে। দুলাভাই তার মধ্যে পড়েন না।'

মীরু রাগ করে চলে গেল। অরু আবরারকে লেখা চিঠিটা আবার পড়ল। পছন্দ হল না। আরো গুছিয়ে লিখতে হবে। হাতের লেখাও ভালো হয় নি। লাইন টানা কাগজে লিখতে হবে।

ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে। ঘুমঘুম অবস্থায় লেখা চিঠিগুলো সুন্দর হয়। কেমন করে যেন চিঠিতে কিছু স্বপ্নভাব চলে আসে।

অরু খাতা নিয়ে উপুড় হল। পায়ের উপরে চাদর ছড়িয়ে দিল। জানালা দিয়ে রোদ এসে গায়ে পড়েছে। খুব আরাম লাগছে। অরু লিখতে শুরু করল। প্রথমেই সম্বোধন। সম্বোধনটাই কঠিন। সম্বোধনে অনেকখানি বলা হয়ে যায়। অরু লিখল 'প্রিয়তমেষু'। এই সম্বোধনের চিঠি আবরার সাহেবকে পাঠানো যায় না। এই চিঠি মুহিবের জন্যে। এটা মন্দ না। মুহিব ফিরে এলে সে অনেকদিন দেখা করবে না। পালিয়ে পালিয়ে বেড়াবে, কিংবা চলে যাবে মামার বাড়ি — কেন্দুয়ায়। মুহিব যখন চিন্তায় চিন্তায় অস্থির তখন হঠাৎ চিঠি পাবে।

'প্রিয়তমেষু,

তুমি ভোরবেলা হুট করে চলে গেলে। এটা একদিকে ভালোই হয়েছে। আমি নিজেকে গুছিয়ে নেবার সময় পেয়েছি। বিরহে কাতর হই নি। গল্প-উপন্যাসের নায়িকারা সম্ভবত বিরহে কাতর হয়ে কাঁদতে বসত। আমি কী করেছি জান? আমি খুব সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে নিজে নিজেই আরেক কাপ চা বানিয়ে খেলাম। চা শেষ করার আগেই তোমার বন্ধু এবং বন্ধুপত্নী এসে উপস্থিত। রাতে আমাদের ফেলে রেখে দুজনই চলে গিয়েছিল এই দুঃখে তারা কাতর। তোমার বন্ধু 'বজলু' সাহেব একটু পর পর বলছেন — 'ভাবী, আমি একটা ছাগল। শুধু ছাগল না, রামছাগল। আমাকে দয়া করে ক্ষমা করে দিন।' বেচারার ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গি দেখে মায়া লাগছিল। তিনি অবশ্যি তোমাকেও একটু পর পর রামছাগল বলছেন কারণ তুমি আমাকে ফেলে চলে গেছ। বজলু সাহেবের স্ত্রী আমাকে আড়ালে নিয়ে একগাদা প্রশ্ন করলেন। সেই সব প্রশ্নের সত্তর ভাগ চূড়ান্ত রকমের অশ্লীল। এই মহিলার অশ্লীল কথাবার্তার দিকে মনে হয় খুব ঝোঁক আছে। শুরুতে তাঁর কথাবার্তা শুনে রাগ লাগছিল। তারপর অবশ্যি রাগ দূর করে হেসে হেসে আমিও বানিয়ে বানিয়ে অনেক কথা বলেছি।

বাসায় ফেরার সময় খুব টেনশান হচ্ছিল। ভেবেছিলাম বাসায় ভয়াবহ কিছু হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেছে। বাবার হার্টের অসুখ। তাঁর মাইল্ড স্ট্রোক জাতীয় কিছু হওয়া বিচিত্র না। হবার সম্ভাবনাও অনেকখানি। কারণ হচ্ছে বাবা তাঁর পছন্দের একটি ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিকঠাক করে রেখেছেন। বাবা হচ্ছেন সেই জাতের মানুষ যাঁরা মনে করেন এই পৃথিবীতে তাঁদের মতামতটাই প্রধান। অন্য কারোর কোনো মতামত থাকতে পারে না। থাকা উচিত না। ঐ ছেলের সঙ্গে বাবার পরিচয় কী করে হল শোন। একদিন বাবার খুব মাথাব্যথা। তিনি প্যারাসিটামল কেনার জন্যে একটা ফার্মেসিতে গেলেন। দশ টাকার প্যারাসিটামল কিনে মানিব্যাগের জন্যে পকেটে হাত দিয়ে দেখলেন মানিব্যাগ আনেন নি। বাবা বললেন, 'টাকা আনতে ভুলে গেছি। পরে এসে টাকা দিয়ে নিয়ে যাব।' দোকানদার বলল, 'আচ্ছা।' সে ওষুধ তুলে রাখল। দোকানে বসা অল্পবয়স্ক একটা ছেলে বলল, 'রমিজ মিয়া ওষুধ দিয়ে দিন।' ছেলেটা বাবার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনি আবার যখন এদিকে আসবেন তখন টাকা দিয়ে দিবেন।'

বাবা বললেন, 'তার প্রয়োজন নেই। আমি টাকা দিয়েই ওষুধ নেব। আপনার ভদ্রতার জন্যে ধন্যবাদ। এই ভদ্রতা কি আপনি সবার সঙ্গে করেন?'

'জ্বি না। আপনি দশ টাকার ওষুধ কিনেছেন বলে ভদ্রতাটুকু করতে পারছি। এক হাজার টাকার অষুধ কিনলে করতাম না। তার কারণও আছে, একবার একটা লোক দুশ টাকার ওষুধ কিনে বলল, টাকা আনতে ভুলে গেছি। এক্ষুনি টাকা এনে দিচ্ছি। সেই এক্ষুনি এখনো শেষ হয় নি। তিন মাস হয়ে গেল।'

বাবা বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে গেলেন। ওষুধ কিনলেন। ছেলেটির সঙ্গে আরো খানিকক্ষণ কথাবার্তা হল, জানা গেল সে ডাক্তার। গত বছর মাত্র পাস করেছে। কথা বলে বাবা মুগ্ধ।

বাবা সহজে মুগ্ধ হন না। তিনি সহজে যা হন তা হল বিরক্ত। তিনি যখন মুগ্ধ তখন ধরে নিতে হবে মানুষটার মধ্যে মুগ্ধ হবার মতো কিছু আছে।

ভদ্রলোক কয়েকবার এলেন আমাদের বাসায়। আমি খুব আগ্রহ নিয়ে তার সঙ্গে কথা বললাম। বাবা কেন মুগ্ধ হলেন তা জানাই ছিল আমার আগ্রহের প্রথম কারণ। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে বাবার প্রিয় মানুষটির সঙ্গে তোমাকে মিলিয়ে দেখতে চাচ্ছিলাম। মিলিয়ে মন খারাপই হল। আবরার সাহেবকে একশতে নব্বুই দিলে তুমি পাও চল্লিশ। মানুষটা অসম্ভব ভদ্র। মেকি ভদ্রতা না — আসল জিনিস। বাবা একদিন জিজ্ঞেস করলেন, 'কি রে, ছেলেটা কেমন?'

আমি বললাম, 'ভালো।'

বাবা ধমক দিয়ে বললেন, 'বি স্পেসিফিক। কেন ভালো?'

'তাঁর সঙ্গে কথা বলে আরাম পাওয়া যায়। বুদ্ধিমান মানুষ।'

'আর কিছু?'

'উনি খুব ভদ্র।'

'আর কিছু আছে?'

'আর মনে পড়ছে না বাবা।'

'তার খারাপ কোনো দিক চোখে পড়েছে?'

'উনি খানিকটা ফরম্যাল।'

'ইনফরম্যাল হবার মতো পরিচয় তো হয় নি যে ইনফরম্যাল হবে। এ ছাড়া আর কোনো পয়েন্ট আছে?'

'উনার মধ্যে এক ধরনের কাঠিন্য আছে।'

'কাঠিন্য মানে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'উনার সঙ্গে যখন কথা বলি তখন উনাকে আমার কেন জানি মাস্টার মাস্টার মনে হয়।'

'এ ছাড়া আর কিছু মনে পড়ছে না?'

'জ্বি না।'

'ভালো কথা। আমি এই ছেলের সঙ্গে তোর বিয়ে দেবার কথা চিন্তা করছি। প্রাথমিক আলোচনা ছেলের বাবার সঙ্গে করেছি। তাঁরা যথেষ্ট আগ্রহী। আমি ছেলের ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে আরো কিছু খোঁজ নেব। তারপর ফাইন্যাল কথা বলব। তোকে খবরটা দেয়া দরকার বলেই দিচ্ছি। তোর মতামত চাচ্ছি না। বুঝতে পারছিস?'

'পারছি।'

'একটা কথা তোকে বলা দরকার — এই ছেলে এমবিবিএস ফাইন্যাল পরীক্ষায় গত পনের বছরের রেকর্ড ভেঙেছে। জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয় তাকে স্কলারশিপ দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। একটা গাধা টাইপ ছেলের সঙ্গে মহা সুখে জীবনযাপন করার চেয়ে ব্রাইট ছেলের সঙ্গে মোটামুটি সুখে জীবনযাপনও আনন্দের—এই কথাটা মনে রাখবি। আচ্ছা এখন যা।'

তুমি তো বাবাকে চেন না। কাজেই বুঝতে পারছ না, যে বাবার মুখের উপর কথা বলা সম্ভব না। আমি কিছুই বললাম না। তার চার দিন পর ছেলের মা আমাকে দেখতে এলেন। মহিলার মনটা মায়ায় ভর্তি। তিনি এসে কী করলেন জান? আমাকে জড়িয়ে ধরে খানিকক্ষণ খুব কাঁদলেন। তারপর একটা মুক্তা-বসানো আংটি আমার হাতে পরিয়ে দিলেন। সেই আংটি আমি সারাক্ষণ হাতে পরে থাকি। এখনো আমার হাতে আছে। শুধু বিয়ের দিন খুলে ভ্যানিটি ব্যাগে রেখেছিলাম। আংটি পরে থাকতে হয় বাবার ভয়ে। বুঝলেন সাহেব? আপনি কি বুঝতে পারছেন আমি কী সমস্যায় আছি? না পারছেন না। শুধু রাগ করছেন এত ঘটা করে ঐ ছেলের কথা লিখলাম বলে। এখন যে কথাটি লিখব তা পড়লে তোমার সব রাগ চলে যাবে। কথাটা হচ্ছে — আমি আমার সমগ্র জীবনের বিনিময়ে তোমাকে চেয়েছিলাম। তোমাকে পেয়েছি। পৃথিবীর কাছে আমার আর কিছুই চাইবার নাই।'

অরুর চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসছে। সে খাতা বন্ধ করে বালিশের নিচে রেখে ঘুমিয়ে পড়ল। গাঢ় ঘুম। ঘুমের মধ্যে বিচিত্র একটা স্বপ্ন দেখল — মুহিব বেড়াতে এসেছে তাদের বাসায়। খালি গায়ে এসেছে। মুহিব গম্ভীর মুখে বলল, 'অরু তুমি তোমার বাবা-মাকে ডেকে আন। আমি উনাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। খালি হাতে আসি নি। মিষ্টি নিয়ে এসেছি। দুকেজি স্পঞ্জ রসগোল্লা।'

অরু বলল, 'তুমি খালি গায়ে এলে?'

'খালি গায়ে না এসে কী করব? তুমি আমার পাঞ্জাবিটা পুড়িয়ে ফেললে না? পাঞ্জাবিটা পরে আসব বলে ভেবেছিলাম।'

'এইভাবে তো তুমি বাবা-মা'র সঙ্গে দেখা করতে পারবে না।'

'তাহলে কী করব, চলে যাব?'

'না, চলে যাবে কেন? আমার ঘরে চুপচাপ বসে থাক। আমি তোমার জন্যে চট করে একটা পাঞ্জাবি বানিয়ে দি।'

'পারবে?'

'অবশ্যই পারব। কাপড় কেনা আছে।'

'সময় লাগবে না তো?'

'না, সময় লাগবে না। সিম্পল পাঞ্জাবি বানাব। গলায় একটু সুতার কাজ করে দেব।'

'দেরি হবে না তো?'

'না, দেরি হবে না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বপ্নের পরবর্তী অংশে দেখা গেল অরুর বিছানায় শুয়ে মুহিব ঘুমাচ্ছে। তার গায়ে সাদা চাদর। অরু মেঝেতে বসে পাঞ্জাবির গলায় সুতার কাজ করছে। কাজটা খুব দ্রুত করতে হচ্ছে বলে সুচ বার বার আঙুলে ফুটে যাচ্ছে। রক্ত বেরুচ্ছে। সেই রক্ত লেগে যাচ্ছে পাঞ্জাবিতে। অরু যতই তাড়াহুড়া করছে ততই পাঞ্জাবির গায়ে রক্ত মেখে যাচ্ছে।

৫

মহসিন বলল, 'শালা হারামি।'

এই জাতীয় গালি সে কিছুক্ষণ পর পর দিচ্ছে। যাকে দেয়া হচ্ছে সে অবশ্যি শুনছে না। সে দশ টনি ট্রাক নিয়ে ছুটে যাচ্ছে। যার পেছনের বাম্পারে লেখা—মায়ের দোয়া।

এই ট্রাক ড্রাইভার মহসিনকে সাইড দিচ্ছে না। অন্যদের দিচ্ছে কিন্তু মহসিনের পিক-আপকে দিচ্ছে না।

ট্রাক ভর্তি করোগেটেড টিনের শিট। টিনের শিটের উপর দুজন কুলি মাথায় গামছা বেঁধে বসে আছে। দুজনের হাতেই বিড়ি। তারা খুব মজা পাচ্ছে। সাইড চেয়ে যে কোনো গাড়ি হর্ন দেয়ামাত্র ট্রাক তাকে সাইড দিয়ে দিচ্ছে। শুধু যখন মহসিন হর্ন দিচ্ছে তখন ট্রাক চলে যাচ্ছে মাঝ রাস্তায়। ট্রাকে বসে থাকা কুলি দুজন দাঁত বের করে হাসছে। তারা খুব মজা পাচ্ছে।

মুহিব বলল, 'পাল্লা দিয়ে লাভ নেই ড্রাইভার সাহেব। ও সাইড দিবে না।'

মহসিন ক্রুদ্ধ গলায় বলল, 'সবেরে দিতেছে, আমারে দিব না কেন?'

'কে জানে কেন? কোনো একটা তামাশা করছে। আমাদের আগে যাবার দরকার নেই, আমরা পেছনে পেছনেই যাই।'

'ট্রাকের পেছনে থাকলে রাস্তা দেখা যায় না। চালাতে অসুবিধা।'

'তাহলে আসুন এক কাজ করি। চায়ের দোকান দেখে গাড়ি থামান। আমরা চা খাই। ট্রাক এর মধ্যে চলে যাক।'

'এই হারামজাদাকে ওভারটেক না করতে পারলে আমি বাপের ঘরের না।'

'কোনোই দরকার নেই ভাই। আপনি গাড়িটা থামান, আমরা চা খাই। চায়ের তৃষ্ণা হচ্ছে।'

মহসিন নিতান্ত অনিচ্ছায় গাড়ি থামাল। মুহিব প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি সময় নিয়ে চা খেল। লীনাও মুহিবের সঙ্গে নেমেছে। সেও চা খাবে। তাকে পিরিচে করে চা দেয়া হয়েছে। সে চা খাচ্ছে। লম্বা ঘুম দেয়ায় তার নিজস্ব ব্যাটারি চার্জ হয়ে গেছে। সে ক্লাস টু'র বাংলা বইয়ের সব ছড়া একের পর এক শুনিয়ে যাচ্ছে। ছড়া বলছে হাত-পা নেড়ে। ছড়া বলার ফাঁকে ফাঁকে পিরিচে চা ঢেলে তার মুখে ধরে খাইয়ে দিতে হচ্ছে। মুহিবকে লীনা এখন ডাকছে — ছোট মামা। ছোট মামা কেন ডাকছে সেই জানে।

'ছোট মামা?'

'কী?'

'রং তুলি কবিতা শুনবে?'

'বল।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'রং তুলিতে ছোপ ছাপ
মাঠের পাশে ঝোপ ঝাপ।
ঝোপের পাশে সোনার গাঁও
একটুখানি বসে যাও।'

মহসিন গম্ভীর মুখে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে। তার মেজাজ ভয়ংকর খারাপ। কেন জানি তার ধারণা হয়েছে যে তাদের পেছনে না দেখে ট্রাকটাও থেমেছে। অপেক্ষা করছে কখন আবার আসে। যেই সে পিক–আপ নিয়ে দেখা দেবে ওমনি ট্রাক ড্রাইভার আগের ফাজলামি শুরু করবে। হারামজাদা।

লীনা চা শেষ করে বলল, 'নাচ দেখবে ছোট মামা ?'

'এখানে নাচবে ?'

'হুঁ। আমি সব জায়গায় নাচতে পারি।'

'এখন তো আমরা রওনা হব। আমরা বরং চিটাগাং পৌঁছে নাচ দেখব।'

'তাহলে কবিতা বলি ?'

'বল।'

'খোকন খোকন ময়না
পরিয়ে দেব গয়না
খোকন যাবে মামার বাড়ি
আর যে দেরি সয় না ...'

মহসিন যা ভেবেছিল তাই।

তারা রওনা হয়েছে পনের মিনিট পর। এই পনের মিনিটে ট্রাকের অনেক দূর চলে যাওয়ার কথা। তা যায় নি। মহসিন পিক–আপ নিয়ে কিছু দূর এগোতেই দেখল ট্রাক। কুলি দুজন পিক–আপের দেখা পাওয়ামাত্র আনন্দে হেসে ফেলল। মহসিন বলল, 'হারামজাদা, কুত্তা।'

মুহিব বলল, 'ড্রাইভার সাহেব আপনি ওদিকে লক্ষ করবেন না, নিজের মতো চালান।'

মহসিনের চোয়াল শক্ত হয়ে গেছে। চোখ লালচে। সে বিড়বিড় করে কি যেন বলল। ট্রাকে বসে থাকা কুলি দুজন দাঁত বের করে হাসছে। এক জন আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে। মহিসন দাঁতে দাঁতে চেপে বলল, 'শুয়োরের বাচ্চা।' আর ঠিক তখনি ট্রাক সাইড দিল। ট্রাক ড্রাইভার জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে ইশারা করল চলে যেতে। মহসিন তাই করল। নিমিষে ট্রাকের পাশাপাশি চলে এল। ভুল যা করার তা এর মধ্যেই করা হয়ে গেছে। মহসিনের সামনে কোকাকোলা কোম্পানির মাইক্রোবাস পেছনে যাবার উপায় নেই। পেছনে ঢাকা–চিটাগাং লাইনের বিরাট একটা হিনো বাস। বাস ড্রাইভার ক্রমাগত হর্ন দিচ্ছে। কান ঝাঁঝা করছে। ট্রাক ড্রাইভার কি ইচ্ছে করে তাকে এই বিপদে ফেলেছে? না রসিকতা? মহসিনের ত্রিশ বছরের গাড়ি চালানোর অভিজ্ঞতা কোনো কাজে লাগছে না। মাথা কাজ করছে না। চোখের দৃষ্টিও ধোঁয়াটে হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে হঠাৎ ঘন হয়ে কুয়াশা পড়েছে, স্টিয়ারিং হুইল হয়ে গেছে পাথরের মতো শক্ত। মহসিন চোখ বন্ধ করে ফেলল।

লীনা শক্ত করে মুহিবের গলা জড়িয়ে ধরে আছে। কিন্তু তাকিয়ে আছে চোখ বড় বড় করে।

মাইক্রোবাস মুখোমুখি ধাক্কা দিয়ে মুহিবদের পিক–আপকে ছুড়ে ফেলল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৬

মীরুর মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। আবীর দুপুর থেকে কিছু মুখে দিচ্ছে না। ঠোঁট শক্ত করে বন্ধ করে আছে। গা একটু গরম। সেই উত্তাপ অবশ্যি থার্মোমিটারে ধরা পড়ছে না। মীরুর ধারণা জ্বর আছে। সে খানিকক্ষণ পর পর ছেলের কপালে এবং বুকে হাত রাখছে।

মীরুর মা বেশ বিরক্ত হচ্ছেন। সেই বিরক্তি প্রকাশ করছেন না। মেয়ের আহ্লাদী প্রশ্রয় দিচ্ছেন না। সহ্য করার চেষ্টা করছেন। মীরু মার ঘরে ঢুকে কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, 'কী করি মা, বল তো?'

রাহেলা আবেগশূন্য গলায় বললেন, 'আবার কী হয়েছে?'

'বাবুর গা গরম।'

'জ্বর-জ্বারি হয়েছে বোধহয়। বাচ্চাদের তো জ্বর-টর হবেই।'

'শ্বাস নেবার সময় কেমন যেন শাঁ শাঁ শব্দ হয়। বুকে বোধহয় ঠাণ্ডা বসে গেছে।'

'আবরার আসবে বলেছে। ও এলে ওকে দেখা —'

'সে তো আর চাইল্ড স্পেশালিস্ট না।'

'চাইল্ড স্পেশালিস্ট খোঁজার মতো কিছু হয় নি মীরু।'

'দুপুর থেকে কিছু মুখে দিচ্ছে না।'

'ক্ষিধে হচ্ছে না তাই মুখে দিচ্ছে না। তুই শুধু শুধু ব্যস্ত হচ্ছিস।'

'আবীরের বাবাকে একটা ট্রাংক কল করব মা?'

'করতে চাইলে কর। তবে ছেলের অসুখের কথা না বলাই ভালো। চিন্তা করবে।'

মীরুর চোখ-মুখ মুহূর্তেই উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে হাসিমুখে বলল, 'টেলিফোনটা তোমার ঘরে নিয়ে আসি মা।'

রাহেলা বললেন, 'নিয়ে আয়।'

বাবার ঘর থেকে টেলিফোন করা বিরাট যন্ত্রণা। তিন মিনিটের বেশি কথা বললেই তিনি রেগে যান। পৃথিবীর কোনো স্বামী-স্ত্রী কি পারে তিন মিনিটে তাদের কথা শেষ করতে?'

রাহেলার দাঁত ব্যথা করছে। তিনি চাদর মুড়ি দিয়ে বিছানায় বসে আছেন। মীরু আবীরকে তাঁর পাশে বসিয়ে টেলিফোন আনতে গেছে। রাহেলা হাত বাড়িয়ে আবীরকে কোলে নিতে নিতে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। এই মাসে মীরুর এটা দ্বিতীয় দফায় লং ডিসটেন্স কল। এক একটা কলে হাজার বার শ করে বিল হয়। আজ এই মেয়ে কতক্ষণ কথা বলবে কে জানে! গত মাসে টেলিফোন বিল এসেছে ছ' হাজার টাকা। ছ' হাজার টাকা টেলিফোন বিল দেয়ার মতো অবস্থা সংসারে নেই। তা এই মেয়ে বুঝবে না। তাঁর মেয়ে এত বোকা কখনো ছিল না। বিয়ের পর বোকা হয়ে গেছে। মনে হয় আরো হবে। মানুষ নষ্ট হয় সঙ্গদোষে। মীরুর স্বামী মুখলেসুর রহমানই মেয়েটার বুদ্ধিশুদ্ধি গুলিয়ে দিচ্ছে।

মুখলেসুর রহমান স্বভাব-কৃপণ। চালিয়াত ধরনের ছেলে। এক বছরের মতো বাইরে আছে, একবারও টেলিফোন করে নি। ডলার নষ্ট হবে। স্ত্রীর হাতখরচের টাকাও আসছে না। চিঠি লিখেছে—কষ্ট-টষ্ট করে চালিয়ে নাও। ডলার জমাচ্ছি। পরে কাজে লাগবে। তোমার বাবার কাছ থেকে কিছু ধার নাও। আমি দেশে এসে শোধ করব।

আবীরের জন্মের সময়ও এই ব্যাপার। ক্লিনিকে বাচ্চা হল। নরম্যাল ডেলিভারি নয়, সিজারিয়ান। সতের হাজার টাকা বিল। সেই টাকা তাঁদেরকে দিতে হয়েছে। কারণ বড়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জামাই হাসিমুখে বলেছে — 'টাকাটা কি আপনারা দেবেন, না আমি দেব? আপনার মেয়ে বলছিল, আমি দিলে আপনারা মাইন্ড করবেন। এই জন্যে জিজ্ঞেস করছি।'

রাহেলা বললেন, 'আমিই দেব। তোমাকে ভাবতে হবে না।'

'ভাবছি না তো মা। মোটেও ভাবছি না। তবে এই সব পুরানো নিয়মকানুন বদলানো উচিত। বিয়ের পর মেয়ের যাবতীয় দায়দায়িত্ব স্বামীর। বাবা–মা'র এইসব নিয়ে ভাবা উচিত না।'

এক বছর ধরে স্ত্রী, পুত্র ফেলে সে নিউ জার্সিতে আছে। ইচ্ছা করলেই দুজনকে নিয়ে যেতে পারে। তা নেবে না। তাতে ডলার 'সেভ' হবে না।

মীরু বাবার ঘরে ঢুকল। বাবা চোখ বন্ধ করে ইজিচেয়ারে শুয়ে আছেন। ঘুমিয়ে পড়েছেন বলেই মনে হচ্ছে। মীরু ভয়ে ভয়ে টেলিফোনের প্ল্যাগ খুলল। জামিল সাহেব কড়া গলায় বললেন, 'টেলিফোন নিচ্ছিস কোথায়?'

মীরু ক্ষীণস্বরে বলল, 'মা জানি কোথায় টেলিফোন করবে।'

'সেটা আমার ঘর থেকে করতে পারে না? গোপনে করতে হবে? সব জিনিসের একটা নির্দিষ্ট জায়গা আছে। আলনা থাকবে আলনার জায়গায়। টেলিফোন থাকবে টেলিফোনের জায়গায়। টেলিফোন তো মানুষ না যে একেক সময় একেক জায়গায় ঘুরে বেড়াবে। যা তোর মাকে আসতে বল।'

'আচ্ছা।'

মীরু এসে কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, 'তুমি টেলিফোনটা এ ঘরে এনে দাও মা। বাবা আনতে দিচ্ছে না।'

রাহেলা টেলিফোন এনে দিলেন। মীরু তৎক্ষণাৎ নিউ জার্সিতে কল বুক করল।

রাহেলা লক্ষ করলেন মীরু টেলিফোন সেটের পাশে মূর্তির মতো বসে আছে। আগ্রহ এবং আনন্দে তার চেহারাই অন্য রকম হয়ে গেছে। রাহেলার খুব মায়া লাগছে। তাঁর কাছে টাকা থাকলে তিনি টিকিট কেটে মেয়েকে স্বামীর কাছে পাঠিয়ে দিতেন।

মীরু বলল, 'মা আজ কিন্তু একটু বেশিক্ষণ কথা বলব।'

'আচ্ছা।'

'তুমি আবীরকে নিয়ে একটু অন্য ঘরে যাও তো মা।'

রাহেলা আবীরকে নিয়ে উঠে গেলেন আর তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই টেলিফোন বাজল। না নিউ জার্সি থেকে কোনো কল না। মগবাজার থেকে বজলু নামের একটা লোক টেলিফোন করেছে। অরুকে চাচ্ছে।

মীরু বলল, 'ওকে তো এখন দেয়া যাবে না। আপনার যা বলার আমাকে বলুন।

'তাঁকেই দরকার। জরুরি একটা খবর দেব।'

'বললাম তো তাঁকে দেয়া যাবে না। সে ঘুমাচ্ছে। শরীর ভালো না। আপনি পরে টেলিফোন করুন। আমি এখন আমেরিকা থেকে একটা কল এক্সপেক্ট করছি।'

'আপনি কি দয়া করে উনাকে বলবেন যে মুহিব অ্যাকসিডেন্ট করেছে। অবস্থা খুব খারাপ। ঢাকা মেডিক্যালে ইনটেনসিভ কেয়ারে আছে।'

'মুহিবটা কে?'

'উনাকে বললেই চিনবেন।'

'আচ্ছা বলব। আপনি লাইনটা ছাড়ুন। আমিও খুব জরুরি একটা কল এক্সপেক্ট করছি।'

'আপনি কি দয়া করে খবরটা দেবেন। বলবেন, বজলু টেলিফোন করেছিল।'

'বলব।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বজলু নামের অপরিচিত এই মানুষটা টেলিফোন রাখার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নিউ জার্সির কল পাওয়া গেল। মীরু দশ মিনিট কথা বলল। এই দশ মিনিটে তিনবার কাঁদল। দুবার ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, 'বুঝতে পারছি তুমি আমাকে ভালবাস না।'

অরুকে যে খবরটা দেয়ার কথা মীরু সেই খবর দিল না। কারণ তার কিছুই মনে নেই। প্রবাসী স্বামীর সঙ্গে কথা বললে তার এরকম হয় — সবকিছু এলোমেলো হয়ে যায়। শরীর ঝন ঝন করতে থাকে। সেই রাতে একফোঁটা ঘুম আসে না। গলার কাছে কি যেন একটা দলা পাকিয়ে থাকে।

অরুর ঘুম ভাঙল সন্ধ্যাবেলা। ঘর অন্ধকার। জানালা দিয়ে শীতের হাওয়া আসছে। আকাশ মেঘে মেঘে কালো। শীতের সময় আকাশে মেঘ করলে কেন জানি খুব বিষণ্ন লাগে। অরু বিছানা থেকে নামল। বারান্দায় এসে দাঁড়াল। বারান্দায় খুব হাওয়া। গায়ে কাঁপন লাগছে।

মীরু বাটি ভর্তি দুধ নিয়ে রান্নাঘর থেকে আসছে। অরুকে দেখে কিশোরীর মতো পরিষ্কার গলায় বলল, 'তোর দুলাভাইয়ের সঙ্গে টেলিফোনে কথা হল। দশ মিনিট কথা বললাম।'

অরু হাই তুলতে তুলতে বলল, 'দুলাভাই টেলিফোন করলেন, না তুমি করলে?'

'আমি করলাম। আমেরিকা থেকে কল করা খুব খরচান্ত ব্যাপার। তাছাড়া লাইনও সহজে পাওয়া যায় না।'

'দুলাভাই শুধু লাইন পান না। আর সবাই পায়।'

'এইসব কী ধরনের কথা অরু?'

'ঠাট্টার কথা আপা। দুলাভাইয়ের সঙ্গে ঠাট্টা করব না ?'

'তোর কথা টেলিফোনে জিজ্ঞেস করছিল।'

'বল কী ? কী সৌভাগ্য!

'তোর বিয়ের তারিখ হয়েছে কিনা জানতে চাইল। আমি বললাম পৌষ মাসের মাঝামাঝি হবে।'

অরু হাসতে হাসতে বলল, 'দুলাভাই বড় বাঁচা বেঁচে গেলেন। যেহেতু বাইরে আছেন গিফট-টিফট কিছু দিতে হবে না। সুন্দর একটা কার্ড পাঠালেই হবে।'

মীরু কঠিন চোখে তাকিয়ে আছে। অরু বলল, 'তুমি রাগ করছ নাকি ? দুলাভাইয়ের সঙ্গে ঠাট্টা করব না ?'

'এই জাতীয় ঠাট্টা আমার ভালো লাগে না। তোদের জন্যে দুলাভাইয়ের যে দরদ তার শতাংশের এক অংশ দরদও তোদের নেই।'

'তাই নাকি ?'

'এক বছর ধরে বেচারা বাইরে পড়ে আছে। আমি ছাড়া একবার কেউ কি তার সঙ্গে কথা বলেছে? বাবার জন্মদিনে সে কার্ড পাঠিয়েছে। বেচারার জন্মদিন গেল। বাবা কি তাকে একটা কার্ড পাঠিয়েছেন, না এক লাইনের একটা চিঠি লিখেছেন?'

'বাবা জানতেন না কবে জন্মদিন।'

'কেন জানবে না? আমি বাবাকে গিয়ে বললাম, বাবা পঁচিশে অক্টোবর আবীরের বাবার জন্মদিন। বাবা বললেন, বুড়ো ধাড়ির আবার জন্মদিন কি? এইভাবে কেউ কথা বলে? বলা উচিত?'

'মোটেই বলা উচিত না।'

মীরুর চোখে পানি এসে গেল। অরু বলল, 'এইসব কথা বাদ দাও আপা। দুলাভাই কেমন আছে বল।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ভালো আছে। একটু ঠাণ্ডা লেগেছিল, এখন ভালো।'

'আপা শোন। খুব সিনসিয়ারলি একটা প্রশ্নের জবাব দাও তো। খুব সিনসিয়ারলি— তোমার সবচে' প্রিয় মানুষটি কে ?'

'তোর দুলাভাই, আবার কে ?'

'আচ্ছা আপা, পৃথিবীর সব মেয়েরাই কি তাদের স্বামীকে তোমার মতো ভালবাসে ?'

মীরু বিরক্ত হয়ে বলল, 'স্বামীকে ভালবাসবে না তো কি রাস্তার মানুষকে ভালবাসবে? মাঝে মাঝে তুই এমন পাগলের মতো কথা বলিস!'

অরু অস্পষ্ট স্বরে বলল, 'পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ যেমন আলাদা তাদের ভালবাসাও কি আলাদা ? এক জনের ভালবাসা নিশ্চয়ই অন্য এক জনের ভালবাসার মতো নয়।'

মীরু বলল, 'বিড়বিড় করে কী বলছিস ?'

অরু বলল, 'কিছু বলছি না।'

বলতে বলতেই সে লক্ষ করল তার কেমন যেন লাগছে। মুহিবের পাশে থাকার জন্যে এক ধরনের তীব্র ব্যাকুলতায় সে আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে। চিটাগাং মুহিব কোথায় উঠেছে এটা কি খোঁজ নিয়ে জানা যায় না? সে যদি রাতের ট্রেনে চিটাগাং চলে যায় ভোরবেলা মুহিবকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে বলে — 'তুমি কেমন আছ ?'..

মুহিব কী করবে? খানিকক্ষণ তোতলাবে। বেশি রকম চমকালে সে তোতলাতে শুরু করে। কুৎসিত লাগে। বয়স্ক এক জন মানুষ তো তো তো করছে... জঘন্য।

কেমন হয় চিটাগাং চলে গেলে ? ট্রেনে করে একা একা চলে যাওয়া খুব কি সাহসের কাজ? গোপনে বিয়ে করে এরচে' অনেক বেশি সাহস কি সে দেখায় নি ? আচ্ছা ধরা যাক, একা যাওয়া সম্ভব না। সে তো অনায়াসে বজলুকে বলতে পারে — ভাই, আপনি আমাকে চিটাগাং নিয়ে চলুন। আমার খুব যেতে ইচ্ছা করছে। উনি নিশ্চয়ই রাজি হবেন।

ময়নার মা এসে বলল, 'আফা, আম্মা আপনারে ডাকে।' অরু মা'র ঘরের দিকে রওনা হল।

রাহেলার দাঁত ব্যথা তীব্র হয়েছে। ওষুধপত্র এখনো কিছু খাচ্ছেন না। আবরার আসবে। তাকে জিজ্ঞেস করে খাবেন। অরু ঘরে ঢুকে বলল, 'মা ডেকেছ?'

'হুঁ।'

'দাঁত ব্যথা কি খুব বেশি?'

'হুঁ।'

'কী জন্যে ডেকেছ মা?'

'বাতি নিভিয়ে আমার পাশে বোস।'

অরু তাই করল। রাহেলা মেয়ের পিঠে হাত রেখে বললেন, 'তোর কি কোনো সমস্যা আছে মা?'

অরু বিস্মিত হয়ে বলল, 'এই কথা কেন বলছ?'

'কোনো কারণ নাই। হঠাৎ মনে হল। আছে কোনো সমস্যা?'

'না।'

'আজ কলেজ থেকে ফিরে শুনি তুই ঘুমাচ্ছিস। বলে দিয়েছিস তোর ঘুম যেন ভাঙানো না হয়। আমি ভাবলাম, অসুখ-বিসুখ হয়েছে। তোর কাছে খানিকক্ষণ বসলাম। দেখি, ঘুমের মধ্যে তুই খুব কাঁদছিস।'

'দুঃস্বপ্ন দেখছিলাম মা।'

'কী দুঃস্বপ্ন?'

'আমি একটা পাঞ্জাবিতে সুতার কাজ করছি। সুচ বার বার আমার আঙুলে ফুটে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাচ্ছে। রক্ত বেরুচ্ছে। সেই রক্তে পাঞ্জাবিটা মাখামাখি হয়ে গেল।'

'পাঞ্জাবিটা কার জন্যে বানাচ্ছিস?'

রাহেলা শান্ত দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে তাকিয়ে আছেন। অরু চোখ ফিরিয়ে নিল। রাহেলা বললেন, 'ঠিক করে বল তো দেখি মা — আবরার ছেলেটিকে কি তোর পছন্দ না?'

'উনি চমৎকার এক জন মানুষ।'

'অনেক সময় চমৎকার মানুষও মনে ধরে না। আমি লক্ষ করেছি বিয়ে ঠিক হয়ে যাবার পর থেকে তোর মধ্যে এক ধরনের অস্থিরতা। ঘুমের মধ্যে তোকে যে আজই কাঁদতে দেখলাম তা না — আগেও দেখেছি।'

অরু কিছু বলতে যাচ্ছিল ঠিক তখন মীরু এসে বলল, 'আবরার সাহেব এসেছেন। একগাদা খাবারদাবার নিয়ে এসেছেন।' রাহেলা বললেন 'ওকে এইখানেই নিয়ে আয়। তিনি অরুর চোখের দিকে তাকালেন। অরুর চোখ উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। তিনি আশ্বস্ত হলেন — যা আশঙ্কা করছিলেন তা নয়।

৭

সাদা রঙের পিক-আপ ধানক্ষেতে পড়ে আছে। ঢাকা-চিটাগাং হাইওয়েতে গাড়ির ভিড়। এরা কেউ থামছে না। বরং অ্যাকসিডেন্টের কাছাকাছি তাদের গাড়ির গতিবেগ বেড়ে যাচ্ছে। এখন গাড়ি থামানোই সমস্যা। আহত মানুষদের হাসপাতালে নিয়ে যাবার দায়িত্ব এসে পড়তে পারে। কেউ মারা গিয়ে থাকলে সমস্যা আরো বেশি। রাস্তা ব্লক হয়ে যাবে। দুঘন্টা তিন ঘণ্টার মতো গাড়ি চলবে না। মানুষজন জমবে, পুলিশ আসবে। গাড়ি ভাংচুরও হতে পারে। গাড়ির ভাংচুর হওয়া অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে, কিছু একটা হলেই গাড়ি ভাঙা হয়। কাজেই অ্যাকসিডেন্ট হলে হবে। বড় বোকামি হবে গাড়ি থামিয়ে কী হয়েছে খোঁজ নিতে যাওয়া। গাড়ি চালক বা যাত্রী কারো হাতে সময় নেই। ফেরি ধরতে হবে। ফেরির লম্বা লাইনে যেন পড়তে না হয়।

গ্রামের কিছু লোকজন পিক-আপ ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। ছোট বাচ্চা এবং মহিলাদের কান্না শোনা যাচ্ছে। উল্টে যাওয়া পিক-আপ থেকে প্রথম বের হয়ে এল লীনা। তার চোখে ভয়ের চেয়ে বিস্ময় বেশি। সে ডাকল, 'আব্বু ও আব্বু।'

লীনার বাবা বের হয়ে এলেন। বেরুল ড্রাইভার মহসিন। মহসিনের বাঁ হাত দিয়ে রক্ত পড়ছে। রক্তে শার্টের অনেকখানি ভিজে গেছে। তবে তার কাছে এই আঘাত খুব গুরুতর বলে মনে হচ্ছে না। হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকা মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল, 'দাঁড়ায়ে তামাশা দেখতেছেন? এদের গাড়ি থেকে বের করেন। আশপাশে ডাক্তারখানা কোথায় আছে ?'

গ্রামের মানুষগুলো কোনো জবাব দিল না। শুধু একজন বুড়ো বলল, 'কয়জনের মৃত্যু হয়েছে ?'

এতবড় অ্যাকসিডেন্ট সেই তুলনায় ক্ষতি অল্প—গুরুতর আঘাত পেয়েছে শুধুমাত্র মুহিব। একমাত্র তারই জ্ঞান নেই। মাথার পেছন দিকের খানিকটা অংশ থেতলে গেছে।

মহসিন বলল, 'ইনারে খুব তাড়াতাড়ি কোনো বড় হাসপাতালে নিতে হবে। আপনারা একটা ব্যবস্থা করেন। ঢাকার দিকে যে গাড়িগুলো যাচ্ছে তার একটারে থামান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুহিবের মাথা কোলে নিয়ে এক জন মহিলা বসে আছেন। ইনি লীনার মা। তাঁর আকাশী রঙের শাড়ি রক্তে মাখামাখি হয়ে গেছে। ভদ্রমহিলা একমনে দোয়া ইউনুস পাঠ করছেন—।

গ্রামের মানুষদের এই দৃশ্য দেখার দিকেই বেশি আগ্রহ। আহত মানুষটিকে ঢাকায় পাঠানোর ব্যাপারে তাদের তেমন উৎসাহ দেখা যাচ্ছে না। ঐ বুড়ো লোকটা লীনার মাকে বলল—"মানুষটা আফনের কে হয়?" লীনার মা বললেন, 'আপনারা কেউ একটু পানি আনবেন? উনারে পানি খাওয়াব।' পানি আনার ব্যাপারে সবার খুব উৎসাহ দেখা গেল। এক সঙ্গে চার পাঁচ জন ছুটে গেল।

লীনার বাবা ঢাকার দিকে যাচ্ছে এমন কোনো একটা গাড়ি থামাবার চেষ্টা করছেন। হাত তুলে চিৎকার করছেন কেউ থামছে না। তাঁকে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে। এই সময় ছোট্ট লীনা একটা অসীম সাহসী কাজ করল, সেও বাবার মতো দুহাত তুলে রাস্তার একটা অংশ আড়াল করে দাঁড়াল। ঢাকাগামী একটা চেয়ারকোচকে যে কারণে বাধ্য হয়ে থামতে হল।

৮

ডাক্তার সাহেব বললেন, 'এখানে শুধু শুধু দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই। আমাদের যা করার আমরা করছি। আপনি বাইরে অপেক্ষা করুন। হৈচৈ, কান্নাকাটিতে সমস্যা হয়।'

জেবা শান্ত স্বরে বলল, 'আমি তো কান্নাকাটি করছি না।'

'তবু বাইরে থাকুন। ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে আমরা রোগীর আত্মীয় স্বজন রাখি না। অবশ্যি মাঝে মাঝে এসে দেখে যাবেন। চব্বিশ ঘণ্টা ডাক্তার থাকবে, চিন্তার কিছু নেই।'

জেবা শেষবারের মতো তাকাল। মুহিব চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। তার পুরো মাথায় ব্যান্ডেজ। সেই ব্যান্ডেজ ভিজে উঠেছে রক্তে। চোখ বন্ধ, নাকের ভেতর নল ঢুকে গেছে। অক্সিজেন দেয়া হচ্ছে। মুখ খানিকটা হাঁ করা। দুটি হাতেই স্ট্রাইপ দিয়ে বিছানার সঙ্গে বাঁধা। মুহিবের বুক উঠা-নামা করছে। জীবনের চিহ্ন বলতে এইটুকুই। ঘরটা ছোট। ছোট ঘরের অনেকখানি দখল করে নিয়েছে যন্ত্রপাতি, অক্সিজেন সিলিন্ডার। ঘরময় মাথা ধরে যাবার মতো কড়া ফিনাইলের গন্ধ। ঘরের ছাদ অনেক উঁচুতে। ছাদ থেকে ইলেকট্রিকের তার ঝুলছে। দেখলেই কেন জানি মনে হয় ফাঁসির দড়ি। ঘরে আলোও কম। মৃত্যুর সময় এই ঘরের রোগীরা পৃথিবীর অসুন্দর একটি অংশ দেখে যাবে।

জেবার মনে হল, ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটগুলো খুব সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা উচিত। এই ঘরটা থাকবে আলো-বাতাসে ভরপুর। ফুলদানি ভর্তি থাকবে গোলাপের গুচ্ছ। বড় বড় জানালা থাকবে, যে জানালা দিয়ে আকাশের অনেকখানি দেখা যায়।

জেবা বারান্দায় চলে এলেন। বারান্দায় অনেকেই আছে। মুহিবের বন্ধুরা এক কোনায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। বজলুকে ছাড়া জেবা অন্য কাউকেই চেনে না। এরা কেউ তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছে না। দূরে দূরে আছে। এই ভালো। জেবার এখন সান্ত্বনার প্রয়োজন নেই। বজলুকে দেখা যাচ্ছে বাচ্চা ছেলেদের মতো মাটিতে বসে আছে। কিছুক্ষণ পরপর ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠছে। তার স্ত্রী একটা হাত রেখেছে স্বামীর পিঠে। সেও কাঁদছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শফিকুর রহমান সাহেব তাঁর মেয়ের হাত ধরে মুহিবের বন্ধুদের থেকে অনেকখানি দূরে দাঁড়িয়ে আছেন। অপরিচিত এক জন ডাক্তার পাশ দিয়ে যাবার সময় কি মনে করে যেন থমকে দাঁড়ালেন এবং বললেন, 'নাম কি তোমার খুকি?' সারা বলল, 'আমার নাম 'প্রিয়দর্শিনী'। শফিকুর রহমান মেয়ের দিকে তাকালেন। তাঁর ভুরু কুঁচকে গেল। 'প্রিয়দর্শিনী' নাম মুহিবের দেয়া। মেয়ের জন্মের পর পর মুহিব বলল, 'আপা, তোমার মেয়েটা তোমার মতো সুন্দর হয় নি তবু আমি ওর নাম দিলাম 'প্রিয়দর্শিনী'। জেবা বলল, 'তুই নাম দিতে গিয়ে ঝামেলা করিস না তো। তোর দুলাভাই নাম ঠিকঠাক করে রেখেছে। তুই নাম দিচ্ছিস শুনলে বিরক্ত হবে।'

মুহিব বলল, 'তোমাদের নামে তোমরা ডাকবে। আমি ডাকব প্রিয়দর্শিনী।' এই যে এই যে প্রিয়দর্শিনী, তাকান দেখি আমার দিকে। আমি আপনার মামা। দুবার মা ডাকলে মামা হয়। কাজেই মামা কোনো হেলাফেলা জিনিস না। দুজন মা সমান সমান এক মামা। এটা হচ্ছে এলজেব্রা। বড় হলে শিখিয়ে দেব। এখন দয়া করে একবার চোখ পিটপিট করুন যাতে আমি বুঝতে পারি, আপনি আমার কথা শুনেছেন। কী আশ্চর্য! আপা দেখ দেখ, চোখ পিটপিট করছে। প্রিয়দর্শিনী আমার কথা শুনেছে।'

শফিকুর রহমান মুহিবের এই নামে যতটুকু বিরক্ত হওয়া সম্ভব ততটুকু বিরক্ত হলেন। তাঁর সমস্ত কাজকর্ম হচ্ছে আনুষ্ঠানিক। কাজেই তিনি মুহিবকে তাঁর অফিসে ডেকে পাঠালেন। বরফশীতল গলায় বললেন, 'আমি আমার মেয়ের নাম রেখেছি 'সারা'। তুমি এই নামেই তাকে ডাকবে।'

'জ্বি আচ্ছা দুলাভাই।'

'দিনের মধ্যে তুমি লক্ষ বার প্রিয়দর্শিনী বলে ডাক যা আমাকে যথেষ্ট পরিমাণে বিরক্ত করে। বুঝতে পারছ ?'

'পারছি। আপনার সামনে আর ডাকব না।'

'আমার আড়ালেও এই নামে ডাকবে না।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'এটা বলার জন্যেই আমি তোমাকে খবর দিয়েছিলাম। এখন যাও। কফি খেয়ে যাও, কফি দিতে বলেছি।'

শফিকুর রহমান সাহেবের কঠিন শাসনে মুহিবের কিছু হল না। তাঁর অনুপস্থিতিতে সে এক লক্ষ বারের জায়গায় দুলক্ষ বার ডাকতে লাগল — প্রিয়দর্শিনী। প্রিয়দর্শিনী।

জেবাও এই নাম মাঝে মাঝে বলত, যেমন — এই মুহিব, শোন্, তোর প্রিয়দর্শিনী আজ কী করেছে, সারারাত আমাকে ঘুমাতে দেয় নি। আমার চোখের পাতা এক হতেই ওঁয়া ওঁয়া করে কান্না। আমি চোখ মেলতেই তার কান্না বন্ধ। মুখে হাসি। এইভাবে রাত জাগলে তো আমি মারা যাব। কবে তোর প্রিয়দর্শিনী বড় হবে?'

প্রিয়দর্শিনী বড় হয়েছে। এখন তার বয়স দশ। সে গোলাপি রঙের একটা স্কার্ট পরে বাবার হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটা শুধু যে বাবার মতো দেখতে তাই না। স্বভাবও বাবার মতো। খুবই গম্ভীর। প্রায় ঘণ্টা দুই-এর মতো সে দাঁড়িয়ে আছে। এই দুঘণ্টায় সে একটিমাত্র প্রশ্ন করেছে। সেই প্রশ্নের সঙ্গে হাসপাতালের বা বর্তমান পরিস্থিতির কোনো সম্পর্ক নেই। সে জানতে চেয়েছে — ক্রিসেনথিমামের বানান কী ?

শফিকুর রহমান বিস্মিত হয়ে ফুলের বানান বলছেন এবং জানতে চেয়েছেন — 'হঠাৎ এই বানানটা কেন মা ?'

সারা বাবার প্রশ্নের উত্তর দেয় নি।

ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট থেকে বের হয়ে জেবা তার কন্যাকে বলল, 'আমরা এখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাসায় চলে যাব। তুমি থাকবে তোমার বাবার সঙ্গে। আমি আবার ফিরে আসব। তোমার মামার অবস্থা ভালো না। তুমি কি বাসায় যাবার আগে তোমার মামাকে একবার দেখতে চাও ?'

সারা বলল, 'না।'

জেবা শান্ত গলায় বলল, 'যে মানুষটা তোমাকে এত আদর করত একবার তুমি তার গায়ে হাত বুলিয়ে দেবে না?'

'না।'

'আচ্ছা চল।'

মুহিবের বন্ধুরা জেবার দিকে তাকিয়ে আছে। ওদের সান্ত্বনা দেবার মতো কোনো কথা জেবার নেই। তাছাড়া তারা সান্ত্বনা পেতেও চাচ্ছে না। দুঃখই পেতে চাচ্ছে। জেবা বজলুর কাছে গিয়ে বলল, 'এখন তো আমাদের আর কিছু করার নেই। বাসায় চলে যাও, বিশ্রাম কর।'

বজলু বলল, 'আমি এখানেই আছি। আমরা সবাই থাকব।'

জেবা খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বলল, 'ঐ মেয়েটিকে কি খবর দিয়েছ, 'অরু' ?

'তাঁর সঙ্গে কথা হয় নি। কিন্তু বাসায় খবর দিয়েছি।'

'ও আচ্ছা। আমি চলে যাচ্ছি। সারাকে খাইয়ে আবার এসে পড়ব।'

'আপনি খুব ক্লান্ত হয়ে আছেন। আমরা তো আছি। এক সেকেন্ডের জন্য এখান থেকে নড়ব না।'

জেবা এগিয়ে যাচ্ছে। কারো কথাই সে পরিষ্কার শুনছে না, বুঝতেও পারছে না। চিৎকার করে কাঁদা দরকার। কাঁদতে পারছে না। কান্না আসছে না।

শফিকুর রহমান গাড়িতে স্টার্ট দিতে দিতে বললেন, 'তোমার রেস্ট দরকার। যা ইনএভিটেবল তার জন্যে মানসিকভাবে তৈরি হবার প্রয়োজনেই রেস্ট দরকার। বাসায় গিয়ে একটা হট শাওয়ার নাও। সামান্য কিছু হলেও মুখে দাও। তারপর দুটা সিডাকসিন খেয়ে ঘণ্টা দুএকের জন্যে রেস্ট নাও।'

জেবা কিছু বলল না। সিটে হেলান দিয়ে ক্লান্ত ভঙ্গিতে বসে রইল। পেট্রোলের গন্ধে তার শরীর গুলাচ্ছে। ভয়ংকর খারাপ লাগছে।

শফিকুর রহমান বললেন, 'এরকম করছ কেন ? খারাপ লাগছে ?'

জেবা বলল, 'না খারাপ লাগছে না।'

'তুমি খুব শক্ত ভঙ্গিতে সিচুয়েশন হ্যান্ডল করছ। আমি ইমপ্রেসড। আমি ভেবেছিলাম, ভেঙে পড়বে, হৈচৈ, কান্নাকাটি...।'

জেবা বলল, 'হৈচৈ কি কখনো করেছি?'

শফিকুর রহমান চুপ করে গেলেন। জেবা যে স্বরে কথা বলল সেই স্বর তাঁর কানে অন্যরকম শুনাল। যেন সে কথা বলছে পর্দার আড়াল থেকে।

জেবা বাড়ি পৌঁছেই সারাকে গরম পানিতে গোসল করাল। অনেকক্ষণ হাসপাতালে কাটানো হয়েছে — পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া দরকার। কাজের মেয়েকে খাবার টেবিল সাজাতে বলে সে স্টাডি রুমে ঢুকল। তেমন কোনো কাজকর্ম না থাকলে শফিকুর রহমান এই রুমে ইজিচেয়ারে শুয়ে বিশ্রাম করেন। জেবা বলল, 'তোমার গোসল হয়েছে?'

শফিকুর রহমান বললেন, 'হ্যাঁ।'

'মেয়েকে নিয়ে খেতে বসে যাও। রাত নটার মতো বাজে। সারার ক্ষিধে পেয়েছে। বিকেলে নাশতা করে নি।'

'তুমি খাবে না?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমার দেরি হবে।'

'দেরি হবে কেন? আমাদের যেমন ক্ষিধে পেয়েছে তোমারও নিশ্চয়ই পেয়েছে।'

জেবা শফিকুর রহমানের সামনের চেয়ারে বসতে বসতে বলল, 'তোমার যেমন ক্ষিধে পেয়েছে আমার তেমন পায় নি। আমার ভাই মারা যাচ্ছে। কে জানে হয়তো ইতিমধ্যে মারাও গেছে।'

শফিক সাহেব নিজেকে সামলে নিলেন। এইভাবে তিনি চিন্তা করেন নি। তিনি নরম গলায় বললেন, 'তুমি বিরাট ক্রাইসিসের ভেতর দিয়ে যাচ্ছ তা তো বটেই। ক্রাইসিস ফেস করতে হবে। তার জন্যে শারীরিক শক্তি দরকার। হাসপাতালে যাবে, রাত জাগবে — এই জন্যেই বলছিলাম। এস খেতে এস।'

'চল।'

জেবা শান্ত ভঙ্গিতে খাওয়া শেষ করল। শফিক সাহেব চাপিলা মাছের ঝাল তরকারির বেশ প্রশংসা করলেন। খাবার শেষে আর সব দিনের মতো তাঁকে দুধ-চিনি ছাড়া চা দেয়া হল।

চায়ের কাপ নিয়ে তিনি স্টাডি রুমে চলে গেলেন। ন্যাশনাল জিওগ্রাফিতে তুন্দ্রা অঞ্চলে বরফের ঘর নিয়ে মজার একটা প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে। চা খাবার জন্যে জেবার তৈরি হতে সময় লাগবে। সারাকে ঘুম পাড়াতে হবে। আজ যে ধকল গিয়েছে জেবা চট করে ঘুমাবে বলেও মনে হয় না।

শফিক সাহেব ঠিক করলেন তিনি নিজেই জেবাকে হাসপাতালে পৌঁছে দেবেন। খানিকক্ষণ থাকবেন, খোঁজখবর নেবেন। ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলবেন। যে দুজনের সঙ্গে কথা হয়েছে তাঁরা রাতের মধ্যে কিছু ঘটে যাবে তা ভাবছেন না। পরিস্থিতি খারাপ হলে তিনি সারারাতই থাকবেন। জেবা খুশি হবে। সে এতটা নিশ্চয়ই আশা করছে না। দুর্ঘটনার সংবাদ পাওয়ার পর থেকে তিনি যা করেছেন তাতে জেবার খুশি হওয়া উচিত। খবর পাওয়ামাত্র হাসপাতালে ছুটে এসেছেন। ওষুধপত্র, রক্ত সব ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাঁর ছেলেবেলার বন্ধু ডাঃ রহমতুল্লাহকে নিয়ে এসেছেন। জেবার সামনে ডাঃ রহমতুল্লাহকে বলেছেন প্রয়োজনে তিনি মুহিবকে ব্যাংকক পাঠাতে প্রস্তুত আছেন। তাঁর দিক থেকে আন্তরিকতার কোনো অভাব তিনি নিজে বোধ করছেন না। অবশ্যি তাঁর মধ্যে এক ধরনের ফরম্যাল ভাব আছে। দুঃখে কাতর হবার ভঙ্গি করা তাঁর পক্ষে সম্ভব না। এই জিনিস তাঁর চরিত্রে নেই। অভিনয় তাঁর আসে না। অবশ্যি তিনি দুঃখিত হয়েছেন। মর্মান্তিক ব্যাপার তো বটেই...

চা শেষ করে শফিক সাহেব কাপড় পরে তৈরি হলেন। তাঁর ঠাণ্ডার ধাত। প্রচুর শীত পড়েছে। মাফলার দিয়ে গলা ঢেকে যাওয়া উচিত, কিন্তু এই গ্রাম্য পোশাকটি তাঁর খুব অপছন্দের। তিনি জেবাকে বললেন মাফলার বের করে দিতে।

জেবা মাফলার হাতে স্টাডি রুমে ঢুকে বলল, 'তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

'তোমার সঙ্গে যাচ্ছি। খোঁজ নিয়ে আসি।'

'কেন?'

শফিক সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, 'কেন মানে?'

'অপ্রয়োজনের কোনো কাজ তো কর না। এই কাজটা তোমার জন্যে অপ্রয়োজনীয়। কেন করতে চাচ্ছ? আমাকে খুশি করবার জন্যে?'

শফিক সাহেব অবাক হয়ে বললেন, 'মনে হচ্ছে তুমি ঝগড়ার একটা ইস্যু তৈরির চেষ্টা করছ?'

'না ঝগড়ার কোনো ইস্যু আমি তৈরি করছি না। কখনোই তো তোমার সঙ্গে ঝগড়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করি নি।'

শফিক সাহেব শীতল গলায় বললেন, 'সমস্ত দিনের উত্তেজনায় তোমার সিস্টেমে খানিকটা উলটপালট হয়েছে। নয়তো এই অবস্থায় ঝগড়াটে মেয়ের মতো কথা বলতে না। আমার উপদেশ শোন, চল যাই খোঁজ নিয়ে আসি। তুমি যদি চাও না হয় রাতে আমি তোমার সঙ্গে থেকে যাব। মুহিবের জন্য যে ঘর নেয়া হয়েছে ঐ ঘর তো খালিই আছে—আমি সেখানে বিশ্রাম নিতে পারি। আমার শরীর ভালো না। বিশ্রাম দরকার।'

'তুমি তোমার নিজের ঘরেই বিশ্রাম নাও। আমাকে খুশি করবার জন্যে তোমাকে কিছুই করতে হবে না।'

'তোমাকে খুশি করবার জন্যে আমি কিছু করছি না। আমি যা করছি দায়িত্ববোধ থেকে করছি।'

জেবা কঠিন গলায় বলল, 'দায়িত্ববোধ? কীসের দায়িত্ববোধ ?'

'তুমি দেখি সত্যি সত্যি ঝগড়া শুরু করেছ। স্টপ ইট।'

জেবা বলল, 'চেঁচিও না। এবং চোখ রাঙিও না। উনিশ বছর ধরে তোমার চোখ রাঙানি দেখছি। আর দেখব না।'

'আর দেখব না মানে ? কী বলতে চাচ্ছ তুমি ?'

'বোস, চেয়ারে শান্ত হয়ে বোস। আমি কী বলতে চাচ্ছি তোমাকে বুঝিয়ে বলছি। কারণ আমার ধারণা তোমার বুদ্ধিবৃত্তি খুব উঁচু পর্যায়ের না। উঁচু পর্যায়ের হলে বিয়ের প্রথম বছরেই বুঝতে পারতে মানুষ নর্দমার কৃমিকে যেমন ঘৃণা করে তোমাকেও আমি ঠিক সেই পরিমাণ ঘৃণা করি।'

শফিকুর রহমান হতভম্ব হয়ে গেলেন। জেবার আচার–আচরণ হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীর মতো। এ যুক্তি শুনবে না। যুক্তি শোনার মতো মানসিক অবস্থা তার নেই। শফিকুর রহমান নিজেকে সংযত করে বললেন, 'শোন জেবা, তুমি দয়া করে দশ মিলিগ্রাম সিডাকসিন খেয়ে নিজেকে শান্ত কর। আমি বুঝতে পারছি ভয়াবহ বিপর্যয়ের সামনে এসে তুমি নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছ। এটা অস্বাভাবিক না। স্বাভাবিক।'

'আমি নিজের উপর কোনো নিয়ন্ত্রণ হারাই নি। তবে তুমি নিয়ন্ত্রণ হারাবে। এখন যেসব কথা আমি তোমাকে বলব তা শোনেই নিয়ন্ত্রণ হারাবে। চিৎকার, চেঁচামেচি তুমি কিছুই করবে না। কারণ তুমি নিতান্তই ভদ্রলোক। তবে আমার কথাবার্তা শুনে তোমার ছোটখাটো স্ট্রোক হয়ে যেতে পারে। তুমি বরং বিশ মিলিগ্রাম সিডাকসিন খেয়ে আমার সামনে বোস। প্রেসারের ওষুধটাও খাও, প্রেসারও বেড়ে যেতে পারে। তার চেয়েও বড় কথা, দামি স্যুটটা গা থেকে খোল। আমার কথাবার্তা শেষ হবার পর আমি তোমার গায়ে থুতু ফেলব। স্যুট নষ্ট হবে।'

শফিকুর রহমান বিচলিত বোধ করলেন। জেবার চোখ লাল। চোয়াল শক্ত হয়ে আছে। চুলগুলো ও কি আজ অন্য রকম করে বেঁধেছে? এতদিনের চেনা মানুষ তো এ নয়। এ অন্য কেউ। অন্য কোনো জেবা। তিনি সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন অনেকদিন। আগে কখনো সিগারেটের তৃষ্ণা বোধ করেন নি। আজ করছেন।

জেবা শাড়ির আঁচল গায়ে তুলে দিল। চেয়ারের হাতল থেকে হাত তুলে নিয়ে কোলের উপর রাখল। সে তাকিয়ে আছে শফিকের দিকে। তার দৃষ্টি তীব্র, চোখের মণি ছোট হয়ে আছে। উজ্জ্বল আলোর দিকে মানুষ যেমন ভুরু কুঁচকে তাকায় তেমনি করে সে তাকিয়ে আছে। জেবা বলল, 'আমার পরম দুর্ভাগ্য যে আমি রূপবতী হয়ে জন্মেছিলাম। এমন রূপবতী যে স্কুলে পড়ার সময়ই আমার নামডাক ছড়িয়ে গেল। তোমরা কৌতূহলী হয়ে আমাকে দেখতে এলে। আমাকে দেখে দ্বিধার মধ্যে পড়ে গেলে। এমন সুন্দর একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেয়েকে হাতছাড়া করতে ইচ্ছে করে না। আবার বাপ-মা মরা হাভাতে ঘরের একটা মেয়েকে গ্রহণ করতেও ইচ্ছা করে না। মহা সমস্যা। মনে আছে?'

'এখন এই প্রলাপের মানে কি?'

'মানে আছে। প্রলাপগুলো মন দিয়ে শোন — তোমরা সুন্দরী মেয়ের লোভ সামলাতে পারলে না। আমাকে বউ হিসেবে ঘরে নেয়া সাব্যস্ত করলে। বড় মামার বাড়িতে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। আমার সোজা সরল মামার ধারণা হল — আমার বাবা-মা'র পরম পুণ্যে এমন একটা বিয়ের সম্বন্ধ হল। আমি মুহিবকে নিয়ে তোমার প্রকাণ্ড বাড়িতে চলে এলাম। এটি তোমার পছন্দ হল না। মুহিবকে মামার বাড়িতে রেখে আসা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। ওর বয়স মাত্র পাঁচ। ওকে বড় করেছি আমি। আমাকে না দেখে সে বেশিক্ষণ থাকতে পারত না। বিকেলে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে যখন খেলতে যেত কিছুক্ষণ পর পর সে ছুটে এসে দেখে যেত আমি বাসায় আছি কিনা। এই পাঁচ বছর বয়সের বাচ্চা ছেলের উপর তুমি কী রকম মানসিক চাপ দিয়েছিলে তোমার মনে আছে?'

শফিক কঠিন গলায় বলল, 'তুমি সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছ।' জেবা বলল, 'গত উনিশ বছর তুমি একা সীমা অতিক্রম করেছ। আজ আমি করব। — মনে আছে কীভাবে তুমি বাচ্চা একটা ছেলেকে শাস্তি দিতে? তোমাদের বিরাট বাড়ি। তাকে একা একটা ঘরে থাকতে দিলে। সে ভয়ে অস্থির। আমি বললাম, কাজের একটা মানুষ তার ঘরে শুয়ে থাক। তুমি বললে, কাজের মানুষদের দোতলায় ওঠার নিয়ম নেই। প্রথম রাতে মুহিব ভয় পেয়ে আমাদের শোবার ঘরের দরজার সামনে এসে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। তুমি তাকে তার ঘরে নিয়ে গিয়ে বাইরে থেকে তালা দিয়ে দিলে। মনে আছে ?'

'হ্যাঁ, মনে আছে। আমি সেটাকে বড় অপরাধ বলে মনে করি নি। আমাদের এই বাড়ি ভূতের বাড়ি নয়। ভয় কাটানোর জন্যে সামান্য শাসন অন্যায় না।'

'এটাকে তুমি সামান্য শাসন বলছ ? রাতের পর রাত তাকে তালাবন্ধ করে রাখা সামান্য শাসন ?'

'তোমার কথা শেষ হয়েছে, না আরো আছে ?'

'এত চট করে আমার কথা শেষ হবার না। আমাকে মুহিবের কাছে যেতে হবে। কাজেই অল্পতেই শেষ করব। আমার যে দরিদ্র বড় মামার কাছ থেকে তুমি আমাকে তুলে এনেছিলে সেই বেচারা কোনো দোষ করে নি। কিন্তু কী অপমান তুমি তাকে করেছ, তা কি মনে আছে ?'

'না মনে নেই। আমার স্মৃতিশক্তি তোমার মতো প্রখর না।'

'তাহলে মনে করিয়ে দেই। ছেলেমেয়েদের নিয়ে খুব আগ্রহ করে মামা একদিন আমাকে দেখতে এলেন। তুমি এমন ভঙ্গি করলে যে — এ কী যন্ত্রণা! মামা সোজা মানুষ তোমার এই ভঙ্গি ধরতে পারলেন না। মহানন্দে তিনি বাড়িঘর দেখতে লাগলেন। আনন্দে এবং বিস্ময়ে তিনি অভিভূত। বার বার বলছেন — আমার জেবা মা'র রাজকপাল। আমি জানি আমার কী কপাল। তবু মামার আনন্দ দেখে আমারও আনন্দ হল। তাঁরা যখন চলে গেলেন তুমি আমাকে এসে বললে, আমার রোলেক্স ঘড়িটা পাচ্ছি না। ড্রেসিং টেবিলের উপর ছিল। তুমি শুনলে আহত হতে পার। তবু বলছি, আমি নিশ্চিত তোমাদের বাড়ির কেউ কাণ্ডটা করেছে। আমি খোঁজ নেবার জন্যে লোক পাঠাচ্ছি। মানুষ হিসেবে তোমার প্রতি আমার উঁচু ধারণা কখনোই ছিল না। তবুও এ ধরনের চিন্তা তুমি করতে পার, তা ভাবি নি। আমি পাথর হয়ে গেলাম। একবার ভাবলাম তোমার পা জড়িয়ে ধরে বলি — এটা কোরো না। এই দয়াটা তুমি আমার প্রতি কর। শেষ পর্যন্ত তাও করা হল না। পা জড়িয়ে ধরতে ঘৃণাবোধ হল। তুমি চিঠি দিয়ে মামার কাছে লোক পাঠালে। মামা ছুটে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এলেন এবং ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে লাগলেন। মনে আছে ?'

'ঘড়ি বিষয়ে খোঁজ নেয়া কি খুব অযৌক্তিক ছিল ? অলগোল্ড রোলেক্স ঘড়ি, পঞ্চাশ হাজার টাকা দাম। তার চেয়ে বড় কথা এটা আমার দাদার দেয়া গিফট্, স্মৃতিচিহ্ন। আমি খোঁজ করব না ? এতগুলো মানুষ ঐদিন এ বাড়িতে এসেছে। দরিদ্র মানুষ। অভাবের তাড়নায় দরিদ্র মানুষের স্বভাব নষ্ট হয়। তাদের পক্ষে ঘড়ি নিয়ে যাওয়াটা কি খুব অস্বাভাবিক ? আমি তো মনে করি, আমি ঐদিন যা করেছিলাম ঠিকই করেছিলাম। অযৌক্তিক কিছু করি নি।'

'তোমার সব কাজই যৌক্তিক। চমৎকার এক জন যুক্তিবাদী মানুষ তুমি। উনিশ বছর ধরে তোমার যুক্তি শুনছি আর মুগ্ধ হচ্ছি। আর ইচ্ছা করছে না। এই যে আমি হাসপাতালে যাচ্ছি। এ বাড়ি থেকে এটাই আমার বের হয়ে যাওয়া। আমি আর ফিরে আসব না।'

'কী বললে ?'

'যা বলেছি তুমি ভালোমতোই শুনেছ। তারপরেও যদি শুনতে চাও আবার বলতে পারি। শুনতে চাও ?'

'তোমার মেয়ে ?'

'এই মেয়ে আমি তোমাকে দিয়ে গেলাম। তুমি তোমার মতোই ওকে মানুষ কর। এর জন্ম আমাদের দুজনের ভালবাসায় হয় নি। এর প্রতি আমার কোনো আকর্ষণ নেই।'

'তুমি যেসব কথা বললে, তার জন্যে তোমার অনুতাপের কোনো সীমা থাকবে না।'

'না থাকলে কী আর করা! অনুতাপ করব। তবে তোমার কাছ থেকে অনেক দূরে থেকে করব। তোমার মুখ দেখতে হচ্ছে না এই আনন্দ অনুতাপের চেয়ে লক্ষগুণ বেশি হবে। এই কথাটি সত্যি।'

জেবা চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে বলল, 'তুমি হয়তো জান না, বুধবারে মুহিব গোপনে একটি মেয়েকে বিয়ে করেছে। বিয়েটা তাকে গোপনে করতে হয়েছে। আমাকেও সে জানায় নি কারণ তুমি। তার জীবনের চরম আনন্দের ঘটনায় আমি পাশে ছিলাম না। তার কারণও হচ্ছ তুমি। বেচারা ভয়ে আমাকে পর্যন্ত বলতে পারে নি। আমাকে বললে যদি তুমি শুনে ফেল। তোমার কাছ থেকে শেষ একটা সুবিধা নেই। তুমি কি তোমার ড্রাইভারকে বলে দেবে যেন আমাকে হাসপাতালে নামিয়ে দিয়ে আসে ? আমি বললে তো হবে না। ড্রাইভারকে তুমি বলে রেখেছ গাড়ি বের করতে হলে সব সময় তোমাকে জিজ্ঞেস করে বের করতে হবে। ঠিক না ?'

শফিকুর রহমান উঠে দাঁড়ালেন। জেবা বলল, 'সব মন্দ দিকেরও একটা ভালো দিক থাকে। মুহিবের জীবন সংশয় না হলে আজ যেভাবে ঘর থেকে বের হয়ে যেতে পারছি তা পারতাম না। সারা জীবন থাকতে হত তোমার সঙ্গে।'

জেবা থু করে কার্পেটে থুতু ফেলল।

'তুমি অসম্ভব উত্তেজিত। উত্তেজিত অবস্থায় তুমি কী বলছ নিজেও জান না।'

'আমি কী বলছি আমি খুব ভালো জানি। এখন তোমাকে যা বললাম তার প্রতিটি শব্দ আমি মনে মনে লক্ষবার করে বলেছি।'

'আমার সম্পর্কে বলা যায় এমন ভালো কিছু কি নেই ?'

'আছে, একটা আছে। বিয়ের পর তুমি আমাকে পড়াশোনা করিয়েছ। ইংরেজি সাহিত্যে আমি এমএ পাস করেছি, তোমার জন্যেই করেছি। সংসারে ছেলেমেয়ে এলে পড়াশোনায় ক্ষতি হবে, কাজেই আমাদের মেয়ে সারার জন্ম হল বিয়ের নবছর পর। খুব সাবধানে এইসব বিষয়ও তুমি লক্ষ করেছ। ওস্তাদ রেখে গান শিখিয়েছ। গায়িকা হিসেবে আমি মোটামুটি ধরনের। সেই মোটামুটি ধরনের গায়িকাকে আজ যে লোকে চেনে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসাহী বালিকারা যে অটোগ্রাফ চায় তার কারণ তুমি বিস্তর ধরাধরি করে আমাকে রেডিও, টিভিতে সুযোগ করে দিয়েছ। এটা অবশ্যই তোমার ভালো দিক। এই ভালো দিকেও কিন্তু ফাঁকি আছে। তুমি যা করেছ তা আমার জন্যে কর নি, তোমার নিজের জন্যে করেছ। লোকে বলবে তোমার স্ত্রী এমএ পাস, লোকে বলবে তোমার স্ত্রী বিখ্যাত গায়িকা.... ভুল বললাম ?'

শফিকুর রহমান জবাব দিলেন না। জেবার ঠোঁট হাসির ভঙ্গিমায় একটু উল্টে গেল। সে তার গলার স্বর খানিকটা নামিয়ে বলল, 'তুমি কি তোমার বিখ্যাত গায়িকা স্ত্রীর গান কখনো শুনতে চেয়েছ ? বর্ষার রাতে কখনো কি তার ঘুম ভাঙিয়ে তাকে বলেছ — "আজি ঝর ঝর মুখর বাদল দিনে" এই গানটা একটু গাও তো শুনি ?'

'সবার সব বিষয়ে উৎসাহ থাকে না।'

'ঠিক বলেছ। সবার সব বিষয়ে উৎসাহ থাকে না। তোমার একটি বিষয়েই উৎসাহ — স্ত্রীকে নগ্ন করে তার দিকে তাকিয়ে থাকা।'

'স্টপ ইট।'

'চেঁচিও না। চেঁচিয়ে কিছু হবে না।'

জেবা আবার কার্পেটে থুতু ফেলল। পাশের ঘরে সারা কাঁদছে। সে হয়তো বাবা-মা'র চিৎকার বা হৈচৈ শুনেছে। কিংবা কোনো কারণে তার কাঁচা ঘুম ভেঙে গেছে। দশ বছর বয়স হলেও এই মেয়ে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে খানিকক্ষণ কাঁদে। অন্য সময় হলে জেবা ছুটে যেত। আজ গেল না। কালো হ্যান্ডব্যাগ হাতে নিতে নিতে বলল, 'মেয়ের কাছে যাও। আমি বিদায় হচ্ছি। গাড়ি নেব না। এমন কিছু রাত হয় নি। আমি একটা রিকশা নিয়ে চলে যাব।'

AMARBOI.COM

অনেকক্ষণ দরজা নক করার পর সারা দরজা খুলল। শফিক সাহেব বললেন, 'কাঁদছ কেন মা?'

সারা চোখ মুছতে মুছতে বলল, 'মামার জন্য খুব খারাপ লাগছে।'

'খারাপ লাগাই তো স্বাভাবিক। কাঁদলে কি খারাপ লাগা দূর হবে?'

'কান্না এলে আমি কী করব?'

'নিজেকে সামলাতে হবে। যাও, বাথরুমে যাও, হাত-মুখ ধুয়ে আস।'

'বাবা, আমি মামার কাছে যেতে চাই।'

'কী হবে সেখানে গিয়ে? তুমি তো ডাক্তার না। তুমি কোনোভাবেই তাকে সাহায্য করতে পারবে না।'

'সাহায্য করার জন্য তো আমি যেতে চাচ্ছি না।'

'তাহলে কী জন্যে যেতে চাও?'

'আমি মামার বন্ধুদের মতো ক্লিনিকের বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকব। আমার যদি কাঁদতে ইচ্ছে করে, আমি কাঁদব। মামার যে বন্ধুটা চিৎকার করে কাঁদছিল আমি সে রকম চিৎকার করে কাঁদব।'

'সারা, মা তুমি বোকা মেয়ের মতো কথা বলছ।'

'আমাকে সারা ডাকবে না বাবা। এই নাম আমার ভালো লাগে না। আমাকে প্রিয়দর্শিনী ডাকবে।'

'কে তোমাকে এসব বলতে শিখিয়েছে? তোমার মা?'

'যা শেখার আমি নিজে নিজে শিখি। কারো কাছ থেকে আমি কিছু শিখি না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনোদিন শফিকুর রহমান যা করেন না আজ তাই করলেন। মেয়ের গালে চড় বসিয়ে দিলেন। প্রিয়দর্শিনী কার্পেটে ছিটকে পড়ল তবে কেঁদে উঠল না। অদ্ভুত ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইল বাবার দিকে।

৯

মুহিবের সব বন্ধুরাই এখনো আছে। চার জন ছিল, তার সঙ্গে আরো দুজন যুক্ত হয়েছে। এদের মধ্যে এক জনের নাম তোফাজ্জল। সে হাসপাতালের ডাক্তারদের বড় বিরক্ত করছে। দশ মিনিট পর পর হাত কচলাতে কচলাতে জিজ্ঞেস করছে, 'স্যার অবস্থা কী রকম দেখছেন ? ইমপ্রুভমেন্ট বোঝা যায় ? ব্লাড লাগবে কিনা একটু কাইন্ডলি বলবেন ? আমার আর মুহিবের সেম ব্লাড গ্রুপ — বি পজিটিভ।'

শুরুতে ডাক্তাররা তার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলেন। এখন দিচ্ছেন না। তাকে দেখামাত্র বিরক্ত হচ্ছেন। তোফাজ্জল এইসব বিরক্তি গায়ে মাখছে না। সে যে শুধু ডাক্তারদের বিরক্ত করছে তাই না, নার্সদেরও বিরক্ত করছে। বিশেষ করে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটের নার্সদের। দরজায় টোকা দিয়ে বলছে — সিস্টার, একটু বাইরে আসবেন ? জাস্ট ফর এ সেকেন্ড। রোগীর অবস্থাটা একটু বলবেন ? খুব টেনশান ফিল করছি। অবস্থা স্টেবল কিনা বলুন। ব্লাড লাগলে জানিয়ে দিলেই হবে। আমারও বি পজিটিভ। আপা কী মনে করেন, অবস্থাটা এখন ভালোর দিকে না ?

মুহিবের অবস্থা ভালোর দিকে নয়। জ্ঞান এখনো আসে নি। সে আছে কোমার ভেতর। হার্টবিট নেমে গেছে। মাঝে মাঝে দুএকটা বিট মিস করা শুরু করেছে। পায়ের পাতা হয়েছে হালকা নীল। যার মানে ফুসফুস রক্ত তেমনভাবে পরিষ্কার করতে পারছে না। রক্তে অক্সিজেনের ঘাটতি দেখা যাচ্ছে। বাইরে থেকে অক্সিজেন দিয়েও সেই ঘাটতি পূরণ হচ্ছে না। রিফ্লেক্স অ্যাকশান সর্বনিম্ন পর্যায়ে। চোখের মণিতে কড়া আলো ফেলার পরও মণি তেমনভাবে সংকুচিত হচ্ছে না।

রাত দশটায় রেসিডেন্ট ফিজিসিয়ান তোফাজ্জলকে তাঁর ঘরে ডেকে নিয়ে গেলেন। শুকনো গলায় বললেন, 'রোগীর অবস্থা ভালো না।'

তোফাজ্জল ক্ষীণ স্বরে বলল, 'একটু আগে এক জন সিস্টার বললেন অবস্থা স্টেবল।'

'এখনো স্টেবল। স্টেবল মানেই ভালো তা তো না। অবস্থা খারাপ হওয়া শুরু করেছে।'

'ও।'

'আমাদের তেমন কিছু করণীয় নেই।'

'স্যার, পিজিতে কি ট্রান্সফার করব?'

'তাতে কোনো উনিশ-বিশ হবে বলে মনে হয় না। পিজিতে যেসব ফেসিলিটি আছে আমাদেরও আছে। আমরা চেষ্টার ত্রুটি করছি না। একমাত্র অপেক্ষা করা ছাড়া এখন আর কিছু করার নেই। অপেক্ষা করুন এবং প্রার্থনা করুন।'

'ব্লাড কী লাগবে স্যার ?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'একটু পর পর ব্লাডের কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন ? লাগলে আপনাদের জানাতাম। রোগী আপনার কী হয়?"

'ভেরি ক্লোজ ফ্রেন্ড স্যার।'

বলতে বলতে তোফাজ্জল কেঁদে ফেলল। মুহিব তার বিয়ের সময় তাকে খবর দেয় নি। এই দুঃখেও সে একবার কেঁদেছে। এখন কাঁদছে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম দুঃখে। বছর তিনেক আগে তোফাজ্জলের আলসার অপারেশন হল। দুব্যাগ রক্ত লেগেছিল। সেই দুব্যাগ রক্ত মুহিব দিয়েছে। রক্তের ঋণ শোধ হয় নি।

ডাক্তার সাহেব অস্বাভাবিক কোমল গলায় বললেন, 'ভাই কাঁদবেন না। আপনি রোগীর আত্মীয়স্বজন সবাইকে খবর দিন। খুব খারাপ কিছুর জন্যে সবাইকে মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে বলুন। আরেকটা কথা — আপনি ইনটেনসিভ ইউনিটের নার্সদের আর বিরক্ত করবেন না। প্লিজ। ওরা আপনার বিরুদ্ধে কমপ্লেইন করেছে।

'স্যার, আমি আর বিরক্ত করব না।'

তোফাজ্জল ডাক্তারের ঘর থেকে বের হয়ে এল চোখ মুছতে মুছতে। তার বন্ধুরা তাকে কিছুই জিজ্ঞেস করল না। সেও কিছু বলল না। শুধু যখন জেবা এসে বারান্দায় দাঁড়াল তখন সে বলল, 'আপা, ডাক্তার সাহেব বললেন মুহিবের অবস্থা ভালো না। আত্মীয়স্বজনদের খবর দিতে বললেন।'

জেবা ক্লান্ত গলায় বলল, 'খবর দেয়ার আর কেউ নেই। ঐ মেয়েটা কি এসেছিল, অরু?'

'জ্বি না।'

'ওর বাসার ঠিকানা কি তোমরা কেউ জান? আমি মেয়েটিকে নিয়ে আসব।'

AMARBOI.COM

১০

রাহেলা বললেন, 'রাত তো অনেক হয়েছে, দশটা প্রায় বাজে — খেয়ে যাও না।' আবরার লজ্জিত ভঙ্গিতে বলল, 'জ্বি না। এখন উঠব। অনেক দেরি করে ফেললাম।'

অরু বলল, 'উঠব বলে তো বসেই আছেন। উঠছেন তো না।'

মীরু তাকাল শাসনের ভঙ্গিতে। চোখের ভাষায় বলার চেষ্টা — এসব কী হচ্ছে ?

রাহেলা বললেন, 'বাবা তুমি পা তুলে আরাম করে বস। ঘরে যা আছে তাই খাবে। আমি খাবার দিতে বলে আসি।'

মীরু বলল, 'আমরা কিন্তু খুব ঝাল খাই। আপনি ঝাল খেতে পারবেন তো ?'

'চেষ্টা করে দেখি।'

'আবীরের বাবা আবার একেবারেই ঝাল খেতে পারে না। কাঁচা মরিচ কিনতে গিয়ে দোকানদারকে কী বলে জানেন ? বলে — এই যে ভাই, ঝাল নেই এমন কাঁচা মরিচ আছে ?'

'উনি আছেন কেমন ?'

'ভালো আছে। আজই কথা বললাম। অবশ্যি খুব ভালো বোধহয় নেই। আমার কাছে তার গলার স্বর একটু ভারি ভারি লাগল। মনে হয় ঠাণ্ডা লেগেছে। ঠাণ্ডা লাগলে গলার স্বর ভারি হয়ে যায় না ?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবরার হাসিমুখে বলল, 'ডাক্তারি শাস্ত্রে এমন কথা পড়ি নি। তবে হতে পারে।'

'জানেন, মাঝে মাঝে ওর গলা আমি একদম চিনতে পারি না। একদিন কী হয়েছে জানেন, সে অফিস থেকে টেলিফোন করে আমাকে বলল, মীরু, কেউ কি আমার খোঁজ করেছিল?' আমি একদম গলা চিনতে পারলাম না। আমি বললাম, কে ? কে কথা বলছেন? ইন্টারেস্টিং না ?'

'ইন্টারেস্টিং তো বটেই।'

মীরু আরেকটা গল্প শুরু করতে যাচ্ছিল। রাহেলা তাকে রান্নাঘরে ডেকে নিয়ে গেলেন। বিরক্ত স্বরে বললেন, 'তোর কি বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারেই নেই? ওকে অরুর সঙ্গে গল্প করতে দে। ও অরুর সঙ্গে কথা বলতে এসেছে। তোর বকবকানি শোনার জন্যে আসে নি। তখন থেকে আঠার মতো লেগে আছিস।'

মীরু আহত গলায় বলল, 'আঠার মতো কখন লেগে রইলাম? বাবুর শরীর খারাপ। বাবুকে দেখাচ্ছিলাম।'

'দেখানো তো হয়েছে। এখন চুপচাপ আমার সামনে বস।'

মীরু গম্ভীর মুখে বসল। তার মনটা খারাপ। আবীরের বাবা প্রসঙ্গে মজার একটা গল্প মনে হয়েছিল। গল্পটা বলা গেল না। খাবার টেবিলেও বলা যাবে না। বাবাও নিশ্চয়ই একসঙ্গে খেতে বসবেন। এইসব হালকা ধরনের গল্প বাবার সঙ্গে করা যায় না।

রাহেলা চাকচাক করে আলু কাটছেন। ঘরে খাবার তেমন কিছু নেই। আলু ভাজি করে দেবেন। একটা পদ বাড়বে। দুপুরের মাছ আছে, রাতে ডিমের তরকারি করা হয়েছে। মাছ, ডিমের তরকারি, আলুভাজা। ডাল রান্না হয় নি। অনেকে আবার ডাল ছাড়া খেতে পারে না। একটু ডাল কি বসিয়ে দেবেন ? আধ ঘণ্টার মতো লাগবে। আচ্ছা লাগুক। এক রাতে একটু দেরি করে খেলে কিছু হবে না। মীরু কেমন মুখ কালো করে বসে আছে। রাহেলার মায়া লাগল, তিনি কোমল গলায় ডাকলেন, 'মীরু ?'

'কি ?'

'মুখ কালো করে বসে আছিস কেন? তুই কি রাগ করেছিস আমার কথায় ?'

'না।'

'আচ্ছা তোর কাছে আবরার ছেলেটাকে কেমন লাগে ?'

'ভালো।'

'কী রকম ভালো ?'

'বেশ ভালো। ভদ্র। চেহারাও সুন্দর। অবশ্যি গায়ের রং শ্যামলা ধরনের। আবীরের বাবার পাশে দাঁড়ালে বেচারাকে রীতিমতো কালো লাগবে। আমেরিকায় থেকে এখন নিশ্চয়ই আরো ফর্সা হয়েছে।'

রাহেলা বিরক্তমুখে বললেন, 'ফর্সা হবারই কথা।'

'তুমি তোমার দুই জামাইয়ের মধ্যে কাকে বেশি পছন্দ কর মা ?'

'দ্বিতীয় জন জামাই এখনো হয় নি। হোক, তারপর দেখা যাবে।'

'ধর হয়েছে। হতে বাকিও বেশি নেই।'

'বড় জামাইকেই বেশি পছন্দ করব। বড়র মর্যাদাই আলাদা।'

'তোমার বড় জামাই তোমাকে খুব পছন্দ করে। প্রতি চিঠিতে তোমার কথা থাকে। লাস্ট চিঠিতে লিখল — মা'র শরীরের দিকে লক্ষ করবে। ব্লাড প্রেসার এই বয়সে কন্ট্রোলে রাখতে হয়। তুমি খুব খেয়াল রাখবে। মা বুড়ো মানুষ — ওষুধ খাবার কথা হয়তো মনেই থাকবে না...'

রাহেলা বিস্মিত হয়ে বললেন, 'তুই কি চিঠি মুখস্থ করে ফেলেছিস নাকি ?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মীরু লাজুক গলায় বলল, 'অনেকবার করে পড়ি তো। মুখস্থ হয়ে যায়। এই যে ওর চিঠিটা তোমাকে পড়ে শুনালাম এর মধ্যে একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস লক্ষ করেছ ?'

'না।'

'ইন্টারেস্টিং হচ্ছে সব জামাইরা শাশুড়িকে আম্মা ডাকে। ও কিন্তু তোমাকে 'মা' ডাকে। মা ডাকটা অনেক আন্তরিক না ?'

রাহেলা কঠিন কিছু বলতে গিয়েও বললেন না। তাঁর দাঁত ব্যথা তীব্র হচ্ছে। বসে থাকতে পারছেন না।

অরু বলল, 'আপনি পা তুলে আরাম করে বসছেন না কেন? পায়ে ঠাণ্ডা লাগছে না ? পায়ের উপর চাদর টেনে দিন।'

আবরার বলল, 'তোমার মা'র বিছানায় পা তুলে বসতে সংকোচ লাগছে।'

'এটা মা'র বিছানা মোটেই না। এটা হচ্ছে গেস্ট বিছানা। বাবা-মা'র ঝগড়া হলে মা এখানে ঘুমাতে আসেন।'

'এখন কি উনাদের ঝগড়া চলছে ?'

'হ্যাঁ, চলছে। সপ্তাহে তাঁরা আটবার ঝগড়া করেন। এমন সব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে ঝগড়া যে মাঝে মাঝে তাঁদেরকে খুব ছেলেমানুষ মনে হয়। আজ কি নিয়ে তাঁদের ঝগড়া হয়েছে জানেন ?'

'কী নিয়ে ?'

'দাঁতব্যথা নিয়ে। মার দাঁতব্যথা করছিল। বাবা বললেন, লবণ-পানি দিয়ে কুলকুচা করতে। মা বললেন, এতে কিছু হয় না। বাবা রেগে গেলেন — তুমি কি করে দেখেছ যে হয় না? না করেই বললে, হয় না। যুক্তি এবং কাউন্টার যুক্তি চলতে লাগল। এক পর্যায়ে বাবা... থাক, সেটা আর আপনাকে বলব না।'

অরু মিটিমিটি হাসতে লাগল। আবরার মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে। এই মেয়ের কথা বলার ভঙ্গি এত সুন্দর। চোখ ফিরিয়ে নেয়া যায় না। মেয়েটা কী বলছে সেদিকে লক্ষ থাকে না — কী করে কথা বলছে তাই প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। আবরার ঠিক করে রেখেছে সে বিয়ের পর অরুকে বলবে, 'তুমি প্রতি রাতে এক ঘণ্টা আমার সামনে বসবে এবং ননস্টপ কথা বলে যাবে। এক মুহূর্তের জন্যেও থামতে পারবে না।'

'অরু।'

'জ্বি।'

'তোমরা দুবোন সম্পূর্ণ দুরকম। চেহারায় মিল ছাড়াও জেনেটিক কারণে বোনে বোনে চরিত্রগত কিছু মিল থাকে। তোমাদের তাও নেই।'

'মিল আছে। দুজনের কাউকেই তো আপনি ভালোমতো জানেন না, তাই ধরতে পারছেন না।'

'মিলটা কি বল তো ?'

অরু শান্ত গলায় বলল, 'ভালবাসার ক্ষমতা আমাদের দুবোনেরই অসাধারণ। আমরা পাগলের মতো ভালবাসতে পারি। আমার দুলাভাই প্রাণী হিসেবে খুবই নিম্নশ্রেণীর। তাকে যে কী পরিমাণ ভাল আপা বাসে তা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না।'

'এটা কি ভালো ?'

'কেন ভালো না ? ভালোকে তো সবাই ভালবাসে। মন্দকে কজন ভালবাসতে পারে?'

আবরার আগের মতো মুগ্ধ চোখে আবার তাকাল। সে ভেবে পাচ্ছে না তার এই মুগ্ধতা বিয়ের পরেও থাকবে কিনা। এই মেয়েটি খুব সহজ খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কথা বলছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এটিও একটি অস্বাভাবিক ব্যাপার। যার সঙ্গে অল্প কদিন পর বিয়ে হবে তার সঙ্গে এত স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কি কথা বলা যায় ? লজ্জা, দ্বিধা, সংকোচ খানিকটা হলেও তো আসবে। এই মেয়েটার মধ্যে তা আসছে না কেন ?

'অরু।'

'জ্বি।'

'প্রায়ই তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই, মনে থাকে না।'

'এখন নিশ্চয়ই মনে পড়েছে।'

'হ্যাঁ। তুমি খুব সহজভাবে আমার সঙ্গে কথা বল, আমার ভালো লাগে। আমি আবার কারো সঙ্গে খুব সহজ হতে পারি না। সহজ হতে ইচ্ছা করে কিন্তু পারি না। আমি যখন আমার মা'র সঙ্গে কথা বলি তখনো খানিকটা আড়াল থাকে।'

'এই তো এখন সহজভাবে কথা বলছেন। এখন কি কোনো আড়ালবোধ করছেন?'

'না করছি না।'

'তাহলে বলুন।'

আবরার ইতস্তত করে বলল, 'তোমার সঙ্গে কি মুহিব নামের কোনো ছেলের পরিচয় আছে ? আমার দূর-সম্পর্কের এক ভাগ্নি দিন দশেক আগে হঠাৎ একগাদা কথা বলল..'

আবরার থেমে গেল। অরু চুপ করে আছে। তাকিয়ে আছে এক দৃষ্টিতে। আবরার অস্বস্তির সঙ্গে বলল, 'আমি অবশ্যি কিছুই মনে করি না। পরিচয় থাকাটাই স্বাভাবিক। ছেলেমেয়েরা এক সঙ্গে ইউনিভার্সিটিতে পড়ছে। মেয়েদের শুধু মেয়ে বন্ধু থাকবে ছেলেবন্ধু থাকবে না তা কি হয় ?'

অরু আবরারকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'আপনার ভাগ্নি ঠিকই বলেছে। মুহিব নামের এক জনের সঙ্গে আমার খুব ভালো পরিচয় আছে।'

আবরার চুপ করে আছে। প্রসঙ্গটা তোলায় সে নিজেই বিব্রতবোধ করছে। তবে অরুর মধ্যে বিব্রত বা অস্বস্তিবোধের তেমন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। অরু বলল, 'আর কিছু কি জানতে চান?'

আবরার বলল, 'এই না না, কিছুই জানতে চাই না। যে সহপাঠী বন্ধুরা একসঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে, হৈচৈ করছে — বন্ধুর মতো সম্পর্ক। এটা আমার কাছে খুব হেলদি বলে মনে হয়। অরু, তুমি কখনো মনে করবে না যে বিয়ের পর আমি তোমাকে সবার কাছ থেকে আলাদা করে একটা ক্ষুদ্র গণ্ডিতে বন্দি করে ফেলব। মনের এইটুকু ঔদার্য আমার আছে।'

অরু বলল, 'আমি আপনাকে একটা চিঠি লিখেছি।'

আবরার বিস্মিত হয়ে বলল, 'কী চিঠি ?'

'আমি আপনার সঙ্গে খুব সহজ ভঙ্গিতে কথা বললেও আমার এমন কিছু কথা আছে যা সহজভাবে বলতে পারছি না। এই জন্যেই চিঠি লিখেছিলাম।'

'কোথায় সেই চিঠি ?'

'চিঠিটা আমার পছন্দ হয় নি। আবার নতুন করে লিখব — আজ রাতেই লিখব। কাল আপনাকে আমি নিজের হাতে দিয়ে আসব।'

'বিষয়বস্তু কি জানতে পারি ?'

'কাল জানবেন।'

'অরু, কোনো সমস্যা আছে কি ?'

অরু ক্ষীণস্বরে বলল, 'আছে। সমস্যা আছে। বড় রকমের সমস্যা আছে।'

আবরার তাকিয়ে আছে। অরুও তাকিয়ে আছে। তবে সে তাকিয়ে আছে জানালার দিকে। বাইরে বৃষ্টি নেমেছে। বারান্দায় বাতি জ্বলছে বলেই বৃষ্টির ফোঁটা চোখে পড়ছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলো পড়ে বৃষ্টির ফোঁটাগুলো মুক্তার মতো ঝিকমিক করছে। অরুর কান্না পাচ্ছে। কান্না আটকে রাখতে কষ্ট হচ্ছে। মীরু এসে বলল, 'কী ব্যাপার, দুজন চুপচাপ কেন? খাবার দেয়া হয়েছে।'

আবরার লক্ষ করল, অরুর হাতে আংটি নেই। এমন কোনো বড় ব্যাপার নয় তবু কেন জানি এক ধরনের অস্বস্তিবোধ হচ্ছে। হাতে আংটি নেই — অরু নিজেও কি এ ব্যাপারটায় গুরুত্ব দিচ্ছে ? হাত আড়াল করার চেষ্টা করছে কেন ?

অরু খেতে বসল না। শুকনো মুখে বলল, 'আমার ক্ষিধে নেই।'

রাহেলা বললেন, 'দুপুরেও তো কিছু খাস নি। কী ব্যাপার, জ্বর নাকি ?'

'না, জ্বর না।'

'দেখি, কাছে আয়। আশ্চর্য! জ্বর আছে তো!'

অরু হাসতে হাসতে বলল, 'এত আশ্চর্য হবার কী আছে মা? মানুষের জ্বর হয় না?'

'অকারণে জ্বর হবে কেন ?'

'সেটা আমাকে জিজ্ঞেস করছ কেন ? ডাক্তার সাহেব আছেন। তাঁকে জিজ্ঞেস কর।'

আবরার নিঃশব্দে খাচ্ছে। মীরু তার প্লেটে খাবার উঠিয়ে দিচ্ছে। অরুদের খাবার টেবিলটা বেশ বড়। এত বড় টেবিলের এক কোনায় এক জন মানুষমাত্র খাচ্ছে। দৃশ্যটা চোখে পড়ার মতো। রাহেলা বললেন, 'তোমাকে একা খেতে হচ্ছে। তুমি কিছু মনে কোরো না বাবা। অরুর বাবা এখন খাবেন না। আমাকে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। আর মীরু সন্ধ্যাবেলা দুটা রুটি খায়, রাতে আর কিছু খায় না।'

আবরার বলল, 'আমার কিছু অসুবিধা হচ্ছে না। একা খেয়ে আমার অভ্যাস আছে বাড়িতেও আমি একা খাই।'

মীরু বলল, 'আমি সন্ধ্যাবেলা দুটা রুটি খাই কেন জানেন? আবীরের বাবার জন্যে।' সে চিঠি লিখেছে — "এ দেশের মেয়েদের বেশিরভাগ পেটুক। যা পায় গবগব করে খায়। বিয়ের পর এক-এক জন ফুলে কোলবালিশ হয়ে যায়। তুমি খাবারদাবারের ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করবে। তোমার মোটার ধাত।"

অরু বলল, 'আপা, চুপ কর তো। পুরো চিঠি মুখস্থ বলতে হবে না। এমনিতে আপার স্মরণশক্তি খুব খারাপ কিন্তু দুলাভাইয়ের প্রতিটি চিঠি দাঁড়ি, কমা, কাটাকুটিসহ মুখস্থ।'

আবরার হাসল। রাহেলাও হেসে ফেললেন। হাসি গোপন করার চেষ্টা করেও গোপন করতে পারলেন না। মীরু কঠিন গলায় বলল, 'স্বামীর চিঠি মুখস্থ করা কি অপরাধ ?'

'না, অপরাধ না। তবে সেই চিঠি কবিতার মতো আবৃত্তি করে সবাইকে শোনানো একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ।'

মীরুর মুখ থমথম করছে। হয়তো সে কেঁদে ফেলবে। রাহেলা পরিস্থিতি সামলানোর জন্যে বললেন, 'মীরু তুই আবরারের জন্যে এক কাপ চা বানিয়ে আন। রাতে ভাত খাবার পর তুমি কি চা খাও বাবা ?'

'খাই না। তবে আজ খাব। বৃষ্টি হওয়ায় ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগছে।'

অরু বলল, 'মা, আমি আর বসে থাকতে পারছি না। তুমি তোমার গেস্টকে যত্ন করে চা খাওয়াও। আমি আমার ঘরে যাচ্ছি। শরীর খুব খারাপ লাগছে। মনে হচ্ছে খুব ভালোমতো জ্বর আসছে।'

মুহিবের অবস্থা মনে হয় খারাপ। এক জন ডাক্তার ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট থেকে ছুটে বের হলেন। দুজন ডাক্তার নিয়ে ফিরলেন। জেবা চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখছে। কাউকে কিছু জিজ্ঞেসও করছে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বজলু এসে বলল, 'আপা ঘরে গিয়ে বসুন। বৃষ্টিতে ভিজে যাচ্ছেন।'

জেবা একটু সরে দাঁড়াল। বৃষ্টির ছাঁটে শাড়ির অনেকখানি ভিজেছে, খেয়ালই হয় নি।

'শীত লাগছে আপা ?'

'একটু লাগছে। তোমার স্ত্রী কোথায় ?'

'ওকে ওর ভাইয়ের বাসায় রেখে এসেছি। খুব কান্নাকাটি করছিল।'

'ভালো করেছ। সবাই মিলে কষ্ট করার কোনো অর্থ হয় না।'

'আপা, আপনি কিছু খেয়েছেন ?'

'না। তোমরা খেয়েছ ?'

'জ্বি। লিয়াকত টিফিন ক্যারিয়ারে করে বাসা থেকে খাবার নিয়ে এসেছিল। এমন ক্ষিধে লেগেছিল...'

'ক্ষিধে লাগাই স্বাভাবিক। ক্রাইসিসের সময় ক্ষিধে পায়।'

'লিয়াকত চাও নিয়ে এসেছে। আপনাকে একটু চা দেব আপা ?'

জেবা স্বাভাবিক গলায় বলল, 'দাও।' বজলু খুব অবাক হচ্ছে। কী শক্ত মেয়ে! কত সহজভাবে সমস্যা গ্রহণ করেছে। এখন পর্যন্ত একবারও কাঁদে নি।

'বজলু!'

'জ্বি আপা।'

'মৃত্যু দেখে আমার অভ্যাস আছে। মা মারা গেলেন, বাবা মারা গেলেন, আমার ছোট একটা বোন ছিল রেবা, সেও মারা গেল। এরা তিন জনই সারারাত মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করে ভোরবেলা মারা গেল। সবার প্রথমে মারা গেলেন মা। মা'র মৃত্যুতে কেঁদেছিলাম। তারপর আর কাঁদি নি। কান্না আসে নি।'

জেবা চায়ের কাপে ছোট ছোট চুমুক দিচ্ছে। তার মুখ দেখে মনে হচ্ছে চা-টা ভালো লাগছে।

'আমার কি মনে হয় জান বজলু ? আমার মনে হয়, মা-বাবা মৃত্যুর পর পরকালে একটা সংসার পেতেছেন। এক এক করে আমাদের সব ভাইবোনদের নিয়ে যাচ্ছেন। সবার আগে নিলেন রেবাকে। কারণ রেবা ছিল বাবা-মা'র খুব পছন্দের মেয়ে। এখন অপেক্ষা করছেন মুহিবের জন্যে।'

'এইসব আলোচনা থাক আপা।'

'কেন ? তোমার কি শুনতে খারাপ লাগছে ? আমার বলতে কিন্তু খারাপ লাগছে না। রেবার মৃত্যুর সময় কী হল শোন — খুব কষ্ট পাচ্ছিল। রাত দুটার সময় হঠাৎ করে যেন তার কষ্ট কমে গেল। স্বাভাবিকভাবে শ্বাস নিতে লাগল। আমি তার মাথার কাছে বসে আছি। সে হঠাৎ শক্ত করে আমার দুহাত ধরে উত্তেজিত গলায় বলল — আপা দেখ দেখ। আম্মু এসেছে। আম্মু! সে আঙুল দিয়ে দরজার দিকে দেখাতে লাগল।'

জেবা চায়ের কাপ বজলুর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'আমাকে আরেকটু চা দাও।'

'আপনি টুলটায় বসুন।'

জেবা বসতে বসতে বলল, 'আমার কি ধারণা জান বজলু? আমার ধারণা, আজো বাবা-মা, রেবা এসেছে। তারা মুহিবের খাটের পাশে বসে আছে।'

'এসব আলোচনা থাক আপা।'

'আচ্ছা থাক। বজলু একটা কথা বল — মুহিব তোমার অনেক দিনের বন্ধু।'

'জ্বি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমার সম্পর্কে নিশ্চয়ই সে অনেক কিছু তোমাদের বলত। কী বলত বল তো?'

'সব সময় বলত এই পৃথিবীতে আপনার মতো ভালো মেয়ে অতীতে কখনো জন্মায় নি। বর্তমানে নেই — ভবিষ্যতেও জন্মাবে না।'

জেবার চোখে পানি এসে গেল। সে চোখ মুছতে মুছতে বলল, 'আমি জানতাম সে এই কথাই বলবে। তবু তোমার কাছে শুনতে চেয়েছি, ভালোই করেছি। অনেকক্ষণ ধরেই কাঁদতে চাচ্ছিলাম, পারছিলাম না। এখন পারছি। তুমি ভাগ্য বিশ্বাস কর বজলু?'

বজলু কিছু বলল না।

জেবা বলল, 'আমি বিশ্বাস করি। এত বড় অ্যাকসিডেন্ট হল। এতগুলো মানুষ গাড়িতে, কারোর কিছুই হল না — মারা যাচ্ছে শুধু এক জন। সেই এক জন মাত্র। একদিন আগে তার বিয়ে হয়েছে। মৃত্যুটা দুদিন আগে কেন হল না বল তো? ওর মৃত্যুর পর কি হবে জান ? — চারদিক থেকে শুধু সান্ত্বনার বাণী শুনব। সুন্দর সুন্দর সব বাণী, চমৎকার সব কথা। ইহকাল কিছুই না। ইহকাল হচ্ছে মায়া। আসল হচ্ছে পরকাল। প্রকৃতির নিয়মকানুন মানুষের বোঝার উপায় নেই। কি কি কথা শুনব সব আমি তোমাকে লিখে দিতে পারি। আগেও তিনবার শুনেছি।'

জেবা হয়তো আরো কিছু বলত — কথা থামিয়ে দিল। ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট থেকে দুজন ডাক্তার বেরুচ্ছেন। দুজনের মুখই জ্যোতিহীন। তাঁদের মুখের দিকে তাকিয়ে পরিষ্কার বলে দেয়া যায় — মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধে এরা পরাজিত।

জেবা উঠে দাঁড়াল। ক্লান্ত গলায় বলল, 'আমি ওকে দেখে আসি।'

নার্স ছাড়াও এক জন ডাক্তার মুহিবের পাশে আছেন। জেবা পায়ের কাছে দাঁড়াল। ক্ষীণ স্বরে বলল, 'ওর নিশ্বাসে এ রকম শব্দ হচ্ছে কেন? ডাক্তার সাহেব ওর কি নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে?'

ডাক্তার সাহেব কিছু বললেন না।

জেবা বের হয়ে এল।

শফিকুর রহমান সাহেব এসেছেন। বাবার হাত ধরে প্রিয়দর্শিনী দাঁড়িয়ে আছে। জেবা তাদের দেখল, কিছু বলল না।

শফিকুর রহমান সাহেব বললেন, 'প্রিয়দর্শিনী তার মামাকে দেখার জন্যে খুব কান্নাকাটি করছিল। ওকে নিয়ে এসেছি।'

এই প্রথম শফিকুর রহমান তাঁর মেয়েকে প্রিয়দর্শিনী নামে ডাকলেন। নাম উচ্চারণ করলেন স্পষ্ট করে, সুন্দর করে।

জেবা বলল, 'তোমার মামাকে এখন দেখে তোমার ভালো লাগবে না মা। না দেখাই ভালো।'

প্রিয়দর্শিনী কঠিন স্বরে বলল, 'আমি দেখব।'

'এস আমার সঙ্গে।'

'আমি একা যাব।'

প্রিয়দর্শিনী ছোট ছোট পা ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে। ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটের দরজায় হাত রেখে মিষ্টি রিনরিনে গলায় বলল, 'আমি কি দু মিনিটের জন্যে ভেতরে আসতে পারি?'

শফিকুর রহমান ভয়ংকর অস্বস্তিবোধ করছেন। স্ত্রীর দিকে চোখ তুলে তাকাতেও পারছেন না। স্বাভাবিক থাকার প্রাণপণ চেষ্টা করতে করতে বললেন, 'জেবা, ওর অবস্থা কেমন?'

জেবা বলল, 'অবস্থা ভালো না। ডাক্তাররা কিছু বলছেন না, কিন্তু আমি বুঝতে পারছি। ওর গলা দিয়ে ঘড়ঘড় শব্দ হচ্ছে। প্রিয়দর্শিনী একা একা গিয়েছে। ও ভয় পাবে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শফিকুর রহমান বললেন, 'ও শক্ত মেয়ে, এতটুকুও ভয় পাবে না। আরেকটা কথা জেবা, তুমি নাকি চাও যে মেয়েটার সঙ্গে মুহিবের বিয়ে হয়েছে তাকে এখানে নিয়ে আসতে?'

'হ্যাঁ।'

'সেটা কি ঠিক হবে জেবা? এই ভয়ংকর ঘটনাটা মেয়ের আড়ালেই হওয়া কি ভালো না? মেয়েটাকে তো একটা নতুন জীবন শুরু করতে হবে। তাকে যদি এখন এখানে নিয়ে আস তাহলে নতুন করে জীবন শুরু করা তার জন্যে খুব সহজ হবে না। সবচে' ভালো হয় কি জান? যদি কেউ কোনোদিন না জানে যে মেয়েটার বিয়ে হয়েছিল। আমি খুব প্র্যাকটিক্যাল কথা বললাম জেবা। লিভ হার এলোন।'

জেবা বলল, 'তুমি মুহিবের দিকটা দেখবে না? তুমি কি মনে কর না মৃত্যুর সময় স্ত্রীকে পাশে পাবার অধিকার তার আছে?'

শফিকুর রহমান জবাব দিলেন না। কোনো জবাব তাঁর মাথায় এল না।

অরু জেগেই ছিল।

সে জানত আবরার যাবার আগে তার ঘরে একবার উঁকি দেবে। জ্বর কেমন জানতে চাইবে। কপালে হাত রেখে উত্তাপ দেখবে। সেটাই তো স্বাভাবিক। যা স্বাভাবিক আবরার তা করল না। জ্বর দেখতে চাইল না। লাজুক মুখে বলল, 'তোমাকে একটা কথা বলতে এসেছি — আজ আমার জন্মদিন। খুব ইচ্ছা ছিল তোমাকে নিয়ে বেড়াতে যাব।'

অরু বলল, 'আগে বললেন না কেন? বললেই হত। কোথাও বেড়াতে যেতাম।'

'লজ্জা লাগল।'

'তখন লজ্জা লাগল তো এখন লাগছে না কেন ?'

আবরার বলল, 'বুঝতে পারছি না। একটু বসি তোমার ঘরে ?'

'বসুন।'

মীরু এসে বলল, 'অরু তোর টেলিফোন।'

অরু বলল, 'কে ?'

'জানি না কে ? এক জন মহিলা। বললাম তোর অসুখ। শুয়ে আছিস। তারপরেও চাচ্ছেন। খুব নাকি জরুরি।'

অরু উঠে দাঁড়াল। আবরারকে বলল, 'আপনি কিন্তু নড়বেন না। আমি এক্ষুনি আসছি।'

'হ্যালো, কে ?'

'আমাকে তুমি চিনবে না। আমার নাম জেবা। আমি মুহিবের বড় বোন ?'

অরু হকচকিয়ে গিয়ে বলল, 'স্লামালিকুম আপা।'

'তুমি কি এক্ষুনি, এই মুহূর্তে আসতে পারবে ?'

'কোথায় ?'

'ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে।'

'কী ব্যাপার আপা ?'

'মুহিব অ্যাকসিডেন্ট করেছে।'

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর অরু বলল, 'ওর কি জ্ঞান আছে ?'

'না, জ্ঞান নেই।'

অরু ক্ষীণ স্বরে প্রায় অস্পষ্টভাবে বলল, 'ওর অবস্থা খুব খারাপ, তাই না আপা ?'

'হ্যাঁ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমি আসছি।'

'আমি কি আসব তোমাকে নিতে ?'

'আপনাকে আসতে হবে না।'

জামিল সাহেব শোবার আয়োজন করছিলেন। অরু এসে দরজা ধরে দাঁড়াল। জামিল সাহেব বললেন, 'কী হয়েছে মা?' অরু ছুটে এসে বাবাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'তুমি আমাকে নিয়ে চল বাবা। আমি একা যেতে পারব না। আমি কিছুতেই একা যেতে পারব না।'

অরু হাঁটু গেড়ে মুহিবের পাশে বসে আছে। তার সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপছে। সে চাপা গলায় বলল, 'ডাক্তার সাহেব, আমি কি ওর হাত একটু ধরতে পারি ?'

বৃদ্ধ ডাক্তার কোমল গলায় বললেন, 'অবশ্যই ধরতে পার মা, অবশ্যই পার।'

'আমি যদি ওকে কোনো কথা বলি তাহলে ও কি তা শুনবে ?'

'জানি না মা। কোমার ভেতর আছে, তবে মস্তিষ্ক সচল, শুনতেও পারে। মৃত্যু এবং জীবনের মাঝামাঝি জায়গাটা খুব রহস্যময়। আমরা ডাক্তাররা এই জায়গা সম্পর্কে তেমন কিছু জানি না।'

'ডাক্তার সাহেব আমি ওকে কয়েকটা কথা বলব আপনি কি আমাকে কিছুক্ষণের জন্যে ওর পাশে থাকতে দেবেন ?'

ডাক্তার সাহেব ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। ঘরে অরু একা। ছোট্ট ঘরটাকে তার সমুদ্রের মতো বড় মনে হচ্ছে। মুহিবের বিছানায় সাদা চাদরের জন্যে বিছানাটাকে মনে হচ্ছে সমুদ্রের ফেনা। সেই ফেনা অবিকল ঢেউয়ের মতো দুলছে।

অরু দুহাতে মুহিবের ডান হাত ধরে আছে। সে খুব স্পষ্ট করে ডাকল, 'এই তুমি তাকাও। তোমাকে তাকাতেই হবে। আমি সব কিছুর বিনিময়ে তোমাকে চেয়েছিলাম। তোমাকে পেয়েছি, আমি তোমাকে চলে যেতে দেব না। তোমাকে তাকাতেই হবে। তাকাতেই হবে।'

১১

পঁচিশ বছর পরের কথা।

অরুর বড় মেয়ে রুচিরার আজ বিয়ে। বিরাট আয়োজন। ছাদে প্যান্ডেল হয়েছে। পাঁচশর মতো মানুষ দাওয়াত করা হয়েছিল—ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে হাজারের ওপর দাওয়াতী মেহমান এসে পড়েছে। সমস্যা হচ্ছে আকাশের অবস্থা ভালো না। সারাদিন ঝকঝকে রোদ গিয়েছে। সন্ধ্যা থেকেই আকাশ মেঘলা। ঘনঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। অরুর স্বামী আবরার সাহেব চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়েছেন। খাওয়া কম পড়ে গেলে সমস্যা হবে। হোটেলে লোক পাঠিয়েছেন। খবর দিয়ে রাখা — প্রয়োজনে যাতে খাবার চলে আসে।

কিছু মেহমান খাইয়ে দিলে ভিড় পাতলা হত। খাওয়ানো যাচ্ছে না। কারণ বর এখনো আসে নি। বড় দেরি করছে। সন্ধ্যা সাতটার সময় চলে আসার কথা এখন বাজছে আটটা। আকাশের অবস্থা আরো খারাপ করেছে। বৈশাখ মাস, ঝড়বৃষ্টির কাল। তিরপল দেয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছে। ভারি বর্ষণ হলে তিরপলে কাজ হবে বলে মনে হয় না। এই নিয়েও আবরার সাহেব দুশ্চিন্তা করছেন। তাঁর প্রেসারের সমস্যা আছে। সামান্য দুশ্চিন্তাতেও তাঁর প্রেসার বেড়ে যায়। বর আসতে এত দেরি হবার কথা নয়। এত দেরি হচ্ছে কেন ?

বর এল রাত সাড়ে আটটায়।

অরুর মেজো মেয়ে কান্তা ছুটে এসে তার মাকে বলল, 'বর এসেছে মা। কী কুৎসিত রুচি, দেখলে তুমি বমি করে দেবে। কটকটে হলুদ রঙের একটা পাঞ্জাবি পরে এসেছে। গরম খুব, এই জন্যে নাকি সে আচকান পরে নি। পাঞ্জাবি দেখে আমার সব বন্ধুরা হাসাহাসি করছে।'

অরু হাতের কাজ ফেলে বর দেখতে গেলেন। বরের মুখের দিকে তিনি তাকালেন না। তাকিয়ে রইলেন কটকটে হলুদ রঙের পাঞ্জাবির দিকে। তাঁর গা ঝিমঝিম করতে লাগল। কান্তা বলল, 'কী হয়েছে মা, এ রকম করছ কেন ?'

তিনি অস্পষ্ট স্বরে বললেন, 'শরীরটা ভালো লাগছে না মা। আমাকে বিছানায় নিয়ে শুইয়ে দে তো।'

বিয়েবাড়ির আনন্দ-কোলাহল থেকে তিনি দূরে সরে গেলেন। ঘর অন্ধকার করে শুয়ে রইলেন চুপচাপ। আবরার সাহেব খবর শুনে স্ত্রীর পাশে এসে বসলেন। হাত রাখলেন মাথায়।

অরু বললেন, 'হাজারো কাজের সময় তুমি এখানে বসে আছ কেন ? আমি ভালো আছি। মাথাটা কেন জানি একটু ঘুরে উঠল।'

আবরার সাহেব বললেন, 'কোনো অসুবিধা নেই। আমি না গেলে কাজ আটকে থাকবে না।'

'ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে। তিরপল নাকি ঝড়ে উড়ে গেছে। তুমি খোঁজখবর করবে না ?'

'খোঁজখবর করবার লোক আছে। তুমি চুপচাপ শুয়ে থাক তো।'

'এত সব সমস্যা আর তুমি বসে আছ আমার ঘরে। লোকে হাসাহাসি করবে তো।'

'করুক হাসাহাসি।'

রাত একটার মতো বাজে। বিয়েবাড়ি মোটামুটি শান্ত হয়েছে। বরযাত্রীরা চলে গেছে। শুধু বর আর তার কিছু বন্ধুবান্ধব রয়ে গেছে। এই বাড়িতে বাসর হবে। অল্পবয়স্ক মেয়েদের উৎসাহের সীমা নেই। তারা অকারণে চিৎকার-ছোটাছুটি করছে।

কান্তার উৎসাহই সবচে' বেশি। যেন বাসরের যাবতীয় খুঁটিনাটি সংবাদ চারদিকে ছড়িয়ে দেবার পুরো দায়িত্ব তার উপর। তার বার বছরের জীবনে এমন উত্তেজনার মুহূর্ত আসে নি। সে ছুটতে ছুটতে মা'র ঘরে এসে ঢুকল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'এখন খুব মজা হচ্ছে মা। আপা করছে কি দুলাভাইয়ের পাঞ্জাবি আগুন দিয়ে পোড়াচ্ছে। 'বন ফায়ার' হবে। সবার সামনে আগুন দিয়ে পোড়ানো হবে।'

অরুর চোখে জল এসে যাচ্ছে। তিনি সেই জল সামলাবার প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। আজ তাঁর মেয়ের বিয়ে। এমন আনন্দের দিনে কি আর চোখের জল ফেলতে আছে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আয়নাঘর

১

লিলিয়ান এক টুকরা মাছ ভাজা মুখে দিয়ে হাসিমুখে বলল, 'ইহা খেতে বড় সৌন্দর্য হয়।' তাহের হো-হো করে হেসে ফেলল। লিলিয়ান ইংরেজিতে বলল, 'আমার ধারণা আমি ভুল বাংলা বলি নি। হাসছ কেন?'

তাহের হাসি থামাল না। তার হাসি-রোগ আছে। একবার হাসতে শুরু করলে সহজে থামতে পারে না। লিলিয়ান আহত গলায় ইংরেজিতে বলল, 'আমার বাংলা শেখার বয়স মাত্র ছ'মাস। যা শিখেছি নিজের চেষ্টায় শিখেছি। এ ব্যাপারে তুমি আমাকে কোনো সাহায্য করছ না। বরং উল্টোটা করছ। যখনই বাংলা বলার চেষ্টা করছি তুমি হাসছ। এটা কি ঠিক?'

তাহের বলল, 'অবশ্যই ঠিক। একশ ভাগ ঠিক। আমরা বাঙালিরা বিদেশিদের মুখে ভুল বাংলা সহ্য করি না। যতবার তুমি ভুল বাংলা বলবে ততবার আমি হাসব। মাছ ভাজা মুখে দিয়ে বললে, ইহা বড় সৌন্দর্য হয়। মাছ ভাজার মধ্যে আবার সৌন্দর্য কী? এটা পিকাসোর ছবি না আবার রবীন্দ্রনাথের কবিতাও না। মাছ ভাজা হল মাছ ভাজা। বুঝলে?'

'না, বুঝলাম না। মাছ ভাজা খেতে ভালো লাগলে আমি কিছুই বলব না?'

'বলবে — খেতে মজা হয়েছে, কিংবা বলবে — ভালো হয়েছে। খেতে সৌন্দর্য হয়েছে আবার কী? 'সুন্দর' আমরা খাই না। চাঁদের আলো খুব সুন্দর, তাই বলে চাঁদের আলো কি কেউ খায়?'

তাহের আবার হেসে উঠল। লিলিয়ান তাহেরের উপর রাগ করার চেষ্টা করছে, পারছে না। কখনো পারে না। তার মনে হয় না কখনো পারবে। লিলিয়ানের বয়স তেইশ। নেপলস-এর মেয়ে। তাহেরের সঙ্গে তার পরিচয় হয় ইয়েলো স্টোন পার্কে। পরিচয় পর্ব বেশ মজার। লিলিয়ান ত্রিশ ডলারের টিকিট কেটে একটা ট্যুর গ্রুপের সঙ্গে এসেছে। এই প্রথম শহর ছেড়ে বাইরে আসা, যা দেখছে তাই তার ভালো লাগছে। সে মুগ্ধ হয়ে একের পর এক ছবি তুলে যাচ্ছে — তখন সে লক্ষ করল, কালো, লম্বামতো ঝাঁকড়া চুলের একটি ছেলে তার দিকে তাকিয়ে হো-হো করে হাসছে। রূপবতী মেয়েদের আশপাশে যেসব ছেলেরা থাকে তারা তাদের অজান্তেই অনেক অদ্ভুত আচরণ করে, কিন্তু এরকম অশালীন ভঙ্গিতে দাঁত বের করে কখনো হাসে না। লিলিয়ান ব্যাপারটা অগ্রাহ্য করার চেষ্টা করল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু অগ্রাহ্য করা যাচ্ছে না। যতবারই সে ছবি তুলছে ততবারই মানুষটা মুখের সব ক'টা দাঁত বের করে হাসছে। যেন লিলিয়ান তেইশ বছর বয়েসী ঝকঝকে চেহারার তরুণী নয়, যেন সে মহিলা চার্লি চ্যাপলিন। তার প্রতিটি ক্রিয়াকলাপে হাসতে হবে। লিলিয়ান এগিয়ে গেল। বরফশীতল গলায় বলল, 'আপনি হাসছেন কেন জানতে পারি?'

লিলিয়ানের শীতল গলা শুনে যে কোনো পুরুষ ঘাবড়ে যেত। এ ঘাবড়াল না। লোকটি হাসিমুখে বলল, 'অবশ্যই জানতে পারেন। আপনার ছবি তোলা শেষ হোক, তারপর বলব।'

'এখন বলতে অসুবিধা আছে?'

'হ্যাঁ অসুবিধা আছে, অবশ্যই অসুবিধা আছে।'

'আমার ছবি তোলা শেষ হয়েছে, আপনি বলুন কেন হাসছেন?'

'আপনি আপনার ক্যামেরার মুখ থেকে ক্যাপ সরান নি। মুখে ক্যাপ লাগিয়ে ছবি তুলছিলেন। এই জন্যে হাসছিলাম।'

'না হেসে আপনি যদি আমাকে বলতেন — ক্যামেরার মুখের ক্যাপ সরানো হয় নি, সেটাই কি শোভন হত না?'

'হ্যাঁ হত।'

বলতে বলতে তাহের আগের চেয়েও শব্দ করে হেসে উঠল। লিলিয়ান সরে এল। সে জীবনে এত অপদস্থ হয় নি। তার রীতিমতো কান্না পাচ্ছে। ইচ্ছা করছে ক্যামেরাটা 'ওল্ড ফেইথফুলে'র পানিতে ছুড়ে ফেলতে। সাধারণ শিষ্টতা, সাধারণ ভদ্রতা কি তরুণী মেয়েরা পুরুষদের কাছ থেকে আশা করতে পারে না? লিলিয়ানের ইচ্ছা করছে খুব কঠিন কঠিন কথা মানুষটাকে শোনাতে। তা সে পারবে না। খুব রেগে গেলে সে গুছিয়ে কোনো কথা বলতে পারে না। সবচে' ভালো হয় লিলিয়ান যদি তার হোটেলে ফিরে যেতে পারে। তা সম্ভব হবে না। সে যে গাইডেড ট্যুরে এসেছে তাদের মাইক্রোবাস ছাড়বে সন্ধ্যা মেলাবার পর। ইচ্ছা না করলেও সন্ধ্যা পর্যন্ত তার এখানে থাকতে হবে। ঘুরেফিরে ঐ লোকটির সঙ্গে দেখা হবে। সেও নিশ্চয়ই সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকবে। লিলিয়ানকে দেখামাত্র দাঁত বের করে হাসবে। কত বিচিত্র মানুষই না পৃথিবীতে আছে।

লিলিয়ান লক্ষ করল, লোকটা তার দিকে আসছে। হাসিমুখেই আসছে। লিলিয়ানের চোখমুখ শক্ত হয়ে গেল। মুখে থুতু জমতে শুরু করল। মানুষটাকে কোনো কঠিন গালি দিতে পারলে মন শান্ত হত। লিলিয়ান জানে, তা সে পারবে না। সবাই সব কিছু পারে না। লিলিয়ান কাউকে কড়া কথা বলতে পারে না।

'আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবার জন্যে এসেছি।'

লিলিয়ান স্থির চোখে তাকাল, কিছু বলল না। লোকটা নরম গলায় বলল, 'আমি যখন প্রথম এ দেশে আসি, তখন একটা সস্তা ধরনের ক্যামেরা কিনে খুব ছবি তুলেছিলাম। যা দেখেছি, মুগ্ধ হয়ে তারই ছবি তুলেছি। মজার ব্যাপার হল, সব ছবি তুলেছি ক্যামেরায় ক্যাপ লাগিয়ে। আপনাকে দেখে পুরোনো স্মৃতি মনে পড়ল। আপনি কি আমেরিকায় নতুন এসেছেন?

'না।'

'ও আচ্ছা, তাহলে ক্যামেরা নতুন কিনেছেন। এ ধরনের ক্যামেরায় এই অসুবিধা হবেই। সুন্দর দৃশ্য দেখে উত্তেজিত হয়ে পড়বেন। ক্যামেরার ক্যাপ না খুলেই ছবি তুলবেন। আপনার যা করা উচিত তা হচ্ছে Single Lens Reflex ক্যামেরা কেনা। এরা বলে SLR।'

'আপনার অযাচিত উপদেশের জন্যে ধন্যবাদ। আমাকে দয়া করে একা থাকতে দিন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমি কি আপনাকে বিরক্ত করছি?'

'হ্যাঁ করছেন।'

লোকটা চলে গেল, কিন্তু লিলিয়ানের মনে হল সে আবার আসবে। সহজে তার সঙ্গ ছাড়বে না। এশিয়ান ছেলেগুলো মোটামুটি নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করে। সুন্দরী মেয়েদের সঙ্গে কথা বলার সামান্যতম সুযোগও এরা ছাড়ে না। এও ছাড়বে না। চেষ্টা চালিয়েই যাবে। লোকটার সঙ্গে কথা বলাই উচিত হয় নি।

লিলিয়ানের অনুমান মিথ্যা হল না। বিকেলে লিলিয়ানদের দলের সবাই বসে কফি খাচ্ছে। ছেলেটি উপস্থিত। লিলিয়ানের কাছে গিয়ে হাসিমুখে বলল, 'আমি আপনার জন্যে একটা ফিল্ম কিনে এনেছি।'

লিলিয়ান কঠিন মুখে বলল, 'কেন?'

'আমার কারণে আপনার ফিল্ম নষ্ট হয়েছে। আমি প্রথম থেকেই লক্ষ করেছিলাম। আমার উচিত ছিল আপনাকে সতর্ক করা। তা করি নি, উল্টা মজা পেয়ে হেসেছি। অবশ্যই অপরাধ করেছি, কাজেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করছি।'

লিলিয়ান কঠিন মুখে বলল, 'অপরাধ-টপরাধ কিছু না। আপনি আমার সঙ্গে গল্প করার লোভ সামলাতে পারছেন না। সুন্দর অজুহাত বানিয়ে এগিয়ে এসেছেন।'

'আপনি ভুল বললেন। নিজেকে খুব রূপবতী ভাবছেন বলে এই সমস্যা হয়েছে। আপনি হয়তো আপনার দেশে, কিংবা খোদ এই আমেরিকাতেই রূপবতী। কিন্তু আমাদের দেশের রূপের বিচারে রূপবতী নন।'

'আপনাদের দেশে রূপবতী হবার জন্যে কি গায়ের রং আপনার মতো কুচকুচে কালো হতে হয়?'

'তা না। আমাদের দেশে রূপবতী মেয়েদের প্রথম শর্ত হল — তাদের চোখ সুন্দর হতে হয়।'

'আমার চোখ সুন্দর না?'

'না। আপনার চোখের মণি নীল। আমাদের দেশে বাদামি বা নীল চোখের তারার মেয়েদের বলে বিড়াল-চোখা মেয়ে। এদের সহজে বর জোটে না। পুরুষরা এদের বিয়ে করতে চায় না।'

'কী অদ্ভুত কথা! আপনি কোন দেশের মানুষ?'

'দেশের নাম আপনাকে বলছি, কিন্তু দয়া করে দেশের নাম শুনে ঠোঁট উল্টে বলবেন না — 'এই দেশ আবার কোথায়?' এ জাতীয় কথা যখন কেউ বলে অসম্ভব রাগ লাগে। আমার দেশের নাম 'বাংলাদেশ'। নাম শুনেছেন?'

'না।'

'নাম না শোনার অপরাধ আমি ক্ষমা করলাম, যদিও ক্ষমা করা উচিত হচ্ছে না। যাই হোক, আমি কি আপনার পাশে বসতে পারি?'

'বিড়াল-চোখা মেয়ের পাশে বসে কী করবেন?'

'আপনার সঙ্গে এক কাপ কফি খাব, তারপর চলে যাব।'

'বসুন।'

'আপনার নাম কি জানতে পারি?'

'লিলিয়ান গ্রে।'

'আমার নিজের নামটা কি আপনাকে বলতে পারি?'

লিলিয়ান চুপ করে রইল। মানুষটার সাহস দেখে সে বিস্মিত হচ্ছে। লোকটা হাসিমুখে বলল, 'আমার নাম তাহের। আপনি যেমন লিলিয়ান গ্রে, তেমনি গায়ের রঙের সঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিলিয়ে আমাকে তাহের ব্ল্যাক বলে ডাকা যায়। আমি সম্প্রতি আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডাক্তারি পাস করেছি। আমার ফিল্ড অব স্পেশালাইজেশন হচ্ছে 'চোখ।' আমি ডাক্তারি পড়ছি, ভবিষ্যতে চোখের ডাক্তার হব।'

'ভালো।'

'চোখের ডাক্তার হিসেবে আপনার নীল চোখ সম্পর্কে আমি আপনাকে মজার একটা তথ্য দিতে পারি। তথ্যটা হচ্ছে — বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আপনার চোখ কিন্তু কালো হতে থাকবে, নীল থাকবে না।'

'কেন?'

'চোখের পিগমেন্টগুলি বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বড় হতে থাকে। চোখের রং নির্ভর করে পিগমেন্টের সাইজের উপর। সাইজ বড় হলে রঙ কালো হয়ে যাবে। এক ধরনের 'Tyndall effect.'

'কখন চোখ কালো হবে?'

'যখন বুড়ো হবেন তখন।'

'আপনি বলতে চাচ্ছেন বৃদ্ধ বয়সে আমি যদি আপনার দেশে যাই তাহলে আমাকে সবাই রূপবতী বলবে?'

তাহের হো-হো করে হাসতে লাগল। এমন হাসি যে লিলিয়ানদের দলের সবাই চোখ ঘুরিয়ে তাকাল। লিলিয়ান নিজেও খানিকটা অপ্রস্তুত বোধ করতে লাগল। হাসতে হাসতে তাহেরের চোখে পানি এসে গেল। সে রুমাল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বলল, 'সরি। আমি একটু বেশি হাসি। আমার হাসি-রোগ আছে। একবার হাসতে শুরু করলে থামতে পারি না। পুরো এক ঘণ্টা তেইশ মিনিট ক্রমাগত হাসার আমার একটা ব্যক্তিগত রেকর্ড আছে। গিনিস রেকর্ড কত তা অবশ্যি জানি না।'

'হাসি-রোগ ছাড়া আর কী রোগ আছে?'

'ঘুম-রোগ আছে।'

'ঘুম-রোগটা কী?'

'একবার ঘুমিয়ে পড়লে সহজে আমার ঘুম ভাঙে না।'

'খুব আন্‌কমন রোগ কিন্তু না। অনেকেরই এই রোগ আছে।'

'আমারটা আন্‌কমন। উদাহরণ দিলে বুঝতে পারবেন। দুবছর আগে আমি লস এন্‌জেল্‌সে ছিলাম। হোস্টেলে থাকি। একবার ভূমিকম্প হল। ভূমিকম্পের নিয়ম হচ্ছে প্রথম একটা ছোট দুলুনি হয় তারপর হয় বড় দুলুনি। প্রথম দুলুনির পর আমার বন্ধুবান্ধবরা আমার ঘুম ভাঙানোর প্রাণপণ চেষ্টা করল। কোনো লাভ হল না। শেষে ওরা আমাকে চ্যাংদোলা করে বাইরে নিয়ে ফুটপাতে শুইয়ে রাখল। আমার ঘুম ভেঙেছে ভোরে, জেগে দেখি আমি একটা হাইড্রেন্টের পাশে শুয়ে আছি।'

লিলিয়ান খিলখিল করে হেসে উঠল। লিলিয়ানের সঙ্গীরা আবারো ফিরে তাকাল। তাহের বলল, 'আমরা বোধহয় ওদের ডিসটার্ব করছি, একটু দূরে গেলে কেমন হয়?'

'ভালো হয় না। আমাদের যাত্রার সময় হয়ে গেছে। আমি এখন উঠব।'

'আমার সঙ্গে গাড়ি আছে। আমি আপনাকে পৌঁছে দিতে পারি।'

'ধন্যবাদ। অপরিচিত কারো গাড়িতে আমি চড়ি না।'

'শুরুতে অপরিচিত ছিলাম। এখন নিশ্চয়ই অপরিচিত না। আপনি আমার নাম জানেন। আমি আপনার নাম জানি।'

লিলিয়ান কঠিন মুখে বলল, 'আপনি শুধু শুধু আমার সঙ্গে ভাব জমানোর চেষ্টা করছেন। আপনার গাড়িতে আমি যাব না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লিলিয়ান তার সঙ্গীদের দিকে রওনা হল। একবার তার ইচ্ছা করল পেছন ফিরে মানুষটির মুখের বিব্রত ভঙ্গিটা দেখে। অনেক কষ্টে এই লোভ সে সামলাল। মনে মনে ভাবল — ভালো শিক্ষা হয়েছে। কাউকে শিক্ষা দেবার এটাই সবচে' ভালো টেকনিক। প্রথম কিছুটা প্রশ্রয় দিতে হয়, তারপর ছুড়ে ফেলতে হয় আঁস্তাকুড়ে। আশ্চর্য স্পর্ধা— ফিল্ম কিনে নিয়ে এসেছে! আড়াই ডলার দামের একটা উপহার কিনে মনে মনে ভেবেছে অনেকদূর এগিয়ে যাবে!

লিলিয়ান ডরমিটরিতে থাকে না। রুমিং হাউসে থাকে। রুমিং হাউসগুলো ইউনিভার্সিটির কোনো ব্যাপার না। ব্যক্তিমালিকানায় চলে। বাড়িওয়ালারা সস্তায় ভাড়া দেয়। রুমিং হাউসে শুধু থাকার ব্যবস্থা। রান্না করার ব্যবস্থা নেই, কারণ কিচেন নেই। কমন বাথরুম। মাসে চল্লিশ ডলারে এরচে' ভালো কিছু আশা করাও অবশ্যি অন্যায়। এরচে' বেশি খরচ করে ডরমিটরিতে জায়গা নেয়া লিলিয়ানের সাধ্যের বাইরে। পিকনিক করতে এসে পঞ্চাশ ডলার খরচ হয়ে গেছে। এই মাসটা তার কষ্টে যাবে। কয়েকটা বই কেনা দরকার। এ মাসে কেনা হবে না। ভেবেছিল মা'র জন্মদিন উপলক্ষে মা'কে লংডিসটেন্স কল করবে। তাও সম্ভব হবে না। তিন মিনিট কথা বলতেই লাগে আঠার ডলার। তা ছাড়া মা'র সঙ্গে তিন মিনিট কথা বলাও যাবে না। একবার টেলিফোন হাতে পেলে তিনি ছাড়বেন না। রাজ্যের কথা বলতে থাকবেন। লিলিয়ান যদি বলে — 'এখন রাখি মা, বিল উঠছে।' মা বলবেন — 'আর একটু, জরুরি কথাটাই বলা হয় নি। তোর পজার চাচা ঐদিন কী করেছে শোন। ঐ লোকটার আক্কেল বলে কোনো জিনিস এখনো হল না। এদিকে তার ডেনটিস্ট বলেছে তার নাকি তিনটা আক্কেল দাঁত। এমন কথা কি শুনেছিস কখনো — তিনটা আক্কেল দাঁত?'

বিছানায় এপাশ-ওপাশ করে লিলিয়ানের ঘুম এল শেষরাতে। ঘুম আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখল। সে অপরিচিত একটা নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে। বিশাল নদী। পানিতে কানায় কানায় ভর্তি। নদী, নদীর ওপাশে বন — সব জোছনায় থৈ থৈ করছে। হঠাৎ মাঝনদীতে কালোমতো কী দেখা গেল। স্রোতের প্রবল টানে ভেসে যাচ্ছে। লিলিয়ান দেখতে পাচ্ছে না তবু পরিষ্কার বুঝতে পারছে, নদীর স্রোতে যে জিনিসটা ভেসে যাচ্ছে তা একটা মৃতদেহ। মৃতদেহটা লিলিয়ানের চেনা। খুব চেনা। মৃত মানুষ প্রশ্নের জবাব দেয় না। তবু লিলিয়ান চিৎকার করে উঠল — 'কে কে কে?'

স্বপ্নে সবই সম্ভব। মৃতদেহ কথা বলল। অনেক কষ্টে পানির উপর উঠে বসল। ক্ষীণ গলায় বলল, 'লিলিয়ান আমি। ওরা আমাকে মেরে নদীতে ফেলে দিয়েছে। তুমি আমাকে বাঁচাও।'

লিলিয়ান আতংকে অস্থির হয়ে বলল, 'আমি কী করে তোমাকে বাঁচাব? তুমি তো মরেই গেছ।'

'বাঁচাও লিলিয়ান বাঁচাও। প্লিজ প্লিজ!'

এই সময় নদীর স্রোত বেড়ে গেল। জলের প্রবল টান উপস্থিত হল। শোঁ-শোঁ শব্দ হতে লাগল। মৃতদেহটি ভাটির দিকে তীব্র গতিতে ছুটে যাচ্ছে। অনেক অনেক দূর থেকে সে ডাকছে —'লিলিয়ান লিলিয়ান!'

লিলিয়ান নদীর পাড় ঘেঁষে ছুটতে শুরু করেছে। খানাখন্দ ঝোপঝাড় ভেঙে সে ছুটছে। মনে হচ্ছে সে আর দৌড়াতে পারবে না। হুমড়ি খেয়ে পড়বে। মৃতদেহ এখনো তাকে ডাকছে। মৃতদেহের কণ্ঠস্বর ক্ষীণ। সেই স্বর বাতাস ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। লিলিয়ানের কান পর্যন্ত পৌঁছাতে পারছে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই অবস্থায় লিলিয়ানের ঘুম ভাঙল। তার সমস্ত শরীর ঘামে ভিজে গেছে। জেগে ওঠার পরেও সে অনেকক্ষণ ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপল। তার ভয়ের অনেকগুলো কারণের একটি হচ্ছে, যে যুবকের মৃতদেহটি ভেসে যাচ্ছিল সেই যুবক তার চেনা। যুবকের নাম তাহের। দেখা হয়েছিল ইয়েলো স্টোন পার্কে। তার গায়ে ছিল হলুদ রঙের গলাবন্ধ স্যুয়েটার। স্বপ্নেও সেই একই স্যুয়েটার ছিল, তবে তার রং ছিল ধূসর।

তীব্র ভয় অনেকটা যেমন হঠাৎ আসে তেমনি হঠাৎই চলে যায়। রোদ উঠার সঙ্গে সঙ্গে লিলিয়ানের ভয় কেটে গেল। শুধু যে ভয় কাটল তাই না, হাসিও পেতে লাগল। তার মনে হল সে এমন কিছু ভয়ংকর স্বপ্ন দেখে নি। নদী দেখেছে। নদী কোনো ভয়ংকর জিনিস নয়। নদী দেখার কারণও আছে। আগের দিন পুরো সময়টা কাটিয়েছে ওল্ড ফেইথফুল হ্রদের তীরে। তাহের নামের ছেলেটিকে জড়িয়ে স্বপ্ন দেখেছে সেটাও স্বাভাবিক। তার সঙ্গে দেখা হয়েছে। সাক্ষাৎ পর্বও খুব সুখকর ছিল না। মস্তিষ্ক এই ব্যাপারগুলোই তার নিজের মতো করে সাজিয়েছে। লিলিয়ানের পরিষ্কার মনে আছে ছোটবেলায় সে যার সঙ্গেই ঝগড়া করত রাতে তাকেই স্বপ্ন দেখত। সেই স্বপ্নগুলোও হত ভয়ংকর।

লিলিয়ান ঠিক করল আজ ইউনিভার্সিটিতে যাবে না। আজ একটামাত্র ক্লাস। এই ক্লাস এমন জরুরি নয়। না করলে ক্ষতি হবে না। তারচে' বরং ক্যান্টিনে যাওয়া যাক। কোনো কাজ পাওয়া যায় কিনা সেই চেষ্টা করা যেতে পারে। চার-পাঁচ ঘণ্টা কাজ করতে পারলে — ইয়েলো স্টোন পার্কের খরচ কিছুটা উঠে আসবে।

ক্যান্টিনে কোনো কাজ পাওয়া গেল না। সে সুইমিং পুলের দিকে গেল। অকারণে যাওয়া। সাঁতার কাটতে হলে টিকিট লাগবে। তার টিকিট কাটার মতো ডলার নেই। কী অদ্ভুত দেশ এই আমেরিকা। কারো মুখে ডলার ছাড়া অন্য শব্দ নেই।

লিলিয়ান বেশ অনেকক্ষণ সুইমিং পুলে সাঁতার কাটা দেখল। তার কাছে সব সময় মনে হয় পৃথিবীর সবচে' সুন্দর দৃশ্যের একটি হচ্ছে মানুষের সাঁতারের দৃশ্য। মানুষ যদি উড়তে পারত তাহলে সেই দৃশ্য নিশ্চয়ই খুব সুন্দর হত।

লিলিয়ান স্যান্ডউইচ কিনে ইউনিভার্সিটি বোটানিক্যাল গার্ডেনের দিকে গেল। লাঞ্চ খাওয়ার জন্যে তার এখানে একটি প্রিয় জায়গা আছে। মেপল গাছের নিচের বাঁধানো বেদি। গাছের পাতা হলুদ হতে শুরু করেছে। কী সুন্দর লাগছে গাছটাকে। সে একা একা সন্ধ্যা পর্যন্ত গাছের নিচে বসে রইল। আরো কিছুক্ষণ বসত। শীত শীত করছে। স্যুয়েটারে শীত মানছে না। তা ছাড়া ঘুমও পাচ্ছে। পড়াশোনা করা দরকার। মনে হচ্ছে আজ পড়া হবে না। সকাল সকাল শুয়ে পড়তে হবে।

আশ্চর্য ব্যাপার, আজ রাতেও লিলিয়ানের ঘুম হল না। শেষরাতের দিকে তন্দ্রামতো হল। তন্দ্রায় দেখল দুঃস্বপ্ন। আগের রাতের স্বপ্নটাই অন্যভাবে দেখা। সে এবং তাহের দৌড়াচ্ছে। প্রাণপণে ছুটছে। তাদের তাড়া করছে ভয়ংকর কিছু মানুষ। তাহের বলছে, 'লিলিয়ান, আমার হাত ধর। আমি দৌড়াতে পারছি না। প্লিজ, আমার হাত ধর। প্লিজ।'

লিলিয়ান চিৎকার করে জেগে উঠল। নিজেকে শান্ত করতে তার সময় লাগল। হিটিং কয়েল দিয়ে গরম এক কাপ কফি খেয়ে মা'কে চিঠি লিখতে বসল।

মা,

আমার কি জানি হয়েছে — দুঃস্বপ্ন দেখছি। ভয়ংকর সব দুঃস্বপ্ন। আমার রাতে ঘুম হচ্ছে না। তুমি চার্চে গিয়ে আমার নামে দু'টা বাতি জ্বালিও...

এই পর্যন্ত লিখেই লিলিয়ান চিঠি ছিঁড়ে ফেলল। এ ধরনের চিঠি মা'কে দেয়ার কোনো মানে হয় না। তিনি শুধু শুধু দুশ্চিন্তায় পড়বেন। তাঁর হাঁপানির টান উঠে যাবে। সে নতুন একটি চিঠি লিখল। সেখানে খুব সুন্দর করে লেখা হল — ইয়েলো স্টোন পার্কে বেড়াতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাবার বর্ণনা। ইউনিভার্সিটি সুইমিং পুলে সাঁতারের আনন্দ বিবরণ।

ভোর সাতটায় সে তৈরি হল ইউনিভার্সিটিতে যাবার জন্যে। আয়নায় একবার নিজেকে দেখল। দুরাত ঘুম হয় নি। কিন্তু চেহারায় ক্লান্তির কোনো ছাপ নেই। তার নিজের কাছে মনে হল আজ তার চোখ অন্যদিনের চেয়েও অনেক উজ্জ্বল।

আজ লাঞ্চ আওয়ারের আগে কোনো ক্লাস নেই। কিন্তু টার্ম পেপার জমা দিতে হবে — লাইব্রেরিতে বইপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করতে হবে। বিরক্তিকর কাজগুলোর মধ্যে একটি। যে বইটি তার প্রয়োজন; দেখা যাবে সেটি ছাড়া সব বইই আছে।

একেকদিন একেকজনের ভাগ্য খুব ভালো থাকে। আজ লিলিয়ানের ভাগ্য খুবই ভালো। যে বইগুলি তার দরকার ছিল সবই সে পেয়ে গেল — বাড়তি পেল একটি মনোগ্রাফ — তার টার্ম পেপারের সঙ্গে মনোগ্রাফের কোনো বেশকম নেই। টুকে ফেললেই হয়। দুঘণ্টার মধ্যে টার্ম পেপার লেখা শেষ হল। লিলিয়ান কফি হাউসে কফি খেতে গেল। ঘুম ঘুম লাগছে। কফি খেয়ে ঘুম তাড়াতে হবে, নয়তো ক্লাস করা যাবে না।

কফি হাউস ছাত্রছাত্রীতে ঠাসা। এখন লাঞ্চ আওয়ার। কফি শপে এত ভিড় থাকার কথা নয়। আজ এত ভিড় কেন? আজ কি সস্তায় কফি দিচ্ছে? না, ফ্রি কফি দিচ্ছে। কফি হাউস মাঝে মাঝে কিছু কায়দা করে নোটিস দিয়ে দেয় — আজ বেলা ন'টা থেকে সাড়ে ন'টা পর্যন্ত ফ্রি কফি। ব্যবসার নতুন কোনো চাল। আজো এরকম কিছু হয়েছে বোধহয়। লিলিয়ান কফির মগ হাতে জায়গা খুঁজছে, তখন শুনল হাত উঁচিয়ে কে তাকে ডাকছে — 'হ্যালো লিলিয়ান, এদিকে এস, জায়গা আছে।'

লিলিয়ান তাকিয়ে দেখে, তাহের।

সে কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল — তারপর এগিয়ে গেল। তাহের হাসিমুখে বলল, 'এত তাড়াতাড়ি তোমার দেখা পাব ভাবি নি। তুমি কি এই ইউনিভার্সিটির ছাত্রী?'

'হ্যাঁ।'

'আমি যাচ্ছিলাম পাশ দিয়ে —কী মনে করে যে ঢুকেছি। তোমার সাবজেক্ট কী?'

'এনথ্রপলজি।'

'দাঁড়িয়ে আছ কেন — বোস। বোস।'

লিলিয়ান বসবে কিনা বুঝতে পারছে না। তার অস্বস্তি লাগছে। মনে হচ্ছে বসা ঠিক হবে না। এই মানুষটির সঙ্গে যোগাযোগের ফল শুভ হবে না। এর কাছ থেকে যত দূরে থাকা যায় ততই মঙ্গল। তাছাড়া এই লোক তার সঙ্গে এমন আন্তরিক ভঙ্গিতে কথা বলবে কেন? এই অধিকার তাকে কে দিয়েছে?

'তুমি কী খাবে? কফি? কফিতে ক্রিম থাকবে —না ব্ল্যাক কফি?'

'আমি কিছু খাব না।'

'কাপাচিনো কফি খাবে? প্রচুর ফেনা থাকে, একগাদা মিষ্টি দিয়ে বানানো হয়। দারুণ মজা। তুমি বোস। আমি নিয়ে আসছি।'

তাহের কফি নিয়ে ফিরে এসে দেখে লিলিয়ান শান্ত ভঙ্গিতে মাথা নিচু করে বসে আছে। মেয়েটিকে তার খুব অসহায় মনে হল। শুধু অসহায় না — ক্লান্ত, বিষণ্ণ। এই বয়সের মেয়েরা অনেক হাসিখুশি থাকে।

'কফি কেমন লাগছে?'

'বেশ মিষ্টি।'

'একেক ধরনের কফির একেক নিয়ম। এই কফি খেতে হয় প্রচুর মিষ্টি দিয়ে। তোমার কি মন খারাপ?'

'না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'দেখে মনে হচ্ছে খুব মন খারাপ।'

লিলিয়ান কিছু বলবে না ভেবেও বলে ফেলল, 'রাতে আমার ঘুম হয় নি।'

তাহের হেসে ফেলল। শব্দময় হাসি। আশপাশের টেবিল থেকে ছাত্রছাত্রীরা তাকাচ্ছে। অনেকের ভুরু কুঁচকে আছে। কোনো বিদেশি তাদের দেশের কফি শপে বসে সবাইকে অগ্রাহ্য করে এমন হাসি হাসবে তা বোধহয় এদের পছন্দ নয়।

তাহের লিলিয়ানের দিকে ঝুঁকে এসে বলল, 'শোন লিলিয়ান — মাঝে মাঝে রাতে ঘুম না হওয়াই সুস্থ মানুষের লক্ষণ। শুধুমাত্র পশুদেরই রাতে ঘুমের অসুবিধা হয় না। মানুষের হয়। আমাকে দেখ — আমি বিছানায় শোয়ামাত্র ঘুমিয়ে পড়ি। এ জন্যে নিজেকে পশু-পশু লাগে। হা-হা-হা।'

আবারো সেই হাসি। আবারো লোকজন চোখ ঘুরিয়ে তাকাচ্ছে। লিলিয়ান বলল, 'আমি উঠব। কফির জন্যে ধন্যবাদ।'

'আহা বস আর খানিকক্ষণ।'

'না না।'

'কাল তো ছুটি। এত তাড়া কীসের? এখান থেকে নব্বুই কিলোমিটার দূরে একটা পেট্রোফাইড ফরেস্ট আছে। পুরো জঙ্গল পাথর হয়ে আছে — আমি আগামীকাল যাব বলে ভাবছি। দিনে দিনে ফিরে আসা যাবে। তুমি কি আগ্রহী ?'

'না আমি আগ্রহী না। আমার বেড়াতে ভালো লাগে না।'

'ঐদিন ইয়েলো স্টোন পার্কে কিন্তু খুব বেড়াচ্ছিলে।'

'ঐদিন ভালো লেগেছিল। এখন লাগবে না।'

লিলিয়ান বের হচ্ছে। তাহের সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছে। তাকে মুখের উপর 'না' বলা হয়েছে তবু কোনো বিকার নেই। অদ্ভুত নির্লজ্জ ধরনের ছেলে তো। সাধারণত আমেরিকান ছেলেগুলো এরকম হয় —আঠার মতো লেগে থাকে। এ তো বিদেশি এক ছেলে। তার মান-অপমান বোধ আরো খানিকটা থাকা উচিত ছিল না?'

লিলিয়ান বলল, 'আর আসতে হবে না। আমি যাচ্ছি।'

তাহের বলল, 'আবার দেখা হবে। ভালো থাক — রাত জেগে জেগে তুমি যে উচ্চ শ্রেণীর মানব-সন্তান তা প্রমাণ করতে থাক। হা-হা-হা। ভালো কথা, তুমি কি আমার টেলিফোন নাম্বার রাখবে। রাতে দুঃস্বপ্ন দেখলে টেলিফোন করতে পার?'

'আমি অন্যের টেলিফোন নাম্বার রাখি না।'

'অন্যের টেলিফোন নাম্বারই তো রাখতে হয়। নিজেরটা তো মনেই থাকে। হা-হা-হা।'

'আমি যাচ্ছি।'

লিলিয়ান দ্রুত করিডোরে চলে এল। সে এমনিতেই দ্রুত হাঁটে, আজ আরো দ্রুত হাঁটছে। মেমোরিয়েল ইউনিয়নের বাইরে এসে হাঁফ ছাড়ল। পেছনে ফিরে তাকাল। তাহেরকে দেখা যাচ্ছে না। নাছোড়বান্দা হয়ে সে যে পেছনে পেছনে আসে নি — এতেই লিলিয়ান আনন্দিত।

লিলিয়ান তার অ্যাপার্টমেন্টে ফিরল না। কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে হাঁটতে বের হল। আজ সারাদিন সে হাঁটবে। হেঁটে হেঁটে এমন ক্লান্ত হবে যে বিছানায় শোয়ামাত্র ঘুমিয়ে পড়বে। ঘুমাতে যাবার আগে হট শাওয়ার নেবে। এক গ্লাস আগুন গরম দুধ খাবে। বিছানায় নতুন চাদর বিছিয়ে রাখবে। তার ঘুমের সমস্যা আছে। এক রাত ঘুম না হলে পরপর কয়েক রাত ঘুম হয় না।

বেশিক্ষণ হাঁটতে হল না। অল্প হেঁটেই লিলিয়ান ক্লান্ত হয়ে পড়ল। মলগুলোতে ঘুরতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখন আর ভালো লাগছে না। ইচ্ছা করছে অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে বিছানায় শুয়ে পড়তে। এখন বিছানায় যাওয়াটা হবে বিপজ্জনক। খানিকক্ষণ ঘুম হবে, কিন্তু রাতটা কাটবে অঘুমে। লিলিয়ান স্যান্ডউইচ কিনল। পার্কে বসে একা একা খেল। একা একা খাওয়া খুব কষ্টের। খাবার সময় একজন কেউ পাশে থাকা দরকার। যে প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে কথা বলবে। হাসবে। লিলিয়ানের এমন কেউ নেই। কোনোদিন কি হবে? প্রিয় একজন কি থাকবে পাশে? কে হবে সেই মানুষটি? চার্চের পাদ্রী মাথায় হলি ওয়াটার ছিটিয়ে, বুকে ক্রস স্পর্শ করে বলবেন —

তোমাদের দুজনকে আমি স্বামী-স্ত্রী হিসেবে ঘোষণা করলাম। মৃত্যু এসে তোমাদের বিচ্ছিন্ন না করা পর্যন্ত একজন থাকবে অন্যের পাশে, সুখে-দুঃখে, আনন্দে-বেদনায়। Till at the point of death do you part.

লিলিয়ানের চোখে পানি এসে যাচ্ছে। সে পার্কের অপরূপ দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করল। মন শান্ত হচ্ছে না। সে এক ধরনের হাহাকার বোধ করছে — মনে হচ্ছে এই অপরূপ দৃশ্য একা দেখার নয়। দুজনে মিলে দেখার।

লিলিয়ান অ্যাপার্টমেন্টে ফিরল সন্ধ্যা মিলাবার পর। ক্লান্তিতে তার শরীর ভেঙে পড়ছে। মনে হচ্ছে এক সেকেন্ডও সে জেগে থাকতে পারবে না। হট শাওয়ার নেয়া, গরম দুধ খাওয়া, বিছানার চাদর বদলানো — কিছুই তার পক্ষে সম্ভব নয়। সে দরজা বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে পড়ল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ল। গাঢ় গভীর ঘুম। যে ঘুমের সময় মানুষ মানুষ থাকে না, পাথরের মতো হয়ে যায়। গভীর ঘুমের স্বপ্নগুলো অন্যরকম হয়। স্বপ্ন আর স্বপ্ন থাকে না। বাস্তবের কাছাকাছি চলে যায়। হালকা ঘুমের স্বপ্নগুলো হয় হালকা, অস্পষ্ট কিছু লজিকবিহীন এলোমেলো ছবি। গাঢ় ঘুমের স্বপ্ন স্পষ্ট, যুক্তিনির্ভর।

আজ লিলিয়ান দেখল গাঢ় ঘুমের স্বপ্ন। স্বপ্নে সে এবং তাহের দুজন পাশাপাশি শুয়ে আছে। তাহের ঘুমাচ্ছে, সে জেগে আছে। ঘুমের মধ্যে তাহের অস্ফুট শব্দ করল। লিলিয়ান হাত রাখল তাহেরের গায়ে। হাত ভেজা-ভেজা লাগছে। সে চোখের সামনে হাত মেলে ধরল। হাত রক্তে লাল। সে চেঁচিয়ে উঠল। লিলিয়ানের ঘুম ভাঙল নিজের চিৎকারে। বাকি রাত সে ঘুমাল না — জেগে বসে রইল। ভোরবেলা টেলিফোন করল মা'কে —

'কেমন আছ মা?'

'আমি ভালো আছি। তোর গলা এমন শোনাচ্ছে কেন? তোর কী হয়েছে?'

'ক'দিন ধরে আমি খুব দুঃস্বপ্ন দেখছি।'

'কী দুঃস্বপ্ন?'

'ভয়ঙ্কর সব দুঃস্বপ্ন। একটা বিদেশি ছেলেকে নিয়ে দুঃস্বপ্ন।'

'এ ছেলের সঙ্গে কি তোর পরিচয় আছে?'

'না। দুদিন কথা হয়েছে।'

'কী রকম কথা?'

'সাধারণ কথা মা। তেমন কিছু না।'

'ছেলেটার মধ্যে নিশ্চয়ই এমন কিছু আছে যা দেখে তুই ভয় পেয়েছিস।'

'তেমন কিছু নেই মা। ভালো ছেলে।'

'দুদিনের আলাপে কী করে বুঝলি ভালো ছেলে?'

লিলিয়ান জবাব দিল না। তার মা কয়েকবার বললেন, 'হ্যালো — হ্যালো লিলিয়ান শুনতে পাচ্ছিস? আমি তো কিছুই শুনতে পাচ্ছি না — হ্যালো হ্যালো!'

লিলিয়ানের সবচে' ছোটবোন রওনি কাঁদছে। রান্নাঘরে মা নিশ্চয়ই কল ছেড়ে রেখেছে — পানি পড়ার শব্দ আসছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'হ্যালো লিলিয়ান! হ্যালো.... টেলিফোনটায় কী হল কিছু শুনতে পারছি না!'

লিলিয়ান বলল, 'মা, রওনি কাঁদছে তুমি ওকে দেখ — আমি টেলিফোন রাখলাম...'

'না না। টেলিফোন রাখিস না। তুই আমার কথা শোন মা... তুই একজন ভালো ডাক্তার দেখা। টাকা যা লাগে লাগুক...আমি যে ভাবেই হোক ডলার পাঠাব। কিছুদিন পরপর তুই এমন দুঃস্বপ্ন দেখিস, এটা তো ভালো কথা না।'

'টেলিফোন রাখলাম মা।'

'না না না...'

লিলিয়ান টেলিফোন রাখল না। কানে লাগিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। এখনো রওনির কান্না শোনা যাচ্ছে। বাথরুমের ট্যাপ দিয়ে পানি পড়ার শব্দ আসছে, কেউ একজন বোধহয় এসেছে তাদের বাড়িতে। কলিং বেল টিপছে...ক্রমাগত বেল বাজছে। লিলিয়ানের মা কাঁদো-কাঁদো গলায় বলে যাচ্ছেন, 'হ্যালো লিলিয়ান, হ্যালো! কী হল টেলিফোনটায় — কোনো কথা শুনতে পাচ্ছি না। অপারেটর হ্যালো অপারেটর...'

লিলিয়ান মা'র কথা অগ্রাহ্য করল না। কোনোদিন করেও না। সে একজন সাইকিয়াট্রিস্টের সঙ্গে কথা বলতে গেল। ইউনিভার্সিটির সাইকিয়াট্রিস্ট। এরা বলে স্টুডেন্ট কাউন্সিলার। ছাত্রছাত্রীদের নানান ধরনের সমস্যা নিয়ে এঁরা কথা বলেন। এক সময় ছাত্রছাত্রীদের সমস্যা ছিল পড়াশোনাকেন্দ্রিক —কোর্স ভালো লাগছে না, গ্রেড খারাপ হচ্ছে এই জাতীয়। এখনকার সমস্যা বেশির ভাগই মানসিক। যে কারণে স্টুডেন্ট কাউন্সিলারদের মধ্যে অন্তত একজন থাকেন সাইকিয়াট্রিস্ট।

লিলিয়ান যার কাছে গেল তাঁর নাম ভারমান। ডঃ এঙ্গেলস ভারমান। ভদ্রলোক ভারিক্কি ধরনের বেঁটেখাটো মানুষ। তাঁর মুখ ভর্তি দাড়ি-গোঁফ। চুল-দাড়ি সবই পাকা। ফর্সা গায়ের রঙের সঙ্গে চুলের রং মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমাটা ঝুলে আছে নাকের উপর। ভদ্রলোক তাকাল চশমার ফ্রেমের উপর দিয়ে। লিলিয়ানের মনে হল — ভদ্রলোকের চোখ সুন্দর। তিনি তাকাচ্ছেন মমতা নিয়ে। ডাক্তাররা যখন রোগীর দিকে তাকান তখন রোগটাকে দেখার চেষ্টা করেন, মানুষটাকে নয়। এই ডাক্তার মানুষটাকে দেখার চেষ্টা করছেন।

লিলিয়ান বলল, 'গুড মর্নিং ডঃ এঙ্গেলস ভারমান।'

'গুড মর্নিং লিটল মিস।'

'আমার নাম লিলিয়ান।'

'গুড মর্নিং লিটল মিস লিলিয়ান।'

'গুড মর্নিং স্যার।'

'বল তো লিলিয়ান, তুমি কেমন আছ?'

'আমি খুব ভালো নেই।'

'শুনে খুশি হলাম। সারাক্ষণ ভালো থাকা কোনো কাজের কথা না — তোমরা যদি সারাক্ষণ ভালো থাক তাহলে আমরা কী করব? তোমার সমস্যা কী তা এখন বল। সহজভাবে বল। খোলাখুলি বল।'

'আমার ঘুম হচ্ছে না।'

'এটা কোনো সমস্যাই না। ঘুম না হলে এক লক্ষ ধরনের ঘুমের ওষুধ আছে — আর কী সমস্যা?'

'ঘুমালেই দুঃস্বপ্ন দেখি।'

'তুমি তো ভালো আছ, ঘুমিয়ে দুঃস্বপ্ন দেখ। আমি দেখি জেগে জেগে। চারদিকে যা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখছি সবই দুঃস্বপ্ন। গতকাল কি হয়েছে শোন — সাবওয়ে দিয়ে আসছি, আমার চোখের সামনে একজন মহিলার ব্যাগ এক কালো ছোকরা ছিনিয়ে নিয়ে দৌড়ে পালাল। এতগুলি লোক আমরা কেউ কোনো কথা বললাম না। সবাই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম। এটা কি বড় ধরনের দুঃস্বপ্ন না?'

'আপনিও কিছু বলেন নি?'

'না। আমি হচ্ছি অবজারভার, আমি বসে বসে দেখেছি।'

লিলিয়ান বলল, 'অন্যরাও হয়তো আপনার মতো কোনো অজুহাত তৈরি করে বসে ছিল।'

ডঃ এঙ্গেলস ভারমান হাসতে হাসতে বললেন, 'তুমি বুদ্ধিমতী মেয়ে। তোমার কোনো সমস্যা থাকার কথা না। সমস্যা হয় কম বুদ্ধিমান মানুষদের। এরা কিছু বুঝতে চায় না। কিন্তু তুমি বুঝবে। যুক্তি দিয়ে বোঝালে বুঝবে। এখন সুন্দর করে তোমার সমস্যা বল। নাকি বলার আগে কফি খেয়ে নেবে?'

'কফি খাব।'

'ঐ টেবিলে কফি-মেকার আছে। তোমার জন্যে আন এবং আমার জন্যে আন। কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে তোমার সমস্যার কথা বল। আমার বদভ্যাস হচ্ছে, আমি চশমার ফাঁক দিয়ে তাকাই। আশা করি এতে কোনো সমস্যা হবে না। কারণ আমার চোখ খুব সুন্দর। ঠিক বলি নি?'

'জ্বি ঠিক বলেছেন।'

লিলিয়ান খুব গুছিয়ে তার সমস্যার কথা বলল। ডঃ ভারমান কোনো প্রশ্ন করলেন না। চুপচাপ শুনে গেলেন। এক ফাঁকে উঠে গিয়ে আবার কফির পেয়ালা ভর্তি করে আনলেন। লিলিয়ান কথা শেষ করবার পর ডঃ ভারমান মুখ খুললেন। তিনি নরম গলায় বললেন, 'তোমার পরিবারে লোকসংখ্যা কত?'

'অনেক। আমাদের যৌথ পরিবার। আমার দু'চাচা এবং বাবা...এরা তিন ভাই একসঙ্গে থাকেন।'

'একত্রে রান্না হয়?'

'হ্যাঁ, একসঙ্গে রান্না হয়। তবে আমাদের পজার চাচা কিছুদিন পরপর রাগ করে বলেন এখন থেকে তিনি আলাদা রান্নাবান্না করবেন। কারো সঙ্গে তাঁর কোনো যোগাযোগ নেই। দু'একদিন আলাদা রান্না হয়; তারপর আবার আগের জায়গায় ফিরে আসেন।'

'তোমাদের চাচাদের মধ্যে কি খুব মিল?'

'মোটেও মিল নেই। সারাক্ষণ তাঁরা ঝগড়া করছেন, কিন্তু তারপরেও একজন অন্যজনদের ছাড়া থাকতে পারেন না। আমার মনে হয় ঝগড়া করার জন্যেই তাঁদের একসঙ্গে থাকা প্রয়োজন। ব্যাপারটা বেশ মজার।'

'তুমিই প্রথম বাইরে পড়তে এসেছ?'

'জ্বি।'

'তুমি যখন বিদেশে রওনা হলে তখন তোমার পরিবারের সদস্যরা কী করল?'

'সবাই খুব কাঁদল। আমার পজার চাচা পুরো এক দিন এক রাত না খেয়ে দরজা-জানালা বন্ধ করে ঘরে বসে ছিলেন। অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাঁকে খাওয়ানো হয়।'

ডাঃ ভারমান পাইপ ধরাতে ধরাতে বললেন, 'তোমার সমস্যার মূল কারণ হচ্ছে তোমার পরিবার। তুমি এমন এক ক্লোজ পরিবার থেকে এসেছ, যে পরিবারের সদস্যরা ভালবাসার কঠিন জালে তোমাকে আটকে রেখেছে। তুমি জাল ছিঁড়তে চাচ্ছ — পারছ না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আপনি ভুল বললেন — আমি জাল ছিঁড়তে চাচ্ছি না।'

'তুমি চাচ্ছ কিন্তু তোমার মন তাতে সায় দিচ্ছে না। তোমার মনে একই সঙ্গে দুটি বিপরীত ধারা কাজ করছে। একটি ধারা তোমাকে জাল কেটে বেরিয়ে আসতে বলছে, অন্যটি তা করতে দিচ্ছে না। এতে মনে প্রচণ্ড চাপ পড়ছে।'

'এর সঙ্গে আমার দুঃস্বপ্নের সম্পর্ক কী? আমি দুঃস্বপ্ন দেখছি অন্য একজনকে নিয়ে।'

'সম্পর্ক আছে —। ঐ ছেলেটিকে দেখেই তোমার জাল কেটে বেরিয়ে আসবার কথা মনে হল। তোমার মনের একটি অংশ তাতে সায় দিল না। সৃষ্টি হল প্রচণ্ড চাপের। দুঃস্বপ্নগুলো চাপের ফল, আর কিছুই না। ছেলেটিকে তোমার খুব ভালো লেগে গেছে তুমি তা স্বীকার করতে চাচ্ছ না।'

'ছেলেটিকে ভালো লাগার কিছু নেই।'

'আমার ধারণা আছে। তুমি তোমার পরিবারের সদস্যদের মধ্যে কাকে সবচে' ভালবাস?'

'পজার চাচাকে।'

'চিন্তা করে দেখ তো পজার চাচার স্বভাব-চরিত্রের সঙ্গে তোমার ঐ ছেলেটির স্বভাব-চরিত্রের কোন কোন মিল আছে?'

'কোনো মিল নেই।'

'ভালো করে চিন্তা কর। আমার ধারণা মিল আছে।'

'পজার চাচা অকারণে হো-হো করে হাসেন। ঐ ছেলেটিও হাসে।'

'আর?'

'এইসব নিয়ে ভাবতে আমার ভালো লাগছে না।'

'আমি যে তোমার সমস্যাটা ধরিয়ে দিয়েছি তা কি বুঝতে পেরেছ?'

লিলিয়ান জবাব দিল না। ডাঃ ভারমান হাসলেন। লিলিয়ান বলল, 'আমাকে আপনি কী করতে বলেন ?'

'উপদেশ চাচ্ছ ?'

'হ্যাঁ।'

'আমি তোমাকে কোনো উপদেশ দেব না। তুমি কী করবে না করবে তা তোমার ব্যাপার। আমি সমস্যা ধরিয়ে দিয়েছি। সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব তোমার। কারণ সমস্যাটা তোমার, আমার নয়।'

লিলিয়ান উঠে দাঁড়াল। ফিরে গেল অ্যাপার্টমেন্টে। প্রায় এক ঘণ্টার মতো চুপচাপ বিছানায় শুয়ে রইল। তারপর উঠে হাতে-মুখে পানি ছিটাল। সে তার সবচে' সুন্দর পোশাকটা পরল। অনেক সময় নিয়ে চুল আঁচড়াল। তার সম্বল অল্প কিছু ডলারের সব ক'টা সঙ্গে নিয়ে বেরুল। সে তাহেরকে খুঁজে বের করবে। এই শহরের মেডিক্যাল স্কুলের একজন বিদেশি ছাত্রের ঠিকানা বের করা কঠিন হবার কথা না। তবে লিলিয়ান প্রথমে গেল ডাউন টাউনের এক ফুলের দোকানে। দশ ডলার দিয়ে সে পঁচিশটা চমৎকার গোলাপ কিনল। আধ-ফোটা গোলাপ। আগুনের মতো টকটকে রং। চিরকাল ছেলেরাই মেয়েদের জন্যে ফুল কিনেছে। মাঝেমধ্যে নিয়মের হেরফের হলে কিছু যায়-আসে না।

কলিং বেল টেপার সঙ্গে সঙ্গেই দরজা খুলে গেল। তাহের খুব স্বাভাবিক গলায় বলল, 'এস লিলিয়ান।' তার কথা বলার ভঙ্গি থেকে মনে হওয়া অস্বাভাবিক না যে সে লিলিয়ানের জন্যেই অপেক্ষা করছিল।

লিলিয়ান বলল, 'আমি যে এখানে আসব তা কি আপনি জানতেন?'

তাহের বলল, 'জানব কী করে — আগে তো বল নি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমাকে দেখে অবাক হন নি?'

'আমি এত সহজে অবাক হই না। ছোটবেলায় বাবার সঙ্গে রিকশা করে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ বাবা রিকশা থেকে পড়ে গেলেন। নেমে গিয়ে দেখি মরে পড়ে আছেন। সেই থেকে অবাক হওয়া ছেড়ে দিয়েছি।'

লিলিয়ানের চোখে-মুখে হকচকিত ভাব। তার ফর্সা কপাল ঘামছে। হাতের গোলাপগুলো নিয়েও সে বিব্রত। তাহের বলল, 'ফুলগুলো কি আমার জন্যে?'

'হুঁ।'

'দাও আমার হাতে। তুমি বোস।'

'না।'

'দাঁড়িয়ে থাকার জন্যে এসেছ?'

লিলিয়ান কী বলবে বুঝতে পারছে না। সত্যি তো সে কী জন্যে এসেছে? কেনই বা এসেছে? সে তাকাল চারদিকে। অবিবাহিত পুরুষের ঘর। একপলকেই বোঝা যায়। টেবিলে বা দেয়ালে কোনো তরুণীর ছবি নেই। এটা একটা বড় ব্যাপার। বিছানার কাছে পিন-আপ পত্রিকা নেই। লিলিয়ান ক্ষীণ গলায় বলল, 'আমি এখন চলে যাব।'

'চলে যাবে ভালো কথা — চলে যাও। হঠাৎ করে একগাদা ফুল নিয়ে এসে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে চলে যাওয়া ভালো।'

'আপনাকে বিব্রত করার জন্যে আমি দুঃখিত।'

'আমি মোটেও বিব্রত হই নি। বিস্মিত হচ্ছি। অন্যদের বিস্ময় যেমন চোখে মুখে ফুটে ওঠে আমার বেলায় তা হয় না বলেই তোমার কাছে মনে হচ্ছে আমি পুরো ব্যাপারটা খুব সহজভাবে নিচ্ছি। আসলে তা না।...আমার ঠিকানা কোথায় পেলে?'

'জোগাড় করেছি।'

'কেন?'

লিলিয়ান চুপ করে রইল। তাহেরের মনে হল এই মেয়ে আর কোনো প্রশ্নের জবাব দেবে না। মেয়েটিকে সহজ করার কোনো পথও সে খুঁজে পাচ্ছে না। কী বললে সে সহজ হবে?

'লিলিয়ান তুমি কি পেট্রিফায়েড ফরেস্টটা দেখতে চাও? ঐদিন আমি যাই নি। তুমি যেতে চাইলে আজ যেতে পারি। সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় চলে আসতে পারব।'

'আমি আমার অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে যাব।'

'বেশ তো ফিরে যাবে। আমি তোমাকে পৌঁছে দেব।'

'আপনাকে পৌঁছে দিতে হবে না।'

'তুমি লক্ষ কর নি বোধহয় বাইরে খুব ঠাণ্ডা পড়েছে। এই ঠাণ্ডায় তুমি এমন পাতলা কাপড় পরে কী করে এসেছ সেও এক রহস্য। তুমি আমার সঙ্গে যেতে না চাইলে একাই যাবে — আমার একটা ওভারকোট আছে; সেটা গায়ে চাপিয়ে চলে যেতে পারবে। নাকি আমার ওভারকোটও গায়ে দেবে না?'

লিলিয়ান বসল। সে যে বসেছে তাতে সে নিজেও অবাক হয়েছে। তার কাছে মনে হচ্ছে পুরো ব্যাপারটা স্বপ্নে ঘটছে। সে নিজের ইচ্ছেতে কিছু করছে না। যা তাকে করতে বলা হচ্ছে তাই সে করছে। পুরো ঘটনা অন্য কেউ ঘটাচ্ছে। সে অন্য কেউটা কে?

'লিলিয়ান।'

'হুঁ।'

'কফি খাবে?'

'হুঁ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'শুনে খুশি হলাম। আমি কফি তৈরি করছি। তুমি সহজ এবং স্বাভাবিক হতে চেষ্টা কর। তারপর তোমার কাছে কয়েকটা জিনিস জেনে নেব। যা যা জানতে চাই তাও বলে নিচ্ছি — এক, হঠাৎ তুমি একগাদা ফুল নিয়ে আমার কাছে কেন এসেছ? দুই, আজ যে আমার জন্মদিন তা কি তুমি জান? যদি জান তাহলে কীভাবে জান?'

লিলিয়ান বিস্মিত হয়ে বলল, 'আজ আপনার জন্মদিন?'

তাহের বলল, 'আমি দ্বিতীয় প্রশ্নটির জবাব পেয়ে গেছি। আজ যে আমার জন্মদিন তা তুমি জান না। এখন বাকি রইল প্রথম প্রশ্ন। তুমি প্রশ্নটির জবাব নিয়ে ভাবতে থাক। আমি একটু গ্রোসারি শপে যাব। ঘরে কফি, চিনি, ক্রিম কিছুই নেই।'

'আমি কি আপনার এখান থেকে একটা টেলিফোন করতে পারি?'

'হ্যাঁ পার।'

'একটা লং ডিসটেন্স কল করব।'

'একটা কেন, দশটা কর। তুমি আমার এখানে আসায় আমি নিজে যে কী পরিমাণ খুশি হয়েছি তা কোনোদিন তুমি বুঝবে না। 'প্রথম দেখাতেই ভালবাসা' — এই জাতীয় কিছু কথা সাহিত্যে প্রচলিত আছে। এই জাতীয় বায়বীয় কথা আমি কখনো বিশ্বাস করতাম না। তোমাকে ওল্ড ফেইথফুল লেকের কাছে দেখে প্রথম মনে হল — সাহিত্যের এই কথাটা মিথ্যা না। মেয়েদের পেছনে ঘোরা আমার স্বভাব নয়। তারপরেও আমি খুঁজে খুঁজে তোমার অ্যাপার্টমেন্ট বের করেছি। ঐদিন তোমার সঙ্গে ইউনিভার্সিটিতে দেখা হল। তোমার বোধহয় ধারণা পুরো ব্যাপারটা কাকতালীয়। আসলে তা না। আমি প্রায়ই তোমাদের মেমোরিয়াল ইউনিয়নে বসে থাকতাম এই আশায় যে তোমার সঙ্গে দেখা হবে। দেখা হলেই বলব, পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম... কবে কোথায় কোন রুমে তোমার ক্লাস তাও আমি জানি — প্রমাণ দেব?'

লিলিয়ান তাকিয়ে আছে, কিছু বলছে না। তাহের আগের মতোই সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলল, 'আজ ছিল তোমার টার্ম পেপার জমা দেয়ার শেষ দিন। আমি কি ঠিক বলেছি?'

লিলিয়ান অন্যদিকে তাকিয়ে হাসল। তাহের বলল, 'আমি কফি নিয়ে আসতে যাচ্ছি। আমার আসতে খানিকটা দেরি হবে। আমার জন্মদিন উপলক্ষে একটা ভালো হোটেলে আমি তোমাকে নিয়ে খেতে যাব। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবার কোনো কারণ নেই। খাওয়ার শেষে আমি তোমাকে তোমার অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছে দেব। তুমি যে এসেছ এতেই আমি খুশি। এর বেশি আমি কিছু আশা করি নি। যা হয়েছে তাই যথেষ্ট। যদিও জানি না — ঘটনা এমন কেন ঘটল। ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই আছে। তোমার ইচ্ছা করলে তুমি ব্যাখ্যা করবে। ইচ্ছা না করলে করতে হবে না।'

তাহের ঘর ছেড়ে চলে গেল। লিলিয়ান উঠে দরজা বন্ধ করল। টেলিফোন করল তার মা'কে। লিলিয়ানের মা আতঙ্ক মেশানো গলায় বললেন, 'আমি এর মধ্যে তিনবার তোর অ্যাপার্টমেন্টে টেলিফোন করেছি। আমরা চিন্তায় অস্থির।'

'চিন্তার কিছু নেই মা।'

'তুই কি গিয়েছিলি কোনো ডাক্তারের কাছে?'

'হ্যাঁ।'

'ডাক্তার কী বললেন?'

'ডাক্তার নতুন কিছু বলেন নি। আমি যা জানতাম তাই বলেছেন।'

'আমি তোর কথা কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। তুই কী জানতি?'

লিলিয়ান হাসল। শব্দ করে হাসল। লিলিয়ানের মা বললেন, 'কী হল, হাসছিস কেন?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'হাসি আসছে তাই হাসছি!'

'তুই এখন কোথায়?'

'কেন, আমার অ্যাপার্টমেন্টে!'

'না, তুই অন্য কোনো জায়গায়।'

'কী করে বুঝলে?'

'আমি জানি। আমার মন বলছে। তুই কি ঐ ছেলেটির কাছে?'

'হ্যাঁ।'

'কেন — ঐখানে কেন? কী হচ্ছে লিলিয়ান?'

'ভয়ের কিছু নেই মা।'

'অবশ্যই ভয়ের কিছু। তুই কেন ঐ ছেলের কাছে গেলি?'

লিলিয়ান খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। ওপাশ থেকে ভদ্রমহিলা বার বার বলতে লাগলেন —'হ্যালো হ্যালো!'

'মা শোন, আমি খুব সম্ভব এই ভদ্রলোককে বিয়ে করব।'

'কী বলছিস তুই!'

'আমি এখনো জানি না। ভদ্রলোক এখানে নেই। তিনি কফি কিনতে গিয়েছেন। ফিরে এলেই তাঁকে বলব।'

'কী বলবি?'

'বলব যে আমি আপনাকে বিয়ে করতে চাই। যদি রাজি থাকেন তবেই শুধু আপনার সঙ্গে কফি খাব, এবং রাতে ডিনার করতে যাব।'

'হা ঈশ্বর! মা তুই কী বলছিস? তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে মা। আমি নিশ্চিত তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।'

'অস্থির হয়ো না মা। আমার মাথা খারাপ হয় নি। মাথা ঠিক আছে। আর এক্ষুনি তোমাদের চিন্তিত হতে হবে না। হয়তো বিয়েতে ভদ্রলোক রাজি হবেন না। হয়তো বলবেন — তিনি বিবাহিত।'

'লোকটা বিবাহিত কিনা তাও তুই জানিস না!'

'না।'

'হা ঈশ্বর! এসব কী শুনছি!'

'কথায় কথায় হা ঈশ্বর বলবে না মা। শুনতে ভালো লাগছে না।'

'লিলিয়ান লক্ষ্মী মা, তুই দেশে চলে আয়। তোকে পড়াশোনা করতে হবে না।'

'কাঁদছ কেন মা! আমি তো ভয়ংকর কিছু করছি না!'

'তুই তোর পজার চাচার সঙ্গে কথা বল।'

'আমি এখন কারো সঙ্গে কথা বলব না!'

'তোর বাবার সঙ্গে কথা বল।'

'বললাম তো মা, আমি এখন কারো সঙ্গে কথা বলব না।'

'হা ঈশ্বর! আমি এ কী শুনছি!'

লিলিয়ান শান্ত স্বরে বলল, 'ঈশ্বরের প্রতি তোমার অবিচল ভক্তি। কাজেই তুমি ধরে নাও — যা হচ্ছে ঈশ্বরের ইচ্ছার অগোচরে হচ্ছে না।'

'লিলিয়ান, মা লিলিয়ান...'

'টেলিফোন রাখছি মা। তুমি ভালো থেকো।'

লিলিয়ানের মা চিৎকার করে কাঁদতে লাগলেন। লিলিয়ান জানালার পাশে দাঁড়াল। বরফ পড়তে শুরু করেছে — বছরের প্রথম বরফ। ইচ্ছে করছে বরফের ভেতর ছুটে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেতে। সারা গায়ে বরফ মাখতে। লিলিয়ান খানিকক্ষণ বরফ পড়া দেখল। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার জন্যেই বোধহয় তার চোখ জ্বালা করছে। সে বাথরুমে ঢুকে চোখে পানি দিয়ে কিছুক্ষণ কাঁদল। ফিসফিস করে বলল, মা রাগ করো না। আমি কী করছি আমি নিজেও জানি না। এর ফল শুভ হবে, কি শুভ হবে না তাও জানি না। শুধু একটা জিনিস জানি — আমৃত্যু আমাকে অচেনা-অজানা এই ছেলেটির সঙ্গে থাকতে হবে। এর থেকে আমার মুক্তি নেই। কিংবা কে জানে, আমার মুক্তি হয়তো বন্ধনের ভেতরই ঘটবে।

দরজায় কলিং বেল বাজছে। লিলিয়ান দরজা খুলে দিল। তাহের মুগ্ধ গলায় বলল, 'বাইরে বরফ পড়ছে দেখেছ?'

'হ্যাঁ।'

'গায়ে বরফ মাখবে?'

'হ্যাঁ মাখব।'

'বাহ্ চমৎকার! আমাদের দেশে বরফ নেই, তবে বৃষ্টি আছে। বছরের প্রথম বৃষ্টি হলে আমরা বৃষ্টিতে ভিজি, এতে গায়ের ঘামাচি নষ্ট হয়। বরফে কিছু নষ্ট হয় কিনা কে জানে।'

'তোমাদের দেশের বৃষ্টি কি তুষারপাতের চেয়েও সুন্দর?'

'লক্ষ গুণ সুন্দর। আমাদের দেশের প্রথম বৃষ্টিতে কী হয় জান — এক ধরনের মাছ আছে — নাম হল কৈ মাছ। এরা এত আনন্দিত হয় যে দল বেঁধে পানি ছেড়ে শুকনায় উঠে আসে।'

'কেন আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ?'

'মোটেই ঠাট্টা করছি না। তোমাকে আমি দেশে নিয়ে গিয়ে নিজের চোখে দেখাব। তখন তুমি...'

তাহের কথা শেষ করল না, থেমে গেল। বিব্রত চোখে লিলিয়ানের দিকে তাকাল। লিলিয়ানও তাকিয়ে আছে। লিলিয়ানের চোখে চাপা দ্যুতি।

AMARBOI.COM

২

ওদের বিয়ে হতে দশ দিন লাগল। বিয়ের লাইসেন্স বের করা এদেশে অনেক যন্ত্রণা। অনেক টেস্ট-ফেস্ট করতে হয়। ডাক্তাররা আগে নিশ্চিত হয়ে নেন এই দম্পতির সন্তান বংশগত কোনো রোগের শিকার হবে না। তারপরই সার্টিফিকেট দেন। সেই সার্টিফিকেট দেখিয়ে লাইসেন্সের জন্যে দরখাস্ত করতে হয়।

বিয়ের পরপর লিলিয়ান ডঃ ভারমানের সঙ্গে দেখা করতে গেল। ডঃ ভারমান চশমার ফাঁক দিয়ে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, 'মিস থেকে মিসেস হয়েছ?'

'হ্যাঁ। কী করে বুঝলেন? আমার কপালে তো লেখা নেই মিসেস।'

'অবশ্যই লেখা আছে। সেই লেখা সবাই পড়তে পারে না। আমি পারি। তুমি কি ঐ ছেলেটিকেই বিয়ে করেছ?'

'হ্যাঁ।'

'দুঃস্বপ্ন এখন নিশ্চয়ই দেখছ না।'

'জ্বি না দেখছি না।'

'শুনে খুব খুশি হলাম। মনস্তত্ত্ববিদ্যা একটি বড় বিদ্যা তা কি বুঝতে পারছ?'

'পারছি।'

'ভবিষ্যতে যদি কোনো সমস্যা হয় তাহলে আমার কাছে আসবে। তবে আমার মনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয় ভবিষ্যতে কোনো সমস্যা হবে না। যদি হয় — তুমি নিজে তার সমাধান করতে পারবে। পারবে না?'

'হ্যাঁ পারব।'

'তোমার হাসি খুশি মুখ দেখে ভালো লাগছে। সত্যিকার হাসিমুখ অনেক দিন দেখি না। চারদিকে ভেজাল হাসি দেখি।'

'হাসির ভেজালও আপনি ধরতে পারেন?'

'অবশ্যই পারি। আমার নিজের মুখে যে হাসিটি আমি ঝুলিয়ে রাখি তা হল ভেজাল হাসি। একশ ভাগ ভেজাল। তুমি তোমার জীবনে ভেজাল হাসিকে আসতে দিও না। মনে কষ্ট পেলে কাঁদবে। মনের কষ্ট চাপা দেয়ার জন্যে হাসির ভান করার প্রয়োজন নেই।'

'আমি আপনার উপদেশ মনে রাখব ডঃ ভারমান।'

ডঃ ভারমানের উপদেশের জন্যেই হয়তো দেশ থেকে মা'র চিঠি পেয়ে লিলিয়ান সারাদিন কাঁদল। চিঠিটি তিনি মেয়ের বিয়ের সংবাদ পাওয়ার পর লিখেছিলেন। সংক্ষিপ্ত চিঠি। যদিও লিলিয়ানের মা'র হাতে লেখা, তবু লিলিয়ান জানে — এই চিঠি তার বাবা লিখে দিয়েছেন। মা শুধু দেখে কপি করেছেন। কপি করতে গিয়েও মা'র বানান ভুল হয়েছে। বাবা সেই সব বানান শুদ্ধ করেছেন।

লিলিয়ান,

তোমার বিবাহের সংবাদ পাইয়াছি। আনন্দে উল্লসিত হই নাই। তুমি নিশ্চয়ই তা আশাও কর না। তুমি খুব ভালো করেই জান তুমি আমাদের সবার অতি আদরের ধন ছিলে। তোমাকে নিয়া আমাদের স্বপ্নের অন্ত ছিল না। তুমি সব স্বপ্নের অবসান ঘটাইয়াছ। আমি তোমাকে দোষ দেই না। ঈশ্বরের হুকুম ছাড়া কিছুই হয় না। এই ক্ষেত্রেও তাঁর ইচ্ছারই প্রতিফলন হইয়াছে। আমি তোমার এবং তোমার স্বামীর সুখী সুন্দর জীবন কামনা করি। যে সুখের জন্যে তুমি আমাদের পরিবারের সকলের সুখ তুচ্ছ করিয়াছ, ঈশ্বর যেন সেই সুখ তোমাকে দেন ইহাই আমাদের সকলের কামনা।

এখন তোমাকে কিছু কথা বলিব — মন দিয়া শোন। তোমার বাবা পরিবারের সদস্য হিসাবে তোমাকে গ্রহণ করিবার ব্যাপারে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের সকলেরই সেইমতো অভিমত। সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুসারে তোমাকে বর্জন করা হইয়াছে। ইহাতে মনে কষ্ট পাইও না। তুমি সকলকে ত্যাগ করিয়া একজনকে পাইতে চাহিয়াছ। ঈশ্বর তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছেন।

এক্ষণে বাড়িতে তোমার নাম আর উচ্চারিত হইবে না। তোমার ব্যবহারী জিনিস, তোমার ফটোগ্রাফ সমস্তই নষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তুমি আমাদের সহিত কোনো রকম যোগাযোগ রাখিবার চেষ্টা করিবে না। যোগাযোগ করিবার চেষ্টার অর্থই হইবে আমাদিগকে কষ্ট দেওয়া এবং নিজে কষ্ট পাওয়া।

ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। ঈশ্বরের নিকট তোমার প্রসঙ্গে ইহাই আমাদের শেষ প্রার্থনা।

তোমার হতভাগিনী মা।

পুনশ্চ : মা তোমার দুঃস্বপ্ন দেখা কি বন্ধ হয়েছে?

লিলিয়ানের ধারণা, চিঠির শেষের পুনশ্চ অংশটি মা'র লেখা। মা বাবাকে না জানিয়ে এই বাক্যটি লিখেছেন। কেন মায়েরা এত ভালো হয়? কেন হয়? সে নিজে কি কোনো একদিন এমন একজন মা হবে?

লিলিয়ান কাঁদতে কাঁদতে ভাবল আমার প্রথম সন্তানটি যেন মেয়ে হয়। মেয়ে হলেই আমি মা'র নামে তার নাম রাখতে পারব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩

ভিন দেশের ভিন ধর্মের একটি ছেলেকে বিয়ে করে ফেলার মতো কাজ সাধারণত প্রচণ্ড ঝোঁকের মাথায় করা হয়, এবং ঝোঁক দীর্ঘস্থায়ী হয় না। বিয়ের এক মাসের মধ্যেই মনে হতে থাকে, কাজটা ঠিক হয় নি। খুব ভুল হয়ে গেছে। এদের বেলায় এটা ঘটল না। বিয়ের এক বছর পর এক গভীর রাতে লিলিয়ানের মনে হল, আমি নিশ্চয়ই শৈশবে কিংবা যৌবনে বড় ধরনের কোনো পুণ্যকর্ম করেছি। বড় ধরনের কোনো পুণ্যকর্ম ছাড়া এমন একজনকে স্বামী হিসেবে, বন্ধু হিসেবে পাওয়া যায় না। লিলিয়ান একা একা কিছুক্ষণ কাঁদল। তারপর চেষ্টা করল তাহেরের ঘুম ভাঙাতে। পারল না। তাহেরের ঘুম ভাঙানো সত্যি সত্যি অসম্ভব ব্যাপার। লিলিয়ানের খুব ইচ্ছা করছিল তাহেরের ঘুম ভাঙিয়ে তাকে নিয়ে রাস্তায় হাঁটতে যায়। গভীর রাতে নির্জন রাস্তায় হাত ধরাধরি করে হাঁটতে হাঁটতে সে তাহেরকে বলে — আমি তোমাকে ভালবাসি। তোমার জন্যে আলাদা করে রাখা এই ভালবাসা কখনো নষ্ট হবে না। কখনো না।

বিয়ের দেড় বছরের মাথায় তাহের ফিফথ্ এভিন্যুতে নতুন বাড়ি নিল। বিশাল ডুপলেক্স। একতলায় খাবার ঘর, বসার ঘর, লাইব্রেরি–কাম–স্টাডি রুম এবং একটা গেস্ট রুম। দোতলায় চারটা শোবার ঘর। এত বড় বাড়ির তাদের কোনোই প্রয়োজন নেই। কিন্তু তাহের ছোট বাড়ি নেবে না। ছোট বাড়িতে তার নাকি দম বন্ধ হয়ে আসে। ছোট বাড়ি নেবার কথা বলতেই তাহের হাসতে হাসতে বলল, 'আমার পূর্বপুরুষরা খুব বড় বড় বাড়িতে থাকতেন, বুঝলে বিদেশিনী। কাজেই আমিও বড় বাড়িতে থাকব। বেতন যা পাই সেখান থেকে টাকা আলাদা করে রাখব। বছর পনের পর সেই টাকায় দশ একর জায়গা নিয়ে এমন বাড়ি বানাব যে তোমার আক্কেলগুড়ুম হয়ে যাবে।'

হাসপাতালের জুনিয়র ডাক্তার হিসেবে তাহের যা পায় তা তার জন্যে যথেষ্ট — জমানো দূরে থাকুক, মাসের শেষে সে শেষ কোয়ার্টারটিও খরচ করে শুকনো মুখে লিলিয়ানকে বলে, 'লিলি! তোমার কাছে কি গোটাবিশেক ডলার হবে?' তখন তাহেরের শুকনো মুখের দিকে তাকিয়ে লিলিয়ানের চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছা করে — 'I love you, I love you.' সে অবশ্যি চেঁচিয়ে বলে না। মনে মনে বলে যেন তাহের কখনো ধরতে না পারে। যেমন ধরা যাক, তাহের কফির পেয়ালা হাতে নিয়ে যখন বলে —'বাহ্ তুমি তো একসেলেন্ট কাপচিনো কফি বানাতে শিখে গেছ! এস আমরা একটা কফি শপ চালু করি। কফি শপের নাম হবে— লিলিয়ান'স কাপাচিনো। তখন লিলিয়ান মনে মনে বলে—'I Love you, I Love you.' ঈশ্বর মানুষকে প্রচুর ক্ষমতা দিয়েছেন, মনের কথা বুঝবার ক্ষমতা দেন নি। যদি দিতেন তাহলে তাহের বুঝতে পারত কী গাঢ় ভালবাসায় লিলিয়ান এই মানুষটাকে ঘিরে রেখেছে।

তাহের অনেক রাত জেগে পড়াশোনা করে। এই সময়টা লিলিয়ান তাকে বিরক্ত করে না। বারান্দায় রকিং চেয়ারে বসে দোল খেতে খেতে ভাবে — ঈশ্বর আমাকে এত সুখী কেন করলেন? এর একশ ভাগের এক ভাগ সুখী হলেও তো আমার জীবনটা সুন্দর চলে যেত!

ভালবাসা ব্যাপারটা কী লিলিয়ান বুঝতে চেষ্টা করে। বুঝতে পারে না। তার ধারণা, ভালবাসা নামের ব্যাপারটায় শরীরের স্থান খুব অল্প। নেই বললেই হয়। আবার কখনো কখনো সম্পূর্ণ উল্টো কথা মনে হয়। মনে হয় ভালবাসায় শরীর অনেকখানি। অনেকখানি না হলে কেন তার সারাক্ষণ এই মানুষটাকে ছুঁয়ে থাকতে ইচ্ছা করবে? মন ছোঁয়া সম্ভব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নয় বলেই কি শরীর ছোঁয়ার এই আকুলতা?

আচ্ছা, তার যেমন সারাক্ষণ মানুষটাকে ছুঁয়ে থাকতে ইচ্ছে করে ঐ মানুষটারও কি তাই করে? সরাসরি জিজ্ঞেস করতে লজ্জা করে, লিলিয়ান ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করেছে — তাহের প্রশ্নটা ধরতে পারে নি। যেমন লিলিয়ান একদিন জিজ্ঞেস করল, 'শোন তাহের, আমরা যখন বাগানে হাঁটি অর্থাৎ পাশাপাশি আমরা হাঁটছি — তখন তোমার কোন দিকে হাঁটতে ভালো লাগে? অর্থাৎ আমার পাশাপাশি হাঁটতে ভালো লাগে, না আমার আগে আগে, না পেছনে পেছনে?'

তাহের গম্ভীর হয়ে বলেছে — 'মাই ডিয়ার বিদেশিনী! আমার তো বাগানে হাঁটতেই ভালো লাগে না। আমার ভেতর বাগান–ভীতি আছে। আমাদের গ্রামের বাড়ির চারপাশে বাগান। ঐ বাগানে একবার আমাকে সাপে তাড়া করেছিল। সেই থেকে বাগান–ভীতি।'

'আচ্ছা ধর, বাগানে না, রাস্তায় হাঁটছি — তখন?'

'মাই ডিয়ার বিদেশিনী! রাস্তায় হাঁটতেও আমার ভালো লাগে না। আমেরিকার রাস্তাগুলো হাঁটার জন্যে নয়, গাড়ি নিয়ে চলার জন্যে।'

লিলিয়ান দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেছে, 'তুমি সব সময় আমাকে বিদেশিনী বল কেন?'

'তুমি বিদেশি মেয়ে, এই জন্যেই বিদেশিনী বলি।'

'বিদেশি মেয়ে বলে কি তোমার মনে কোনো ক্ষোভ আছে?'

'বিন্দুমাত্র ক্ষোভ নেই।'

'খুব অস্পষ্টভাবে হয়তো আছে। এত অস্পষ্ট যে তুমি নিজেও জান না।'

'যদি থাকে তুমি কি করবে?'

'তোমার সেই ক্ষোভ, সেই হতাশা দূর করার চেষ্টা করব।'

'কিভাবে করবে?'

'প্রথমে আমি তোমার ভাষা শিখব।'

'বাংলা ভাষা শিখবে?'

'হ্যাঁ।'

'নিতান্তই অসম্ভব ব্যাপার। বাংলা ভাষা হচ্ছে পৃথিবীর কঠিন ভাষাগুলোর চেয়েও কঠিন। হিব্রু বাংলার তুলনায় শিশু।'

'কেন বাজে কথা বলছ?'

'মোটেও বাজে কথা বলছি না। ইংরেজি 'S' অক্ষরের ধ্বনির কাছাকাছি আমাদের তিনটা অক্ষর আছে শ, স, ষ। আবার 'Z' অক্ষরের কাছাকাছি আছে তিনটা অক্ষর–জ, য, ঝ।'

'এ রকম সব ভাষাতেই আছে।'

'আমাদের আরো অদ্ভুত ব্যাপার–স্যাপার আছে। যেমন ধর — আমার শীত লাগে, এর এক রকম মানে, আবার আমার শীত–শীত লাগে, এর অন্য রকম মানে। শীত শব্দ দুবার ব্যবহার করা মাত্র অর্থ বদলে গেল। সে দারুণ কঠিন ব্যাপার।'

'কঠিন ব্যাপার হলে তুমি আমাকে সাহায্য কর।'

'পাগল হয়েছ? আমি নিজেই বাংলা জানি না; তোমাকে সাহায্য করব কি? মেট্রিকে বাংলা ফার্স্ট পেপারে ৩৬ পেয়েছিলাম। কানের পাশ দিয়ে গুলি গিয়েছে।'

'তার মানে তুমি আমাকে সাহায্য করবে না?'

'না।'

'না কেন?'

'আমি তার প্রয়োজন দেখছি না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমি দেখছি। তুমি যে ভাষায় কথা বল, আমি সেই ভাষা জানব না তা হতেই পারে না। আমি তোমাকে ভালবাসি, কাজেই আমি তোমার ভাষায় কথা বলতে চাই।'

'আমিও তোমাকে ভালবাসি, তার মানে এই না যে রাত জেগে আমাকে তোমার গ্রীক ভাষায় কথা বলা শিখতে হবে।'

'আমার ভাষা কিন্তু গ্রীক না।'

'সব বিদেশি ভাষাই আমার কাছে গ্রীক ভাষা।'

'আমি তো তোমাকে আমার ভাষা শিখতে বলছি না। আমি শুধু বলছি তোমার ভাষা শেখার ব্যাপারে তুমি আমাকে সাহায্য কর।'

'ফাইন, সাহায্য করব। ভাষা শেখা ছাড়া আর কী কী জিনিস শিখতে চাও? একবারে বলে ফেল।'

'আমি তোমাদের দেশের রান্না শিখতে চাই।'

'আর কী?'

'তোমাদের দেশের রীতি-নীতি, আদব-কায়দা। ভাসা-ভাসা শেখা নয়। খুব ভালোমতো শেখা, যেন তুমি কোনোদিন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে না বল — কেন যে বিদেশি একটা মেয়ে বিয়ে করলাম!'

তাহের হাসতে হাসতে বলল, 'তুমি চেষ্টা করছ পুরোপুরি একটা বাঙালি মেয়ে হয়ে যেতে?'

'হ্যাঁ। খুব কি কঠিন?'

'ভয়ংকর কঠিন।'

'মোটেই কঠিন না। আমি ঠিক করেছি বাংলাটা পুরোপুরি শেখা হয়ে গেলে আমি তোমাকে নিয়ে তোমার দেশে যাব। বাঙালি মেয়ে হবার মূল ট্রেনিং আমি দেশে গিয়ে নেব।'

'পাগল হয়েছে। দেশে যাবার কথা আমি চিন্তাও করি না।'

'কেন চিন্তা কর না?'

'দেশে আমার কেউ নেই।'

'তোমার বাবা-মা মারা গেছেন তা জানি, তাই বলে আর কেউ থাকবে না, তা কী করে হয়?'

'আমার বাবা-মা নেই, আমার কোনো ভাইবোনও নেই। একটাই বোন ছিল। ছোটবেলায় মেনিনজাইটিসে মারা গেছে।'

'বাড়িঘর তো আছে, না তাও নেই?'

'একটা বাড়ি আছে তাও গ্রামের দিকে। শহরে কোনো বাড়িঘর নেই।'

'গ্রামের বাড়িতে কে থাকে?'

'কেউ থাকে না। তালাবন্ধ থাকে। দরজা-জানালা কিছু কিছু চুরি করে নিয়ে গেছে, তবে খুব বেশি নিতে পারে নি। বাড়ির সঙ্গে বিরাট আম-কাঁঠালের বাগান আছে। আমার এক দূর সম্পর্কের চাচা সেই বাগান দেখাশোনা করেন। বাগানের আয় তিনিই ভোগ করেন। তাঁকে আমি মাঝে মাঝে কিছু ডলার পাঠাই যাতে তিনি বাড়িটা দেখেশুনে রাখেন।'

লিলিয়ান আগ্রহ নিয়ে বলল, 'খুবই ভালো কথা। মনে হচ্ছে তোমাদের পৈতৃক বাড়ি বাসযোগ্য অবস্থায় আছে। এই সামারে চল দুমাস থেকে আসি।'

'পাগল হয়েছ? সামারে আমি থাকব ভিয়েনা।'

'কোনোক্রমেই কি যাওয়া সম্ভব না?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'না। তাছাড়া লিলিয়ান, সামারে বাংলাদেশ তোমার ভালোও লাগবে না। ট্রপিক্যাল কান্ট্রি। প্রচণ্ড গরম। টেম্পারেচার চৌত্রিশ ডিগ্রি পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত ওঠে। হাই হিউমিডিটি। গা থেকে আলকাতরার মতো ঘাম বের হয়।'

'আমার কোনোই অসুবিধা হবে না।'

'হবে। আমার পৈতৃক বাড়িতে কোনো ইলেকট্রিসিটি নেই। হাতপাখা হচ্ছে একমাত্র পাখা। প্রচণ্ড মশা। বাড়ির চারদিকে বাগানটা সুন্দর, কিন্তু সুন্দর হলেও বাগানে হাঁটতে পারবে না। বর্ষায় প্যাচপ্যাচে কাদা হয়ে থাকে। সেই সঙ্গে আছে সাপের উপদ্রব।'

'তুমি আমাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছ।'

'ভয় দেখানোর চেষ্টা করছি না। সত্যি কথা বলছি। ভয় দেখাতে চাইলে বলতাম, আমাদের বাড়ির চারপাশে ঘন জঙ্গল। সেই জঙ্গলে রয়েল বেঙ্গল টাইগার এবং বুনোহাতি ঘুরে বেড়ায়। আমি মশার কথা বলেছি, রয়েল বেঙ্গল টাইগারের কথা বলি নি।'

লিলিয়ান দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, 'আমার খুব আশা ছিল আমি এই সামারেই তোমার পৈতৃক বাড়ি দেখতে যাব।'

'তোমার আশা আপাতত পূর্ণ হচ্ছে না। কোনো একদিন নিশ্চয়ই হবে। বাংলাদেশের মশা তোমাকে দেখিয়ে আনব। সব মশা এক্সপোর্ট কোয়ালিটির — ইয়া সাইজ। এককেটা এক ছটাক দেড় ছটাক করে রক্ত খায়। রক্ত খেয়ে বমি করে ফেলে দেয়, আবার খায়। হা-হা-হা।'

তাহেরের ভিয়েনায় এক মাসের জন্যে যাবার কথা ছিল। সেটা বেড়ে হয়েছে দুমাস। সেমিনারের শেষে একটা শর্টকোর্স শেষ করে সে ফিরবে। তাহের খুব খুশি। লিলিয়ানের খারাপ লাগছে। বেশ খারাপ লাগছে। খারাপ লাগছে এই ভেবে যে, তাহের বুঝতে পারছে না তাহেরকে ছেড়ে একা একা বাস করা তার জন্যে কত কষ্টের। সে তো অনায়াসে বলতে পারত — লিলি, তুমিও আমার সঙ্গে চল। ঘরদুয়ার তালাবন্ধ থাকুক। এই কথা একবারও বলছে না।

তাহেরের ফ্লাইট বুধবারে। সে মঙ্গলবার নাশতার টেবিলে কফি খেতে খেতে বলল, 'লিলি তুমিও চল। আমি সেমিনার করব, কোর্স করব — তুমি শহরে শহরে ঘুরবে। শুধু রাতে আমরা একসঙ্গে ঘুমাব। এখানে একা একা এত বড় বাড়িতে থাকার তোমার দরকার কী? শেষে ভয়টয় পাবে।'

'না আমি ভয় পাব না।'

'ভয় না পেলে থাক। বাড়ি খালি রেখে যাওয়া ঠিক না।'

লিলিয়ানের কান্না পাচ্ছে — কেন সে বলতে গেল 'না আমি ভয় পাব না।' তাহের বলামাত্র সে রাজি হল না কেন? এখন কি সে বলবে — 'আমি একা একা এখানে থাকতে চাচ্ছি না। আমি তোমার সঙ্গে যাব। তুমি আমার জন্যেও একটা টিকিট কর।' না, তা বলা সম্ভব না। এমন ছেলেমানুষি কিছু সে করতে পারবে না।

'লিলিয়ান।'

'হুঁ।'

'তুমি স্বীকার না করলেও আমি বুঝতে পারছি দুমাস একা একা থাকা তোমার জন্যে কষ্টকর হবে। তোমাকে আমি একটা সাজেশান দেই। তুমি তোমার বাবা-মা'র কাছ থেকে ঘুরে আস। ওদের রাগ ভাঙিয়ে আস।'

'ওদের রাগ সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণা নেই বলেই তুমি এমন কথা বললে। এই রাগ ভাঙবার নয়।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমার ধারণা তাঁদের সামনে গিয়ে তুমি কান্নাকাটি শুরু করলেই রাগ গলে জল হয়ে যাবে। চেষ্টা করে দেখ।'

'চেষ্টা করে লাভ হবে না। আমার পজার চাচা মারা গেছেন, কেউ আমাকে এই খবরটাও দেয় নি। আমি জেনেছি অন্য একজনের কাছে।'

'এরা কোনোদিনই তোমাকে গ্রহণ করবে না?'

'তুমি আমাকে ছেড়ে চলে গেলে, কিংবা মারা গেলে হয়তো-বা করবে।'

'তোমাকে ছেড়ে যাবার প্রশ্ন ওঠে না। মৃত্যু বিষয়ে কিছু বলা যাচ্ছে না। যে প্লেনে উঠছি সেই প্লেনটাই ক্র্যাশ করতে পারে। তবে তোমাকে পৈতৃক বাড়ি না দেখিয়ে আমি মরব না। এ বিষয়ে নিশ্চিত থাক।'

লিলিয়ানের খুব খারাপ লাগছে। হঠাৎ মৃত্যু প্রসঙ্গ চলে এল কেন? এই প্রসঙ্গ তো আসার কথা ছিল না!

'লিলিয়ান।'

'হুঁ।'

'আমি প্রতিদিন একবার টেলিফোন করব।'

'আচ্ছা।'

'তোমার ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারে একটা খাম রেখে যাচ্ছি। আমি বাসা থেকে বেরুবার পর খাম খুলবে। তার আগে নয়।'

'কী আছে খামে?'

'কিছু না। আরেকটা কথা, তুমি যদি একা থাকতে ভয় পাও তাহলে ঘরে তালা দিয়ে পরিচিত কারোর বাড়িতে উঠে পড়বে। কিংবা কোনো হোটেলে।'

'আমি ভয় পাব না।'

'তোমার চোখ দেখে মনে হচ্ছে এখনি ভয় পাচ্ছ। আমি চোখের ডাক্তার। চোখ-বিশেষজ্ঞ। চোখ দেখে অনেক কিছু বলে দিতে পারি। হা-হা-হা।'

লিলিয়ান তাহেরের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলল, 'I love you.

'লিলি!'

'হুঁ।'

'এই দুমাসে তুমি কি দয়া করে একটা কাজ করবে, গাড়ি চালানোটা শিখে নেবে? এটা কোনো কঠিন ব্যাপার না। ড্রাইভিঙের যে কোনো স্কুলে ভর্তি হলেই হবে। গাড়ি চালানো জানলে তুমি আমাকে এয়ারপোর্টে নামিয়ে দিয়ে আসতে পারতে। দুজন গল্প করতে করতে যেতাম। এখন যাব ক্যাবে করে। বিশ্রী ব্যাপার!'

তাহের ঘর থেকে বের হওয়া মাত্র লিলিয়ান ড্রয়ার খুলল। সেখানে একটা চিঠি। চিঠিতে লেখা — "প্রিয় লিলি, খামের ভেতর একটা ভিয়েনা যাবার ওপেন টিকিট আছে। টিকিটটা তোমার জন্যে। যখন ইচ্ছে করবে তুমি চলে আসবে। আমি জোর করেই তোমাকে নিয়ে যেতাম। যাই নি। কারণ আমি সারাদিন থাকব ব্যস্ত, তুমি একা একা হোটেলে বসে থাকবে। নিজের স্বার্থে তোমাকে কষ্ট দিতে ইচ্ছা করল না। এরচে' ওপেন টিকিট ভালো। এখানে একা একা থেকে ক্লান্ত হয়ে পড়লে চলে আসবে। তখন ভিয়েনার হোটেলে বসে বিরক্ত হলেও আমাকে দোষ দিতে পারবে না। কারণ তুমি এসেছ নিজের আগ্রহে। হা-হা-হা।'

লিলিয়ান সঙ্গে সঙ্গেই ট্রাভেল এজেন্টকে ফোন করল। যদি বুকিং পাওয়া যায়। সম্ভব হলে আজ।

ট্রাভেল এজেন্টের রোবট গলার মেয়েটি বলল, 'আগামী পনের দিন বুকিং পাওয়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনো সম্ভাবনা নেই। সামারে ইউরোপ যাবার টিকিট কনফার্ম করা কঠিন। দল বেঁধে ট্যুরিস্টরা যাচ্ছে। তবে তোমাকে আমি ওয়েটিং লিস্টে রেখে দিচ্ছি। কিছু পাওয়া গেলে জানাব।'

অনেকদিন পর লিলিয়ান একা একা ঘুমাতে গেল। এবং আশ্চর্য, অনেকদিন পর ভয়ংকর স্বপ্নটা সে আবার দেখল। এবারের স্বপ্ন আরো স্পষ্ট। যেন স্বপ্ন না; পুরো ব্যাপারটা বাস্তবে ঘটে যাচ্ছে। সে দেখল — বিশাল প্রাচীন শ্যাওলা–পড়া এক অট্টালিকা। সে সিঁড়ি বেয়ে উঠছে। লোহার প্যাঁচানো সিঁড়ি। সে উঠেই যাচ্ছে... উঠেই যাচ্ছে। সিঁড়ি শেষ হচ্ছে না। হঠাৎ সিঁড়ি শেষ — নিচে নামতে চেষ্টা করল। কী আশ্চর্য, নিচে নামারও ব্যবস্থা নেই! সে এখন কী করবে? তাহেরের কথা শোনা যাচ্ছে। সে অনেক দূর থেকে ডাকছে। তার গলার স্বর ক্ষীণ। প্রায় অস্পষ্ট।

'লিলিয়ান! লিলিয়ান! তুমি কোথায়?'

'আমি এখানে।'

'তুমি আমাকে বাঁচাও। আমি ভয়ংকর বিপদে পড়েছি। ওরা আমাকে মেরে ফেলতে চাইছে। তুমি বাঁচাও আমাকে।'

'আমি নামতে পারছি না। আমি আটকা পড়ে গেছি!'

'আমাকে বাঁচাও! লিলিয়ান — আমাকে বাঁচাও!'

'আমি আটকা পড়ে গেছি!'

সিঁড়ি দুলছে। প্রচণ্ড শব্দে দুলছে। দুলুনিতে লোহার রেলিং খুলে আসছে। অনেক দূর থেকে তাহেরের অস্পষ্ট স্বর কানে আসছে। খুব বাতাস দিচ্ছে। বাতাসের কারণে কিছু শোনা যাচ্ছে না।

লিলিয়ান জেগে উঠল। ঘড়িতে একটা দশ বাজে। লিলিয়ান বাকি রাতটা বারান্দায় রকিং চেয়ারে বসে কাটাল।

AMARBOI.COM

৩

ডঃ ভারমান চশমার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে আছেন। লিলিয়ানের মনে হল তিনি হাসি চেপে রাখার চেষ্টা করছেন। যে কোনো মুহূর্তে হেসে ফেলবেন। হাসবেন তাহেরের মতো শব্দ করে। লিলিয়ান খুব লজ্জায় পড়বে। সে রকম কিছু হল না। ডঃ ভারমান হাসলেন না। চোখ থেকে চশমা খুলে ফেলে কাচ পরিষ্কার করতে করতে বললেন, 'তুমি আবার দুঃস্বপ্ন দেখেছ?'

'হ্যাঁ।'

'মাঝে মাঝে দুঃস্বপ্ন দেখা তো খুব স্বাভাবিক লিলিয়ান। আমরা সুন্দর স্বপ্ন যেমন দেখি, দুঃস্বপ্নও দেখি।'

'ডঃ ভারমান, আমি তা জানি। কিন্তু আমার স্বপ্ন অন্য রকম।'

'অন্য রকম বলতে কী বোঝাচ্ছ?'

'আপনাকে ব্যাখ্যা করতে পারব না। তবে আমার মনে হয় স্বপ্নে কেউ আমাকে কিছু বলার চেষ্টা করছে।'

'তুমি ঠিকই ধরেছ। স্বপ্নে কেউ তোমাকে কিছু বলার চেষ্টা করছে — এটা ঠিক। অবশ্যই বলার চেষ্টা করছে। সেই 'কেউ'টা হচ্ছ — তুমি নিজে। তোমার নিজের সাব–

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কনশাস মাইন্ড তোমার কনশাস মাইন্ডকে তথ্য দিতে চাইছে।'

'ডক্টর! তা কিন্তু না। তাহেরের মহাবিপদ সম্পর্কে আমাকে কেউ-একজন সাবধান করছে।'

ডঃ ভারমান এবার হাসলেন, তবে শব্দ না করে। নিঃশব্দে। শিশুদের প্রবোধ দেয়ার জন্যে বড়রা যেমন হাসে, তেমন হাসি।

'শোন লিলিয়ান, ছেলেটা সম্পর্কে তোমার নিজের মধ্যেই এক ধরনের ভয় আছে। সেই ভয় হচ্ছে ছেলেটিকে হারানোর ভয়। এই ভয়ের উৎপত্তি হল ভালবাসায়। কাউকে গভীরভাবে ভালবাসলেই এই ভয় তৈরি হয়। মনে হয় — এক সময় ভালবাসার মানুষ আমাকে ছেড়ে চলে যাবে। তখন আমার কী হবে? অবচেতন মনে ধীরে ধীরে ভয় জমা হতে থাকে... তোমার ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে?'

'আপনাকে আমি বোঝাতে পারছি না — আমি স্বপ্নে তাহেরদের প্রাচীন বসতবাড়ি স্পষ্ট দেখেছি। আমি সে বাড়ির লোহার সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছিলাম।'

'তুমি তোমার কল্পনার একটি বাড়ির লোহার সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠেছিলে।'

'ডঃ ভারমান আমি কিন্তু নিশ্চিত জানি একদিন ঐ বাড়িতে আমরা যাব — তাহের ভয়ংকর বিপদে পড়বে।'

'যদি জান তাহলে ঐ বাড়িতে যেও না।'

'আমাদের যেতেই হবে। এটা হচ্ছে নিয়তি। যা ঘটবার তা ঘটবেই।'

'লিলিয়ান তুমি তোমার নিজের যুক্তিতে আটকা পড়ে যাচ্ছ — যা ঘটবার তা যদি ঘটে তাহলে তোমাকে স্বপ্নে সাবধান করার প্রয়োজন কি?'

লিলিয়ান চুপ করে রইল। ডঃ ভারমান শান্ত গলায় বললেন, 'তুচ্ছ জিনিস নিয়ে এত ভেব না। তুচ্ছ জিনিসকে তুচ্ছ করতে শেখ।'

লিলিয়ান উঠে দাঁড়াল। ক্লান্ত গলায় বলল, 'আমি ওদের বাড়ি স্বপ্নে সত্যি দেখেছি। দেখামাত্র চিনতে পারব। লোহার প্যাঁচানো সিঁড়ি...'

'লিলিয়ান আমি তোমাকে ঘুমের ওষুধ দিচ্ছি। রাতে ঘুমাতে যাবার এক ঘণ্টা আগে দুটা ট্যাবলেট খাবে। মনে থাকবে?'

'থাকবে।'

ডক্টর ভারমান নিশ্চয় খুব কড়া ঘুমের ওষুধ দিয়েছেন। ওষুধ খাবার পরপর লিলিয়ানের মনে হল সে তলিয়ে যেতে শুরু করেছে। কোনো গভীর খাদে পড়ে গেছে — নিচে নেমে যাচ্ছে। অতি দ্রুত নেমে যাচ্ছে। খাদটা অন্ধকার এবং শীতল। লিলিয়ানের ভয় ভয় করতে লাগল। মনে হয় এই ঘুম তার আর ভাঙবে না। কেউ ভাঙতে পারবে না। সে বিরাট এই বাড়িতে মরে পড়ে থাকবে। কেউ জানবেও না।

'ক্রিং ক্রিং ক্রিং!'

কীসের শব্দ? টেলিফোন না — কেউ এসে কলিং বেল টিপছে। নাকি গির্জার ঘণ্টার শব্দ? তাদের বাড়ির কাছেই ক্যাথলিক চার্চ। ওরা মাঝে মাঝে ঘণ্টা বাজায়। কেউ মারা গেলে ঘণ্টা বাজায়। কে মারা গেছে? তাহের? তাহেরের কি কিছু হয়েছে? প্লেন দুর্ঘটনার খবর তো কেউ দেয় নি। টিভি খোলা আছে। প্লেন দুর্ঘটনা হলে বলত। প্লেন দুর্ঘটনার খবর টিভি খুব ফলাও করে প্রচার করে। ট্রেন বা বাস দুর্ঘটনার খবর কোনো পাত্তা পায় না। এর কারণ কি?

'ক্রিং ক্রিং ক্রিং।'

লিলিয়ান টেলিফোন তুলে ক্লান্ত গলায় বলল, 'হ্যালো!'

ওপাশ থেকে তাহেরের গলা পাওয়া গেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'হ্যালো লিলিয়ান — আমি। তুমি কেমন আছ?'

'ভালো।'

'গলা শুনে তো ভালো মনে হচ্ছে না। অসুখ–বিসুখ করেছে নাকি?'

'না, ঘুম পাচ্ছে।'

'এখনি ঘুম পাচ্ছে কেন? রাত তো বেশি হয় নি। ক'টা বাজে তোমাদের এখানে?'

'দশটা।'

'দশটা তো তেমন রাত না। তুমি ঘুমে কথা বলতে পারছ না। ব্যাপার কি?'

'আমি ঘুমের ওষুধ খেয়েছি।'

'কেন?'

'কয়েক রাত ধরে আমার ঘুম হচ্ছে না। আমি দুঃস্বপ্ন দেখছি।'

'ও আচ্ছা।'

লিলিয়ান জড়ানো স্বরে বলল, 'তোমাকে একটা জরুরি কথা জিজ্ঞেস করি। খুব জরুরি। আচ্ছা, তোমাদের গ্রামের বাড়িটা বিশাল না?'

'হ্যাঁ বিশাল। হঠাৎ এই প্রসঙ্গ কেন?'

'কারণ আছে। এখন বল তোমাদের বাড়ির বাইরের দিকে ছাদ পর্যন্ত লোহার প্যাঁচানো সিঁড়ি আছে না?'

'না নেই।'

'আগে এক সময় ছিল। এখন নেই।'

'কখনো ছিল না। কোনো কালেও ছিল না। সিঁড়ির কথা এল কেন?'

'এখন কথা বলতে পারব না — খুব ঘুম পাচ্ছে।'

'হ্যালো লিলিয়ান — হ্যালো।'

লিলিয়ান টেলিফোন নামিয়ে রেখে সোফার উপর ঘুমিয়ে পড়ল। আবার ঘুম ভাঙল টেলিফোনের শব্দে। লিলিয়ান জড়ানো গলায় বলল, 'হ্যালো!'

'মিসেস লিলিয়ান?'

'ইয়েস।'

'ইউনাইটেড ট্রাভেল এজেন্সি থেকে বলছি — আপনি ভিয়েনার বুকিং চেয়েছিলেন। আগামীকাল বুকিং পাওয়া গেছে। লন্ডন ফ্রাংকফোর্ট হয়ে ভিয়েনা। লন্ডনে একরাত থাকতে হবে।'

'কোথায় থাকব?'

'এয়ারপোর্ট হোটেল। এয়ারপোর্টের কাছেই।'

'আচ্ছা, এই হোটেলে কী প্যাঁচানো লোহার সিঁড়ি আছে?'

'ম্যাডাম আপনি কী বলছেন বুঝতে পারছি না।'

লিলিয়ান টেলিফোন রেখে আবার ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমের মধ্যে সেই প্যাঁচানো সিঁড়ি আবার দেখল। সে সিঁড়ি দিয়ে নামছে। অতি দ্রুত নামছে। সিঁড়ি কাঁপছে — মনে হচ্ছে পড়ে যাবে। লিলিয়ান ঘুমের মধ্যেই ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

৪

তাহেরের নার্ভ শক্ত। শুধু শক্ত না, বেশ শক্ত। চরম বিপদেও তার মাথা ঠাণ্ডা থাকে। ভিয়েনায় সে কোনো বিপদের মধ্যে নেই। সুখেই আছে বলা চলে। সেমিনার চলছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেপার পড়া হচ্ছে, তবে আড্ডা হচ্ছে তার চেয়ে বেশি। প্রতি সন্ধ্যায় ককটেল পার্টি। হৈচৈ, নাচানাচি। তাহের এই হৈচৈ-এ নিজেকে মেশাতে পারছে না। মনে হচ্ছে তার ইস্পাতের নার্ভেও মরিচা ধরে গেছে। গতরাতে এক ফোঁটা ঘুম হয় নি। এরকম অদ্ভুত ঘটনা তাহেরের জীবনে খুব বেশি ঘটে নি। বিছানায় যাবার আগেই সে ঘুমিয়ে পড়ে। তার অনিদ্রার কারণ লিলিয়ান। লিলিয়ানের সমস্যাটা সে ঠিক ধরতে পারছে না। টেলিফোনে প্যাঁচানো সিঁড়ির কথা কেন জিজ্ঞেস করল? তাহেরকে এত আগ্রহ করে সে কেনই-বা বিয়ে করল? আমেরিকান মেয়েগুলোর কাছে বিয়ে এবং ডিভোর্স দুই-ই ডালভাত। চব্বিশ ঘণ্টার পরিচয়ে তারা বিয়ে করে ফেলে, আবার এক সপ্তাহ পর ছাড়াছাড়ি। দুজন দুদিকে গিয়ে অন্য দুজনকে খুঁজে নেয়। কিন্তু লিলিয়ান এ রকম মেয়ে নয়। সে কেন তাহেরের মতো আধা-বাউন্ডেল একজনের জন্যে এতটা ভালবাসা জমিয়ে রাখবে?

লিলিয়ান কোনো একটি ব্যাপারে কষ্ট পাচ্ছে। সেই কষ্টের প্রকৃতি তাহের জানে না। জানার চেষ্টা করা কি উচিত? স্বামী-স্ত্রীর ভেতরও কিছু গোপন ব্যাপার থাকা প্রয়োজন বলে তাহের মনে করে। অবশ্যি ভিয়েনায় পা দেয়ার পর থেকে তাহেরের মনে হচ্ছে, সে ভুল করছে। তার উচিত ছিল লিলিয়ানের গোপন কষ্টের ব্যাপারগুলো জানা।

লিলিয়ানকে টেলিফোনে ধরার সব চেষ্টা বিফল হল। সারাদিনে তাহের ছ'বার চেষ্টা করল। রিং হয়, কেউ টেলিফোন ধরে না। লিলিয়ান কি ঘর তালাবন্ধ করে কোথাও গেছে? নাকি স্ট্রোক হয়ে ঘরে মরে পড়ে আছে? তাহের খুব অস্থির বোধ করতে লাগল। সেমিনারে একেবারেই মন বসছে না। ইচ্ছা করছে ব্যাগ গুছিয়ে প্লেনে উঠে বসতে। রাতদুপুরে বাড়িতে পৌঁছে আমেরিকানদের মতো চেঁচিয়ে বলতে — "Honey I am home."

সেমিনারে 'Cataract Solvent'-এর উপর বিরক্তিকর এক বক্তৃতা হচ্ছে। বক্তা মাঝে মাঝে হাসাবার চেষ্টা করছেন, পারছেন না।

বক্তৃতার মাঝখানে তাহেরের কাছে স্লিপ এল, আমেরিকা থেকে জরুরি কল। তাহের টেলিফোন ধরবার জন্যে প্রায় ছুটে গেল। যিনি পেপার পড়ছিলেন তিনি পড়া বন্ধ করে কড়া চোখে তাকিয়ে রইলেন।

টেলিফোন করেছে লিলিয়ান। তাহের বলল, 'কেমন আছ লিলিয়ান?'

'ভালো আছি।'

'কোনো বিশেষ কারণে টেলিফোন করেছ, না এমনি?'

'এমনি করেছি। আমি কি তোমাকে বিরক্ত করলাম?'

'মোটেও বিরক্ত কর নি, বরং খুব আনন্দিত করেছ। আমি তোমাকে নিয়ে খুব দুশ্চিন্তা করছিলাম। ঐদিন হঠাৎ টেলিফোন রেখে দিলে...'

'খুব ঘুম পাচ্ছিল, শরীর ভালো লাগছিল না।'

'প্যাঁচানো সিঁড়ির কথা জিজ্ঞেস করছিলে কেন?'

'ও কিছু না, বাদ দাও।'

'লিলিয়ান, এখন তোমার শরীর কেমন?'

'শরীর ভালো। তুমি আমাকে নিয়ে মোটেও চিন্তা করবে না। তুমি ঠিকমতো তোমার সেমিনার কর। কোর্স ওয়ার্ক কবে থেকে শুরু হচ্ছে?'

তাহের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে খুব নরম গলায় বলল, 'লিলিয়ান, তুমি কি আমার একটা প্রশ্নের জবাব দেবে?'

'অবশ্যই দেব।'

'আমার কেন জানি মনে হচ্ছে, তুমি এক ধরনের ক্রাইসিসের ভেতর দিয়ে যাচ্ছ। ক্রাইসিসের কারণটা কি আমি জানতে পারি?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'না।'

'বেশ, জানাতে না চাইলে জানাতে হবে না। এমন কিছু কি আছে যা তুমি আমাকে বলতে চাও?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে বল।'

'I love you.'

অন্য সময় হলে তাহের হো-হো করে হেসে ফেলত। আজ পারল না। তার অসম্ভব মন খারাপ হয়ে গেল। টেলিফোন নামিয়ে রেখে সে দুটা কাজ করল। প্রথম কাজ, কোর্স কো-অর্ডিনেটরকে বলল, 'আমার একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। আমি আমেরিকা ফিরে যাচ্ছি। দ্বিতীয় কাজ, ট্রাভেল এজেন্সিতে টেলিফোন করে বলল, আমি আমার স্ত্রীকে নিয়ে দুমাস ঘুরে বেড়াব। খুব ইন্টারেস্টিং একটা ট্যুর প্ল্যান তুমি তৈরি করে দাও। ট্যুর প্ল্যানে সমুদ্র, পাহাড়, অরণ্য — এই তিনটি জিনিসই থাকতে হবে। আমরা বিয়ের পর একসঙ্গে বাইরে কোথাও যাই নি। এটা হবে আমাদের হানিমুন ট্যুর।'

'অ্যাডভেঞ্চার চাও, না smooth প্ল্যান চাও?'

'দুই-ই চাই'।

'ট্যুর প্ল্যানে হোটেলের ব্যবস্থাও থাকবে?'

'হ্যাঁ থাকবে।'

'ইকনমি হোটেল — না এক্সপেনসিভ হোটেল?'

'এক্সপেনসিভ হোটেল। ইকনমি হোটেলে আমি থাকতে পারি না — দম বন্ধ হয়ে আসে।'

'কোন মহাদেশ ঘুরতে চাও? ইউরোপ, এশিয়া? ইন্ডিয়া দেখে আস। ইন্ডিয়া এবং নেপাল। পাহাড়, সমুদ্র, অরণ্য — সবই পাবে। তাজমহল আছে — সপ্তম আশ্চর্য...'

তাহের হঠাৎ তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'তুমি বরং আমাদের দুজনের জন্যে বাংলাদেশে একটা ট্যুরের ব্যবস্থা কর।'

'বাংলাদেশ খুব ইন্টারেস্টিং হবে বলে আমার মনে হয় না।'

'আমার নিজেরও মনে হয় না। তবু কর।'

'পুরো ট্যুরটাই হবে বাংলাদেশে?'

'হ্যাঁ।'

'কিছু মনে করবেন না — বাংলাদেশে হানিমুন ট্যুরে যেতে চাওয়ার কারণ কি জানতে পারি?'

'হ্যাঁ পার। এটা আমার নিজের দেশ। হো-হো-হো। হা-হা-হা।'

অনেকদিন পর তাহের প্রাণখুলে হাসল। অনেক কষ্টে হাসি থামিয়ে বলল, 'হ্যালো মিস, আমাকে মন্টানা যাবার একটা টিকিটের ব্যবস্থা করে দাও। এমনভাবে করবে যেন আমি রাতদুপুরে উপস্থিত হতে পারি। আমি আমার স্ত্রীকে চমকে দিতে চাই। হা-হা-হা।'

রাত তিনটায় লিলিয়ান দরজা খুলল।

তাহের দাঁড়িয়ে আছে। বাচ্চাদের খেলনার দোকান থেকে অদ্ভুত একটা মুখোশ কিনে মুখে পরেছে। মুখোশে তাকে ভয়ংকর দেখানোর কথা। কেন জানি তা দেখাচ্ছে না। বরং হাস্যকর লাগছে। লিলিয়ান শিশুদের মতো চেঁচিয়ে উঠে বলল-'এ কী! তুমি?'

তাহের মুখোশের আড়াল থেকে হাসতে হাসতে বলল, 'ইয়েস বিদেশিনী, আমি।'

'চলে এলে যে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তোমাকে দেখতে এলাম, তুমি কেমন আছ?'

লিলিয়ান ঝলমলে গলায় বলল, 'খুব খারাপ ছিলাম। এখন আর খারাপ নেই। আমি এখন ভালো আছি। খুব ভালো আছি।'

'ভালো থাকলে চমৎকার করে কাপাচিনো কফি বানাও। প্রচুর ফেনা যেন হয়, এবং জিনিসপত্র গোছগাছ করা শুরু কর।'

'আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

'আমরা যাচ্ছি বাংলাদেশের একটি জেলা নেত্রকোনায়। নেত্রকোনা থেকে নান্দাইল রোড স্টেশন বলে অখ্যাত একটা রেল স্টেশনে। সেখান থেকেও কুড়ি মাইল দূরের অতি দুর্গম এক স্থানে; যেখানে আমার পূর্বপুরুষরা বোকার মতো এক বিশাল অট্টালিকা বানিয়েছিলেন। সেই অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ তোমাকে দেখিয়ে নিয়ে আসব। ঐ অঞ্চলে পৌঁছতে যেসব যানবাহনে আমরা চড়ব সেসব হচ্ছে — প্লেন, রেল, নৌকা, মহিষের গাড়ি, সবশেষে 'হণ্টন'।'

'হণ্টন মানে কি?'

'হণ্টন মানে আমি বলব না। বাংলাদেশে যাচ্ছ, কাজেই এখন থেকে কথাবার্তা হবে বাংলায়। তুমি বুঝতে পারলে ভালো কথা, বুঝতে না পারলে নেই।'

'এত দ্রুত কথা বললে বুঝব কী করে? স্লোলি বল, আমি সবই বুঝব।'

'বাংলা এমনই ভাষা যা স্লো বলা যায় না। অতি দ্রুত বলতে হয়। দ্রুত কথা বলা শিখে নাও। আমাদের দেশের লোকজন কাজকর্ম করে ঢিমেতালে কিন্তু কথা বলে দ্রুত — হা-হা-হা।'

৫

রেল, নৌকা, মহিষের গাড়ি এবং হণ্টনের কথা বলা হলেও ট্রেন থেকে নেমে সরাসরি নৌকা নিয়ে বাড়ির ঘাটে যাওয়া যায়। ঘাটের নাম ইন্দারঘাট, গ্রাম তিলতলা। তাহের নৌকা নিয়েছে, ঠাকরাকোনা থেকে ইন্দারঘাট যাবে। দুই মাঝির নৌকা। দুই মাঝির একজনের বয়স দশ-এগার। সে আবার দার্শনিক প্রকৃতির। বেশিরভাগ সময় আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। প্রশ্ন করলে মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে নেয়। তার নীরবতা অন্যজন পুষিয়ে দেয়। একটা কথা জিজ্ঞেস করলে দশটা কথা বলে।

তাহের বলল, 'কতক্ষণ লাগবে?'

বালক মাঝি উত্তর দিল না, মুখ ঘুরিয়ে নিল। বালক মাঝির বাবা হাসিমুখে বলল, 'একটানে লইয়া যামু। একটানের মামলা।'

'টান দিতে পারবেন তো? আপনার নিজের অবস্থা দেখছি কাহিল —ছেলেটাও নিতান্তই শিশু।'

'বিছনা কইরা দিতেছি। শুইয়া ঘুমান। ইন্দারঘাটে ঘুম থাইক্যা ডাইক্যা তুলব। সাথের মেমসাব আফনের কী লাগে?'

'আমার স্ত্রী।'

'গত বছর একজন মেমসাব দেখছিলাম। হাফপেন্ট পরা। নবীনগর হাটবারে মোটর সাইকেল নিয়া আসছে। একটা কুমড়া কিনছে। কুমড়া এরা খুব ভালো খায়। শখ কইরা খায়।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আপনি নৌকা ছাড়ার ব্যবস্থা করুন তো দেখি।'

'সব ব্যবস্থা হইতেছে। নূর মিয়ার নৌকায় উঠছেন। আর চিন্তার কিছু নাই।'

নৌকা ছাড়ার পর মনে হল চিন্তার অনেক কিছুই আছে। নূর মিয়া নিজে কিছুই করছে না, হাল ধরে বসে আছে। বাচ্চা ছেলে একা দাঁড় টেনে নিয়ে যাচ্ছে। দশ মাইল পথ যেতে দীর্ঘ সময় লাগবে। দিনে দিনে পৌঁছানোর আশা মনে হচ্ছে ছেড়ে দিতে হবে।

লিলিয়ান খুব আগ্রহ নিয়ে নদী দেখছে। তার কেমন লাগছে বোঝা যাচ্ছে না। কালো চশমায় তার চোখ ঢাকা। তাহের বলল, 'কেমন লাগছে লিলিয়ান?'

'খুব ভালো লাগছে — অদ্ভুত লাগছে। আশা করি খুব অল্প সময়ের মধ্যে এই জার্নি শেষ হবে না।'

'না, এই জার্নি বলতে গেলে অনন্তকাল ধরে চলবে। তুমি ইচ্ছা করলে ঘুমিয়ে পড়তে পার।'

'আমি ঘুমাব না।'

'খিদে পেয়েছে?'

'না।'

'স্টেশনে কিছু খেয়ে নেয়া দরকার ছিল। অল্পক্ষণের ভেতর খিদে পাবে। তখন নদীর পানি ছাড়া কিছুই খেতে পারবে না।'

নূর মিয়া তাদের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বলল, 'খাওয়াদাওয়া নিয়া কোনো চিন্তা কইরেন না। বসিরহাট বাজারে নৌকা ভিরামু। বাজার-সদাই কইরা রান্ধা চাপামু, খাওয়াদাওয়া শেষ কইরা বেলাবেলি চইল্যা যামু ইন্দারঘাট। একটানের মামলা।'

তাহের দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। তার কাছে মনে হচ্ছে নূর মিয়া খুব যন্ত্রণা করবে। তাদের প্রতিটি কথায় অংশগ্রহণ করবে। নিজস্ব মতামত দেবে। রান্নাবান্নায় অনেক সময় নষ্ট করার পরিকল্পনাও নূর মিয়ার আছে বলে মনে হচ্ছে।

'স্যার, আপনের পরিবার বাংলা কথা কয়?'

'হুঁ।'

'ঐ মোটর সাইকেলের মেমসাবও বাংলায় কথা কয়। কুমড়া কিনতে গিয়া পরিষ্কার বলছে — কুমড়ার কত দাম?'

'ঠিকমতো নৌকা চালান নূর মিয়া। বেশি কথা বলার দরকার নেই।'

'এইটা স্যার আপনার বলা লাগব না। বেশি কথার মইদ্যে নূর মিয়া নাই। দেশটা নষ্ট হইতাছে অধিক কথার কারণে।'

লিলিয়ান ইংরেজিতে বলল, 'আহা বেচারা কথা বলতে এত পছন্দ করে আর তুমি তাকে কথা বলতেই দিচ্ছ না। বলুক না কথা। কী ক্ষতি তাতে? আমার তো ওর কথা শুনতে ভালো লাগছে।'

'বুঝতে পারছ?'

'কিছু কিছু পারছি। যতই কথা শুনব ততই আরো বেশি বুঝব।'

'তুমি এক কাজ কর — নূর মিয়ার সঙ্গে বসে বসে গল্প কর। আমি ঘুমিয়ে পড়ি।'

'চারদিকে অসহ্য সুন্দর, এর মাঝখানে তুমি ঘুমিয়ে পড়বে?'

'কাব্যভাব আমার একেবারেই নেই লিলি। আমি মানুষটা পাথর টাইপ। অনুভূতিশূন্য।'

'আমি কি এই অনুভূতিশূন্য মানুষটির কাছে একটি আবেদন রাখতে পারি?'

'হ্যাঁ পার।'

'আমেরিকায় ফিরে গিয়ে কী হবে? চল, আমরা এখানেই থেকে যাই।'

তাহের সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, 'এই জঙ্গলে থেকে যেতে চাও?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'হ্যাঁ চাই।'

'তোমার মাথা থেকে পোকাগুলো দূর কর লিলিয়ান। তুমি আমার গ্রামের বাড়ি দেখতে চেয়েছিলে বলে তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি। সেখানে আমি থাকব খুব বেশি হলে তিন দিন। তারপর বাংলাদেশের সুন্দর সুন্দর জায়গাগুলো ঘুরে ঘুরে দেখব — কক্সবাজার, সুন্দরবন, সিলেট। তারপর যাব নেপাল। হিমালয়-কন্যা নেপাল দেখার পর আমেরিকা ফিরে যাব।'

লিলিয়ান ছোট্ট একটা নিশ্বাস ফেলে শান্তগলায় প্রায় ফিসফিস করে বলল, 'আমার একটা অদ্ভুত কথা মনে হচ্ছে। আমার মনে হচ্ছে আমাদের দুজনের কেউই এই জায়গা ছেড়ে কোনোদিন অন্য কোথাও যেতে পারব না। বাকি জীবনটা আমাদের থেকে যেতে হবে এইখানে।'

তারা ইন্দারঘাটে পৌঁছল সন্ধ্যার পর। কাকতালীয়ভাবেই পূর্ণিমা পড়ে গেছে। চাঁদ উঠেছে, তবে চাঁদের আলো এখনো জোরালো হয় নি। গাছপালায় কেমন ভূতুড়ে অন্ধকার। তাহের বলল, 'হাত ধর লিলিয়ান, বনের ভেতর দিয়ে যেতে হবে। এক সময় এটা ছিল সুন্দর বাগান। এখন পুরোপুরি ফরেস্ট। 'হালুম' শব্দ করে বাঘ বের হয়ে এলেও অবাক হব না। এখনো বের হচ্ছে না কেন সেও এক রহস্য।'

বাড়ি দেখে লিলিয়ান একই সঙ্গে মুগ্ধ ও দুঃখিত হল। বিশাল অট্টালিকা, কিন্তু অন্তিম দশা। বাড়ির পলেস্তারা খসে খসে পড়ছে। দক্ষিণ দিকের দেয়াল ধসে পড়েছে। পুরো বাড়ি ঘন শ্যাওলায় ঢাকা। দোতলায় উঠার সিঁড়ি ভাঙা, রেলিং ধসে গেছে। একতলার বারান্দায় গোবরের স্তূপ দেখে মনে হয় বৃষ্টির সময় এই জায়গা গরু-ছাগলের আস্তানা হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

তাহের বিরস গলায় বলল, 'বাড়ি দেখলে লিলিয়ান?'

'হ্যাঁ দেখলাম।'

'কোনো কমেন্ট করতে চাও?'

'চাই।'

'করে ফেল।'

'এই বাড়ি আমার চেনা। আমি এই বাড়ি আগে দেখেছি। তোমাকে আমি লোহার প্যাঁচানো সিঁড়ির কথা বলেছিলাম। তুমি বলেছিলে — এ রকম 'সিঁড়ি নেই।'

'সেই সিঁড়ি কি এখন দেখতে পাচ্ছ?'

'স্বপ্নে আমি অবিকল এই সিঁড়ি, এই বাড়ি দেখেছি।'

লোহার সিঁড়ি তাহেরের চোখে পড়ল। বাড়ির যে অংশ ধসে পড়েছে সিঁড়ি সেই দিকে। সিঁড়ির গা ঘেঁষে তেঁতুল পাতার মতো চিকন পাতার একটা গাছ। তাহের বলল, 'আমি এ বাড়িতে খুব ছোটবেলায় থেকেছি। এই কারণেই সিঁড়ি চোখে পড়ে নি... যাই হোক, তুমি দাবি করছ এই বাড়িই তুমি স্বপ্নে দেখেছ?'

'হুঁ।'

'স্বপ্নের সব ভাঙা বাড়ি এক রকম হয়।'

লিলিয়ান ক্লান্ত গলায় বলল, 'হয়তো হয়।'

তাহেরের দূর সম্পর্কের চাচা ইস্কান্দর আলি, তার দুই ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। হাতে হারিকেন। এই গরমেও ইস্কান্দর আলির গায়ে চাদর। পরনের লুঙ্গিটা সিল্কের, চিকচিক করছে। সঙ্গের ছেলে দুটির গায়ে গেঞ্জি। দুজনেরই শক্ত-সমর্থ চেহারা। এরা কোনো কথা বলছে না, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে লিলিয়ানের দিকে। তাকানোর ভঙ্গি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শালীন নয়। তাহের একবার ভাবল ধমক দিয়ে বলে, 'এভাবে তাকিয়ে আছ কেন?' বলল না। নিজেকে সামলে নিল। চাচার দিকে তাকিয়ে বলল, 'বাড়ির অবস্থা তো শোচনীয়।'

ইস্কান্দর আলি কাশতে কাশতে বললেন, 'পুরানা বাড়ি, এর চেয়ে ভালো আর কী হইব? ভাইঙ্গা যে পড়ে নাই এইটাই আল্লাহ্‌র রহমত।'

'ঠিকঠাক করার জন্যে প্রতি মাসে টাকা পাঠাই।'

'প্রতিমাসে পাঠাও না। মাঝে-মইদ্যে পাঠাও।'

'অবস্থা যা তাতে মনে হয় না এ বাড়িতে থাকা যাবে।'

'থাকতে পারবা। দুইতলার কয়েকটা ঘর পরিষ্কার করাইয়া থুইছি।'

'থাকা যাবে?'

'হ যাবে। সাথের এই মাইয়া কি তোমার ইসতিরি?'

'হ্যাঁ।'

'খিরিস্তান বিবাহ করছ?'

'হ্যাঁ।'

'মেয়ে দেখতে সুন্দর আছে। বিবাহ করছ ভালো করছ। খিরিস্তান বিবাহ করা জায়েজ আছে। নবী করিম নিজেও একটা খিরিস্তান মেয়ে বিবাহ করেছিলেন।'

'বাবুর্চির ব্যবস্থা করতে লিখেছিলাম। ব্যবস্থা করেছেন?'

'গেরাম দেশে বাবুর্চি কই পামু? আমার ঘরে রান্ধা হইব। টিফিন বাক্সে কইরা তোমরারে খানা দিয়া যাব। তোমরা থাকবা কয় দিন?'

'এখনো বলতে পারছি না।'

'ডাকাইতের খুব উপদ্রব। বেশি দিন না থাকনই ভালো।'

'আমার সঙ্গে আছে কী যে ডাকাত নেবে?'

'তোমার ইসতিরিরে নিয়া যাবে। সুন্দর মেয়েছেলে — হইলদা চামড়া, বিলাতি। ডাকাইতরা খুশি হইয়া তোমার ইসতিরিরে নিয়া যাবে।'

'আপনি কি আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করছেন?'

'তোমারে ভয় দেখাইয়া আমার ফায়দা কি? তোমার ইসতিরি মাছ-ভাত খায়, না পাউরুটি খায়?'

'মাছ-ভাত খায়।'

'শুয়োরের গোশ্‌ত খায়?'

তাহের ক্ষিপ্ত গলায় বলল, 'খেলে কী করবেন? শুয়োরের গোশ্‌তের ব্যবস্থা করবেন?'

'রাগ হও ক্যান? কথার কথা বললাম। তোমার ইসতিরি দেখি হাসতাছে। সে বাংলা কথা বুঝে?'

'তাকেই জিজ্ঞেস করুন।'

'একলা একলা বাড়িতে ঢুকতেছে, তারে নিষেধ কর।'

'নিষেধ করতে হবে না। তার বুদ্ধিশুদ্ধি আছে।'

লিলিয়ান হারিকেন হাতে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছে। খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে উঠছে। মনে হচ্ছে এটা তার অনেকদিনের চেনা বাড়ি।

ইস্কান্দর আলি থু করে তাহেরের পায়ের কাছে একদলা থুতু ফেললেন। তাহের চমকে সরে গেল। ইস্কান্দর আলি হাই তুলতে তুলতে বললেন, 'খাওয়ার জইন্যে কিছু খরচ দিও। জিনিসপত্র অগ্নিমূল্য। মাছ এক জিনিস পাওয়াই যায় না। একটা মুরগির বাচ্চা — হের দামই তোমার চল্লিশ, পঞ্চাশ।'

তাহের দুটা পাঁচশ টাকার নোট বের করল। তিনি বিরসমুখে নোট দুটা হাতে নিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাহের বলল, 'উত্তর দিকে ভাঙা দেয়াল ঠিক করার জন্যে টাকা চেয়েছিলেন। পাঠিয়েছিলাম। দেয়াল তো ঠিক হয় নি।'

'বললেই ঠিক হয় না। ইট-সুরকি-সিমেন্ট আনাইতে হয় শহর থাইক্যা। বর্ষা মৌসুমে নৌকা দিয়া আনতে হয়। বিরাট যন্ত্রণা।'

'টাকাটা কী করেছেন?'

'আছে, টাকা আলাদা করা আছে।'

'বাড়িটার এ কী অবস্থা! ভূতের বাড়ি বলে মনে হচ্ছে। আলোর কোনো ব্যবস্থা করেছেন?'

'দুইটা হারিকেন আছে। মোমবাতি আছে।'

'একটা টর্চের ব্যবস্থা করুন।'

'আইচ্ছা করব। বললেই তো হয় না। সব আনতে হয় শহর থাইক্যা। তোমরারে একটা উপদেশ দেই — দোতলায় থাকবা। একতলায় নামনের প্রয়োজন নাই।'

'কেন?'

'সাপের উপদ্রপ। গত চইত মাসে সাপের কামড়ে একটা গরু মারা গেল।'

'কার্বলিক এসিডের ব্যবস্থা করতে পারবেন? এখানে কোনো ফার্মেসি আছে?'

'না। তুমি বললে ছেলে একটারে শহরে পাঠাইতে পারি। এরা কিছুই করে না। বাদাইম্যা হইছে। শহরে যাইতে বললে ফাল দিয়া উঠে।'

'দিন, কাউকে পাঠিয়ে দিন।'

'যাওনের খরচ দেও। আর কী আনা লাগব কাগজে লেইখ্যা দেও। সাপের ওষুধ? ওষুধে কিছু হয় না — কপালে লেখা থাকলে ওষুধের বোতলের ভিতরে বসা থাকলেও সাপে কামরাইব।'

'আমি কাগজে লিখে দিচ্ছি। দয়া করে আনাবার ব্যবস্থা করুন। একশ টাকা দিচ্ছি যাওয়ার খরচ। এতে হবে?'

'আরো কিছু দেও। একশ টাকা আইজকাইল কোনো টাকাই না। তুমি থাক বেদেশে। এই জন্যে বুঝতাছ না। আর একটা কথা, তোমার পরিবাররে নিয়া আমরার বাড়িতে একদিন যাওয়া লাগে। বাড়ির মেয়েছেলেরা দেখতে চায়। এরা আবার কার কাছ থাইক্যা জানি হুনছে —বিলাতের মাইয়াছেলে পিসাব-পায়খানার পরে পানি নেয় না। বড় 'ঘিন্নাকর', কিন্তু কী আর করা! যে দেশে যে নিয়ম। তোমার-আমার করণের কিছু নাই।'

তাহের বিরক্তমুখে বলল, 'ঠিক আছে আপনি এখন যান। রাতে খাবার পাঠিয়ে দেবেন। খাবার পানি পাঠাবেন।'

'আইচ্ছা। তোমরা নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাও। ছেলে দুইটারে বইল্যা দিছি রাইতে পাহারা দিতে। এরা কাজকাম কিছুই করে না। বাদাইম্যা। যে কয়দিন থাকবা এরা পাহারা দিব। কিছু খরচ-বরচ দিও।'

তাহের দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। তার মনটাই খারাপ হয়ে গেল।

লিলিয়ান হারিকেন হাতে দোতলার বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে। তাকে অদ্ভুত সুন্দর লাগছে। ইস্কান্দর আলি দোতলার জানালার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'তোমার ইসতিরি বড়ই সৌন্দর্য। এইটা বিপদের কথা। ডাকাইতে সন্ধান পাইলে বড়ই খুশি হইব।' ইস্কান্দর আলির দুই ছেলেও গভীর আগ্রহ নিয়ে দোতলার বারান্দার দিকে তাকিয়ে আছে। তাদের চোখে পলক পড়ছে না।

লিলিয়ান বারান্দা থেকে চেঁচিয়ে বলল, 'উপরে চলে আস। দোতলাটা অসম্ভব সুন্দর। মার্বেল পাথরের মেঝে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লিলিয়ানের খুব ভালো লাগছে। সে হারিকেন হাতে এক ঘর থেকে আরেক ঘরে যাচ্ছে। তার ভাবভঙ্গি কিশোরীর মতো। যে ঘরে আজ রাতে তারা থাকবে সেই ঘর দেখে সে মুগ্ধ। বিশাল দুটা জানালা। জানালার পাশে দাঁড়ালেই দূরের ব্রহ্মপুত্র দেখা যায়। নদীতে চর পড়েছে। চরের ধবধবে সাদা বালি চাঁদের আলোয় চিকচিক করছে। কী হাওয়া! উড়িয়ে নিয়ে যেতে চায়। শোবার ঘরটা কী প্রকাণ্ড! যেন ফুটবল খেলার মাঠ। মাঠের মাঝখানে খাট পাতা হয়েছে। কালো রঙের একটা খাট, যার চারদিকে রেলিং দেয়া। খাটে সরাসরি উঠার উপায় নেই, এত উঁচু। টুলে পা দিয়ে উঠতে হয়। ঘর ভর্তি ভারি ভারি আলমিরা। লিলিয়ান প্রতিটি আলমিরা খুলে দেখল। সব শূন্য। খাটের মাথার কাছে গোল শ্বেত পাথরের টেবিল। এ বাড়ির অনেক দরজা-জানালা লোকজন খুলে নিয়ে গেছে। এগুলো নেয় নি কেন?

লিলিয়ান বলল, 'এই টেবিল, এই খাট যে কোনো মিউজিয়াম লুফে নেবে। মনে হচ্ছে হাজার বছরের পুরোনো।'

লিলিয়ানের মুগ্ধতা তাহেরকে স্পর্শ করছে না। সে বেশ ক্লান্ত। বারান্দায় রাখা বালতির পানিতে হাত-মুখ ধুয়ে সে বিছানায় বিরসমুখে বসে আছে। এ বাড়িতে রাত্রিযাপন ঠিক হবে কিনা তা বুঝতে পারছে না। সাপের ব্যাপারটা তাকে চিন্তিত করছে।

লিলিয়ান বলল, 'কথা বলছ না কেন?'

'কী বলব?'

'তোমাদের এইসব ফার্নিচারের বয়স কত?'

তাহের হাই তুলতে তুলতে বলল, 'এদের বয়স দুশ বছরের মতো। সবই আমার দাদার বাবা বানিয়েছিলেন। খাটটা বর্মা থেকে কেনা। এই যে বাড়ি দেখছ, এই বাড়িও উনার করা।'

'খুব ধনী মানুষ ছিলেন?'

'হতদরিদ্র ছিলেন। পরের বাড়িতে কামলা খাটতেন। সুপারির ব্যবসা করে ধনী হন। মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে তিনি লাখের বাতি জ্বালিয়েছিলেন।'

'লাখের বাতিটা কী?'

'আমাদের অঞ্চলে নিয়ম ছিল — কেউ লাখপতি হলে লাখের বাতি জ্বালাতে হত। একটা লম্বা বাঁশের মাথায় হারিকেন জ্বালিয়ে ঘরের উঠানে রেখে দিত। এই হল লাখের বাতি। দূর থেকে দেখে লোকজন বুঝত এই অঞ্চলে একজন লাখপতি আছে।'

'এই নিয়ম কি এখনো আছে?'

'পাগল হয়েছ? এই নিয়ম থাকলে উপায় আছে? আজ কোনো বাড়িতে লাখের বাতি জ্বালালে কালই ডাকাতি হবে। সেই বাড়িতে যদি তোমার মতো রূপবতী কেউ থাকে তাহলে তো কথাই নেই।'

'আমার মনে হয় এ বাড়িতে এসে তোমার ভালো লাগছে না।'

'এখন পর্যন্ত ভালো লাগার মতো কোনো কারণ ঘটে নি।'

'আমার কাছে কিন্তু অসাধারণ লাগছে।'

'ভাঙা বাড়ি অসাধারণ লাগছে?'

'পুরোনো বাড়ি ভাঙা তো থাকবেই। এই অঞ্চলের জন্যে পুরোনো বাড়ি সুন্দর মানিয়ে গেছে। ঝকঝকে নতুন বাড়ি এখানে মানাত না। আমি এক ঘর থেকে আরেক ঘরে যাচ্ছি আর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে।'

'ভয়ে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'না ভয়ে না। মনে হচ্ছে এইসব ঘরগুলোতে কত না স্মৃতি, কত রহস্য — আমি ঠিক করেছি আজ সারারাত ঘুমাব না।'

'হারিকেন হাতে এক ঘর থেকে আরেক ঘরে ঘুরবে?'

'হ্যাঁ।'

'খুব ভালো কথা। ঘুরে বেড়াও। দয়া করে আমাকে ঘুমাতে দিও। আমি খুব ক্লান্ত হয়ে আছি। ডিনার শেষ হওয়া মাত্র শুয়ে পড়ব।'

লিলিয়ান বলল, 'তুমি আমাকে ক্রমাগত মশার ভয় দেখিয়েছ। মশা কিন্তু নেই।'

'তাই তো দেখছি। তবে ঘুমাতে হবে মশারি খাটিয়ে। মশা না থাকুক, পোকামাকড় আছে।'

'আজ রাতে না ঘুমালে কেমন হয়?'

'কী বললে?'

'চল আমরা বারান্দায় বসে জোছনা দেখি।'

'আর কোনো পরিকল্পনা আছে?'

'আমার খুব শাড়ি পরতে ইচ্ছা করছে। সুন্দর একটা শাড়ি জোগাড় করতে পারবে? আমাকে শিখিয়ে দেবে কী করে পরতে হয়?'

'তোমার কি মনে হয় না লিলিয়ান তুমি বাড়াবাড়ি করছ?'

'না, আমার মনে হয় না।'

'আমার কিন্তু মনে হচ্ছে তুমি বাড়াবাড়ি করছ।'

লিলিয়ান কিছুক্ষণ স্থির চোখে তাকিয়ে থেকে বলল, 'তোমার এ রকম মনে হয়ে থাকলে আমি দুঃখিত। আমার যা মনে হয়েছে আমি তোমাকে বলেছি। তোমাদের এই বাড়িটা ভাঙা। দরজা-জানালা লোকজন খুলে নিয়েছে। তারপরেও এ বাড়িতে পা দেয়ার পর থেকে আমার ভালো লাগছে। এক ধরনের আনন্দ অনুভব করছি। সেই আনন্দ লুকানোর চেষ্টা করি নি। হয়তো সেটা করাই উচিত ছিল।

লিলিয়ান বারান্দায় চলে গেল। তার খুব খারাপ লাগছে। চোখে পানি এসে যাচ্ছে। এই দৃশ্য দেখলে তাহের হেসে উঠতে পারে। লিলিয়ান চোখের পানি দিয়ে তাহেরকে হাসাতে চায় না। লিলিয়ান একটা ঘর থেকে অন্য ঘরে যেতে লাগল। তার কাছে কেন জানি মনে হচ্ছে, ঘরগুলি তাকে ডেকে বলছে, 'এস লিলিয়ান, এস। আমাকে দেখে যাও।'

তাহের এসে লিলিয়ানকে আবিষ্কার করল সর্বদক্ষিণের বারান্দায়। এখান থেকেই লোহার সিঁড়ি নিচে নেমে গেছে।

'লিলিয়ান!'

'কি?'

'তুমি কি আমার উপর রাগ করেছ?'

'না।'

'মনে হচ্ছে তুমি রাগ করেছ। আসল ব্যাপার কি জান, আমার চাচার সঙ্গে কথা বলে মেজাজ হয়েছে খারাপ। কিছুই ভালো লাগছিল না। এই কারণেই তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছি। কিছু মনে কোরো না।'

'আমি কিছু মনে করি নি।'

'খাওয়াদাওয়ার পর আমরা ছাদে বসে জোছনা দেখব।'

'ছাদে ওঠার সিঁড়ি আছে?'

'হ্যাঁ, সিঁড়ি আছে। তালাবন্ধ। চাচার ছেলেটাকে পাঠিয়েছি চাবি আনতে।'

'থ্যাংক ইউ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তোমার খিদে পেয়েছে লিলিয়ান?'

'এখনো খিদে পায় নি।'

'একটা বিরাট ভুল হয়েছে। ওদের বলে দেয়া উচিত ছিল মসলা কম দিতে। এরা প্রচুর মসলা দিয়ে রান্না করবে। ঝালের জন্যে কিছু মুখে দিতে পারবে না।'

'আমার খাওয়া নিয়ে ভেব না। তুমি যা খেতে পারবে, আমিও পারব।'

'সব ঘর দেখা হয়েছে?'

'হ্যাঁ।

'আয়নাঘর? আয়নাঘর দেখেছ?'

'না তো! আয়নাঘর কী?'

'ওটা একটা ইন্টারেস্টিং ঘর। আমার দাদার বাবা — দি গ্রেট জাঙ্গির মুনশি, এই ঘর বানিয়েছিলেন। তালাবন্ধ কিনা জানি না। তালাবন্ধ থাকার কথা। চল দেখি — খুঁজে বের করতে হবে — কোন দিকে তাও জানি না।'

ঘরটা তালাবন্ধ। বেশ বড় তালা ঝুলছে। কয়েকবার ঝাঁকি দিতেই তালা খুলে গেল। অনেকদিন বন্ধ থাকায় ঘরে ভাপসা জলজ গন্ধ। ছোট্ট ঘর, কোনো জানালা নেই। ঘরে ঢোকার একটিই দরজা। সেই দরজাও নিচু। ঘরের একদিকের পুরো দেয়াল জুড়ে বিশাল আয়না। অন্য পাশে কাবার্ড।

লিলিয়ান বলল, 'এত বড় আয়না কোথায় পেলেন?'

তাহের হাসতে হাসতে বলল, 'জানি না কোথায় পাওয়া গেছে। দি গ্রেট জাঙ্গির মুনশি জোগাড় করেছিলেন সাহেব বাড়ি থেকে। অর্থাৎ ইংরেজদের কাছ থেকে। এই ঘরটার নাম হল আয়নাঘর। জাঙ্গির মুনশির স্ত্রী তিতলী বেগম এই ঘরে সাজগোজ করতেন। সাজের সময় বাইরের কেউ যেন দেখতে না পায় এ জন্যেই এ ঘরের কোনো জানালা নেই। লক্ষ করেছ?

'হ্যাঁ, লক্ষ করেছি।'

'ঐ মহিলা অসম্ভব রূপবতী ছিলেন। তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রের জন্মদিনে মারা যান। মাত্র ষোল বছর বয়সে।'

'আহা!'

'আয়নাঘর উনার খুব প্রিয় ছিল। উনি যখন মোটামুটি নিশ্চিত হলেন যে মারা যাচ্ছেন তখন তিনি তাঁর স্বামীকে বলেন তাঁকে আয়নাঘরে নিয়ে যেতে। তাই করা হল। তিনি মারা গেলেন আয়নাঘরে। জাঙ্গির মুনশি দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন নি। স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি প্রায় চল্লিশ বছর বেঁচে ছিলেন। এই চল্লিশ বছর তিনি আয়নাঘর বন্ধ করে রেখেছিলেন। একদিনের জন্যেও খোলেন নি। উনার মৃত্যুর পর আয়নাঘর প্রথম খোলা হয়। এস লিলিয়ান, খুব সম্ভব খাবার নিয়ে এসেছে। খেয়ে নিই। খিদে লেগেছে। তাছাড়া আমার বেশিক্ষণ থাকা ঠিকও নয়। আয়নাঘরে কোনো পুরুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ।'

'তুমি যাও। আমি এই ঘরে একটু একা একা থাকি।'

'কেন বল তো?'

'আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে ভালো লাগছে। এই দেখ আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে — দেখ, দেখ।'

তাহের বিস্মিত হয়ে বলল, 'হ্যাঁ দেখলাম। কারণটা কী?'

'প্রায় দেড়শ বছর আগে এই বাড়ির বউ এক আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখেছিল। আজ আমি নিজেকে দেখছি। আমিও এই বাড়িরই বউ। এই আয়নাটা আমার।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাহের বিস্মিত চোখে তাকিয়ে রইল।

লিলিয়ান বলল, 'আমি যখন অসুস্থ হয়ে পড়ব তখন তুমি আমাকে এই বাড়িতে নিয়ে আসবে। আমি চাই আমার মৃত্যু যেন আয়নাঘরে হয়।

'সে তো অনেক দূরের ব্যাপার। আপাতত ভাত খাই চল।'

'প্লিজ, প্লিজ, আমি খানিকক্ষণ এখানে একা থাকব। খুব অল্প কিছুক্ষণ।'

তাহের চিন্তিতমুখে বের হয়ে এল। লিলিয়ান তাকিয়ে আছে আয়নার দিকে। তাহের লিলিয়ানের কাণ্ডকারখানা কিছুই বুঝতে পারছে না।

রান্নার আয়োজন ভালো। রুই মাছ ভাজা। পোলাও-কোরমা। এক বাটি পায়েস। লিলিয়ানের জন্যে একটা কাঁটা চামচও দেয়া হয়েছে। তবে পোলাও সিদ্ধ হয় নি — চাল চাল রয়ে গেছে। কোরমা রান্না হয়েছে প্রচুর পরিমাণে চিনি দিয়ে। খেতে রসগোল্লার মতো লাগছে। তাহের বিরক্তমুখে বলল, 'ভাজা মাছ খেয়ো না লিলিয়ান। মাছটা পচা বলে ভেজে ফেলেছে।'

খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে পানটাই আরাম করে খাওয়া গেল। মৌরী দিয়ে সুন্দর করে বানানো। লিলিয়ান দুটা পান মুখে দিল। সে বিস্মিত হয়ে বলল, 'খাওয়াদাওয়া শেষ হলে তোমরা ভেজিটেবল খাও কেন তা তো বুঝলাম না।'

তাহের বলল, 'এটা ভেজিটেবল না। এর নাম পান। খাবার পর খেতে হয়। কোৎ করে গিলে ফেললে হবে না। ক্রমাগত চিবিয়ে যাবে। গিলতে পারবে না।'

'কতক্ষণ চিবাব?'

'আধঘণ্টা তো বটেই।'

'তাতে লাভ কী?'

'মুখের একটা একসারসাইজ হয়। এইটুকুই লাভ।'

'ঠাট্টা করছ?'

'মোটেই ঠাট্টা করছি না। তুমি কী ভেবেছ? আমার কাজ শুধু ঠাট্টা করা?'

'জিনিসটা খেতে আমার ভালো লাগছে।'

'ভালো লাগলে খাও। আমাদের গ্রামের নতুন বউদের অবশ্যপালনীয় কর্তব্যের একটি হচ্ছে পান খেয়ে ঠোঁট লাল করা।'

'আমি তো নতুন বউ না।'

'অবশ্যই নতুন বউ। ছেলেমেয়ে না হওয়া পর্যন্ত আমাদের দেশের বউদের নতুন বউ ধরা হয়।'

'কোনো মহিলার দশ বছরেও যদি ছেলেমেয়ে না হয় তাহলে কি তাকে নতুন বউ ধরা হবে?'

'না। তখন তাকে বলা হবে বাঁজা মেয়েমানুষ। অমঙ্গলজনক একটি ব্যাপার। সেই মেয়েকে কোনো উৎসবে ডাকা হবে না। সকালবেলা কেউ তার মুখ দেখতে চাইবে না।'

'তোমাদের নিয়মকানুন ভারি অদ্ভুত।'

'অদ্ভুত তো বটেই। আরো অদ্ভুত কথা শুনবে? আমাদের দেশে স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে পাশাপাশি বসে পূর্ণিমার চাঁদের দিকে তাকাবে না।'

'তাকালে কী হয়?'

'তাকালে তাদের যে সন্তান হবে সে হবে চরিত্রহীন।'

'আবার তুমি তামাশা করছ। কী জন্যে করছ তাও বুঝতে পারছি। তুমি আমার সঙ্গে জোছনা দেখতে চাচ্ছ না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'জোছনা দেখতে অসুবিধা নেই। চাঁদের দিকে না তাকালেই হল।'

'ছাদে সত্যি সত্যি বসবে আমার সঙ্গে?'

'হুঁ বসব। তবে ছাদে না। বারান্দায়। তোমার বিখ্যাত চাঁদ বারান্দা থেকেও দেখা যায়। চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমি যদি মুগ্ধ হয়ে ঘুমিয়ে পড়ি কিছু মনে কোরো না। ঘুমিয়ে পড়ার সম্ভাবনা নিরানব্বই দশমিক নয় ভাগ।'

ইস্কান্দর আলির মেজো ছেলে বারান্দা ঝাঁট দিচ্ছে। তাহের তাকে বারান্দায় চাদর পাততে বলেছে। এই ছেলেই খাবার নিয়ে এসেছে। বাজার থেকে জিনিসপত্র কিনে এনেছে। তার বুদ্ধি কোন পর্যায়ের তাহের এখনো ধরতে পারছে না। সে টর্চ কিনে এনেছে, কিন্তু ব্যাটারি আনে নি।

'তোমার নাম কি?'

'ছালাম।'

'ছালাম, না সালাম?'

'ছালাম। ছালাম আলি।'

'ছালাম তোমাকে টর্চের ব্যাটারি আনতে যেতে হবে, পারবে না?'

'হুঁ।'

'দোকান কি অনেক দূর?'

'হুঁ।'

'দূর হলে থাক, সকালে এনে দিও।'

'ছাইকেল আছে।'

'সাইকেল থাকলে সাইকেলে করে নিয়ে এস।'

তারা ঘুমাতে গেল রাত দুটায়। তাহের বলল, 'হারিকেন জ্বালানো থাকুক।' লিলিয়ান বলল, 'হারিকেন জ্বালানো থাকলে ঘরে চাঁদের আলো আসবে না।' তাহের বলল, 'তোমার ভেতর এত কাব্যভাব আছে তা কিন্তু আমার জানা ছিল না।'

'জানা থাকলে কী করতে, আমাকে বিয়ে করতে না?'

তাহের হাসল। হাসতে হাসতে বলল, 'চা খেতে ইচ্ছা করছে। আমার সমস্যা হচ্ছে ঘুমের প্রথম ধাক্কাটা কেটে গেলে ঘুম আসে না। আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি, বাকি রাতটা তুমি আরাম করে ঘুমাবে, আর আমাকে জেগে থেকে তোমার বিখ্যাত জোছনা দেখতে হবে।'

'চা সত্যি খেতে চাও? আমার কাছে টি-ব্যাগ আছে, সুগার কিউব আছে। শুধু দুধ নেই।'

'পানি গরম করবে কীভাবে?'

'কাগজ জ্বালিয়ে পানি গরম করব।'

'কাগজ পাবে কোথায়?'

'তুমি ডার্টি জোকস-এর যে বইটি এনেছ, সেটা পুড়িয়ে ফেলব। বানাব চা?'

'মন্দ না। পারলে বানাও।'

'তুমি চুপচাপ বিছানায় বসে থাক। আমি চা বানিয়ে আনছি।'

'আমি তোমার পাশে বসি।'

লিলিয়ান চায়ের পানি গরম করছে। পাশে বসে আছে তাহের। তার ঘুম কেটে গেছে বলে মনে হচ্ছে না। সে খানিকক্ষণ পরপর হাই তুলছে। লিলিয়ান বলল, 'তুমি ঐ মহিলা সম্পর্কে আরো কিছু বল।'

'কোন মহিলা?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আয়নাঘরে যিনি মারা গিয়েছিলেন।'

'আমি কিছুই জানি না। খুব রূপবতী ছিলেন, এইটুকু জানি। জাঙ্গির মুনশি বেনারস থেকে একজন আর্টিস্ট এনে তাঁর কিছু ছবি আঁকিয়েছিলেন। সেইসব ছবি দেখলে তাঁর সম্পর্কে আন্দাজ পেতে। তাঁর কোনো ছবিও নেই। উনার মৃত্যুর পর জাঙ্গির মুনশি তাঁর স্ত্রীর সব ছবি পুড়িয়ে ফেলেন।'

লিলিয়ান কোমল গলায় বলল, 'উনাকে খুব দেখতে ইচ্ছা করছে।'

তাহের চা খাচ্ছে। কাচের গ্লাসে চা দেয়া হয়েছে। গ্লাস গরম হয়ে গেছে — চা খাওয়া যাচ্ছে না। তাহের চায়ের গ্লাসে ফুঁ দিতে দিতে বলল, 'আমার মা'র ধারণা উনি একবার তিতলী বেগমকে দেখেছিলেন।'

'উনি দেখলেন কীভাবে?'

'মা'র ধারণা, দেখেছেন। গভীর রাতে আয়নাঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছেন — হঠাৎ শোনেন আয়নাঘরের ভেতর থেকে ঝুনঝুন চুড়ির শব্দ। আয়নাঘর তালাবন্ধ। চুড়ির শব্দ কীভাবে আসবে? মা খুব অবাক হলেন। উনার সাহসের সীমা ছিল না। চাবি নিয়ে আয়নাঘর খুললেন। মোমবাতি হাতে একা একা আয়নাঘরে ঢুকলেন।'

'তারপর?'

'তারপরের ব্যাপার পরিষ্কার জানা যায় না। মা কিছু একটা দেখেছিলেন। কী দেখেছিলেন কিছুই ভেঙে বলেন নি। এরপর থেকে তাঁর অভ্যাস হয়ে গেল — গভীর রাতে আয়নাঘরের দরজা খুলে সেখানে ঢুকতেন। অনেকক্ষণ থাকতেন। আয়নাঘরের মেঝেতে পাটি পেতে দুপুরে ঘুমাতেন। আমার বাবা জানতে পেরে খুব রাগ করেন। বাবার ধারণা, এই বাড়িটা অভিশপ্ত। এ বাড়িতে থাকলে অকল্যাণ ছাড়া কল্যাণ হবে না। তিনি মাকে নিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যান।'

'কোথায় যান?'

'প্রথমে ময়মনসিংহ শহরে যান। সেখান থেকে যান ঢাকায়। ঢাকায় যাবার পর থেকে মা'র মাথায় পাগলামি ভর করে। তিনি রাতে একেবারেই ঘুমাতেন না। ছটফট করতেন। আর বলতেন —ঐ বাড়ি ফেলে এসেছি — উনি খুব রাগ করছেন। খুব মন খারাপ করছেন। উনার কত শখ বাড়ি ভর্তি থাকবে ছেলেমেয়েতে। তারা হৈচৈ করবে, চেঁচামেচি করবে।'

'উনি মানে কে? তিতলী বেগম?'

'হুঁ। মা খুব কান্নাকাটি শুরু করেন বাড়ি যাবার জন্যে। বাবা পাত্তাই দেন নি। বাবা বলতেন — ঐ বাড়িতে থাকার জন্যেই তোমার মাথার দোষ হয়েছে। আমি ওখানে তোমাকে নিয়ে যাব না। বাবা নিয়ে যান নি। মা'র মৃত্যু হয় ঢাকায়।'

'তোমার কি মনে হয় না তোমার বাবা ভুল করেছিলেন?'

'না মনে হয় না। বাবা যুক্তিবাদী মানুষ ছিলেন। মা'র মনের ভ্রান্তিকে তিনি আমল দেন নি। তুমি নিশ্চয়ই মনে কর না আয়নাঘরে একজন মৃত মানুষ বাস করে।'

'জগৎ বড়ই রহস্যময় তাহের!'

'জগৎ মোটেই রহস্যময় নয়। জগৎ কঠিন নিয়ম-শৃঙ্খলায় বাঁধা। প্রকৃতি কখনো কোনো নিয়মের ব্যতিক্রম হতে দেয় না। রহস্যের বাস মানুষের মনে। মানুষই রহস্য লালন করে। যেমন তুমি কর। কত আয়োজন করে জোছনা দেখলে। জোছনার যে সৌন্দর্য তার সবটাই তুমি আরোপ করেছ। জোছনা কী? সূর্যের প্রতিফলিত আলো — একে নিয়ে মাতামাতি করার কিছু নেই। কিন্তু তুমি মাতামাতি করছ। তোমার মতো অনেকেই করছে। কবিতা লেখা হচ্ছে। গান লেখা হচ্ছে — আজ জোছনা রাতে সবাই গেছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বনে...'

লিলিয়ান বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে। 'ছালাম' সব কাজ ফেলে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে লিলিয়ানের দিকে। লিলিয়ান বাংলায় বলল, 'আপনাদের পাঠানো খাবার উত্তম হয়েছে। পান খুবই উত্তম হয়েছে।' ছালাম কিছু বলছে না। তাকিয়ে আছে। মনে হচ্ছে লিলিয়ানের কোনো কথা তার কান দিয়ে ঢুকছে না। লিলিয়ান বলল, 'আমি আমাদের এই বাগান প্রাতঃকালে পরিচ্ছন্ন করব। আমি কিছু লেবারার নিয়োগ করব। দয়া করে আমাকে সাহায্য করবেন। আপনি কি আমার বাংলা ভাষা বুঝতে পারছেন?'

ছালাম কিছু বলল না। সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেল। তাহের বলল, 'বিদেশি উচ্চারণে তোমার অদ্ভুত বাংলা সে কিছুই বোঝে নি। বোঝার চেষ্টাও করে নি। আমিই বুঝতে পারি না, আর বুঝবে ছালাম আলি! সে হাঁ করে তাকিয়ে ছিল তোমার দিকে। যাই হোক, এসে বস এখানে। জোছনা দেখ।'

লিলিয়ান বসল। তাহের হাই তুলতে তুলতে বলল, 'কাপাচিনো কফি খেতে পারলে ভালো হত। যা ঘুম পাচ্ছে বলার না। চাঁদটাকে ঘুমের ট্যাবলেটের মতো লাগছে। যতই দেখছি ততই ঘুম পাচ্ছে। ভালো কথা, জঙ্গল পরিষ্কারের কথা কী বলছ? এইসব মাথা থেকে দূর কর।'

'না দূর করব না। আমি বাগান পরিষ্কার করব। বাড়ি ঠিকঠাক করব। আমাদের এত সুন্দর বাড়ি এভাবে পড়ে থাকবে?'

'সুন্দর দেখলে কোথায়?'

'আমার কাছে খুব সুন্দর লাগছে।'

'আচ্ছা ধরে নিলাম সুন্দর। কে থাকবে তোমার এই সুন্দর বাড়িতে?'

'আমরা দুজন থাকব। আমাদের ছেলেমেয়েরা থাকবে। এরা বাগানে খেলবে। আমি এদের জন্যে দোলনা বানিয়ে দেব। জোছনা রাতে বাচ্চাদের হাত ধরে আমরা নদীর পাড়ে হাঁটব। আর একটা বড় নৌকা কিনব। নদীর ঘাটে নৌকা বাঁধা থাকবে।'

তাহের হাসতে হাসতে বলল, 'কী বলছ পাগলের মতো?'

'আমার মনের ইচ্ছার কথা তোমাকে বলছি।'

'লোকালয় ছেড়ে আমরা বনে পড়ে থাকব?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার কী হয়েছে বল তো লিলিয়ান?'

'বুঝতে পারছি না।'

'আমার মনে হয় ঘুমের অভাবে তোমার চিন্তাশক্তি এলোমেলো হয়ে গেছে। ভালো করে ঘুমাও — দেখবে মাথা থেকে ভূত নেমে গেছে। চল শুয়ে পড়ি।'

'তুমি শুয়ে পড়। আমি খানিকক্ষণ বসি।'

'আচ্ছা বস, আমি তাহলে এখানেই শুয়ে থাকি। তোমার যখন জ্যোৎস্না দেখা শেষ হবে, আমাকে ডেকে দিও।'

'একটুক্ষণ জেগে থাক না। আমার খুব গল্প করতে ইচ্ছা করছে।'

তাহের হাই তুলতে তুলতে বলল, 'আমি জেগে থাকার চেষ্টা করছি। তুমি গল্প শুরু কর। আমার পক্ষে গল্প করা সম্ভব না। আমার পক্ষে যা সম্ভব তা হচ্ছে হাই তোলা। ঐ কাজটা আমি দায়িত্বের সঙ্গে করে যাচ্ছি।' তাহের দেয়ালে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করল। মনে হচ্ছে সে ঘুমিয়ে পড়েছে।

লিলিয়ান গলার স্বর হঠাৎ অনেকখানি নিচে নামিয়ে বলল, 'আমি তোমাকে কতখানি ভালবাসি তা কি তুমি জান?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাহের চোখ না মেলেই বলল, 'জানি।'

'কীভাবে জান?'

'বলতে চাচ্ছি না। বললে তুমি লজ্জা পাবে।'

'আমি লজ্জা পাব না। তুমি বল। আমার শুনতে ইচ্ছে করছে।'

'তোমার শুনতে ইচ্ছা করলেও আমার বলতে ইচ্ছা করছে না। আমার ঘুমাতে ইচ্ছা করছে। আমি কি তোমার কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়তে পারি?'

'হ্যাঁ পার। আমি সারারাত কিন্তু এখানেই বসে থাকব। তুমি এইভাবেই ঘুমাবে।'

'তোমার মধ্যে পাগলামির বীজ আছে লিলিয়ান। আমার ধারণা, বেশ ভালোমতো আছে।'

লিলিয়ান হালকা গলায় বলল, 'হয়তো আছে। এই মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছে কি জান? আমার মনে হচ্ছে এই যে — তুমি আমার কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছ — একজন কেউ তা দেখছে। খুব আনন্দ নিয়ে দেখছে।'

'সেই 'একজন কেউ' টা কে? ভূত-প্রেত?'

'বুঝতে পারছি না, তবে তার উপস্থিতি অনুভব করছি।'

'এ বাড়িতে তোমাকে বেশিদিন রাখা ঠিক হবে না। তোমার ব্রেইন পুরোপুরি নষ্ট হবার আগেই আমাদের চলে যেতে হবে।'

ছালাম উঠে এসেছে। তাহের লিলিয়ানের কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে দেখেও সে অস্বস্তি বা লজ্জা কোনোটাই বোধ করল না। শুকনো গলায় তাহেরকে বলল, 'ব্যাটারি আনছি।'

তাহের তাকিয়ে দেখল ছালাম দুটি পেনসিল ব্যাটারি নিয়ে এসেছে। তাহেরের কেন জানি মনে হল সে এটা নির্বুদ্ধিতার কারণে করে নি। ইচ্ছা করে করেছে।

'আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি যাও।'

'আর কিছু লাগব?'

'না, আর কিছু লাগবে না।'

লিলিয়ান বলল, 'আজ হঠাৎ তুমি এত গুছিয়ে কথা বলছ কেন? এত লজিক দিয়ে তুমি কখনো কথা বল না।

'তা বলি না, আজ বলছি। কারণ আমার মনে হচ্ছে তোমার নিজস্ব জগতে লজিকের স্থান খুব কম। তোমার লজিক ভালো থাকলে কখনো আমাকে বিয়ে করতে না। আর করলেও ভালোমতো খোঁজখবর করতে — আমি কে, আমার বাবা-মা'রা কোথায়, ক'ভাই বোন — কোনো প্রশ্ন না, কোনো কৌতূহল না — স্বপ্নে পাওয়া মানুষের মতো বলে বসলে — আমি আমার জীবনটা তোমার সঙ্গে কাটাতে চাই।'

'আমি কি ভুল করেছি?'

'তুমি ভুল করেছ কিনা তা আমি এই মুহূর্তে বলতে পারব না। তুমি নিজেও বুঝবে না। আজ থেকে দশ বা পনের বছর পর ধরতে পারবে।'

'কীভাবে ধরব?'

'আমাকে বিয়ে করার সময়, আমার সম্পর্কে তোমার কিছু প্রত্যাশা ছিল। আমি যদি তা মেটাতে পারি তাহলে বুঝতে হবে আমাকে বিয়ে করে তুমি ভুল কর নি। মজার ব্যাপার হচ্ছে, আমি নিজে এখনো জানি না কোন প্রত্যাশা নিয়ে তুমি আমাকে বিয়ে করেছ। জানলে মেটাবার চেষ্টা করতাম।'

'তোমার প্রতি আমার কোনো প্রত্যাশা নেই। আমাকে তোমার পাশে থাকতে হবে — এটা হল নিয়তি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাহের সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, 'নিয়তি হচ্ছে আরেকটা বাজে কথা। যারা দুর্বল মানুষ, অর্থাৎ যারা দুর্বল লজিকের মানুষ — নিয়তি তাদের একটি প্রিয় শব্দ। এই শব্দ আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত। অভিধান থেকে এই শব্দ তুলে দেওয়া উচিত।'

লিলিয়ান কোমল গলায় বলল, 'পৃথিবীর সব ভাষার অভিধানে কিন্তু এই শব্দটি আছে। নিয়তি বলে কিছু একটা আছে বলেই আছে।'

তাহের রাগী গলায় বলল, 'তুমি একটা হাস্যকর লজিক দিলে লিলিয়ান। অভিধানে দৈত্য শব্দটাও আছে। পরী আছে, ড্রাগন আছে, মৎস্যকন্যা আছে। তুমি কি কখনো দৈত্য, পরী বা ড্রাগন দেখেছ? পৃথিবীর কেউ কি দেখেছে?'

'না দেখে নি। এত রেগে যাচ্ছ কেন? চল ঘুমাতে যাই।'

তাহের মুখে বলছিল তার ঘুম ছুটে গেছে, বাস্তবে দেখা গেল বিছানায় শোয়ামাত্র তার নাক ডাকতে শুরু করেছে। হারিকেন নিভিয়ে লিলিয়ান এসে পাশে শুয়েছে। তার ঘুম আসছে না। জানালা গলে জোছনা এসে পড়েছে তাদের খাটের এক মাথায়। কী সুন্দর যে লাগছে দেখতে! বাইরের বাগানে পাখি ডাকছে। লিলিয়ান কোন বইয়েও যেন পড়েছিল — রাতে কখনো পাখি ডাকে না। বইয়ের তথ্য ঠিক না— অনেক পাখিই ডাকছে। ঝিঁঝির ডাকের সঙ্গেও বোধহয় পাখির ডাকের এক ধরনের সম্পর্ক আছে। ঝিঁঝির ডাক যখন থামছে তখনি শুধু পাখি ডাকছে। ঝিঁঝি এবং পাখি কখনোই একসঙ্গে ডাকছে না।

শোবার ঘরের দরজায় খুট করে শব্দ হল। কে যেন দরজায় হাত রেখেছে। এ ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করা যায় নি। দরজার ছিটকিনিতে জং পড়েছে। কিছুতেই নড়ানো যায় না। কেউ যদি সত্যি সত্যি এসে থাকে সে অল্প ধাক্কা দিয়েই দরজা খুলতে পারবে। আশ্চর্য তো, দরজা খুলে যাচ্ছে। লিলিয়ান তাহেরের গায়ে হাত রাখল। তাহের ঘুমের মধ্যেই বলল, 'আহ্, কী কর!'

লিলিয়ান হাত সরিয়ে নিল। সে খোলা দরজার দিকে তাকিয়ে আছে। তার কাছে মনে হচ্ছে দরজার ওপাশে কেউ একজন আছে। সে গভীর আগ্রহ নিয়ে তাকে দেখছে। লিলিয়ান বলল, 'কে?'

ফিসফিস করে কেউ কি জবাব দিল? খুব হালকা স্বর যা বাতাসে ভেসে চলে যায়। লিলিয়ান খুব সাবধানে বিছানা থেকে নামল। এগুলো দরজার দিকে। তার মোটেও ভয় করছে না। বরং ভালো লাগছে।

না, দরজার ওপাশে কেউ নেই। ফাঁকা সিঁড়ি। রেলিং গলে জোছনা পড়ে অপূর্ব সব নকশা তৈরি হয়েছে। নকশার ভেতর দিয়ে হাঁটতে কেমন লাগবে? লিলিয়ান হাঁটছে। হাঁটতে হাঁটতে সে আয়নাঘরের সামনে চলে এল। আয়নাঘরের দরজা ভেজানো। তার ইচ্ছা করতে লাগল ভেজানো দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতে। ভেতরটা নিশ্চয়ই অন্ধকার। দরজা খুলে দিলে চাঁদের আলো কি ঘরে ঢুকবে?

লিলিয়ান দরজা খুলল। চাঁদের আলো ঘরে ঢুকেছে। আয়নার একটা অংশ আলোকিত হয়ে আছে। কী সুন্দর লাগছে দেখতে! শোবার ঘর থেকে ঘুমের ঘোরে তাহের ডাকল, 'লিলিয়ান!'

শোবার ঘরে যেতে ইচ্ছা করছে না। আয়নাঘরের মেঝেতে পাটি পেতে শুয়ে থাকতে ইচ্ছা করছে। পাটি ছাড়াও সিমেন্টের মেঝের উপর শুয়ে থাকা যায়। এ ঘরের মেঝে কালো সিমেন্টের। খুব মসৃণ। কেমন ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব।

তাহের আবার ডাকল, 'লিলিয়ান!' এবার বোধহয় সে জেগে উঠেছে। লিলিয়ান ক্লান্ত গলায় বলল, 'কি?'

'পানি খাব।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আনছি।'

পানির গ্লাস নিয়ে লিলিয়ান আবার শোবার ঘরে চলে এল। তাহেরের গায়ে হাত রেখে মনে মনে বলল, I love you. যদিও মনে মনে বলার প্রয়োজন ছিল না। তাহের ঘুমিয়ে আছে। এই বাক্যটি শব্দ করেও বলা যেত। তবু কিছু কিছু কথা আছে, মনে মনে বলতেই ভালো লাগে।

৬

খুব ভোরে পাখির কিচকিচ শব্দে লিলিয়ানের ঘুম ভেঙেছে। এত পাখিকে সে একসঙ্গে কখনো ডাকতে শোনে নি। তাহেরকে ডেকে তুলে পাখির গান শোনাতে ইচ্ছা করছে। ডেকে লাভ হবে না। এত ভোরে সে উঠবে না। ছুটির দিনে ন'টা-দশটার আগে তার ঘুম ভাঙে না। এখন তো প্রতিদিনই ছুটি। লিলিয়ান বিছানা ছেড়ে বাগানে গেল। কাল রাতে যে বাগানটাকে ভয়াবহ জঙ্গল বলে মনে হচ্ছিল এখন তা মনে হচ্ছে না। ঝোপঝাড় ঠিকই আছে, ঝোপঝাড়ের জন্যেই ভালো লাগছে। বাগানটা বেশ বড়, বেশির ভাগ গাছই তার অচেনা। তাহেরের কাছ থেকে গাছের নামগুলো জেনে নিতে হবে। একটা বড় গাছের সামনে লিলিয়ান থমকে দাঁড়াল। এ গাছটা চেনা চেনা লাগছে। মনে হচ্ছে ওলিভ গাছ। এ দেশে কি ওলিভ গাছ হয়? একেক দেশে একেক রকম গাছ, সেই হিসেবে মানুষেরও তো একেক রকম হওয়া উচিত। এ বিষয়ে তাহেরের মতামত কী জিজ্ঞেস করতে হবে।

একটা গাছের নিচটা বাঁধানো। এখানে বসে সকালের ব্রেকফাস্ট খেলে কেমন হয়? তাহেরকে বললে সে হয়তো আবার মুখ বাঁকিয়ে বলবে — 'তুমি কিন্তু বাড়াবাড়ি করছ।'

লিলিয়ানের ধারণা, সে মোটেই বাড়াবাড়ি করছে না। এই যে বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছে এটা কি বাড়াবাড়ি? নিশ্চয়ই বাড়াবাড়ি না। সে দেখছে মোট কত ধরনের গাছ এখানে আছে।

ইস্কান্দর আলির সঙ্গে বাগানেই লিলিয়ানের দেখা হল। তিনি সকালের নাশতা নিয়ে এদিক আসছেন। এক হাতে টিফিন ক্যারিয়ার, অন্য হাতে ফ্লাস্ক। লিলিয়ানকে দেখে তিনি থমকে দাঁড়ালেন। লিলিয়ান বলল, 'গুড মর্নিং!'

তিনি হাসিমুখে মাথা নাড়লেন। লিলিয়ান বাংলায় থেমে থেমে বলল, 'আপনি কেমন আছেন?'

ইস্কান্দর আলি থতমত খেয়ে বললেন, 'জ্বে ভালো। এইখানে কী করেন?'

'আমি বাগান দেখছি।'

'বাগানে দেখার কিছু নাই। সাপের আড্ডা। প্রতি বছর একটা-দুইটা গরু মরে। সাপ চিনেন তো?'

'জ্বি, আমি সাপ চিনি।'

'বড়ই ভয়ংকর জিনিস। চলেন উপরে যাই। নাশতা নিয়া আসছি। খিচুড়ি আর ডিমের তরকারি। গৈ-গেরাম জায়গা। কিচ্ছু পাওয়া যায় না। সব জিনিস শহর থাইক্যা আনা লাগে। অনেক খরচ পড়ে।'

লিলিয়ান সব কথা বুঝতে না পারলেও আন্দাজ করছে— এই মানুষটি বলছে : শহর থেকে জিনিস আনতে হয় বলে টাকা বেশি লাগে। লিলিয়ান বলল, 'আপনি তাহেরকে বলবেন, ও টাকা দেবে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বলতেও শরম লাগে। কত টাকা সে আনছে কিছুই তো জানি না।'

'ও যথেষ্ট টাকা-পয়সা এনেছে। আমরা বাড়িঘর ঠিক করব, টাকা লাগবে।'

'বাড়িঘর ঠিক কইরা ফয়দা কী? কে থাকব?'

'আমরা থাকব। আচ্ছা, আপনি বলুন তো এই গাছটার কি নাম?'

'জলফই গাছ।'

'আমি ঠিক করেছি আমি এবং তাহের এই গাছের নিচে বসে সকালের ব্রেকফাস্ট করব। কাউকে দিয়ে কি পরিষ্কার করিয়ে দিতে পারবেন?'

'পারব। কিছু খরচ-বরচ লাগবে। টাকা ছাড়া কাউরে দিয়া কিছু করান যায় না। যে যুগের যে ভাও। দুনিয়া গেছে উল্টাইয়া।'

লিলিয়ান ইস্কান্দর আলিকে নিয়ে বাগানে ঘুরছে। গাছের নাম জিজ্ঞেস করছে। অনেকগুলি নাম লিলিয়ান শিখে ফেলল — আমগাছ, তেঁতুলগাছ, বেলগাছ, কাঁঠালগাছ, জলফইগাছ, গাবগাছ...।

লিলিয়ানের খুব ভালো লাগছে। তাহেরের ঘুম না ভাঙা পর্যন্ত সে বাগানে বাগানে ঘুরল।

তাহের নাশতা খেয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ল। দুপুরের খাবার খেয়েও ঘুমাতে গেল। তার ঘুম ভাঙল বিকেলে। সে হাসিমুখে বলল, 'ইচ্ছা করে ঘুম স্টক করে নিয়েছি। আজ রাত জাগব। তোমাকে নিয়ে ছাদে বসে থাকব। কাল ছাদে যাওয়া হয় নি। আজ হবে। ছাদটা সুন্দর। ছাদ থেকে ব্রহ্মপুত্র পরিষ্কার দেখা যায়। ব্রহ্মপুত্র নদীতে নৌকাভ্রমণ করতে চাও?'

'চাই!'

'দেখি খোঁজ করে।'

তাহের হাই তুলতে তুলতে বলল, 'বেশি ঘুমানোর প্রবলেম কি জান? নেশা লেগে যায়। তখন শুধু ঘুমাতে ইচ্ছা করে।'

'তুমি কি আবার ঘুমাবে?'

'না।'

'বাগানে যাবে? চল বাগানে যাই। বিকেলের চা'টা বাগানে বসে খাই।'

'ওরে সর্বনাশ! বিকেলে বাগানে যাওয়াই যাবে না। বিকেলে সাপরা খুব উত্তেজিত থাকে। বিকেলে দোতলা থেকে নিচে নামাটা হবে চরম বোকামি। বরং চল ছাদে বসে চা খাই।'

'বেশ চল।'

'তোমাকে আরেকটা কথা বলা দরকার। আজ রাতই কিন্তু এ বাড়িতে আমাদের শেষ রজনী। কাল ভোরে আমরা চলে যাব। তোমার যা দেখার দেখে নাও। ছবি তুলতে চাইলে ছবি তোল —। ক্যামেরাটা বের কর তো!'

লিলিয়ানের মন খারাপ হয়ে গেল। আজই শেষ রজনী? লিলিয়ান কিছু বলল না। ছবি তোলার ব্যাপারে তার কোনো আগ্রহ দেখা গেল না।

বিকেলে ছাদে চা খাওয়া হল না। কারণ ছাদের দরজার চাবি নেই। ছালাম চাবি নিয়ে এল অনেক রাতে। সেই চাবিতে তালা না খোলায় তালা ভাঙতে হল। ছাদে পাটি পেতে বিছানা করতে করতে রাত দশটার মতো বেজে গেল। লিলিয়ানের খুব শখ ছিল শাড়ি পরবে। শাড়ি জোগাড় হয় নি। সে তার সবচে' সুন্দর ড্রেসটি পরে ছাদে বসে আছে। তাহের ছালামকে বিদেয় করে ছাদে আসবে। সে আসতে খুব দেরি করছে। একা একা ছাদে বসে থাকতে লিলিয়ানের খুব খারাপ লাগছে না। বরং ভালোই লাগছে। তবে আজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গত রাতের মতো জোছনা হয় নি। আকাশে মেঘ। মরা জোছনা।

তাহের ছাদে এল এগারটার দিকে। বিরক্তমুখে বলল, 'লিলিয়ান, ছাদের প্রোগ্রামটা আধঘণ্টা পিছিয়ে দিতে হবে। আমার চাচা খবর পাঠিয়েছেন। অত্যন্ত জরুরি কী একটা কথা নাকি এই মুহূর্তে আমাকে বলা দরকার। তাঁর হাঁপানির টান উঠেছে। তিনি আসতে পারছেন না। তুমি শোবার ঘরে গিয়ে বস। আমি ফিরে এসে তোমাকে নিয়ে ছাদে যাব।

তারা ছাদ থেকে নেমে এল। লিলিয়ান বুঝতে পারছে তাকে একা ফেলে তাহেরের যেতে ইচ্ছা করছে না। লিলিয়ান বলল, 'আমিও যাই তোমার সঙ্গে?'

'তিনি বলে দিয়েছেন আমি যেন একা যাই। তোমার ভয়ের কিছু নেই। তাঁর বড় ছেলেটা এখানে থাকবে।'

'আমি মোটেও ভয় পাচ্ছি না। তবে উনার ছেলে এখানে না থাকলে ভালো হয়। ছেলেটাকে আমার পছন্দ না। সারাক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে আছে। তাকানোর ধরনটা ভালো না।'

'তাকানোর ধরন ঠিকই আছে। ওরা কখনো বিদেশি মেয়ে দেখে নি। তোমাকে অবাক হয়ে দেখছে। এতে যে তুমি অস্বস্তিবোধ করতে পার সেই জ্ঞান ওদের নেই। তাছাড়া সে থাকবে একতলায় — তুমি দোতলায়, অসুবিধা কী। পারবে না আধঘণ্টা থাকতে?'

'পারব।'

'সিঁড়ির দরজাটা বন্ধ করে দিও।'

'আচ্ছা।'

'আমি মোটেও দেরি করব না। কথাটা শুনব আর চলে আসব। তাদের যদি ভালো কোনো শাড়ি থাকে তোমার জন্যে নিয়ে আসব।'

'থ্যাংকস।'

লিলিয়ান সিঁড়ির দরজা বন্ধ করে শোবার ঘরে চলে এল। তার হাতে হারিকেন। তাকে একা একা আধঘণ্টা সময় কাটাতে হবে। আধঘণ্টা সময় কিছুই না। দেখতে দেখতে কেটে যাবে। হিথ্রো এয়ারপোর্ট থেকে তাহের ডার্টি জোকস-এর একটা বই কিনেছে। নোংরা রসিকতা পড়তে ভালো লাগে না। তবু সময় কাটানোর জন্যে নিশ্চয়ই পড়া যায়।

লিলিয়ান শ্বেত পাথরের টেবিলে হারিকেন নামিয়ে রাখল। হারিকেনের সম্ভবত কোনো সমস্যা হয়েছে। শিখা দপদপ করছে। নিভে যাবে না তো? লিলিয়ান তাকিয়ে আছে হারিকেনের শিখার দিকে। তাকিয়ে থাকতে থাকতেই কোনো রকম কারণ ছাড়া আচমকা তীব্র ভয়ে লিলিয়ান আচ্ছন্ন হয়ে গেল। তার মনে হল — ভয়ংকর কোনো বিপদ ঘটতে যাচ্ছে। তাহের কিছুক্ষণের মধ্যেই ভয়াবহ কোনো বিপদে পড়বে। লিলিয়ান যন্ত্রের মতো পরপর তিনবার বলল, 'O God! Save him Please, Save him. পরম করুণাময় ঈশ্বর! তুমি আমার স্বামীকে রক্ষা কর।'

লিলিয়ানের সামনে রাখা হারিকেন নিভে গেল। সে স্পষ্ট শুনল খুব হালকা পায়ে কে যেন আসছে তার ঘরের দিকে। যে আসছে তার পা ছোট ছোট, সে পা ফেলছে খুব সাবধানে। দরজার কাছে এসে সে থমকে দাঁড়িয়েছে, এক হাতে দরজা ধরেছে তা বোঝা যাচ্ছে। দরজায় ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ হল। এর উপস্থিতিই কি লিলিয়ান টের পাচ্ছিল? কে, এ কে? লিলিয়ান আতংকে অস্থির হয়ে কাঁপা গলায় বলল, 'কে? কে? Who is there?'

ছোট্ট করে কে যেন নিশ্বাস ফেলল। ছোট নিশ্বাস, কিন্তু লিলিয়ান স্পষ্ট শুনল। সে কি তার নিজের নিশ্বাসের শব্দই শুনেছে? ভয় পেলে মানুষের মস্তিষ্ক ঠিক কাজ করে না। তারও কি তাই হয়েছে? ডঃ ভারমান নিশ্চয়ই এর চমৎকার ব্যাখ্যা দিতে পারবেন কিন্তু তার কাছে কোনো ব্যাখ্যা নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাহের সিগারেট ধরিয়েছে। বর্ষাকাল হলেও কয়েকদিন বৃষ্টি না হওয়ায় রাস্তাঘাট শুকনো। একজন যাচ্ছে সামনে সামনে। তার হাতে টর্চলাইট। সে টর্চের আলো ফেলছে। তাহেরের সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছে চারজন যুবক। একজনের নাম তাহের জানে — ছালাম। চাচার মেজো ছেলে। সে আসছে সবার পেছনে। বাকি তিনজন কে? এরা সঙ্গে যাচ্ছে কেন? কিছু জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা হচ্ছে না। ওরাও কিছু বলছে না। চাচার এমন কী জরুরি কথা থাকতে পারে? জমিজমা সম্পর্কিত কিছু? তাহেরের পৈতৃক জমি নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই। যা হবার হবে। এগুলো হাতছাড়া হয়ে একদিকে ভালো হয়েছে। বন্ধনমুক্ত হওয়া গেছে। জমির কারণে তার বাবাকে অপঘাতে মরতে হয়েছে। এই অভিশাপ থেকে তাহের মুক্তি চায়। তবে বাড়িটা সে রাখবে। সংস্কার করাবে। লিলিয়ানের যখন এত পছন্দ। তাদের ছেলেমেয়েরা বড় হলে এদের দেখাতে নিয়ে আসবে। কে জানে বৃদ্ধ বয়সে সে নিজেও হয়তো ফিরে আসবে। সে এবং লিলিয়ান জীবনের শেষ সময়টা কাটাবে নদীর ধারের এই বিশাল বাড়িতে। ততদিনে গ্রামে গ্রামে ইলেকট্রিসিটিও নিশ্চয়ই চলে আসবে।

দলটা নদীর পাড়ে এসে থমকে দাঁড়াল। তাহের বলল, 'এখানে কী?' টর্চ হাতের ছেলেটা বলল, 'নদীর হেই পাড়ে যাওয়া লাগব।'

তাহের বিস্মিত হয়ে বলল, 'নদীর ঐ পাড়ে কেন? ঐ পাড়ে কী? ছালাম তুমি এদিকে এস। তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি।' ছালাম এল না। সে দ্রুত সরে গেল। গেল নদীর দিকেই। সেখানে ঝাঁকড়া একটা পাকুড় গাছ। পাকুড় গাছের ডালের সঙ্গে নৌকা বাঁধা। চাঁদ উঠে নি। চারদিক অন্ধকার। নক্ষত্রের আলোয় কিছু দেখা যাচ্ছে না। অসংখ্য ঝিঁঝিপোকা ডাকছে। Something is very wrong, তাহের দ্রুত ভাবতে চেষ্টা করছে। চারজন যুবক তাকে ঘিরে আছে কেন? এরা নদীর পাড়ে তাকে নিয়ে এসেছে কেন? হত্যা করতে চায়? কেন চায়? টাকা-পয়সার জন্যে? মানুষ খুন করা এত সহজ!

টর্চ হাতের লোকটা বলল, 'আসেন নৌকায় আসেন।'

তাহের কি দৌড়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করবে? পারবে পালাতে? এমনও তো হতে পারে পুরো ব্যাপারটা কিছুই না। সে ভয় পাচ্ছে বলেই আজেবাজে চিন্তা করছে। হয়তো তার চাচা নদীর ঐ পারে আরেকটা বাড়ি করেছেন। এই ছেলেগুলোকে রাখা হয়েছে বাড়ি পাহারার জন্যে।

'খাড়াইয়া আছেন ক্যান? আসেন। দেরি কইরা তো কিছু লাভ নাই।'

তাহের যন্ত্রের মতো এগুলো। পাকুড় গাছের কাছে চাদর গায়ে আর একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। এই গরমে তার গায়ে চাদর কেন? লোকটা নৌকায় উঠে বসল। তাহের এগুলো যন্ত্রের মতো।

সবাই নৌকায় উঠল না। ছালাম এবং টর্চ হাতে ছেলেটা পাকুড় গাছের নিচে দাঁড়িয়ে রইল। বাকি দুজন তাহেরের দুহাত ধরে নৌকায় প্রায় টেনে তুলল। চাদর গায়ের লোকটা ছাড়াও নৌকার একজন মাঝি আছে। মাঝি সঙ্গে সঙ্গে নৌকা ছেড়ে দিল। চাদর গায়ের লোকটা নিশ্বাস ফেলে বলল, 'আইজ গরম বড় বেশি পড়ছে।'

লোকটির গলার স্বরে বোঝা যাচ্ছে সে বৃদ্ধ। তাহেরের বলতে ইচ্ছা করছে — 'গরম বেশি কিন্তু আপনি চাদর গায়ে দিয়েছেন কেন?' কিন্তু কিছুই বলল না। তাহেরের হাতে সিগারেট, প্যাকেট থেকে বের করে হাতে নিয়েছে। আগুন ধরাতে ভুলে গেছে। যদিও আগুন নেই তবু তাহের অভ্যাস মতো সিগারেট মুখে দিচ্ছে এবং টানছে।

চাদর গায়ে বুড়ো লোকটি খুককুক করে কেশে বলল, 'নৌকা মাঝগাংগে নিয়া চল।' লোকটির মাথা থেকে চাদর সরে গেছে। তার মাথার সব চুল সাদা। থুতনির কাছে অল্প

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছু দাড়ি। দাড়ির রঙ কালো। তাহেরের মনে হল তার বুকের উপর দিয়ে বরফশীতল পানির একটা স্রোত বয়ে গেল। এরা তাকে খুন করার জন্যে এখানে নিয়ে এসেছে! গ্রামে সব খুনখারাপি হয় নদীর কাছে। নদী হত্যার চিহ্ন ধুয়ে–মুছে ফেলে। জলধারার প্রবল স্রোত মৃতদেহ অনেক দূর নিয়ে যায়। জলজ প্রাণী অতি দ্রুত মৃতদেহ নষ্ট করে দেয়। চেনার উপায় থাকে না।

বুড়ো বলল, 'আপনের সিগারেট নিভা। সিগারেট ধরান। সিগারেট ধরাইয়া আরাম কইরা একটা টান দেন। আহ্ শালার গরম কি পড়ছে।'

তাহেরের বাঁ হাতটা একজন ধরে ছিল। সে হাত ছাড়ল। তাহের পকেট থেকে দেয়াশলাই বের করল। তাকাল বুড়োর দিকে। মনে হচ্ছে এই বুড়োই হত্যাকারী। বুড়ো বন্দুক আনে নি। নিশ্চয়ই চাদরের নিচে ছোরা নিয়ে এসেছে। খোলা জায়গায় বন্দুকের আওয়াজ অনেক দূর পর্যন্ত যাবে। সেই তুলনায় ছোরা অনেক নিরাপদ।

বুড়ো বলল, 'ধরান, সিগারেট ধরান।'

তাহের সিগারেট ধরানোর চেষ্টা করছে। ধরাতে পারছে না। বাতাসের বেগ প্রবল। তাছাড়া তার হাত কাঁপছে। দেয়াশলাইয়ের চারটি কাঠি নষ্ট হবার পর, পঞ্চম কাঠিটি ধরল। তীব্র ঘামের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। ঘামের গন্ধে তার বমি এসে যাচ্ছে।

তাহের দেখল সবাই এক দৃষ্টিতে তার দিকেই তাকিয়ে আছে। কেউ মুহূর্তের জন্যেও দৃষ্টি ফিরিয়ে নিচ্ছে না। বুড়ো লোকটির মুখ হাসি হাসি। চাঁদের আলোয় হাসিমুখের এই বুড়োকে কী ভয়ংকরই না লাগছে!

লিলিয়ানের শোবার ঘর অন্ধকার। হারিকেন নিভে যাওয়ার পর সলতা থেকে বিশ্রী ধোঁয়া আসছে। লিলিয়ানের নাক জ্বালা করছে। ঘরে কি কার্বন মনোক্সাইড তৈরি হয়েছে? তার কি ঘর ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত? সিঁড়ির দরজায় ধাক্কার শব্দ হল। ভারি গলায় কে বলল — 'দরজা খুলেন।'

লিলিয়ান বলল, 'কে?'

'খবর আছে। দরজা খুলেন, Urgent খবর।'

লিলিয়ান সিঁড়ির দরজার কাছে চলে এল। দরজা খুলল না। তার মন বলছে — দরজার আড়ালে অপেক্ষা করছে ভয়ংকর বিপদ।

'খুলেন দরজা। খুলেন।'

কে যেন প্রচণ্ড শব্দে ধাক্কা দিচ্ছে। লিলিয়ান বলল, 'Go away.'

দরজায় হিংস্র পশুর থাবার মতো থাবা পড়ছে। একজন না, কয়েকজন। লিলিয়ানের মনে হল —খুব কম করে হলেও তিনজন আছে। লিলিয়ান খিকখিক হাসির শব্দও শুনল। তিনজনের কোনো একজন আনন্দে হাসছে। এই আনন্দের উৎস কী?

'ঐ সাদা চামড়া, দরজা না খুইল্যা কতক্ষণ থাকবি? আপোসে দরজা খোল।'

লিলিয়ান নড়ল না। দাঁড়িয়ে রইল। প্রাচীন ভারি দরজা চট করে ভাঙবে না। ভাঙতে সময় লাগবে। কতক্ষণ সময় লিলিয়ান জানে না। তাহের ফিরে আসা পর্যন্ত কি দরজা তাকে রক্ষা করবে? কিন্তু তাহের? ও কেমন আছে? তারও কি লিলিয়ানের মতোই বিপদ হয় নি? সে কি ফিরে আসতে পারবে? অনেক দিন পর লিলিয়ান তার মাকে ডাকল। ফিসফিস করে বলল, 'মা, আমি খুব বিপদে পড়েছি।'

প্রচণ্ড শব্দ হচ্ছে দরজায়। এরা দরজা ভাঙার চেষ্টা করছে। লিলিয়ান কাঁপা গলায় বলল, 'ঈশ্বর আমাকে রক্ষা কর।' দরজার সামনে থেকে তার সরে যাওয়া উচিত। লিলিয়ান সরতে পারছে না। তার পা সিসের মতো ভারি হয়ে আছে — দরজার বাইরের মানুষগুলি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পশুর মতো গর্জন করছে।

'ভাঙ দরজা। ভাইঙা ধর সাদা চামড়ারে।'

দরজা ভেঙে পড়ার কয়েক মিনিট আগে লিলিয়ান সম্বিৎ ফিরে পেল। প্রথম দৌড়ে ঢুকল শোবার ঘরে। সেখান থেকে ছুটে গেল আয়নাঘরে। কোথাও লুকিয়ে থাকতে হবে। আয়নাঘরে লুকানোর জায়গা কোথায়? কাবার্ড খুলে ভেতরে বসে থাকবে?

লিলিয়ান কাবার্ড খুলে ভেতরে ঢুকল, আর তখনি তিনজনের একটা দল দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে পড়ল। এই দলের একজন নিতান্ত চ্যাংড়া। তার হাতে পাঁচ ব্যাটারির একটা টর্চ। তার বয়স পনের-ষোলর বেশি না। সে খিকখিক করে হাসতে হাসতে বলল — 'মেম মাগী গেছে কই?'

একজন বলল, 'পালাইছে। হয় খাটের নিচে, নয় আলমিরার ভিতরে।' লিলিয়ান এদের কথা শুনতে পারছে, কিন্তু গ্রাম্য টানা টানা কথার অর্থ ধরতে পারছে না।

লিলিয়ানের মনে হচ্ছে কাবার্ডে ঢুকে সে বড় ধরনের বোকামি করেছে। এরা প্রথমেই কাবার্ডগুলো খুঁজবে। খুঁজবেই। তার উচিত কাবার্ড থেকে বের হয়ে আসা। খোলামেলা জায়গায় থাকা যাতে দৌড়ে পালানোর চেষ্টা সে করতে পারে। কোণঠাসা হয়ে ধরা পড়ার কোনো মানে হয় না।

ওরা হারিকেন জ্বালিয়েছে। হারিকেন নিয়ে আয়নাঘরেই বোধহয় আসছে। লিলিয়ান কাবার্ড ছেড়ে পালাবার জন্যে কাবার্ডের দরজায় হাত রাখল, আর ঠিক তখন কাবার্ডের ভেতর কী যেন একটা নড়ে উঠল। ঝুনঝুন শব্দ হল। একজন কেউ কোমল ভঙ্গিতে হাত রাখল তার পিঠে। লিলিয়ান ছোট্ট একটা নিশ্বাসের শব্দও যেন শুনল।

কী হচ্ছে লিলিয়ানের? সে কি পাগল হয়ে গেছে? তার কি হেলুসিনেশন হচ্ছে? সে এখন কী করবে? চিৎকার করে উঠবে? তাতে লাভ কি? পিঠে যে হাত রেখেছে সে হাত সরিয়ে নিচ্ছে না। যেন তাকে বলার চেষ্টা করছে — 'ভয় নেই। কোনো ভয় নেই। আয়নাঘরে তুমি নিশ্চিন্ত মনে অপেক্ষা কর। এরা তোমাকে কিছুতেই খুঁজে পাবে না। লিলিয়ান মনে মনে বলল, 'আপনি যেই হোন, আমার স্বামীকে রক্ষা করার চেষ্টা করুন। ও বিপদে পড়েছে। ওর বিপদ আমার চেয়েও ভয়ংকর বিপদ। আমি বুঝতে পারছি। আমি খুব পরিষ্কার বুঝতে পারছি।'

তাহেরের সিগারেট অনেক ছোট হয়ে এসেছে। সিগারেটের শেষ অংশ এখনি নদীর জলে ফেলে দিতে হবে। এরা সম্ভবত সিগারেট শেষ করার জন্যে অপেক্ষা করছে। তাহের বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনি কী চান?'

বৃদ্ধ খিকখিক করে খানিকক্ষণ হাসল। সে একাই হাসছে। অন্য কেউ হাসছে না। বৃদ্ধ হাসি থামিয়ে বলল, 'বিলাত দেশটা কেমন এট্টু কন তো হুনি।'

'বিলেতের খবর আমি জানি না। আমি থাকি আমেরিকায়।'

'আমরার কাছে আমরিকা বিলাত এক জিনিস।'

বৃদ্ধ চাদরের নিচে হাত ঢুকাল। তাহের জ্বলন্ত সিগারেট হাতে লাফিয়ে পড়ল নদীতে। পানির টান প্রবল। তাহেরকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। এরা কি তাহেরকে ছেড়ে দেবে? মনে হয় না। নৌকা নিয়ে এরা তাকে খুঁজবে। তন্নতন্ন করে খুঁজবে। তাহের ভাবার চেষ্টা করছে তার বেঁচে থাকার সম্ভাবনা কতটুকু। খুব বেশি নয়। সম্ভাবনা ক্ষীণ, কারণ তাহের সাঁতার জানে না।

লিলিয়ান আয়নাঘরের কাবার্ডে বসে আছে। কী গাঢ় অন্ধকার! এই অন্ধকার যেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাতৃগর্ভের অন্ধকার। কোনো মানুষের পক্ষে এই অন্ধকার সহ্য করা সম্ভব না।

হঠাৎ করে অন্ধকার কমে গেল। তিনজনের দলটা আয়নাঘরে ঢুকল। কাবার্ডে বসে থাকার অর্থ হয় না। লিলিয়ান ঠিক করল সে দরজা খুলে বের হবে। বলবে, 'কী চাও তোমরা?'

লিলিয়ান দরজা খুলতে পারল না। যে লিলিয়ানের পিঠে হাত রেখেছিল সে এবার লিলিয়ানের হাত চেপে ধরল। নরম হাত। হাত ভর্তি চুড়ি। রিনরিন করে চুড়ি বেজে উঠল। এসব কি স্বপ্নে ঘটছে?

টর্চ হাতের ছেলেটি বলল, 'কুদ্দুস ভাই আমার মনে হইতেছে মেম সাব এই ঘরে। 'ছেন্টের' গন্ধ পাইতেছি। মেম সাব শইল্যে 'ছেন্ট' দিছে। হি হি হি .....।'

লিলিয়ান শক্ত হয়ে আছে। এই বোধহয় কাবার্ডের দরজা খুলল। না, ঠিক তখন রান্নাঘরে 'ঝন' করে শব্দ হল। টিনের একটা কিছু মেঝেতে গড়িয়ে যাচ্ছে। দলের তিনজনই ছুটে গেল রান্নাঘরের দিকে। দৌড়ে যাবার জন্যে হারিকেনটা নিভে গেল।

যে লিলিয়ানের হাত ধরেছে সেই তাকে কাবার্ড থেকে বের করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে পাশের ঘরে। চারদিকে জমাটবাঁধা অন্ধকার। চাঁদের আলো কোথায়? আজ কি চাঁদ ওঠে নি? কিছুই দেখা যাচ্ছে না। লিলিয়ান অন্ধের মতো অনুসরণ করছে। তার বোধ লুপ্ত। সে কী করছে নিজেও জানে না। তারা দুজন এখন দাঁড়িয়ে আছে একটা পর্দার আড়ালে। এটা কোন ঘর? লিলিয়ানের সব এলোমেলো হয়ে গেছে। যে তার হাত ধরে আছে সে কে? বা আসলেই কি কেউ তার হাত ধরে আছে?

তিনজনের দলটি এ ঘরে এসেছে। তারা এখন খানিকটা বিভ্রান্ত। একজন বলল, 'গেল কই? বসির ভাই গেল কই?'

'এই ঘর দেখা হইছে?'

'একবার দেখলাম।'

'আবার দেখ। পর্দা টান দিয়া ফেলা।'

একজন এসে পর্দা ধরল আর তখন শোবার ঘর থেকে খিলখিল হাসির শব্দ শোনা গেল। কিশোরীর মিষ্টি রিনরিনে গলা। টর্চ হাতের ছেলেটা বলল — 'হাসে কেডা বসির ভাই, হাসে কেডা?'

তিনজন এগুচ্ছে শোবার ঘরের দিকে। এবার আর আগের মতো ছুটে যাচ্ছে না। কিশোরীর হাসির শব্দ আরো বাড়ল। তারপর হঠাৎ করে থেমে গেল। লিলিয়ান মনে মনে বলল, যা ঘটছে সবই আমার কল্পনা। আমার উত্তেজিত মস্তিষ্ক আমাকে এসব দেখাচ্ছে, শোনাচ্ছে। আসলে কেউ আমার হাত ধরে নেই —। কেউ আমাকে টেনে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে না। আমি নিজেই জায়গা বদল করছি, এবং কল্পনা করছি প্রচণ্ড ভয়ের কারণে আমার এ রকম হচ্ছে! ডঃ ভারমান আমাকে তাই বলতেন।

তারপরেও লিলিয়ান ফিসফিস করে বলল, 'আপনি কে?'

ছোট্ট নিশ্বাসের শব্দ শোনা গেল। কোনো জবাব পাওয়া গেল না। লিলিয়ান বের হয়ে এল পর্দার আড়াল থেকে — নিজের ইচ্ছায় নয়। যে তার হাত ধরে ছিল সেই তাকে টেনে বের করল। সে চরকির মতো ঘুরছে — এ ঘর থেকে ঐ ঘরে। যেন এক মজার খেলা। এক সময় লিলিয়ান লক্ষ করল সে লোহার প্যাঁচানো সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে। বাইরের অন্ধকার গাঢ় নয়। অস্পষ্টভাবে সব কিছুই দেখা যাচ্ছে। এখন আর কেউ তার হাত ধরে নেই। এতক্ষণ যা ঘটেছিল সবই কল্পনা। মস্তিষ্ক তার নিজস্ব নিয়মে তৈরি করেছে বিভ্রম, এবং তাকে নিয়ে এসেছে ঘরের বাইরে। অশরীরী বলে কিছু নেই, কিছু থাকতে পারে না।

লিলিয়ান খুব সাবধানে লোহার সিঁড়ি দিয়ে নামছে — এতটুকু শব্দও যেন না হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাকে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যেতে হবে। অনেক দূর যেতে হবে, যেন কেউ তার নাগাল না পায়। সিঁড়ি এত দুলছে কেন? মনে হচ্ছে ভেঙে পড়ে যাবে। খুব হাওয়া। উড়িয়ে নিয়ে যাবার মতো হাওয়া। এই ব্যাপারগুলো তো স্বপ্নে ঘটেছিল! এখনো কি সে স্বপ্ন দেখছে? পুরোটাই কি স্বপ্ন? লিলিয়ানের শরীর অবসন্ন, অসম্ভব ক্লান্ত। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে। ইচ্ছা করছে সিঁড়ির রেলিং জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়ে। মনে হচ্ছে সে জেগে আছে হাজার বছর ধরে।

সে একতলায় নেমে এসেছে। তার সামনেই এ বাড়ির ভাঙা প্রাচীর। ফিসফিস কথা শোনা যাচ্ছে। নিচেও কি কেউ অপেক্ষা করছে তার জন্যে? নাকি ওরাই নেমে এসেছে নিচে? দোতলা থেকে কে যেন টর্চের আলো ফেলল সিঁড়িতে। আলো এদিক–ওদিক যাচ্ছে। খুঁজে বেড়াচ্ছে লিলিয়ানকে। আর একটু হলেই সে আলো পড়ত লিলিয়ানের মুখে। লিলিয়ান ক্লান্ত গলায় ফিসফিস করে বলল, "আমাকে সাহায্য করুন। আমাকে সাহায্য করুন, Please help me."

কার কাছে সে সাহায্য চেয়েছে? উত্তেজিত বিভ্রান্ত মস্তিষ্কের কাছে, নাকি যে অশরীরী নারী তার হাত ধরেছিল তার কাছে? লিলিয়ান জানে না। সে জানতেও চায় না। প্রয়োজন হলে সে চোখ বন্ধ করে থাকবে। অশরীরী নারীমূর্তি তার হাত ধরে টেনে নিয়ে যাক। লিলিয়ান আবারো বলল, 'আপনি কোথায়? আপনি আমাকে সাহায্য করুন।'

আর ঠিক তখন সে নারীমূর্তিকে দেখতে পেল। ভাঙা দেয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা প্রকাণ্ড শিরীষ গাছের আড়ালে সে দাঁড়িয়ে। সে হাত ইশারায় লিলিয়ানকে ডাকল। লিলিয়ান মন্ত্রমুগ্ধের মতো এগিয়ে গেল।

নারীমূর্তি সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে আগে আগে যাচ্ছে। পেছনে পেছনে এগুচ্ছে লিলিয়ান। পাঁচিলের বাইরে এসেই নারীমূর্তি ছুটতে শুরু করল। সে লিলিয়ানকে কিছুই বলে নি। তবু লিলিয়ানের মনে হল তাকে যেন এই অশরীরী মূর্তি বলছে — 'ভয় পেও না। তুমি আমার পেছনে পেছনে দৌড়াতে থাক।'

আমবাগান ছাড়িয়ে খোলা মাঠ, আবার খানিক ঝোপঝাড়, চষা ক্ষেত। নারীমূর্তি দ্রুত ছুটছে। একবারও পেছন ফিরে তাকাচ্ছে না। লিলিয়ান কাতর গলায় বলল, 'পারছি না। আমি পারছি না। একটু থামুন, please একটু থামুন।' নারীমূর্তি থামছে না। ছুটছে, আরো দ্রুত ছুটছে।

তারা একসময় চলে এল নদীর তীরে। আর তখনি মেঘের আড়াল থেকে চাঁদ স্পষ্ট হল। ঝলমল করে উঠল নদী ও নদীর ওপাশের বনভূমি। নারীমূর্তি থমকে দাঁড়িয়েছে। হাত ইশারায় নদীর তীরে পড়ে থাকা কী একটা যেন দেখাচ্ছে। লিলিয়ান সেদিকে তাকাচ্ছে না। সে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে নারীমূর্তির দিকে।

কী সুন্দর মায়াময় একটি মুখ! লম্বা বিনুনি করা চুল। শাড়ির আঁচল হাওয়ায় উড়ছে। লিলিয়ান বলল, 'আপনি কে? আপনি কি আমার কল্পনা নাকি সত্যি কিছু ?'

নারীমূর্তি হাসল। কী সুন্দর সে হাসি! লিলিয়ান হাসির শব্দও শুনল।

'আপনি কি বলবেন না আপনি কে ?'

ছায়ামূর্তি না–সূচক মাথা নাড়ল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে ছুটতে শুরু করল। লিলিয়ান চেঁচিয়ে বলল, 'আপনি কোথায় যাচ্ছেন ?'

ছায়ামূর্তি ছুটতে ছুটতে কি যেন বলল, বাতাসের শব্দে তা শোনা গেল না।

লিলিয়ান একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। চোখ ফিরিয়ে নিতে পারছে না। চোখ ফিরিয়ে নিয়ে আশপাশে তাকালেই দেখতে পেত নদীর তীরে চিৎ হয়ে যে মানুষটি শুয়ে আছে সে তাহের। এখনো তার দেহে প্রাণ আছে, সে বেঁচে যাবে — সে নিশ্চয়ই বেঁচে যাবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জ্যোৎস্না-প্লাবিত জলরাশি, তার ধার ঘেঁষে ছুটে যাচ্ছে এক নারীমূর্তি। বাতাসে তার শাড়ির আঁচল উড়ছে। রিনরিন করে বাজছে হাতের চুড়ি।

৭

পনের বছর পর লিলিয়ান আবার তাহেরকে নিয়ে ইন্দারঘাটে এসেছে। তাদের সঙ্গে দুটি ফুটফুটে মেয়ে। এগার বছরের সারা, সাত বছরের রিয়া। দুজনই হয়েছে মা'র মতো, শুধু চোখ পেয়েছে বাবার। বড় বড় কালো চোখ। মা'র নীল চোখ কেউই পায় নি। দুজনই খুব হাসিখুশি মেয়ে, কিন্তু এদের চোখের দিকে তাকালে মনে হয় — চোখ ভর্তি জল। এক্ষুনি বুঝি কাঁদবে।

তাদের আসা উপলক্ষে বাড়িঘর ঠিক করা হয়েছে। বাড়ির চারপাশের বাগান পরিষ্কার করা হয়েছে। মেয়ে দুটি মহানন্দে ছোটাছুটি করছে। রিয়া ছুটতে গিয়ে উল্টে পড়ে হাঁটুতে ব্যথা পেয়েছে। হাঁটুর চামড়া ছিলে গেছে। কিন্তু রিয়া হাঁটু চেপে ধরে হাসছে। যেন এই বাগানবাড়িতে ব্যথা পাওয়াও এক আনন্দজনক অভিজ্ঞতা।

তাহের নিজেও বাগানে। সে খুব ব্যস্ত। আমগাছের ডালে দোলনা টানানোর চেষ্টা করছে। ডাল উঁচু। চেয়ারে দাঁড়িয়ে নাগাল পাওয়া যাচ্ছে না। বড় মেয়ে সারা বাবাকে সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে এল। সে গম্ভীর গলায় বলল, 'বাবা শোন, তুমি যদি দুদিন পর বল, বেড়ানো শেষ হয়েছে এখন আমেরিকা ফিরে যাব; তাহলে কিন্তু হবে না। আমরা খুব রাগ করব।'

'তাহলে আমাকে কী করতে হবে?'

'এখানে থাকতে হবে।'

'কতদিন?'

'For eternity.'

তাহের হো-হো শব্দে হাসছে। হাসির শব্দে লিলিয়ান এসে দোতলার বারান্দায় দাঁড়াল। তাহের উঁচু গলায় বলল, 'এই যে বিদেশিনী! দয়া করে মগভর্তি কাপাচিনো কফি বানিয়ে নিচে এসে আমাকে সাহায্য কর।'

'এখন কফি বানানো যাবে না। সরঞ্জাম নেই।'

'কোনো অজুহাত শুনতে চাই না। কফি বানাতে হবে।'

ছোট মেয়ে রিয়া চেঁচিয়ে বলল, 'বাবার জন্যে কফি বানাতেই হবে।'

লিলিয়ান রান্নাঘরের দিকে গেল না। সে ঢুকল আয়নাঘরে। দরজা বন্ধ করে দিল। অন্ধকার হয়ে গেল আয়নাঘর। সে গলার স্বর নামিয়ে প্রায় ফিসফিস করে বলল, 'আপনাকে দেখানোর জন্যে আমি আমার বাচ্চা দুটিকে নিয়ে এসেছি। আপনি কি দেখেছেন তাদের?'

কেউ জবাব দিল না।

লিলিয়ান বলল, 'আপনি কি তাদের একটু আদর করে দেবেন না?'

নীরবতা ভঙ্গ হল না। আয়নাঘরের স্তব্ধতা ভাঙল না। লিলিয়ানের চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি পড়ছে। পনের বছর আগে এক ভয়ংকর জটিল সময়ে কেউ একজন তার হাত ধরে বলার চেষ্টা করেছিল — কোনো ভয় নেই। সেই দুঃসময় আজ আর তার নেই। জীবন তার মঙ্গলময় বিশাল বাহু মেলে লিলিয়ানকে জড়িয়ে ধরেছে। আজ আর আশ্বাসের বাণী শোনার তার প্রয়োজন নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লিলিয়ান আবার বারান্দায় এসে দাঁড়াল। নিচে খুব মজা হচ্ছে। দোলনা তৈরি হয়ে গেছে। তাহের দোল খাচ্ছে। মেয়েরা বাবাকে নামিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে, পারছে না। লিলিয়ান আপন মনে বলল, 'আমি কেউ না, অতি তুচ্ছ একজন, তবু ঈশ্বর কেন এত সুখ আমার জন্যে রেখেছেন?'

খুট করে শব্দ হল। আয়নাঘরের দরজা খুলে গেল। লিলিয়ানের মনে হল, নূপুর পায়ে কে যেন আসছে তার দিকে! এই তো লিলিয়ান তার পা ফেলার ছোট ছোট শব্দ শুনতে পাচ্ছে! লিলিয়ান বাগানের দিকে ইশারা করে স্পষ্ট স্বরে বলল—'ঐ দেখুন, ও হচ্ছে সারা, আমার বড় মেয়ে। আর নীল জামা পরা মেয়েটা রিয়া। দুজনই খুব দুষ্টু।'

তাহের দোল খাওয়া বন্ধ করে উঁচু গলায় বলল, 'মেয়েরা! তোমাদের মাকে দেখ। অকারণে কাঁদছে। ব্যাপারটা কী বল তো, এই মহিলার অকারণে কাঁদার রোগ আছে। আগেও কয়েকবার লক্ষ করেছি।'

রিয়া বড়দের মতো গম্ভীর গলায় বলল, 'আমার মনে হয় মা'র চোখে কোনো প্রবলেম আছে।'

লিলিয়ান খুব কাঁদছে। অসম্ভব সুন্দর এই দিনে কেউ কাঁদে না। লিলিয়ান কাঁদছে, কাঁদতে তার বড় ভালো লাগছে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জলপদ্ম

১

রিকশা থেকে নামার সময় ইলা লক্ষ করল তার হাত-পা কাঁপছে। বুক ধকধক করছে। হাতের তালু ঘামছে। এত ভয় লাগছে কেন তার? ভয় কাটানোর জন্যে কিছু একটা করা দরকার, কী করবে বুঝতে পারছে না। বাড়িওয়ালার ভাগ্নে হাসান একতলার গেটের কাছে দাঁড়িয়ে। ইলা তার দিকে তাকিয়ে ফ্যাকাসে ভঙ্গিতে হাসল। কারো দিকে তাকিয়ে হাসলে হাসির জবাব দিতে হয়, কিন্তু হাসান কখনো তা করে না। আজো করল না। চোখ ফিরিয়ে নিল। এই ছেলে কখনো চোখে চোখে তাকায় না। সব সময় মাথা নিচু করে থাকে। সে যদি ইলার দিকে তাকিয়ে একটু হাসত তাহলে ইলার ভয় খানিকটা কমত। রঙ জ্বলে যাওয়া হলুদ রঙের ফুল হাওয়াই শার্ট পরা, ফ্যাকাসে চেহারার এই ছেলে কখনো তা করবে না।

চার টাকা ভাড়া ঠিক করা। ইলা রিকশাওয়ালাকে পাঁচ টাকার একটা নোট দিল। এক টাকা ফেরত নেবার জন্যে অপেক্ষা করল না। এত সময় নেই। অতি দ্রুত তাকে তিন তলার ফ্ল্যাটে উঠতে হবে। তার মন বলছে — ভয়ংকর কিছু ঘটে গেছে। খুব ভয়ংকর। যদিও সে জানে কিছুই ঘটে নি। দিনে-দুপুরে কী আর ঘটবে? ফ্ল্যাটে অন্তু মিয়া আছে। তাকে বলা আছে যেন সে কিছুতেই দরজা না খোলে। আগে জিজ্ঞেস করবে, 'কে?' পরিচিত কেউ হলেও বলবে— 'বিকালে আসবেন। বাসায় কেউ নেই।'

অন্তু মিয়ার বয়স আট-ন বছর। এত বুদ্ধি কি তার আছে? কলিং বেলের শব্দ হতেই সে বোধহয় দরজা খুলে দিয়েছে। গত মঙ্গলবারে তাদের পেছনের বাড়ির তিনতলা 6/B ফ্ল্যাটে এ রকম হল। ভদ্র চেহারার দুটি ছেলে এসে কলিং বেল টিপেছে। ভদ্রমহিলা দরজার কাছে আসতেই এক জন বলল, 'আপা, আমি মিটার চেক করতে এসেছি।' ভদ্রমহিলা দরজা খুললেন। ছেলে দুটি শান্তমুখে ঢুকল। চশমা পরা ছেলেটি মিষ্টি গলায় বলল, 'আপা, চেঁচামেচি করবেন না। এক মিনিট সময় দিচ্ছি। গয়না এবং টাকা-পয়সা রুমালে বেঁধে আমাকে দিন। আমার সঙ্গে পিস্তল আছে।' বলেই সে হাসিমুখে পিস্তল বের করল। ভদ্রমহিলা একবার শুধু তাকালেন পিস্তলের দিকে, তারপরই অজ্ঞান। ভাগ্যিস, জ্ঞান হারিয়েছিলেন ; নয়তো টাকা-পয়সা, গয়না-টয়না সব যেত। নিজেই স্টিলের আলমিরা খুলে সব বের করে দিতেন। জ্ঞান হারানোর জন্যে কিছু করতে পারলেন না। ওরাও চাবি খুঁজে না পেয়ে টেলিভিশনটা নিয়ে চলে গেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ইলার মনে হল নিশ্চয়ই তাদের ফ্ল্যাটেও এ রকম কিছু হয়েছে। অন্তু মিয়াকে খুন করে জিনিসপত্র সব নিয়ে চলে গেছে। রক্তে ঘর ভেসে যাচ্ছে। অন্তুর মুখের উপর ভনভন করে উড়ছে নীল রঙের মাছি। এই মাছিগুলোকে সাধারণত দেখা যায় না, শুধু পাকা কাঁঠাল এবং মৃত মানুষের গন্ধে এরা উড়ে আসে। ছিঃ, এসব কী ভাবছে ইলা!

ফ্ল্যাটের দরজার কাছে ইলা থমকে দাঁড়াল। ফ্ল্যাটের দরজা খোলা। পর্দা ঝুলছে। ইলার ঢুকতে সাহস হচ্ছে না। এমনভাবে বুক কাঁপছে যে মনে হচ্ছে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়বে। সে দরজা ধরে নিজেকে সামলাল, ভয়ে ভয়ে ডাকল, 'অন্তু, অন্তু মিয়া!' কেউ জবাব দিল না। ইলা নিশ্বাস বন্ধ করে পর্দা সরিয়ে ঘরে উঁকি দিল। সোফায় পা তুলে বিরক্তমুখে জামান বসে আছে। এত সকালে সে কখনো অফিস থেকে ফেরে না। রোজই ফিরতে সন্ধ্যা হয়। জামান গম্ভীর গলায় বলল, ' কোথায় গিয়েছিলে?'

ইলা জবাব দিল না। তার নিশ্বাস স্বাভাবিক হয় নি। এখনো বুক ধড়ফড় করছে। এটা বোধহয় এক ধরনের অসুখ। নয়তো শুধু শুধু সে এত ভয় পাবে কেন? জামান বলল, 'কথা বলছ না কেন? ছিলে কোথায়?'

'নিউ মার্কেট গিয়েছিলাম।'

'দুপুরবেলা হুটহাট করে নিউ মার্কেটে যাবার দরকার কী? দুদিন আগে 6/B ফ্ল্যাটে এত বড় একটা ঘটনা ঘটল। নিউ মার্কেটে গিয়েছিলে কেন?'

'উল কিনতে।'

'উল দিয়ে কী হবে?'

'একটা সোয়েটার বানাব।'

'সোয়েটার-টোয়েটার আজকাল কেউ ঘরে বানায় না। শুধু শুধু সময় নষ্ট। বাজারে সস্তায় পাওয়া যায়। দেখি ঠাণ্ডা এক গ্লাস পানি দাও।'

পানি আনতে গিয়ে ইলা লক্ষ করল অন্তু ভেতরের বারান্দায় রেলিঙের দিকে মুখ করে বসে আছে। কিছুক্ষণ পরপর শরীর যেভাবে ফুলে ফুলে উঠছে তাতে মনে হচ্ছে কাঁদছে। জামান কি কিছু বলেছে অন্তুকে? থাক, এখন জিজ্ঞেস করে লাভ নেই। পরে জিজ্ঞেস করা যাবে।

জামান পানির গ্লাস হাতে নিতে নিতে বলল, 'অন্তুকে তুমি কী বলে গিয়েছিলে? সে কিছুতেই দরজা খুলবে না। যতবারই বলি—আমি, দরজা খোল ততবারই সে বলে — 'কেডা?' চড় লাগিয়েছি।

ইলা বলল, 'আহা মারলে কেন? ছোট মানুষ!'

'ছোট হলে কি হবে, ঝাড়ে-বংশে বজ্জাত। খুব কম করে হলেও আধঘণ্টা দরজা ধাক্কিয়েছি। সে বুঝতে পারছে আমি, তারপরেও দরজা খুলবে না। দেখি পরিষ্কার একটা রুমাল দাও তো। বেরুব।'

'কোথায় যাবে?'

'জয়দেবপুর। ফিরতে দেরি হবে। রাত বারটা-একটা বেজে যাবে। বাড়িওয়ালাকে বলবে দয়া করে যেন গেটটা খোলা রাখে। ব্যাটা উজবুক, দশটা বাজতেই গেট বন্ধ করে দেয়। এটা যেন মেয়েদের হোস্টেল।'

ইলা ক্ষীণ গলায় বলল, 'আমি কি মার বাসা থেকে এক বার ঘুরে আসব? শুনেছি ভাইয়ার জ্বর। ভাইয়াকে দেখে আসতাম।'

'সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় ফিরে আসতে পারলে যাও। এত রাতে একা ফেরার প্রশ্নই ওঠে না। শহরের অবস্থা যা ; মেয়েদের তো ঘর থেকে বের হওয়াই উচিত না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'একা ফিরব না। ভাইয়া পৌঁছে দেবে।'

'একটু আগে না বললে ভাইয়ার জ্বর, রোগী দেখতে যাচ্ছ। যাকে দেখার জন্যে যাচ্ছ সে-ই তোমাকে পৌঁছে দেবে এটা কেমন কথা! যা বলবে লজিক ঠিক রেখে বলবে।'

জামান উঠে দাঁড়াল। বিরক্তমুখে বলল, 'অন্তুর ঠোঁট বোধহয় কেটে গেছে। ঘরে ডেটল আছে। ডেটল লাগিয়ে দিও। আমি চললাম। দরজা ভালো করে বন্ধ কর।'

অন্তুর ঠোঁট ভয়াবহভাবে কেটেছে। দুভাগ হয়ে গেছে। রক্তে তার শার্ট ভিজেছে। যেখানে বসে আছে সেই মেঝে ভিজেছে। রক্ত এখনো বন্ধ হয় নি। চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে। সমস্ত মুখ ফুলে চোখ দুটা ছোট ছোট হয়ে গেছে। অন্তুকে ভয়ংকর দেখাচ্ছে। ইলা হতভম্ব হয়ে গেল।

'ঠোঁট কাটল কীভাবে? পড়ে গিয়েছিলি?'

'হুঁ।'

'কীভাবে ঠোঁট কাটল?'

অন্তু জবাব দিল না। এতক্ষণ সে কাঁদে নি। এইবার কাঁদতে শুরু করেছে। এ বাড়ির পুরুষ মানুষটাকে সে যমের মতো ভয় পায়। তার সম্পর্কে নালিশ করতে ভয় লাগে বলে সে নালিশও করছে না। নয়তো বলত, চড় খেয়ে মেঝেতে পড়ে গিয়ে ঠোঁট কেটে গেছে।

'ব্যথা করছে অন্তু?'

'হুঁ।'

'খুব বেশি?'

'হুঁ।'

'চুপ করে বসে থাক। তোকে এক্ষুনি ডাক্তারের কাছে পাঠাব। এই কাপড়টা ঠোঁটের উপর চেপে ধরে রাখ তো। রক্ত বন্ধ হোক। আমি বাড়িওয়ালার ভাগ্নেটাকে ডেকে নিয়ে আসি।'

চিন্তিত মুখে ইলা বসার ঘরে ঢুকল। সে ভেবে পাচ্ছে না, দরজা খোলা রেখে সে নিজেই একতলায় যাবে, না অন্তুকে পাঠাবে। অন্তুর যে অবস্থা তাতে মনে হচ্ছে না সে একা একা নিচে যেতে পারবে। কিন্তু দরজা খোলা রেখে সে-ই বা যাবে কীভাবে? অন্তু এখন কাঁদছে শব্দ করে। ইলার মনটাই খারাপ হয়ে গেল। আট-ন বছরের বাচ্চা একটা ছেলে। এ রকম ব্যথা পেলে তার মা তাকে কোলে নিয়ে হাঁটত।

'অন্তু মিয়া!'

'হুঁ।'

'দরজা বন্ধ করে বসে থাক, আমি নিচ থেকে আসি। যাব আর আসব। মুখ থেকে কাপড়টা সরা তো — দেখি রক্ত বন্ধ হয়েছে কিনা।'

রক্ত বন্ধ হয় নি। ক্ষীণ ধারায় এখনো পড়ছে। অন্তু মাঝে মাঝে জিভ বের করে রক্ত চেটে চেটে দেখছে। ইলা বলল, 'রক্ত চেটে খাচ্ছিস কেন রে গাধা? রক্ত কি খাবার জিনিস?' ইলা চিন্তিত মুখে নিচে গেল। হাসানকে পাওয়া গেল না। বাড়িওয়ালার স্ত্রী সুলতানা বললেন, 'গাধাটাকে এক কেজি চিনি আনতে বলেছিলাম। চল্লিশ মিনিট হয়ে গেছে, ফেরার নাম নেই। কখন হুজুরের ফিরতে মর্জি হবে কে জানে? আসুক, আসলে পাঠায়ে দিব।'

ইলা বলল,'খালা, গেটটা আজ একটু খোলা রাখতে হবে। ও জয়দেবপুর গেছে, ফিরতে রাত হবে।'

'হাসানকে বলে দিও। গেটের চাবি তার কাছে থাকে। আর তোমাকেও একটা কথা বলি, দিনকাল খারাপ — তোমার বয়স অল্প। একা একা থাক — এটা ঠিক না। কখন কী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘটে যায়। পিছনের বাড়ির টেলিভিশন নিয়ে গেছে বলে যা শুনেছ সব ভুয়া। রেপ কেইস্। তিনটা ছেলে ঢুকেছে। ঢুকেছে ১২টার সময়, গেছে তিনটায়। কতক্ষণ হল? তিন ঘণ্টা। একেক জনের ভাগে এক ঘণ্টা। বুঝতে পারলে?' সুলতানা চোখ ছোট করে রহস্যময় ইংগিত করলেন। ইলা চমকে উঠল — এমন কুশ্রী ইংগিত এমনভাবে কেউ করে?

'খালা, আমি যাই।'

'আহা দাঁড়াও না। বিস্তারিত শুনে যাও। এরা আসল ঘটনা চাপা দেয়ার চেষ্টা করছে। চাপা দিলেই কি চাপা দেয়া যায়? বলে কি টেলিভিশন নিয়ে গেছে! টেলিভিশন নিয়ে গেলে বাড়িতে ডাক্তার আনা লাগে? ঐ বাড়িতে দুনিয়ার আত্মীয়স্বজন এসে উপস্থিত হয়েছে। মরাকান্না! ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট টেলিভিশন এমন কী জিনিস যে গুষ্টিসুদ্ধ মরাকান্না কাঁদবে! তুমি আমাকে বল।'

'খালা, অন্তু একা আছে। আমি যাই।'

'যাই যাই করছ কেন? ঘটনা শুনে যাও—মেয়েটার হাসবেন্ডকে দেখলাম দুজনে ধরাধরি করে বেবিট্যাক্সিতে তুলল। একটা টেলিভিশন নিয়ে গেলে এই অবস্থা হয়! তুমিই বল। আমি কি ভুল বললাম?'

'জ্বি না।'

'তোমার বয়স কম। নতুন বিয়ে। খুব সাবধানে থাকবে। পারতপক্ষে বারান্দায় যাবে না। তোমার আবার বিশ্রী স্বভাব বারান্দায় হাঁটাহাঁটি করা। এইসব রেপিস্টদের নতুন বিয়ে হওয়া মেয়েগুলোর দিকে নজর থাকে বেশি — সাবধান। খুব সাবধান — চা খাবে?'

'জ্বি না।'

'খাও না।'

'আরেকদিন এসে খেয়ে যাব।'

'আসবে — নিজের বাড়ি মনে করে আসবে। বাড়িওয়ালা-ভাড়াটে সম্পর্ক আমার না। আমার বাড়িতে যে এসে উঠবে — সে আমার আপনা মানুষ। তার ভালোমন্দ আমার ভালোমন্দ। মাসের শেষে টাকা নিয়ে দায়িত্ব শেষ — এই জিনিস আমাকে দিয়ে হবে না। সবাইকে দিয়ে সব জিনিস হয় না।'

সুলতানা হাঁপাতে লাগলেন। শরীরে অতিরিক্ত মেদ জমে যাওয়ায় একনাগাড়ে বেশিক্ষণ কথা বলতে কষ্ট হয়। কষ্ট হলেও তিনি কথা বলেন। ধর্ষণ জাতীয় খবরে তিনি বড় মজা পান। এইসব খবর আগে শুধু কাগজে পড়তেন। এখন বাড়ির কাছে ঘটে যাওয়ায় বড় ভালো লাগছে।

ইলা আবার বলল, 'আসি খালা।' বলে আর দাঁড়াল না। তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এল। সুলতানা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। ইলা মেয়েটা অতিরিক্ত রকমের সুন্দর। তাঁর বড় ছেলের জন্যে তিনি অনেকদিন ধরে একটা সুন্দর মেয়ে খুঁজছেন। পাচ্ছেন না। সুন্দর মেয়েগুলো গেল কোথায়? যে কটাকে পাওয়া যায় সবকটার বিয়ে হওয়া। মায়ের পেট থেকে পড়েই এরা বিয়ে করে ফেলে না-কি? কোনো মানে হয়?

আশ্চর্য, অন্তুর ঠোঁট থেকে এখনো রক্ত পড়ছে!

'অন্তু, বেশি ব্যথা করছে?'

'হুঁ।'

'হাসান এসেই তোকে নিয়ে যাবে। এক্ষুনি আসবে, খবর দিয়ে এসেছি। শুয়ে থাকবি খানিকক্ষণ? বিছানা করে দেই?'

অন্তু ঘাড় কাত করল। এবং কেন জানি প্রবল কষ্টের মধ্যেও হাসার চেষ্টা করল। অন্তুর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিছানা বলতে ভাঁজ করা একটা মাদুর। একটা বালিশ পর্যন্ত ছেলেটার নেই। ইলা জামানকে একবার বলেছিল, 'একটা বালিশ নিয়ে এস। বেচারা বালিশ ছাড়া ঘুমায়।' জামান গম্ভীর গলায় বলেছে — 'এদের বালিশ দরকার হয় না। খামোকা বড়লোকি শেখাতে হবে না।' ইলা ঠিক করে রেখেছে এবার মার বাসায় গেলে একটা বালিশ আর একটা কাঁথা নিয়ে আসবে।

মাদুর বিছাতে গিয়ে ইলা দেখল, মেঝেতে কার্পেটের উপর জামানের মানিব্যাগ। পেটমোটা কালো রঙের মানিব্যাগ। যখন চেয়ারে বসেছিল তখন নিশ্চয়ই পকেট থেকে পড়ে গেছে। মানিব্যাগ পকেট থেকে পড়ে যাবে, জামান টের পাবে না, এ রকম হবার কথা না। টাকা-পয়সার ব্যাপারে সে খুব সাবধানী। মানিব্যাগে বেশ কিছু পাঁচশ টাকার নোট রবার ব্যান্ড দিয়ে বাঁধা। কতগুলো নোট? গুনে দেখতে ইচ্ছে করছে।

জামান নিশ্চয়ই খুব দুশ্চিন্তা করছে। এতগুলো টাকা ; দুশ্চিন্তা করারই কথা। সে কি বুঝতে পেরেছে মানিব্যাগ হারিয়েছে? নিশ্চয়ই খুব ঝামেলা হয়েছে। রিকশা থেকে নেমে রিকশা ভাড়া দিতে গিয়ে হঠাৎ দেখল মানিব্যাগ নেই। এইসব ক্ষেত্রে রিকশাওয়ালারা বিশ্বাস করতে চায় না যে মানিব্যাগ হারিয়েছে। তারা খুব যন্ত্রণা করে। ইলা নিজে একবার এ রকম যন্ত্রণার মধ্যে পড়েছিল। যাত্রাবাড়ি থেকে বার টাকা রিকশা ভাড়া ঠিক করে সে আর রুবা এসেছে বায়তুল মোকার্‌রমে। কিছু কেনার নেই — এমনি ঘোরার জন্যে আসা। রিকশা থেকে নেমে ব্যাগ খুলে দেখে পুরানো ছেঁড়াখোঁড়া একটা এক টাকার নোট ছাড়া কোনো টাকা নেই। কী বিশ্রী কাণ্ড! রিকশাওয়ালার সরল-সরল মুখ, কিন্তু সে এমন হৈচৈ শুরু করল যে তাদের চারদিকে লোক জমে গেল। লোকগুলো ভাবল ইচ্ছা করেই ইলা রিকশাওয়ালাকে টাকা দিচ্ছে না। রুবা অসম্ভব ভীতু। সে ইলার বাঁ হাত শক্ত করে চেপে ধরে বলল — এখন কী হবে আপা? এখন কী হবে? ইলা রিকশাওয়ালাকে বলল, 'আপনি আমাদের সঙ্গে যাত্রাবাড়ি চলুন। আপনাকে চব্বিশ টাকা দেব।' রিকশাওয়ালা থু করে থুতু ফেলে বলল, 'যাত্রাবাড়ি যামু ক্যান? আমার কি ঠেকা?'

'আপনার কোনো ঠেকা না, আমাদের ঠেকা। প্লিজ চলুন।'

ইলার আবেদনে কোনো লাভ হল না বরং রিকশাওয়ালাটা আরো প্রশ্রয় পেয়ে গেল। সে আরো কিছু রিকশাওয়ালা জুটিয়ে ফেলল এবং সরল-সরল মুখ করে মিথ্যা কথা বলা শুরু করল — 'এই মাইয়া দুইটা আমারে ভাড়া দেয় না। আবার উল্টা গালি দিতাছে। আমারে বলে তুই ছোডলোকের বাচ্চা।'

রুবা কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, 'আপা, ব্যাগে তোমার যে কলমটা আছে ঐ কলমটা ওকে দিয়ে দাও। কলম নিয়ে চলে যাক।'

'কলম দিয়া আমি করমু কী? কলম ধুইয়া খামু? কলম খাইলে ফেড ভরব?'

আর ঠিক তখন মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক এসে গম্ভীর গলায় বললেন — 'কত হয়েছে ভাড়া?'

রুবা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, 'বার টাকা।'

ভদ্রলোক একটা বিশ টাকার নোট বাড়িয়ে বললেন, 'এটা রাখ। সঙ্গে কলম আছে? আমার ঠিকানা লিখে রাখ। এক সময় ফেরত দিয়ে যেও।'

তাদের চারপাশের ভিড় তবুও কমে না। যেন নাটকের শেষ দৃশ্যটা এখনো বাকি আছে। এরা শেষটা না দেখে যাবে না। ইলা ঠিকানা লিখছে — ভদ্রলোক বলছেন — লেখ বি, করিম। এগার বাই এফ, কলতাবাজার। দোতলা।

ভিড়ের মধ্যে একজন বলল, 'টাকা ফেরত দিতে হবে না। টাকার বদলে অন্য কিছু দিলে আরো ভালো হয়।' একসঙ্গে সবাই হেসে উঠল। রুবার চোখ দিয়ে টপটপ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে পানি পড়তে লাগল। একজন সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'আবার দেহি কান্দে!'

আবারো সবাই হেসে উঠল। সময় সময় কোনো কারণ ছাড়াই মানুষ খুব নির্মম হয়। মধ্যবয়স্ক ঐ ভদ্রলোক চলে গেলেন না। ভিড় থেকে তাদের বের করে আনলেন। রুবার দিকে তাকিয়ে বললেন—'নাম কী?'

'রুবা। দিলরুবা খানম।'

'শোন দিলরুবা খানম — কাঁদছ কেন? কাঁদার মতো ঘটনা কী ঘটল? টাকা-পয়সা সঙ্গে না নিয়ে বাড়ি থেকে বের হও কেন? যাও, বাড়ি যাও।'

ভদ্রলোক লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেলেন। একবার পেছনে ফিরে তাকালেনও না। মোটা মোটা ভারিক্কি ধরনের এই মানুষটাকে ধন্যবাদ পর্যন্ত দেয়া হল না।

হাসান নিঃশব্দে এসে পর্দার ওপাশে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে। তাকিয়ে আছে নিজের পায়ের নখের দিকে। গভীর মনোযোগে নখের শোভা দেখছে হয়তো। ইলা নিজ থেকে কিছু না বললে সে চুপ করেই থাকবে। কিছুই বলবে না। অদ্ভুত ছেলে!

'হাসান, তুমি অন্তুকে একটু ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে? দেখ না ওর ঠোঁটের অবস্থা।'

হাসান এক পলকের জন্য তাকাল। তার কোনো ভাবান্তর হল না। তবে সে কথা বলল। মেঝের দিকে তাকিয়েই বলল, 'ভাবী, মনে হচ্ছে সেলাই লাগবে। আর এটিএস দিবে। কিছু হলেই ওরা এটিএস দেয়।'

'দাঁড়াও, তোমাকে টাকা দিয়ে দি। কত লাগবে বল তো?'

'বুঝতে পারছি না ভাবী, গোটা ত্রিশেক দিন।'

আশ্চর্যের ব্যাপার, ভাংতি টাকা ঘরে নেই। কী করা যায়! ভাংতি কেন, কোনো টাকাই নেই। জামানের মানিব্যাগ থেকে একটা পাঁচশ টাকার নোট কি দিয়ে দেবে? জামান জানতে পারলে খুব রাগ করবে। আর জানতে যে পারবে তাও নিশ্চিত। টাকা না গুনেই সে বলে দিতে পারবে — পাঁচশ টাকার একটা নোট কম।'

ইলা অস্বস্তির সঙ্গে বলল, 'একটা পাঁচশ টাকার নোট দেব?'

'দিন। আমি ভাঙিয়ে নেব।'

'তুমি মাটির দিকে তাকিয়ে কথা বলছ কেন হাসান?'

হাসান জবাব দিল না। চোখ তুলে তাকালও না। ইলা তাকে পাঁচশ টাকার একটা নোট দিল। অন্তু ছোট ছোট পা ফেলে যাচ্ছে। অন্তুর পা দুটি শরীরের তুলনায় ছোট। কেমন হেলেদুলে হাঁটে, মনে হয় পড়ে যাবে।

পাঁচশ টাকার নোট মোট কতগুলো আছে? ইলার গুনে দেখতে ইচ্ছা করছে। টাকা দেখলেই সব মানুষেরই বোধহয় গুনতে ইচ্ছা করে। ইলার যা ভাগ্য, গুনবার সময়ই হয়তো জামান এসে উপস্থিত হবে। থাক, গোনার দরকার নেই। আন্দাজে মনে হচ্ছে একশটার মতো হবে। তার মানে পঞ্চাশ হাজার টাকা। কী সর্বনাশ! গা ঝিমঝিম করে। এতগুলো টাকা একটা মানুষ পকেটে নিয়ে ঘোরে? যদি সত্যি সত্যি হারিয়ে যেত? ইলা টাকা গুনতে বসল। একশ বারটা পাঁচশ টাকার নোট। তার মানে ছাপ্পান্ন হাজার। কী সর্বনাশ!

ইলা দরজা বন্ধ করে আলনার দিকে গেল। ঘরে পরার একটা শাড়ি নেবে। বাথরুমে গিয়ে গা ধুবে। প্রচণ্ড গরম লাগছে। গা কুটকুট করছে। বাথরুমে গিয়ে হয়তো দেখা যাবে পানি নেই। বিকেলের দিকে এ বাড়িতে পানি থাকে না। জামানকে একটা বড় বালতি কিনতে বলেছিল। জামান বিরক্ত হয়ে বলেছে — খামোকা একটা বড় বালতি কেনার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দরকার কী? দুজন মাত্র মানুষ — বালতি-ফালতি কিনে বাড়ি ভর্তি করার জাস্টিফিকেশন নেই। শুধু শুধু ঝামেলা। কী কিনতে হবে, কী কিনতে হবে না — তা আমাকে বলার দরকারও নেই। আমার চোখ-কান খোলা, আমি জানি কী দরকার — কী দরকার না। যখন যা দরকার হবে, আমি ঠিকই কিনব।

কী অদ্ভুত মানুষ! টাকা আছে, অথচ খরচ করবে না। বিয়ের প্রথম এক মাস ইলা কিছু বুঝতে পারে নি। সে ভেবেছিল, মানুষটার আর্থিক অবস্থা বোধহয় তাদের মতোই। টাকা-পয়সা নেই। যদিও থাকছে সুন্দর একটা ফ্ল্যাটে। বসার ঘরে কার্পেট আছে, সোফা আছে, টিভি, ফ্রিজ আছে। তবে হাতে হয়তো নগদ টাকা নেই। বিয়ে উপলক্ষে জিনিসপত্র কিনেই সব শেষ করে ফেলেছে। লোকটার উপর খুব মায়া হয়েছিল। মায়া হয়েছিল বলেই বিয়ের তিন দিনের দিন সে বলেছিল—আমার কাছে সাতশ টাকা আছে। তোমার যদি দরকার হয় তুমি নিতে পার।'

'কোথায় পেলে সাতশ টাকা?'

'ভাইয়া আমাকে এক হাজার টাকা দিয়েছিল। বিয়েতে কিছু দিতে পারে নি এই জন্যে এক হাজার টাকা দিল। আমি নিতে চাই নি ...'

'এক হাজার থেকে সাতশ আছে, বাকি তিনশ কী করলে?'

ইলা বিস্মিত হয়ে বলল, 'খরচ করেছি।'

'গরিব ঘরের মেয়ে। খরচের এই হাত তো ভালো না। দেখি, এই সাতশ টাকা আমাকে দিয়ে দাও। কোনো কিছুর প্রয়োজন হলে বলবে। একটা কথা মন দিয়ে শোন — ইলা এই জীবনে অনেক কিছুই কিনতে ইচ্ছা করবে। কিনতে ইচ্ছা করলেই কিনতে নেই। টাকা-পয়সা অনেকেরই থাকে — খুব কম মানুষই থাকে যারা টাকা জমাতে পারে। হাতের ফাঁক দিয়ে টাকা বের হয়ে যায়। বুঝতে পারে না। বুঝতে পারছ?'

ইলা শুকনো গলায় বলল, 'পারছি।' তার মনটা বেশ খারাপ হল। মানুষটা তাহলে কৃপণ। বেশ ভালো কৃপণ। ইলা লক্ষ করল মানুষটা শুধু কৃপণ না, মনও ছোট। কৃপণ মানুষের মন এমনিতেই ছোট থাকে — তবে তারা তা গোপন রাখতে চেষ্টা করে। এই লোকটা তা করে না। বরং চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়।

বিয়ের পরপর রুবা এসেছে, বড় বোনের সঙ্গে কয়েকদিন থাকবে। জামান হাসিমুখে গল্পটল্প করছে, তবু এক ধরনের গম্ভীর-গম্ভীর ভাব। সারাক্ষণ ভুরু কুঁচকানো। জামান এমন করছে কেন ইলা কিছুতেই ধরতে পারে না। তৃতীয় দিনের দিন রাতে ঘুমুতে যাবার সময় জামান হাই তুলতে তুলতে বলল, 'রুবা কদিন থাকবে?'

ইলা হাসিমুখে বলল, 'এসএসসি পরীক্ষা হয়ে গেছে। এখন তো ছুটি। চলে যেতে চেয়েছিল, আমি জোর করে রেখে দিয়েছি।'

জামান গম্ভীর গলায় বলল, 'জোর করে রাখার দরকার কী? জোর-জবরদস্তি ভালো না। হয়তো এখানে থাকতে ভালো লাগছে না।'

'ভালো লাগছে না কে বলল। ভালো লাগছে — দেখ না কত হাসিখুশি।'

'সারাক্ষণ দেখি টিভির নব্ টেপাটেপি করছে। এইসব সেনসিটিভ ইনস্ট্রুমেন্ট। হুট করে নষ্ট করে দেবে।'

ইলা হতভম্ব হয়ে গেল। কী বলছে এই মানুষটা? জামান সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলল, 'ঐ দিন দেখি ফ্রিজের দরজা ধড়াম করে বন্ধ করল। ট্রাকের দরজাও এমন করে কেউ বন্ধ করে না। ফ্রিজের দরজা নিয়ে কুস্তি করার দরকার কী?'

ইলা বলল, 'আচ্ছা, কাল সকালে ওকে যাত্রাবাড়িতে রেখে এস।'

'সকালে পারব না, কাজ আছে। দেখি বিকেলে না হয় রেখে আসব।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'না, সকালেই রেখে আস।'

'রাগ করছ না-কি? ফালতু ব্যাপার নিয়ে আমার সঙ্গে রাগারাগি করবে না। বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে বেশি মাখামাখি কচলাকচলি আমার পছন্দ না। তারা থাকবে তাদের মতো। আমরা থাকব আমাদের মতো। বুঝতে পারছ?'

'পারছি।'

'বিয়ের পর সুখী হবার একমাত্র উপায় হচ্ছে বাপের বাড়ি দ্রুত ভুলে যাওয়া। ভুলে যাবার চেষ্টা কর।'

'চেষ্টা করব।'

জামান সত্যি সত্যি সকালে রুবাকে নিয়ে যেতে চাইবে, ইলা ভাবে নি। জামান তাই করল। ইলার চেয়েও অবাক হল রুবা। রুবা বলল, 'দুলাভাই, আমার তো আরো তিন দিন থাকার কথা। আজ যাব কেন?'

'থাকতে চাইলে তিন দিন থাক, অসুবিধা কি! তোমার আপা বলল রেখে আসতে।'

রুবা গেল ইলার কাছে। বিস্মিত হয়ে বলল, 'দুলাভাই আমাকে যাত্রাবাড়িতে রেখে আসতে চাচ্ছে — ব্যাপার কী?'

'ব্যাপার কিছু না।'

'তোমাদের মধ্যে ঝগড়া-টগড়া হয়েছে?'

'না।'

'এমন গম্ভীর মুখে না বলছ কেন? আচ্ছা শোন, মা যদি শোনে তোমাদের মধ্যে ঝগড়া হয়েছে — মা খুব মন খারাপ করবে।'

'আমাদের মধ্যে কোনো ঝগড়া হয় নি। আমার প্রচণ্ড মাথাধরা। এ জন্যেই বোধহয় গম্ভীর হয়ে আছি। তোর থাকতে ইচ্ছা হলে থাক।'

'না আপা, এখন যাই। দুলাভাই বলছিলেন তিনি ভিসিআর কিনবেন। কেনা হোক, তখন এসে অনেকদিন থাকব। রোজ পাঁচটা করে ছবি দেখব। তোমরা টেলিফোন কবে নিবে আপা? এত সুন্দর বাড়ি — টেলিফোন ছাড়া মানায় না।'

'টেলিফোনের জন্যে অ্যাপ্লাই করেছে। এসে যাবে শিগগির।'

'দুলাভাইয়ের কি অনেক টাকা, আপা?'

'জানি না।'

ইলা আসলেই জানে না। মানুষটা সম্পর্কে জানে না। তবু তার সঙ্গে সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে জীবনযাপন করে।

অন্তুর পেছনে মাত্র উনিশ টাকা খরচ হয়েছে। হাসান বাসে করে তাকে মেডিকেলের ইমার্জেন্সিতে নিয়ে গেছে। ডাক্তার দুটা স্টিচ দিয়েছেন। এটিএস এবং কমবায়োটিক ইন্জেক্শন শুধু কিনতে হয়েছে। হাসান পাঁচশ টাকার নোটটা ভাঙায় নি। ফেরত এনেছে। ইলা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। মানিব্যাগে রেখে দিলেই হবে। জামান কিছুই জানতে পারবে না।

'তোমাকে আমি সকালে টাকাটা দিয়ে দেব।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'বস একটু, চা খাও।'

'আমি চা খাই না।'

'চা না খেলে শরবত খাও। আমি লেবু দিয়ে শরবত বানিয়ে দি। ভালো লাগবে।'

'কিচ্ছু লাগবে না ভাবী।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তুমি বস তো দেখি।'

হাসান জড়সড় হয়ে সোফার চেয়ারে বসল। এখনো মুখ তুলে তাকাচ্ছে না। কার্পেটের ডিজাইন দেখছে। পুরুষমানুষ এমন হয় কখনো? কী বিশ্রী মেয়েলি স্বভাব!

'কী পড় তুমি?'

'বি. এ. পড়ি। এ বছর পরীক্ষা দেব।'

'তাই না-কি? কখন পড়? আমি তো সব সময় তোমাকে বারান্দায় বসে থাকতে দেখি।'

'নাইট সেকশনে পড়ি। জগন্নাথ কলেজে।'

'ও আচ্ছা।'

'ডে সেকশনে ভর্তি হতাম। চান্স পেয়েছিলাম। চাচা নিষেধ করলেন। চাচা বললেন — দিনে অনেক কাজকর্ম আছে। তাই...'

'চাচা কে? আমাদের বাড়িওয়ালা?'

'জ্বি।'

'আমি শুনেছিলাম তিনি তোমার মামা।'

'জ্বি না, চাচা। বাবার ফুপাতো ভাই।'

'দিনের বেলায় কী কাজ কর?'

'বাজার করি। তারপর প্রেসে যাই। চাচার একটা প্রেস আছে মগবাজারে। কম্পোজ সেকশান।'

'ও, তাই না-কি?'

'জ্বি।'

'তুমি আমার অনেক উপকার করলে ভাই, নাও, শরবত খাও। ঘরে আর কিছু নেই।'

হাসান এক নিশ্বাসে শরবতের গ্লাস শেষ করেই উঠে দাঁড়াল। ইলার মনে হল শরবতের বদলে চা দিলে গরম চা-ও হয়তো সে এভাবে এক নিশ্বাসে খেয়ে ফেলত।

'ভাবী, যাই?'

'তুমি আরেকদিন এসে আমাদের সঙ্গে চারটা ডাল-ভাত খাবে। আর শোন, তুমি আমাকে এত লজ্জা পাচ্ছ কেন? মুখ তুলে তাকাও। রাস্তায় কখনো দেখা হলে আমি তোমাকে চিনতে পারব না। এখনো আমি ভালোমতো তোমার মুখ দেখি নি।'

হাসান মুখ তুলে তাকাল। এই প্রথম সে হাসল। লাজুক ধরনের সুন্দর একটা ছেলে। কচি মুখ। সে আবার বলল, 'ভাবী, যাই?'

'আচ্ছা যাও। আর শোন, তুমি আমাকে ভাবী ডাকবে না। আপা ডাকবে। ভাবী ডাকটা শুনতে ভালো লাগে না।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'আজ রাতে গেটটা একটু খোলা রাখতে হবে। ওর ফিরতে দেরি হবে। এগারটা-বারটা বেজে যাবে।'

'জ্বি আচ্ছা!'

অন্তুর জ্বর এসেছে। বেশ ভালো জ্বর। রাতে সে কিছুই খেল না। ইলা বসার ঘরে মাদুর পেতে অন্তুকে শুইয়ে দিল। বেচারা মরার মতো শুয়ে আছে। গালে মশা বসেছে, সেই মশা তাড়াবারও চেষ্টা করছে না। ছেলেটার জন্যে একটা মশারি কিনতে হবে। জামানকে বলে দেখলে হয়। রাজি হতেও পারে। মশারি কোনো অপ্রয়োজনীয় জিনিস নয়। প্রয়োজনের জিনিস।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইলা অন্তুর হাতে একটা পাঁচ টাকার নোট দিল। সে টাকা পেয়ে খুব খুশি। হাসার চেষ্টা করছে। ইলা বলল, 'খবরদার, হাসবি না। হাসলে ঠোঁটে টান পড়বে। ব্যথা পাবি।'

অন্তু ব্যথা পাচ্ছে তবু হাসছে।

এরা কত অল্পতে খুশি! ঠোঁটের ব্যথার কথা এখন আর তার মনে নেই। মনে থাকলেও ব্যথা অগ্রাহ্য করে সে ঘুমাবে। ভোরবেলা উঠে কাজকর্ম করবে। টাকাটা লুকানো থাকবে গোপন কোনো জায়গায়। বার বার কাজ ফেলে দেখে আসবে নোটটা ঠিকমতো আছে কিনা।

'অন্তু! দুধ খাবি? এক কাপ দুধ এনে দেই?'

'দুধ গন্ধ করে।'

'থাক তাহলে। গন্ধ করলে খেতে হবে না। ঘুমিয়ে পড়।'

বাধ্য ছেলের মতো অন্তু চোখ বন্ধ করল। ঘুমিয়েও পড়ল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে।

ছেলেটার বাবা-মা কোথায় আছে ইলা জানে না। অন্তু নিজেও জানে না। জানলে খবর দিত।

জামান রাত এগারটায় ফিরল। কোনো কথা না বলে গম্ভীর মুখে তোয়ালে হাতে বাথরুমে ঢুকল। সেখান থেকেই চেঁচিয়ে বলল, 'খেয়ে এসেছি। এক কাপ চা করে দাও।'

আশ্চর্যের ব্যাপার! হারানো মানিব্যাগের কথা সে কিছুই বলছে না। ইলা ভেবেছিল ঘরে ঢুকে সে জিজ্ঞেস করবে, 'মানিব্যাগ পেয়েছ?' এতগুলো টাকা মানিব্যাগে। জিজ্ঞেস করাই তো স্বাভাবিক। যে কোনো মানুষ করবে। জামানের মতো সাবধানী মানুষ আরো বেশি করবে। জিজ্ঞেস করছে না কেন?

খালিগায়ে বারান্দায় বসে জামান চা খাচ্ছে। বারান্দায় বাতি নেভানো। তার মুখ দেখা যাচ্ছে না। তবু সে যে খুব চিন্তিত, এটা বোঝা যাচ্ছে। কেমন কুঁজো হয়ে বসেছে। একটু পরপর শব্দ করে নিশ্বাস ফেলছে। ইলা ঠিক করল, রাতে শোবার সময় সে বলবে মানিব্যাগ ঘরে পাওয়া গেছে। তুমি ফেলে গিয়েছিলে। এত চিন্তা করার কিছু নেই।

ইলা চায়ের কাপ জামানের দিকে বাড়িয়ে ধরল। জামান শান্ত গলায় বলল, 'বিরাট একটা লোকসান হয়েছে।'

'কী লোকসান?'

'পকেটমার হয়েছে।'

'বল কী?'

'হারামজাদা মানিব্যাগ নিয়ে গেছে।'

'সত্যি নিয়েছে?'

'এটা আবার কী রকম কথা? সত্যি না তো কি? আমি তোমার সঙ্গে ঠাট্টা-ফাজলামি করছি?'

ইলা কিছু একটা বলতে গিয়েও বলল না। জামান চায়ের কাপ নামিয়ে উঠে দাঁড়াল। নিজের মনেই বলল, 'কোত্থেকে নিয়েছে তাও জানি। কলাবাগানে রিকশা থেকে নামলাম। ঠিক তখন একটা লোক ঘাড়ে পড়ে গেল। মানিব্যাগ যে তখনি পাচার হয়ে গেছে আমি বুঝতে পারি নি। রিকশাভাড়া দিতে গিয়ে বুঝলাম। এর মধ্যে হারামজাদা হাওয়া।'

'মানিব্যাগ পকেটে ছিল?'

'মানিব্যাগ পকেটে থাকবে না তো কোথায় থাকবে? অনাবশ্যক কথা বল কেন? কী বিশ্রী অভ্যাস।'

'কত টাকা ছিল?'

'ছিল কিছু। ঠাণ্ডা এক গ্লাস পানি দাও, আর পান দাও। দেশটা চোরে ভর্তি হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেছে।'

জামান ঘুমাতে এল খবরের কাগজ হাতে। বিছানায় বসে মানুষটা ভুরু কুঁচকে কাগজ পড়ছে। ইলা বুঝতে পারছে জামান আসলে কাগজ পড়ছে না। নিজেকে ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করছে। ইলা শুয়ে আছে। তাকিয়ে আছে জামানের দিকে। বড় মায়া লাগছে।

ইলার ঠিক মাথার নিচেই প্রায় একশ বারটা পাঁচশ টাকার নোট বোঝাই মানিব্যাগ। না একশ বার না, তের। হাসানের ফেরত দেয়া নোটটাও সে রেখে দিয়েছে। সে এক সময় ক্ষীণস্বরে বলল, 'এই, একটা কথা শোন।'

জামান বিরক্ত স্বরে বলল, 'এখন ঘুমাও তো। কোনো কথা শুনতে পারব না। কথাবার্তা যা সকালে বলবে। দুপুররাতের জন্যে জমা করে রাখবে না।'

'ঘুমাবে না?'

'কেন যন্ত্রণা করছ? তোমার ঘুম তুমি ঘুমাও।'

'টাকা হারানোয় খুব খারাপ লাগছে?'

'না, খারাপ লাগছে না। খুব আনন্দ পাচ্ছি।'

জামান খবরের কাগজ ভাঁজ করে মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলল। এটি তার স্বভাবের বাইরে। সে খুব গোছালো। এমন কাজ কখনো করবে না। ইলা বলল, 'বাতি নিভিয়ে দেব?'

'দাও।'

ইলা বাতি নিভিয়ে দিল। অন্তু মিয়া কুঁ-কুঁ শব্দ করছে, জ্বর বোধহয় আরো বেড়েছে। জ্বর বাড়লে কী করতে হবে ডাক্তার কি তা বলেছে? ঘরে একটা থার্মোমিটার নেই। তাদের যাত্রাবাড়ির বাসায় থার্মোমিটার আছে। রুবার দখলে থাকে। রুবার একটা কাঠের বাক্স আছে। সেই বাক্সে শুধু যে থার্মোমিটার আছে তাই না — ডেটল আছে, তুলা আছে, বার্নল আছে। বাক্সের গায়ে বড় বড় করে লেখা — 'আরোগ্য নিকেতন'।

ইলা ক্ষীণ গলায় বলল, 'ঘুমুচ্ছ?'

জামান জবাব দিল না। তবে সে যে এখনো ঘুমায় নি তা বোঝা যাচ্ছে।

ইলা আর কিছু বলল না। তার ঘুম আসছে না। প্রায়ই তার এরকম হয়। জেগে জেগে রাত পার করে দেয়। নানান কথা ভাবে। রাত জেগে ভাবতে তার বড় ভালো লাগে।

জামান বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে। বড় বড় নিশ্বাস ফেলছে। ইলা খুব সাবধানে বিছানা থেকে নামল। ফ্যানের নিচেও খুব গরম লাগছে। বারান্দায় এসে সে কিছুক্ষণ বসবে। এটাও নতুন কিছু নয়। প্রায়ই বসে। অন্ধকারে একা একা বসে থাকার মধ্যেও এক ধরনের আনন্দ আছে।

ইলা বারান্দায় চেয়ারে বসতে বসতে ভাবল, মানিব্যাগটা ফিরিয়ে না দিলে কেমন হয়? সে নিজে বুঝতে পারছে, এটা খুবই অন্যায় চিন্তা। কিন্তু কিছুতেই মাথা থেকে দূর করতে পারছে না। এক বান্ডিল পাঁচশ টাকার নোট। এত টাকা একসঙ্গে সে নিজে কখনো দেখে নি। টাকাটা কি সে নিজের জন্যে রেখে দিতে পারে না? যদি রাখে তাহলে কি খুব বড় পাপ হবে?

অন্তু আহ্-উহ্ করছে। ইলা উঠে গিয়ে তার কপালে হাত রাখল। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। মাথায় পানি ঢালা দরকার। এত রাতে পানি ঢালাঢালির ব্যবস্থা করতে গেলে জামানের ঘুম ভেঙে যাবে। সে খুব বিরক্ত হবে। ইলা অসহায় ভঙ্গিতে অন্তুর মাথার পাশে বসে রইল।

তার নিজের পানির পিপাসা হচ্ছে, কিন্তু উঠে যেতে ইচ্ছা করছে না। একজন কেউ যদি হাতের কাছে থাকত এবং বলামাত্র গ্লাস ভর্তি বরফশীতল পানি নিয়ে আসত তাহলে চমৎকার হত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'অন্তু!'

'উ।'

'তোর অসুখ সারলে তোকে আমি মার বাসায় রেখে আসব। সেখানে খুব আরামে থাকবি।'

'আচ্ছা।'

'এ বাড়িতে তোর কি ভয় লাগে?'

'হুঁ।'

ইলা মনে মনে বলল, আমারও ভয় লাগে। পানির পিপাসা ক্রমেই বাড়ছে। উঠে যেতে ইচ্ছা করছে না। এখন যদি জামান ঘুমের ঘোরে বলে, 'পানি দাও ;' সে পানি নিয়ে আসবে। অন্তু চাইলেও আনবে। অথচ নিজের জন্যে পানি আনতে যাবার সামান্য কষ্টটাও করবে না।

২

রুবা আটটার আগে ঘুম থেকে ওঠে না। যত সকাল সকালই ঘুমাতে যাক, উঠতে উঠতে সেই আটটা। তাও নিজ থেকে উঠবে না, কাউকে এসে ডাকতে হবে, পা ধরে ঝাঁকুনি দিতে হবে। ইদানীং ঘুম ভেঙে প্রথম যে কথাটি সে বলছে তা হচ্ছে — 'আজ কলেজে যাব না, মা। শরীর ভালো না।'

রুবার কথা শুনে তাঁর মা সুরমা এমন ভঙ্গিতে তাকাবেন যাতে মনে হবে তিনি এই মুহূর্তে মেয়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বেন। রুবা তখন বলবে — 'ঠিক আছে মা, যাচ্ছি।' যদিও যাবার কোনো রকম তাড়া দেখা যাবে না। দীর্ঘ সময় নিয়ে দাঁত মাজবে। নাশতা খেতে দেরি করবে। কাপড় পরতে দেরি করবে ; তারপর রিকশাভাড়ার জন্যে ঘ্যানঘ্যান করতে থাকবে। যদিও সে জানে রিকশাভাড়া পাওয়া যাবে না। যেতে হবে বাসে। সময় নষ্ট করবার জন্যেই রিকশাভাড়া নিয়ে হৈচৈ করা। শুরুর একটা বা দুটা পিরিয়ড রুবা কখনো ধরতে পারে না। এই নিয়ে তার খুব মাথাব্যথাও নেই। বন্ধু ঠিক করা আছে, তারা প্রক্সি দেবে।

রুবার বন্ধুভাগ্য খুব ভালো। কলেজ চলাকালীন সময়ে তাকে দেখা যাবে ক্যান্টিনে আড্ডা দিতে। মজার মজার গল্প বলে বান্ধবীদের সে সারাক্ষণ হাসাতে পারে। কলেজের প্রতিটি আপার কথা বলা এবং হাঁটা নকল করতে পারে। রুবার এই প্রতিভা কলেজের আপাদের অজানা নয়। প্রিন্সিপ্যাল আপা একদিন তাকে ডেকে নিয়ে খুব ধমকালেন। কড়া গলায় বললেন, 'আবার যদি শুনি তুমি আপাদের নকল করছ তাহলে খুব খারাপ হবে। কলেজ থেকে বের করে দেব। কলেজ পড়াশোনার জায়গা, এটা নাট্যশালা নয়।'

রুবা মাথা নিচু করে বলেছে, 'আর করব না আপা।' তখন রুবাকে অবাক করে দিয়ে প্রিন্সিপ্যাল আপা বললেন—'মিস মনোয়ারা কীভাবে হাঁটেন একটু দেখি।'

'সত্যি দেখাব?'

'হ্যাঁ, দেখাও। এটা হচ্ছে তোমার লাস্ট পারফরম্যান্স। মাইন্ড ইট। কলেজের ডিসিপ্লিনের ব্যাপারে আমি খুবই কড়া।'

রুবা মনোয়ারা আপার কোমর দুলিয়ে হাঁটা এবং হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ার ভঙ্গির খানিকটা করল। প্রিন্সিপ্যাল আপা খুব চেষ্টা করলেন না-হাসতে। শেষ পর্যন্ত পারলেন না। হাসলেন, কাশলেন এবং বিষম খেলেন। প্রিন্সিপ্যাল আপা বুঝতেও পারলেন না তাঁর একই সঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাসি, কাশি ও বিষম খাওয়ার দৃশ্যটি রুবা দশ মিনিটের ভেতরেই কমনরুমে দেখাবে এবং দৃশ্য দেখে তার বান্ধবীরা হাসতে হাসতে গড়াগড়ি যাবে।

রুবা এরকম ছিল না। তার পরিবর্তনটা হয়েছে হঠাৎ। কলেজে ঢোকার কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল রুবা বদলে গেছে। আগে যে কোনো তুচ্ছ কারণেও তার চোখে পানি এসে যেত। এখন হাসি এসে যায়। সে এ রকম হল কেন সে নিজেও জানে না।

আজ রুবার ঘুম ভেঙেছে খুব ভোরে। বিছানা ছেড়ে ওঠে নি। অনেকক্ষণ গড়াগড়ি করেছে। আপার বিয়ে হয়ে যাওয়ায় এই একটা লাভ তার হয়েছে। পুরোপুরি বিছানার দখল পাওয়া গেছে। এই গরমে কারো সঙ্গে গায়ে গা লাগিয়ে শুতে হচ্ছে না, ঘুমের ঘোরে কেউ গায়ে পা তুলে দিচ্ছে না। পুরো রাজত্ব তার একার।

সুরমা যথানিয়মে তাকে ডাকতে এলেন। রুবা বলল, 'পা ধরে ঝাঁকুনি শুরু করবে না মা, আমি জেগে আছি।'

'উঠে আয়। হাতমুখ ধুয়ে তৈরি হ।'

'আজ কলেজে যাব না মা। এ রকম কড়া করে তাকালেও কোনো লাভ হবে না। হাতি দিয়ে টেনেও কেউ আজ আমাকে কলেজে নিতে পারবে না।'

'কেন?'

'আজ কলেজে গেলেই দেড়শ টাকা দিতে হবে। দেড়শ টাকা তুমি দিতে পারবে না। আমারও যাওয়া হবে না।'

'এখন কীসের দেড়শ' টাকা! সেদিন না বেতন দিলি?'

'পিকনিক হচ্ছে মা।'

'চৈত্র মাসে কিসের পিকনিক?'

'পিকনিকের কোনো চৈত্র-বৈশাখ নেই। যখন ইচ্ছা তখন করা যায়। আমাদের কলেজের কিছু বড়লোকের মেয়ে পিকনিক করছে চৈত্র মাসে। তারা একটা লঞ্চ ভাড়া করেছে। ঐ লঞ্চ ঢাকা থেকে মানিকগঞ্জ যাবে। আবার ফিরে আসবে। এর জন্যে চাঁদা হচ্ছে দেড়শ টাকা।'

'তুই ওদের সঙ্গে যাবি কেন?'

'যাব নাই বা কেন?'

'বড়লোকের মেয়েদের সঙ্গে তোর এত কীসের মাখামাখি? তুই তোর নিজের মতো মেয়েগুলোর সঙ্গে মিশবি।'

'গরিব মেয়েগুলোকে খুঁজে বের করব? জনে জনে জিজ্ঞেস করব — তুমি কি গরিব, তোমার বাবা কি মারা গেছেন? তোমার বড়ভাই কি খুব কষ্ট করে সংসার চালাচ্ছেন? তুমি কি রোজ বাসে করে কলেজে আস? পিকনিকে যাবার জন্যে সামান্য দেড়শ টাকা চাঁদা কি তুমি দিতে পার না? যদি না পার তাহলে আস, তুমি আমার বন্ধু।'

'চুপ কর তো রুবা। তুই এমন ফাজিল হচ্ছিস কীভাবে!'

'জানি না মা কীভাবে হচ্ছি। আমার ফাজলামি দেখে তুমি যেমন অবাক হচ্ছ আমি নিজে তার চেয়েও বেশি অবাক হচ্ছি। মনে হয় আমাকে জ্বীনে ধরেছে। সুন্দরী মেয়েদের জ্বীনে ধরে।'

'চুপ করবি?'

'আমাকে ধমক দিয়ে কোনো লাভ হবে না মা। যে জ্বীনটা আমাকে ধরেছে তাকে কড়া করে ধমক দিতে হবে। তাকে বলতে হবে — হে জ্বীন, তুমি আমার শান্ত ভালোমানুষ মেয়েটাকে ছেড়ে দিয়ে বড়লোকের কোনো মেয়েকে ধর।'

সুরমার কড়া দৃষ্টি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে রুবা হাই তুলল। আদুরে গলায় বলল, 'এখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কটা বাজে বলতে পারবে?' সুরমা মেয়ের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বের হয়ে এলেন। রুবা বিছানা ছাড়ল। বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

বারান্দায় রুবার বড়ভাই বাবু তার দিনের সবচে' কঠিন কাজটি করছে। শুধুমাত্র একটা ব্লেড হাতে নিয়ে দাড়ি শেভ করার চেষ্টা করছে। সে বসেছে উবু হয়ে। তার সামনে চেয়ারের উপর ছোট্ট একটা আয়না। বাবুর সমস্ত চিন্তা-চেতনা আয়নায় নিবদ্ধ। রুবা বড় ভাইয়ের দাড়ি শেভ করার দৃশ্য শান্তমুখে খানিকক্ষণ দেখল। এই দৃশ্য তার কখনো ভালো লাগে না, গা শিরশির করে। একটা সামান্য রেজার কিনতে কত টাকা লাগে? ভাইয়া তা কিনবে না। নিজের জন্যে একটা পয়সা খরচ করতেও তার গায়ে জ্বর আসে।

'ভাইয়া!'

'হুঁ।'

'আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে নিশ্চয়ই কেউ নাপিত ছিল। নাপিত ছাড়া শুধুমাত্র ব্লেড দিয়ে এত সুন্দর শেভ কেউ করতে পারবে না।'

বাবু হাসল। রুবা তার সামনে বসতে বসতে বলল, 'ভাইয়া, চৈত্র মাসের এই সুন্দর সকালে তোমার কাছে কি সামান্য একটা আবেদন রাখতে পারি?'

'অবশ্যই পারিস।'

'তুমি কি আমাকে দেড়শটা টাকা দিতে পার?'

'দেড়শ?'

'হ্যাঁ দেড়শ। ভাইয়া দেবে?'

'হ্যাঁ দেব।'

রুবা ছোট্ট করে নিশ্বাস ফেলল। ভাইয়ার স্বভাবই হচ্ছে — সব কিছুতেই হ্যাঁ বলবে। আজ পর্যন্ত সে কখনো ভাইয়াকে 'না' বলতে শোনে নি। 'না' বলে যে বাংলা অভিধানে একটা শব্দ আছে তা বোধহয় এই চমৎকার মানুষটা জানে না।

'ভাইয়া, টাকাটা আজই দিতে হবে।'

বাবু আয়না থেকে মুখ ফেরাল। রুবার দিকে তাকিয়ে লজ্জিত গলায় বলল, 'আজ তো দিতে পারব না রুবা। আজ হাত একেবারে খালি। একশটা টাকা আছে, বাজার খরচ। চাল কিনতে হবে। পাঁচ কেজি চাল কিনতেই সত্তর টাকা চলে যাবে। তোরা তো আবার মোটা চাল খেতে পারিস না।'

ভাইয়া এমনভাবে কথা বলছে যেন রুবা একটা বাচ্চা মেয়ে। সংসারের কোনো সমস্যা সে বুঝতে পারে না। ব্যাপারটা ঠিক তার উল্টো। সংসারের অনেক সমস্যা সে সবার আগে বোঝে। খুব ভালোই বোঝে।

'রুবা।'

'কী ভাইয়া।'

'কিছু টাকা পাই এক জায়গায়। একটা বিল আটকে আছে। সপ্তাহখানেক পরে হলে তোর চলবে না?'

'হুঁ চলবে। খুব চলবে। তুমি বরং সপ্তাহখানেক পরে দিও।'

ভাইয়াকে খুশি করার জন্যে বলা। তার দরকার আজ। সপ্তাহখানেক পর সে টাকা দিয়ে কী করবে? পিকনিকের কথাটা যখন উঠল তখন যদি সে বলত—"ঝড়-বাদলের দিনে কীসের পিকনিক? আমি এর মধ্যে নেই।" তাহলে আজ আর এই ঝামেলা হত না। তখন সে-ই সবচে' বেশি লাফিয়েছে। কি কি খাওয়া হবে তার লিস্ট বানিয়েছে। সবাই শাড়ি পরে যাবে। হলুদ শাড়ি। এ রকম একটা প্রস্তাবও ছিল। সেই প্রস্তাব বাতিল হয়ে গেছে। বাতিল হয়েছে তার জন্যে। কারণ তার হলুদ শাড়ি নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুরমা লক্ষ করলেন, রুবা কলেজে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছে। কলেজে যাবার নাম করে অন্য কোথাও যাচ্ছে না তো? ইদানীং তার এ রকম সন্দেহ হচ্ছে। দিনকাল ভালো না। ছেলেপুলেরা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এদের রাখতে হয় চোখে চোখে। তার উপর বাপ নেই মেয়ে। গার্জেন ছাড়া মেয়ে হচ্ছে পাল–খাটানো নৌকার মতো। যেদিকে বাতাস দিবে সেদিকে যাবে। আর বাবার সংসারের মেয়ে হল গুণটানা নৌকা। যে নৌকাকে বাবাই গুণের দড়ি ধরে টেনে নিয়ে যাবে। তার সংসারে গুণ টানার মানুষ নেই। বাবু সাধ্যমতো করছে। করলেও সে হল ভাই। বাবার কাজ কি ভাই দিয়ে হয়?

'কোথায় যাচ্ছিস রুবা?'

'কোথায় আবার? কলেজে। রিকশাভাড়া দাও মা।'

'রোজ রোজ রিকশাভাড়া — কী শুরু করেছিস তুই?'

'আচ্ছা বেশ। না দিলে না দেবে। চেঁচিও না। সকালবেলাতেই চেঁচামেচি শুনতে ভালো লাগে না।'

'সত্যি করে বল তো কোথায় যাচ্ছিস?'

'প্রথমে যাব আপার কাছে। দেড়শ টাকা ধার চাইব। যদি পাই তাহলে যাব কলেজে, আর যদি না পাই তাহলে যাব সদরঘাট।'

'সদরঘাট?'

'হুঁ। সদরঘাট থেকে বুড়িগঙ্গায় ঝাঁপ দেব। সলিল সমাধি।'

'তোর কথাবার্তার কোনো মা–বাপ নেই।'

'না নেই। আমি ঠাট্টা করছি না মা। সত্যি সত্যি বুড়িগঙ্গায় ঝাঁপ দেব। ঝপাং একটা শব্দ ; তারপর সব শেষ। বুড়িগঙ্গায় যে বাংলাদেশ–চীন মৈত্রী সেতু আছে — ঐ সেতু থেকে ঝাঁপ দেব।'

সুরমা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। এই মেয়ে কন্ট্রোলের বাইরে চলে যাচ্ছে। একে খুব তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দেয়া দরকার। কোনো সম্বন্ধ আসছে না। একটা ছেলে পাওয়া গেছে। কিন্তু তার কথা বলতেও সাহসে কুলোচ্ছে না। ছেলের আগে এক বার বিয়ে হয়েছিল। সেই পক্ষের একটা ছেলে আছে। তাতে তো আর জগৎ–সংসার অশুদ্ধ হয়ে যায় না। পাত্র হিসেবে বরং এইসব ছেলেই ভালো হয়। বাবুর সঙ্গে একবার কথা বলতে হবে।

বাবু রুবার সঙ্গে সঙ্গে আসছে। তাকে বাসে তুলে দিয়ে সে বাজার করবে। সেই বাজারে রান্না হবে। অতিদ্রুত খেয়ে ছুটবে অফিসে। অফিস হচ্ছে মালিবাগে তিন তলায় আট ফুট বাই ছফুট একটা ঘর। ঘরের বাইরে সাইনবোর্ড — 'বন এন্টারপ্রাইজেস'। বাবুর 'ব' এবং নাসিমের 'ন' দিয়ে বন। দুই বন্ধুর পার্টনারশিপ বিজনেস।

'আমাকে বাসে তুলে দিতে হবে না, ভাইয়া। তুমি তোমার কাজে যাও।'

'আহ্ চল না। গল্প করতে করতে যাই।'

'তুমি আবার গল্পও জান নাকি?'

'আমি জানি না। তুই তো জানিস। তুই বল, আমি শুনি।'

'আমি যেসব গল্প জানি সেসব তোমার ভালো লাগবে না।'

'কী করে বুঝলি?'

'আমি বুঝতে পারি। আমি অনেক কিছুই বুঝতে পারি যা তোমরা বুঝতে পার না।"

বাসে ওঠা খুবই মুশকিল। ভোরবেলা চাপের সময় কোনো কন্ডাক্টার মহিলা যাত্রী নিতে চায় না। এক জন মহিলা একাই পাঁচ জনের জায়গা দখল করে। গায়ে গা লেগে গেলে ছ্যাঁৎ করে ওঠে। কী দরকার ঝামেলার।

রুবা বলল, 'শেয়ারে টেম্পোতে করে চলে যাই, ভাইয়া? গুলিস্তানে নামব। এক টাকা মাত্র ভাড়া।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আরে না, টেম্পোতে মেয়েরা যায় নাকি?'

'বাসে যেতে পারলে টেম্পোতেও যাওয়া যায়। অনেক মেয়েরা কিন্তু যাচ্ছে।'

'যাচ্ছে নাকি!'

'হুঁ। আমি নিজেও দুদিন গেলাম।'

'সে কী!'

'গুলিস্তানে নামলে আমার সুবিধাও হবে। প্রথমে যাব আপার কাছে।'

'ইলার কাছে গেলে বলিস তো খুব সাবধানে থাকতে। পত্রিকায় দেখলাম, ঝিকাতলার এক বাসায় দিনে-দুপুরে ডাকাতি হয়েছে। টিভি নিয়ে গেছে। খবরটা শুনেই বুক ছ্যাঁৎ করে উঠল। ভাবলাম ওর বাসাতেই ডাকাতি হল কিনা।'

'আপাদের পাশের বাসায় হয়েছে।'

'তুই জানলি কীভাবে?'

'আমার মন বলছে।'

রুবা হাসতে লাগল। বাবু তাকে টেম্পোতে তুলে দিল। অন্য যাত্রীরা সরুচোখে তাকাচ্ছে। ব্যাপারটা তারা পছন্দ করছে না। টেম্পোর ছোকরা দাঁত বের করে হাসছে। নতুন ধরনের যাত্রী, তার মনে হয় ভালোই লাগছে।

রুবার পাশে একটি অল্পবয়সী ছেলে। খুব সম্ভব মফস্বল থেকে এসেছে। সে অস্বস্তি বোধ করছে। অনেকখানি জায়গা রুবাকে ছেড়ে দিয়ে নিজেকে এমন করে গুটিয়েছে যে রুবার একটু মনখারাপ হল। সে নরম স্বরে বলল, 'আপনার এত কষ্ট করার দরকার নেই। আপনি আরাম করে বসুন। গায়ে গা লাগলে আমার গা পচে যাবে না।'

'অসুবিধা নাই। আমার কোনো অসুবিধা নাই।'

ছেলেটি আরো গুটিয়ে গেল। অস্বস্তিতে বেচারা যেন মারা যাচ্ছে। রুবা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভাবল, জীবন গল্প-উপন্যাসের মতো হলে বেশ হত। উপন্যাসে এই জায়গায় ছেলেটা কৃতজ্ঞ চোখে তাকাবে। ভাড়া দেবার সময় দেখা যায় ছেলেটা মানিব্যাগ ফেলে এসেছে। মেয়েটা তখন ভাড়া দিয়ে দেবে। ছেলেটা বলবে, আপনাকে কী বলে যে থ্যাংক্স্ জানাব। মেয়েটা বলবে, 'একদিন আসুন না আমাদের বাসায়।' ছেলেটা আসবে। এসে দেখে কী অদ্ভুত কাণ্ড! চার তলা বিরাট এক বাড়ি। এই মেয়ে এই বাড়ির মেয়ে। বাবা-মা'র একমাত্র সন্তান। ঐদিন মেয়েটি টেম্পোতে উঠেছিল নিতান্তই শখের কারণে। ছেলেটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলবে। কারণ সে খুব গরিব। টিউশ্যানি করে অনেক কষ্টে সংসার চালায়।

রুবাদের টেম্পোর পেছনে অনেকক্ষণ থেকে একটা লাল রঙের টয়োটা আসছে। হর্ন দিচ্ছে। সাইড পাচ্ছে না বলে যেতে পারছে না। টয়োটাটা চালাচ্ছে সুন্দরী একটা মেয়ে। সে কৌতূহলী চোখে মাঝে মাঝে রুবাকে দেখছে। এই মেয়েটি জীবনে হয়তো কোনোদিন টেম্পোতে চড়ে নি। ভবিষ্যতেও চড়বে না। মাঝে মাঝে টেম্পোর মহিলা যাত্রীদের দিকে তাকাবে বিস্ময় নিয়ে। রুবার খুব ইচ্ছা করছে মেয়েটাকে একটা ভেংচি কাটতে। ভেংচি খেয়ে টয়োটা গাড়ির রূপবতী ড্রাইভারটির মুখের ভাব কেমন হয় দেখতে ইচ্ছা করছে। রুবা ভেংচি কাটার মানসিক প্রস্তুতি নেবার আগেই টয়োটাটা তাদের ওভারটেক করে গেল। রুবার মন খারাপ হয়ে গেল।

৩

কে যেন নখ দিয়ে দরজা আঁচড়াচ্ছে।

কী অদ্ভুত কাণ্ড! কলিং বেল আছে, দরজার কড়া আছে। বেল টিপবে কিংবা কড়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাড়বে। দরজা নখ দিয়ে আঁচড়াবে কেন? পাগল–টাগল না তো! ইলার বুক ছ্যাঁৎ করে উঠল। ভাগ্যিস সে একা নেই। জামান আছে।

'কে?'

চাপা হাসির শব্দ। আবার দরজায় আঁচড়।

ইলা সাহস করে দরজা খুলল। যা ভেবেছিল তাই। রুবা হাসিমুখে দাঁড়িয়ে।

রুবা বলল, 'পাঁচটা টাকা দিতে পারবে আপা? রিকশাভাড়া।'

'দাঁড়া দিচ্ছি।'

রুবা বসার ঘরে ঢুকে একটু হকচকিয়ে গেল। গম্ভীর মুখে জামান বসে আছে। জামানের সামনে সে কেন জানি সহজ হতে পারে না। রুবার ধারণা হল, দরজা আঁচড়ানোর ব্যাপারটায় দুলাভাই বিরক্ত হয়েছেন।

'কেমন আছেন দুলাভাই?'

'ভালো। দরজা আঁচড়াচ্ছিলে কেন?'

'ঠাট্টা করছিলাম।'

'এ রকম ঠাট্টা না করাই ভালো। সব বয়সে সব ঠাট্টা ভালো না। আর শোন, রিকশাভাড়া না নিয়ে রিকশায় উঠবে না। ধর, আমরা কেউ যদি বাসায় না থাকতাম তখন কী করতে?'

'এত ভোরে আপনারা যাবেন কোথায়? ঘরেই তো থাকবেন, তাই না? আমি আসছি দুলাভাই। ভাড়াটা দিয়ে আসি।'

রুবা একটু মনখারাপ করে রিকশাভাড়া দিতে গেল। জামান ইলার দিকে তাকিয়ে অপ্রসন্ন গলায় বলল, 'তোমাদের সবারই কাণ্ডজ্ঞান একটু কম। একটু না, অনেকখানি কম।' ইলা কিছু বলল না।

'পকেটে টাকা–পয়সা না নিয়েই রিকশা ভাড়া করে চলে এসেছে। এর মানে কী? এইসব ব্যাপার আমার খুব না–পছন্দ।'

'আস্তে বল, ও এসে শুনবে।'

'শোনার জন্যেই তো বলা। শুনে যদি কিছু শেখে। তা তো শিখবে না। সবাই কাজ করবে তার নিজের মতো।

রুবা বোধহয় কিছু শুনেছে। সে ঘরে ঢুকল মুখ কালো করে। লজ্জিত মুখে জামানের দিকে একবার তাকিয়েই নিচু গলায় বলল, 'আপা, আরো দুটাকা দিতে হবে। পাঁচ টাকা ভাড়া ঠিক করে এসেছি। এখন চাচ্ছে সাত টাকা। আমার কাছে একটা পাঁচ টাকার নোট আছে, ওটা নিতে চাচ্ছে না। একটু ছেঁড়া।'

জামান বিশ্রী ভঙ্গিতে হাসল। লজ্জায় রুবার মরে যেতে ইচ্ছা করছে।

ইলা আরো দুটাকা এনে দিল। জামান ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'এ রকম কাজ আর করবে না রুবা।'

'জ্বি আচ্ছা।'

রুবার চোখে প্রায় পানি এসে যাচ্ছিল। সে নিজেকে সামলে নিল। রিকশাওয়ালাকে বাড়তি দুটাকা দিল। দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। এই মুহূর্তেই আবার ঘরে ঢোকা ঠিক হবে না। চোখে পানি এসে যাবে। বরং কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে নিজেকে সামলে নেয়া যাক। একবার ভাবল, ঘরে না গিয়ে কলেজের দিকে হাঁটা ধরবে। কিন্তু তাতে আপার মন খুব খারাপ হবে। ক্যাটক্যাট করে দুলাভাই নিশ্চয়ই আপাকে খুব কথা শুনাবে। রুবা আবার ঘরে ঢুকল।

জামান বলল, 'কোনো কাজে এসেছ, না এমনি?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আপার কাছে এসেছিলাম।'

'তা তো বুঝতেই পারছি। সেটা কাজে, না অকাজে?'

'অকাজে।'

ইলা রুবার হাত ধরে তাকে রান্নাঘরে নিয়ে গেল। নিচু গলায় বলল, 'তোর দুলাভাইয়ের অনেকগুলো টাকা হারিয়ে গেছে। এই জন্যে মনখারাপ। যা মনে আসছে, বলছে। তুই কিছু মনে করিস না। লক্ষ্মী ময়না। কিছু মনে করবি না।'

'না, মনে করব কী? আমার এত মনটন নেই।'

'মা ভালো আছে?'

'আছে। মোটামুটি ভালো।'

'আর ভাইয়া?'

'সেও ভালো।'

'তার ব্যবসা কেমন চলছে রে?'

'ভালো না। লাভ এক পয়সাও হচ্ছে না। মাঝে মাঝে লোকসান। এখন মনে হচ্ছে সমান সমান যাচ্ছে। লাভও নেই, লোকসানও নেই।'

'নাসিম ভাই, নাসিম ভাই কেমন আছে?'

রুবা চট করে এই প্রশ্নের উত্তর দিল না। আপার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, 'জানি না কেমন। অনেক দিন আমাদের বাসায় আসে না।' ইলা অস্বস্তির সঙ্গে বলল, 'তুই এইভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আছিস কেন?' রুবা বলল, 'তোমাকে দেখছি। তুমি আরো সুন্দর হয়েছ। যত দিন যাচ্ছে তুমি তত সুন্দর হচ্ছ।'

ইলা বলল, 'তুই দাঁড়া এখানে। আমি তোর দুলাভাইকে চা-টা দিয়ে আসি। তুই চা খাবি?'

'না। আমাকে ফ্রিজের ঠাণ্ডা পানি দাও আপা। ফ্রিজ ধরলে দুলাভাই আবার রাগ করবে না তো?'

ইলা কিছু বলল না। চায়ের কাপ নিয়ে বসার ঘরে ঢুকল। জামান শার্ট গায়ে দিচ্ছে। আজ সে দাড়ি কামায় নি। এক দিন দাড়ি না কামালে তাকে কেমন বুড়োটে দেখায়। জামান চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে বলল, 'রুবা কী জন্যে এসেছে?'

'এমনি এসেছে। বেড়াতে। আবার কী জন্যে।'

'আমার তো মনে হয় টাকা-পয়সা চাইতে এসেছে। হাবভাবে তাই মনে হচ্ছে। পাঁচ-দশ চাইলে দিয়ে দিও। এর বেশি চাইলে না করবে।'

'আচ্ছা।'

'আমি যাচ্ছি জয়দেবপুর। ফিরতে রাত দশটার বেশি বাজবে। বাড়িওয়ালাকে বলবে গেটটা যেন খোলা রাখে। ব্যাটা ছোটলোক! সন্ধ্যাবেলা গেট বন্ধ করে দিবে। ইয়ারকি!'

'রোজ রোজ জয়দেবপুর যাচ্ছ কেন?'

'কাজ আছে, তাই যাচ্ছি। কাজ না থাকলে যেতাম না। তোমার অতিরিক্ত কৌতূহল আমার পছন্দ না। কৌতূহল যত কম থাকে তত ভালো।'

ইলা কাতর গলায় বলল, 'তুমি যাবার আগে রুবাকে কিছু-একটা বলে যাও। বেচারা মনখারাপ করেছে।'

'কী বলে যাব?'

'চলে যাচ্ছ যে এটা বলবে।'

'ওকে তা বলার দরকার কী? চলে যাচ্ছি তার জন্য কি অনুমতি নিতে হবে?'

জামান গম্ভীর মুখে বেরিয়ে গেল। ধড়াম করে দরজা বন্ধ করে খানিকটা রাগও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখাল। সকাল থেকেই সে রেগে আছে।

ইলা রান্নাঘরে ফিরে এসে দেখে রুবা সত্যি সত্যি কাঁদছে। ওড়নার একপ্রান্ত চোখে ধরে আছে। নিঃশব্দ কান্না। ইলা তখনি সন্দেহ করেছিল — এই কাণ্ড হবে।

'কী হয়েছে রে?'

রুবা ফিক করে হেসে ফেলে বলল, 'অভিনয় করছি। তুমি কি ভেবেছিলে সত্যি সত্যি কাঁদছি?'

ইলা কাতর গলায় বলল, 'তুই যে তোর দুলাভাইয়ের উপর রাগ করে কাঁদছিস তা জানি। শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে হবে না। বললাম না ওর মনটা ভালো নেই। শরীরও খারাপ। কাল রাতে ঘুমাতে পারে নি। আয়, ফ্যানের নিচে বসি। ইস্, গরমে ঘেমে কী হয়েছিস!'

'দুলাভাই চলে গেছেন?'

'হুঁ। জয়দেবপুর গেছে। ফিরতে ফিরতে রাত এগারটা হবে।

'জয়দেবপুরে কী?'

'জমি নাকি কিনেছে। আমাকে কিছু বলে না।'

'বলে না কেন?'

'সব মানুষ কি এক রকম হয়? একেক জন একেক রকম হয়। ওর স্বভাব হচ্ছে কাউকে কিছু না বলা।'

'তোমাকে বোধহয় বিশ্বাস করে না?'

'বিশ্বাস করবে না কেন? কী যে তোর পাগলের মতো কথা। আয় তোর চুল বেঁধে দেই। কাকের বাসা করে রেখেছিস।'

ইলা চিরুনি নিয়ে বসল। অন্তু মিয়া বারান্দায় চাদর গায়ে বসে আছে। তার চোখ লাল। মুখ ফোলা।

রুবা বলল, 'ওর ঠোঁটে কী হয়েছে আপা?'

'পড়ে গিয়েছিল। তোর আজ কলেজ নেই?'

'আছে।'

'কলেজ ফাঁকি দিয়ে এসেছিস?'

'হুঁ।'

ইলা খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বলল, 'তোর কি কোনো টাকা-পয়সার দরকার? দরকার থাকলে বল।'

রুবা আনন্দিত স্বরে বলল, 'দেড়শ টাকা দিতে পারবে?'

'খুব পারব। এরচে' বেশিও পারব। দাঁড়া চুলটা বেঁধে শেষ করি।'

ইলা একটা পাঁচশ টাকার নোট নিয়ে এল। সহজ গলায় বলল — 'সবটাই নিয়ে নে।'

'সে কী! সবটা নিয়ে নেব?'

'ফেরত দিতে হবে না। সবটাই তোর।'

'বল কী আপা! এত টাকা কোথায় পেয়েছ?'

'তোর দুলাভাইয়ের কাছ থেকে পেয়েছি। আর কে আমাকে টাকা দেবে? তুই বসে থাক। আমি রান্না চড়িয়ে আসি। আজ তুই যেতে পারবি না। সারাদিন থাকবি। সন্ধ্যার আগে আগে আমি তোকে যাত্রাবাড়ি রেখে আসব।'

রুবার এখন আর কলেজে যেতে ইচ্ছা করছে না। এখানে বসে থাকতেই ভালো লাগছে। কী হবে পিকনিকে গিয়ে! শুধু হৈচৈ। মেয়েগুলো অবশ্যি খুব মনখারাপ করবে। রুবাকে কলেজে গেলে চেপে ধরবে। কোনো অজুহাত কাজে খাটবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রুবা রান্নাঘরে ইলার পাশে এসে বসল। আপা বিয়ের আগে রান্নাবান্না কিছুই জানত না। এখন কী সুন্দর এটার সঙ্গে ওটা দিচ্ছে। নুন চাখছে। ইলা বলল — 'গরমের মধ্যে বসে আছিস কেন? যা ফ্যানের নিচে গিয়ে বস্। আমি লেবুর শরবত বানিয়ে দেই।'

'তোমার বাসায় এলেই শুধু লেবুর শরবত, লেবুর শরবত! তুমি বুঝি দুনিয়ার সব লেবু কিনে রেখে দিয়েছ? শরবত লাগবে না। তুমি কাজ কর, আমি দেখি।'

'যা এখান থেকে, যা। রান্নাঘরে বসে থাকবি না। রং নষ্ট হয়ে যাবে। বিয়ে আটকে যাবে।'

রুবা মনে মনে হাসল। আপা অবিকল মার কথাগুলো বলছে। মা তাদের দুবোনের কাউকেই রান্নাঘরে ঢুকতে দিত না। মার কী করে ধারণা হয়ে গিয়েছিল রান্নাঘরে ঢুকলেই মেয়েদের রং নষ্ট হয়ে যাবে। মা সেদিনও বলেছে, 'গরিবের ঘরে রংটাই হচ্ছে আসল। রঙের জন্যেই গরিবের ঘরের মেয়েদের ভালো ভালো বিয়ে হয়। দেখ না ইলার কেমন বিয়ে হয়ে গেল। একটা পয়সা খরচ হল না। সেটা কী জন্য হয়েছে? রঙের জন্য। মুখশ্রী–টুখশ্রী সব বাজে কথা। আসল হচ্ছে রং।'

রুবা হেসে বলেছে, 'আমার তাহলে কী গতি হবে মা? আপার রং আর আমার রং! আমার তো মনে হচ্ছে এনড্রিন–ফেনড্রিন খেতে হবে। এনড্রিন খেতে কেমন কে জানে। হি–হি–হি।'

মা বিরক্ত হয়ে বলেছেন — 'গরিবের মেয়ের মুখে এত হাসি ভালো না। কম হাসবি।'

মার মনের মধ্যে কীভাবে জানি 'গরিব' ব্যাপারটা গেঁথে গেছে। তিনটা বাক্য বললে এর মধ্যে একবার অন্তত 'গরিব' শব্দটা বলবেন। ভাইয়া সেদিন মাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেছে। ডাক্তার বললেন, 'প্রেসার খুব লো। ভালো খাওয়াদাওয়া করবেন। ডিম, দুধ এইসব।' মা ফট করে বলে বসলেন—'গরিব মানুষ ডাক্তার সাহেব। ডিম, দুধ এইসব পাব কোথায়?' কী দরকার ছিল এটা বলার? অথচ ডিম, দুধের ব্যবস্থা তো হয়েছে। ভাইয়ার যত অসুবিধাই হোক সে চালিয়ে যাচ্ছে।

'রুবা তুই রান্নাঘর থেকে যা তো। কথা শুনছিস না এখন কিন্তু আমার রাগ লাগছে।'

রুবা উঠে পড়ল। শোবার ঘরে গিয়ে খানিকক্ষণ বসল। ঘর খুব সুন্দর করে সাজানো। বিছানার চাদর নীল, তার মধ্যে সাদা ফুল। জানালার পর্দাও তাই। কেমন একটা বড়লোকি ভাব এসে গেছে। আপারা ভালোই বড়লোক।

দেয়ালে অচেনা সব মানুষদের বাঁধানো ছবি। দুলাভাইয়ের দিকের আত্মীয়স্বজন নিশ্চয়ই। মেয়েদের কী অদ্ভুত জীবন। একদল অচেনা মানুষকে নিয়ে মাঝখান থেকে জীবন শুরু করতে হয়।

'নে, শরবত নে।'

'শরবত আবার কে চাইল?'

'খা একটু। শরীর ঠাণ্ডা হবে।'

রুবা বোনের দিকে তাকিয়ে আছে। আগুনের আঁচে ইলার মুখ লালচে হয়ে আছে। মাথার চুল এলোমেলো।

'তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে আপা। পরীর মতো লাগছে। তোমার নামকরণ সার্থক হয়েছে। বাবা যে তোমাকে আদর করে পরী ডাকতেন তা দুলাভাইকে বলেছ?'

'না।'

'কী যে সুন্দর তোমাকে লাগছে আপা।'

'সত্যি বলছিস?'

'হুঁ সত্যি। তোমার পাশে আমাকে লাগছে ঠিক পেত্নীর মতো। দেখ না আয়নার দিকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাকিয়ে। ছিঃ, কী বাজে! ওমা আমার নাকটা কেমন মোটা দেখলে? তোমার আয়না নষ্ট না তো?'

দুবোন বেশ কিছুক্ষণ আয়নার দিকে তাকিয়ে রইল। রুবা ছোট্ট একটা নিশ্বাস ফেলল। আয়নায় তাকে সত্যি সত্যি কেমন জানি বাজে দেখাচ্ছে। যদিও সে দেখতে এত বাজে না। আয়নাটা বোধহয় আসলেই খারাপ।

'আপা।'

'কি?'

'আমার সঙ্গে একটু নিউ মার্কেটে চল না। এক জোড়া স্যান্ডেল কিনব — টাকা যখন পাওয়া গেল। দুলাভাই নিশ্চয়ই দুপুরে খেতে আসবে না। যাবে? তোমার বিয়ের আগে, মনে নেই, আমরা শুধু দোকানে ঘুরতাম?'

'মনে আছে। তোর জন্যেই ঘুরতাম।'

'বায়তুল মোকাব্‌রমে একবার রিকশাওয়ালার সঙ্গে কী কাণ্ড হল তোমার মনে আছে আপা? আমি কেঁদে-টেদে ... মনে আছে?'

'মনে থাকবে না কেন?'

'ঐ লোকটাকে পরে আর টাকাগুলো দেয়া হয় নি। কী লজ্জার ব্যাপার! টাকাগুলো দেয়া উচিত ছিল। ভদ্রলোক আমাদের সম্পর্কে নিশ্চয়ই খারাপ কিছু ভাবছেন। মাঝে মাঝে ঐ ভদ্রলোকের কথা আমার মনে হয়। তোমার হয় না?'

'হয়।'

'উনার ঠিকানাটা তোমার মনে আছে? থাকলে একদিন চল যাই উনাকে টাকাটা দিয়ে আসি। ভদ্রলোক নিশ্চয়ই খুব অবাক হয়ে যাবেন। এত দিন পর হঠাৎ।'

ইলা শান্ত গলায় বলল, 'টাকা আমি উনাকে দিয়ে এসেছি।'

রুবা বিস্মিত হয়ে বলল, 'কবে দিলে?'

'দিন-তারিখ মনে করে রেখেছি না-কি? দেয়ার কথা — দিয়েছি।'

'আমাকে বল নি কেন?'

'এটা এমন কি ঘটনা যে তোকে বলতে হবে?'

রুবা অবাক হয়ে বলল — 'তুমি এমন রেগে যাচ্ছ কেন আপা?'

'কী আশ্চর্য, রাগলাম কোথায়?'

'আমি জানি তুমি রেগে গেছ। রাগলে তোমার কান লাল হয়ে যায়, নাক ঘামে। ব্যাপারটা কী আপা?'

'ব্যাপার কিছু না।'

ইলা উঠে রান্নাঘরে চলে গেল। ভাত ফুটছিল, হাঁড়ি নামিয়ে মাড় গালল। বাথরুমে ঢুকে হাত-মুখ ধুয়ে সহজ স্বাভাবিক গলায় বলল, 'আমার চুলটা বেঁধে দে। এক বেণি করবি।'

রুবা চিরুনি নিয়ে বসল। ইলা বলল, 'ভাত খেয়ে তারপর চল নিউ মার্কেটে। বিকেল পর্যন্ত ঘুরব, তারপর তোকে রেখে আসব। রাতে তোদের সঙ্গে খাব। তারপর ভাইয়াকে বলব পৌঁছে দিতে। ভাইয়া কেমন আছে রে?'

'প্রথমেই তো একবার বললাম, ভালো।'

'ভাইয়ার বিয়ে দেবার কথা কেউ ভাবছে না, তাই না?'

'না। মাকে একদিন বললাম। মা মুখ শুকনো করে বলল, ও বউকে খাওয়াবে কী? তাছাড়া কোনো ভদ্রলোক এই গরিবের ফ্যামিলিতে মেয়ে দেবে কেন? তাদের কী গরজ?'

'এ আবার কেমন কথা?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমিও মাকে তাই বললাম। আমি বললাম, আমাদের মতো গরিব ফ্যামিলির একটা মেয়েকেই না-হয় আন। মা রেগে অস্থির।'

'এর মধ্যে রাগের কী আছে?'

'রেগেমেগে বলেছে, তোর বাবার সম্মানটা দেখবি না তোরা? কত বড় মানুষ ছিলেন। মার মাথার মধ্যে একটা পোকা ঢুকে গেছে।'

দুটার দিকে দুজনে খেতে বসল। খেতে বসে রুবা আবার পুরানো প্রসঙ্গ তুলল — নিচু গলায় বলল, 'ঐ ভদ্রলোকের কথা ওঠায় তুমি রেগে গিয়েছিলে কেন আপা?'

'রাগব কেন? রাগি নি। উনি আমার সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার করেছিলেন, তাতে আমার খুব মনখারাপ হয়েছিল। ব্যস।'

'তুমি মিথ্যা কথা বলছ আপা। অন্য কোনো ব্যাপার। উনি শুধু শুধু তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবেন কেন?'

ইলা জবাব দিচ্ছে না। নিঃশব্দে ভাত খাচ্ছে। রুবা বলল, 'তুমি একা একাই গেলে উনার কাছে?'

'হুঁ।'

'তোমাকে চিনতে পারলেন?'

'না। পরে চিনেছেন।'

'উনি কি ম্যারেড, আপা?'

'কী মুশকিল, আমি এতসব জানব কেন? গিয়েছি, টাকা দিয়ে চলে এসেছি।'

'তুমি কি একবারই গিয়েছ, না আরো গেছ?'

'তুই কী শুরু করলি বল্ তো রুবা। জেরা করছিস কেন?'

'জেরা করছি না। জানতে চাচ্ছি।'

'ভাত খেতে বসেছিস্, ভাত খা।'

রুবা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বোনের দিকে তাকিয়ে রইল।

ইলা খাওয়া শেষ না করেই উঠে পড়ল। রুবা আপার দিকে তাকিয়ে আছে। তার এই আপাটা খুব অদ্ভুত। অনেক রহস্য সে নিজের মধ্যে লুকিয়ে রাখে। রুবার ধারণা, আপা একবার না, কয়েকবারই গিয়েছে ঐ মানুষটার কাছে। রুবা চেঁচিয়ে বলল, 'আপা তুমি নাসিম ভাইয়ের কথা জিজ্ঞেস করেছিলে। উনি কি কখনো এসেছিলেন তোমার এই ফ্ল্যাটে?'

ইলা কঠিন গলায় বলল, 'উল্টাপাল্টা কথা কেন বলছিস? নাসিম ভাই এখানে কেন আসবেন?'

'আসলে অসুবিধা কী? উনি কি আসতে পারেন না?'

ইলা জবাব দিল না। বাথরুমে ঢুকে গেল। রুবা বাথরুমের দরজার কাছে এসে বলল, 'বিয়ের পর তোমার মেজাজ অন্য রকম হয়ে গেছে আপা, মা বলছিল, তুমি না-কি ঐদিন বাসায় গিয়ে মার সঙ্গে অকারণে ঝগড়া করেছ।'

'অকারণে ঝগড়া করি নি।'

'তুমি তো কখনো এ রকম কর না। হঠাৎ কে তোমাকে বদলে দিল?'

'চুপ কর রুবা। মানুষ এক রকম থাকে না। কিছুদিন পরপর বদলায়।'

ইলা বাথরুম থেকে হাসিমুখে বের হয়ে এল। তার মুখ ভেজা। রুবা মুগ্ধ গলায় বলল, 'তোমাকে কী যে সুন্দর লাগছে আপা!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪

বন এন্টারপ্রাইজেসের অফিস ঘরে বাবু এবং নাসিমকে বসে থাকতে দেখা যাচ্ছে। কারো মুখে কোনো কথা নেই। মাথার উপর ফ্যান ঘুরছে। সেখানে ঘটাং ঘটাং শব্দ হচ্ছে। সিগারেটের ধোঁয়ায় ঘর অন্ধকার। নাসিম একটার পর একটা সিগারেট ধরাচ্ছে। সস্তা সিগারেট। উৎকট গন্ধ। দুজনকেই খুব চিন্তিত দেখাচ্ছে। চিন্তাগ্রস্ত হবার সংগত কারণ আছে। তারা একটা ভালো সাপ্লাইয়ের কাজ পেয়েছিল। মতিঝিলের এক বড় অফিসে কাগজ, পেন্সিল, ফাইল, আইকা গাম সাপ্লাই। অফিসের একশ দশ জন কর্মচারীর জন্যে সাবান, গামছা, গ্লাস, কুড়িটা সেক্রেটারিয়েট টেবিল, চল্লিশটা বেতের চেয়ার। তিনটা দশ ফুট বাই বার ফুট কামরার জন্যে জুট কার্পেট। সবই দেয়া হয়েছে। বিল পাস হচ্ছে না। আজ হবে, কাল হবে বলে তারা এক মাস পার করেছে। শেষবার বলে দিয়েছিল, বুধবার সকাল এগারটায় আসতে। আজ বুধবার। তারা দুজনই গিয়েছিল। বিল যার পাস করবার কথা — রহমান সাহেব, তাদের দুঘণ্টা বসিয়ে রাখলেন। একটার সময় ডেকে পাঠালেন। শীতল গলায় বললেন — 'এখন লাঞ্চ টাইম। বেশি কথা বলতে পারব না। বিল তো আপনারা পাবেন না।'

নাসিম হতভম্ব হয়ে বলল, 'কেন?'

'জিনিস ঠিকমতো দেন নি। লো কোয়ালিটি জিনিস দিয়েছেন।'

'সব জিনিস তো স্যার আপনাদের দেখিয়ে — আপনাদের এপ্রোভেল নিয়ে তারপর ডেলিভারি দিয়েছি।'

'তা দিয়েছেন, তবে যে জিনিস দেখিয়েছেন সেই জিনিস দেন নি। দিয়েছেন রদ্দি মাল।'

বাবু বলল, 'স্যার, আপনার কথা ঠিক না। যা দেখিয়েছি তাই দিয়েছি। বিশ্বাস করুন, কোনো উনিশ-বিশ হয় নি।'

'আপনি বললে তো হবে না — মিষ্টির ব্যাপারে ময়রার কথা গ্রাহ্য না। আমাদের নিজস্ব টিম ইনকোয়ারি করেছে। তারা বলেছে — লো কোয়ালিটি।'

'তার মানে কি এই যে আমরা বিল পাব না?'

'না। সেক্রেটারিয়েট টেবিল আর চেয়ার রিজেক্টেড হয়েছে। যেগুলো দিয়েছেন ফেরত নেবেন, নতুন করে দেবেন। তারপর দেখা যাবে।'

বাবু বলল, 'আমাদের এটা তো স্যার খুব ছোট ফার্ম। আমাদের অর্থবল নেই বললেই হয়....'

'আমাকে এসব বলে লাভ নেই। আমি আমার ডিসিশান জানিয়ে দিলাম। কাল ট্রাক নিয়ে এসে ফার্নিচার তুলে নিয়ে যাবেন। আমি আলসারের রোগী। আমাকে টাইমলি খেতে হয়। আপনারা এখন দয়া করে যান, আমি খেতে বসব।'

'আমরা স্যার বাইরে অপেক্ষা করি।'

'অপেক্ষা করে লাভ কিছু নেই। যা বলার বলে দিয়েছি।'

'আমাদের কিছু বলার ছিল স্যার।'

'আমার মনে হয় না আপনাদের কিছু বলার আছে। তারপরেও যদি কিছু বলার থাকে, আমার পি. এ.কে বলুন।'

বাবু এবং নাসিম মুখ শুকনো করে বের হয়ে এল। এই কাজটা এরা খুব আশা নিয়ে করেছিল। তারা যা চেয়েছে তাই দিয়েছে। বড় কাজ, ঠিকমতো করলে আরো কাজ পাওয়া যাবে। দুজনই পরিশ্রমের চূড়ান্ত করেছে। এখন দেখা যাচ্ছে সবই জলে গেছে। সমস্যাটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কী বোঝা যাচ্ছে না। ভদ্রলোক কি তাদের কাছ থেকে ঘুষ চাচ্ছেন? তাও তো মনে হচ্ছে না। কাজ দেবার সময় তিনি হাসিমুখে বলেছেন — 'আপনারা দুই ইয়াংম্যান ইউনিভার্সিটি থেকে পাস করে ব্যবসায় নেমেছেন দেখে ভালো লাগছে। আপনারা লোয়েস্ট টেন্ডার দিয়েছেন। লোয়েস্ট টেন্ডারে কাজ দিতে হবে এমন কোনো কথা নেই। তবু আপনাদের দিচ্ছি। আমি চাই শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা বিজনেসে আসুক। আপনারা সৎভাবে কাজ করবেন, আমি আপনাদের ব্যাক করব। কেউ যদি টাকা-পয়সা চায় — চট করে দেবেন না। আমাকে প্রথমে জানাবেন।'

নাসিম হাত কচলাতে কচলাতে বলেছে, 'আপনার কথা শুনে বড় ভালো লাগছে স্যার। চোখে পানি এসে যাচ্ছে। ইউনিভার্সিটি থেকে পাস করার কথা যা বললেন — সেটা অর্ধেক সত্যি। বাবু এম. এ. পাস করেছে। আমার বিদ্যা স্যার আই. এ. পর্যন্ত। থার্ড ডিভিশন পেয়েছিলাম — ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হতে পারি নি। আপনি স্যার আমাদের উপর একটু দোয়া রাখবেন।'

নাসিম এগিয়ে এসে পা ছুঁয়ে সালাম করে ফেলেছে এবং গদগদ গলায় বলেছে — 'আপনি স্যার বলতে গেলে আমাদের ফাদারের মতো। আমাদের দুজনেরই ফাদার নেই।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। তোমরা অনেস্টলি কাজ কর, আমি দেখব।'

সেই একই ভদ্রলোক আজ উল্টো কথা কেন বলছেন বাবু বা নাসিম দুজনের কারো মাথাতেই তা আসছে না। এতদিন তুমি তুমি করে বলেছেন, আজ বলছেন আপনি করে। মানেটা কী?

সূর্যের চেয়ে বালি সব সময়ই বেশি গরম হয়। অফিসারের চেয়ে পি.এ.র দাপট থাকে বেশি। রহমান সাহেবের পি.এ.র বেলায় এই থিওরি খাটল না। ভদ্রলোক হাসিখুশি। নিজেই এদের দুজনকে ক্যান্টিনে নিয়ে গিয়ে চা খাওয়ালেন।

নাসিম বলল, 'ব্যাপারটা কী ভাই সাহেব বলুন তো। আমরা কি ভুল করেছি?'

'ভুল কিছু করেন নি।'

'তাহলে? বিল না পেলে বিশ্বাস করুন ভাই, আমার অফিসে যে সিলিং ফ্যান আছে ঐটাতে ঝুলতে হবে। বোনের গয়না বন্ধক রেখে টাকা জোগাড় করেছি। সে দিতে চায় নি। বলতে গেলে জোর করে নিয়েছি। দুলাভাই কিছু জানে না। জানতে পারলে বোনকে সেফটিপিন দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারবে। সমস্যাটা কোথায় আপনি আমাকে বলুন তো।'

'হাজার পঞ্চাশেক টাকা জোগাড় করতে পারবেন?'

'হাজার পঞ্চাশেক টাকা তো আমাদের লাভ হবে না। সব খরচ-টরচ বাদ দিয়ে তেতাল্লিশ হাজার টাকা লাভ হবে। এর মধ্যে সুদের টাকা দিতে হবে আঠাশ হাজার।'

'এইসব আমাকে শুনায়ে কোনো লাভ নেই রে ভাই। পঞ্চাশ হাজার টাকা জোগাড় করুন। ব্যবস্থা হবে।'

বাবু হতভম্ব গলায় বলল, 'কে নেবে এই টাকা?'

'আপনার তো সেটা দিয়ে দরকার নাই।'

'আমাদের রক্ত পানি করা টাকা কে নেবে এটা জানার আমাদের দরকার নেই? কী বলছেন আপনি?'

'আপনারা এই লাইনে খুবই নতুন। টাকাটা কে নেবে বুঝতে পারছেন না কেন? আপনাদের সঙ্গে কে কথা বলছে — আমি। আমি কার লোক? রহমান সাহেবের লোক। কে আপনাদের আমার সঙ্গে কথা বলতে বলল? রহমান সাহেব বললেন। এখন কিছু বুঝতে পারছেন?'

'না, এখনো বুঝতে পারছি না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কেউ এখানে টেন্ডার দেয় না। কেন দেয় না বুঝতে পারছেন না। এখানে টেন্ডার দিয়ে কেউ লাভ করতে পারে না। সব ঠিকঠাক মতো চলে — শেষটায় ধরা খায়। হা-হা-হা।'

'আপনি হাসছেন? হাসি আসছে আপনার?'

'আপনাদের দুজনের বেকুবি দেখে হাসছি।'

নাসিম সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, 'টাকাটা দিতে হবে — সিস্টেমটা কী?'

'সিস্টেম খুব সোজা। একটা ঠিকানা দেব — ঐ ঠিকানায় একটা রঙিন টিভি চব্বিশ ইঞ্চি সনি, আর একটা ন্যাশনাল কোম্পানির G-10 ভিসিআর দিয়ে আসবেন। স্যারের মেজো মেয়ের বাসা। যেদিন দিবেন তার পরের দিন বিলে সই হবে। দেব ঠিকানা?'

'দিন।'

ঠিকানা ভদ্রলোকের পকেটে লেখাই ছিল। তিনি ঠিকানা বের করে দিতে দিতে বললেন — 'এর পরেও আপনাদের হাজার পঁচিশেক টাকা লাভ থাকবে। কথা ছিল সেগুন কাঠ দিয়ে সেক্রেটারিয়েট টেবিল বানাবেন। বানিয়েছেন কড়ই কাঠে। কড়ই কাঠের সিএফটি হল তিনশ দশ। আর সেগুন এগার শ।

বাবু বলল, 'কড়ই কাঠের টেবিল বানানো হয় নি। সেগুন কাঠ দেয়া হয়েছে। আমি নিজে কাঠ কিনে মিস্ত্রিকে দিয়েছি।'

'বিশ্বাস করলাম। কাঠ আপনি সেগুন ঠিকই কিনেছেন। মিস্ত্রি দিয়েছে কড়ই, রঙ করে দিয়েছে। আপনাদের একটা উপদেশ দেই। শুনে রাখেন — এই লাইনে আপনাদের কিছু হবে না। অন্য কিছু করুন।'

'অন্য কিছু কী করব?'

'আপনারাই চিন্তাভাবনা করে বের করুন। আপনাদের বয়স কম, চিন্তাশক্তি বেশি। চা খাবেন আরেক কাপ? খান। গরম গরম সিঙাড়া ভাজা হয়েছে। সিঙাড়া খেতে পারেন। বলব সিঙাড়ার কথা?'

'না থাক। অনেক মেহেরবানি করেছেন। আর না। আমরা এখন উঠব।'

তারা ফিরে এসেছে অফিসে। দুজন চুপচাপ বসে আছে। অসহ্য গরম। মাথার উপর ফ্যান আছে। ফ্যান ছাড়ার কথা কারোরই মনে আসে নি। বাবু বলল, 'কী করবি নাসিম?'

'জানি না। বিষ-টিষ খাওয়া যায়। ঐ লাইনেই চিন্তা করছি।'

'রহমান সাহেবের মেয়েটার সঙ্গে দেখা করলে কেমন হয়?'

'খালি হাতে দেখা করবি?'

'হুঁ। এছাড়া উপায় কী? দেখা করে আমাদের অবস্থাটা বুঝিয়ে বলব।'

'এটা মন্দ না। প্রয়োজন দেখলে আমি পা জড়িয়ে ধরব। বিষ খাওয়ার চেয়ে পায়ে ধরা সহজ। বড়লোকের মেয়ে। পা মাখনের মতো নরম হবার কথা। ধরলে আরাম লাগবে।'

নাসিম নড়েচড়ে বসল। বাবু বলল, 'সত্যি যাওয়ার কথা ভাবছিস?'

'হুঁ। তবে একেবারে খালি হাতে যাব না। বিশাল এক কাতলা মাছ কিনব। বাজারের সবচে' বড় মাছটা। প্রথমে মাছটা দেব। মেয়েরা কেন জানি বড় মাছ দেখলে খুশি হয়। মাছটা দেখে খুশি হবে। খুশি খুশি অবস্থায় আসল ঘটনা বলে পায়ে পড়ে যাওয়া। চল যাই।'

'এখন?'

'হ্যাঁ এখন। মাছ কিনব। ঐ বাসায় তোর যাবার দরকার নেই। আমি একাই যাব। পায়ে ধরা তোকে দিয়ে হবে না। ঐটা হচ্ছে আমার লাইন। তুই থাকলে আমার জন্যেও সমস্যা। ঠিকমতো পায়ে ধরতে পারব না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'মাছ কিনবি যে ; টাকা আছে?'

'না, জোগাড় করব।'

'মাছ নিয়ে যাবি কখন?'

'সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় যাব। সন্ধ্যাবেলা মেয়েদের মন একটু দুর্বল থাকে।'

'মেয়েদের মনের এতসব খবর তুই জানলি কীভাবে?'

নাসিম হো-হো করে অনেকক্ষণ ধরে হাসল। বাবু তাকিয়ে আছে নাসিমের দিকে। নাসিমের জন্যেই তার খারাপ লাগছে। ছোটখাটো মানুষ। খুব ঘামছে। শব্দ করে হাসছে ঠিকই কিন্তু হাসিতে কোনো প্রাণ নেই। নাসিম বলল, 'তুই বাসায় থাকিস। কী অবস্থা রাতে গিয়ে রিপোর্ট করব।'

রাত আটটার দিকে প্রায় একমন ওজনের এক কাতলা মাছ নিয়ে নাসিম বাবুদের বাসায় উপস্থিত হল। রুবা চোখ কপালে তুলে বলল, এটা কী?'

নাসিম কড়া গলায় বলল, 'ফাজলামি করিস না তো রুবা। ফাজলামি করলে চড় খাবি। এটা কী বললি কোন্ আন্দাজে? তুই মাছ চিনিস না?'

'চিনি। ছোট সাইজের মাছগুলো চিনি — এত বড় মাছ চিনি না। নাসিম ভাই এটা কি তিমি মাছের বাচ্চা? এত বড় মাছ কী জন্যে নাসিম ভাই?'

'খাবার জন্যে। বঁটি আন, মাছ কাটব। শুধু বঁটিতে হবে না — কুড়াল লাগবে। কুড়াল আছে?'

'কুড়াল থাকবে কেন? আমরা কি কাঠুরে?'

কথাবার্তা শুনে সুরমা বের হয়ে এলেন। তিনি স্তম্ভিত হয়ে বললেন, 'এত বড় মাছ কী জন্যে?'

নাসিম হাসিমুখে বলল, 'খাবার জন্যে। অনেকদিন বড় মাছ খাই না। ভাবলাম যা থাকে কপালে ; আজ একটা বড় মাছ খাব।'

'তোমার পাগলামি কবে কমবে বল তো? তোমার কি বড় মাছ খাবার অবস্থা? নুন আনতে পান্তা ফুরায়...'

নাসিম হাসতে হাসতে বলল, 'আমার অবস্থা তার চেয়েও খারাপ। আমার নুনও নাই, পান্তাও নাই... তাই বলে এক-আধদিন একটা বড় মাছ খেতে পারব না? বাবু কোথায়?'

'টিউশ্যানিতে গেছে।'

'ফিরবে কখন?'

রুবা বলল, 'দশটার আগে কোনোদিন ফেরে না। আজ সকাল সকাল ফিরবে। শরীর খারাপ।'

'ওর জন্যে অপেক্ষা করলে রান্নার দেরি হয়ে যাবে। কাটা শুরু করে দি। রুবা যা তো, ছাই নিয়ে আয়। খালা, আপনি আপনার রান্নার সমস্ত প্রতিভা ব্যয় করে মাছটা রান্না করুন তো দেখি।'

সুরমা কঠিন গলায় বললেন — 'আমার শরীরের অবস্থা তো জান। এই অবস্থায় আমি রাতদুপুরে মাছ রাঁধতে বসতে পারব না।'

'আপনাকে কিছু করতে হবে না খালা। আপনি শুয়ে পড়ুন। রান্নাবান্না যা করার আমি আর রুবা মিলে করব। আমি একজন প্রথম শ্রেণীর বাবুর্চি। রুবা হাত লাগা — মাছের ল্যাজটা চেপে ধর।'

'মরে গেলেও আমি মাছের ল্যাজ চেপে ধরব না। হাত গন্ধ হয়ে যাবে। কাল আমার পিকনিক। গন্ধ হাত নিয়ে আমি পিকনিকে যাব?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তাহলে যা, চা বানিয়ে আন। খুব কড়া করে বানাবি।'

'নাসিম ভাই, তোমাকে এত খুশি খুশি লাগছে কেন? কারণটা কী?'

'দারুণ একটা ব্যাপার ঘটেছে। তুই বুঝবি না। চা বানাতে বললাম — বানিয়ে আন। চা খেয়ে অ্যাকশানে নেমে যাব। এই মাছ কাটতে মিনিমাম এক ঘণ্টা লাগবে।'

সুরমা বিছানায় শুয়ে আছেন। এমনিতেই তাঁর শরীর ভালো না। তার চেয়েও বড় কথা, নাসিমকে তিনি সহ্য করতে পারেন না। তাঁর ধারণা, নাসিমের পাল্লায় পড়ে বাবুর আজ এই অবস্থা। শিক্ষিত এম. এ. পাস ছেলে হকারদের মতো এই অফিসে ঐ অফিসে ঘুরে বেড়াচ্ছে — কোনো মানে হয়? শিক্ষিত ছেলে চাকরি করবে — দশটা-পাঁচটা অফিস করবে। তার জীবন থাকবে রুটিন-বাঁধা। এইসব কী? ছন্নছাড়া জীবন। যত বদ বুদ্ধি দিচ্ছে নাসিম ছোঁড়া। মাছ নিয়ে ঢং দেখাচ্ছে। মাছ রান্না করবে, খাবে, তারপর বসার ঘরে লম্বা হয়ে ঘুমিয়ে থাকবে। যে ছেলে পরের বাড়িতে এমন নির্বিকারভাবে ঘুমায় তাকে বিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই।

নাসিম মাছ কাটছে। নাসিমের সামনে চায়ের কাপ হাতে রুবা বসে আছে। সে কৌতূহলী চোখে মাছ কাটা দেখছে। নাসিমের মুখ হাসি হাসি। রুবা অনেকদিন নাসিমকে এত আনন্দিত অবস্থায় দেখে নি।

নাসিমের আনন্দের কারণ আছে। তার কাজ হয়েছে। রহমান সাহেবের মেয়ে সব ঘটনা চুপ করে শুনেছে এবং নাসিমকে অবাক করে রাগে-দুঃখে কেঁদে ফেলেছে। নাসিম ভাবেও নি এই ব্যাপার হবে। মেয়েটি বলেছে — 'আপনি যদি মাছ এখানে রেখে যান, মাছ আমি খাব না। রাস্তায় ফেলে দেব। বাবাকেও আপনাদের বিল প্রসঙ্গে কিছু বলব না। মাছ আপনি দয়া করে নিয়ে যান। আজ রাতেই আমি বাবাকে যা বলার বলব। বাবার যে এই অভ্যাস আছে আমি সন্দেহ করেছিলাম। কখনো বিশ্বাস করি নি।'

নাসিম রুবার দিকে তাকিয়ে বলল, 'রুবা!'

'উঁ।'

'এই মাছটা পুকুরের, না নদীর বল তো দেখি।'

'কী করে বলব? মাছের গায়ে তো লেখা নেই 'made in river' কিংবা 'made in pond'.

'অবশ্যই লেখা আছে। সেই লেখা পড়ার চোখ থাকতে হয়। নদীর রুই মাছ হয় লম্বা। এদের স্রোতের বিরুদ্ধে চলতে হয়। লম্বা না হলে এদের চলাফেরা সমস্যা। পুকুরের মাছগুলো হয় মোটা, গোলগাল। তোকে ভালো জিনিস শিখিয়ে দিলাম।'

'থ্যাংকস। আরো কিছু শেখাও।'

'বল দেখি — এই মাছটা টাটকা, না বাসি?'

'বিশ্রী গন্ধ আসছে। মনে হচ্ছে বাসি।'

'হল না। মাছের তেলটার দিকে তাকিয়ে দেখ। ধবধবে সাদা। এর মানে টাটকা মাছ। এক টুকরা মুখে দিবি, অমৃতের মতো লাগবে।'

'নাসিম ভাই, কেন তুমি আজ এত খুশি?'

'খুশি হবার মতো কারণ ঘটেছে। অসাধারণ একটা মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হল। আমি আমার এই জীবনে এমন অসাধারণ মেয়ে দেখি নি।'

রুবার মুখ কালো হয়ে গেল। সে নিজের অজান্তেই বড় ধরনের একটা ধাক্কা খেল। তার এই পরিবর্তন নাসিম ধরতে পারল না। ধরতে পারলে সেও চমকে উঠত।

'বুঝলি রুবা, মেয়েটার বাপটাকে চিনি। হারামজাদা নাম্বার থ্রি। মানুষ-সমাজের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কলংক। কিন্তু মেয়েটা এত ভালো যে বাপের অপরাধও মেয়ের দিকে তাকিয়ে ক্ষমা করা যায়।'

'নাম কী মেয়েটার?'

'ভালো নাম মেহেরুন্নিসা। ডাকনাম বোধহয় তুহিন। তুহিন করে ঐ বাড়ির সবাই ডাকছিল।'

'আজই পরিচয় হল?'

'হুঁ।'

'অনেকক্ষণ গল্প করলে?'

'হুঁ। ভেবেছিলাম মিনিট পাঁচেক গল্প করব। অবস্থা এমন দাঁড়াল যে প্রায় ঘণ্টাখানেক থাকলাম। চা খেলাম। কেক খেলাম। কেকটা অমৃতের মতো। কিছু কিছু মানুষ আছে না, প্রথম দেখাতেই মনে হয় — আরে, এই মানুষটাকে তো অনেকদিন ধরেই চিনি এই মেয়েটাও সে রকম।'

'আমার চেয়েও ভালো?'

নাসিম হো-হো করে হেসে ফেলল। হাসতে হাসতে বলল, 'তোর ধারণা তুই একটা দারুণ মেয়ে?'

'হ্যাঁ আমার তাই ধারণা।'

'মুখ এমন কালো করে ফেলেছিস কেন? ব্যাপার কী?'

'তোমার অসাধারণ একটি মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। মুখ আলো হয়ে আছে। আমার তো আর কোনো অসাধারণ পুরুষের সঙ্গে পরিচয় হয় নি ; আমার পরিচয় তোমার মতো একজনের সঙ্গে যাকে সবাই ডাকে — গিট্টু। কাজেই আমার মুখ অন্ধকার।'

'ঘরে মসলাপাতি কী আছে দেখ। কী ফটফটি হয়েছিস। ফটফট করে কথা। সেই দিন এতটুকু প্যান্ট পরে খালি গায়ে ঘুরঘুর করতে দেখলাম।'

রুবা কঠিন গলায় বলল — 'নাসিম ভাই, তুমি আমাকে কখনো খালি গায়ে ঘুরঘুর করতে দেখ নি।'

'আচ্ছা যা, দেখি নি। তুই এত রাগছিস কেন?'

'তুমি আজেবাজে কথা বলবে, আমি রাগব না?'

রুবা উঠে দাঁড়াল। নাসিম বলল, 'যাচ্ছিস কোথায়?'

'মসলা আছে কিনা দেখতে যাচ্ছি।'

রুবা রান্নাঘরে গেল না। নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। সে কাঁদছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। কেন তার এত কান্না পাচ্ছে তা সে নিজেও বুঝতে পারছে না। নাসিম ভাই বলেছে তাঁর একটা অসাধারণ মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, তাতে তার নিজের এত খারাপ লাগছে কেন? ভাগ্যিস তার এই খারাপ লাগাটা অন্য কেউ দেখতে পাচ্ছে না। দেখতে পেলে কী ভয়ংকর ব্যাপার হত!

রুবা কিছুক্ষণের মধ্যেই নিজেকে সামলাল। চোখে-মুখে পানি দিয়ে এসে দেখে, নাসিম বঁটি দিয়ে হাত কেটে ফেলেছে। রক্ত বের হচ্ছে গলগল করে। নাসিম বলল, 'তোর "আরোগ্য নিকেতন" চট করে নিয়ে এসে হাতটা বেঁধে দে।'

'তুমি তো হাত একেবারে দুটুকরা করে ফেলেছ!'

'দু টুকরা করলেও কেন জানি ব্যথা পাচ্ছি না। একটা মজার জিনিস লক্ষ করেছিস রুবা, মাছের রক্ত আর মানুষের রক্ত এক রকম। এইখানে দেখ পাশাপাশি মাছের রক্ত আর মানুষের রক্ত। কোন্‌টা কার বল তো?'

রুবা কিছু বলল না। তার ওষুধের বাক্স আনতে গেল। নাসিম কৌতূহলী চোখে মাছের এবং মানুষের রক্ত দেখছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫

জামানের ফিরতে আজো দেরি হবে। গেট খোলা রাখতে হবে বলে গেছে। কী করছে সে জয়দেবপুরে? বাড়ি বানানো কি শুরু করে দিয়েছে? কোথেকে পাচ্ছে এত টাকা? হারানো মানিব্যাগের কথা এর মধ্যে একবারও তোলে নি। সে হয়তো ভুলেই গেছে। ইলা ভুলতে পারে নি। ভুলবে কীভাবে? মানিব্যাগটা তো তার কাছেই। সে লুকিয়ে রেখেছে তার সুটকেসে। যদি জামান কোনো কারণে তার সুটকেস খোলে ; তখন কী হবে? ভয়ংকর কোনো কাণ্ড যে হবে তা সে জানে। সেই ভয়ংকর মানে কী রকম ভয়ংকর? মাঝে মাঝে ইলার ইচ্ছা করে ভয়ংকর কাণ্ডটা ঘটে যাক। দেখা যাক সে কী করে।

জামানের রাগ ভয়ংকর। রাগের সময় সে এমনভাবে তাকায়, এমন ভঙ্গি করে যে ইলাকে হতভম্ব হয়ে দেখতে হয়। ইলা রাগ করে না, দুঃখিত হয় না, সে শুধু অবাক হয়ে দেখে। বিস্ময়বোধটাই তার প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। একদিন জামান রেগে গিয়ে এমন ভঙ্গি করল যে ইলার মনে হল সে তাকে চড় মারতে আসছে। যদি সত্যি সত্যি চড় মেরে বসত তাহলে কী বিশ্রী ব্যাপার হত! অথচ ঘটনা কিছুই না। জামান বাথরুমে ঢুকে দেখে বেসিনের উপর একটা আঙটি। ইলার আঙটি। সে আঙটি খুলে হাত ধুয়েছিল। তারপর আর পরতে মনে নেই। এটা কোনো ভয়ংকর ঘটনা না। কিন্তু জামান কী বিশ্রী কাণ্ড করল! হাত উঁচিয়ে ছুটে এল — 'কাণ্ডজ্ঞান নেই? তোমার কাণ্ডজ্ঞান নেই?' ইলার বয়স চব্বিশ। এই চব্বিশ বছরের জীবনে সে প্রথম একজনকে দেখল যে হাত উঁচিয়ে তাকে মারতে আসছে।

আঙটি ফেলে আসায় যে মানুষ এমন করেছে সে যদি শোনে ইলার সুটকেসে তার মানিব্যাগ, মাঝে মাঝে সেখান থেকে টাকা বের করে সে খরচ করে, তাহলে কী করবে? তার চেয়েও ভয়ংকর কিছু ইলা শুনতে পারে। এমন ভয়ংকর কিছু শোনার পর ঐ মানুষটা হাত উঁচিয়ে তাকে মারতে আসবে না, কারণ তার সেই ক্ষমতা থাকবে না। সে অবাক বিস্ময়ে চোখ বড় বড় করে ইলাকে দেখবে। কিংবা মাথা ঘুরে নিচে পড়ে যাবে। মুখ দিয়ে ফেনা বের হবে।

টিভিতে ম্যাকগাইভার শুরু হবার পর ইলা নিচে নামল। ম্যাকগাইভারের কাণ্ডকারখানা দেখবে না। ভয়ে বুক ধড়ফড় করাটা তাহলে আবার শুরু হতে পারে। গেট খোলা রাখার কথা হাসানকে বলে আসতে হবে। পেছনের বাড়ির ঐ ঘটনার পর দশটা বাজার আগেই গেট বন্ধ করে দিচ্ছে।

হাসানকে পাওয়া গেল না। সে বেশির ভাগ সময়ই বারান্দায় ক্যাম্পখাট পেতে ঘুমায়। ঝড়বৃষ্টির সময়ও একই জায়গা। তখন পর্দার মতো কী যেন দেয়। এই ছেলেটির জন্যে বাড়ির ভেতরে কোনো জায়গা হয় নি।

আজ ঝড় না হোক, বৃষ্টি হবে। অসহ্য গরম পড়েছে। আকাশ মেঘলা। ঘনঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। ইলা বাড়িওয়ালার স্ত্রীকে বলে আসতে গেল। বৃষ্টির মধ্যে জামান এসে যদি দাঁড়িয়ে থাকে, আর যদি গেট খোলা না হয় তার পরবর্তী অবস্থা কী হবে চিন্তা করা যায় না।

বাড়িওয়ালার স্ত্রী সুলতানা খেতে বসেছেন। আজ তাঁকে অন্যদিনের চেয়েও মোটা লাগছে। গলার চামড়া থলথল করছে। ব্লাউজের বোতাম লাগান নি। তাঁর দিকে তাকানো যাচ্ছে না। ইলাকে দেখে বললেন — 'বসে যাও তো মা। চারটা ভাত খাও আমার সাথে। রূপচান্দা শুঁটকির দোপিঁয়াজা। ঝাল ঝাল করে রাঁধা। খেয়ে দেখ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইলা বলল, 'আরেক দিন খাব। আজ রাতে গেটটা একটু খোলা রাখতে হবে। হাসানকে যদি একটু বলে দেন।'

'দিব, বলে দিব।'

'আরেকটা কাজ আছে। অন্তুকে ডাক্তার দেখাতে হবে।'

'চিন্তা করো না তো। হাসান নিয়ে যাবে। সারাদিন তো ঘরে বসেই ঝিমায়। ঐ দিন মগবাজার যাবে — আমার কাছে রিকশাভাড়া চায়। চিন্তা করে দেখ কত বড় সাহস। মগবাজার এমন কী দূর। গাধা, তুই হেঁটে চলে যা। এত বাবুয়ানা কিসের?'

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এইসব কথা শুনতে ভালো লাগছে না, আবার চলেও যাওয়া যাচ্ছে না। খাওয়া বন্ধ রেখে একজন এত আগ্রহ নিয়ে গল্প করছে ; তার সামনে থেকে উঠে চলে যাওয়া যায় না।

'বস না মা, দাঁড়িয়ে আছ কেন?'

'অন্তু একা আছে।'

'থাকুক না একা। একটা জিনিস তোমার মধ্যে দেখি যেটা আমার পছন্দ না। কাজের লোক তুমি মাথায় তুলে রাখ। কাজের লোক থাকবে কাজের লোকের মতো। কয়েকদিন আগে দেখলাম রিকশা করে যাচ্ছ, চাকর ছোঁড়া বসে আছে তোমার পাশে। সে বসবে নিচে। পায়ের কাছে। পাশে বসালে এরা কোলে বসতে চাইবে।'

'খালা এখন যাই।'

'আহা বস না। পেপসি আছে — পেপসি খাবে। খাও একটা পেপসি। ও রত্না, পেপসি দে।'

ইলাকে বসতে হল। পেপসির গ্লাস হাতে নিতে হল। সুলতানা গলা নিচু করে বললেন, 'পেছনের বাড়ির ঘটনা পত্রিকায় উঠেছে, দেখেছ? ব্যাপার সব ফাঁস করে দিয়েছে। রেইপ কেইস। হেডিং ছিল — 'গৃহবধূ ধর্ষিতা'। আমি মেয়েটাকে দেখতে গিয়েছিলাম। হাসবেন্ডটা খুব চালাক। চোখে-মুখে কথা বলে। আমাকে বলে কি — খালাম্মা দেখেন না — পত্রিকায় বানিয়ে বানিয়ে কী-সব লিখেছে। এখন কাউকে মুখ দেখাতে পারি না। আমি মানহানির মামলা করব। হাতকড়া পরাব। দুজন এডভোকেটের সাথে আলাপও করেছি। বুঝলে ইলা, ইতং বিতং কথা বলেই যাচ্ছে। শাক দিয়ে কি আর মাছ ঢাকা যায়?'

পত্রিকায় কি উঠেছে সেই ঘটনার সবটা ইলাকে শুনতে হল। সুলতানা ফিসফিস করে বললেন, 'ঘটনা আরো আছে। এত বড় ঘটনা ঘটল আর মেয়ে সাড়াশব্দ করল না। চুপ করে রইল। এর কারণ কী? চিৎকার দিলেও তো দশজনে শুনত! কিছু মেয়ে আছে এইসব পছন্দ করে... তারা চায় রেইপড হতে। এক জনে মন ভরে না।'

ইলা বলল, 'খালা, আমি উঠি?'

'আহা মা বস না, তোমার সঙ্গে কথা বলতে ভালো লাগে। তোমার ছোট বোনটাকে ঐদিন দেখলাম। মুখের কাটিং ভালো। রঙ ময়লা, রঙ ভালো হলে আমার ছেলেটার জন্য বলতাম—কালো মেয়ে বিয়ে করিয়ে কী হবে...'

ইলা উঠে পড়ল। আর বসে থাকা যায় না।

টুকটুক করে কে যেন দরজায় টোকা দিচ্ছে। ইলার বুক ধক করে উঠল। তার কী বিশ্রী কোনো অসুখ হয়ে যাচ্ছে? দরজার সামান্য টোকায় পৃথিবীর কেউ এমন চমকে ওঠে না। সে চমকাচ্ছে কেন?

'কে?'

'ভাবী আমি। আমি হাসান। আপনি কি আমাকে খুঁজছিলেন?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'হ্যাঁ খুঁজছিলাম।'

ইলা দরজা খুলতে খুলতে বলল, 'তোমাকে না একবার বলেছি আপা ডাকতে। আজ আবার ভাবী ডাকছ। দাঁড়িয়ে আছ কেন, ভেতরে আস।'

হাসান খুব অস্বস্তি নিয়ে ভেতরে ঢুকল। ইলা বলল, 'ভাই, আমাকে আরেকটা কাজ করে দিতে হবে। অন্তুর মুখের অবস্থা দেখ। ফুলেটুলে কী হয়েছে। ডাক্তারের কাছে একটু নিয়ে যাবে।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'ঐ দিনের কিছু টাকা পাওনা ছিল, ঐ টাকাও তো নাও নি।'

'এখন দিয়ে দিন।'

'আরেকটা কাজ করে দিতে হবে। অন্তু মিয়ার জন্যে একটা মশারি কিনে দিতে হবে। সিঙ্গেল মশারি। কত লাগে সিঙ্গেল মশারির, তুমি জান?'

'জ্বি না।'

'তোমাকে একটা পাঁচশ টাকার নোট দিচ্ছি — তোমার টাকাটা এখান থেকে রেখে দেবে, অন্তুকে ডাক্তার দেখাবে আর একটা সিঙ্গেল মশারি কিনবে।'

'মশারি কি এখনই কিনব? দোকান বোধহয় বন্ধ হয়ে গেছে।'

'কাল সকালে কিনে দিলেও হবে।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'বস না। একটু চা খেয়ে যাও।'

'আমি চা খাই না ভাবী।'

'আচ্ছা তোমার জন্যে একদিন ভালো কিছু বানিয়ে রাখব। আজ দেরি না করাই ভালো। দেরি করলে হয়তো ডাক্তার পাবে না।'

হাসান অন্তুকে নিয়ে নেমে গেল। রাত দশটার মতো বাজে। পুরো ফ্ল্যাটে ইলা একা। তার বুক আবার ধকধক করা শুরু হয়েছে। মনে হচ্ছে ভয়ংকর কিছু ঘটবে। খুব ভয়ংকর কিছু। পেছনের ফ্ল্যাটে যেমন ঘটেছিল, তেমনি কিছু। প্রথমে দরজায় টকটক শব্দ হবে। ইলা বলবে, 'কে'? বাইরে থেকে খুব মিষ্টি গলায় একটি ছেলে বলবে — 'আপা, আমি টিএন্ডটি'র পিওন। টেলিগ্রাম নিয়ে এসেছি।'

ইলা বলবে, 'দরজা তো খোলা যাবে না। আপনি দরজার নিচে দিয়ে দিন।'

'আপা, আর্জেন্ট টেলিগ্রাম — সই করে রাখতে হবে।'

ইলা দরজা খুলবে, তারপর? তারপর কী? ইলা ঘামতে লাগল। বুক শুকিয়ে কাঠ। কখন আসবে হাসান? বেশি দেরি নিশ্চয়ই করবে না। ইলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইল। বারান্দা থেকে রাস্তার এক অংশ দেখা যায়। বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতেও তার খারাপ লাগছে। বারান্দার রেলিংটা নিচু। এখানে দাঁড়ালেই তার কেন জানি লাফিয়ে নিচে পড়ে যেতে ইচ্ছা করে।

জামান ফিরল রাত বারটায়। হাতে কফির একটা কৌটা। বিরস গলায় বলল, 'কফি বানাতে পার?'

ইলা হ্যাঁ–সূচক মাথা নাড়ল। জামান বলল, 'হ্যাঁ বা না বল। মাথা নাড়ানাড়ি কেন? ভালো করে কফি বানাও। আমি রাতে ভাত খাব না। খেয়ে এসেছি।'

'আচ্ছা।'

ইলা কফি বানাতে চলে গেল। সে নিজে না খেয়ে অপেক্ষা করছিল। খিদে মরে গেছে। একা একা এত রাতে খেতে বসার অর্থ হয় না।

জামান অনেক সময় নিয়ে গোসল সেরে বের হল। বারান্দায় অন্তু মিয়ার বিছানা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নতুন মশারি খাটানো হয়েছে। জামান বলল, 'মশারি পেলে কোথায়?'

'কিনেছি। হাসানকে বলেছি, হাসান কিনে দিয়েছে।'

'টাকা?'

'ভাইয়া আমাকে কিছু টাকা দিয়েছে।'

'কিছু মানে কত?'

'অল্প।'

'অ্যামাউন্টটা বলতে অসুবিধা আছে?'

'পাঁচশ।'

'তুমি টাকা চেয়েছিলে?'

'না।'

'না চাইতেই পাঁচশ টাকা দিয়ে দিল?'

'ভাইয়ার যখন হাতে টাকা-পয়সা হয় তখন সবাইকেই কিছু কিছু দেয়।'

'উনার হাতে এখন টাকা-পয়সা হয়েছে?'

ইলা জবাব দিল না। কফির কৌটা নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকল। আবার তার বুক ধড়ফড় করছে। মিথ্যা কথাটা কি ধরা পড়ে যাবে? সেই সম্ভাবনা কতটুকু? খুব অল্প। জামান যাত্রাবাড়িতে কখনো যায় না। ভাইয়ার সঙ্গে তার দেখা হবার সম্ভাবনা নেই বললেই হয়। আর দেখা হলেও জামান নিশ্চয়ই টাকার প্রসঙ্গ তুলবে না। এতটা নীচে কি সে নামবে?

ইলা দু কাপ কফি বানিয়েছে। জামান নিজের কাপে চুমুক দিচ্ছে। ইলা কাপ সামনে নিয়ে চুপচাপ বসে আছে। তার খেতে ইচ্ছা করছে না। বরং কেমন বমি বমি লাগছে। জামান বলল, 'পাঁচশ' টাকা পেয়েই অন্তুর জন্যে নেটের মশারি, লেপ-তোশক এইসব কিনে ফেলেছ? কোলবালিশ কিনেছ? নাকি এই আইটেম বাদ পড়েছে?'

'শুধু মশারি কিনেছি।'

'বাড়াবাড়ি করা তোমাদের সব ভাইবোনদের একটা স্বভাব। নিজে খেতে পায় না ; শংকরকে ডেকে আনে। বাড়াবাড়ি না করলে হয় না?'

ইলা বসে আছে চুপচাপ। এই মানুষটার কথা এখন তার আর শুনতে ইচ্ছা করছে না। সে তাকিয়ে আছে শূন্য দৃষ্টিতে। চেষ্টা করছে যেন কিছুই তার কানে না আসে। কাজটা কঠিন। সব সময় পারা যায় না। মাঝে মাঝে পারা যায়। নিয়মটা খুব সহজ। যার কথা শুনতে ইচ্ছা করে না তার দিকে তাকাতে হয় কিন্তু কখনো তার চোখের দিকে নয়। ভুলেও না। তাকাতে হয় মানুষটার ভুরুর দিকে, ভাবতে হয় অন্য কিছু। এমন কিছু যা ভাবতে ভালো লাগে। এই মুহূর্তে ইলা ভাবছে বি, করিম সাহেবের কথা।

ঠিকানা খুঁজে খুঁজে ইলা এক বিকেলে কলতাবাজারে উপস্থিত হল। ভদ্রলোক দরজা খুলে রুক্ষ গলায় বললেন, 'কে, কী চাই?'

'বি, করিম সাহেবকে খুঁজছিলাম।'

'আমিই বি, করিম। ব্যাপার কী?'

'আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন?'

'আমার কি চেনার কথা?'

'জ্বি। আপনার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল।'

'দেখা হলেও — তুমি যখন আমাকে চিনতে পার নি, আমি তোমাকে চিনব এটা ভাবছ কেন? বাদ দাও এই প্রসঙ্গ। এসেছ কেন?'

'আমি টাকাটা দিতে এসেছি।'

'কীসের টাকা?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'একবার আপনি আমার রিকশাভাড়া দিয়েছিলেন।'

'আমি তোমার রিকশাভাড়া দিতে যাব কেন?'

কী কর্কশ কথাবার্তা! খালিগায়ে দরজা খুলেছে, কিন্তু কোনো বিকার নেই। খালিগায়েই দাঁড়িয়ে আছে। কেউ কি পারে একজন তরুণীর সামনে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে? কোনো সংকোচ নেই। কোনো দ্বিধা নেই। তুমি তুমি করেই বা ভদ্রলোক বলছেন কেন?

ইলা তার হ্যান্ডব্যাগ খুলে টাকা বের করতে করতে বলল — 'আপনি সত্যি সত্যি চিনতে পারছেন না? আমরা দুই বোন ছিলাম। আমার ছোট বোনটা কাঁদছিল।'

'ও আচ্ছা। ইয়েস। মনে পড়েছে। বায়তুল মোকাররমে।'

'জ্বি।'

'কত টাকা দিয়েছিলাম?'

'কুড়ি।'

'গুড। দাও, টাকাটা দাও, কাজে লাগবে। হাত খালি। পারলে আরো কিছু বেশিও দিতে পার। আছে?'

ইলা ভাবল লোকটা ঠাট্টা করছে। কিন্তু না, ঠাট্টা না। তিনি সত্যি সত্যি চাইছেন। ইলা একটা পঞ্চাশ টাকার নোট বাড়িয়ে দিল। তিনি বিন্দুমাত্র সংকোচ না করে নিলেন।

'এস, খানিকক্ষণ বসে যাও। চা খেয়ে যাও।'

'জ্বি না।'

'না কেন? খেয়ে যাও। যাও যাও, ভেতরে ঢুকে পড়। আমি চায়ের কথা বলে আসি।'

ভদ্রলোক লুঙ্গি পরা অবস্থাতেই টাকা নিয়ে চলে গেলেন। হয়তো চায়ের কথাই বলতে গেলেন। ইলা ভেতরে ঢুকল না, আবার চলেও গেল না। দাঁড়িয়ে রইল। ভদ্রলোক দ্রুত ফিরে এসে বিরক্ত গলায় বললেন — 'দাঁড়িয়ে আছ কেন? দরজা তো খোলাই ছিল। এস।'

ঘর বেশ গোছানো, তবে মেঝেতে একটা বিশাল পাটি পাতা। বড় একটা খাতা পড়ে আছে। খাতার পাশে দুতিনটা কলম।

'আপনি লিখছিলেন?'

'হুঁ।'

'কী লিখছিলেন?'

'সিনেমার স্ক্রিপ্ট। ঐ আমার পেশা। লেখক হবার ইচ্ছা ছিল, তা হওয়া গেল না, হয়ে গেলাম স্ক্রিপ্ট রাইটার। ছবি দেখ তুমি?'

'খুব বেশি না।'

'জিন্দেগী দেখেছ?'

'জ্বি না।'

'আমার লেখা। না দেখে ভালো করেছ। দেখলে হলের মধ্যে বমি করে ফেলতে। আমি নিজে লিখে শেষ করবার পর সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলেছি।'

ইলা খিলখিল করে হেসে ফেলল। ভদ্রলোক অবাক হয়ে বললেন — 'তোমার হাসি তো খুব সুন্দর। দাঁতও সুন্দর। অভিনয় করবে?'

ইলা হকচকিয়ে গেল। বলে কী এই লোক!

ভদ্রলোক হড়বড় করে বললেন — 'অভিনয় করবার ইচ্ছা হলে আমাকে বলবে। আমার কথা মজিদ আলি ফেলে না। দুজন নায়িকা আমি মজিদকে দিয়েছি। দুটাই হিট। একজনের সাইনিং মানিই এখন এক লাখ। শুনেছি খুব দেমাগ হয়েছে। তবে আমাকে এখনো খাতির করে। দেখা হলে পা ছুঁয়ে সালাম করে।'

চা চলে এল। ভদ্রলোক পিরিচে ঢেলে চা খেতে লাগলেন। খানিকক্ষণ শিস দেবার ভঙ্গি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করলেন। ঠোঁট সুচাল করে ফুঁ দিচ্ছেন। লাভ হচ্ছে না। শব্দ হচ্ছে না। ভদ্রলোক খানিকটা বিরক্ত হলেন। বিরক্তি ঝেড়ে ফেলে বললেন, 'মজিদ আলি সেদিন বলছিল, অনেকদিন তো হল ; আরেকটা নায়িকা দিন। দেখি হিট করে কিনা। আমি বলেছি, দেব। তোমার যদি অভিনয় করার শখ থাকে বলবে। লজ্জার কিছু নেই।'

'আমার কোনো শখ নেই।'

'শখ না থাকলে ভিন্ন কথা।'

ইলা বলল, 'আমি এখন উঠি?'

'আচ্ছা ঠিক আছে। এস আরেক দিন। বাড়তি টাকা ফেরত নিয়ে যাবে। আমি ঋণ রেখে মরতে চাই না।'

'জ্বি আচ্ছা, আমি আরেক দিন আসব।'

'সপ্তাহখানেক পরে এস। এর মধ্যে লেখা শেষ হয়ে যাবে। গল্পটা পড়ে শুনাব। নাম কী তোমার?' ইলা খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বলল, 'পরী।'

'পরী!'

'জ্বি পরী।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ সত্যি। নাম নিয়ে মিথ্যা বলব কেন?'

'তাও তো ঠিক। নাম নিয়ে মিথ্যা কেন বলবে? আমি খুবই অবাক হয়েছি, বুঝলে— আমি যে স্ক্রিপ্টটা লিখছি তার নায়িকার নামও পরী। তোমার কি বিশ্বাস হচ্ছে, না-কি ভাবছ আমি বানিয়ে বলছি?'

'বিশ্বাস হচ্ছে।'

'উঁহু, বিশ্বাস হচ্ছে না। তোমার মুখ দেখেই বুঝতে পারছি। নাও, এই পৃষ্ঠাটা পড়। এক পৃষ্ঠা পড়লেই বুঝতে পারবে। গোটাটা পড়তে হবে না।'

ইলা পৃষ্ঠাটা হাতে নিল। চোখের সামনে ধরল। পড়ল না। পড়তে ইচ্ছা করছে না।

'কি, আমার কথা বিশ্বাস হল?'

'জ্বি'।

'আমার কাহিনীর পরী নাচ জানে, গান জানে, রাইফেল চালাতে জানে। আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সব পরীক্ষায় ফার্স্ট ক্লাসফার্স্ট হয়। যে সেকেন্ড হয় তারচে' একশ নম্বর এগিয়ে থাকে।'

'পরী কি নায়িকা?'

'না। পরী নায়িকা নয়, নায়িকার ছোটবোন। নায়িকার ছোটবোনেরই এই অবস্থা। এখন নায়িকার অবস্থা চিন্তা কর। হা-হা-হা...'

ভদ্রলোক হেসেই যাচ্ছেন। ইলা হাসছে না। তার কেন জানি হাসি আসছে না, বরং ভয় ভয় লাগছে — মনে হচ্ছে মানুষটা ঠিক সুস্থ নয়। একজন সুস্থ মানুষ এত দীর্ঘ সময় ধরে এমনভাবে হাসে না। ইলা বলল, 'আমি যাই?'

'আচ্ছা যাও।'

সে ঠিক করে রেখেছিল সে আর কোনোদিন যাবে না। কিন্তু দশ দিনের মাথায় সে আবার গেল। তিনি বাসাতেই ছিলেন। সেদিন আর খালিগায়ে না। নতুন মটকার পাঞ্জাবি। পাঞ্জাবির বোতামগুলো বোধহয় সোনার। ঝিকঝিক করছে। তাঁর গা দিয়ে ভুরভুর করে আতরের গন্ধ বেরুচ্ছে। ইলা বলল, 'আমাকে চিনতে পারছেন?'

ভদ্রলোক শুকনো গলায় বললেন, 'চিনতে পারছি। এখন যাও, বিরক্ত করো না। অন্য একদিন এস।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লজ্জায়–অপমানে ইলার চোখে প্রায় পানি এসে যাচ্ছিল। সে অনেক কষ্টে নিজেকে সামলাল। ভদ্রলোক বিরসমুখে বললেন, 'মজিদ আলিকে তোমার কথা বলেছি। তবে ব্যাটা ইন্টারেস্টেড না। শুধু হুঁ–হুঁ করে। অবশ্য একেবারে আশা ছেড়ে দেয়ার কিছু নেই। আমি আবার বলব। পরে এসে খোঁজ নিয়ে যেও।'

ইলা বলল, 'আপনার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। কী খোঁজ নিয়ে যাব?'

'নায়িকা হিসেবে তোমার কোনো সুযোগ হয় কিনা।'

'এই সুযোগের জন্যে তো আমি আপনার কাছে আসি নি।'

'কী জন্যে এসেছ? আচ্ছা, ঠিক আছে কী জন্যে এসেছ পরে শুনব। আজ যাও। আমি বেরুব।'

ইলা চলে এল।

বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। ভালো বৃষ্টি নেমেছে। বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে অন্তুর কান্নার শব্দ কানে আসছে। ছেলেটার এ কী অবস্থা হল! ইলা তার কাছে গেল। ফিসফিস করে বলল, 'এত শব্দ করে কাঁদিস না রে অন্তু। উনার ঘুম ভেঙে যাবে।' অন্তু সঙ্গে সঙ্গে কান্না থামাল। ইলা অন্তুর গায়ে হাত দিয়ে দেখে — অনেক জ্বর।

ইলা পেছনের বারান্দায় এসে দাঁড়াল। 6/B ফ্ল্যাটে আলো জ্বলছে। শুধু একটা ঘরে না, সবকটা ঘরে। এত রাত পর্যন্ত এরা জেগে আছে কেন? কালও দেখেছে অনেক রাত পর্যন্ত ঐ বাড়ির ফ্ল্যাটে আলো জ্বলছে। মেয়েটা এখন বোধহয় বাতি নিভিয়ে ঘুমাতে পারে না। তাদের উচিত এই পাড়া ছেড়ে চলে যাওয়া। বোকা মেয়েটা কেন এখনো পড়ে আছে? কী আছে এখানে?

AMARBOI.COM

৬

আজকের দিনটা শুরু হয়েছে খুব খারাপভাবে। সকাল থেকেই বিরাট এক ঝামেলা। অন্তু জ্বরে অচেতন। তার মুখ দিয়ে লালা ভাঙছে। হাসান এসে তাকে কোলে করে নিচে নামিয়েছে। রিকশা করে হাসপাতালে নিয়ে যাবে। ইলা জামানকে বলল, 'তুমি যাও না একটু সাথে।' জামান মহা বিরক্ত হয়ে বলল — 'আমি সাথে গিয়ে করব কী?'

'জ্ঞান নেই। আমার কেন জানি ভয় লাগছে। না–হয় আমি সঙ্গে যাই।'

'তোমার যাবার দরকার নেই। যা করার ও–ই করবে। ভ্যাবলা ধরনের ছেলে। এরা কাজ গুছাতে ওস্তাদ। ডাক্তারদের হাতে–পায়ে ধরে দেখবে হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দিয়েছে।'

ইলার মনটা খারাপ হয়ে গেল। কী ধরনের কথাবার্তা। পরের বাড়ির একটা ছেলে এত ছোটাছুটি করছে অথচ লোকটার এতটুকু গরজ নেই। দিব্যি শার্ট–প্যান্ট পরছে। যদি ছেলেটার কিছু হয়? অবস্থা আরো খারাপ হলে তো আত্মীয়স্বজনদের খবর দিতে হবে।

'আমি বেরুচ্ছি, বুঝলে। তেমন কিছু হলে বাড়িওয়ালার বাসা থেকে টেলিফোন করে দিও। আর ভয়ের কিছু নেই। ওয়ার্কিং ক্লাসের লোকদের এত অল্পতে কিছু হয় না। দুএকটা স্যালাইন–ট্যালাইন পড়লেই চাঙ্গা হয়ে উঠবে।'

'ওর আত্মীয়স্বজনদের কোনো খবর দেয়া দরকার না?'

'পাগলের মতো কী–সব কথা যে তুমি বল! ওর আত্মীয়স্বজন আমি পাব কোথায়? এদের কি কোনো ঠিকানা আছে ; না পোস্ট বক্স নাম্বার আছে? শোন, হাসানকে বলে রেখ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেট যেন খুলে রাখে। অফিস থেকে আবার যেতে হবে জয়দেবপুর।'

'ফিরতে দেরি হবে?'

'হুঁ হবে। গেট খোলা রাখতে বলবে।'

দারুণ দুশ্চিন্তায় ইলার সময় কাটতে লাগল। তার মনে হচ্ছে এক্ষুনি হাসান রিকশা নিয়ে ফিরে এসে বলবে — 'ভাবী, রাস্তার মধ্যেই এই কাণ্ড হয়েছে। মরে গেছে বুঝতে পারি নি। এখন কী করব?'

হাসান এগারটার দিকে ঘামতে ঘামতে ফিরে এল। সে অসাধ্য সাধন করেছে। অন্তুকে হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দিয়েছে।

'এক নম্বর ওয়ার্ডে আছে ভাবী। সিট নেই, বারান্দায় শুইয়ে রেখেছে। সিট হলে বিছানায় তুলে দিবে। জমাদারকে দশটা টাকাও দিয়ে এসেছি — বখশিশ। জমাদার-টমাদার এরা অনেক কিছু করতে পারে।'

'জ্ঞান এসেছে?'

'হ্যাঁ, এসেছে। আসার সময় দেখে এসেছি কথা-টথা বলছে। স্যালাইন দিচ্ছে। ডাক্তার সাহেব বললেন — ভয়ের তেমন কিছু নেই।'

'ভাই, তুমি আমার বিরাট উপকার করেছ।'

'ভর্তি করাতে খুব ঝামেলা হয়েছে। কেউ কোনো কথা শোনে না। এদিকে অচেতন এই ছেলে নিয়ে আমি করি কী! আমার আবার অল্পতেই চোখে পানি এসে যায়। চোখে পানি এসে গেল। তাই দেখে একজন ডাক্তার ব্যবস্থা করলেন। ডাক্তারদের মধ্যেও ভালো মানুষ আছে ভাবী।'

'তা তো আছেই।'

'ডাক্তার সাহেব ভেবেছেন অন্তু আমার ভাই। আমি তাঁর ভুল ভাঙাই নি। ভাই ভেবেছে ভাবুক। কাজের ছেলে শুনলে হয়তো গা করবে না।'

'এস হাসান, ভেতরে এসে বস। কিছু খাবে?'

'জ্বি না।'

'একটু কিছু খাও। এস লক্ষ্মী ভাই।'

হাসান লজ্জিত মুখে ভেতরে ঢুকল। নিচু গলায় বলল, 'কোনো চিন্তা করবেন না ভাবী। দুপুরবেলা আমি আবার যাব।'

ইলা বলল, 'হাসপাতাল থেকে কি খাওয়া-দাওয়া দেয়?'

'তা দেয়। আমি তিন টাকা দিয়ে একটা ডাব কিনে দিয়ে এসেছি। পাঁচটা টাকা বেঁচেছিল। ওর হাতে দিয়ে হেঁটে চলে এসেছি।'

'সে কী!'

'খামোকা টাকা খরচ করে লাভ কী বলেন? তাছাড়া হাঁটতে আমার ভালোই লাগে।'

ইলা হাসানকে চা-বিসকিট এনে দিল। হাসান মাথা নিচু করে খাচ্ছে। এক পলকের জন্যেও এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে না। তার পরনে আকাশী রঙের একটা শার্ট। শার্টটা নতুন, তবে পেটের কাছে পয়সার সাইজের একটা পোড়া দাগ আছে। হাসান একটা হাত সব সময় সেখানে দিয়ে রেখেছে।

বেচারার শার্ট বোধহয় একটাই। সব সময় এই একটা শার্টই গায়ে দিতে দেখা যায়। ইলা মনে মনে ঠিক করে ফেলল — আজই সে একটা শার্ট কিনবে। খুব সুন্দর একটা শার্ট।

'ভাবী যাই।'

'আচ্ছা ভাই এস।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমি দুপুরে আবার যাব। আপনি চিন্তা করবেন না ভাবী।'

হাসান পুরোপুরি চলে গেল না। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে পড়ল। ইলা বলল, 'কিছু বলবে?'

'ভাবী, আপনি ভাইজানকে আমার জন্যে একটা চাকরির কথা বলবেন। যে কোনো চাকরি। ছোট হলেও ক্ষতি নাই।'

ইলা বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে আছে। হাসান মেঝের দিকে তাকিয়ে বলল — 'এখানে আর থাকতে পারছি না ভাবী। প্রেসে সীসা চুরি হয়েছে। সবাই বলছে আমি চুরি করেছি। আমার কোথাও যাবার জায়গা নাই।'

'আমি ওকে বলব। অবশ্যই বলব। আজই বলব। কিন্তু ও বোধহয় কিছু করতে পারবে না।'

'আপনার আর কেউ চেনা নাই? খুব ছোট চাকরি হলেও আমার কোনো অসুবিধা নাই।'

ইলাকে স্তম্ভিত করে দিয়ে এত বড় একটা পুরুষমানুষ হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল। ইলা কী বলবে বুঝে উঠতে পারছে না।

হাসান নিজেকে সামলে নিল। হঠাৎ কেঁদে ফেলাতে নিজেই লজ্জা পাচ্ছে। অস্বস্তি ঢাকতে পারছে না। ইলা পরিস্থিতি সহজ করার জন্যে হাসিমুখে বলল, 'তোমাকে বলেছিলাম আমাকে আপা ডাকতে। তুমি কিন্তু ভাবীই বলে যাচ্ছ।'

'মনে থাকে না।'

'মনে না থাকলে তো হবে না। মনে থাকতে হবে।'

হাসান চলে যেতে ধরল। ইলা দরজা ধরে দাঁড়িয়েছে। তার মনে হচ্ছে হাসান আরো কিছু বলতে চায়। বলার সাহস পাচ্ছে না। ইলা বলল, 'কিছু বলবে?'

হাসান হড়বড় করে বলল, 'আমার সম্পর্কে কিছু শুনেছেন আপা?'

'না, কী শুনব?'

'পরে বলব। আজ যাই আপা। বাজারে যেতে হবে।'

অনেকদিন পর ইলা আজ আবার ঘুরতে বের হয়েছে। ফ্ল্যাট তালাবন্ধ। হাসানকে বলা আছে, সে লক্ষ রাখবে। রাত করে ফিরলেও আজ কোনো সমস্যা নেই — জামানের ফিরতে দেরি হবে। জয়দেবপুরে এই মানুষটা কী করছে? কে জানে কী করছে। এখন আর জানার আগ্রহ হচ্ছে না।

ইলা আজ কোথায় যাবে কিছু ঠিক করে নি। রিকশায় উঠে ঠিক করবে। বেশ কিছু টাকা সঙ্গে নিয়েছে। কত সে নিজেও জানে না। গুনে নেয় নি। জামানের মানিব্যাগ থেকে চোখ বন্ধ করে কয়েকটা নোট তুলে নিয়েছে। ইলা ঠিক করে রেখেছে — সব টাকা খরচ করবে। আবার ফ্ল্যাটে ফিরে আসবে খালিহাতে। সঙ্গে কিছু থাকবে না। কিছু থাকলে জামান টের পেয়ে যাবে।

ভাইয়ার জন্যে কোনো একটা উপহার কিনতে পারলে ভালো হত। তা কেনা যাবে না। ভাইয়া কোনো এক প্রসঙ্গে জামানকে বলে ফেলতে পারে। তাদের বাড়ির কারোর জন্যেই কিছু কেনা যাবে না। কী বিশ্রী সমস্যায় ইলা পড়েছে। টাকা আছে কিন্তু খরচ করতে পারছে না।

কোথায় যাওয়া যায়? ভূতের গলিতে জামানের বড়বোন থাকেন। হঠাৎ তাঁর বাসায় গিয়ে উপস্থিত হলে কেমন হয়? ভদ্রমহিলা চমকে উঠবেন। কারণ তাদের বাড়িতে যাওয়া ইলার নিষেধ। জামান বিয়ের পরদিনই বলেছে — আমার কোনো আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে কোনো রকম যোগাযোগ রাখবে না। আমার বড়বোন যদি আসে দরজাও খুলবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দরজা খোলাও নিষেধ।

'কেন?'

'আমি তাদের পছন্দ করি না।'

'তারা কী করেছে?'

'এত ইতিহাস বলতে পারব না। পছন্দ করি না। করি না। চাই না এদের সঙ্গে কোনো রকম যোগাযোগ থাকুক।'

জামানের বড়বোনকে ইলার অবশ্যি বেশ পছন্দ হয়েছিল। মোটামুটি মানুষ। চোখমুখে ভীত ভীত ভাব। অকারণেই চমকে উঠছেন। তিনি ইলাকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন, 'আমি ভূতের গলিতে থাকি। ভূতের গলিতে ঢুকেই একটা ওষুধের দোকান — ডেল্টা ফার্মেসি। ফার্মেসির উল্টোদিকে তিন তলা বাড়ির দোতলায় থাকি। মনে থাকবে?'

'থাকবে।'

'ফার্মেসিটার নাম কী বল তো?'

'ডেল্টা ফার্মেসি।'

'তুমি আসবে তো?'

'আসব।'

'জামানকে না জানিয়ে আসবে। জামানকে বললে সে আসতে দেবে না। অকারণে রাগ করবে। কী দরকার?'

ইলার বিয়ের সময় জামানের বড়বোন ছাড়াও বাজিতপুর থেকে জামানদের অনেক আত্মীয়স্বজন এসেছিলেন। জামানের বাবা এসেছিলেন। ভদ্রলোকের চোখ নষ্ট হয়ে গেছে। হাত ধরে ধরে চলাফেরা করাতে হয়। জামান তাঁকে বলল, 'আপনি কী জন্যে এসেছেন?' তিনি থতমত খেয়ে বললেন — 'বিবাহ দেখতে আসলাম।'

'আপনি তো চোখেই দেখেন না। বিবাহ দেখবেন কী? খামোকা বাজে ঝামেলা করেন। আসা-যাওয়ার খরচ আছে না? যাওয়ার সময়ও তো ভাড়া দিতে হবে। হবে না?'

'হবে।'

'তাহলে? এতগুলা মানুষ নিয়ে এসেছেন। থাকবেন কোথায়?'

'তোমার এইখানে থাকব। আর যাব কই?'

'দুই রুমের ফ্ল্যাট — থাকবেন বললেই তো হয় না। এ রকম উল্টাপাল্টা কাজ আর করবেন না। আপনি থাকতে চান থাকুন — অন্যদের আমি হোটেলে দিয়ে আসব।'

'তাহলে আমাকেও হোটেলে দিয়ে আস। সবাই একসঙ্গে থাকি।'

'সেটাও মন্দ না।'

জামানের বাবা হোটেল থেকেই বাড়ি চলে গেলেন। প্রতি পনের দিন পরপর চিঠি লিখেন। জামান সেইসব চিঠির বেশির ভাগই পড়ে না। হাতে চিঠি দিলে হাই তুলে বলে — ফেলে দাও। কী লেখা আমি জানি — আমি ভালো আছি, তুমি কেমন আছ? গত সপ্তাহে মনি অর্ডার পাইয়াছি। টাকার পরিমাণ আরো কিছু বাড়াও — দ্রব্যমূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে.... ইলা কিছু কিছু চিঠি পড়েছে। আসলেই তাই। চিঠিগুলোতে টাকা-পয়সা ছাড়া অন্য কোনো কিছুরই উল্লেখ নেই।

ইলা প্রথম গেল বায়তুল মোকাররম, সেখান থেকে রিকশা করে নিউ মার্কেট। নিউ মার্কেট থেকে বেবিট্যাক্সি নিয়ে কামাল আতাতুর্ক অ্যাভিনিউ। সেখানে সুন্দর একটা শপিং সেন্টার না-কি হয়েছে। সে কিছুই কিনল না। ঘুরে ঘুরে বেড়াল। ঐ শপিং সেন্টারে একটা বাচ্চা মেয়ে এক প্যাকেট চকলেট কেনার জন্যে খুব চাপাচাপি করছিল। মা কিছুতেই কিনে দেবে না। ইলা এগিয়ে গিয়ে বলল, 'আমি কিনে দিলে আপনি কি রাগ করবেন?' মেয়েটির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মা অবাক হয়ে বললেন, 'আপনি কিনে দেবেন কেন? সে কী!'

'যদি আপনি অনুমতি দেন তবেই কিনতে পারি, প্লিজ।'

চকলেটের টিনটা কিনতে চারশ টাকা চলে গেল। টাকাটা দেবার সময় ইলার বুক খানিকক্ষণ খচখচ করল। এতগুলো টাকা! সেই 'খচখচ' ভাব স্থায়ী হল না। বাচ্চা মেয়েটি চকলেটের টিন হাতে লাফাচ্ছে। দেখতে ভালো লাগছে। ভদ্রমহিলা বললেন, 'আন্টিকে স্লামালিকুম দাও। বল — চকলেটের জন্য ধন্যবাদ।'

মেয়েটি কোনো কিছু বলাবলির ধার দিয়ে গেল না। সে সমানে লাফাচ্ছে।

ইলা যাত্রাবাড়িতে উপস্থিত হল একটার দিকে। সুরমা দরজা খুলে দিলেন। ইলা হাসিমুখে বলল, 'কেমন আছ মা? রান্না হয়েছে? প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে। ভাত খাব। বাসা খালি কেন? কেউ নেই?'

'না।'

'গেল কোথায়?'

সুরমা বিরক্ত গলায় বললেন, 'দুপুরবেলায় কেউ বাসায় থাকে না-কি? রুবা গেছে পিকনিকে। লঞ্চে করে মানিকগঞ্জ যাবে। আবার ফিরে আসবে।'

'ভাইয়া? ভাইয়া কোথায়?'

'জানি না কোথায়। বাউণ্ডুলেটার সঙ্গে কোথায় কোথায় যেন ঘুরছে। ছোঁড়াটা বাবুর মাথা খেয়েছে। এখন বলছে ভাতের হোটেল দিবে। বাবু তাতেই লাফাচ্ছে।'

'তুমি মনে হয় খুব রাগ করছ।'

'রাগ করব না? ভদ্রলোকের ছেলে ভাতের হোটেল দেবে কেন?'

ইলা হাসিমুখে বলল, 'ভদ্রলোকের ছেলেরা দেবে পোলাওয়ের হোটেল।'

সুরমা বিরক্ত গলায় বললেন, 'সব কিছু নিয়ে হাসবি না। এটা কোনো হাসিঠাট্টার বিষয় না। হাতমুখ ধুয়ে আয়। ভাত বাড়ি।'

'ভাত খাব না মা। এখন চলে যাব।'

'একটু আগে না বললি খাবি।'

'এখন বলছি — খাব না। কারণ একটা জরুরি কাজ বাকি আছে।'

'জরুরি কাজটা কী?'

'তোমাকে বলা যাবে না।'

'ভাত খেয়ে যা। কতক্ষণ লাগবে ভাত খেতে?'

'একবার তো মা বললাম, খাব না। কেন বিরক্ত করছ?'

সুরমা বিস্মিত হয়ে মেয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ইলা বাথরুমে ঢুকল। অনেক সময় নিয়ে গোসল করল, বের হয়ে এল হাসিমুখে।

'ভাত দাও মা।'

সুরমা ভাত বাড়লেন। তিনি আগ বাড়িয়ে আর কোনো কথাবার্তায় গেলেন না। খাবার আয়োজন খুবই নগণ্য। ডাল, বেগুন ভর্তা, ভাত। ইলার জন্যে একটা ডিম ভাজা করা হয়েছে। খেতে খেতে ইলা বলল, 'ভাইয়ার ব্যবসা মনে হয় জলে ভেসে গেছে।' সুরমা তিক্ত গলায় বললেন, 'সঙ্গদোষে ওর সব গেছে। ছোটলোকটা মাথার মধ্যে একেক বার একেকটা জিনিস ঢোকায় — বাবু লাফায়। আরে গাধা, তোর নিজের বুদ্ধিশুদ্ধি নেই।'

'ছোটলোক কাকে বলছ মা, নাসিম ভাইকে?'

'আর কাকে বলব!'

'আমরা কি বড়লোক?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুরমা বিরক্ত গলায় বললেন, 'তুই কি এর মধ্যে প্যাঁচ ধরছিস না–কি? তোদের সঙ্গে তো কথাবার্তা বলাই মুশকিল। রাগের মাথায় ছোটলোক বলেছি।'

'কোনো সময়ই এটা বলা উচিত না মা। কারণ তুমি ভালো করেই জান নাসিম ভাইকে শুধু ভাইয়া না, আমি, রুবা, আমরা দুজনই খুব পছন্দ করি। আমাদের খুব পছন্দের একজন মানুষকে তুমি কথায় কথায় ছোটলোক বলতে পার না।'

সুরমা কঠিন গলায় বললেন, 'বলে বিরাট অন্যায় করেছি — এখন আমাকে কী করতে হবে। পা ধরে ক্ষমা চাইতে হবে?'

'তোমার তিরিক্ষি মেজাজ হয়েছে মা। মনে হয় ব্লাডপ্রেসার আরো নেমে গেছে। দুধ–ডিম কি তুমি ঠিকমতো খাচ্ছ?'

সুরমা কিছু বললেন না। মা এবং মেয়ে দুজন দুজনের দিকে কঠিন চোখে তাকিয়ে রইল। সুরমাই প্রথম চোখ নামিয়ে নিলেন। ইলা হাসিমুখে বলল, 'চোখে চোখে তাকিয়ে থাকার প্রতিযোগিতায় তুমি কখনো জিততে পার না মা। তুমি সব সময় হেরে যাও। কোনোদিন পারবেও না।'

'এটা কী ধরনের কথা?'

ইলা হেসে ভাত খাওয়া শুরু করল। খাওয়া শেষ করে সহজ ভঙ্গিতে বলল, 'ঘরে পান আছে মা? একটা দাও তো।'

সুরমা পান এনে দিলেন। ইলা বলল, 'আমি খানিকক্ষণ ঘুমাব মা। তুমি আমাকে ঠিক পাঁচটার সময় ডেকে দেবে।'

'আমার ঘরে ঘুমাবি? ঐ ঘরটায় আলো আসে না। আরাম করে ঘুমাতে পারবি। রুবার ঘরে রোদ আসে।'

'আমার ঘরটা এখন হয়েছে রুবার ঘর?'

'বিয়ের পর — স্বামীর ঘরই ঘর। আর কোনো ঘর — ঘর না।'

'জামানের সঙ্গে তোমার মিল আছে মা। জামানও এইভাবে কথা বলে।'

সুরমা স্তম্ভিত হয়ে বললেন, 'জামান জামান করছিস কী রে?'

'কী বলব? জামান সাহেব? না–কি মিস্টার জামান?'

সুরমা কিছু বললেন না। ইলা হাসিমুখে বলল, 'তুমি আমাকে খুব ভয় পাও — তাই না মা?' সুরমা ক্ষীণ গলায় বললেন, 'বিয়ের পর তুই কী রকম পাগলাটে হয়ে গেছিস। আমি তোকে ভয় পাব কেন?'

'ভয় পাও না, তাহলে এমন ফিসফিস করে কথা বলছ কেন?'

সুরমা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। ইলা রুবার ঘরে ঢুকে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিল। শুধু দরজা না, জানালাও বন্ধ করল। ঘর পুরোপুরি অন্ধকার হয়ে গেল।

পাঁচটায় ইলাকে ডেকে তোলার কথা। সুরমা জেগে বসে রইলেন। ঠিক পাঁচটায় দরজা ধাক্কা দিতেই ভেতর থেকে ইলা বলল, 'ধাক্কাধাক্কি করবে না তো মা। আমার এখনো ঘুম আসে নি। তোমাকে ডাকতে হবে না। আমি নিজেই উঠব।'

'দিন খুব খারাপ করেছে ইলা। ঝড়বৃষ্টি হবে।'

'হোক।'

'সন্ধ্যা হয়ে গেলে তোর বাসায় যাবি কীভাবে? বাবু রাত দশটা–এগারটার আগে বাসায় ফেরে না। তোকে দিয়ে আসবে কে?'

'আমাকে দিয়ে আসতে হবে না। আমি এখানেই থাকব। তুমি আর বিরক্ত করো না তো মা। আমি এখন ঘুমাব।'

ইলার ঘুম ভাঙল সন্ধ্যার আগে আগে। রুবা ফেরে নি। ঘরে সুরমা একা। তাঁর মনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হচ্ছে রুবার কোনো একটা সমস্যা হয়েছে। হয়তো লঞ্চ ডুবে গেছে। কিংবা লঞ্চের উপর ছোটাছুটি করতে গিয়ে পা পিছলে রুবা পানিতে পড়ে গেছে। রুবা সাঁতার জানে না।

সুরমা তাঁর মনের অস্থিরতা কিছুতেই কমাতে পারছেন না। বাবুও বাসায় নেই, কাকে তিনি কী বলবেন? ইলার ঘুম ভাঙতে তিনি ব্যাকুল গলায় বললেন, 'রুবা তো এখনো ফিরল না। বলে গিয়েছিল চারটার সময় ফিরবে।'

ইলা হাই তুলতে তুলতে বলল, 'পিকনিক–টিকনিকে গেলে খানিকটা দেরি হয়। এসে যাবে।'

'তোর দুশ্চিন্তা লাগছে না?'

'না।'

ইলা চুল আঁচড়াল। শাড়ি ঠিকঠাক করে, হ্যান্ডব্যাগ হাতে নিয়ে বলল, 'যাই মা।'

'চলে যাচ্ছিস?'

'হুঁ।'

'তুই না বলেছিলি থাকবি।'

'থাকব না। ভালো লাগছে না। জামান সাহেব যদি কোনো কারণে আজ আগেভাগে এসে পড়েন তালাবন্ধ বাসা দেখে কী করবেন কিছুই বলা যায় না। আমাকে হয়তো কেটে কুচিকুচি করে তেল–মসলা দিয়ে রান্না করে খেয়ে ফেলবেন।'

সুরমা স্তম্ভিত গলায় বললেন, 'তোর কি মাথাটাথা খারাপ হয়ে গেছে?'

ইলা হাসল। সুন্দর করে হাসল। সেই হাসি দেখে সুরমা ভরসা পেলেন। আদুরে গলায় বললেন, 'থেকে যা–না। রাতে বাবু ফিরলে তোকে পৌঁছে দিয়ে আসবে। জামাইকে বুঝিয়ে বলবে।'

'বুঝিয়ে কী বলবে?'

'বলবে — রুবা বাসায় ফিরছিল না, আমি ভয়ে অস্থির হয়ে কান্নাকাটি করছিলাম। আমাকে সামাল দেবার জন্যে তুই থেকে গেছিস। তুই থাকতে চাচ্ছিলি না — আমিই জোর করে রেখে দিয়েছি...'

'মা তুমি তো খুব গুছিয়ে মিথ্যা কথা বলতে পার!'

সুরমার মুখ কালো হয়ে গেল। ইলা বলল, 'মা আমি যাচ্ছি। রুবাকে নিয়ে কোনো দুশ্চিন্তা করবে না। ও আমার মতো বোকা মেয়ে না — ধর, যদি লঞ্চ ডুবেই যায়, সে ঠিক সাঁতরে পারে উঠে আসবে। সে সাঁতার জানে না। তারপরেও কোনো না কোনোভাবে ঠিকই ম্যানেজ করবে।'

সুরমা বললেন, 'আমার উপর তোর এত রাগ কেন রে ইলা?'

'তোমার উপর আমার এত রাগ কেন তা তুমি ভালো করেই জান মা।'

'আমি যা করেছি, তোর ভালোর জন্যেই করেছি।'

'ভালোর জন্যে করেছ?'

'হ্যাঁ। আজ তুই বুঝতে পারছিস না। একদিন বুঝতে পারবি।'

'সেই এক দিনটা কবে?'

'যেদিন তোর বড় মেয়ের বিয়ের বয়স হবে, সেদিন। আজ আমি যা করেছি সেদিন তুইও ঠিক তাই করবি।'

ইলা আবার হাসল। সুরমা এগিয়ে এসে মেয়ের হাত ধরলেন। ইলা বলল, 'হাত ছাড় মা। মসলা পিষে পিষে তোমার হাতে কড়া পড়ে গেছে। আমার ব্যথা লাগছে।' সুরমা হাত ছাড়লেন না। কোমল গলায় বললেন — 'বোস। একটু বোস। কেতলি চুলায় দিয়ে এসেছি। পানি ফুটছে। চা খেয়ে যা। তোর সঙ্গে খাব বলে আমিও চা খাই নি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ঠিক আছে মা, বসছি। যাও, চা বানিয়ে আন।'

চা বানাতে বানাতে সুরমা ঠিক করে ফেললেন — ইলাকে গুছিয়ে কথাগুলো কী করে বলবেন। অসংখ্যবার তিনি নিজের মনে কথাগুলো গুছিয়ে রেখেছেন। কখনো বলতে পারেন নি। আজ হয়তো বলতে পারবেন।

এক বিশেষ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। তিনি মা হিসেবে সেই পরিস্থিতি সামাল দিয়েছেন। তিনি যেভাবে পরিস্থিতি সামলেছেন — অন্য মায়েরাও ঠিক একইভাবে পরিস্থিতি সামলাবেন। তিনি কোনো ভুল করেন নি। এই ব্যাপারটা ইলাকে বোঝাতে হবে। ইলা অবুঝ নয়। সে বুঝবে।

ব্যাপারটা শুরু হয় এইভাবে। তিনি বছর দুই আগে ভয়ংকর আতংক নিয়ে লক্ষ করেন নাসিম এ বাড়িতে এলেই তার বড় মেয়ের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ফেল করা আই. এ. পাস এক ছেলে। যারা বাবা মোটর মেকানিক। কিছুদিন পরপর বিয়ে করা যার প্রধান হবিগুলোর একটি। যার সর্বশেষ বিয়েটি হল জনৈক রিকশাওয়ালার চৌদ্দ বছরের সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে। ইলার রুচি এত নিচে কী করে নামে তিনি ভেবে পান না। তাঁর এম. এ. ক্লাসে পড়া মেয়ে কেন নাসিম নামের রাস্তার একটা ছেলের গলার স্বর শুনলে আনন্দে ঝলমল করে ওঠে? কী আছে এই ছেলের? যেমন তার ভাঁড়ের মতো চেহারা ঠিক তেমনি ভাঁড়ের মতো আচার-আচরণ। হো-হো করে হাসা ছাড়া এই ছেলে আর কী পারে! তার কোন্ কাজটা স্বাভাবিক? একদিন সন্ধ্যায় রিকশায় করে একটা সুটকেস, একটা ট্রাংক নিয়ে উপস্থিত। দাঁত বের করে বলল, 'কয়েকটা দিনের জন্যে আশ্রয় দিতে হয় খালা। বাবা বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে। ভদ্রভাবে বের করে নি, স্পঞ্জপেটা করেছে।

রুবা বলল, 'স্পঞ্জপেটাটি কী?'

'জুতাপেটার চেয়েও নিম্নমানের। স্পঞ্জ স্যান্ডেল নিয়ে তাড়া করেছে।'

'কেন?'

'কে জানে কেন? রাত বারটার সময় মদফদ খেয়ে বাসায় ফিরেছে। ঐ জিনিস খেলে পিতাজীর মেজাজ থাকে খারাপ। নতুন মার সঙ্গে বোধহয় হয়েছে গণ্ডগোল। রাগ ঝাড়বার লোক পায় নি। আমাকে পেরেছে। স্পঞ্জের স্যান্ডেল নিয়ে তাড়া করেছে। হা-হা-হা।'

সুরমা বললেন, 'হাসছ কেন? এর মধ্যে হাসির কি আছে?'

'ব্যাপারটা খুবই হাসির ছিল খালা। আপনি দেখেন নি তো, তাই বুঝতে পারেন নি। দেখলে বুঝতেন। বাবা আমার পিছনে পিছনে ছুটছে। ভয় পেয়ে আমার ছয় বোন ছুটছে ছদিকে। নতুন মা ছুটছে আরেক দিকে। ভয়াবহ অবস্থা! এর মধ্যে আমার নতুন মা আবার আছাড় খেয়ে পড়ে গেল। নতুন মার অবস্থা দেখে বাবার মন দুঃখে নরম হয়ে গেল। স্যান্ডেল হাতে মার দিকে ছুটে গেলেন। কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন — ব্যথা লাগছে ময়না?'

গল্প শুনে সুরমার রাগে গা জ্বলে যাচ্ছিল আর হেসে ভেঙে পড়ছে তাঁর বড় মেয়ে! তার এত আনন্দ?

ইলা বলল, 'নাসিম ভাই, তুমি আমাদের সঙ্গে কতদিন থাকবে?'

'যতদিন থাকতে দিস ততদিন।'

'সারাজীবন থাকতে হবে। আমরা তোমাকে যেতে দেব না।'

ইলার কথা শুনে সুরমার গা হিম হয়ে গিয়েছিল। মেয়ে কি বুঝতে পারছে সে কী সর্বনাশা কথাবার্তা বলছে? এই বুদ্ধি কি মেয়ের আছে? মেয়ের যে এই বুদ্ধি নেই তা পুরোপুরি বুঝতে তাঁর দেরি হল না। তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন ইলার বিয়ে নিয়ে। যাকে পান তাকেই বলেন। অনেকে আগ্রহী হয়ে আসে। মেয়ে দেখে খুশি হয়। খুশি না হবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনো কারণ নেই। কথাবার্তা অনেকদূর এগিয়ে ভেঙে যায়। আজকাল শুধু রূপে বিয়ে হয় না। রূপের সঙ্গে আরো অনেক কিছু লাগে। সেই অনেক কিছু তাঁর নেই। তিনি লক্ষ করেন যতবার বিয়ে ভাঙে ততবারই আনন্দের আভা দেখা যায় ইলার চোখেমুখে। যেন খুব সুখের কোনো ঘটনা ঘটেছে। সুরমা নিজেকে বুঝিয়েছেন — এটা আর কিছুই না — ভান। মেয়ে অভিনয় করছে। বিয়ে ভেঙে যাওয়া যে কোনো মেয়ের জন্যেই ভয়াবহ অপমানের ঘটনা।

সুরমার ধারণা যে ঠিক না তার প্রমাণ পেলেন এক রাতে। খুব বৃষ্টি হচ্ছিল। দরজা-জানালা বন্ধ করে শুয়েছেন। শরীর ভালো না। গভীর রাতে দরজায় ধাক্কা পড়ল। ইলা চাপা গলায় ডাকল, 'মা। একটু দরজা খোল।'

তিনি বিস্মিত হয়ে বিছানা ছেড়ে নামলেন। বাতি জ্বালালেন, দরজা খুললেন। ইলা দাঁড়িয়ে আছে। তাঁর এতদিনের চেনা মেয়েকে তিনি চিনতে পারছেন না। যেন অন্য কোনো মেয়ে। দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে অদ্ভুত ভঙ্গিতে। থরথর করে কাঁপছে। তিনি বললেন, 'কী হয়েছে রে?'

'তোমার সঙ্গে কথা বলব।'

'আয় ভেতরে আয়। তোর কি শরীর খারাপ?'

'না। শরীর খারাপ না, শরীর ভালো। বাতি নেভাও মা।'

'বাতি নেভাতে হবে কেন?'

'আলো জ্বালা থাকলে কথা বলতে পারব না।'

সুরমার বুক ধড়ফড় করতে লাগল। ইলা কী বলবে তিনি বুঝতে পারছেন। সেই কথা শোনার মতো সাহস তাঁর নেই।

'বল কী বলবি।'

'আমার বিয়ে নিয়ে তুমি যে চারদিকে ছোটাছুটি করছ তার দরকার নেই মা।'

'দরকার নেই কেন?'

'আমি আমার নিজের পছন্দমতো একটা ছেলেকে বিয়ে করব।'

'আছে এ রকম কেউ?'

ইলা জবাব দিল না। সুরমা ইলার ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ শুনলেন। তিনি শান্ত গলায় বললেন, 'সেই ছেলেটা কি নাসিম?' ইলার কান্নার শব্দ বাড়ল। এবারো জবাব দিল না।

সুরমা বললেন, 'তুই যে নাসিমকে বিয়ে করতে চাস তা কি সে জানে?'

'না, জানে না।'

'কিছুই জানে না?'

'না।'

'তুই তাকে চিঠিফিঠি কিছু দিয়েছিস?'

'না।'

'আমার গা ছুঁয়ে বল।'

'গা ছুঁয়ে কিছু বলতে হবে না মা। নাসিম ভাই কিছুই জানে না।'

'তুই শুয়ে থাক বিছানায়, আমি তোর গায়ে হাত বুলিয়ে দি।'

ইলা বাধ্য মেয়ের মতো শুয়ে পড়ল। তিনি মেয়ের গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে ক্ষীণ গলায় বললেন, 'তুই আমাকে বললি কেন? তুই নিজে কেন তোর কথা তাকে বললি না।'

'আমার লজ্জা লাগল। আমার মনে হচ্ছিল — আমার কথা শুনে উনি হো-হো করে হেসে ফেলবেন। সবার সামনে আমাকে ক্ষ্যাপাবেন।'

ইলা ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে লাগল। সুরমা বললেন, 'কাঁদিস না — যা বলার আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলব।'

'কবে বলবে?'

'কালই বলব।'

'নাসিম ভাইকে বলবে?'

'না, তাকে প্রথমে বলব না। আগে তার বাবার সঙ্গে কথা বলব। তুই কাঁদিস না।'

ইলা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, 'তার বাবার সঙ্গে কথা বলতে হবে না। তুমি তাকেই বল।'

'আচ্ছা বলব। নাসিমকেই বলব।'

'তুমি এত ভালো কেন মা?'

মা হিসেবে যা করার তিনি করেছেন। ইলার মাথা থেকে ভূত দূর করেছেন। তিনি যা করেছেন, যে কোনো মা তাই করবেন। তিনি তাঁর মেয়ের সাময়িক আবেগের দিকে তাকান নি। মেয়ের ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়েছেন। তাঁর সূক্ষ্ম কৌশল মেয়ে ধরতে পারে নি। জামানের সঙ্গে বিয়ে ঠিকঠাক হবার পর সে আপত্তি করে নি। বিয়ে করেছে।

এখন মনে হচ্ছে ইলা তাঁর সূক্ষ্ম চাল ধরে ফেলেছে। ধরে ফেলারই কথা। ইলা বোকা মেয়ে নয়। বুদ্ধিমতী মেয়ে। সে এখন যে কষ্ট পাচ্ছে তা সাময়িক কষ্ট। স্বামীর সংসারে এক সময় মন বসে যাবে। ছেলেমেয়ে হবে। পুরানো কথা কিছুই মনে থাকবে না।

সুরমা যে কাজটি করেছিলেন তাঁর জন্যে তাঁর মনে কোনো অপরাধবোধও নেই। তিনি এমন কোনো অন্যায় করেন নি। এক সন্ধ্যায় নাসিমকে গোপনে ডেকে এনে বলেছিলেন — 'বাবা তোমার কাছে আমি একটা অনুরোধ করব। তুমি কি রাখবে?'

নাসিম হকচকিয়ে গিয়ে বলেছে — 'অবশ্যই রাখব খালা। আপনি একটা কথা বলবেন আমি রাখব না তা কী করে হয়!'

'আমি তোমার কাছে হাতজোড় করছি বাবা।'

'ছিঃ ছিঃ খালা — কী করছেন আপনি!'

নাসিম এসে তাঁর পা ছুঁয়ে সালাম করল। সুরমা বললেন, 'তুমি কি ইলাকে ডেকে একটু বলবে যে তুমি তাকে ছোটবোনের মতো দেখ।'

'তাই তো দেখি খালা।'

'আমি জানি বলেই বলছি। তুমি তাকে বল — ইলাকে তুমি ছোটবোনের মতোই স্নেহ কর। তুমি চাও তার একটা ভালো বিয়ে হোক।'

'তা তো খালা আমি সব সময় চাই। এ রকম ভালো একটা মেয়ে তার একটা ভালো বিয়ে তো হতেই হবে। ইলার মতো সুন্দর মেয়ে এই পৃথিবীতে খুব কম আছে। চার-পাঁচটার বেশি না।'

'তাহলে বাবা তুমি ইলাকে একটু বল।'

'এটা বলার দরকার কী?'

সুরমা খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বললেন, 'বলার দরকার আছে। তার ধারণা তুমি তাকে অন্য চোখে দেখ। এই ভেবে সে হয়তো মনে কষ্ট পায়।'

নাসিম ফ্যাকাসে হয়ে গেল। সুরমা বললেন, 'এইসব কথা তাকে বলার দরকার নেই। তুমি শুধু বল যে তুমি তাকে ছোটবোনের মতো দেখ।'

'খালা আমি আজই বলব। ইলা গেছে কোথায়?'

'বাবুর সঙ্গে কোথায় যেন গেছে। তিন ভাইবোন মিলে গেছে। তুমি বরং চলে যাও। অন্য একদিন এসে বলো।'

'জ্বি আচ্ছা।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আর শোন বাবা। তুমি নিজেও এখন একটা বিয়ে-টিয়ে কর। আমরা দেখি।'

'করব খালা। একটু সামলে-সুমলে উঠি, তারপর। খালা আজ যাই।'

সুরমা যা করেছেন নিজের মেয়ের ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়েই করেছেন। আজ সে তা বুঝতে পারছে না। একদিন পারবে। আজ সে তার মাকে ক্ষমা করতে পারছে না। একদিন অবশ্যই পারবে।

সুরমা চা নিয়ে ঘরে ঢুকে দেখেন ইলা চলে গেছে। কিছু বলেও যায় নি। তিনি চায়ের কাপ হাতে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। রুবা রিকশা করে ফিরছে। মাকে দেখে সে খুব হাত নাড়ছে। রুবার হাতে লাল রঙের বিরাট একটা বেলুন।

ইলাদের বাসার সামনে রাস্তাটা আজ অন্ধকার। আবারো বোধহয় ঢিল ছুঁড়ে স্ট্রিট ল্যাম্প ভাঙা হয়েছে। আকাশ মেঘলা বলেই চারদিক অন্ধকার। রিকশা থেকে নেমেই ইলা তাদের ফ্ল্যাটের দিকে তাকাল। ফ্ল্যাটের সবগুলো বাতি জ্বলছে। ইলার বুক ধকধক করা শুরু হয়েছে। ফ্ল্যাটের সব আলো জ্বলার অর্থ একটাই — জামান আজ সকাল সকাল ফিরেছে। তার কাছে চাবি আছে, ঘরে ঢুকেছে তালা খুলে। কতক্ষণ আগে সে এসেছে জানতে পারলে ভালো হত। হাসানকে জিজ্ঞেস করে গেলে হয়।

ইলা রিকশাভাড়া দিল। ভয়ে ভয়ে সে এগুচ্ছে। তার হাত-পা কাঁপছে। এটা নিশ্চয়ই ভয়ংকর কোনো অসুখের পূর্বলক্ষণ। নয়তো সে এত ভয় পাবে কেন?

'ভাবী?'

ইলা চমকে উঠল। সিঁড়ির মুখে অন্ধকারে মিশে হাসান দাঁড়িয়ে আছে। নীল শার্টের ছেঁড়াটা হাত দিয়ে ঢেকে রেখেছে। বেচারার জন্যে শার্টটা কেনা হয় নি। কাল একবার যেতে হবে।

'ভাবী, একটা খারাপ খবর আছে।'

ইলা দাঁড়িয়ে আছে। হাসান তাকে কি খারাপ খবর দিতে পারে সে বুঝতে পারছে না।

'কী খবর?'

'অন্তুর শরীর খুবই খারাপ।'

'সে কী?'

'ডাক্তার বলছেন — বাঁচবে না। ঠোঁটের ঘা থেকে নানান সব সমস্যা হয়েছে। আজ বিকেলে দেখতে গিয়েছিলাম। আমাকে চিনতে পারল না। শ্বাসকষ্ট হচ্ছে।'

'কী বলছ এসব?'

'ভাবী আমার মনটা খুব খারাপ হয়েছে। ছেলেটা এদিক-ওদিক কাকে যেন শুধু খোঁজে। বোধহয় আপনাকে খোঁজে। আপনি কি যাবেন?'

'হ্যাঁ যাব।'

'ভাইজান এসেছেন। ভাইজানকে বললাম, উনি চান না যে আপনি যান।'

'তুমি এখানে থাক, আমি তোমার ভাইজানের সঙ্গে কথা বলে আসি।'

দরজা খোলাই ছিল। ইলা ঘরে ঢুকে দেখে জামান চা খাচ্ছে। নিজেই বানিয়েছে। শুধু চা না। পিরিচে বিসকিট আছে। ইলা সহজ গলায় বলল, 'কখন এসেছ?'

জামান চা খেতে খেতে বলল, 'দুপুরে।'

ইলা নিজ থেকেই বলল, 'আজ দুপুরে চলে আসবে তা তো বলে যাও নি। বলে গেলে ঘরে থাকতাম। দুপুরে খেয়েছ?'

'হুঁ।'

'কোথায় খেয়েছ? বাসায়, না বাইরে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বাইরে।'

'ঘরে খাবার তৈরি ছিল। ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলাম।'

জামান কিছু বলল না। সে নিঃশব্দে চা খাচ্ছে। সে যে ইলার উপর খুব রেগে আছে তা মনে হচ্ছে না। ইলা বলল, 'অন্তুর শরীর খুব খারাপ তা কি তোমাকে হাসান বলেছে।'

'হ্যাঁ বলেছে।'

'আমি ওকে একটু দেখে আসব। হাসান নিচে আছে, ও আমাকে নিয়ে যাবে।'

'বস আমার সামনে।'

ইলা বসল। জামান চায়ের কাপ নামিয়ে শান্ত গলায় বলল, 'দেখতে যাবার কোনো দরকার নেই। যদি সত্যি সত্যি মরে যায় নানান যন্ত্রণা হবে। ডেডবডি নিয়ে সমস্যা হবে। পত্রপত্রিকায় লেখা হবে। কী দরকার।'

'আমি বাচ্চাটাকে দেখতে যাব না?'

'না। খাল কেটে কুমির আনতে হবে না।'

ইলা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। জামান তার বিস্মিত দৃষ্টি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বলল, 'আর তুমি যদি মনে কর আমার চড় খেয়ে অন্তু মারা যাচ্ছে সেটাও ভুল কথা। চড় তাকে ঠিকই মেরেছিলাম। পড়ে গিয়ে ঠোঁট কেটে ফেলেছে সেটাও সত্যি। সামান্য ঠোঁট কাটা থেকে কেউ মরে যায় না। নানান অসুখ-বিসুখ এই ছেলের আগেই ছিল।'

'তোমার এতটুকুও খারাপ লাগছে না?'

'লাগবে না কেন, লাগছে। খারাপ লাগাটাকে প্রশ্রয় দিচ্ছি না। প্রশ্রয় দিলে যে যন্ত্রণা হবে তা সামাল দেয়া যাবে না। পেছনের ফ্ল্যাটের ব্যাপারটাই ধর। তিনটা ছেলে ঐ বাড়িতে ঢুকল। ছেলে তিনটাকে সবাই চেনে। কেউ কি বলেছে তাদের কথা? কেউ বলে নি। বলবেও না।'

'তুমি কী বলছ কিছু বুঝতে পারছি না। ছেলে তিনটাকে সবাই চেনে মানে কী?'

'সবাই চেনে মানে সবাই চেনে। পালের গোদা আমাদের বাড়িওয়ালার ছেলে।'

'তোমাকে কে বলেছে?'

জামান সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, 'আমি জানি। আমার কথা বিশ্বাস না হলে হাসানকে জিজ্ঞেস কর। জিজ্ঞেস না করাই ভালো। আমরা খোঁজখবর করছি, এটা প্রচার হলেও অসুবিধা। আসল কথা হচ্ছে — চুপচাপ থাকতে হবে। সব সময় পর্দার আড়ালে থাকতে হবে। কেউ যেন কিছু বুঝতে না পারে। অন্তুর মরে যাওয়াটা দুঃখের ব্যাপার, কিন্তু আগ বাড়িয়ে ভালবাসা দেখাতে গেলে হবে ভয়াবহ ব্যাপার।'

'তুমি আমাকে যেতে দেবে না?'

'না।'

'ঠিক আছে যাব না। আমি হাসানকে বলে আসি যে যেতে পারব না। ও গিয়ে দেখে আসুক।'

'তুমি থাক। আমি বলে আসছি — ওরও যাবার দরকার নেই।'

জামান শার্ট গায়ে দিয়ে নিচে নেমে গেল। ইলার নিজের শরীর খুব খারাপ লাগছে। গা গুলাচ্ছে। বমি আসছে। ইলা বেসিনের কাছে গিয়ে মুখ ভর্তি করে বমি করল।

জামান হাসানকে ডেকে রাস্তার কাছে নিয়ে গেছে। কথা বলছে নিচু গলায়।

'কেমন আছ হাসান?'

'জ্বি ভালো।'

'তুমি অন্তুর ব্যাপারে আর খোঁজখবর করবে না।'

'জ্বি আচ্ছা।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ছেলেটা মরে গেলে সবার যন্ত্রণা। তোমারও যন্ত্রণা।'

'জ্বি।'

'তুমি কি ইলার কাছে প্রায়ই যাও?'

'ভাবী ডাকলে যাই। টুকটাক কাজ করে দি।'

'এখন থেকে ডাকলেও যাবে না। ইলার এমন কিছু কাজ নেই যে তোমাকে করে দিতে হবে। যখন–তখন তার কাছে গেলে লোকজন নানান কথা বলতে পারে। টাকাটা রাখ, আমাকে এক প্যাকেট সিগারেট এনে দাও। ভাংতি ফেরত দেয়ার দরকার নেই।'

'জ্বি আচ্ছা।'

জামান দাঁড়িয়ে আছে। হাসান সিগারেট আনতে যাচ্ছে। হাঁটছে মাথা নিচু করে। জামানের মনে হল, এই ছেলের জন্মই হয়েছে মাথা নিচু করে থাকার জন্যে।

৭

বাবু দাড়ি শেভ করতে বসেছে।

ব্লেডটা পুরোনো ; কাজেই গালে সাবান লাগিয়ে বেশ কিছুক্ষণ বসে থাকতে হবে। দাড়িগুলোকে নরম হবার সময় দিতে হবে। সে তাই করছে। সাবান লাগিয়ে বসে আছে। রুবা দাঁত মাজতে মাজতে ভাইকে লক্ষ করছে।

'কতক্ষণ বসে থাকবে ভাইয়া?'

'এই কিছুক্ষণ। দাড়ি নরম হোক।'

'কী বিরাট যন্ত্রণা তোমাদের, তাই না ভাইয়া?'

'হুঁ।'

'বিশেষ করে তোমার মতো যাদের টাকা–পয়সা কম তাদের আরো বেশি যন্ত্রণা। এক ব্লেড যাদের এক মাস ব্যবহার করতে হয়।'

বাবু জবাব দিল না। আয়না হাঁটুর উপর রেখে ব্লেড হাতে নিল। রুবা তখন খুবই স্বাভাবিক ভঙ্গিতে নতুন কেনা ঝকঝকে শেভিং বাক্স তার সামনে এনে রাখল। বাবু অবাক হয়ে বলল, 'ব্যাপার কী? টাকা কোথায় পেলি?'

'যেখান থেকেই পাই তাতে তোমার কী। দাও ব্লেড ভরে দেই। জিনিসটা সুন্দর, না ভাইয়া? এই দেখ সঙ্গে ব্রাশও আছে।'

বাবু বিস্মিত হয়ে বলল, 'এ তো দামি জিনিস রে!

'হুঁ দামি। দু শ পঁচিশ টাকা পড়েছে।'

'বলিস কী!'

'আপা আমাকে কিছু টাকা দিয়েছে, ঐ টাকায় কিনলাম। হাঁ করে তাকিয়ে থাকবে না তো। দাড়ি কাটতে শুরু কর — আমি দেখি।'

'টাকা নষ্ট করলি? সংসারে দিলে কাজে লাগত। এতগুলো টাকা। এটা এখন ফেরত দিলে ফেরত নেবে না?'

'না নেবে না।'

'টাকাটা পানিতে ফেললি রুবা।'

'মোটেই পানিতে ফেলি নি। তুমি মুখটা ফেনায় ভর্তি কর তো ভাইয়া, আমি দেখি।'

বাবু লজ্জিত মুখে ব্রাশ ঘষছে। শেভ করতে তার কেন জানি লজ্জা লজ্জা লাগছে। রেজার টানতেই গাল খানিকটা কেটে গেল। ধবধবে সাদা ফেনায় লাল রক্ত। রুবা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাকিয়ে আছে। বাবু বিব্রত মুখে বলল, 'বড়লোকি জিনিসে অভ্যাস নেই। এই দেখ গাল কেটে ফেলেছি।'

রুবা ভাইয়ের পাশে বসল। গলা নিচু করে বলল, 'ভাইয়া, তুমি আপাকে একদিন গিয়ে দেখে আস না কেন? তাদের নতুন ফ্ল্যাটে তুমি একদিনও যাও নি।'

'ইলা কি কিছু বলেছে?'

'না বলে নি। আপা কোনোদিন কিছু বলবেও না। না গেলে কষ্ট পাবে — এই পর্যন্তই।'

'যাব। একদিন যাব। খালি হাতে তো যাওয়া যায় না। হাতেও টাকা-পয়সা নেই। এক সের মিষ্টি তো অন্তত নিয়ে যাওয়া উচিত।'

'এক সের মিষ্টির দাম আমি তোমাকে দেব।'

'বলিস কী!'

'আমার কাছে টাকা আছে। ইলা আপা পাঁচশ টাকা দিয়েছে।'

'এত টাকা সে পেল কোথায়?'

'দুলাভাই দিয়েছে। এছাড়া আর কোথায় পাবে?'

বাবুর গাল আবার খানিকটা কেটেছে। সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে। এতগুলো টাকা বোনকে দিয়ে দিল, জামান জানতে পারলে অশান্তি করবে। লোকটা টাকা-পয়সার ব্যাপারে খুব কৃপণ। জামানকে না জানিয়ে ইলার উচিত নয় এত টাকা এদিক-ওদিক করা। পাঁচশ টাকা অনেক টাকা, জামানের স্বভাব ভালো না। জামানের স্বভাব যে খারাপ তা বাবু ইলার বিয়ের এক সপ্তাহ পরই টের পেয়েছে। বোনকে দেখতে গিয়েছিল। ভেবেছিল যাবে আর দেখা করে চলে আসবে। ইলা কিছুতেই আসতে দেবে না। কেঁদে-টেঁদে এক কাণ্ড — খেয়ে আসতে হবে।

খাবার টেবিলে জামান বলল, 'ভাইসাহেব আপনার ব্যবসা কেমন চলছে?'

'চলছে। ক্যাপিটেলের অভাব। ক্যাপিটেল ছাড়া সবই আছে। ছোটখাটো একটা অর্ডার পেয়েছি। ক্যাপিটেল জোগাড় না হলে অর্ডার নিতে পারব না। হাজার দশেক টাকার মামলা।'

জামান সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'আমার হাত তো একদম খালি। আপনাকে তো দিতে পারব না।'

বাবু বিস্মিত হয়ে বলল, 'আপনি কেন দেবেন? আপনার কাছে তো টাকা চাই নি।'

'চাইতে হবে কেন? আমার তো নিজ থেকেই দেয়া উচিত। সম্ভব হচ্ছে না — হাত একেবারে খালি। ধার-দেনা করে বিয়ে।'

বাবুর গলায় খাবার আটকে যেতে লাগল। কিছুই মুখে রুচছে না। অল্প সময়ে প্রচুর আয়োজন করেছে ইলা। পোলাও করেছে। রোস্ট করেছে। না খেলে কষ্ট পাবে।

জামান বিরক্ত গলায় বলল, 'গরমের মধ্যে পোলাও কেন? প্লেন ভাত করতে পারলে না? আর তিন জন মানুষ আমরা, এত কী রান্না করেছ? পঞ্চাশজন লোক এ দিয়ে খাওয়ানো যায়। এমন অপচয় মানুষ করে?'

ইলা অসম্ভব লজ্জা পেয়েছিল। তার ফর্সা মুখ টকটকে লাল হয়ে গিয়েছিল। খাবার সময়টাতে সে আর সামনে থাকে নি। হয়তো বাথরুমে দরজা বন্ধ করে কেঁদেছে।

রুবা এখনো হাঁ করে বাবুর দাড়ি শেভ করা দেখছে। সে ব্যাপারটায় খুব মজা পাচ্ছে। বাবু বলল, 'ইলাকে কেমন দেখে এলি?'

'ভালোই দেখলাম।'

'কথায়-বার্তায় কি মনে হয় সে সুখী?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সুখী–অসুখী কি আর কথায়–বার্তায় বোঝা যায়?'

'তা ঠিক বোঝা যায় না। যেমন আমার কথাই ধর। আমাকে দেখে সবাই মনে করে অসুখী। আমি কিন্তু আসলে সুখী, বেশ সুখী।'

'তুমি এবং নাসিম ভাই তোমরা দুজনেই যে সুখী তা কিন্তু তোমাদের মুখ দেখে বোঝা যায়। শুধু সুখী না — মহা সুখী। তোমরা কি ঐ বিলটা পেয়েছ ভাইয়া?'

'না।'

'পাবে না?'

'বুঝতে পারছি না। নাসিম অবশ্যি আশা ছাড়ে নি। এখনো চেষ্টা করে যাচ্ছে। এখন চেষ্টা হচ্ছে আধ্যাত্মিক লাইনে। রোজ সন্ধ্যায় এক পীর সাহেবের পা জড়িয়ে ধরে বসে থাকে।'

বাবু শব্দ করে হেসে ফেলল। রুবাও হাসতে লাগল।

সুরমা রান্নাঘর থেকে অনেকক্ষণ থেকেই দেখছেন ভাইবোন বারান্দায় বসে গুনগুন করছে। হাসাহাসি করছে। দুজনের খুব খাতির। ইলা যখন আসে তখন তিন জন মিলে গুনগুন করে। তিনি কাছে গেলে তাদের গুনগুনানি থেমে যায়। তারা অবশ্যি বলে — 'এস মা। বস।' তিনি প্রায়ই বসেন — তখন তাদের কথাবার্তা আর জমে না। এদের সংসারে তিনি যেন আলাদা মানুষ।

আজো দুজন বসে গুনগুন করছে। তিনি পাশে গেলেই থেমে যাবে। সুরমা রান্নাঘর থেকে বের হয়ে এলেন। বিরক্ত গলায় বললেন — 'তোরা সারাদিন বারান্দায় বসে থাকবি? নাশতা নিয়ে বসে থাকা ছাড়া আমার অন্য কাজ নেই?'

রুবা বলল — 'তুমি যাও মা, আমরা আসছি।' সুরমা চলে এলেন। দুঃখে তাঁর চোখে পানি এসে যাচ্ছে। কী রকম কথা — তুমি যাও মা। তিনি যেন কাছেও থাকতে পারেন না। আশপাশে থাকলেও দোষ।

বাবুর গাল আরেক জায়গায় কেটেছে। রুবা বলল, 'গালটা কী অবস্থা করেছ ভাইয়া। মোরব্বা বানিয়ে ফেলছ।'

'তাই তো দেখছি। তোর এই জিনিস আমার পোষাচ্ছে না রে। আমাকে মনে হয় আগের জিনিসে ফিরে যেতে হবে। বরং একটা ক্ষুর কিনে নেব।'

'আমারও তাই মনে হচ্ছে ভাইয়া।'

এই বলেই রুবা হঠাৎ গলার স্বর পাল্টে বলল — 'আচ্ছা ভাইয়া, তুমি কি জান আপা নাসিম ভাইকে বিয়ে করতে চেয়েছিল?'

'জানি।'

'কীভাবে জান? কে বলেছে তোমাকে?'

'কেউ বলে নি। অনুমান করেছি।'

'আমি পুরো ব্যাপারটা জানি। আমারটা কিন্তু অনুমান না।'

রুবা গলার স্বর আরো নিচু করে বলল, 'যে রাতে আপা মাকে ঘুম থেকে তুলে বলল, আমি সেই রাতেই জানি। আমি আসলে একজন স্পাই টাইপের মেয়ে। মাঝরাতে আপা বিছানা ছেড়ে উঠে গেল। আমি তার পেছনে পেছনে চুপি চুপি বিছানা ছেড়ে উঠলাম। আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনলাম কথাবার্তা।'

'কাজটা কি ঠিক হল রুবা?'

'ঠিক হয় নি। আমি তো ভাইয়া তোমার বা আপার মতো ভালোমানুষ না। আমি খারাপ মানুষ। কে কী করছে, কে কী ভাবছে — এইসব আমি ধরতে চেষ্টা করি।'

'আর করিস না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আচ্ছা আর করব না।'

রুবা ছোট্ট নিশ্বাস ফেলে বলল, 'আপার সঙ্গে নাসিম ভাইয়ের বিয়ে হলে খুব চমৎকার হত। মানুষ হিসেবে দুজনই অসাধারণ। আমি আমার জীবনে আপার মতো ভালো মেয়ে যেমন দেখি নি, নাসিম ভাইয়ের মতো ভালো ছেলেও দেখি নি। এই দুজন মানুষকে যে আমি কী পছন্দ করি তা তোমরা বুঝতেও পারবে না। ঐদিন কথায় কথায় নাসিম ভাই বলল, একটা মেয়েকে তার খুব ভালো লেগেছে — শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখে পানি এসে গেছে।'

বাবু দাড়ি শেভ করা বন্ধ করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। রুবা ভাইয়ের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে শান্ত গলায় বলল, 'তুমি কেন এ রকম করে তাকিয়ে আছ তা আমি বুঝতে পারছি ভাইয়া। তুমি যা ভাবছ তা কিন্তু না।'

'আমি কী ভাবছি?'

'তুমি ভাবছ — রুবারও কি ইলার মতো সমস্যা হল? না, তা হয় নি।'

'শুনে ভালো লাগল।'

বাবু হাসল। রুবাও হাসল।

সুরমা আবার বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। লক্ষ করলেন তাঁকে দেখেই দুই ভাইবোন হাসি বন্ধ করে দিয়েছে। কেন তারা এ রকম করে! তারা মনে করার চেষ্টা করে না — তাদের বাবা মারা যাবার পর এই সংসার তিনি একা টেনে তুলেছেন। প্রাণপণে চেষ্টা করেছেন বাবার অভাব যেন এরা বুঝতে না পারে।

এক সময় ছেলেমেয়ের কাছে তাঁর প্রয়োজন ছিল। আজ নেই। আজ তিনি এদের বিরক্তির কারণ।

রুবা বলল, 'দাঁড়িয়ে আছ কেন মা? কিছু বলবে?'

'না।'

'তাহলে দয়া করে অন্য কোথাও যাও তো মা। তুমি যেভাবে আমাদের দিকে তাকাচ্ছ তাতে মনে হচ্ছে অভিশাপ দিচ্ছ।'

সুরমা ক্লান্ত গলায় বললেন, 'অভিশাপ দিচ্ছি না। আর অভিশাপ দিলেও — মার অভিশাপ ছেলেমেয়েদের স্পর্শ করে না।'

AMARBOI.COM

৮

কলিং বেল টিপে নাসিম অপেক্ষা করছে। তার হাতে কুড়িটা রজনীগন্ধার স্টিক। ফুলগুলো থেকে সে কোনো গন্ধ পাচ্ছে না। গন্ধহীন রজনীগন্ধা! তার কাছে মনে হচ্ছে — ফুলের মধ্যে কোনো ভেজাল আছে। সব কিছুতেই ভেজাল। এ বাড়ির কলিং বেলেও ভেজাল আছে মনে হয়। তিন বার টেপা হল। কেউ আসছে না। শব্দই হয়তো হচ্ছে না। দরজা ধাক্কাধাক্কি করাটা যুক্তিসঙ্গত নয়। এ বাড়িতে আজ নিয়ে তার দ্বিতীয় দফা আসা। প্রথমবার কাতল মাছ নিয়ে এসেছিল। আজ রজনীগন্ধা। নাসিম 'বিসমিল্লাহ্' বলে আরেকবার কলিং বেল টিপল। এবারে দরজা খুলল। বুড়ো একজন লোক দরজা খুললেন। সব বুড়ো মানুষ অসুখী অসুখী চেহারা করে রাখেন — এঁর চেহারা সুখী সুখী। চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। হাতে ইংরেজি গল্পের বই। মনে হচ্ছে জীবনের শেষ অংশটা তাঁর আনন্দে কাটছে।

'কাকে চান?'

'মিসেস মেহেরুন্নেসাকে একটু প্রয়োজন ছিল।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'মিসেস মেহেরুন্নেসাটা কে?'

'ডাকনাম সম্ভবত তুহিন।'

'তুহিন ডাকনামের কেউ এ বাড়িতে নেই।'

নাসিম ধাঁধায় পড়ে গেল। এর আগের বার তুহিন নামটা সে শুনেছে। ডাকনাম ঘনঘন বদলাবার নিয়ম আছে কি?

'আমি রহমান সাহেবের মেয়ের কাছে এসেছিলাম।'

'ও, মেজ বৌমা? মাহীনকে চাও?'

'জ্বি।'

'তুমি কে?'

'নাম বললে আমাকে উনি চিনবেন না। আমার নাম নাসিম। বন এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেড থেকে এসেছি।'

'তুমি বোস। বৌমা খোকাকে খাওয়াচ্ছে।'

'আমার কোনো তাড়াহুড়া নেই, আমি বসছি।'

বুড়ো ভদ্রলোক ভেতরে চলে গেলেন। নাসিম স্বস্তি পেল। মাহীনের আসতে দেরি হলেই ভালো। কিছুক্ষণ ঠাণ্ডামাথায় চিন্তা করার সুযোগ পাওয়া যাবে। কথাগুলো কীভাবে বলতে হবে প্র্যাকটিস করে নেয়া। প্রথম কথা যা বলবে তা হচ্ছে — আপা, আপনি কি আমাকে চিনতে পেরেছেন? আরেকদিন এসেছিলাম। আমি বন এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেডের নাসিম। আপনাকে একটা কার্ড দিয়ে গিয়েছিলাম। আমাদের একটা বিলের ব্যাপারে। বিলটা আপনার বাবার কাছে আটকে আছে। আপা, আপনার কি মনে পড়েছে? আপনি বলেছিলেন সব ঠিকঠাক করে দেবেন। খুব সমস্যার মধ্যে আছি। লোকজনদের কাছ থেকে ধার-টার নিয়ে কাজটা করেছি ; ওরা এখন আমাকে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবার মতলব করেছে। সবচে' বেশি সমস্যা করছে আমার নিজের বোন .....'

চিন্তার সময় তেমন পাওয়া গেল না। পর্দা ঠেলে মাহীন ঢুকল। নাসিমকে দেখে তার চোখমুখ শক্ত হয়ে গেল। নাসিম তার সাজিয়ে রাখা কথা একটাও বলতে পারল না। মাহীন তীক্ষ্ণ গলায় বলল, 'আপনার সাহস তো কম না। আপনি আবার এসেছেন?'

নাসিম হকচকিয়ে গেল। এ জাতীয় আক্রমণ তার কাছে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। মাহীন বলল, 'আপনার কথা শুনে ঐদিনই বাবার কাছে গিয়েছিলাম। বাবা আকাশ থেকে পড়েছেন। বাবা অনেক ঝামেলা করে আপনাদের কাজ পাইয়ে দিয়েছিলেন। আর এইভাবে তাঁর নামে আজেবাজে কথা ছড়িয়ে আপনি তার প্রতিদান দিচ্ছেন? এত সাহস আপনার?'

হৈচৈ শুনে বুড়ো ভদ্রলোক আবার ঢুকলেন। বিস্মিত হয়ে বললেন, 'কী হয়েছে বৌমা?' মাহীন কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, 'দেখুন না বাবা, এই লোক আমাকে অপমান করার চেষ্টা করছে। বাবার নামে আজেবাজে কথা আমার কাছে বলছে।'

বুড়ো তীক্ষ্ণ গলায় বলল — 'কী চাও হে ছোকরা? কী ভেবেছ? মতলবটা কী? পুলিশের কাছে হ্যান্ডওভার করে দেব? বৌমা, লালবাগ থানার নাম্বারটা কত বল তো।'

অতি দুঃখেও নাসিমের হাসি পেল। বুড়ো একজন মানুষের ভয় দেখানোর এ কী ছেলেমানুষি চেষ্টা — 'বৌমা, লালবাগ থানার নাম্বারটা কত বল তো?' ভাবটা এ রকম যে তাদের আদরের বৌমা অবসর সময়ে সব থানার নম্বর মুখস্থ করে বসে থাকে। এটাই হচ্ছে আদরের বৌমার হবি।

নাসিম মিষ্টি করে হাসল। হাসিতে যদি কাজ হয়। কাজ হল না। বুড়ো আরো রেগে গেল।

'ছোকরা, তোমার গায়ের চর্বি পানি বানিয়ে ছাড়ব। বৌমা, লালবাগ থানার ওসিকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টেলিফোনে ধর। বল — খায়রুল ইসলাম কথা বলবেন।'

নাসিম বলল, 'স্যার, আপনি বেশি রেগে গেছেন। এই বয়সে বেশি রেগে যাওয়াটা ঠিক হচ্ছে না। স্ট্রোক এখন ডালভাত হয়ে গেছে। বিশেষ করে আপনার মতো দুধ-ঘি খাওয়া মানুষদের জন্যে তো রাগ করা খুবই রিস্কি।'

'শাট আপ — ইউ স্কাউনড্রেল।'

'আমি তো 'শাট আপ' করেই আছি। চিৎকার যা করার তো আপনিই করছেন।'

'সান অব এ বিচ বলে কী? বৌমা, টেলিফোনটা দেখি।'

নাসিম হেসে ফেলল। হাসতে হাসতে বলল, 'মাহীন, তুমি বুড়োমিয়াকে টেলিফোনটা দাও। বুড়োমিয়া কোথায় টেলিফোন করতে চায় করুক। আর শুনুন বুড়ো মিয়া, আমি একা এখানে আসি নি। দলবল নিয়ে এসেছি। ওরা নিচে অপেক্ষা করছে। মালমসলা নিয়ে অপেক্ষা করছে। হৈচৈ শুনলে উপরে চলে আসতে পারে। উপরে চলে এলে আপনাদের সামান্য অসুবিধা হতে পারে।'

বুড়ো এবং তার বৌমা দুজনের মুখই শুকিয়ে গেল। নাসিম পকেট থেকে সিগারেট বের করতে করতে খুব স্বাভাবিক গলায় — যেন ঘরোয়া আলাপ করছে এমন ভঙ্গিতে বলল, 'মাহীন শোন, তোমাকে এবং তোমার বাবাকে আটচল্লিশ ঘণ্টা সময় দিলাম। এখন বাজে এগারটা পঁয়ত্রিশ। বুধবার এগারটা পঁয়ত্রিশের মধ্যে আমাদের অফিসে টাকা-পয়সা পৌঁছে দিতে হবে। এটা তুমি তোমার বাবাকে বলবে। আমি এমনিতে অত্যন্ত মধুর স্বভাবের মানুষ। আশা করি — ইতিমধ্যে তা বুঝতে পেরেছ। কিন্তু বুধবার এগারটা পঁয়ত্রিশের পর মধুর স্বভাব নাও থাকতে পারে। চলি, কেমন? বুড়ো মিয়া, চলি। আমার সঙ্গে তিনটা জর্দার কৌটা আছে। ব্যবহার করলাম না। যদিও আপনার ব্যবহারে বেশ বিরক্ত হয়েছি। আজকের মতো বিদায় হচ্ছি। ও মাহীন, ভালো কথা, এই রজনীগন্ধাগুলো তোমার জন্যে এনেছিলাম। রেখে দাও। এগুলো দেখতে আসলের মতো হলেও আসল না। গন্ধবিহীন রজনীগন্ধা। এর ডাঁটাগুলো তরকারি হিসেবে খাওয়া যায়। ঝাল-ঝাল করে রান্না করতে হবে। চেষ্টা করে দেখতে পার।'

নাসিম মুখ ভর্তি করে ধোঁয়া ছাড়ল। মধুর ভঙ্গিতে হেসে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে কয়েকবার শিস দেবারও চেষ্টা করল। পেছন থেকে কেউ কোনো শব্দ করল না।

নাসিম বলেছিল নিচে তার দলবল আছে। দলবল বলতে বাবু একা। সে রাস্তার পাশের চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে চিন্তিত মুখে চা খাচ্ছিল, নাসিমকে দেখে চায়ের কাপ রেখে এগিয়ে এল।

'কিছু হয়েছে?'

'না। ভয় দেখিয়ে এসেছি।'

'সে কী — কী ভয় দেখালি?'

'কোনো টেকনিকই যখন কাজ করছে না — ভয় টেকনিকটা ট্রাই করলাম।'

বাবু চিন্তিত মুখে বলল, 'আমার মনে হচ্ছে তুই একটা ঝামেলা বাধিয়েছিস। টাকা উদ্ধারের আমি কোনো আশা দেখছি না।'

'টাকা ঠিকই উদ্ধার হবে, যে অসুখের যে ওষুধ। বুধবারের আগেই দেখবি টাকা-পয়সা সব দিয়ে গেছে।'

'বুধবার কেন?'

'বুধবার পর্যন্ত ওদের সময় দিয়েছি। ফোর্টি এইট আওয়ারস টাইম। ধর, সিগারেট নে। তুই মুখ এমন শুকনো করে রেখেছিস কেন? ভয় পাচ্ছিস না-কি? ভয়ের কিছু নেই।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমার তো মনে হচ্ছে ভয়ের অনেক কিছুই আছে।'

'তোর মতো ভীতুর ডিম নিয়ে কাজ করা মুশকিল। অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে ভীতুদের কোনো স্থান নেই। বর্তমান কালটা হচ্ছে শক্তের। যে অন্যকে ভয় দেখাতে পারবে সেই টিকে থাকবে। অন্যরা পারবে না। তাদের স্থান হবে নর্দমায়।'

'কী বলে ওদের ভয় দেখালি?'

'কী কী বলেছি নিজেরও মনে নেই। তবে বুড়ো এক লোক ছিল — তাঁর আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেছে। হাত থেকে বই পড়ে গেছে। মনে হয় লুঙ্গিও ভিজিয়ে ফেলেছে — হা-হা-হা। হো-হো-হো।'

'তুই হাসছিস? আমার কিন্তু ভয় লাগছে।'

'ভয়ের কিছু নেই।'

'ভয়ের কিছু নেই' বাক্যটি বিকেল নাগাদ মিথ্যা প্রমাণিত হল। পুলিশ এসে বন এন্টারপ্রাইজেসের অফিস থেকে নাসিমকে ধরে নিয়ে গেল।

৯

হাসান খুব অবাক হয়ে লক্ষ করল, ইলা অন্তুর মৃত্যুসংবাদ খুব সহজভাবে গ্রহণ করেছে। তার মধ্যে কোনো রকম উত্তেজনা বা উচ্ছ্বাস দেখা যাচ্ছে না। হাসান ভেবেছিল ইলা জানতে চাইবে — কীভাবে মারা গেল? কখন মারা গেল? ইলা সেদিক দিয়ে গেল না। সে শুধু ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে রইল। জানতে চাইলে হাসান বিপদে পড়ত, কারণ সে নিজেও পুরোপুরি জানে না।

AMARBOI.COM

'ভাবী, ডেডবডি কি নিয়ে আসব?'

'না। তোমার ভাই চান না। তুমি তো এ বাসার ঠিকানা হাসপাতালে দিয়ে আস নি। তাই না?'

'জ্বি না, আমি ভর্তি করাবার সময় শুধু লিখেছিলাম, ঝিকাতলা, ঢাকা। ওর অবস্থা খারাপ ছিল। এত কিছু লেখার সময় ছিল না।'

'ঠিকানা না দিয়ে ভালোই করেছ। তোমার ভাই খুশি হয়েছে।'

'ডেডবডি কি হাসপাতালেই থাকবে?'

'থাকুক, তোমার ভাই বলেছে বেওয়ারিশ লাশের জন্যে ওদের অনেক ব্যবস্থা আছে।'

'ভাবী, আমি তাহলে যাই?'

'একটু দাঁড়াও। তোমার জন্যে আমি সামান্য একটা উপহার কিনেছি। দেখ তো তোমার পছন্দ হয় কিনা।'

ইলা শার্টের প্যাকেটটা হাসানের দিকে বাড়িয়ে দিল। হাসান অবাক হয়ে প্যাকেটটা নিল।

'আমি তো তোমার মাপ জানি না। অনুমানে কিনেছি। পরে দেখ হয় কিনা। না হলে বলবে, তোমাকে নিয়ে গিয়ে বদলে নিয়ে আসব।'

হাসান ধন্যবাদসূচক কিছু বলতে গেল, বলতে পারল না। সে কিছুই বুঝতে পারছে না। আজ এই চমৎকার মেয়েটা এমন আচরণ করছে কেন?

ইলাকে আজ তার কাছে লাগছেও অন্য রকম। মুখ ফোলা-ফোলা। চোখের নিচে কালি পড়েছে। হাসানের খুব ইচ্ছা করছে জিজ্ঞেস করে, আপনার কী হয়েছে? জিজ্ঞেস করতে পারছে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ভাবী যাই?'

'আচ্ছা যাও।'

হাসান গেল না। দাঁড়িয়ে রইল। ইলা বলল, 'কিছু বলবে হাসান?'

'জ্বি না।'

'আমি তোমার চাকরির কথা তোমার ভাইকে কিছু বলি নি। ওকে বললে কোনো লাভ হবে না। আমি অন্য একজনকে বলব। তাঁকে বললে কাজ হবে। যাকে বলব তাঁর ক্ষমতা খুবই সামান্য। তবু উনি কিছু-না-কিছু জোগাড় করে দেবেন।'

'কবে কথা বলবেন?'

'খুব শিগগিরই বলব।'

'আপনি বরং একটা চিঠি লিখে দিন। আমি হাতে হাতে দিয়ে আসব। আমি এখানে আর থাকতে পারছি না ভাবী।'

'আচ্ছা তুমি একটু ঘুরে আস। ঘণ্টাখানেক পরে খোঁজ নিও। লিখে রাখব।'

'জ্বি আচ্ছা।'

ইলা দরজা বন্ধ করল। সঙ্গে সঙ্গে চিঠি নিয়ে বসল না। চোখে-মুখে খানিকটা পানি দিল। রান্নাঘরে ঢুকে চায়ের পানি বসাল। চা খেতে ইচ্ছা করছে। চুলায় চায়ের পানি ফুটছে, সে গিয়ে অন্তুর বেতের সুটকেসটা খুলল। এই সুটকেসটা ইলার, সে অন্তুকে দিয়েছে। স্যুটকেস খুব সুন্দর করে গোছানো। যেসব জিনিস অন্তুর মনে ধরেছে সবই সে সুটকেসে তুলে রেখেছে। চায়ের একটা চামচ ভেঙে গিয়েছিল। চামচের সেই মাথা অতি যত্নে তুলে রাখা হয়েছে। জামানের জুতার ফিতা ছিঁড়ে গিয়েছিল। নতুন ফিতা কিনেছে। পুরোনো ফিতা ফেলে দিয়েছিল। সেই ফেলে দেয়া ফিতাও সুটকেসে রাখা আছে। ইলা যে পাঁচ টাকার নোটটা দিয়েছিল সেটা একটা খামে ভরা। ইলা তার একটা ছবিও খুঁজে পেল। ছবির অর্ধেকটা ছেঁড়া। তার এবং জামানের পাশাপাশি বসে তোলা বিয়ের সময়কার ছবি। কোত্থেকে অন্তু পেয়েছে কে জানে। ছবির একটি অংশ সে নষ্ট করে ফেলেছে — প্রিয় অংশটি রেখে দিয়েছে।

ছেলেটার নিশ্চয়ই বাবা আছে, মা আছে, ভাইবোন আছে। মরবার সময় তাকে মরতে হয়েছে একদল অপরিচিত মানুষের মধ্যে। ইলা পাশে থাকলে কী লাভ হত? সে কি বলতে পারত — অন্তুমিয়া শোন, এই পৃথিবী তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছে। এই কষ্ট তোমার প্রাপ্য ছিল না। আমি পৃথিবীর পক্ষ থেকে তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। নাও, তুমি আমাকে জড়িয়ে ধরে থাক। পৃথিবী ছেড়ে যাবার সময় অতি-প্রিয় একজন কাউকে জড়িয়ে ধরে থাকতে হয় —

ইলা সুটকেস বন্ধ করে উঠে গেল। চা বানাল। শান্ত ভঙ্গিতে চা খেয়ে চিঠি লিখতে বসল। সে অনেক দিন ভেবেছে — নাসিম ভাইকে একটা চিঠি লিখবে। একটিই চিঠি। প্রথম এবং শেষ। সেই চিঠিটি আজই লেখা হোক।

ইলা নিজের সুটকেস খুলল। এখানে চিঠি লেখার জন্যে খুব দামি কাগজ আছে, খাম আছে। কলম আছে। কোনোটাই কখনো ব্যবহার করা হয় নি। ইলা চিঠি শুরু করল খুব ঘরোয়া ভঙ্গিতে —

নাসিম ভাই,

আমার সালাম নিন। চিঠি দেখে নিশ্চয়ই অবাক হচ্ছেন। জরুরি কারণে লিখতে বাধ্য হচ্ছি —। যে ছেলেটা চিঠি নিয়ে আপনার কাছে যাচ্ছে, সে খুব সমস্যায় আছে। আপনি তার কোথাও থাকার ব্যবস্থা করে দেবেন। এবং কোনো একটা চাকরি-বাকরির ব্যবস্থা করে দেবেন। কীভাবে করবেন তা আমি জানি না। বুঝতে পারছি চিঠি এই পর্যন্ত পড়েই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপনি আমার উপর খুব রেগে গেছেন। চেঁচিয়ে বাবু ভাইকে বলছেন — ইলাটার যে মাথা খারাপ তা তো জানতাম না। আমার নিজের নেই ঠিক, আমি অন্যকে কী চাকরি দেব?

আমি জানি কিছু একটা ব্যবস্থা হবেই। তাছাড়া শুনলাম — আপনারা ভাতের হোটেল দিচ্ছেন। সেখানেও তার একটা ব্যবস্থা হতে পারে। সে না-হয় বাজার থেকে চাল কিনে আনবে — আপনারা দুই বন্ধু সেই চাল ফুটিয়ে ভাত করবেন — সেই ভাত বিক্রি হবে। আপনি নিশ্চয়ই রাগ করছেন। আমি ঠাট্টা করছি। আপনার সঙ্গে তো মুখোমুখি আমি কখনো ঠাট্টা করি না। আজ করলাম। তা ছাড়া — এমনিতে আপনাকে তুমি করে বলি — চিঠিতে আপনি লিখছি। প্রভেদটা কি আপনার চোখে পড়েছে?

নাসিম ভাই, আজ আমার খুব কষ্টের একটা দিন। আমার বাসার কাজের ছেলেটা মারা গেছে। ওর নাম অন্তু মিয়া। একদিন ভিক্ষা করতে এসেছিল, আমি ভাত-তরকারি খেতে দিয়ে বললাম, কাজ করবি অন্তু? সে হাসতে হাসতে বলল, 'জ্বে না।' খেয়ে-দেয়ে চলে গেল। সন্ধ্যাবেলা একটা মাদুর নিয়ে উপস্থিত। সে থাকবে। ছেলেটা হাসপাতালে মারা গেছে। আমি তাকে দেখতেও যাই নি। আপনি হলে কী করতেন আমি জানি। হাসপাতালে ছোটাছুটি করে হৈচৈ করে একটা কাণ্ড ঘটাতেন। মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার পর — শব্দ করে কাঁদতে শুরু করতেন। চারপাশে লোক জমে যেত।

ভাইয়া একবার খাঁচা ভর্তি মুনিয়া পাখি কিনে আনল। কয়েকদিন যেতেই একটা পাখি অসুস্থ হয়ে গেল। সে অন্য পাখিগুলো থেকে নিজেকে সরিয়ে নিল। তার পালক ফুলে গেল। সে একা একা মৃত্যুর জন্যে তৈরি হল। একটি পাখিও তাকে দেখতে আসে না। পাখিদের এই অদ্ভুত সাইকোলজিতে আমরা সবাই খুব মজা পেলাম। আপনাকে যখন বলা হল — আপনি মোটেই মজা পেলেন না। অসম্ভব দুঃখিত হলেন। অসুস্থ পাখিটাকে বাঁচাবার জন্যে আপনার সে কী চেষ্টা। দেশে পশু-ডাক্তার আছে, পাখি-ডাক্তার নেই বলে আপনার কী রাগারাগি। পাখিটা মারা গেল আপনার কোলে। আপনার চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি পড়তে লাগল। রেগে অস্থির হয়ে ভাইয়াকে বললেন — 'গাধা তোকে কে পাখি কিনে আনতে বলেছে?'

আপনি যে কী চমৎকার একজন মানুষ তা কি আপনি জানেন নাসিম ভাই? জানেন না। বাবু ভাইয়াও অসাধারণ একজন মানুষ। আপনাদের দুজনকে একসঙ্গে দেখলে আমার কী যে ভালো লাগে!

আমি খুব সাধারণ একটি মেয়ে বলেই অসাধারণ মানুষদের অবাক হয়ে দেখি। আমি আপনাকে অবাক হয়ে দেখতাম। অসাধারণ মানুষদের স্বপ্নগুলোও খুব অসাধারণ হয়। কিন্তু আশ্চর্য, আপনাদের দুজনের স্বপ্নগুলো খুবই সাধারণ। ভাতের হোটেল দেয়াতেই স্বপ্নের শেষ। অথচ আমি কত সাধারণ একটা মেয়ে, কিন্তু অসাধারণ আমার স্বপ্ন। স্বপ্নটা কী আপনাকে বলি। আমি শহর থেকে অনেক দূরে বিরাট জায়গা জুড়ে একটা বাগানবাড়ি করব। সেই বাড়িতে থাকবে অসংখ্য ঘর। কিন্তু মানুষ মাত্র দুজন। বাড়ির চারদিকে ঘন বন। পেছনে বিশাল এক পুকুর। পুকুর ভর্তি জলপদ্ম। জানি না জলপদ্মের ধারণা হঠাৎ কী করে আমার মাথায় এল। এমন না যে আমি খুব কাব্যিক স্বভাবের মানুষ। হয়তো ছোটবেলায় কোনো একটা গল্পের বইয়ে জলপদ্মের কথা পড়েছিলাম। কিংবা কে জানে, হয়তো বাবার কাছে জলপদ্মের গল্প শুনেছি। সেটাই মাথায় ঢুকে গেছে।

আপনার কি মনে আছে, আমি একদিন আপনাকে বললাম, 'নাসিম ভাই, আমাকে একদিন জলপদ্ম দেখিয়ে আনবে?' আপনি বিরক্ত হয়ে বললেন, 'জলপদ্ম আমি পাব কোথায়?'

'বলধা গার্ডেনের পুকুরে আছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমার খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, তোকে নিয়ে বলধা গার্ডেনে ঘুরে বেড়াব। যা ভাগ।'

আমি কিন্তু ঘ্যানঘ্যান করতেই থাকলাম। শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে আমাকে নিয়ে গেলেন। সেদিন বলধা গার্ডেন বন্ধ ছিল। আমরা ঢুকতে পারলাম না। আপনি বিরক্ত হয়ে বললেন, 'হল জলপদ্ম দেখা? চল এখন বাসায় ফিরি। দিনটা নষ্ট হল। এখন তো জায়গা চিনে গেলি। কাল একবার এসে দেখে যাস। ধর এই কুড়িটা টাকা রেখে দে — রিকশাভাড়া।'

নাসিম ভাই, জলপদ্ম আমার দেখা হয় নি। জলপদ্ম আমি আপনার সঙ্গে দেখতে চেয়েছিলাম। কিছু কিছু জিনিস আছে একা দেখা যায় না। দুজনে মিলে দেখতে হয়।

আজ আপনাকে এসব লেখা অর্থহীন। তবু লিখলাম। যদি অন্যায় করে থাকি ক্ষমা করবেন। আমি আমার জীবনে বলতে গেলে কোনো অন্যায়ই করি নি। একটা না হয় করলাম। তাতে ক্ষতি যদি কারো হয় — আপনার হবে। আপনার খানিকটা ক্ষতি হলে, হোক না।

আমার বিয়ের দিন আপনি যখন বরযাত্রী খাওয়ানো নিয়ে খুব ব্যস্ত তখন আমি রুবাকে দিয়ে আপনাকে ডেকে পাঠালাম। আমি সেজেগুজে খাটে বসে আছি। আপনি ঘরে ঢুকে আমাকে দেখে হকচকিয়ে গেলেন। নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'ডেকেছিস কেন?'

'বিয়ে হয়ে চলে যাচ্ছি — আর তো দেখা হবে না। সালাম করবার জন্যে ডাকলাম।'

আমি আপনার পা ছুঁয়ে সালাম করলাম। ঘর ভর্তি লোকজন। আপনি অপ্রস্তুত মুখে হাসছেন। আমি বললাম, 'নাসিম ভাই, তুমি এমন কাঠের মতো দাঁড়িয়ে আছ কেন? মাথায় হাত দিয়ে দোয়া কর। না-কি আমি এতই খারাপ মেয়ে যে আমার মাথায় হাত দেয়া যাবে না?'

আপনি আমার মাথায় হাত দিলেন। কী দোয়া করেছিলেন আপনি? প্রিয়জনদের দোয়া কখনো ব্যর্থ হয় না। এই পৃথিবীতে আপনার চেয়ে প্রিয়জন আমার কে আছে? আপনার দোয়া ব্যর্থ হল কেন বলুন তো?

দরজায় শব্দ হচ্ছে। ইলা দরজা খুলল। হাসান দাঁড়িয়ে আছে।

'চিঠিটা কি শেষ হয়েছে ভাবী?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে খামের উপর ঠিকানা লিখে দিন। আমি নিয়ে যাই।'

ইলা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'চিঠি দেব না। আমি মুখেই বলব। তুমি চিন্তা করো না। একটা ব্যবস্থা হবেই।'

'জ্বি আচ্ছা ভাবী।'

'আরেকটা কথা হাসান — আমাদের পেছনের বাড়ির ফ্ল্যাটে যে ছেলে তিনটা ঢুকেছিল — তাদের তুমি দেখেছ — তাই না?'

'জ্বি।'

'তাদের তুমি চেন। অন্তত একজনকে খুব ভালো করে চেন। চেন না?'

'জ্বি।'

'পুলিশকে বল নি কেন?'

'সাহস নাই ভাবী।'

ইলা কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, 'তোমাকে একটা মজার কথা বলি। ছেলে তিনটাকে আমিও দেখেছি। ঐদিন আমি পেছনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলাম। ওরাও আমাকে দেখেছে। ওরা ঐ বাড়ি থেকে কিছু নিয়ে যায় নি। ওদের সঙ্গে টেলিভিশন সেট ছিল না।'

'জ্বি ভাবী আমি জানি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আচ্ছা ঠিক আছে হাসান। তুমি যাও। আমার মাথা ধরেছে। — আমি শুয়ে থাকব।'

'আপনার কি শরীর খারাপ ভাবী?'

'একটু বোধহয় খারাপ।'

'ডাক্তার ডেকে আনব?'

'না, ডাক্তার লাগবে না।'

ইলা দরজা বন্ধ করে চিঠির কাছে ফিরে এল। কয়েকটা লাইন বাকি আছে। সেই বাকি লাইনগুলো লিখতে ইচ্ছা করছে না। তার খুব খারাপ লাগছে। চিঠি কুচিকুচি করে ছিঁড়ল। ছেঁড়া টুকরোগুলো নিজের সুটকেসে রেখে ঘুমাতে গেল।

দুপুরে রান্না হয় নি। রান্না করতে ইচ্ছা করছে না। জামান বলে গেছে—আজ দুপুরে বাসায় খাবে তবু রান্নাঘরে যেতে ইচ্ছা করছে না। শরীরটা এত খারাপ লাগছে কেন?

ইলার ঘুম ভাঙল কলিং বেলের শব্দে। একটানা বেল বেজেই যাচ্ছে। বেজেই যাচ্ছে। ইলা উঠে গিয়ে দরজা খুলল — জামান দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখ কঠিন। সে ইলার দিকে অদ্ভুত চোখে তাকাচ্ছে।

'অনেকক্ষণ ধরে বেল বাজাচ্ছি। কী করছিলে?'

'ঘুমাচ্ছিলাম।'

'দুপুরবেলা ঘুমাচ্ছ?'

'আমার শরীরটা ভালো না। আমি আজ কিছু রাঁধি নি। তুমি হোটেল থেকে কিছু খেয়ে এস।'

'তোমার ভাই এসেছিল আমার কাছে। আমার অফিসে।'

'ও।'

'কী জন্যে এসেছিল জিজ্ঞেস করলে না?'

'কী জন্যে?'

'দু হাজার টাকার জন্যে এসেছিল — পুলিশকে না-কি ঘুষ দিতে হবে। তার যে বন্ধ আছে নাসিম, বিজনেস পার্টনার, ওকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে। এখন আছে লালবাগ থানা হাজতে। টাকা আমি তাকে দেই নি, কারণ আমার ধারণা তার কাছে টাকা আছে। না থাকলে কিছুদিন পরপর বোনকে টাকা দেয় কী করে? ঠিক না ইলা?'

'হ্যাঁ ঠিক।'

'নিচে হাসানের সঙ্গে দেখা হল। গায়ে নতুন শার্ট। আমাকে দেখে খুব খুশি হয়ে বলল — তুমি কিনে দিয়েছ। শার্টটার কত দাম পড়ল?'

'তিন শ একুশ।'

'এ রকমই হবার কথা, বিদেশি জিনিস। ইলা, তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।'

'বল।'

'এখন না। এখন আমি বেরুব। জয়দেবপুর যাব। রাত এগারটার দিকে ফিরব। তখন কথা হবে।'

'আচ্ছা আমি হাসানকে বলব গেট খোলা রাখতে।'

'তুমি আমাকে বোকা ভাবলে কেন ইলা?'

'আমি কাউকে বোকা ভাবি না।'

'আমাকে ভেবেছ। তুমি ভেবেছ মানিব্যাগ চুরির ব্যাপারটা আমি কখনো ধরতে পারব না।'

দুজন তাকিয়ে আছে দুজনের দিকে। এক সময় জামান উঠে দাঁড়াল। **ইলা বলল**, 'আজ আমি যাত্রাবাড়িতে আমার মার কাছে যাব। আজ আমার বাবার মৃত্যুবার্ষিকী। আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফিরে আসব। রাত এগারটার আগে অবশ্যই ফিরে আসব।'

জামান বিচিত্র ভঙ্গিতে হাসল। জামানকে অবাক করে দিয়ে ইলাও তার দিকে তাকিয়ে হাসল। কেন জানি এই মানুষটাকে তার এখন আর ভয় করছে না।

১০

হাসান গেটের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। ইলাকে দেখে বলল, 'কোথায় যাচ্ছেন ভাবী?'

ইলা হাসল। হাসান বলল, 'রিকশা ডেকে দেই?'

'দাও। শার্টটায় তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে হাসান। খুব মানিয়েছে।'

হাসান মাটির দিকে তাকিয়ে হাসল। ইলা বলল, 'তুমি সব সময় এমন ছোট হয়ে থাক কেন?'

'ছোট মানুষ ভাবী। এই জন্যেই ছোট হয়ে থাকি।'

'বড় মানুষ হবার চেষ্টা করলে কেমন হয়?'

'কীভাবে হব?'

'চেষ্টা করলেই পারবে। তোমার মতো চমৎকার একটা ছেলে সারাজীবন মাথা নিচু করে থাকবে ভাবতেও খারাপ লাগে।'

'পরের আশ্রয়ে থাকি।'

'তা ঠিক। এই আমাকেই দেখ। পরের আশ্রয়ে আছি বলেই আমার নিজেরও মাথাটা নিচু। সারাক্ষণ ভয়ংকর আতংকের মধ্যে থাকি। সাহস গেছে নষ্ট হয়ে। এত বড় একটা ঘটনা আমি দেখলাম। ছেলে তিনটাকে বেরুতে দেখলাম — অথচ কাউকে কিছু বললাম না। ঠিক তোমার মতো অবস্থা। ঠিক না হাসান?'

হাসান কিছু বলল না। ইলা বলল, 'এই জায়গাটা কোন্ থানার আন্ডারে তুমি জান?'

'মোহাম্মদপুর থানা।'

'তুমি আমাকে একটা রিকশা ঠিক করে দাও। আমি প্রথম যাব মোহাম্মদপুর থানায়। আমি যা জানি ওদের বলব।'

'এতে লাভ কিছু হবে না ভাবী।'

'লাভ হোক না হোক, আমি বলব। অন্যের লাভের ব্যাপার না — আমার লাভ হবে। আমার সাহস নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। বলার সঙ্গে সঙ্গে সাহস ফিরে পাব। তুমি বোধহয় জান না হাসান, আমি সব সময় খুব সাহসী মেয়ে ছিলাম।'

হাসান একটা রিকশা এনে দিল।

ইলা রিকশায় উঠল। রিকশাওয়ালাকে বলল, 'হুড ফেলে দিন।'

'খুব রইদ আম্মা।'

'থাক রোদ। চারদিক দেখতে দেখতে যাই।'

ইলাকে অনেক জায়গায় যেতে হবে। প্রথমে যাবে মোহাম্মদপুর থানা, তারপর যাবে মার কাছে। মার সঙ্গে সে ঐদিন খুব খারাপ ব্যবহার করেছিল। আজ মাকে জড়িয়ে ধরে সে খানিকক্ষণ কাঁদবে। সেখান থেকে যাবে বি, করিম সাহেবের কাছে। সবশেষে যাবে লালবাগ থানায়। অনেক কাজ।

রিকশা এগুচ্ছে। নীল শার্ট পরা চমৎকার চেহারার একটা ছেলে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১১

বি, করিম সাহেব খুশি খুশি গলায় বললেন, 'আরে এস এস। তোমার নাম তো পরী, তাই না?' ইলা বি, করিম সাহেবকে বিস্মিত করে তাঁর পা ছুঁয়ে সালাম করে ফেলল। নিচু গলায় বলল, 'আমার নাম ইলা। শুধু বাবা আমাকে পরী ডাকতেন।'

'তোমাকে আমি মনে মনে খুঁজছিলাম। ঠিকানা রেখে যাও নি। ঠিকানা রেখে গেলে নিজেই যোগাযোগ করতাম। তোমার জন্যে সুসংবাদ আছে। মজিদ নতুন নায়িকা ট্রাই করতে রাজি হয়েছে। তার কাছে তোমাকে একদিন নিয়ে যাব। তবে তারও আগে তোমার একগাদা ছবি দরকার। ভালো ফটোগ্রাফার দিয়ে কিছু ছবি তোলাবে। আমি একজন ফটোগ্রাফারের নাম–ঠিকানা দিয়ে দেব। ওকে দিয়ে ছবি তোলাবে। ব্যাটা কাজ ভালো করে। তবে স্বভাব–চরিত্র খারাপ। ছবি তোলা শেষ হলেই ঘাড় ধরে বিদেয় করে দেবে।'

'নায়িকা হবার জন্যে আমি কিন্তু আপনার কাছে আসি নি। আমি আগেও আপনাকে বলেছি। আপনি বোধহয় আমার কথা মন দিয়ে শোনেন নি।'

'তাহলে আস কেন আমার কাছে?'

'এমনি আসি।'

'কোনো কারণ ছাড়াই আমার কাছে আস?'

'কারণ একটা আছে। তবে সেই কারণ আপনার কাছে বিশ্বাসযোগ্য হবে না।'

বি, করিম খানিকক্ষণ গম্ভীর ভঙ্গিতে বসে থেকে বললেন, 'আমি বাংলাদেশের ছবির স্ক্রিপ্ট লিখি। আমার কাছে সব কারণই বিশ্বাসযোগ্য। ব্যাপারটা কী বল।'

'ভেতরে এসে বলি?'

'এস, ভেতরে এস।'

ইলা ঘরে ঢুকল। আজকে ঘরদুয়ার অন্য দিনের মতো অগোছালো নয়। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ঘর ঝাঁট দেয়া হয়েছে। বইপত্র ছড়ানো–ছিটানো নয়। সাজানো। তবে মেঝেতে খবরের কাগজ বিছানো। একটা টিফিন ক্যারিয়ার, থালা, গ্লাস। ভদ্রলোক বোধহয় খেতে বসবেন।

'শোন পরী, আমি এখনো ভাত খাই নি। ভাত নিয়ে বসব। তোমার যা বলার তুমি চট করে বলে চলে যাও।'

ইলা হ্যান্ডব্যাগ খুলে একটা বি–টু সাইজের ছবি বের করে এগিয়ে দিল। নিচু গলায় বলল, 'ছবিটা দেখুন।'

করিম সাহেব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ ছবির দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'দেখলাম।'

'আপনার সঙ্গে এই ছবিটার মিল আছে না?'

'খানিকটা আছে। তবে এই ভদ্রলোকের চোখ বড় বড়। আমার চোখ ছোট। কার ছবি?'

'আমার বাবার ছবি।'

'ও।'

'বাবা যখন মারা যান তখন আমরা সবাই খুব ছোট। আমার ছোট বোনটার বয়স এক বছর, আমার চার বছর, আর আমার বড় ভাইয়ের বয়স সাত। আমার অবশ্যি বাবার চেহারা মনে আছে।'

'চার বছর বয়স হলে মনে থাকারই কথা।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইলা শান্ত গলায় বলল, 'মানুষের সঙ্গে মানুষের চেহারায় মিল থাকতেই পারে। এটা এমন কিছু না। এটাকে কোনো রকম গুরুত্ব দেয়া ঠিক না। তারপরেও আপনার কাছে আসতে আমার ভালো লাগে। আপনি বিরক্ত হন। ভাবেন কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে আসছি।'

'আর ভাবব না। তুমি বোস। তোমার মুখটা শুকনা লাগছে। তুমি কি দুপুরে কিছু খেয়েছ?'

'জ্বি না।'

'আমার সঙ্গে চারটা খাবে?'

ইলা কিছু বলল না। চুপ করে রইল। বি, করিম সাহেব বললেন, 'এস পরী হাত ধুয়ে আস। হোটেলের খাবার। ভালো হবে না। তবু খাও।'

ইলা হাত ধুয়ে খেতে বসল। করিম সাহেব খেতে খেতে কৌতূহলী হয়ে মেয়েটিকে দেখছেন। তাঁর নিজেরই খানিকটা অস্বস্তি বোধ হচ্ছে।

'পরী।'

'জ্বি।'

'তোমার যদি কখনো কোনো সমস্যা হয় আমাকে বলো। আমার ক্ষমতা এবং সামর্থ্য দুইই সীমিত। তবু আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করব।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'তোমার কি কোনো সমস্যা আছে?'

'আছে। আমার খুব আপন একজন মানুষ লালবাগ থানা হাজতে আটকা আছেন। আপনি তাঁকে ছাড়িয়ে আনতে পারবেন?'

'কোন্ অপরাধে তাকে ধরা হয়েছে সেটা না জানলে বলতে পারব না। টাকা-পয়সাও লাগবে। এদেশের পুলিশ টাকা ছাড়া কথা বলে না?'

'আমি টাকা নিয়ে এসেছি।'

ইলা করিম সাহেবকে একটা খাম বাড়িয়ে দিল। তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, 'এ তো অনেক টাকা!'

'জ্বি, অনেক টাকা।'

'কত আছে এখানে?'

'ছাপ্পান্ন হাজার ছিল। আমি কিছু খরচ করেছি — এখন কত আছে জানি না।'

করিম সাহেব সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, 'তুমি চাচ্ছ ওকে বের করে আনতে যে টাকা লাগে তা এখান থেকে দেব আর বাকি টাকাটা ওর হাতে দেব?'

'জ্বি।'

'তুমি চাচ্ছ না যে ব্যাপারটা কেউ জানুক?'

'আপনি ঠিকই ধরেছেন।'

'বেশ। করা হবে। ছেলের নাম দিয়ে যাও। ঠিকানা দাও।'

'খামের ভেতর একটা কাগজে লেখা আছে।'

'তুমি কি ওকে কোনো চিঠি দেবে?'

'জ্বি না।'

'তুমি নিজের পরিচয় গোপন রাখতে চাও?'

'জ্বি।'

ইলা বলল, 'আমি এখন উঠব।' সে কদমবুসি করবার জন্যে নিচু হল। বি, করিম সাহেব হাসিমুখে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। ভদ্রলোক চিরকুমার। সারাজীবন একা কাটিয়েছেন। তার জন্যে কোনো রকম অতৃপ্তি তিনি বোধ করেন নি। আজ করলেন। আজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হঠাৎ করে মনে হল — বিরাট ভুল হয়েছে। সংসার করলে হত। এই মেয়ের মতো একটা মেয়ে তাহলে তাঁর ও থাকত।

'চাচা যাই?'

করিম সাহেবের খুব ইচ্ছা করল বলেন—'আবার এস মা।' বলতে পারলেন না। দীর্ঘদিন 'মা' ডাকেন না। আজ হঠাৎ করে কাউকে 'মা' ডাকা সম্ভব না। তিনি কোমল গলায় বললেন, 'আবার এস।' ইলা বলল, 'আমি আর আপনাকে বিরক্ত করব না।'

১২

নাসিম কম্বলের উপর শুয়ে ছিল। হাজতে আরো কিছু কয়েদি আছে, তারা মেঝেতে গাদাগাদি করে বসা। কম্বলের বিশেষ ব্যবস্থা নাসিমের জন্যে। তাকে চেনার কোনো উপায় নেই — পুলিশের মারের কারণে মুখ ফুলে বীভৎস দেখাচ্ছে। সবচে' বেশি ফুলেছে নাক। মনে হচ্ছে নাকের হাড় ভেঙেছে। বাঁ চোখ বন্ধ হয়ে আছে। ডান চোখ অক্ষত, তবে লাল হয়ে আছে। পুলিশী মারের ধরন এমন হয় যে বাইরে থেকে কিছু বোঝা যায় না। নাসিমের বেলায় ব্যতিক্রম হয়েছে। মারের কারণেই অন্য হাজতীরা নাসিমের প্রতি মমতা দেখাচ্ছে। কম্বল হচ্ছে মমতার প্রকাশ। হাজতখানার একমাত্র কম্বলটি ভাঁজ করে নাসিমকে দেয়া হয়েছে, যাতে সে শুয়ে থাকতে পারে।

ইলা হাজতের দরজার কাছে এসে দাঁড়াল সন্ধ্যার ঠিক আগে আগে। প্রথম দর্শনে সে চিনতে পারল না। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। নাসিম হাসিমুখে বলল, 'আরে তুই, তুই কোত্থেকে? তোকে কে খবর দিল? আমি বাবুকে এত করে বললাম, তোকে যেন খবর না দেয়া হয়। শুধু শুধু দুশ্চিন্তা করবি।'

'তুমি করেছ কী?'

'মিস-আন্ডারস্টেনডিং হয়ে গেছে। যাকে বলে ভুল বোঝাবুঝি।'

'তোমাকে এ রকম করে মেরেছে কেন?'

'পুলিশ ধরেছে — মারবে না? তাও তো আমাকে কম মেরেছে।'

'এর নাম কম মারা?'

'বাদ দে বাদ দে। মেয়েছেলের এইসব জায়গায় আসাই ঠিক না। তোরা অল্পতে নার্ভাস হয়ে যাস। বাবুকে এত করে বলেছি যেন কাউকে কিছু না জানায়। সে মনে হয় মাইক নিয়ে ঢাকা শহরে বের হয়ে পড়েছে। দুপুরে টিফিন ক্যারিয়ারে খাবার নিয়ে রুবা এসে উপস্থিত। তারপর বিশ্রী কাণ্ড। টিফিন ক্যারিয়ার ফেলে দিয়ে চিৎকার করে কান্না। হাজতখানা কি কান্নাকাটির জায়গা? দুনিয়াসুদ্ধ মানুষ তাকিয়ে দেখছে। কাঁদতে হয় বাড়িতে বসে, দরজা বন্ধ করে কাঁদবি। হাটের মধ্যে কাঁদার দরকার কী। বাবুর সঙ্গে দেখা হচ্ছে না — দেখা হলে কঠিন কিছু কথা শুনিয়ে দিতাম।'

'ভাইয়া কোথায়?'

'আমাকে বের করার জন্যে — খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে নানান জায়গায় ছোটাছুটি করছে। ভাবটা এ রকম যেন আমাকে ফাঁসিতে ঝুলাচ্ছে। এক্ষুনি এখান থেকে বের করতে হবে। দু একদিন পরে বের হলে ক্ষতি তো কিছু নেই। এত অস্থির হবার দরকার কী। আর শোন, সন্ধ্যা হয়ে গেছে তুই খামোকা এখানে দাঁড়িয়ে থাকিস না। বাসায় চলে যা। তোর কি শরীর খারাপ না-কি? তোকে এ রকম দেখাচ্ছে কেন?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমার শরীর ভালোই আছে। নাসিম ভাই তুমি শুয়ে আছ শুয়ে থাক, তোমাকে উঠে দাঁড়াতে হবে না।'

নাসিম উঠে দাঁড়াল। ইলা বলল, 'তোমার বাঁ চোখ এমন ফুলে আছে। চোখে কিছু হয় নি তো?'

'চোখ ঠিক আছে। সকালের দিকে ঝাপসা দেখছিলাম — এখন পরিষ্কার দেখতে পারছি।'

'তুমি একদিনও আমাকে দেখতে যাও নি নাসিম ভাই।'

'ছোটাছুটি করেই সময় পাই না। দেখি এইবার যাব। জামান সাহেব ভালো আছেন?'

'হ্যাঁ।'

'তাঁকে আমার সালাম দিবি। অতি ভদ্রলোক। কিছুদিন আগে রাস্তায় একবার দেখা হয়েছিল। আমাকে রেস্টুরেন্টে নিয়ে চা-সিঙাড়া খাওয়ালেন। জয়দেবপুরে একটা বাড়ি কিনেছেন বলে বললেন, ঠিকঠাক করছেন। বাড়ির পেছনে পুকুর আছে। আমি জামান সাহেবকে বললাম, আপনি ভাই ঐ পুকুরে কিছু জলপদ্ম লাগাবেন। আমাদের ইলার খুব শখ। লাগিয়েছেন জলপদ্ম?'

'জানি না। লাগাবে নিশ্চয়ই।'

'অবশ্যই লাগাবে। আমি চারা জোগাড় করে দেব। কোথাও পাওয়া না গেলে বলধা গার্ডেন থেকে জোগাড় করব। কেয়ারটেকারকে ভুজং ভাজং দিয়ে ব্যবস্থা করতে হবে। এমনিতে রাজি না হলে পা চেপে ধরব।'

ইলা হেসে ফেলল। খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার, হাসতে হাসতে তার চোখে পানি এসে গেল। অন্যের কাছ থেকে গোপন করার মতো পানি নয়। ফোঁটায় ফোঁটায় পানি আসছে।

নাসিম বিস্মিত হয়ে বলল, 'কী যন্ত্রণা, কাঁদছিস কেন? চোখ মোছ।'

ইলা শাড়ির আঁচলে চোখ ঢেকে শব্দ করে কেঁদে উঠল। থানার সেকেন্ড অফিসার কান্নার শব্দে এগিয়ে এলেন। নাসিম অসহায় চোখে তাকিয়ে আছে। কী করবে বা বলবে ভেবে পাচ্ছে না। ইলা বলল, 'নাসিম ভাই আমি যাই।'

'আচ্ছা যা। তোর অবস্থা দেখে তো আমি ঘাবড়ে যাচ্ছি। শরীর মনে হয় বেশি খারাপ। এত অল্পতে কান্নাকাটির মেয়ে তো তুই না। তোর সমস্যাটা কী বল তো।'

'সমস্যা কিছু না। আমার বাচ্চা হবে নাসিম ভাই। তিন মাস যাচ্ছে। কাউকে বলি নি। তোমাকে প্রথম বললাম।'

নাসিমের মুখ হাঁ হয়ে গেল। মেয়েটার কি সত্যি সত্যি মাথা খারাপ হয়ে গেল? বাচ্চা হবার খবর কি হাটের মধ্যে বলার জিনিস? হাজতীরা কান পেতে শুনছে। কথাবার্তা আরেকটু সাবধানে বলা উচিত না?

নাসিম ইলাকে ধমক দিতে গিয়েও দিল না। নিজেকে সামলে নিল। একটা খুশির কথা বলেছে — এই সময় ধমকাধমকি করা ঠিক হবে না। পরে এক সময় বুঝিয়ে বলতে হবে।

'যাই নাসিম ভাই।'

'অনেকক্ষণ ধরেই তো যাই যাই করছিস। যাচ্ছিস তো না।'

'এইবার যাব। একটা কথা শুধু জিজ্ঞেস করে যাই। আমার বিয়ের দিন আমি তোমাকে সালাম করলাম। তখন তুমি আমার জন্যে কী দোয়া করেছিলে?'

'মনে নেই।'

'মনে করার চেষ্টা কর।'

'তুই বড় বিরক্ত করছিস ইলা, যা বাসায় যা।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাসিম সেকেন্ড অফিসারের দিকে তাকিয়ে বলল, 'স্যার মেয়েটাকে একটা রিকশা করে দিন। ওর শরীরটা খারাপ। রিকশাওয়ালাকে বলে দেবেন যেন খুব সাবধানে নিয়ে যায় ; ঝাঁকুনি না দেয়। মেয়েটা খুবই অসুস্থ।'

আশ্চর্যের ব্যাপার, এই সাধারণ কথাগুলো বলতে বলতে নাসিমের গলা ধরে এল। বন্ধ হয়ে যাওয়া ফুলে ওঠা চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগল।

১৩

ইলা খুব সুন্দর করে সেজেছে। বিয়ের লাল বেনারসীটা পরেছে। ঠোঁটে কড়া করে লিপিস্টিক দিয়েছে। বিয়ের সময় জামান তাকে অনেক গয়না দিয়েছিল — আজ সে সবই পরেছে। বিছানায় নীল চাদর বিছিয়ে সে বসেছে মাঝখানে। সদর দরজা খোলা। অন্যদিন দরজা খোলা রাখলে সে ভয়েই মরে যেত। আজ এতটুকু ভয় করছে না। সে পা গুটিয়ে খাটে বসে আছে। অপেক্ষা করছে জামানের জন্যে। তার এগারটায় ফেরার কথা। এগারটা বাজতে খুব বাকি নেই। নীল বিছানায় লাল বেনারসী পরা ইলাকে দেখাচ্ছে জলপদ্মের মতো।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিমু

১

কী নাম বললেন আপনার, হিমু?'

'জ্বি, হিমু।'

'হিম থেকে হিমু?'

'জ্বি না, হিমালয় থেকে হিমু। আমার ভালো নাম হিমালয়।'

'ঠাট্টা করছেন?'

'না, ঠাট্টা করছি না।'

আমি পাঞ্জাবির পকেট থেকে ম্যাট্রিক সার্টিফিকেট বের করে এগিয়ে দিলাম। হাসিমুখে বললাম, 'সার্টিফিকেটে লেখা আছে। দেখুন।'

এষা হতভম্ব হয়ে বলল,'আপনি কি সার্টিফিকেট পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়ান ?'

'জ্বি, সার্টিফিকেটটা পকেটেই রাখি। হিমালয় নাম বললে অনেকেই বিশ্বাস করে না, তখন সার্টিফিকেট দেখাই। ওরা তখন বড় ধরনের ঝাঁকি খায়।'

আমি উঠে দাঁড়ালাম। এষা বলল, 'আপনি কি চলে যাচ্ছেন?'

'হুঁ।'

'এখন যাবেন না। একটু বসুন।'

আমার যেহেতু কখনোই কোনো তাড়া থাকে না — আমি বসলাম। রাত নটার মতো বাজে। এমন কিছু রাত হয় নি — কিন্তু এ বাড়িতে মনে হচ্ছে নিশুতি। কারো কোনো সাড়াশব্দ নেই। বুড়ো এক জন মানুষের খকখক শুনছিলাম, এখন তাও শোনা যাচ্ছে না। বুড়ো মনে হয় এই ফ্ল্যাটের নয়। পাশের ফ্ল্যাটের।

এষা আমার সামনে বসে আছে। তার চোখে অবিশ্বাস এবং কৌতূহল একসঙ্গে খেলা করছে। সে অনেক কিছুই জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছে, আবার জিজ্ঞেস করতে ভরসা পাচ্ছে না। আমি তাদের কাছে নিতান্তই অপরিচিত এক জন। তার দাদিমা রিকশা থেকে পড়ে মাথা ফাটিয়েছেন। আমি ভদ্রমহিলাকে হাসপাতালে নিয়ে মাথা ব্যান্ডেজ করে বাসায় পৌঁছে বেতের সোফায় বসে আছি। এদের কাছে এই হচ্ছে আমার পরিচয়।

আমি খানিকটা উপকার করেছি। উপকারের প্রতিদান দিতে না পেরে পরিবারটা একটু অস্বস্তির মধ্যে পড়েছে। ঘরে বোধহয় চা-পাতা নেই। চা-পাতা থাকলে এতক্ষণে চা চলে আসত। প্রায় আধ ঘণ্টা হয়েছে। এর মধ্যে চা চলে আসার কথা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বললাম 'আপনাদের বাসায় চা–পাতা নেই, তাই না?'

এষা আবারো হকচকিয়ে গেল। বিস্ময় গোপন করতে পারল না। গলায় অনেকখানি বিস্ময় নিয়ে বলল,' না, নেই। আমাদের কাজের মেয়েটা দেশে গেছে। ওই বাজার–টাজার করে। চা–পাতা না থাকায় আজ বিকেলে আমি চা খেতে পারি নি।'

'আমি কি চা–পাতা এনে দেব?'

'না না, আপনাকে আনতে হবে না। আপনি বসুন। আপনি কী করেন?'

'আমি এক জন পরিব্রাজক।'

'আপনার কথা বুঝতে পারছি না।'

'আমি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াই।'

এষা তীক্ষ্ণ গলায় বলল, 'আপনি কি ইচ্ছা করে আমার প্রশ্নের উদ্ভট উদ্ভট জবাব দিচ্ছেন?'

আমি হাসিমুখে বললাম, 'যা সত্যি তাই বলছি। সত্যিকার বিপদ হল — সত্যি কথার গ্রহণযোগ্যতা কম। যদি বলতাম, আমি এক জন বেকার, পথে পথে ঘুরি, তা হলে আপনি আমার কথা সহজে বিশ্বাস করতেন।'

'আপনি বেকার নন?'

'জ্বি না। ঘুরে বেড়ানোই আমার কাজ। তবে চাকরিবাকরি কিছু করি না। আজ বরং উঠি?'

'দাদিমা আপনাকে বসতে বলেছে।'

'উনি কী করছেন?'

'শুয়ে আছেন। মনে হয় ঘুমিয়ে পড়েছেন। আপনি যদি এখন চলে যান তা হলে দাদিমা খুব রাগ করবেন।'

'তা হলে বরং অপেক্ষাই করি।'

আমি বেতের সোফায় বসে অপেক্ষা করছি। আমার সামনে বিব্রত ভঙ্গিতে এষা বসে আছে। বসে থাকতে তার ভালো লাগছে না তা বোঝা যাচ্ছে। বার বার তাকাচ্ছে ভেতরের দরজার দিকে। এর মধ্যে দুবার হাতঘড়ির দিকে তাকাল। উপকারী অতিথিকে একা ফেলে রেখে চলে যেতেও পারছে না। আজকালকার মেয়েরা অনেক স্মার্ট হয়। এরা ফট করে বলে বসে — আপনি বসে বসে পত্রিকা পড়ুন, আমার কাজ আছে। এ তা বলতে পারছে না। আবার বসে থাকতেও ইচ্ছা করছে না। তার গায়ে ছেলেদের গায়ের চাদর। বয়স কত হবে — চব্বিশ–পঁচিশ? কমও হতে পারে। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমার জন্যে হয়তো বয়স বেশি লাগছে। গায়ের রং শ্যামলা। রংটা আরেকটু ভালো হলে মেয়েটিকে দারুণ রূপবতী বলা যেত। শীতের দিনে ঠাণ্ডা মেঝেতে মেয়েটা খালিপায়ে এসেছে। এটা ইন্টারেস্টিং। যেসব মেয়ে বাসায় খালিপায়ে হাঁটাহাঁটি করে তারা খুব নরম স্বভাবের হয় বলে আমি জানি।

এষা অস্বস্তির সঙ্গে বলল, 'আমার পরীক্ষা আছে। আমি পড়তে যাব। একা একা বসে থাকতে কি আপনার খারাপ লাগবে?'

'খারাপ লাগবে না। পত্রিকা থাকলে দিন, বসে বসে পত্রিকা পড়ি।'

'আমাদের বাসায় কোনো পত্রিকা রাখা হয় না।'

'ও, আচ্ছা।'

'টিভি দেখবেন, টিভি ছেড়ে দি?'

'আচ্ছা দিন।'

এষা টিভি ছাড়ল। ছবি ঠিকমতো আসছে না। ঝাপসা ঝাপসা ছবি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এষা বলল, 'অ্যান্টেনার তার ছিঁড়ে গেছে বলে এই অবস্থা।'

আমার অসুবিধা হচ্ছে না।'

'আমি খুব লজ্জিত যে আপনাকে একা বসিয়ে রেখে চলে যেতে হচ্ছে।'

'লজ্জিত হবার কিছুই নেই।'

'আপনি কাইন্ডলি পাশের চেয়ারটায় বসুন। এই চেয়ারটা ভাঙা। হেলান দিলে পড়ে যেতে পারেন।'

আমি পাশের চেয়ারে বসলাম। কিছু কিছু বাড়ি আছে — যার কোনো কিছুই ঠিক থাকে না। এটা বোধহয় সেরকম একটা বাড়ি। দেয়ালে বাঁকাভাবে ক্যালেন্ডার ঝুলছে, যার পাতা ওল্টানো হয় নি। ডিসেম্বর মাস চলছে — ধুলা জমে আছে। আমি ক্যালেন্ডার থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে তাকালাম টিভির দিকে। নাটক হচ্ছে।

মাঝখান থেকে একটা নাটক দেখতে শুরু করলাম। এটা মন্দ না। পেছনে কী ঘটে গেছে আন্দাজ করতে করতে সামনে এগিয়ে যাওয়া — নাটকে একটি মধ্যবয়স্ক লোক তার স্ত্রীকে বলছে — 'এ তুমি কী বলছ সীমা? না না না। তোমার এ কথা আমি গ্রহণ করতে পারি না।' বলেই ভেউ ভেউ করে মুখ বাঁকিয়ে কান্না।

সীমা তখন কঠিন মুখে বলছে — 'চোখের জলের কোনো মূল্য নেই ফরিদ। এ পৃথিবীতে অশ্রু মূল্যহীন।'

কিছুদূর নাটক দেখার পর মনে হল এরা স্বামী-স্ত্রী নয়। নাটকের স্ত্রীরা স্বামীদের নাম ধরে ডাকে না। সহপাঠী প্রেমিক-প্রেমিকা হতে পারে। মাঝবয়েসী প্রেমিক-প্রেমিকা ব্যাপারটায় একটু খটকা লাগছে। যথেষ্ট আগ্রহ নিয়ে নাটক দেখছি। মাঝখান থেকে নাটক দেখার এত মজা আগে জানতাম না। জিগ-স পাজল-এর মতো। পাজল শেষ করার আনন্দ পাওয়া যাচ্ছে। নাটক শেষ হল। মিলনান্তক ব্যাপার। শেষ দৃশ্যে সীমা জড়িয়ে ধরেছে ফরিদকে। ফরিদ বলছে — 'জীবনের কাছে আমরা পরাজিত হতে পারি না সীমা।' ব্যাকগ্রাউন্ডে রবীন্দ্রসংগীত হচ্ছে — পাখি আমার নীড়ের পাখি। নাটকের শেষ দৃশ্যে রবীন্দ্রসংগীত ব্যবহার করার একটা নতুন স্টাইল শুরু হয়েছে — যার ফলে গানটা ভালো লাগে, নাটক ভালো লাগে না।

আমি টিভি বন্ধ করে চুপচাপ বসে আছি। এ বাড়ির ড্রয়িংরুমে সময় কাটাবার মতো কিছু নেই। একটি মাত্র ক্যালেন্ডারের দিকে কতক্ষণ আর তাকিয়ে থাকা যায়!

দরজার কড়া নড়ছে। আমি দরজা খুললাম। স্যুট-টাই পরা এক ভদ্রলোক। ছেলেমানুষি চেহারা। মাথাভর্তি চুল। এত চুল আমি কারো মাথায় আগে দেখি নি। হাত বুলিয়ে দেখতে ইচ্ছা করছে। ভদ্রলোককে দেখে মনে হল দরজার কড়া নেড়ে তিনি খুবই বিব্রত বোধ করছেন। আমি বললাম,, 'কী চাই।'

ভদ্রলোক ক্ষীণ গলায় বললেন, 'এষা কি আছে ?'

'আছে। ওর পরীক্ষা। পড়াশোনা করছে।'

'ও, আচ্ছা।'

ভদ্রলোক মনে হল আরো বিব্রত হলেন। আরো সংকুচিত হয়ে গেলেন। আগের চেয়েও ক্ষীণ গলায় বললেন, 'আমি ওকে একটা কথা বলে চলে যাব।'

'কথা বলতে রাজি হবে কিনা জানি না।'

'কাইন্ডলি একটু আমার কথা বলুন। বলুন মোরশেদ।'

'মোরশেদ বললেই চিনবে?'

'জ্বি।'

'ভেতরে এসে বসুন, আমি বলছি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমি ভেতরে যাব না। এখানেই দাঁড়াচ্ছি।'

'আচ্ছা দাঁড়ান — কী নাম যেন বললেন আপনার — মোরশেদ?'

'জ্বি, মোরশেদ।'

আমি কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করলাম। কী করা যায়? এখান থেকে এষা করে ডাকা যায়। ডাকতে ইচ্ছা করছে না। সরাসরি বাড়ির ভেতর ঢুকে গেলে কেমন হয়? এষা কোথায় পড়াশোনা করছে আমি জানি। ভেতরের বারান্দার এক কোনায় তার পড়ার টেবিল। দাদিমাকে ধরাধরি করে ভেতরের বারান্দায় ইজিচেয়ারে শুইয়ে দিতে গিয়ে আমি এষার পড়ার টেবিল দেখেছি। আগে যেহেতু একবার ভেতরে যেতে পেরেছি, এখন কেন পারব না? এষা রেগে যেতে পারে। রাগুক না! মাঝে মাঝে রেগে যাওয়া ভালো। প্রচণ্ড রেগে গেলে শরীরের রোগজীবাণু মরে যায়। যারা ঘন ঘন রাগে তাদের অসুখবিসুখ হয় না বললেই চলে। আর যারা একেবারেই রাগে না, তারাই দুদিন পরপর অসুখে ভোগে। সবচে' বড় কথা, এষাকে খানিকটা ভড়কে দিতে ইচ্ছা করছে। আমাকে চুপচাপ বসিয়ে সে দিব্যি পড়াশোনা করবে তা হয় না। একটু হকচকিয়ে দেয়া যাক।

আমি পর্দা সরিয়ে নিতান্ত পরিচিত জনের মতো ভেতরে ঢুকে গেলাম। এষা চেয়ারে পা তুলে বসেছে। বইয়ের উপর ঝুঁকে আছে। তার মনোযোগ এতই বেশি যে আমার বারান্দায় আসা সে টের পেল না। মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে বাচ্চা মেয়েদের মতো পড়তেই থাকল। আমি ঠিক তার পেছনে দাঁড়িয়ে খুব সহজ গলায় বললাম, 'এষা, মোরশেদ সাহেব এসেছেন। বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। তোমার সঙ্গে একটা কথা বলেই চলে যাবেন।'

এষা ভূত দেখার মতো চমকে আমার দিকে তাকাল। আমি বললাম, 'ভদ্রলোককে কি চলে যেতে বলব? ভেতরে এসে বসতে বলেছিলাম, উনি রাজি হলেন না।'

এষা কঠিন গলায় বলল, 'আপনি দয়া করে বসার ঘরে বসুন। আপনি হুট করে ঘরে ঢুকে গেলেন কী মনে করে?'

আমি নিতান্তই স্বাভাবিক গলায় বললাম, 'ভদ্রলোককে কি বসতে বলব ?'

'তাঁকে যা বলার আমি বলব। প্লিজ, আপনি বসার ঘরে যান। আশ্চর্য, আপনি কী মনে করে ভেতরে চলে এলেন?'

আমি এষাকে হতচকিত অবস্থায় রেখে চলে এলাম। ভদ্রলোক বাইরে সিগারেট ধরিয়েছেন। আমাকে দেখে আস্ত সিগারেট ফেলে অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে হাসলেন। আমি বললাম, 'ভেতরে গিয়ে বসুন, এষা আসছে।'

'আমাকে বসতে বলেছে?'

'তা বলে নি, তবে আমার মনে হচ্ছে আপনি ভেতরে গিয়ে বসলে খুব রাগ করবে না।'

'আমি বরং এখানেই থাকি?'

'আচ্ছা, থাকুন।'

আমি লম্বা লম্বা পা ফেলে রাস্তায় চলে এলাম। আপাতত রাস্তার দোকানগুলোর কোনো একটিতে চা খাব। ইতোমধ্যে ভদ্রলোকের সঙ্গে এষার কথাবার্তা শেষ হবে — আমি আবার ফিরে যাব। ফিরে নাও যেতে পারি। এই জগৎ-সংসারে আগেভাগে কিছুই বলা যায় না।

শীতের রাতে ফাঁকা রাস্তায় দাঁড়িয়ে চা খাবার অন্যরকম আনন্দ আছে। চা খেতে খেতে মাঝে মাঝে আকাশের দিকে তাকিয়ে আকাশের তারা দেখতে হয়। সারা শরীরে লাগবে কনকনে শীতের হাওয়া, হাতে থাকবে চায়ের কাপ। দৃষ্টি আকাশের তারার দিকে। তারাগুলোকে তখন মনে হবে সাদা বরফের ছোট ছোট খণ্ড। হাত দিয়ে ছুঁতে ইচ্ছা করবে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু ছোঁয়া যাবে না।

পরপর দু কাপ চা খেয়ে তৃতীয় কাপের অর্ডার দিয়েছি, তখন দেখি মোরশেদ সাহেব হনহন করে যাচ্ছেন। মাটির দিকে তাকিয়ে এত দ্রুত আমি কাউকে হাঁটতে দেখি নি। আমি ডাকলাম — 'এই যে ভাই, মোরশেদ সাহেব।'

ভদ্রলোক থমকে দাঁড়ালেন। খুবই অবাক হয়ে তাকালেন। নিতান্তই অপরিচিত কেউ নাম ধরে ডাকলে আমরা যেরকম অবাক হই — সেরকম অবাক। ভদ্রলোক আমাকে চিনতে পারছেন না। আশ্চর্য আত্মভোলা মানুষ তো! আমি বললাম, 'চা খাবেন মোরশেদ সাহেব?'

'আমাকে বলছেন?'

'হ্যাঁ, আপনাকেই বলছি। আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন না?'

'জ্বি না।'

'একটু আগেই দেখা হয়েছে।'

ভদ্রলোক আরো বিস্মিত হলেন। আমি বললাম, 'এখন কি চিনতে পেরেছেন?'

তিনি মাথা নেড়ে বললেন, 'জ্বি জ্বি'। মাথা নাড়ার ভঙ্গি দেখেই বুঝতে পারছি তিনি মোটেই চেনেন নি। আমি বললাম — 'এষার সঙ্গে কথা হয়েছে?'

'জ্বি, হয়েছে। এখন আমি আপনাকে চিনতে পেরেছি। আপনি এষার ছোটমামা। এষাকে ডেকে দিয়েছেন।'

'আপনার স্মৃতিশক্তি খুবই ভালো। আমি অবশ্যি এষার ছোটমামা না। সেটা কোনো বড় কথা না। এষা আপনার সঙ্গে কথা বলেছে। এটাই বড় কথা।'

'এষা কথা বলে নি।'

'কথা বলে নি?'

'জ্বি না। আমাকে দেখে প্রচণ্ড রাগ করল। আপনি তো জানেন ও রাগ করলে কেঁদে ফেলে — কেঁদে ফেলল। তারপর বলল, বের হয়ে যাও। এক্ষুনি বের হও। আমি চলে এসেছি।'

'ভালো করেছেন। আসুন চা খাওয়া যাক।'

'আমি চা খাই না। চা খেলে রাতে ঘুম হয় না।'

'তা হলে চা না খাওয়াই ভালো। এষা আপনার কে হয় ?'

'ও আমার স্ত্রী।'

'আমি তাই আন্দাজ করছিলাম। চলুন যাওয়া যাক।'

'চলুন।'

বড় রাস্তায় গিয়ে ভদ্রলোক রিকশা নিলেন। খিলগাঁ যাবেন। রিকশাওয়ালাকে বললেন, ১৩২ নম্বর খিলগাঁ, একতলা বাড়ি। সামনে একটি বড় আমগাছ আছে। রিকশাওয়ালাকে এইভাবে বাড়ির ঠিকানা দিতে আমি কখনো শুনি নি। তিনি রিকশায় উঠে বসে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ছোটমামা, আপনি কোন দিকে যাবেন? আসুন আপনাকে নামিয়ে দি।'

আমি এষার ছোটমামা নই। কিন্তু মনে হচ্ছে ভদ্রলোককে এইসব বলা অর্থহীন। তাঁর মাথায় ছোটমামার কাঁটা ঢুকে গেছে। সেই কাঁটা দূর করা এত সহজে সম্ভব না। আমি বললাম, 'মোরশেদ সাহেব, আমি উল্টোদিকে যাব।'

'আপনি এষাকে একটু বলবেন যে আমি সরি। একটা ভুল হয়ে গেছে। এরকম ভুল আর হবে না।'

'যদি দেখা হয় বলব। অবশ্যই বলব।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'যাই ছোটমামা?'

'আচ্ছা, আবার দেখা হবে।'

আমি উল্টোদিকে হাঁটা ধরলাম। এষাদের বাড়িতে আবার ফিরে যেতে ইচ্ছা করছে না। কী করব এখনো ঠিক করি নি। ঘণ্টাখানিক রাস্তায় হেঁটে মেসে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ব। রাতের খাওয়া এখনো হয় নি — কোথায় খাওয়া যায়? কুড়ি টাকার একটা নোট পকেটে আছে। অনেক টাকা। কুড়ি কাপ চা পাওয়া যাবে। এক জন ভিখিরির দুদিনের রোজগার। ঢাকা শহরে ভিখিরিদের গড় রোজগার দশ টাকা। এই তথ্য ইয়াদের কাছ থেকে পাওয়া। সে হল আমার বোকা বন্ধুদের এক জন। ইয়াদের অঢেল টাকা। টাকা বোকা মানুষকেও বুদ্ধিমান বানিয়ে দেয়। ইয়াদকে বুদ্ধিমান করতে পারে নি। ইয়াদদের পরিবারের যতই টাকা হচ্ছে, সে ততই বোকা হচ্ছে। ইয়াদ ভিখিরিদের উপর গবেষণা করছে। তার পি.এইচ.ডি. থিসিসের বিষয় হল 'ভাসমান জনগোষ্ঠী আর্থ–সামাজিক নিরীক্ষার আলোকে'। ইয়াদকে অনেক ডাটা কালেক্ট করতে হচ্ছে। আমি তাকে সাহায্য করছি। সাহায্য করার মানে হল — তার একটা বিশাল পেটমোটা কালো ব্যাগ হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়ানো।

তার কালো ব্যাগে পাওয়া যাবে না এমন জিনিস নেই। কাগজপত্র ছাড়াও ছোট্ট একটা টাইপ রাইটার। বোতলে ভর্তি চিঁড়া–গুড়। ইনসটেন্ট কফি, চিনি, ফার্স্ট এইডের জিনিসপত্র। একগাদা লম্বা নাইলনের দড়িও আছে। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম —'দড়ি কী জন্যে রে ইয়াদ?' সে মুখ শুকনো করে বলেছে — 'কখন কাজে লাগে বলা তো যায় না। রেখে দিলাম। ভালো করি নি?' ভালো করি নি — বলাটা ইয়াদের মুদ্রাদোষ। কিছু বলেই খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে বলবে — ভালো করি নি?'

রাত একটার দিকে মজনুর দোকানে ভাত খেতে গেলাম। ভাতের হোটেলের সাধারণত কোনো নাম থাকে না। এটার নাম আছে। নাম হল — "মজনু মিয়ার ভাত মাছের হোটেল।"

বিরাট সাইনবোর্ড। সাইনবোর্ডের এক মাথায় একটা মুরগির ছবি, আরেক মাথায় ছাগলের ছবি। ভাত–মাছের ছবি নেই। মজনুর দোকানে ভাত খেতে যাওয়ার আদর্শ সময় হল রাত একটা। কাস্টমাররা চলে যায়। কর্মচারীরা দুটা টেবিল একত্র করে গোল হয়ে খেতে বসে। ওদের সঙ্গে বসে পড়লেই হয়। মজনুর 'ভাত মাছের হোটেলে'র ঝাঁপ ফেলে দেয়া হয়েছে। বয়–বাবুর্চি একসঙ্গে খেতে বসেছে। খাবার যা বাঁচে তাই শেষ সময়ে খাওয়া হয়। আজ ওদের ভাগ্য ভালো — রুই মাছ, খাসি দুটাই বেঁচে গেছে। প্রচুর বেঁচেছে। শুধু ভাত নেই। অল্পকটা আছে, তাই একটা টিনের থালায় রাখা আছে। তরকারির চামচে এক চামচ করেও সবার হবে না। আমাকে দেখে এরা জায়গা করে দিল। মজনু মিয়া বিরসমুখে বললেন, 'হিমু ভাই রোজ দেরি করেন। আপনার মতো কাস্টমার না থাকা ভালো। বড়ই যন্ত্রণা।'

আমি বললাম, 'ভাত নেই নাকি?'

'যা আছে আপনার হয়ে যাবে। আপনে খান। ওরা মাছ, গোছ খাবে। এতবড় পেটি একটা খেলে পেট ভরে যায়।'

'খানিকটা ভাত রান্না করে ফেললে কেমন হয়?'

'হিমু ভাই, আপনি আর যন্ত্রণা করবেন না তো! রাত একটার সময় ভাত রানবে ?'

'অসুবিধা কি?'

'অসুবিধা আছে। চাল নাই। পোলাওয়ের চাল সামান্য আছে — সকালে বিরানি হবে। এই, খা তোরা। আমি চললাম। আর শুনেন হিমু ভাই, আপনার ঐ পাগলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বন্ধু ইয়াদ সাহেবকে আমার এখানে আসতে নিষেধ করে দিবেন। আজ একদিনে দুইবার এসেছে আপনার খোঁজে। দুইবারেই খুব যন্ত্রণা করেছে। বলে, চা দিন। দিলাম চা। বলে কাপ পরিষ্কার হয় নি। গরম পানি দিয়ে ধুয়ে নিন, আমি ডাবল দাম দিব। দিলাম গরম পানি দিয়ে ধুয়ে। চা মুখে দিয়ে থু করে ফেলে দিয়ে বলে — চিনি কম দিয়ে আরেক কাপ দিতে বলুন, আমি ডাবল দাম দিব। কথায় কথায় ডাবল দাম। আরে ডাবল দাম চায় কে তার কাছে? এতগুলা কাস্টমারের সামনে যে থু করে চা ফেলল, আমার অপমান হল না? আপনি আপনার বন্ধুরে বলে দিবেন।'

'ইয়াদকে আমি বলে দেব।'

'আজেবাজে লোককে হোটেল চিনায়ে দিয়েছেন, এরা জান শেষ করে দেয়।'

মজনু মিয়া ক্যাশ নিয়ে চলে গেল। টিনের থালায় এক থালা ভাত নিয়ে আমরা ছজন মানুষ চুপচাপ বসে আছি। বাবুর্চির নাম মোস্তফা। মোস্তফা বসেছে আমরা পাশে। সে ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত। মোস্তফা বলল, 'হিমু ভাই, আফনে খান। রুই মাছটা ভালো ছিল। আরিচার মাছ। খেয়ে আরাম পাইবেন।'

'আমি একা ভাত খাব, আপনারা শুধু তরকারি?'

'অসুবিধা কিছু নাই ভাইজান।'

'অসুবিধা আছে। চুলা ধরান, পোলাওয়ের চাল বসিয়ে দেন। পোলাও রান্না করে ফেলুন। ভালো মাছ আছে, পোলাও দিয়ে আরাম করে খাই।'

বাবুর্চি অন্যদের দিকে তাকাল। সবার চোখই চকচক করছে। আমি বললাম, 'মাছের তরকারি ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। গরম করতে হবে। চুলা তো ধরাতেই হবে।'

মোস্তফা ক্ষীণ গলায় বলল, 'মালিক শুনলে খুবই রাগ হইব।'

'শুনবে কেন? শুনবে না। তা ছাড়া আগামী দুদিন মালিক দোকানে আসবে না।'

'পোলাও বসাইয়া দিমু?'

'দিন।'

'সকালের জইন্যে মুরগি কোটা আছে। মোরগ-পোলাও বসাইয়া দিমু ভাইজান?'

'আইডিয়া মন্দ না। যাহা বাহান্না তাহা পঁয়ষট্টি। পোলাও যখন হচ্ছে মোরগ পোলাওয়ে অসুবিধা কি! কতক্ষণ লাগবে?'

'ডাবল আগুন দিয়ে রানলে আধা ঘণ্টার মামলা ভাইজান।'

'দিন ডাবল আগুন। সিঙ্গেল আগুনে আজকাল কিছু হয় না।'

মজনু মিয়ার ভাত মাছের দোকানের কর্মচারীদের চোখ-মুখ আনন্দে ঝলমল করতে লাগল। আমি বললাম, 'রান্নাবান্না হোক, আমি আধ ঘণ্টা পর আসব।'

'চা বানাইয়া দেই ভাইজান? বইসা বইসা গরম চা খান।'

'চা খেয়ে খিদে নষ্ট করব না। ভালো ভালো জিনিস রান্না হচ্ছে।'

আমি চলে গেলাম তরঙ্গিনী ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে। ডাকাডাকি করে মুহিব সাহেবের ঘুম ভাঙালাম। তিনি স্টোরের ভেতরই ঘুমান। মুহিব সাহেব দরজা খুলে সহজ গলায় বললেন, 'কী দরকার হিমুবাবু?'

'ছ বোতল ঠাণ্ডা কোক দিন তো!'

মুহিব সাহেব ছটা বোতল পলিথিনের ব্যাগে করে নিয়ে এলেন। একবারও জিজ্ঞেস করলেন না, রাত দেড়টায় কোক কি জন্যে।

'মুহিব সাহেব, সঙ্গে টাকা নেই। টাকা পরে দিয়ে যাব।'

'জ্বি আচ্ছা। আপনি আমার জন্যে একটু দোয়া করবেন হিমু ভাই। খাস দিলে দোয়া করবেন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আবার কী হল?'

'কিছু হয় নি। এমনি বললাম। আজ আপনার জন্মদিন। একটা শুভদিন।'

'জন্মদিন আপনি জানতেন?'

'জানব না কেন? জানি। সকালবেলা একবার আপনার কাছে যাব ভেবেছিলাম — যেতে পারি নি। ছুটি পেলাম না। যাক, তবু শুভদিনে শেষ পর্যন্ত দেখা হল।'

'শুভদিনে দেখা হয় নি মুহিব সাহেব — এখন প্রায় দুটা বাজতে চলল। জন্মদিনের মেয়াদ শেষ, যাই।

মুহিব সাহেব দুঃখিত চোখে তাকিয়ে রইলেন। ছ বোতল কোক নিয়ে আমি বের হয়ে এলাম। মজনু মিয়ার ভাত মাছের হোটেলের লোকজন নিশ্চয়ই অপেক্ষা করছে আমার জন্যে। ভালো শীত পড়েছে। শীতের সময় সবাই খুব দ্রুত হাঁটে। আমি ধীরে ধীরে এগুচ্ছি। গায়ে শীত মাখিয়ে হাঁটতে ভালো লাগছে। রাতে হাঁটার সময় আপনাতেই আকাশের দিকে চোখ যায়। প্রাচীনকালে মানুষ আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘ ভ্রমণে বেরুত। সব মানুষই বোধহয় সেই প্রাচীন স্মৃতি তার 'জীনে' বহন করে।

২

ঘরের ভেতর দুটা চিঠি। একটি খাম দেখেই বোঝা যাচ্ছে রূপার কাছ থেকে এসেছে। কার্টিস পেপারে ধবধবে সাদা খাম। খামের এক মাথায় রূপালি কালিতে এমবস করা রূপার নাম। সাদার উপর রূপালি ফোটে না, তবু এটাই রূপার স্টাইল। অন্য চিঠিটি ব্রাউন কাগজের। ঠিকানা ইংরেজিতে টাইপ করা। দুটা চিঠির কোনোটিতেই স্ট্যাম্প নেই — হাতে হাতে পৌঁছে দেয়া। আমি রূপার চিঠি পকেটে রেখে অন্যটা খুললাম।

যা ভেবেছি তাই — ইয়াদের লেখা। টাইপ করা চিঠি। ইংরেজি ভাষায় — টেলিগ্রামের ধরনে লেখা।

হিমু, খুঁজে পাচ্ছি না। কোথায় আছ?
ভিডিও ক্যামেরা কিনেছি। সব ভিডিও হবে।
ইয়াদ।

ঘরে থাকলেই ইয়াদের হাতে পড়তে হবে। সারা দিনের জন্যে আটকে যেতে হবে। আমার কাজ হবে তার পেটমোটা কালো ব্যাগ নিয়ে ঘুরে বেড়ানো — এখন যেহেতু ভিডিও ক্যামেরা কেনা হয়েছে — ভিক্ষুকদের ইন্টারভ্যু হবে ভিডিওতে। এতদিন ক্যাসেট রেকর্ডারে হচ্ছিল। ইয়াদের কাজকর্ম পরিষ্কার। তৈরী প্রশ্নমালা আছে— ইন্টারভ্যুর সময় তৈরী প্রশ্নমালার বাইরে কোনো প্রশ্ন করা যাবে না। প্রশ্নের নমুনা হল —

নাম?
স্ত্রী না পুরুষ?
বয়স?
শিক্ষা?
পিতার নাম?
ঠিকানা (ক) স্থায়ী?
(খ) অস্থায়ী?
কতদিন ধরে ভিক্ষা করছেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দৈনিক গড় আয়?
পরিবারের সদস্য সংখ্যা?
সদস্যদের মধ্যে কতজন ভিক্ষুক?
খাবার রান্না করে খান, না ভিক্ষালব্ধ খাবার খান?

এরকম মোট পঞ্চাশটা প্রশ্ন। একেকজনের উত্তর দিতে ঘণ্টাখানিক লাগে। এক ঘণ্টার জন্যে তাকে পাঁচ টাকা দেয়া হয়। পাঁচ টাকার চকচকে একটা নোট হাতে নিয়ে অধিকাংশ ভিক্ষুকই চোখ কপালে তুলে বলে, 'অতক্ষণ খাটনি করাইয়া এইডা কী দিলেন? আফনের বিচার নাই?'

আমি ইয়াদকে বলার চেষ্টা করেছি, এ জাতীয় প্রশ্ন অর্থহীন। ইয়াদ তা মানতে রাজি নয়। সে নাকি তিন মাস দিনরাত খেটে প্রশ্ন তৈরি করেছে। প্রশ্ন তৈরির আগে স্ট্যাটিসটিক্যাল মডেল দাঁড় করিয়েছে। কম্প্যুটার সফটওয়ারে পরিবর্তন করেছে — ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি তার বকবকানি শুনে বিরক্ত হয়ে বলেছি, 'চুপ কর্ গাধা।' সে খুবই অবাক হয়ে বলেছে — 'গাধা বলছিস কেন? আমাকে গাধা বলার পেছনে তোর কী কী যুক্তি আছে তুই পয়েন্ট ওয়াইজ কাগজে লিখে আমাকে দে। আমি ঠাণ্ডা মাথায় অ্যানালাইসিস করব। যদি দেখি তোর যুক্তি ঠিক না, তা হলে আমাকে গাধা বলার জন্যে তোকে লিখিতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে।'

এ জাতীয় মানুষদের কাছ থেকে যত দূরে থাকা যায় ততই মঙ্গল। আমি সবসময় দূরে থাকার চেষ্টাই করি। আমি পালিয়ে পালিয়ে বেড়াই। গাধাটা আমাকে খুঁজে খুঁজে বের করে। একধরনের চোর-পুলিশ খেলা। আমি চোর — সে পুলিশ। যেহেতু চোরের বুদ্ধি সবসময়ই পুলিশের বুদ্ধির চেয়ে বেশি, সেহেতু সে গত এক সপ্তাহ আমার দেখা পায় নি। আজো পাবে না। আমি আবার বের হয়ে পড়লাম। আমার কোনোরকম পরিকল্পনা নেই। প্রথমে রূপার কাছে যাওয়া যায়। ওর সঙ্গে অনেক দিন দেখা হয় না। প্রিয় মুখ কিছুদিন পরপর দেখতে হয়। মানুষের মস্তিষ্ক অপ্রিয়জনদের ছবি সুন্দর করে সাজিয়ে রাখে। প্রিয়জনদের ছবি কোনো এক বিচিত্র কারণে কখনো সাজায় না। যে জন্যে চোখ বন্ধ করে প্রিয়জনের চেহারা কখনোই মনে করা যায় না।

রূপাকে পাওয়া গেল না। রূপার বাবার সঙ্গে দেখা হল। তিনি ভুরু কুঁচকে বললেন — 'ও তো ঢাকায় নেই।'

এই ভদ্রলোক সহজ গলায় মিথ্যে বলেন। রূপা ঢাকায় আছে তা তাঁর কথা থেকেই আমি বুঝতে পারছি।

আমি বললাম, 'কোথায় গেছে?'

'সেটা জানার কি খুব প্রয়োজন আছে ?'

'না, প্রয়োজনে নেই — তবু জানতে ইচ্ছা করছে।'

'ও যশোর গিয়েছে।'

'ঠিকানাটা বলবেন?'

ভদ্রলোক শুকনো গলায় বললেন, 'ঠিকানা দিতে চাচ্ছি না। ও অসুস্থ। আমরা চাই না অসুস্থ অবস্থায় কেউ ওকে বিরক্ত করে।'

'অসুস্থ অবস্থায় মানুষের বন্ধুবান্ধবের প্রয়োজন পড়ে। আমি ওর খুব ভালো বন্ধু।'

'ওর ঠিকানা দেয়া যাবে না।'

'ও কোথায় গেছে বললেন যেন?'

'যশোর।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'খুব শিগ্‌গির ফেরার সম্ভাবনা নেই — তাই না?'

'দেরি হবে।'

আমি খুব চিন্তিত মুখে বললাম, একটা ঝামেলা হয়ে গেল যে! আজই প্রেসক্লাবের সামনের রাস্তায় রূপার সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেল। সে-ই আমাকে বাসায় আসতে বলেছে। ব্যাপারটা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, আপনি বলছেন রূপা যশোরে। আপনার মতো বয়স্ক, দায়িত্ববান এক জন মানুষ আমার সঙ্গে নিশ্চয়ই মিথ্যা কথা বলবেন না। তাহলে রূপার সঙ্গে দেখা হল কীভাবে?'

ভদ্রলোক তাকিয়ে আছেন। কিছু বললেন না। তাঁকে মোক্ষম আঘাত করা হয়েছে। সামলে উঠতে সময় লাগবে। তাঁর মুখের ভাবের পরিবর্তন দেখতে ভালো লাগছে।

'তোমার নাম হিমু না?'

'জ্বি।'

'মিথ্যা যা বলার তুমি বলেছ। রূপার সঙ্গে তোমার দেখা হয় নি, ও যশোরে আছে। আমার সঙ্গে তুমি যে ক্ষুদ্র রসিকতা করার চেষ্টা করলে তা আর করবে না। মনে থাকবে?

'জ্বি স্যার, থাকবে।'

'গেট আউট।'

'থ্যাংক ইউ স্যার।'

আমি চলে এলাম। এমন কঠিন ধরনের এক জন মানুষ রূপার মতো মেয়ের বাবা কী করে হলেন ভাবতে ভাবতে আমি হাঁটছি — রূপার চিঠি এখনো পড়া হয় নি। পড়লে তো ফুরিয়ে গেল। চিঠির এই হল ম্যাজিক। যতক্ষণ পড়া হয় না, ততক্ষণ ম্যাজিক থাকে। পড়ামাত্রই ম্যাজিক ফুরিয়ে যায়।

কোথায় যাওয়া যায়? মেসে ফিরে যাবার প্রশ্নই ওঠে না। ইয়াদ সেখানে নিশ্চয়ই বসে আছে। আমি মোরশেদ সাহেবের বাসার দিকে রওনা হলাম। খিলগাঁ — দূর আছে। অনেকক্ষণ হাঁটতে হবে। কোনো একটা উদ্দেশ্য সামনে রেখে হাঁটতে ভালো লাগে। যদিও জানি মোরশেদ সাহেবকে পাওয়া যাবে না। কোনো কোনো দিন এমন যায় যে কাউকেই পাওয়া যায় না। আজ বোধহয় সেরকম একটা দিন।

মোরশেদ সাহেবকে পাওয়া গেল না। দরজা তালাবন্ধ। তবে একটা মজার ব্যাপার লক্ষ করলাম। বাসার ঠিকানা বলার সময় তিনি বলেছিলেন — ১৩২ নং খিলগাঁ, একতলা বাড়ি, সামনে বিরাট আমগাছ সবই ঠিক আছে, শুধু আমগাছ নেই। শুধু এই বাড়ি না, আশপাশের কোনো বাড়ির সামনেই আমগাছ নেই। মোরশেদ সাহেবের বাড়িতে দারোয়ান জাতীয় এক জনকে পাওয়া গেল। তাকে জিজ্ঞেস করলাম — 'এখানে কি আমগাছ কখনো ছিল?' সে বিরক্ত হয়ে বলল, 'আমগাছ কেন থাকবে?'

যেন আমগাছ থাকাটা অপরাধ। আমি খুবই বিনয়ের সঙ্গে বললাম, 'আপনি এ বাড়িতে কতদিন ধরে আছেন?'

'ছোটবেলা থাইক্যা আছি।'

'এটা কি মোরশেদ সাহেবের কেনা বাড়ি?'

'জ্বে না, ভাড়া বাসা। তয় বেশিদিন থাকব না। বাড়িওয়ালা নোটিশ দিছে।'

'আচ্ছা ভাই, যাই।'

'উনারে কিছু বলা লাগব?'

'না।'

আমি আবার হাঁটা ধরলাম। রাত একটা পর্যন্ত পথে পথে থাকতে হবে। ইয়াদ একটা পর্যন্ত আমার জন্যে বসে থাকবে না। তাকে রাত বারাটার মধ্যে বাড়ি ফিরতে হবে। নীতুর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কঠিন নির্দেশ। নীতুর মতো মেয়ের নির্দেশ অগ্রাহ্য করা ইয়াদের পক্ষে সম্ভব না।

নীতুর সঙ্গে দেখা করে এলে কেমন হয়? ইয়াদের হাত থেকে বাঁচার সবচে' ভালো উপায় হচ্ছে ইয়াদের বাসায় গিয়ে বসে থাকা। সে বসে থাকবে আমার মেসে, আমি বসে থাকব তার বাড়িতে। চোর–পুলিশ খেলার এরচে' ভালো স্ট্র্যাটিজি আর হয় না। ফুল প্রুফ। ইয়াদের বাড়ি একটা স্থলস্থুল ব্যাপার। বাইরে থেকে মনে হয় জেলখানা। গেটটাও এমন যে বাইরে থেকে কিছুই দেখা যায় না। বড় গেট কখনো খোলা হয় না। বড় গেটের সঙ্গে আছে একটা খোকা গেট। অনেক ধাক্কাধাক্কির পর সেটা খোলা হয়। বাড়িতে ঢুকতে হয় মাথা নিচু করে। একবার ঢোকার পর সঙ্গে সঙ্গে ছুটে বের হয়ে যেতে ইচ্ছা করে — কারণ তীব্র বেগে দুটা অ্যালসেশিয়ান ছুটে আসে। এদের একজন কুচকুচে কালো, অন্যজন ধবধবে সাদা। রং ভিন্ন হলেও এদের স্বভাব অভিন্ন, দুজন ভয়ংকর হিংস্র, এদের এক জনের নাম টুটি, অন্যজনের নাম ফুটি। দারোয়ান বলে — 'চুপ টুটি–ফুটি'। এরা চুপ করে, তবে এমনভাবে তাকায় যাতে মনে হয় যে কোনো সুযোগে এরা ঘাড় কামড়ে ধরবে।

গেট থেকে বাড়ি পর্যন্ত যেতে খানিকক্ষণ বাগানের ভেতর দিয়ে হাঁটতে হয়। সেই বাগানও দারুণ বাগান। এদের বাড়ি দোতলা — সিঁড়ি মার্বেল পাথরের। বাড়ির বারান্দায় ইউ আকৃতিতে কিছু বেতের চেয়ার বসানো। মনে হয় প্রতিদিন চেয়ারগুলোতে রং করা হয়, কারণ যখনি আমি দেখি — ঝকঝক করছে। চেয়ারের গদিগুলোর রং হালকা সবুজ। সাদা ও সবুজে যে এত সুন্দর কম্বিনেশন হয় তা ইয়াদদের বাড়িতে না এলে কখনো জানতে পারতাম না।

ঠিক মাঝখানের বেতের চেয়ারে নীতু বসে ছিল। নীতু ছিল নায়িকা–স্বভাবের মেয়ে। সব সময় সেজেগুজে থাকে এবং নায়িকাদের মতো চোখে থাকে সানগ্লাস। দিনরাত সব সময়ই সানগ্লাস। তাকে যখনি দেখি তখনি মনে হয় — সে পার্টিতে যাচ্ছে, কিংবা পার্টি থেকে ফিরেছে। স্বাভাবিক ভঙ্গিতে এই মেয়েটিকে একবার আমার দেখতে ইচ্ছা করে। সেটা বোধহয় সম্ভব না। আমাকে দেখে উঠে দাঁড়াল, হাসিমুখে বলল — 'যাক, আপনাকে তা হলে পাওয়া গেল! ও খুব ব্যাকুল হয়ে আপনাকে খুঁজছে।'

'ব্যাপার কি খোঁজ নিতে এলাম।'

'ব্যাপার কি আমি জানি না, ভিক্ষুক সম্পর্কিত কিছু হবে। আমি জানতেও চাই নি। আপনাকে এমন লাগছে কেন?'

'কেমন লাগছে?'

'মনে হচ্ছে ম্যানহোলের গর্তের কাজ করছিলেন — কাজ বন্ধ করে বেড়াতে এসেছেন। ফিরে গিয়ে আবার কাজ শুরু করবেন।'

'এতটা খারাপ?'

'হ্যাঁ। এতটাই খারাপ। আপনি কি গোসল করেন, না করেন না?'

'শীতের সময় কম করি—'

'বাথটাবে গরম পানি দিলে আপনি কি গোসল করবেন?'

'আমার প্রয়োজন নেই। নোংরা থাকতে ভালো লাগছে।'

'নোংরা থাকতে ভালো লাগছে মানে! এটা কী ধরনের কথা?'

'রসিকতা করার চেষ্টা করছি।'

নীতু ঠোঁট বাঁকিয়ে বলল, 'রসিকতা বলে আমার কাছে মনে হচ্ছে না। আপনি আসলেই নোংরা থাকতে ভালবাসেন। যাই হোক — আমার জন্যে হলেও দয়া করে পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন হয়ে আসুন। আপনার সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা বলি। আপনাকে নতুন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একসেট কাপড় দিচ্ছি। গায়ের কাপড় বাথরুমে রেখে আসবেন। ইস্ত্রি করে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেয়া হবে।'

আমি হাসলাম। নীতু বলল, 'হাসবেন না। হাসির কোনো কথা বলি নি। যান, বাথরুমে ঢুকে পড়ুন। কুইক।'

একদল মানুষ আছে — বাথরুমপ্রেমিক। তারা অন্য কিছুতেই মুগ্ধ হয় না, বাথরুম দেখে মুগ্ধ হয়। আমি সেই দলে পড়ি না, কিন্তু ইয়াদের বাড়ির বাথরুমে ঢুকে খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে মনে মনে বলি — 'এ কী!' আজ আবার বললাম। বাথটাব ভর্তি পানি। সেই বাথটাব এত বড় যে ইচ্ছা করলে সাঁতার কাটা যায়। ডুব দেয়া যায়। গোসল করতে করতে 'সংগীত শ্রবণের' ব্যবস্থা আছে। সংগীতের কন্ট্রোল অবশ্যি বাইরে। যে রেকর্ড বাজানো হবে, স্পীকারের মাধ্যমে তা চলে আসবে বাথরুমে। এখন গান হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকলে আহত হতেন, কারণ বাথটাবে শুয়ে আমি শুনছি তাঁর মায়ার খেলা। সখী বলছে,

ওগো কেন, ওগো কেন মিছে এ পিপাসা।
আপনি যে আছে আপনার কাছে
নিখিল জগতে কী অভাব আছে —
আছে মন্দ সমীরণ, পুষ্পবিভূষণ, কোকিল কূজিত কুঞ্জ।

প্রায় ঘণ্টাখানিক বাথরুমে কাটিয়ে আমি বের হয়ে এলাম। গায়ে ধবধবে সাদা পায়জামা–পাঞ্জাবি, একটা হালকা নীল উলের চাদর। পায়ে দিয়েছি চটিজুতো। সেগুলোও নতুন। আয়নায় নিজেকে দেখে নিজেরই লজ্জা লাগছে। নীতু বলল, 'বাহ্, আপনাকে ভালো দেখাচ্ছে! আসুন, চা খেতে আসুন।'

বিভিন্ন খাবারের জন্যে এদের বিভিন্ন ঘর আছে। চা খাবার জন্যে আছে টি–রুম। আমরা দুজন টি–রুমে বসলাম। পটভর্তি চা। সঙ্গে অ্যাশট্রে এবং টিনভর্তি সিগারেট। নীতু বলল, 'চা নিন। সিগারেট নিন। যাবার সময় টিনটা নিয়ে যাবেন। এটা আপনার জন্যে।'

'আচ্ছা, নিয়ে যাব।'

'এখন আপনার সঙ্গে আমি কিছুক্ষণ খোলামেলা কথা বলব। যা জানতে চাইব আপনি দয়া করে উত্তর দেবেন।'

'দেব।'

'ইয়াদ আপনার কী রকম বন্ধু?'

'ভালো বন্ধু।'

'ভালো বন্ধু যদি হয় তাহলে ওকে আপনি গাধা বলেছিলেন কেন?'

'গাধা একধরনের আদরের ডাক। অপরিচিত বা অর্ধ–পরিচিতদের গাধা বলা যাবে না। বললে মেরে তক্তা বানিয়ে দেবে। প্রিয় বন্ধুদেরই গাধা বলা যায়। এতে প্রিয় বন্ধুরা রাগ করে না। বরং খুশি হয়।'

'আপনি কি জানেন ইয়াদ অন্য দশজনের মতো নয়? সে সবকিছু সিরিয়াসলি নেয়। আপনি গাধা বলায় সে সারা রাত ঘুমায় নি — জেগে বসে ছিল — একটা খাতায় নোট করছিল কেন তাকে গাধা বলা যাবে না।'

'আমি হাসতে হাসতে বললাম, সে যা করছিল গাধা বলার জন্যে তা কি যথেষ্ট নয়?'

'না, যথেষ্ট নয়। ভবিষ্যতে কখনো তাকে গাধা বলবেন না এবং তার মাথায় কোনো অদ্ভুত আইডিয়া ঢুকিয়ে দেবেন না।'

'আমি ওর মাথায় কোনো অদ্ভুত আইডিয়া ঢোকাই নি।'

'ঢুকিয়েছেন — আপনি ওকে বলেছেন ভিক্ষুকদের জানতে হলে ভিক্ষুক হতে হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওদের সঙ্গে থাকতে হবে। ওদের মতো ভিক্ষা করতে হবে। বলেন নি এমন কথা?'

'বলেছি।'

'আপনি তা বিশ্বাস করেন?'

'করি।'

'তার মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন, কেউ যদি পিঁপড়াদের সম্পর্কে গবেষণা করতে চায়, তা হলে তাকে পিঁপড়া হতে হবে, এবং পিঁপড়াদের সঙ্গে থাকতে হবে, পিঁপড়াদের খাবার খেতে হবে?'

'ওদের ভালোমতো জানতে হলে তাই করতে হবে, কিন্তু সে উপায় নেই। ভিক্ষুকদের ব্যাপারে উপায় আছে। তা ছাড়া পিঁপড়া মানুষ না, ভিক্ষুকরা মানুষ।'

'আমি যে আপনাকে কী পরিমাণ অপছন্দ করি তা কি আপনি জানেন ?'

'না, জানি না।'

'মাকড়সা আমি যতটা অপছন্দ করি আপনাকে তারচে বেশি অপছন্দ করি। আজ আমি বারান্দায় বসে ছিলাম। আপনি যখন আসছিলেন তখন ইচ্ছা করছিল — টুটি-ফুটিকে বলি — ধর্ ঐ লোকটাকে, ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেল্। বলেই ফেলতাম। নিজেকে সামলেছি। আমি নিজেকে কনট্রোল করেছি। আজ যা করেছি অন্য একদিন যে তা করতে পারব তা তো না। একদিন হয়তো সত্যি কুকুর লেলিয়ে দেব। নিন, আরেক কাপ চা খান।'

আমি আরেক কাপ চা নিলাম। নীতু বলল, 'আপনার সম্পর্কে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। আপনি নাকি মহাপুরুষজাতীয় মানুষ। মানুষের ভবিষ্যৎ বলতে পারেন। আমি তার একবিন্দুও বিশ্বাস করি না।'

'আমি নিজেও করি না।'

'কিন্তু কেউ কেউ করে। আপনার অদ্ভুত জীবনযাপন প্রণালির জন্যেই করে। নোংরা কাপড় পরে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ালেই মানুষ মহাপুরুষ হয় না। যদি হত, তা হলে ঢাকা শহরে তিন লক্ষ মহাপুরুষ থাকত। এই শহরের রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো মানুষের সংখ্যা তিন লক্ষ। বুঝতে পারছেন?'

'পারছি।'

'আপনার কোনো ক্ষমতা নেই তা বলছি না। একটা ক্ষমতা আছে। ভালোই আছে। সেটা হল — সুন্দর করে কথা বলা। আপনি যা বলেন তা-ই সত্যি বলে মনে হয়। বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে। এই ক্ষমতা নিম্নশ্রেণীর ক্ষমতা। রাস্তায় রাস্তায় যারা ওষুধ বিক্রি করে তাদেরও এই ক্ষমতা আছে। আপনি যদি দাঁতের মাজন কিংবা সর্বব্যথানিবারণী ওষুধ বিক্রি করেন তাহলে বেশ ভালো বিক্রি করবেন।'

নীতুর সঙ্গে অন্যদের এক জায়গায় বেশ ভালো অমিল আছে। রাগের কথা বলতে বলতে অন্যদের রাগ পড়ে যায়। নীতুর পড়ে না। তার রাগ বাড়তেই থাকে। আস্তে আস্তে মুখ লাল হতে থাকে। এক সময় সারা মুখ লাল টকটকে হয়ে যায়। এখন যেমন হয়েছে। নীতু বলল, 'আমি অনেক কথা বললাম, আপনি তার উত্তরে কিছু বলতে চাইলে বলতে পারেন।'

'আমি কিছু বলতে চাচ্ছি না।'

'তা হলে আপনি কি স্বীকার করে নিলেন, আমি যা বললাম সবই সত্যি?'

'হ্যাঁ।'

'ইন দ্যাট কেইস আপনি কি আমার পরামর্শ শুনবেন ?'

'হ্যাঁ, শুনব।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আপনি এক জন সাইকিয়াট্রিস্টের সঙ্গে কথা বলুন। আপনার মধ্যে যেসব অস্বাভাবিকতা আছে — এক জন ভালো সাইকিয়াট্রিস্ট তা দূর করতে পারবে। আপনি অনেক দিন থেকেই মহাপুরুষের ভূমিকায় অভিনয় করছেন। অভিনয় করতে করতে আপনার ধারণা হয়েছে আপনি এক জন মহাপুরুষ।'

'এরকম কোনো ধারণা আমার হয় নি।'

'হয়েছে। ইয়াদের কাছে শুনেছি আপনি মজনু মিয়ার মাছ ভাতের হোটেল নামে একটা হোটেলে ভাত খান। সেখানে এক রাতে বললেন – হোটেলের মালিক দু দিন হোটেলে আসবে না। এবং এই বলে কর্মচারীদের প্ররোচিত করলেন রোস্ট, পোলাওটোলাও রাঁধার জন্যে। করেন নি ?'

'হ্যাঁ, করেছি।'

'এগুলো হচ্ছে মহাপুরুষ সিনড্রম। নিজেকে আপনি অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন ভাবতে শুরু করেছেন।'

'মজনু মিয়া কিন্তু দু দিন ঠিকই হোটেলে আসে নি।'

'তা আসে নি। কাকতালীয় ব্যাপার। মাঝে মাঝে কাকতালীয় ব্যাপার ঘটে। কেউ কেউ সেসব ব্যাপার কাজে লাগাতে চেষ্টা করে, যেমন আপনি করেছেন। আপনি এক জন অসুস্থ মানুষ। আপনার চিকিৎসা হওয়া দরকার।'

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, 'আমি চিকিৎসা করাব। আপনি সাইকিয়াট্রিস্টের ঠিকানা দিন।'

'সত্যি করাবেন ?'

'হ্যাঁ, সত্যি।'

'আমার কাছে কার্ড আছে। কার্ড দিয়ে দিচ্ছি। আমি টেলিফোনেও উনার সঙ্গে কথা বলে রাখব।'

'আচ্ছা আজ তা হলে উঠি?'

'আপনার বন্ধুর জন্যে অপেক্ষা করবেন না?'

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, 'ও আজ রাতে ফিরবে না।' নীতু তীক্ষ্ণ গলায় বলল, 'তার মানে কী? আপনি কী বলতে চাচ্ছেন? আপনি কি আপনার তথাকথিত অলৌকিক ক্ষমতার নমুনা আমাকে দেখাতে চাচ্ছেন? আমাকে ভড়কে দিতে চাচ্ছেন?'

'তা না। আপনি শুধু শুধু রাগ করছেন। আমার মনে হচ্ছে ইয়াদ আজ রাতে বাসায় ফিরবে না। বললাম।'

'শুনুন হিমু সাহেব, আমার সঙ্গে চালাকি করতে যাবেন না। আমি চালাকি পছন্দ করি না।'

নীতু আমাকে বারান্দা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এল। টুটি–ফুটি বারান্দায় বসে ছিল। নীতুকে দেখেই উঠে দাঁড়াল। লেজ নাড়তে লাগল। লেজ নাড়া দিয়ে কুকুর কী বোঝাতে চেষ্টা করে? লেজ নেড়ে সে কি বলে — আমি তোমাকে ভালবাসি? ভালবাসার পরিমাণও কি সে লেজ নেড়ে প্রকাশ করে? কেউ কি এই বিষয়টি নিয়ে রিসার্চ করেছে? ইয়াদের মতো কেউ এক জন এসে ব্যাপারটা নিয়ে রিসার্চ করলেই পারে। 'কুকুরের লেজ এবং ভালবাসা'।

আমি মেসে ফিরলাম না। এত সকাল সকাল ফেরা ঠিক হবে না। ইয়াদ হয়তো বসে আছে। রাস্তায় হাঁটতেও ইচ্ছা করছে না। ক্লান্তি লাগছে। কেন জানি মাথায় ভোঁতা ধরনের যন্ত্রণা হচ্ছে। মেসে ফিরে যাওয়াই ভালো। মাথার এই যন্ত্রণা ইদানীং আমাকে কাবু করে ফেলছে। হালকাভাবে শুরু হয় — শেষের দিকে ভয়াবহ অবস্থা! এক সময় ইচ্ছা করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাউকে ডেকে বলি, ভাই, আপনি আমার মাথাটা ছুরি দিয়ে কেটে শরীর থেকে আলাদা করে দিতে পারেন? রূপার চিঠি এখনো পড়া হয় নি। বিছানায় শুয়ে শুয়ে চিঠিটা পড়া যায়। আমি একটা রিকশা নিয়ে নিলাম।

ইয়াদ আমার জন্যে মেসে বসে নেই। এটা একটা সুসংবাদ। আগের মতো টাইপ করা ইংরেজি নোট রেখে গেছে –

'খুঁজে পাচ্ছি না। জরুরি প্রয়োজন।
দয়া করে যোগাযোগ কর। ভিডিও
ক্যামেরা কিনেছি।
ইয়াদ।'

দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ার সময় মনে হল রূপার চিঠি আমার সঙ্গে নেই। নীতুদের বাসায় পুরোনো কাপড়ের সঙ্গে ফেলে এসেছি। কাপড়গুলো ইতোমধ্যে নিশ্চয়ই ধোপার বাড়িতে চলে গেছে।

মাথার যন্ত্রণা বাড়ছে। এই অসহ্য তীব্র যন্ত্রণার উৎস কী? তীব্র আনন্দ যিনি দেন, তীব্র ব্যথাও কি তাঁরই দেয়া? কিন্তু তা তো হবার কথা না। যিনি পরম মঙ্গলময়, ব্যথা তাঁর সৃষ্টি হতে পারে না।

পাশের ঘরে হৈচৈ হচ্ছে। তাসখেলা হচ্ছে নিশ্চয়ই। আজ বৃহস্পতিবার। সপ্তাহে এই একটা দিন মেসে তাসখেলা হয়। শুধু তাস না, অতি সস্তার বাংলা মদ আনা হয়। যাঁরা এই জিনিস খান না, তাঁরাও দু–এক চুমুক খান। সারা রাতই তাঁদের আনন্দিত কথাবার্তা শোনা যায়। এই আনন্দও কি তাঁর দেয়া?

AMARBOI.COM

৩

ধুম ধুম করে দরজায় কিল পড়ছে।

আমি ঘুমের ঘোরে বললাম, 'কে?' কেউ জবাব দিল না। দরজায় শব্দ হতে থাকল। আমার সমস্যা হচ্ছে — শীতের ভোরে একবার লেপের ভেতর থেকে বের হলে আবার ঢুকতে পারি না। এখনো ঠিকমতো ভোর হয় নি — চারদিক আঁধার হয়ে আছে। কাচের জানালায় গাঢ় কুয়াশা দেখা যাচ্ছে। এত ভোরে আমার কাছে আসার মতো কে আছে ভাবতে ভাবতে দরজা খুলে দেখি — ইয়াদ। এই প্রচণ্ড শীতে তার গায়ে একটা ট্রাকিং স্যুট। পায়ে কেড্‌স্ জুতা। নিশ্চয় দৌড়ে এসেছে। চোখ–মুখ লাল। বড় বড় করে শ্বাস নিচ্ছে। ইয়াদ বলল, 'জগিং করতে বের হয়েছিলাম। ভাবলাম, একটা চান্স নিয়ে দেখি তোকে পাওয়া যায় কিনা। কতবার যে এসেছি তোর খোঁজে। এই কদিন কোথায় ছিলি?'

আমি জবাব না দিয়ে বাথরুমে ঢুকে গেলাম। বাথরুমের দরজা ঠেলে ইয়াদও ঢুকে গেল। আমি মুখে পানি দিচ্ছি। ইয়াদ পাশে। সে বলল, 'ছিলি কোথায় তুই?' ইয়াদের স্বভাব–চরিত্রের একটি ভালো দিক হচ্ছে অধিকাংশ প্রশ্নেরই সে কোনো জবাব শুনতে চায় না। প্রশ্ন করা প্রয়োজন বলেই প্রশ্ন করে। জবাব দিলে ভালো, না দিলে ক্ষতি নেই। সে প্রশ্ন করে যাবে তার মনের আনন্দে।

'হিমু!'

'কি?'

'কাল রাতে আমার বউকে তুই খামাখা ভয় দেখালি কেন?'

'ভয় দেখিয়েছি?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'অফকোর্স ভয় দেখিয়েছিস — তুই তাকে বললি আমি নাকি রাতে ফিরব না। এদিকে আমি সত্যি সত্যি আটকা পড়ে গেলাম ছোটখালার বাসায়। ফিরতে ফিরতে রাত দুটা বেজে গেছে। এসে দেখি নীতুর মাথায় পানি ঢালা হচ্ছে — পরিচিত-অপরিচিত সব জায়গায় টেলিফোন করা হয়েছে। ম্যানেজারকে পাঠানো হয়েছে সব হাসপাতালে খোঁজ নিয়ে আসতে। ম্যানেজার ব্যাটা গাড়ি নিয়ে বের হয়ে সেই গাড়ি ড্রেনে ফেলে দিয়েছে।

'এই অবস্থা?'

'হ্যাঁ, এই অবস্থা। নীতুর হাইপারটেনশান আছে। অল্পতেই এমন নার্ভাস হয়। ওর এক জন পোষা সাইকিয়াট্রিস্ট আছে। দুদিন পরপর তার কাছে যায়। একগাদা করে টাকা দিয়ে আসে।'

'তোর তো টাকা খরচ করার পথ নেই — কিছু খরচ হচ্ছে, মন্দ কি?'

'টাকা কোনো সমস্যা না, নীতুই সমস্যা। অল্পতেই এত আপসেট হয় — এই কারণেই তোকে খুঁজছি। নীতুকে সামলানোর ব্যাপারে কী করা যায়?'

'সামলানোর দরকার কি?'

'দরকার আছে। তোর প্রস্তাব আমি গ্রহণ করেছি। ভিখিরি হয়ে যাব। সাত দিনের ক্র্যাশ প্রোগ্রাম। সাত দিন ভিখিরি হয়ে ওদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরব। ভিক্ষা করব।'

'সাত দিনে কিছু হবে না।'

'কত দিন লাগবে?'

'দু বছর।'

'বলিস কী!'

'ঠিকমতো ওদের জানতে হলে ওদের এক জন হতে হবে। ওদের এক জন হতে সময় লাগবে।'

'নীতুকে সামলাব কী করে?'

'যারা ছোটখাটো ঘটনাতে আপসেট হয় তারা বড় ঘটনায় সাধারণত আপসেট হয় না। নীতু সামলে উঠবে। আরো বেশি বেশি করে সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যাবে। তুই ঘর ছাড়ছিস কবে ?'

ইয়াদ বিরক্ত গলায় বলল, 'আমাকে জিজ্ঞেস করছিস কেন? এটা তো তোর উপর নির্ভর করছে। আমি মানসিকভাবে প্রস্তুত। তুই বললেই শুরু করব — তুই একটা ডেট বল্। আমি নীতুকে বলি।'

'আমি ডেট বলব কেন?'

'তুইও তো যাবি আমার সঙ্গে। আমি একা একা পথে পথে ভিক্ষা করব?'

'হ্যাঁ, করিব। তোরই ভিক্ষুকদের জীবনচর্চা দরকার। আমার না।'

'তুই আমার সঙ্গে যাচ্ছিস না?'

'না।'

'ও মাই গড! আমি তো ধরেই রেখেছি তুই যাচ্ছিস। সেইভাবেই প্রস্তুতি নিয়েছি।'

সকালবেলা খালিপেটে আমি সিগারেট খেতে পারি না। শুধুমাত্র বিরক্তিতে আমি সিগারেট ধরালাম। বিরক্তি ভাব গলার স্বরে যথাসম্ভবই ফুটিয়ে তুলে বললাম — 'তুই ভিক্ষা করতে যাবি, সেখানেও এক জন ম্যানেজার নিয়ে যেতে চাস? তুই ভিক্ষা করবি। তোর ম্যানেজার টাকা-পয়সার হিসাব রাখবে। খাওয়াদাওয়া দেখবে। ইট বিছিয়ে আগুন করে পানি ফোটাবে যাতে তুই ফুটন্ত পানি খেতে পারিস। যা ব্যাটা গাধা!

ইয়াদ আহত গলায় বলল, 'গাধা বলছিস কেন?'

'যে যা তাকে তাই বলতে হয়। তুই গাধা, তোকে আমি হাতি বলব? যা বলছি,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিদেয় হ।'

'চলে যেতে বলছিস?'

'হ্যাঁ, চলে যেতে বলছি — আর আসিস না।'

'আর আসব না?'

'না। তোকে দেখলেই বিরক্তি লাগে।'

'বিরক্তি লাগে কেন?'

'বেকুবদের সঙ্গে কথা বললে বিরক্তি লাগবে না?'

'গাধা বলছিস ভালো কথা, বেকুব বলছিস কেন?'

'বাথরুমে ঢুকে পড়েছিস— এই জন্যে বেকুব বলছি।'

ইয়াদ বলল, 'ভুল করে বাথরুমে ঢুকে পড়েছি, খেয়াল করি নি। যাই।'

আমি ওর দিকে না তাকিয়ে বললাম, 'আচ্ছা যা, আর আসিস না।'

ইয়াদ বের হয়ে গেল। আমার মনে হল এতটা কঠিন না হলেও বোধহয় হত। তবে আমার কাছ থেকে এ ধরনের ব্যবহার পেয়ে সে অভ্যস্ত। তার খুব খারাপ লাগবে না। লাগলেও সামলে উঠবে। ইয়াদকে আমার পছন্দ হয়। শুধু পছন্দ না, বেশ পছন্দ। রূঢ় ব্যবহার করতে হয় পছন্দের মানুষদের সঙ্গে। আমার বাবার উপদেশনামার একটি উপদেশ হল —

> *হে মানবসন্তান, তুমি তোমার ভালবাসা লুকাইয়া রাখিও। তোমার পছন্দের মানুষদের সহিত তুমি রূঢ় আচরণ করিও, যেন সে তোমার স্বরূপ কখনো বুঝিতে না পারে। মধুর আচরণ করিবে দুর্জনের সঙ্গে। নিজেকে অপ্রকাশ্য রাখার ইহাই প্রথম পাঠ।*

আমাদের মেসে সকালবেলা চা হয় না। চা খেতে রাস্তার ওপাশে ক্যান্টিনে যেতে হয়। সেই ক্যান্টিনে পৃথিবীর সবচে' মিষ্টি এবং একই সঙ্গে পৃথিবীর সবচে' গরম চা পাওয়া যায়। এই চা প্রথম দুদিন খেতে খারাপ লাগে। কিন্তু তৃতীয় দিন থেকে নেশা ধরে যায়। ঘুম থেকে উঠেই কয়েক কাপ চা খেতে ইচ্ছা করে।

ক্যান্টিনে পা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম ইয়াদ আবার আসছে। সে আমাকে দেখতে পেয়েছে। হয়তো আশা করছে আমি হাত ইশারা করে তাকে ডাকব। আমি কিছুই করলাম না। মুখ কঠিন করে অন্যদিকে তাকিয়ে রইলাম।

ইয়াদ সামনের চেয়ারে বসতে বসতে বলল, 'তুই কাল রাতে আমাদের বাড়িতে একটা চিঠি ফেলে এসেছিলি। নিয়ে এসেছিলাম, দিতে ভুলে গেছি।' আমি ইয়াদের হাত থেকে চিঠি নিয়ে পকেটে রেখে দিলাম।

ইয়াদ বলল, 'পড়বি না?'

'এক সময় পড়ব। তাড়া নেই।'

'নীতু বলে দিয়েছে এটা নাকি জরুরি চিঠি।'

'ও পড়েছে বুঝি?'

ইয়াদ অপ্রস্তুত গলায় বলল, 'মনে হয় পড়েছে। ওর খুব সন্দেহবাতিক। হাতের কাছে খাম পেলে খুলে পড়ে ফেলে। খামে যার নামই থাকুক সে পড়বেই। সরি।'

'তোর সরি হবার কিছু নেই। চা খাবি?'

'খাব।'

আমি ইয়াদকে চা দিতে বলে উঠে দাঁড়ালাম। সে বিস্মিত হয়ে বলল, 'যাচ্ছিস কোথায়?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কাজ আছে।'

'চা-টা শেষ করি — তারপর যা।'

'সময় নেই — খুব তাড়া।'

আমি ইয়াদকে রেখে মেসে ফিরে এলাম। দরজা বন্ধ করে লেপের ভেতর ঢুকে পড়লাম। আজ আমার কোনো প্ল্যান নেই — সারাদিন ঘুমাব। ঘুম এবং উপবাস। সন্ধ্যায় উপবাস ভঙ্গ করব এবং বিছানা থেকে নামব।

বিশ্রামের সবচে' ভালো টেকনিক হল — কুকুরকুণ্ডলী হয়ে শুয়ে পড়া। মায়ের পেটে আমরা যে ভঙ্গিতে থাকি — সেই ভঙ্গিটি নিয়ে আসা। মায়ের পেটে গাঢ় অন্ধকার — কাজেই যেখানে বিশ্রাম নিতে হবে সে জায়গাটাও হতে হবে অন্ধকার, গাঢ় অন্ধকার। তাপ হতে হবে সামান্য বেশি। কারণ জরায়ুর তাপ শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রার চেয়ে তিন ডিগ্রি বেশি।

আমার ঘর এমনিতেই অন্ধকার। কম্বলে নাক-মুখ ঢেকে অন্ধকার আরো বাড়ানো হল। আমি কুণ্ডলী পাকিয়ে শোয়ামাত্র দরজার কড়া নড়ল। আমাদের মেসের মালিক এবং ম্যানেজার জীবনবাবু মিহি গলায় ডাকলেন — 'হিমু ভাই, হিমু ভাই।'

জীবনবাবুর ডাকে সাড়া দিতেই হবে এমন কোনো কথা নেই, তিনি আমার কাছে মেসভাড়া পান না। মাসের শুরুতেই ভাড়া দেয়া হয়েছে। ইচ্ছা করলেই চুপচাপ শুয়ে থাকা যায়, তবে তা করা সম্ভব না। কারণ জীবনবাবুর ধৈর্য রবার্ট ব্রুসের চেয়েও বেশি। তিনি ডাকতেই থাকবেন। কড়া নাড়তেই থাকবেন। সিল্কের মতো মোলায়েম গলায় ডাকবেন। চুড়ির শব্দের মতো শব্দে কড়া নাড়বেন।

'হিমু ভাই, হিমু ভাই।'

'কী ব্যাপার?'

'ঘুমাচ্ছেন।'

'যদি বলি ঘুমাচ্ছি তাহলে কি বিশ্বাস করবেন?'

'একটু আসুন, বিরাট বিপদে পড়েছি।'

দরজা খুলতে হল। জীবনবাবু ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। ফিসফিস করে বললেন, 'মাথায় বাড়ি পড়েছে হিমু ভাই। অকূল সমুদ্রে পড়েছি।'

'বলুন কী ব্যাপার?'

জীবনবাবু গলার স্বর আরো নামিয়ে ফেললেন। কোনো সাধারণ কথাই তিনি ফিসফিস না করে বলতে পারেন না। বিশেষ কিছু নিশ্চয়ই ঘটেছে, কারণ আমি তাঁর কোনো কথাই প্রায় শুনতে পারছি না।

'আরেকটু জোরে বলুন জীবনবাবু। কিছু শুনতে পাচ্ছি না।'

'প্রতি বৃহস্পতিবার মেসের ছয় নম্বর ঘরে তাসখেলা হয় জানেন তো?'

'জানি।'

'গত রাতে তাসখেলা নিয়ে মারামারি। মুর্শিদ সাহেব মশারির ডাণ্ডা খুলে জহির সাহেবের মাথায় বাড়ি মেরেছে। রক্তারক্তি কাণ্ড!'

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, 'জহির সাহেব কি মারা গেছেন?'

'মারা যায় নাই — তবে বেকায়দায় বাড়ি পড়লে উপায় ছিল? খুনখারাবি হলে পুলিশ আগে কাকে ধরত? আমাকে। আমি হলাম মাইনরিটি দলের লোক। হিন্দু। সব চাপ যায় মাইনরিটির উপর। আপনারা মেজরিটি হয়ে বেঁচে গেছেন।'

'এইটাই আপনার বিশেষ কথা?'

'জ্বি।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমাকে কিছু করতে বলছেন? তাস ওদেরকে কি না খেলতে বলব?'

'না না, আপনার কিছু বলার দরকার নেই। ঘটনাটা আপনাকে জানিয়ে রাখলাম। খুনখারাবি যদি সত্যি কিছু হয় — তা হলে পুলিশের কাছে — আমার হয়ে দু-একটা কথা বলবেন।'

'আচ্ছা বলব। এখন তাহলে যান। আজ সারা দিন ঘুমাব বলে প্ল্যান করেছি। আজ হল আমার ঘুম-দিবস।'

জীবনবাবু নড়লেন না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন। আমি বললাম, 'আরো কিছু বলবেন?'

'জ্বি, বলব। মনে পড়ছে না। মনে করার চেষ্টা করছি।'

'তেমন জরুরি কিছু নয়। জরুরি হলে মনে পড়ত।'

'মনে পড়েছে — এক জন মহিলা এসেছিলেন আপনার কাছে।'

'রূপা?'

'জ্বি না — উনি না। উনাকে তো চিনি। যিনি এসেছিলেন তাঁকে আগে কখনো দেখি নি — নাম বলেছিলেন। নামটা মনে পড়ছে না। স্মৃতিশক্তি পুরোপুরি গেছে। মাইনরিটির লোক তো — সারাক্ষণ টেনশানে থেকে থেকে ব্রেইন গেছে।'

'মেয়েটা কিছু বলে গেছে?'

'মেয়ে না তো, পুরুষমানুষ। আমাকে নাম বললেন, একবার না, কয়েকবার বললেন।'

'আপনি দয়া করে বিদেয় হন।'

'নামটা মনে করার চেষ্টা করছি। মনে পড়ছে না। বললাম না আপনাকে — ব্রেইন একেবারে গেছে। কিছুই মনে থাকে না। ঐদিন দুপুরে ভাত খেতে গেছি — অতসী বলল — বাবা, তুমি না একটু আগে ভাত খেয়ে গেলে! বুঝুন অবস্থা! এদিকে ব্লাডপ্রেসারও নেমে গেছে। ব্লাডপ্রেসার হয়েছে সিক্সটি। সিক্সটি ব্লাডপ্রেশার মানুষের হয় না। গরু-ছাগলের হয়। গরু-ছাগলের পর্যায়ে চলে গেছি হিমু ভাই . . .'

জীবনবাবুকে বিদেয় করে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। আশঙ্কা নিয়ে শুয়ে আছি। যে কোনো মুহূর্তে ভদ্রলোকের নাম জীবনবাবুর মনে পড়বে। তিনি দরজায় ধাক্কা দিতে দিতে ডাকবেন — 'হিমু ভাই, হিমু ভাই।'

ঘুম আনার চেষ্টা করছি। লাভ হচ্ছে না। কোনোভাবেই শুয়ে আরাম পাচ্ছি না। বুকপকেটে রাখা রূপার খামটা খচখচ করছে। তার চিঠিটা পড়ে ফেলা দরকার। চিঠি পড়ার মুহূর্ত আসছে না। প্রিয় চিঠি পড়ার জন্যে প্রয়োজন প্রিয় মুহূর্তের। আমার প্রিয় মুহূর্ত হল মধ্যরাত, যখন পৃথিবীর সব তক্ষক গম্ভীর স্বরে দু বার ডেকে ওঠে।

দরজায় আবার ঠকঠক শব্দ হচ্ছে। জীবনবাবু ডাকলেন — 'হিমু ভাই, হিমু ভাই।'

আমি জবাব না দিয়ে রূপার চিঠি বের করলাম।

'হিমু ভাই।'

'বলুন। কথা কি মনে পড়েছে?'

'জ্বি না, মনে পড়ে নি। অন্য একটা কথা বলতে এসেছি। বলব?'

'বলুন।'

'তাসখেলা নিয়ে উনাদের কিছু বলবেন না। রাগ করতে পারেন।'

'আচ্ছা বলব না। আর শুনুন জীবনবাবু, এখন একটা জরুরি কাজ করছি — চিঠি পড়ছি। আমাকে বিরক্ত করবেন না। ঐ লোকের নাম মনে পড়লে কাগজে লিখে ফেলবেন।'

'জ্বি আচ্ছা।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘরে চিঠি পড়ার মতো আলো নেই — আধো আলো আধো আঁধারে আমি চিঠি পড়ছি—

ভেবেছিলাম তোমার জন্মদিনে উদ্ভট কিছু করে তোমাকে চমকে দেব। কী করা যায় অনেক ভাবলাম। দামি গিফ্‌টের ব্যাপারে তোমার আসক্তি নেই — মাঝখান থেকে টাকা নষ্ট হবে। তারপর ভাবলাম সব কটি দৈনিক পত্রিকায় একপাতার বিজ্ঞাপন দিই — বিজ্ঞাপনে লেখা থাকবে — শুভ জন্মদিন হিমু! বাবার ম্যানেজার সাহেবকে ডেকে এনে বললাম পরিকল্পনার কথা। শুনে তাঁর চোয়াল ঝুলে পড়ল। তিনি হাঁ করে তাকিয়ে আছেন তো তাকিয়েই আছেন। আমি বললাম — পরিকল্পনাটা আপনার কাছে ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে না?'

তিনি বললেন, 'হচ্ছে।'

আমি বললাম, 'তাহলে খোঁজ নিয়ে বলুন কত লাগবে। আমি চেক লিখে দিচ্ছি।'

তিনি বললেন, 'হিমু লোকটা কে?'

'আমার চেনা এক জন। পাগলা ধরনের মানুষ।'

তিনি মাথা চুলকে বললেন, 'পাগলা ধরনের একজন মানুষের জন্মদিনের কথা যত কম লোক জানে ততই ভালো। দেশসুদ্ধ লোককে জানিয়ে লাভ কি?'

ম্যানেজার চাচার কথা আমার মনে ধরল। আসলেই তো, সবাইকে জানিয়ে কী হবে? যার জানার কথা সেই তো জানবে না। তুমি নিজেই তো পত্রিকা পড় না।

ম্যানেজার চাচা বললেন, 'মা, তুমি সুন্দর দেখে একটা কার্ড কিনে লিখে দাও — হ্যাপি বার্থ ডে। আমি উনাকে দিয়ে আসব। একশ টাকার মধ্যে গোলাপের তোড়া পাওয়া যায়, তার একটাও না হয় সঙ্গে দিয়ে দেব।'

আমি বললাম, 'আচ্ছা, তাই করব।'

ম্যানেজার চাচা চলে গেলেন, যাবার সময় অদ্ভুত চোখে আমার দিকে তাকাতে লাগলেন, যেন আমার নিজের মাথার সুস্থতা নিয়েও তাঁর সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে।

হিমু, আমি আসলেই খানিকটা অসুস্থ বোধ করছি। নানান ধরনের ছোটখাটো পাগলামি করছি। ইচ্ছা করে যে করছি তা নয়। সেদিন বাবার সঙ্গে ঝগড়া করলাম। আমার ছোটমামা স্টেটস থেকে মেম-বউ নিয়ে দেশে এসেছেন। সেই মেমসাহেবের সম্মানে পার্টি। সবাই সেজেগুজে তৈরি হয়ে আছে। আমি নিজেও খুব সেজেছি। গয়নাটয়না পরে একটা কাণ্ড করেছি — গাড়িতে ওঠার সময় কী যে হল, আমি বললাম, 'আমার যেতে ইচ্ছা করছে না।'

বাবা বললেন, 'তার মানে কি?'

আমি বললাম, 'আমার রিসিপশনে যেতে ভালো লাগছে না।'

'তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে?'

'না, শরীর খারাপ লাগছে না — শুধু যেতে ইচ্ছা করছে না।'

বাবা বললেন, 'তুমি আমার সঙ্গে ড্রয়িংরুমে আস। আমি তোমাকে কয়েকটা কথা বলব।'

সবাই গাড়ি বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইল। বাবা আমাকে নিয়ে ড্রয়িংরুমে গেলেন। স্কুলের হেডমাস্টারদের মতো গলায় বললেন, 'সিট ডাউন ইয়াং লেডি।'

আমি বসলাম। বাবা বললেন, 'তোমার ছোটমামাকে যে পার্টি দেয়া হচ্ছে সেই পার্টি আমরা দিচ্ছি। আমরা হচ্ছি হোস্ট। কাজেই আমাদের উপস্থিত থাকতেই হবে। তোমার শরীর খারাপ থাকলে তোমাকে কিছু বলতাম না। তোমার শরীর ভালো আছে। তোমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেতে ইচ্ছা করছে না, সেটা বুঝতে পারছি। অনেক সময় আমাদের অনেক কিছু করতে ইচ্ছা করে না। তবু আমরা করি। মানুষ হয়ে জন্মালে সামাজিক রীতিনীতি মানতে হয়। এখন চল আমার সঙ্গে — সবাই দাঁড়িয়ে আছে।'

আমি বললাম, 'না।'

বাবা খুব অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। আমি বুঝতে পারছি ভেতরে ভেতরে রাগে তিনি কাঁপছেন। তার পরেও রাগ সামলে নিয়ে বললেন, 'রূপা, তুমি না হয় খানিকক্ষণ থেকে চলে এস।'

আমি আবারো বললাম, 'না।' বাবা আর কিছু বললেন না। আমাকে রেখে চলে গেলেন। খালি বাসায় আমি একা। তখন আবার মনে হল — কেন যে থাকলাম, চলে গেলেই হত!

হিমু, আমি এরকম হয়ে যাচ্ছি কেন বল তো? ইদানীং বিকট বিকট সব দুঃস্বপ্ন দেখছি। শুধু যে বিকট তাই না — নোংরা সব স্বপ্ন। এত নোংরা যে ভাবলে শিউরে উঠতে হয়। কী দেখি জান? দেখি লম্বা রোগা বিকলাঙ্গ এক জন মানুষ আমার সামনে নগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমার সারা গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করছে। কুষ্ঠরোগীর হাতের মতো হাত। তার হাত থেকে পুঁজ, রক্ত আমার সারা গায়ে লেগে যাচ্ছে। চিৎকার করে জেগে উঠি। সার গা ঘিনঘিন করতে থাকে। আমি বাথরুমে ঢুকে সাবান দিয়ে গা ধুই। হিমু, আমার কী হচ্ছে বল তো। আমার মাথাটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে কিনা কে জানে। তোমার সঙ্গে অনেক দিন দেখা হয় না। দেখা হলে বলতাম, আমার হাতটা একটু দেখে দাও তো!

কোথায় জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাব তা না, আজেবাজে সব কথা বলে সময় নষ্ট করছি। জন্মদিনের শুভেচ্ছা নাও। আমি কথার কথা হিসেবে শুভেচ্ছা বলছি না। আমি মনেপ্রাণে কামনা করছি। তোমার দিন সুন্দর হোক।

রাতে দরজা-জানালা বন্ধ করে আমি অনেকক্ষণ তোমার জন্যে প্রার্থনা করেছি, যেন তুমি সুখে থাক। মধ্যবিত্তের সহজ সুখ নয় — অসাধারণ সুখ — খুব অল্প মানুষই যে সুখের সন্ধান পায়।

তোমার সঙ্গে অনেকদিন আমার দেখা হয় না। এবার দেখা হলে কী করব জান? এবার দেখা হলে তোমাকে যশোর নিয়ে আসব। এখানে আমাদের একটা খামারবাড়ি আছে। বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি। চারদিক গাছগাছড়ায় ঢাকা। বাড়ির সামনেই পুকুর। তোমাকে ঐ খামারবাড়িতে নিয়ে যেতে চাই — একটা জিনিস দেখানোর জন্যে — সেটা হচ্ছে — পুকুরের পানি কত পরিষ্কার হতে পারে সেটা স্বচক্ষে দেখা। শীত, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত সব সময় এই পুকুরের পানি কাচের মতো ঝকঝক করছে। আমি এই পুকুরের নাম দিয়েছি — 'অশ্রুদিঘি।' বল তো কেন?

আমার জীবনের অসংখ্য বাসনার একটি হচ্ছে কোনো এক ভরা পূর্ণিমায় তোমার সঙ্গে অশ্রুদিঘিতে সাঁতার কাটব। অথচ মজার ব্যাপার হচ্ছে আমি সাঁতার জানি না।

আচ্ছা হিমু, আমার এই চাওয়া কি খুব বড় কিছু চাওয়া? আমি কখনো কারো কাছে কিছু চাই না। ঠিক করেছি এ জীবনে কিছু চাইব না। আলাদীনের চেরাগের দৈত্য যদি হঠাৎ উপস্থিত হয়ে আমাকে বলে — 'রূপা, চট করে বল। তোমার তিনটা ইচ্ছা আমি পূর্ণ করব।' তাহলে মাথা চুলকে আমি বলব, 'স্যার থ্যাংক ইউ, আপনার কাছে আমার কিছু চাইবার নেই। আমার যা চাইবার তা চাইতে হবে হিমুর কাছে। ওকে একটু আমার কাছে এনে আপনি বিদেয় হোন। আপনার গা থেকে বিশ্রী গন্ধ আসছে। . . . . .'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দরজায় মিহি করে টোকা পড়ছে। জীবনবাবু কয়েকবার কেশে ফিসফিস করে ডাকলেন, ‘হিমু ভাই! হিমু ভাই!’

আমি চিঠি পড়া বন্ধ রেখে বললাম, ‘কী হল জীবনবাবু?’

‘নামটা মনে পড়েছে।’

‘বলুন। বলে বিদেয় হোন।’

‘এটা ছাড়াও আরো একটা কথা বলতে চাচ্ছি।’

‘কাগজে লিখে রাখুন। আমি পরে পড়ব।’

লিখে রাখতে গিয়েছিলাম — তারপর দেখি বল পয়েন্টে কালি নেই। আপনার কাছে কি বল পয়েন্ট আছে?’

আমি দরজা খুলে বললাম, ‘লিখতে হবে না। মুখে বলুন, শুনে নিচ্ছি।’

‘তরঙ্গিনী স্টোর থেকে মুহিব সাহেব এসেছিলেন।’

‘কিছু বলেছেন?’

‘জ্বি না, কিছু বলেন নি।’

‘ও, আচ্ছা।’

‘প্রায় সারা দিন বসে ছিলেন। দুপুরে কিছু খানও নি। এক কাপ চা আনিয়ে দিয়েছিলাম — সেটাও খান নি।’

‘চা না খাওয়ারই কথা। মুহিব সাহেব চা পান সিগারেট কিছুই খান না। কী জন্যে এসেছিলেন কিছু বলেন নি?’

‘জ্বি না।’

‘আচ্ছা, ঠিক আছে। এখন তা হলে যান।’

‘অন্য আরেকটা কথা হিমু ভাই। গোপন কথা।’

‘বলুন কী বলবেন?’

জীবনবাবু বসলেন। মাথা নিচু করে বসলেন। অসহায় বসার ভঙ্গি।

‘খুব বিপদে পড়েছি হিমু ভাই। ভয়ংকর বিপদ।’

‘বলুন।’

‘আজ থাক, অন্য একদিন বলব।’

‘আপনার মেয়ে ভালো আছে তো?’

‘জ্বি জ্বি। মেয়ে ভালো আছে। ওর কোনো সমস্যা না। মেয়েটার বিয়েও মোটামুটি ঠিকঠাক। সিরাজগঞ্জের ছেলে। কাপড়ের ব্যবসা আছে। অতসীকে দেখে পছন্দ করেছে। তিন লাখ টাকা পণ চাচ্ছে। দেব তিন লাখ টাকা। মেসবাড়িটা বেচে দেব। একটাই তো মেয়ে। আমিও একা মানুষ — মেয়ে বিয়ে দিয়ে বাকি জীবনটা হোটেলে কাটিয়ে দেব। বুদ্ধিটা ভালো না হিমু ভাই?’

‘হ্যাঁ, ভালো।’

‘আমি আজ উঠি, অন্য আরেকদিন এসে আমার বিপদের কথাটা বলব।’

‘আমাকে বললে আপনার বিপদ কি কমবে? যদি মনে করেন বিপদ কমবে, তা হলে বলুন। আর যদি বিপদ না কমে, শুধু শুধু কেন বলবেন?

রূপার চিঠির শেষটা আমার পড়া হল না। চিঠি ভাঁজ করে পকেটে রেখে দিলাম — আজ থাক। অন্য কোনো সময় পড়া যাবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪

বড় রাস্তার ফুটপাতে উবু হয়ে বসে বয়স্ক এক ভদ্রলোক ঠোঙা থেকে বাদাম নিয়ে নিয়ে খাচ্ছেন। খাওয়ার ব্যাপারটায় বেশ আয়োজন আছে। খোসা থেকে বাদাম ছাড়ানো হয়। খোসাগুলো রাখা হয় সামনে। ভদ্রলোক অনেকক্ষণ বাদামে ফুঁ দিতে থাকেন। ফুঁয়ের কারণে বাদামের গায়ে লেগে থাকা লাল খোসা উড়ে যায়। তখন তিনি অনেক উপর থেকে একটা একটা করে বাদাম তাঁর মুখে ফেলেন। আমি কৌতূহলী হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। আমার মতো আরো কয়েকজন কৌতূহলী হয়েছে। তারাও দেখি দূর থেকে তাকিয়ে আছে।

ভদ্রলোক শেষ বাদামের টুকরো ফেলে উঠে দাঁড়ালেন। আমার দিকে তাকিয়ে আনন্দিত গলায় বললেন, 'ছোটমামা না?'

আজ তিনিই প্রথম আমাকে চিনলেন। আমি চিনতে পারি নি। এখন চিনলাম — মোরশেদ সাহেব। ঐদিন স্যুট-টাই পরা ছিলেন, আজ পায়জামা পাঞ্জাবি চাদর। ভদ্রলোককে পায়জামা-পাঞ্জাবিতে আরো সুন্দর লাগছে।

'কী করছিলেন মোরশেদ সাহেব?'

'বাদাম খাচ্ছিলাম। অনেক দিন বাদাম খাই না। একটা ছেলে গরম গরম বাদাম ভাজছিল। দেখে লোভ লাগল। দু টাকার কিনলাম। অনেকে হাঁটতে হাঁটতে বাদাম খেতে পারে। আমি পারি না। ফুটপাতে বসে বাদাম খাচ্ছিলাম। লোকজন এমনভাবে তাকাচ্ছিলেন যেন আমি একটা পাগল।'

'আপনি ভালো আছেন?'

'জ্বি ছোটমামা, ভালো।'

'এষা, এষা কেমন আছে?'

'মনে হয় ভালোই আছে। আর খারাপ থাকলেও তো আমাকে বলবে না।'

'আপনি কি এর মধ্যে গিয়েছিলেন ওর কাছে?'

'আমি তো দু-তিন দিন পরপর যাই। ও খুব বিরক্ত হয়। তার পরেও যাই।'

'যান ভালো করেন। নিজের স্ত্রীর কাছে যাবেন না তো কার কাছে যাবেন?'

মোরশেদ সাহেব বিষণ্ন গলায় বললেন, 'এষাকে এখনো স্ত্রী বলা ঠিক হবে কিনা বুঝতে পারছি না। ও উকিলের নোটিশ পাঠিয়েছে। ডিভোর্স চায়।'

'নোটিশ কবে পাঠিয়েছে?'

'কবে পাঠিয়েছে সেই তারিখ দেখি নি। আমি পেয়েছি আজ। মন খুব খারাপ হয়েছে। আপনি হয়তো বিশ্বাস করবেন না ছোটমামা, নোটিশ পাওয়ার পর আমার চোখে পানি এসে গেল। সকালে যখন নাশতা খাচ্ছি তখন নোটিশটা এসেছে। তারপর আর নাশতা খেতে পারি না। পরোটা ছিঁড়ে মুখে দিয়েছি। চাবাচ্ছি তো চাবাচ্ছিই, গলা দিয়ে আর নামছে না। এক ঢোক পানি খেলাম, যদি পানির সঙ্গে পরোটা নেমে যায়। পানি পেটে চলে গেল কিন্তু পরোটা মুখে রইল।'

'আসুন মোরশেদ সাহেব, কোথাও গিয়ে বসি। আপনাকে ক্লান্ত লাগছে। সারা দিনই বোধহয় হাঁটাহাঁটি করছেন?'

'জ্বি। দুপুরেও কিছু খাই নি। এমন খিদে লেগেছে। তারপর বাদাম কিনে ফেললাম দু টাকার। কিনতাম না, ছেলেটা গরম গরম বাদাম ভাজছিল। দেখে খুব লোভ লাগল।'

আমি ভদ্রলোককে নিয়ে গেলাম সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে। সময় কাটানোর জন্যে খুব ভালো জায়গা। জোড়ায় জোড়ায় ছেলেমেয়ে গল্প করে। দেখতে ভালো লাগে। এরা যখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গল্প করে তখন মনে হয় পৃথিবীতে এরা দুজন ছাড়া আর কেউ নেই। কোনোদিন থাকবেও না। ক্ষুধা-তৃষ্ণা-শীত-বর্ষা কোনোকিছুই এদের স্পর্শ করে না। একবার ঘোর বর্ষায় দুজনকে দেখেছি ভিজে ভিজে গল্প করছে। মেয়েটি কাজল পরে এসেছিল। পানিতে সেই কাজল ধুয়ে তাকে ডাইনীর মতো লাগছিল। সেই ভয়ংকর দৃশ্যও ছেলেটির চোখে পড়ছে না। সে তাকিয়ে আছে মুগ্ধ চোখে।

'মোরশেদ সাহেব।'

'জ্বি?'

'কিছু খাবেন? এখানে ভ্রাম্যমাণ হোটেল আছে, চা, কোল্ড ড্রিংস এমনকি বিরিয়ানির প্যাকেট পর্যন্ত পাওয়া যায়।'

'আমি কিছু খাব না। আচ্ছা ছোটমামা, আপনি আমাকে মোরশেদ সাহেব ডাকেন কেন? আপনি আমার নাম ধরে ডাকবেন। আপনি হচ্ছেন এষার মামা।'

'আচ্ছা তাই ডাকব। এখন বলুন তো দেখি — এষা আপনাকে ডিভোর্স দিতে চাচ্ছে কেন?'

'আমি তো মামা অসুস্থ। খারাপ ধরনের এপিলেপ্সি। ডাক্তাররা বলেন গ্রান্ডমোল। একেকবার যখন অ্যাটাক হয় ভয়ংকর অবস্থা হয়। অসুখের জন্য চাকরি টাকরি সব চলে গেছে।'

'অ্যাটাক কি খুব ঘন ঘন হয়?'

'আগে হত না। এখন হচ্ছে।'

'চিকিৎসা করাচ্ছেন না?'

'চিকিৎসা তো মামা নেই। ডাক্তাররা কড়া ঘুমের ওষুধ দেন। এগুলো খেয়ে খেয়ে মাথা কেমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। আমাদের বাসার সামনে কোনো আমগাছ নেই। কিন্তু যখনই আমি বাইরে থেকে বাসায় যাই তখনি আমি দেখি বিশাল এক আমগাছ।'

'চোখে দেখেন?'

'জ্বি, দেখি। শুধু গাছটা দেখি তাই না, গাছে পাখি বসে থাকে, সেগুলো দেখি। ওরা কিচিরমিচির করে, সেই শব্দ শুনতে পাই।'

'বলেন কী!'

মোরশেদ সাহেব দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'এক জন সাইকিয়াট্রিস্টের সঙ্গে কথা বলা দরকার। কিন্তু যেতে ইচ্ছা করে না। তার উপর শুনেছি ওরা অনেক টাকা নেয়। জমানো টাকা খরচ করে করে চলছি তো মামা। প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।'

'আমার চেনা এক জন সাইকিয়াট্রিস্ট আছেন। আমি একদিন তাঁর কাছে আপনাকে নিয়ে যাব।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'চলুন, আপনাকে বাসায় দিয়ে আসি।'

'আমি এখন বাসায় যাব না মামা। উকিল নোটিশটা টেবিলে ফেলে এসেছি। বাসায় গেলেই নোটিশটা চোখে পড়বে। মনটা হবে খারাপ। এখানে বসে থাকতেই ভালো লাগছে।'

'বেশ, তা হলে বসে থাকুন।'

মোরশেদ সাহেব ইতস্তত করে বললেন, 'মামা, আপনি কি একটু এষার সঙ্গে কথা বলে দেখবেন? কোনো লাভ হবে না জানি, তবু যদি একটু . . .'

'আমি বলব।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমার একটা ক্যামেরা আছে। ক্যামেরাটা বিক্রি করে দেব বলে ঠিক করেছি। হাত একেবারে খালি হয়ে এসেছে। দেখবেন তো কাউকে পাওয়া যায় কিনা। বিয়ের সময় কিনেছিলাম। এষার খুব ছবি তোলার শখ ছিল। ওর জন্যেই কেনা।'

'আচ্ছা দেখব, ক্যামেরা বিক্রি করা যায় কিনা।'

'থ্যাংকস মামা। আপনি সাইকিয়াট্রিস্ট ভদ্রলোকের সঙ্গেও একটু কথা বলবেন। কত টাকা নেন, এইসব।'

আমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চলে এলাম। মোরশেদ সাহেব পা তুলে সন্ন্যাসীর ভঙ্গিতে বসে আছেন। দূর থেকে দৃশ্যটা দেখতে ভালো লাগছে।

নীতু এক জন সাইকিয়াট্রিস্টের ঠিকানা দিয়ে দিয়েছিল। কার্ডটা হারিয়ে ফেলেছি। নীতুর কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে একবার ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করে আসতে হবে।

৫

নীতুর সাইকিয়াট্রিস্ট ভদ্রলোকের নাম ইরতাজুল করিম। নামের শেষে এ বি সি ডি অনেক অক্ষর। এতগুলো অক্ষর যিনি জোগাড় করেছেন তাঁর অনেক বয়স হবার কথা, কিন্তু ভদ্রলোক মধ্যবয়স্ক এবং হাসিখুশি। মুখে জর্দা দেয়া পান। বিদেশি ডিগ্রিধারী ভদ্রলোকেরা জর্দা দেয়া পান খান না। আর খেলেও বাড়িতে চুপিচুপি খান। কেউ এলে দাঁত মেজে বের হন। এই ভদ্রলোক দেখি বেশ আয়েশ করে পান খাচ্ছেন। এবং পিক করে অ্যাশট্রেতে পানের পিক ফেলছেন। তাঁর চেম্বারটাও সুন্দর। অফিস অফিস লাগে না, মনে হয় ড্রয়িংরুম। ডাক্তার সাহেবের ঠিক মাথার উপর ক্লঁদ মনের আঁকা water lily-র বিখ্যাত পেইনটিঙের প্রিন্ট। প্রিন্ট দেখতেই এত সুন্দর, আসলটা না জানি কত সুন্দর! আমি ডাক্তার সাহেবের সামনের চেয়ারটায় বসলাম। ভদ্রলোক আমার দিকে ঝুঁকে এসে বললেন, 'কেমন আছেন হিমু সাহেব?'

'জ্বি ভালো।'

'ইয়াদ সাহেবের স্ত্রী মিসেস নীতু অনেক দিন আগেই আপনার ব্যাপারে আমাকে টেলিফোন করেছিলেন। তাও একবার না, দুবার। তাদের মতো ফ্যামিলি থেকে যখন দু বার টেলিফোন আসে তখন চিন্তিত হতে হয়। আমি চিন্তিত হয়েই আপনার জন্যে অপেক্ষা করছি। আরাম করে বসুন তো।'

আমি নড়েচড়ে বসলাম। ডাক্তার সাহেব আমার দিকে ঝুঁকে এসে বললেন, 'আসতে এত দেরি করেছেন কেন?'

'টাকা-পয়সা ছিল না, তাই দেরি করেছি। আপনি কত টাকা নেন তা তো জানি না।'

'আমি অনেক টাকা নিই। তবে টাকা নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না। আপনার চিকিৎসার সমস্ত ব্যয়ভার মিসেস নীতু নিয়েছেন।'

'আমি তাহলে অসুস্থ?'

'উনার তাই ধারণা।'

'আপনার কী ধারণা ডাক্তার সাহেব?'

'আপনার সঙ্গে খানিকক্ষণ কথাবার্তা না বলে ধরতে পারব না।'

'কথাবার্তা বললেই ধরতে পারবেন?'

'হ্যাঁ পারব। পারা উচিত। অবশ্যি আমার প্রশ্নের উত্তরে আপনাকে সত্যি কথা বলতে হবে। আমাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করবেন না। অধিকাংশ লোক তাই করে —

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাইকিয়াট্রিস্টদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে।'

'বিভ্রান্ত করার চেষ্টা থেকেই তো আপনার ধরতে পারার কথা — লোকটি কী চায়? তার সমস্যা কী?'

'ধরতে চেষ্টা করি। সব সময় পারি না। মানুষের ব্রেইন নিয়ে আমাদের কাজকর্ম — সেই ব্রেইন কেমন জটিল তা কি আপনি জানেন হিমু সাহেব?'

'জানি না, তবে আঁচ করতে পারি।'

'না, আপনি আঁচও করতে পারেন না। মানুষের ব্রেইনে আছে এক বিলিয়ন নিউরোন। এক একটি নিউরোনের কর্মপদ্ধতি বর্তমান আধুনিক কম্পিউটারের চেয়ে জটিল। বুঝতে পারছেন কিছু?'

'না।'

'বুঝতে পারার কথাও না। এখন আমরা কথা বলা শুরু করি। আপনি বেশ রিলাক্সড ভঙ্গিতে নিজের কথা বলুন তো শুনি। যা মনে আসে বলতে থাকুন। নিজের কথা বলুন, নিজের বাবা–মা, আত্মীয়স্বজনের কথা বলুন, বন্ধুবান্ধবের কথা বলুন। চা খেতে খেতে, সিগারেট খেতে খেতে বলুন।'

'আমাকে কি কৌচে শুয়ে নিতে হবে না?'

'না, ঐসব ফ্রয়েডীয় পদ্ধতি বাতিল হয়ে গেছে। আপনি শুরু করুন।'

'আপনার কি তাড়া আছে ডাক্তার সাহেব?'

'না, আমার কোনো তাড়া নেই। অন্যসব রোগী বিদায় করে দিয়েছি। আপনি হচ্ছেন বিশেষ এক রোগী, ভেরি স্পেশাল। চা দিতে বলি, নাকি কফি খাবেন?'

'চা কফি কিছুই লাগবে না। যা শুনতে চাচ্ছেন বলছি। দুভাবে বলতে পারি — সাধারণভাবে কিংবা ইন্টারেস্টিং করে। কীভাবে শুনতে চান?'

'সাধারণভাবেই বলুন। ইন্টারেস্টিং করার প্রয়োজন দেখছি না। আমার ধারণা এমনিতেই ইন্টারেস্টিং হবে।'

'আমি কি পা উঠিয়ে বসতে পারি?'

'পারেন।'

আমি জীবন ইতিহাস শুরু করলাম।

'ডাক্তার সাহেব, আমার বাবা ছিলেন এক জন অসুস্থ মানুষ। সাইকোপ্যাথ। এবং আমার ধারণা খুব খারাপ ধরনের সাইকোপ্যাথ। তাঁর মাথায় কী করে যেন ঢুকে গেল — মহাপুরুষ তৈরি করা যায়। যথাযথ ট্রেনিং দিয়েই তা করা সম্ভব। তাঁর যুক্তি হচ্ছে — ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ডাকাত, খুনী যদি শিক্ষা এবং ট্রেনিঙে তৈরি করা যায়, তা হলে মহাপুরুষ কেন তৈরি করা যাবে না? অসুস্থ মানুষদের চিন্তা হয় সিঙ্গেল ট্র্যাকে। তাঁর চিন্তা সেইরকম হল — তিনি মহাপুরুষ তৈরির খেলায় নামলেন। আমি হলাম তাঁর একমাত্র ছাত্র। তিনি এগুলেন খুব ঠাণ্ডা মাথায়। তাঁর ধারণা হল, আমার মা বেঁচে থাকলে তিনি তাঁকে এ জাতীয় ট্রেনিং দিতে দেবেন না। কাজেই তিনি মাকে সরিয়ে দিলেন।'

'সরিয়ে দিলেন মানে?'

'মেরে ফেললেন।'

'কী বলছেন এসব।'

'আমি অবশ্যি মাকে খুন হতে দেখি নি। তেমন কোনো প্রমাণও পাই নি। বাবা প্রমাণ রেখে খুন করবেন এমন মানুষই না। খুব ঠাণ্ডা মাথার লোক। তাঁর মাথা এত ঠাণ্ডা যে মাঝে মাঝে আমার মনে হয় হয়তো তিনি অসুস্থ ছিলেন না। অসুস্থ মানুষ এত ভেবেচিন্তে কাজ করেন না। অসুস্থ মানুষের মাথা এত পরিষ্কার থাকে না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তারপর বলুন।'

'আপনার কাছে কি ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে?'

'অবশ্যই ইন্টারেস্টিং, তবে আমার কেন জানি মনে হচ্ছে আপনি আমাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন।'

আমি হেসে ফেললাম।

ডাক্তার সাহেব বললেন, 'হাসছেন কেন?'

আমি বললাম, 'গল্প বলে আমি আপনাকে বিভ্রান্ত করব না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। যা বলছি সবই সত্যি। আপনাকে গল্প ছাড়াই আমি বিভ্রান্ত করতে পারি।'

'করুন তো দেখি!'

আমি হাসিমুখে কিছুক্ষণ ডাক্তার সাহেবের দিকে তাকিয়ে সহজ গলায় বললাম, 'আপনার বাড়িতে এই মুহূর্তে একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। আপনার ছোট মেয়ে কিছুক্ষণ আগে তার পায়ে কিংবা হাতে ফুটন্ত পানি ফেলেছে। তাকে হাসপাতালে নেয়া হচ্ছে।'

'আপনি আমাকে এই কথা বিশ্বাস করতে বলছেন?'

'জ্বি বলছি।'

ইরতাজুল করিম সাহেব অ্যাশট্রেতে পানের পিক ফেলতে ফেলতে বললেন, 'হিমু সাহেব, আপনি কি চান আমি বাসায় টেলিফোন করি?'

'করুন।'

ডাক্তার সাহেব টেলিফোন করতে লাগলেন, লাইন এনগেইজড পাওয়া যাচ্ছে। ডাক্তার সাহেবের চোখ–মুখ শক্ত হতে শুরু করেছে। তিনি রিসিভার নামিয়ে রাখছেন, আবার ডায়াল করছেন। আমি সিগারেট ধরিয়ে আগ্রহ নিয়ে ডাক্তার সাহেবকে দেখছি। ডায়াল করতে করতে তিনি আমার দিকে সরু চোখে তাকাচ্ছেন।

লাইন পেতে তাঁর দশ মিনিটের মতো লাগল। এই দশ মিনিটে তিনি ঘেমে গেলেন। কপাল ভর্তি ফোঁটা ফোঁটা ঘাম। লাইন পাবার পর তিনি কাঁপা গলায় বললেন, 'কে, কে?'

ওপাশের কথা শুনতে পাচ্ছি না। তবে ডাক্তার সাহেবের কথা থেকে বুঝতে পারছি ওপাশে তাঁর স্ত্রী ধরেছেন।

ডাক্তার সাহেব বললেন, 'কেমন আছ? সবাই ভালো? শুচি কী করছে? টিভি দেখছে? আমার আসতে দেরি হবে। আচ্ছা রাখি।'

তিনি রিসিভার নামিয়ে রেখে রাগী গলায় বললেন, 'আমার ছোটমেয়ে শুচি ভালো আছে। টিভি দেখছে। আপনি আমাকে ভয় দেখালেন কেন?'

'ভয় তো দেখাই নি! বিভ্রান্ত করেছি। আপনার মতো অতি আধুনিক এক জন মানুষ আমার কথা বিশ্বাস করে আতঙ্কে অস্থির হয়ে গেলেন। কাজেই দেখুন — বিভ্রান্ত করতে চাইলে আমি করতে পারি। আমি কি আমার জীবনবৃত্তান্ত বলব, না আপনি উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছেন?'

'বলুন। সংক্ষেপে বলুন। ডিটেইলসে যেতে হবে না।'

'সংক্ষেপেই বলছি — বাবা আমাকে মহাপুরুষ বানানোর কাজে লেগে গেলেন। আমাকে সংসার, চারপাশের জীবন, অপরূপ প্রকৃতি প্রসঙ্গে নিরাসক্ত করতে চাইলেন।'

'কীভাবে?'

'বুদ্ধি খাটিয়ে আসক্তি কাটানোর তিনি নানা পদ্ধতি বের করেছিলেন। সংক্ষেপে বলতে বলছেন বলেই পদ্ধতিগুলো আর বর্ণনা করছি না।'

'একটি পদ্ধতি বলুন।'

'একবার বাবা আমার জন্যে একটা তোতা পাখি আনলেন। আমার বয়স তখন চার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিংবা পাঁচ। আমি পাখি দেখে মুগ্ধ। বাবা বললেন, তোতা খুব সহজে কথা শিখতে পারে। তুই ওকে কথা শেখা। রোজ এর কাছে দাঁড়িয়ে বলবি — হিমু, হিমু। একদিন দেখবি সে সুন্দর করে তোকে ডাকবে — হিমু। হি ...মু ...। আমি মহাউৎসাহে পাখিকে কথা শেখাই। একদিন সত্যি সত্যি সে পরিষ্কার গলায় ডেকে উঠল — হিমু, হিমু। আমি আনন্দে কেঁদে ফেললাম। বাবা তখন পাখিটাকে খাঁচা থেকে বের করে একটানে মাথাটা ধড় থেকে আলাদা করে ফেললেন!'

ডাক্তার সাহেব চাপা গলায় বললেন, 'মাই গড!'

আমি হাসিমুখে বললাম, 'আপনি চাইলে আরো দু একটা পদ্ধতির কথা বলতে পারি। বলব ?'

'না, থাক। আমি আর শুনতে চাচ্ছি না।'

'মানুষের চরিত্রের ভয়ংকর দিকগুলোও আমি যেন জানতে পারি বাবা সেই ব্যবস্থাও করলেন। কিছু ভয়ংকর ধরনের মানুষের সঙ্গে আমাকে বাস করতে পাঠালেন। তাঁরা সম্পর্কে আমার মামা। পিশাচ-চরিত্রের মানুষ। বলতে পারেন আমি আমার জীবনের একটি অংশ পিশাচদের সঙ্গে কাটিয়েছি। তবে মামারা আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। যাকে বলে অন্ধ স্নেহ। পাগলদের বিচিত্র মানসিকতা যেন আমি ধরতে পারি সে জন্যে তিনি প্রায়ই বাসায় পাগল ধরে নিয়ে আসতেন — যত্ন করে দু দিন-তিন দিন রাখতেন। এক জন এসেছিল ভয়াবহ উন্মাদ। সে রান্নাঘর থেকে বটি এনে আমার গায়ে কোপ বসিয়েছিল। পিঠে এখনো দাগ আছে। দেখতে চান?'

'না। আজ বরং থাক। আর শুনতে ভালো লাগছে না। এক সপ্তাহ পর ঠিক এই দিনে আবার কথা বলব। আমি ডায়েরিতে লিখে রাখলাম। একটু রাত করে আসুন, দশটার দিকে।'

'চলে যেতে বলছেন?'

'হ্যাঁ, চলে যান। আমার নিজের শরীরও ভালো লাগছে না। মনে হচ্ছে আপনার গল্প আমাকে এফেক্ট করেছে। যাবার আগে শুধু বলে যান — আপনার বাবার এক্সপেরিমেন্ট কি সফল হয়েছে?'

আমি উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললাম — 'সফল হয় নি। বাবার এক্সপেরিমেন্টে ত্রুটি ছিল। তিনি মানুষের অন্ধকার দিকগুলোই আমাকে দেখাতে চেয়েছিলেন। আলোকিত দিক দেখাতে পারেন নি। আমার প্রয়োজন ছিল ঈশ্বরের কাছাকাছি এক জন মানুষ — যে আমাকে শেখাবে — ভালবাসা, আনন্দ, আবেগ এবং মঙ্গলময় মহাসত্য। আমি নিজে এখন সেইরকম মানুষই খুঁজে বেড়াচ্ছি। পাচ্ছি না। পেলে বাবার এক্সপেরিমেন্টের ফল দেখতে পারতাম।'

'আপনি বিশ্বাস করেন মহাপুরুষ হওয়া সম্ভব?'

'হ্যাঁ, করি। ডাক্তার সাহেব, আর একটা কথা আপনাকে বলা দরকার। আমি কিন্তু মাঝে মাঝে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি। কিছু একটা বলি, তা লেগে যায়। আপনাকে যখন বললাম আপনার মেয়ে গরম পানিতে পুড়ে গেছে তখন আমি নিজে পুরোপুরি নিশ্চিত ছিলাম যে তাই ঘটেছে। আপনি হয়তো লক্ষ করেন নি যে আমি বলেছি আপনার সবচে' ছোট মেয়ে। আমি জানতাম না আপনার কয়েকটি মেয়ে আছে।'

'কাকতালীয় ব্যাপার, হিমু সাহেব।'

'ঠিক কাকতালীয় নয়। আপনি কি আরেকবার টেলিফোন করে দেখবেন?'

'না। আপনি একবার আমাকে বিভ্রান্ত করেছেন। আমি দ্বিতীয়বার আমাকে বিভ্রান্ত করার সুযোগ আপনাকে দেব না। আপনি যথেষ্ট বুদ্ধিমান মানুষ, তবে আমাকে বোকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাবারও কারণ নেই।'

আমি হেসে ফেললাম। ডাক্তার সাহেব বললেন, 'আপনি কোথায় যাবেন বলুন। আসুন আমার সঙ্গে, আপনাকে নামিয়ে দেব।'

'চলুন।'

বেশিরভাগ ডাক্তার নিজের গাড়ি নিজেই চালান। শিক্ষকরা যেমন সবাইকে ছাত্র মনে করেন, ডাক্তাররাও সেরকম সবাইকে রোগী ভাবেন। গাড়িও তাঁদের কাছে রোগীর মতো। নিজের রোগী অন্যকে দিয়ে ভরসা পান না বলে তাঁরা নিজেদের গাড়ি নিজেরাই চালান। তবে ইনি ব্যতিক্রমী ডাক্তার। কারণ তাঁর গাড়ি ড্রাইভার চালাচ্ছে। তিনি হাত-পা ছড়িয়ে পেছনের সিটে বসেছেন। আমি তাঁর পাশে বসলাম।

'পান খাবেন হিমু সাহেব?'

'জ্বি না।'

'পান খাওয়ার এক বিশ্রী অভ্যাস এক রোগী আমাকে ধরিয়ে দিয়ে গেছে। আমি জন্মেও পান খেতাম না। সেই রোগী রূপার তৈরী এক পানের কৌটা বের করে বলল, পান খাবেন ডাক্তার সাহেব? আমি কৌটা দেখে মুগ্ধ হয়ে একটা পান নিলাম। সেই থেকে শুরু। এখন দিনরাত পান খাই। পান কেনা হয় পণ হিসাবে।'

'সব বড় জিনিস ছোট থেকে শুরু হয়।'

'ঠিক বলেছেন — You start by killing a bird, you end by killing a man. আপনি নামবেন কোথায়?

'যে কোনো এক জায়গায় নামিয়ে দিলেই হবে।'

'সে কী! পার্টিকুলার কোথাও নামতে চান না?'

'জ্বি না। আচ্ছা ডাক্তার সাহেব, আমার এক বন্ধুকে কি আপনার কাছে নিয়ে আসতে পারি?'

'অবশ্যই পারেন। উনিও কি আপনার মতো?'

'না। আমরা কেউ কারো মতো নই ডাক্তার সাহেব। আমরা সবাই আলাদা।'

'আমার কাছে আনতে চাচ্ছেন কেন?'

'ঐ ভদ্রলোকের একটা সমস্যা আছে। উনি থাকেন খিলগাঁয়। একতলা বাসা। উনার বাড়ির সামনে কোনো গাছপালা নেই। কিন্তু উনি সবসময় বাড়ির সামনে একটা প্রকাণ্ড আমগাছ দেখেন। এর মানে কী?'

'ভদ্রলোককে একবার নিয়ে আসবেন।'

'আচ্ছা, আনব।'

'হিমু সাহেব।'

'জ্বি?'

'চলুন আমার সঙ্গে। আমার বাসায় চলুন — একসঙ্গে ডিনার করব। আপত্তি আছে?'

'না, আপত্তি নেই।'

আমরা ধানমণ্ডি তিন নম্বর রোডে কম্পাউন্ড দেয়া দোতলা একটা বাসার সামনে থামলাম। গেটটা খোলা। গেটের সামনে জটলা হচ্ছে। জানা গেল — এই বাড়ির ছোট মেয়েটা কিছুক্ষণ আগে গরম পানির গামলায় পড়ে ঝলসে গেছে। তাকে অ্যাম্বুলেন্স এসে হাসপাতালে নিয়ে গেছে। ডাক্তার ইরতাজুল করিম ছুটে ভেতরে চলে গেলেন। আমি একা একা দাঁড়িয়ে রইলাম।

ডাক্তার সাহেব প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফিরলেন। যান্ত্রিক গলায় বললেন, 'চেম্বার থেকে ফিরে আমি সবসময় গরম পানিতে গোসল করি। ঘরে ওয়াটার হিটার আছে। আজই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিটারটি কাজ করছিল না বলে আমার জন্য পানি গরম করেছে।'

আমি বললাম, 'খুব বেশি পুড়েছে?'

ডাক্তার সাহেব নিচু গলায় বললেন, 'হ্যাঁ। তাকে অজ্ঞান অবস্থায় হাসপাতালে নেয়া হয়েছে।'

'চলুন, আমরাও হাসপাতালে যাই।'

ডাক্তার সাহেব ক্লান্ত গলায় বললেন, 'আপনাকে হাসপাতালে যেতে হবে না। সরি, আপনাকে আজ ডিনার খাওয়াতে পারছি না।'

৬

মোরশেদ সাহেব সম্ভবত বাসায় ফেরেন নি। এখন সন্ধ্যা। যাদের ঘরে কোনো আকর্ষণ নেই তারা সন্ধ্যাবেলা ঘরে ফেরে না। ঠিক সন্ধ্যায় তারা একধরনের অস্থিরতায় আক্রান্ত হয়। এই অস্থিরতা শুধু মানুষের বেলাতেই যে হয় তা না, পশুপাখিদের ক্ষেত্রেও হয়। সেই কারণেই হয়তো সব ধর্মে সন্ধ্যা হল উপাসনার সময়। মনের অস্থিরতা দূর করে মনকে শান্ত করার এক বিশেষ প্রক্রিয়া। পরম রহস্যময় মহাশক্তির কাছে আবেদন — আমাকে শান্ত কর। আমার অস্থিরতা দূর কর।

দিনের কর্ম সাধিতে সাধিতে ভেবে রাখি মনে মনে
কর্ম অন্তে সন্ধ্যাবেলায় বসিব তোমারি সনে।

খোলা গেট দিয়ে ঘরে ঢুকলাম। ঘর অন্ধকার, তবে দরজায় তালা নেই। কয়েকবার ধাক্কা দিতেই মোরশেদ সাহেব দরজা খুলে দিলেন। মুখ শুকিয়ে কালো হয়ে আছে। মাথা ভেজা।

'কী ব্যাপার মোরশেদ সাহেব?'

'কিছু না ছোটমামা। আসুন, ভেতরে আসুন।'

'শরীর খারাপ?'

'জ্বি, দুপুরে একবার এপিলেপটিক সিজার হল। মেঝেতে পড়ে ছিলাম। ঘরে কেউ ছিল না।'

'একা থাকেন?'

'জ্বি।'

'বাতি জ্বালান নি কেন? সন্ধ্যাবেলা বাড়িঘর অন্ধকার দেখলে ভালো লাগে না।'

মোরশেদ সাহেব বাতি জ্বালালেন। আমি বসতে বসতে বললাম, 'আপনার আত্মীয়স্বজন কেউ নেই? ওদের কাউকে সঙ্গে এনে রাখতে পারেন না? আপনি অসুস্থ মানুষ। এক জন কারো তো আপনার সঙ্গে থাকা দরকার।'

'ছোটভাই আছে। সে কানাডায় থাকে। ছোটবোন ঢাকাতেই আছে। ওর নিজের স্বামী–সংসার আছে। ওকে বিরক্ত করতে ইচ্ছা করে না। আমি হলাম সবার বড়।'

'এষার সঙ্গে কি এর মধ্যে দেখা হয়েছে?'

'জ্বি দেখা হয়েছে। ও এসেছিল।'

'নিজেই এসেছিল! — বাহ্, ভালো তো!'

'ওর দাদিমাকে নিয়ে এসেছিল। আমাকে বোঝাল যে ডিভোর্সই আমাদের দুজনের জন্য মঙ্গলজনক। আমিও দেখলাম এষা ঠিকই বলছে। তা ছাড়া বেচারি আমার সঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকতে চাচ্ছে না। আমি তো জোর করে কাউকে ধরে রাখতে পারি না।'

'তা তো বটেই। পশুকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা যায়, মানুষকে যায় না।'

'আমি এষার সঙ্গে ম্যারিজ রেজিস্ট্রারের অফিসে গিয়ে কাগজপত্রে সই করে এসেছি।'

'ভালো করেছেন।'

'এষার জন্যে হয়তো ভালো করেছি, আমার জন্যে না। আমার মনটা খুব খারাপ। মামা, আপনাকে চা করে দি। ঘরে আর কিছু নেই — শুধু চা।'

'শুধু চা-ই দিন। রান্নাবান্না কি আপনি নিজেই করেন?'

'চা-টা নিজেই বানাই, বাকি খাবার হোটেল থেকে খেয়ে আসি। সেখানেও বেশিদিন যাওয়া যাবে না। গেলেই টাকার জন্যে তাগাদা দেয়। আচ্ছা মামা, আমার ক্যামেরাটা বিক্রির ব্যবস্থা করেছেন? এর সঙ্গে আলাদা একটা ঝুম লেন্স আছে। লেন্সটা আমার ভাই কানাডা থেকে পাঠিয়েছে।'

'আপনার ভাইয়ের কাছে কিছু টাকা-পয়সা চেয়ে চিঠি লিখলে কেমন হয়?'

'না না, তা হয় না। ছোট ভাই তো। আপনি ক্যামেরা বিক্রির ব্যবস্থা করে দিন।'

'ক্যামেরা বিক্রির টাকা যখন শেষ হয়ে যাবে তখন কী করবেন?'

'আমি বেশিদিন বাঁচব না, ছোটমামা। আমার শরীর খুব খারাপ। নতুন একটা উপসর্গ দেখা দিয়েছে। আগে ছিল না।'

'কী উপসর্গ?'

'মাথার ভেতরে ঝিঁঝি পোকা ডাকে। ঝিঁঝি শব্দ হয়। সবসময় যদি হত তা হলে আমি অভ্যস্ত হয়ে যেতাম। সবসময় হয় না। মাঝে মাঝে হয়।'

আমি চা খেলাম। মোরশেদ সাহেবের ঘর-দুয়ার দেখলাম। একা মানুষ, কিন্তু ঘর খুব সুন্দর করে সাজানো। দেখতে ভালো লাগে।

'মোরশেদ সাহেব।'

'জ্বি ছোটমামা?'

'আপনার ঘর তো খুব সুন্দর করে সাজানো। দেয়ালে ছবি নেই কেন? আপনার এত দামি ক্যামেরা। ঘরভর্তি ছবি থাকা উচিত।'

'ছবি ছিল। অনেক ছবি ছিল। সব এষার ছবি। এষা বলল, আমার ছবি দিয়ে ঘর ভর্তি করে রাখার তো কোনো মানে নেই। তোমার এখন উচিত আমাকে দ্রুত ভুলে যাওয়া। ছবি থাকলে তুমি তা পারবে না। তা ছাড়া তুমি নিশ্চয়ই আবার বিয়ে করবে। তোমার নতুন স্ত্রী আমার ছবি দেখলে রাগ করবে। ছবিগুলো তুমি আমাকে দিয়ে দাও। আমি দিয়ে দিলাম।'

'ভালো করেছেন। চলুন আমরা এখন বের হই।'

'কোথায় যাব?'

'আমার একটা চেনা ভাতের হোটেল আছে, আপনাকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে আসি। ওদের রান্না খুব ভালো। তারচে' বড় কথা — বাকিতে খাওয়া যাবে। মাস পুরালেই টাকা দিতে হবে তাও না। এক সময় দিলেই হল।'

মোরশেদ সাহেব উজ্জ্বল মুখে বললেন, চলুন। ক্যামেরাটা কি এখন দিয়ে দেব?'

'দিন।'

মজনু মিয়া আমাকে দেখেই গম্ভীর মুখে বলল, 'হিমু ভাই। আপনার সাথে আমার কিছু প্রাইভেট কথা আছে।'

'প্রাইভেট কথা শুনব, তার আগে আপনি আমার এই ভাগ্নেকে দেখে রাখুন। এর নাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোরশেদ। এ আপনার এখানে খাবে। টাকা-পয়সা এক সময় হিসেব করে দেয়া হবে। আপনি খাতায় লিখে রাখবেন।'

মজনু মিয়া বিরস মুখে অন্যদিকে তাকিয়ে রইল।

আমি বললাম, 'অন্যদিকে তাকিয়ে আছেন কেন?'

'আপনার সাথে আমার প্রাইভেট কথা আছে।'

'বলুন প্রাইভেট কথা, শুনছি।'

'আসেন, বাইরে আসেন।'

আমি মোরশেদকে বসিয়ে বাইরে এলাম। মজনু মিয়া দুঃখিত গলায় বলল, 'আমি আপনারে খুবই পেয়ার করি, হিমু ভাই।'

'তা জানি।'

'আপনার উপর মনটা আমার খুব খারাপ হয়েছে। কাজটা আপনি কী করলেন?'

'কোন কাজ?'

'ঐদিন দুপুররাতে মোস্তফাকে বললেন, 'মোরগ-পোলাও কর। আপনারা সাতটা মানুষ মিলে চারটা মুরগি খেয়ে ফেলেছেন। আচ্ছা ঠিক আছে, খেয়েছেন ভালো করেছেন— চার মুরগির জন্য মজনু মিয়া মরে যাবে না।'

'তা হলে সমস্যা কী?'

'ঐ রাতে আপনে বললেন, আমি দুই দিন হোটেলে আসব না। বলেন নাই?'

'বলেছি।'

'কথাটা আপনে এদের বলতে পারলেন, আমারে বলতে পারলেন না?'

'আপনাকে বললে কী হত?'

'আমি সাবধান থাকতাম। সাবধান থাকলে কি অ্যাকসিডেন্ট হয়?'

'অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল?'

মজনু মিয়া বিরক্ত মুখে বলল, 'আপনি এমন একটা ভাব ধরলেন যেন কিছুই জানেন না। আপনি পীর-ফকির মানুষ — কামেল আদমী — এটা আর কেউ না জানুক, আমি জানি। আপনারে যে খাতির করি — ভালবাসা থেকে যতটা করি, ভয়ে তারচে' বেশি করি। কখন কি ঘটনা ঘটবে এটা আপনি আগেভাগে জানেন। জানেন না?'

আমি কিছু বললাম না। মজনু মিয়া বলল, 'আপনি ঠিকই জানতেন যে আমার অ্যাকসিডেন্ট হবে। রিকশা থেকে পড়ে পা মচকে যাবে। তার পরেও আমাকে না বলে অন্য সবেরে বললেন। কাজটা কি ঠিক হল হিমু ভাই?'

'বেশি ব্যথা পেয়েছেন?'

'অল্পের জন্যে পা ভাঙে নাই। মচকে গেছে। সাত দিন হয়ে গেছে, এখনো ঠিকমতো পা ফেলতে পারি না। চিলিক দিয়ে ব্যথা হয়।'

'আপনার প্রাইভেট কথা শেষ হয়েছে মজনু মিয়া?'

'জ্বি শেষ হয়েছে। আবার এক বন্ধুকে নিয়ে এসেছেন — দেখে তো মনে হয় — মাথা আউলা। ইয়াদ সাহেবের মতো যন্ত্রণা করবে।'

'ইয়াদ কি এখনো আসে? তাকে তো আসতে নিষেধ করেছি।'

'না, উনি আর আসেন না। উনি আছেন কেমন?'

'জানি না কেমন। অনেক দিন দেখা হয় না। ভালোই আছে মনে হয় — মজনু মিয়া, ক্যামেরা কিনবেন?'

'ক্যামেরা?'

'জ্বি, ক্যামেরা — মিনোলটা। সঙ্গে ঝুম লেন্স আছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমি ক্যামেরা দিয়ে কী করব? আমি বেচি ভাত।'

'ভাতের ছবি তুলবেন। পৃথিবীতে সবচে' সুন্দর ছবি হল — ভাতের ছবি। ধবধবে সাদা।'

মজনু মিয়া বিরক্ত হয়ে বলল, 'আপনি বড় উল্টাপাল্টা কথা বলেন হিমু ভাই। আগা-মাথা কিছুই বুঝি না।'

'ক্যামেরা কিনবেন না?'

'জ্বি না।'

'জিনিসটা কিন্তু ভালো ছিল। সস্তায় ছেড়ে দিতাম।'

'মাগনা দিলেও আমি নিব না, হিমু ভাই। আসেন চা খান। নাকি ভাত খাবেন? ভালো সরপুটি আছে।'

'ভাত খাব না। ক্যামেরা বিক্রির চেষ্টা করতে হবে। চলি মজনু মিয়া।'

আমি চলে গেলাম তরঙ্গিনী স্টোরে। মুহিব সাহেব নেই। নতুন একটি ছেলে বিরস মুখে দরজা বন্ধ করছে। রাত মাত্র এগারটা, এর মধ্যেই দোকান বন্ধ। আমি ছেলেটার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'ভালো আছেন?' সে সরু চোখে তাকাল। কিছু বলল না।

'মুহিব কোথায়?'

'উনার চাকরি চলে গেছে। উনি কোথায় আমি জানি না।'

'চাকরি গেল কেন?'

'জানি না। মালিক জানে। আপনে উনার কে হন?'

'কেউ হই না। টেলিফোন করতে এসেছি। টেলিফোন করা যাবে?'

'জ্বি না। মালিকের নিষেধ আছে।'

'পাঁচটা টাকা যদি আপনাকে দিই তাহলে করা যাবে?'

লোকটা টেলিফোন খুলে দিল। ডায়াল ঘোরাতে ঘোরাতে বললাম, 'মুহিবকে বদলে আপনাকে নেয়া মালিকের ঠিক হয় নি। আপনার হল চোর-স্বভাব। মাত্র পাঁচ টাকার জন্যে মালিকের নিষেধ অমান্য করেছেন। একশ টাকার জন্যে দোকান খালি করে দেবেন।'

লোকটা আমার দিকে ভীত চোখে তাকাচ্ছে। আমি তাকে অগ্রাহ্য করে বললাম, 'হ্যালো।'

ওপাশ থেকে ডাক্তার ইরতাজুল করিম বললেন, 'কাকে চাচ্ছেন?'

'আপনাকে। আমি হিমু। চিনতে পারছেন?'

'পারছি। কী চান?'

'কিছু চাচ্ছি না। আপনি কি ক্যামেরা কিনবেন? ভালো ক্যামেরা।'

'হিমু সাহেব, রাতদুপুরে আমি রসিকতা পছন্দ করি না।'

'এটা কিন্তু সাধারণ ক্যামেরা না। এর সঙ্গে দুজন মানুষের ভালবাসার এবং ভালবাসা ভঙ্গের ইতিহাস জড়ানো আছে। আমি আপনাকে সস্তায় দেব।'

খট করে শব্দ হল। ডাক্তার ইরতাজুল করিম টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন।

রাত ঠিক সাড়ে এগারটায় আমি নীতুকে টেলিফোন করলাম। নীতু আমার গলা খুব ভালো করে চেনে। তবু তীক্ষ্ণ গলায় বলল, 'আপনি কে বলছেন?'

আমি বললাম, 'সরি, রং নাম্বার হয়েছে।'

নীতু তৎক্ষণাৎ বলল, 'রং নাম্বার হয় নি। আপনি ঠিকই করেছেন। ইয়াদকে চাচ্ছেন? ও বাসায় নেই।'

'আমি ইয়াদকে চাচ্ছি না। আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'আমার সঙ্গে আবার কী কথা?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'জরুরি কথা।'

'টেলিফোনে বলা যাবে? টেলিফোনে বলা না গেলে, আপনি চলে আসুন। গাড়ি পাঠাচ্ছি। আপনি কোথায় আছেন বলুন।'

'গাড়ি পাঠাতে হবে না। টেলিফোনে বলা যাবে। আপনি কি একটা ক্যামেরা কিনবেন?'

'কী কিনব?'

'ক্যামেরা। সিঙ্গেল লেন্স রিফ্লেক্স ক্যামেরা। অটোম্যাটিক ম্যানুয়েল দুটাই আছে। প্লাস একটা জুম লেন্স। সেকেন্ড হ্যান্ড হলেও ভালো জিনিস।'

'চোরাই মালের ব্যবসা কবে থেকে শুরু করলেন?'

'চোরাই মাল নয়। জেনুইন পার্টির ক্যামেরা। কিনবেন কিনা বলুন।'

'আপনার কী করে ধারণা হল যে আমার ক্যামেরা নেই? সেকেন্ড হ্যান্ড ক্যামেরা কেনার জন্যে আমি আগ্রহী ... ?'

আমি গম্ভীর ভঙ্গিতে বললাম, 'খুব যারা বড়লোক, সেকেন্ড হ্যান্ড জিনিসের প্রতি তাদের একধরনের আগ্রহ থাকে। বঙ্গবাজারে যেসব পুরোনো কোট বিক্রি হয় — তাদের বড় ক্রেতা হলেন কোটিপতিরা। তারাই আগ্রহী ক্রেতা।'

'কোটিপতিদের সম্পর্কে আপনার খুব ভ্রান্ত ধারণা হিমু সাহেব। কোটিপতিদের কোনোকিছু সম্পর্কেই আগ্রহ থাকে না। যাই হোক, আপনার সঙ্গে আমি তর্কে যেতে চাচ্ছি না। আপনার ক্যামেরা আমি কিনব না। তবে কত টাকার আপনার দরকার আমাকে বলুন, আমি টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

'হাজার পাঁচেক দিতে পারবেন?'

'এখন পাঠাব?'

'জ্বি, পাঠিয়ে দিন।'

'কোথায় আছেন ঠিকানা বলুন।'

'আমাকে পাঠাতে হবে না। আমি এক ভদ্রলোকের ঠিকানা দিচ্ছি — তাঁর ঠিকানায় পাঠিয়ে দিলেই হবে।'

আমি মোরশেদ সাহেবের ঠিকানা দিলাম। টেলিফোনে শুনতে পাচ্ছি — নীতু খসখস করে লিখছে।

'হিমু সাহেব।'

'জ্বি?'

'আপনার একটা চিঠি পাঞ্জাবির পকেটে ছিল। পেয়েছেন? ইয়াদকে দিয়ে পাঠিয়েছিলাম।'

'পেয়েছি।'

'পড়েছেন?'

'পুরোটা পড়তে পারি নি — অর্ধেকের মতো পড়েছি।'

'আপনি কি আমাকে বিশ্বাস করতে বলছেন যে পুরো চিঠি আপনি পড়েন নি — অর্ধেক পড়েছেন?'

'বিশ্বাস করতে বলছি।'

'আপনার আচার-আচরণে কতটা সত্যি আর কতটা ভান, দয়া করে বলবেন?'

'ফিফটি-ফিফটি। অর্ধেক ভান অর্ধেক সত্যি।'

'এই চিঠিটা আমি পড়ে ফেলেছি। কিছু মনে করবেন না। আই অ্যাম সরি। আচ্ছা আপনি কি রূপা মেয়েটিকে নিয়ে এক দিন আসবেন আমাদের বাসায়? — উনাকে দেখব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উনি যদি আসতে না চান — আমি আপনার সঙ্গে যেতে রাজি আছি।'

'আচ্ছা, একদিন নিয়ে যাব।'

৭

এষা দরজা খুলে তাকিয়ে রইল। মনে হচ্ছে আমাকে চিনতে পারছে না। মাফলার দিয়ে মাথা ঢাকা। চিনতে না পারার সেটা একটা কারণ হতে পারে।

'কেমন আছেন?'

এষা যন্ত্রের মতো বলল, 'ভালো।'

'আপনার পরীক্ষা কেমন হল খোঁজ নিতে এলাম।'

'ভেতরে আসুন।'

আমি ভিতরে ঢুকলাম। এষা দরজা বন্ধ করে দিল। রাত আটটা বাজে। টিভিতে বাংলা খবর হচ্ছে। খবর পাঠকের মুখ দেখা যাচ্ছে, কথা শোনা যাচ্ছে না। এদের বাড়ি পুরোপুরি নিঃশব্দ। একটু অস্বস্তি লাগে।

'আপনার দাদিমা ভালো আছেন?'

'হ্যাঁ, ভালোই আছেন।'

'কাজের মেয়েটা যে চলে গিয়েছিল, ফিরেছে?'

'না।'

'আমি কি বসব?'

'বসুন।'

আমি বসলাম। এষা আমার মুখোমুখি বসল। তার চোখে আজ চশমা নেই। সে মনে হয় শুধু পড়াশোনার সময়ই চোখে চশমা দেয়। মেয়েটার চোখ দুটা খুব সুন্দর। আজ এষাকে আরো সুন্দর লাগছে। একটু বোধহয় রোগাও হয়েছে। কানে সবুজ পাথরের দুটা দুল। ঐ রাতে দুল দেখি নি।

'হিমু সাহেব, ঐদিন আপনি আমাদের কিছু না বলে চলে গেলেন কেন?'

'আপনি আপনার হাসব্যান্ডের সঙ্গে কথা বলছিলেন, কাজেই আপনাদের বিরক্ত করলাম না। বিদেয় হয়ে গেলাম।'

এষা তীক্ষ্ণ গলায় বলল, 'আমি হাসব্যান্ডের সঙ্গে কথা বলছিলাম আপনাকে কে বলল? ও বলেছে?'

'আমি অনুমান করেছি। তারপর মোরশেদ সাহেবের সঙ্গে কথাও বললাম। উনার খিলগাঁর বাসাতেও গিয়েছি।'

'আমি আপনার ব্যাপার কিছু বুঝতে পারছি না। ওকে কি আপনি আগে থেকে চিনতেন?'

'না, চিনতাম না। ঐ রাতেই প্রথম পরিচয় হল।'

'সঙ্গে সঙ্গে বাসায় চলে গেলেন! সবসময় তাই করেন?'

'কাউকে পছন্দ হলে করি। উনাকে আমার পছন্দ হয়েছে। খুব পছন্দ হয়েছে।'

এষা চাপা গলায় বলল, 'পাগল কিন্তু বাইরে থেকে বোঝা যায় না, এমন মানুষরা কমপেনিয়ন হিসেবে খুব ভালো। সাধারণ মানুষরা বোরিং হয়, কিন্তু এরা বোরিং হয় না।'

'আপনার কাছে কিন্তু হয়েছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমার কাছে হয়েছে, কারণ আমাকে তার সঙ্গে জীবনযাপন করতে হয়েছে। এক জন বিকৃতমস্তিষ্ক মানুষের সঙ্গে জীবনযাপন ক্লান্তিকর ব্যাপার। যাই হোক, আপনি এসেছেন যখন বসুন। দাদিমা বাসায় নেই, উনি চলে আসবেন। আপনি চা খেতে পারেন, আজ ঘরে চা চিনি সবই আছে।'

'আমি আজ উঠব। কোনো একদিন ভোরবেলায় আসব।'

'না — আপনি বসবেন। দাদিমা আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান। আপনি চলে যাওয়ায় ঐদিন আমার উপর খুব রাগ করেছিলেন। উনার ধারণা — আমিই আপনাকে বিদেয় করে দিয়েছি। আজ আপনি দাদিমার মাথা থেকে ঐ ধারণা দূর করবেন এবং আপনার ঠিকানা লিখে রেখে যাবেন।'

'আপনার দাদিমা না আসা পর্যন্ত আমাকে এখানে একা একা বসে থাকতে হবে?'

'আমি থাকব আপনার সঙ্গে। একা বসিয়ে রাখব না।'

'আমরা কী নিয়ে কথা বলব? দুজন মানুষ তো চুপচাপ মুখোমুখি বসে থাকতে পারে না। আমাদের কথা বলতে হবে।'

'বলুন কথা।'

'আপনার দাদিমার কি ফিরতে রাত হবে?'

'বেশি রাত হবার কথা না। তিনি জানেন আমি এখানে একা আছি।'

আমি টিভির দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলাম। শব্দহীন খবর পাঠ দেখতে মন্দ লাগছে না। এরও একটা আলাদা মজা আছে। খবর পাঠকদের কখনোই খুব খুঁটিয়ে দেখা হয় না, তাঁদের কথাই শুধু শোনা হয়। কথা বন্ধ করে দিলেই শুধু ব্যক্তি হিসেবে তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়েন। তাঁদের খুঁটিয়ে দেখতে ইচ্ছা করে।

'হিমু সাহেব।'

'জ্বি?'

'ও যে অসুস্থ সেই খবরটি কি আপনাকে দিয়েছে?'

'এপিলেপ্সির কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ।'

'জ্বি, উনি আমাকে বলেছেন।'

'বিয়ের আগে কিন্তু আমাদের কিছু বলে নি। এমন ভয়ংকর একটা অসুখ সে গোপন করে গেছে।'

'বিয়ের আগে অসুখটা হয়তো ভয়ংকর ছিল না।'

'সবসময়ই ভয়ংকর ছিল। ছ বছর বয়স থেকেই এই অসুখ নিয়ে সে বড় হয়েছে।'

'তা হলে মনে হয় — উনি অসুখে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ায় এটা হয়েছে। উনি ধরেই নিয়েছেন, তাঁর অসুখের ব্যাপারটা সবাই জানে, নতুন করে কাউকে কিছু জানানোর প্রয়োজন নেই। ইচ্ছা করে যে তিনি ব্যাপারটা গোপন করেছেন তা আমার মনে হয় না।'

'আপনি কি তাকে ডিফেন্ড করার চেষ্টা করছেন?'

'তা করছি। উনি আমার বন্ধুমানুষ। বন্ধুকে বন্ধু ডিফেন্ড করবে। বাইরের কেউ করবে না। তা ছাড়া এখন তো আপনারা আলাদা হয়ে গেছেন। উনার যা কিছু মন্দ তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন কেন? উনার ভালো যদি কিছু থাকে তা নিয়ে থাকুন।'

'ওর ভালো কিছু নেই। ও পুরোপুরি অসুস্থ এক জন মানুষ। ওর খিলগাঁ বাসায় আপনি গিয়েছেন? সেখানে কি কোনো আমগাছ দেখেছেন? দেখেন নি। ও কিন্তু প্রায়ই বাসার সামনে একটা আমগাছ দেখে। আমগাছের দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে। একবার রাতদুপুরে আমাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে বলল, এষা, চল আমরা দুজন গাছটার নিচে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বসি।'

'আপনি নিশ্চয়ই বসতে যান নি?'

'না, যাই নি।'

'গেলে ভালো হত। আপনি যদি বলতেন — চল যাই বসি গাছের নিচে। কিংবা যদি বলতেন — তোমার এই আমগাছের ডালে একটা দোলনা টানিয়ে দাও — আমি দোলনায় চড়ব — তাহলে খুব ইন্টারেস্টিং হত।'

'এতে কি পাগলামির প্রশ্রয় দেয়া হত না?'

'না, হত না। আপনি যাকে পাগলামি ভাবছেন তা হয়তো পাগলামি নয়। আলেকজান্ডার পুশকিন তাঁর বাড়ির পেছনে সব সময় একটা দিঘি দেখতে পেতেন। জোছনা রাতে দিঘির পাড়ে বেড়াতে যেতেন।'

'এক জন বিখ্যাত ব্যক্তি পাগলামি করে গেছেন বলেই পাগলামিকে স্বীকার করতে হবে?'

'না, হবে না, এমনি বললাম। আপনি ঐ লোককে ছেড়ে এসে ভালোই করেছেন। ও বেশিদিন বাঁচবেও না। স্বামীর মৃত্যু আপনাকে দেখতে হবে না। আপনাকে বিধবা শব্দটার সঙ্গে যুক্ত হতে হবে না। বিধবা খুব পেলেটেবল শব্দ নয়। তা ছাড়া এক জন ভয়াবহ অসুস্থ, রুগ্ন মানুষের সঙ্গে যুক্ত থেকে নিজের জীবনটাকে নষ্ট করবেন কেন? একটাই আপনার জীবন। একটাই পৃথিবী। দ্বিতীয় কোনো পৃথিবী আপনার জন্যে নেই। সেটাকে নষ্ট করার কোনো মানে হয় না। তা ছাড়া মোরশেদ সাহেবের আপনাকে প্রয়োজন নেই, তাঁর আছে নিজস্ব পৃথিবী, নিজস্ব আমগাছ। অল্প যে কদিন বাঁচবেন, তিনি তাঁর আমগাছ নিয়ে কাটিয়ে দিতে পারবেন। আপনার তো কোনো আমগাছ নেই — কাজেই আপনার এক জন বন্ধু প্রয়োজন। ওমর খৈয়াম পড়েছেন? –

এইখানে এই তরুর তলে
তোমার আমার কৌতূহলে
যে কটি দিন কাটিয়ে যাব প্রিয়ে
সঙ্গে রবে সুরার পাত্র
অল্প কিছু আহার মাত্র
আরেকখানি ছন্দ মধুর কাব্য হাতে নিয়ে।'

'ও মারা যাবে কেন?'

'শরীর খুবই খারাপ। তা ছাড়া টাকা-পয়সাও নেই। বাড়িভাড়া বাকি পড়েছে। বাড়িওয়ালা খুব তাড়াতাড়িই মনে হয় বাড়ি থেকে বের করে দেবে। তখন খেয়ে না খেয়ে, পথে পথে ঘুরতে গিয়ে কিছু একটা ঘটিয়ে ফেলবেন।'

'আপনি জানেন না, ওর অনেক বড় বড় আত্মীয়স্বজন আছে।'

'ঐ লোক কি আত্মীয়স্বজনের কাছে যাবে? হাত পাতবে ওদের কাছে?'

'না।'

'এষা, এখন আমি উঠব। আরেকদিন আসব। আপনার দাদিমার জন্যে আর অপেক্ষা করতে পারছি না। আমাকে এক জন সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যেতে হবে। অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। রাত নটায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট। নটা প্রায় বাজতে চলল।'

'কবে আসবেন?'

'খুব শিগ্‌গিরই আসব। এষা, আপনাকে আরেকটা কথা বলা প্রয়োজন মনে করছি। কথাটা হচ্ছে — আমার কথাবার্তা থেকে দয়া করে কোনো ভ্রান্ত ধারণা নেবেন না। মনে করবেন না আমি খুব কায়দা করে মোরশেদ সাহেবের কাছে আপনাকে ফিরে যেতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলছি।'

'আপনি বলছেন না?'

'অবশ্যই না। মোরশেদ সাহেব যদি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠতেন আমি হয়তো-বা বলতাম। সেই সম্ভাবনা একেবারেই নেই। উঠি এষা।'

ডক্টর ইরতাজুল করিম সাহেবও ঠিক এষার মতো ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকালেন, যেন চিনতে পারছেন না।

'স্লামালিকুম ডাক্তার সাহেব, আমি হিমু।'

'কী ব্যাপার?'

'আপনার সঙ্গে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।'

'আমার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট?'

'আপনি ডায়েরিতে লিখে রেখেছেন। প্রথম যেদিন এসেছিলাম সেদিনই বলেছিলেন এক সপ্তাহ পর রাত নটার দিকে আসতে। বসব?'

'বসুন।'

'শুরু করব?'

'কী শুরু করতে চাচ্ছেন?'

'জীবন কাহিনী। আমার বাবা কী করে আমাকে মহাপুরুষ বানানোর চেষ্টা করতে লাগলেন, তিনি কতটুকু পারলেন, কতটুকু পারলেন না। অর্থাৎ ঐ রাতে যেখানে শেষ করেছিলাম, সেখান থেকে শুরু .....'

'হিমু সাহেব।'

'জ্বি।'

'আমার একটি মেয়ে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে পড়ে আছে। আপনি সেই খবর খুব ভালো করেই জানেন। ওর এখন স্কিন গ্রাফটিং হচ্ছে। শরীরের বিভিন্ন জায়গা থেকে চামড়া কেটে লাগানো হচ্ছে। আমি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। রোগী দেখছি না। কিছু করার নেই বলে চেম্বারে এসে বসেছি।'

'আমি তা হলে চলে যাই?'

'এসেছেন যখন বসুন। আমার কাছে আপনার একটি ডিনার পাওনা আছে। আসুন, আমরা এক সঙ্গে ডিনার করি। ঘরে গত সাত দিন ধরে রান্নাবান্না হচ্ছে না। আমার স্ত্রী থাকেন হাসপাতালে, কাজেই আমরা কোনো একটা হোটেলে বসব। আপনার আপত্তি আছে?'

'না, আপত্তি নেই।'

'চলুন তাহলে ওঠা যাক।'

আমরা গুলশান এলাকার একটা চাইনিজ রেস্টুরেন্টে ঢুকলাম। ডাক্তার সাহেব বললেন, 'এই রেস্টুরেন্টটা ছোট, কিন্তু খাবার খুব ভালো। এদের কুক এক জন ভিয়েতনামি মহিলা। তিনি খাবার তৎক্ষণাৎ তৈরি করে দেন। আপনি কী খাবেন মেনু দেখে অর্ডার দিন। আমি নিজে শুধু একটা স্যুপ খাব। আপনি কি মদ্যপান করেন?'

'জ্বি না।'

'বিয়ার? বিয়ার নিশ্চয়ই চলতে পারে।'

'আপনি খান। আমার লাগবে না।'

বিয়ারের ক্যান খুলতে খুলতে ডাক্তার সাহেব বললেন, 'আমি আপনার একটি বিষয় জানার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্যে আগ্রহী। আপনার ভবিষ্যৎ বলার ক্ষমতা। এই ক্ষমতা কি সত্যি আপনার আছে?'

'আমি ঠিক জানি না। মাঝে মাঝে যা ভাবি তা হয়ে যায়। সে তো সবারই হয়। আপনারও নিশ্চয়ই হয়?'

'না, আমার হয় না।'

'অবশ্যই হয়। ভালো করে ভেবে দেখুন — এরকম কি হয় না যে আপনি দুপুরে বাসায় ফিরছেন — আপনার মনে হল আজ বাসায় বেগুন দিয়ে ইলিশ মাছ রান্না হয়েছে। খেতে বসে দেখেন, সত্যি তাই।'

'এটা হচ্ছে কো-ইনসিডেন্স।'

'আমার ব্যাপারগুলোও কো-ইনসিডেন্স। এর বাইরে কিছু না।'

'আপনি বলতে চাচ্ছেন আপনার কোনো ক্ষমতা নেই?'

'না।'

ডাক্তার সাহেব তিনটি বিয়ার শেষ করে চতুর্থ বিয়ারের ক্যানে হাত দিলেন। মদ্যপানে তিনি খুব অভ্যস্ত বলে মনে হচ্ছে না। চোখটোখ লাল হয়ে গেছে। কথা জড়িয়ে যাচ্ছে।

'হিমু সাহেব।'

'জ্বি?'

'আমার কিন্তু ধারণা, আপনার ক্ষমতা আছে। আপনার বাবা পুরোপুরি ব্যর্থ হন নি — Strange কিছু জিনিস আপনার ভেতর তৈরি করতে পেরেছেন। তার একটি হচ্ছে মানুষকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা। এই ক্ষমতা আপনার প্রচুর আছে।'

'এই ক্ষমতা অল্পবিস্তর সবারই আছে।'

'আপনার অনেক বেশি আছে। ইয়াদ সাহেবের সঙ্গে কি রিসেন্টলি আপনার দেখা হয়েছে?'

'না।'

'আপনি কি জানেন তিনি গত দুদিন ধরে ভিক্ষুক সেজে পথে পথে ঘুরছেন? দু রাত বাড়ি ফেরেন নি?'

'না — জানি না।'

'ইয়াদ সাহেবের স্ত্রী আপনি আসার কিছুক্ষণ আগেই আমার কাছে এসেছিলেন। ভদ্রমহিলা যে কী পরিমাণ মানসিক অর্ডিয়েলের ভেতর দিয়ে যাচ্ছেন তা তাঁকে না দেখলে বিশ্বাস করা অসম্ভব।'

'আপনি তাঁকে কী বলেছেন?'

'বলেছি এটা সাময়িক ঝোঁক। ঝোঁক কেটে যাবে। ইয়াদ সাহেব বাসায় ফিরবেন। আপনার কী ধারণা হিমু সাহেব?'

'কোন ধারণার কথা জানতে চাচ্ছেন?'

'ইয়াদ সাহেব প্রসঙ্গে জানতে চাচ্ছি। উনার ঝোঁক কাটতে কতদিন লাগবে?'

'বলতে পারছি না। ঝোঁক নাও কাটতে পারে।'

'তার মানে ?'

খাওয়া বন্ধ করে আমি সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললাম, 'মানুষ খুব বিচিত্র প্রাণী ডাক্তার সাহেব। সে সারা জীবন অনেক কিছুই অনুসন্ধান করে ফেরে। সেই অনেক অনুসন্ধানের একটি হল — তার অবস্থান। সে কোথায় খাপ খায় তা জানতে চায় — সেই বিশেষ জায়গাটা যখন পেয়ে যায় তখন তাঁকে নড়ানো কঠিন হয়ে পড়ে।'

'আপনি ভুলে যাচ্ছেন হিমু সাহেব, মানুষ খুব Rational প্রাণী।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'মানুষ মোটেই Rational প্রাণী নয়। সমস্ত পশুপাখি, কীটপতঙ্গ Rational, মানুষ নয়। যখন বৃষ্টি হয়, পাখি তখন বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচার জন্যে গাছের নিচে আশ্রয় নেয়। এর কোনো ব্যতিক্রম নেই। মানুষের ভেতর ব্যতিক্রম আছে। এদের কেউ কেউ ইচ্ছা করে বৃষ্টিতে ভেজে। কেউ কেউ গাছের নিচে দাঁড়ায় ঠিকই, কিন্তু মন পড়ে থাকে বৃষ্টিতে। সে মনে মনে ভিজতে থাকে।'

'হিমু সাহেব।'

'জ্বি?'

'আপনি কিছুই খাচ্ছেন না। খাবারটা কি আপনার পছন্দ হচ্ছে না?'

'জ্বি না, সবকিছুর মধ্যে ধোঁয়া ধোঁয়া গন্ধ পাচ্ছি।'

ডাক্তার সাহেব বিল মিটিয়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, 'আপনাকে কোথায় নামিয়ে দেব বলুন।'

'কোথাও নামাতে হবে না। আমি এখান থেকেই হেঁটে হেঁটে চলে যাব।'

'অনেকটা দূর কিন্তু।'

'খুব দূর নয়। আবার কবে আপনার কাছে আসব, ডাক্তার সাহেব?'

'আপনাকে আর আসতে হবে না। আমি আপনার চিকিৎসা করব না।'

'আপনার কি ধারণা আমি অসুস্থ না?'

'বুঝতে পারছি না। আচ্ছা, গুড নাইট।'

বাসায় ফিরতে ফিরতে রাত একটা বেজে গেল। মেসের অফিসে বাতি জ্বালিয়ে জীবনবাবু বসে আছেন। আমাকে দেখেই বললেন, 'আপনার জন্যে বসে আছি হিমু ভাই। আপনাকে বলেছি না, আমি একটা ভয়ংকর বিপদে পড়েছি?'

বিপদের কথাটা বলতে চান?'

'জ্বি।'

'আসুন আমার ঘরে। বলুন।'

জীবনবাবু অনেকক্ষণ আমার ঘরের চৌকিতে বসে থেকে কিছু না বলেই চলে গেলেন। খুব জাঁকিয়ে শীত পড়েছে। আমার ঘরের জানালার একটা কাচ ভাঙা। শীতের ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে। জীবনবাবুকে বলতে মনে থাকে না। আজ কী বার? বৃহস্পতিবার? পাশের ঘরে তাস খেলা হচ্ছে। হৈচৈ শোনা যাচ্ছে। বিছানায় যাবার পর লক্ষ করলাম — মাথাধরা শুরু হয়েছে। ইরতাজুল করিম সাহেবকে এই মাথাধরার কথাটা বলা হয় নি।

৮

টেলিফোন করার জায়গা পাচ্ছি না। গ্রিন ফার্মেসি বন্ধ। কম্পিউটারের নতুন একটা সার্ভিস সেন্টার হয়েছে। ওদের টেলিফোন আছে — গেলেই টেলিফোন করতে দেয়। সার্ভিস সেন্টারটিও বন্ধ। এসেছি তরঙ্গিনী স্টোরে। নতুন ছেলেটা আমাকে দেখেই বলল, 'টেলিফোন নষ্ট।' মিথ্যা বলছে বোঝাই যাচ্ছে। বলার সময় মুখের চামড়া শক্ত হয়ে গেছে। সে মনে হয় আগে থেকে ঠিক করে রেখেছিল — আমাকে দেখলেই বলবে, 'টেলিফোন নষ্ট।'

আমি আন্তরিক ভঙ্গিতে বললাম, 'গোটা দশেক টাকা দিলে কি ঠিক হবে?'

'বললাম তো নষ্ট।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আপনার চাকরি কতদিন হয়েছে?'

'তা দিয়া আপনের কী প্রয়োজন?'

'কোনো প্রয়োজন নেই, এমনি জিজ্ঞেস করছি। মুহিব এসেছিল এর মধ্যে?'

'না।'

'ওর ঠিকানা জানেন?'

'না।'

'আপনার ঠিকানা কি?'

'আমার ঠিকানা দিয়া কী করবেন?'

ছেলেটা কঠিন গলার স্বর বের করছে। একে বিরক্ত করতে ভালো লাগছে। কী করে আরো রাগিয়ে দেয়া যায় তাই ভাবছি।

'আপনাদের এই দোকান খোলে কখন?'

'খামাখা প্যাচাল পাড়তেছেন ক্যান? সওদা করার থাকলে সওদা করেন, নয়তো যান গিয়া।'

'আপনার ঠিকানাটা তো এখনো বলেন নি?'

'আরে দুত্তেরি।'

আমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললাম, 'বল পয়েন্ট কলম আছে? দেখান দেখি।'

সে একটা কলম সামনে রাখল। তাকে দেখে মনে হচ্ছে কলম দিয়ে খোঁচা মেরে সে যদি আমার চোখ গেলে দিতে পারত তাহলে খুশি হত।

'দাম কত?'

'দশ টাকা।'

'বাংলাদেশি বল পয়েন্ট না?'

'হুঁ।'

'এগুলি তিন টাকা করে বাইরে বিক্রি হয়। আপনার এখানে দশ টাকা কেন?'

'আপনে বাইরে থাইক্যা কিনেন।'

'আমি আপনার এখান থেকেই কিনতে চাচ্ছি। তিন টাকার জিনিস বেশি হলে চার টাকা হবে। তার চেয়েও বেশি হলে হবে পাঁচ। দশ টাকা কেন?'

'দাম বেশি ঠেকলে নিবেন না।'

মানিব্যাগ খুলে আমি আমার শেষ সম্বল দশ টাকার নোটটা দিয়ে তিন টাকা দামের বল পয়েন্ট কিনে বের হয়ে এলাম। টাকার সন্ধানে যেতে হবে। মাসের প্রথম তারিখে ফুপা আমাকে চার শ টাকা দেন। শর্ত একটাই — আমি কখনো তাঁর বাসায় যেতে পারব না। তাঁর ছেলে বাদল যেন কখনো আমার দেখা না পায়। ফুপার ধারণা, আমার প্রভাবে বাদলের সর্বনাশ হচ্ছে। বাদলকে বাঁচানোর একমাত্র উপায় আমার কাছ থেকে দূরে রাখা। দু মাস ফুপার কাছ থেকে টাকা নেয়া হয় নি।

ফুপার অফিসঘরে শীতকালেও এয়ারকুলার চলে। এয়ারকুলারের বিজবিজ আওয়াজ না হলে বোধহয় তাঁর মেজাজ আসে না।

'কেমন আছেন ফুপা?'

ফুপা ফাইল থেকে মুখ না তুলেই বললেন, 'ভেতরে আস। অনেক দিন দেখা হয় না। তোমাকে তুই করে বলতাম, না তুমি করে বলতাম ভুলে গেছি। ভালো আছ?

'জ্বি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমি মোটামুটি নিশ্চিত ছিলাম যে তুমি জেলে আছ। তোমার মতো লোক দীর্ঘদিন বাইরে ঘুরে বেড়াতে পারে না। একসময় না একসময় তাদের জেলে ঢুকতে হয়। এর মধ্যে পুলিশ ধরে নি তোমাকে?'

'না।'

'আমি অবশ্যি বাদলকে বলেছি — তুমি জেলে আছ। তোমার এক বছরের সাজা হয়েছে। না বললে তোমার খোঁজ বের করার জন্যে অস্থির হয়ে পড়ত।'

'আমি কি বসব ফুপা?'

ফুপা বিস্মিত হয়ে বললেন, 'অনুমতি নিচ্ছ কেন? বস।'

'আপনার অফিসে ঢুকলেই নিজেকে অফিসের একজন কর্মচারী বলে মনে হয়। আপনাকে মনে হয় বড় সাহেব। সামনে বসতে ভয় লাগে।'

ফুপা খুশি হলেন। ফাইল সরিয়ে আমার দিকে তাকালেন।

'তোমার টাকা আলাদা করে রেখেছি।'

'থ্যাংকস ফুপা।'

'নাও, খাম দুটা রাখ। চারশ চারশ করে আটশ আছে।'

খাম পকেটে ভরলাম। ফুপা আমার দিকে খানিকটা ঝুঁকে এসে বললেন, 'তুমি ইচ্ছা করলে আমার অফিসে কাজ করতে পার। এন্ট্রি লেভেলে অফিসারের একটা পোস্ট খালি হয়েছে। আমরা অ্যাডভার্টাইজ করব না। অ্যাডভার্টাইজ করলে সামাল দেয়া যাবে না। তুমি চাইলে আজই তোমাকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেয়া যেতে পারে।'

'বেতন কত?'

'বেসিক তিন হাজার প্লাস ফর্টি পারসেন্ট হাউস রেন্ট। টু হানড্রেড কনভেন্স। থ্রি হানড্রেড মেডিকেল – হিসাব কর। কত হল?'

'জটিল হিসাব আমাকে দিয়ে হবে না ফুপা। তবে আমি খুব ভালো এক জন লোক দিতে পারি। ভেরি অনেস্ট।'

'তোমার কাছে তো আমি লোক চাই নি।'

'তা চান নি। তবু হাতে যখন আছে তখন বললাম। আমার জানামতে তাঁর মতো মানুষ এই পৃথিবীতে দ্বিতীয় কেউ নেই। এর উপর আমি আটশ টাকা বাজি রাখতে পারি। এই টাকাটাই আমার সম্বল। আপনি যদি এমন কাউকে পান যে ঐ লোকটার মতো, তাহলে আমি সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে আটশ টাকা দিয়ে দেব।'

ফুপা চুরুট ধরাতে ধরাতে বললেন, কী আছে লোকটার যা অন্য কারোর নেই?

'সে তার বাড়ির সামনে একটি আমগাছ দেখতে পায়, যদিও সেখানে কোনো গাছ নেই। কোনোকালে ছিলও না। সে পরিষ্কার আমগাছ দেখে, গাছে পাখি বসে থাকতে দেখে। পাখির কিচিরমিচির শুনতে পায়।'

ফুপা বিস্মিত হয়ে বললেন, 'তুমি এই বদ্ধ উন্মাদকে আমার এখানে চাকরি দিতে চাচ্ছ?'

'জ্বি।'

'কেন বল তো?'

'ভদ্রলোকের চাকরি খুব দরকার। উনি অসুস্থ। এপিলেপ্সি আছে। আগে ভালো চাকরি করতেন। এখন চাকরি নেই। যদি চাকরি হয় মানসিক শক্তি পাবেন। এতে শরীর সুস্থ হতে থাকবে।'

'তোমার ধারণা, আমার অফিস পাগল সারাবার কারখানা?'

'না, তা হবে কেন?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'একে উন্মাদ, তার উপর এপিলেপটিক পেসেন্ট, তাকে তুমি আমার এখানে চাকরি দেবার কথা ভাবলে কি বলে বল তো?'

'আর ভাবব না ফুপা। এখন তাহলে যাই?'

'যাও। খবরদার, বাসায় আসবে না।'

'বাদল আছে কেমন?'

'ও ভালোই আছে। তোমার প্রভাব থেকে দূরে আছে, ভালো না থাকার তো কোনো কারণ নেই।'

'আমি কি ওর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলতে পারি ফুপা? অনেক দিন দেখি না — কথা বলতে ইচ্ছা করে।'

'অসম্ভব! টেলিফোন করতে পারবে না। একেবারেই অসম্ভব।'

'বলব — ঢাকা সেন্ট্রাল জেল থেকে বিশেষ অনুমতি নিয়ে টেলিফোন করা হচ্ছে। মিনিট দুই কথা বলব। দু মিনিটে কী আর হবে!'

'কিছু হবার থাকলে দু মিনিটেই হবে। বাদলের মাথা খারাপ হয়েই আছে — ঠিক করার চেষ্টা করছি। তোমার টেলিফোন পেলে — আর ঠিক হবে না। হিমু, তুমি বিদেয় হও। ক্লিয়ার আউট। এখন থাক কোথায়?'

কোথায় থাকি বলতে যাচ্ছিলাম, ফুপা আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'থাক্, বলতে হবে না। জানতে চাচ্ছি না।'

আমি ঘর ছেড়ে বেরুবার আগে বললাম, 'ফুপা! বাদলের ব্যাপারে একটা ক্ষুদ্র সমস্যা হতে পারে। ঐ সমস্যাটা নিয়ে কি ভেবেছেন?'

'কী সমস্যা?'

'আমি জেলে আছি শুনে সেও ভাবতে পারে জেলে যাওয়াটা প্রয়োজনীয়। কাজেই জেলে যাবার একটা চেষ্টা করতে পারে।'

ফুপার মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। আমি চলে এলাম। মজনু মিয়ার ভাতের হোটেলে যেতে হবে। ভাতের বিল দিতে হবে। অনেক টাকা বাকি পড়ে আছে।

AMARBOI.COM

মজনু মিয়ার হোটেলে খুব ভিড়। প্রচুর কাস্টমার। সবার জায়গা হচ্ছে না। কেউ কেউ দাঁড়িয়ে আছে। মজনু মিয়া টাকা গুনতে হিমশিম খাচ্ছে। আমাকে দেখে শীতল গলায় বলল, 'ভাইজান, কথা আছে।'

'কী কথা — সাধারণ না প্রাইভেট?'

'প্রাইভেট।'

আমি প্রাইভেট কথা শোনার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। বসার জায়গা নেই। দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে। মজনু মিয়া তার ছোট ভাইটাকে ক্যাশে বসিয়ে এগিয়ে এল। আমি বললাম, 'খুব ভালো বিজনেস হচ্ছে, মজনু মিয়া। ব্যাপার কি?'

'ব্যবসাপাতি হইল আপনার ভাগ্যের ব্যাপার। কখন কী হয় কিছু বলা যায় না। কয়েক দিন ধরে দেখতেছি আমার সামনের হোটেলের সব বান্ধা কাস্টমার এইখানে আসতেছে।'

'বয়-বাবুর্চি তো বাড়াতে হবে। এরা পারছে না। আরো কয়েকজন নিন।'

'দেখি।'

'আর এদের বেতন বাড়িয়ে দিন।'

'বাজে কথা বলবেন না তো হিমু ভাই। বাজে কথা শুনতে ভালো লাগে না।'

'আচ্ছা যান। বাজে কথা বলব না। আপনার প্রাইভেট কথা শুনব। প্রাইভেট কথাটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কি?'

'আপনি যে আপনার এক ভাগ্নেকে গছায়ে দিয়ে গেলেন — তার আছে মৃগী বেরাম। ঐ দিন দুপুরে শরীর কাঁপতে কাঁপতে পড়ে গেল। কেলেঙ্কারি অবস্থা। কাস্টমাররা সব খাওয়া ফেলে উঠে দাঁড়িয়েছে।'

'তাতে অসুবিধা কী?'

'অসুবিধা আছে না? এইরকম রোগী নিয়ে কারবার করলে তো হবে না ভাইজান। দোকানের বদনাম হবে। লোক আসা কমে যাবে। আপনে উনারে আমার দোকানে আসতে নিষেধ করে দেবেন।'

'আচ্ছা, নিষেধ করে দেব।'

'আপনি রাগ হলেও কিছু করার নেই। আপনার জন্য সব মাপ। কিন্তু হিমু ভাই — পাগল, ছাগল, মৃগীরোগী এদের আমি দোকানে ঢুকাব না। ঐদিন আপনার ভাগ্নেরে দেখে আমি কানে হাত দিয়েছি। অনেক কাস্টমার বাইরে দাঁড়া হয়েছিল। গণ্ডগোল দেখে ভিতরে ঢোকে নাই। আপনার ভাগ্নেরে আমি বলে দিয়েছি আর যেন এখানে না আসে।'

'আপনি নিজেই বলে দিয়েছেন?'

'জ্বি ভাইজান, আমিই বলেছি। মৃগীরোগী আমার দরকার নাই।'

'আমি পকেট থেকে সিগারেট বের করতে করতে বললাম, 'রুগ্ন মানুষের প্রতি মমতা দেখানোর বদলে আপনি দেখাচ্ছেন ঘৃণা। এটা কি ঠিক হচ্ছে'? রোগটা তো আপনারও হতে পারত। তা ছাড়া এই যে আজ আপনার দোকানে এত বিক্রি বেড়েছে, হয়তো আমার ভাগ্নের কারণেই বেড়েছে। এই কদিন তাকে যত্ন করে খাইয়েছেন বলেই বেড়েছে। এখন তাকে বিদেয় করে দিয়েছেন — দেখা যাবে হুট করে বিক্রিবাটা পড়ে যাবে।'

'আমাকে ভয় দেখায়ে লাভ নেই হিমু ভাই। আমি ভয় খাওয়ার লোক না। ঐ মৃগীরোগী আমি আর দোকানে ঢুকতে দেব না।'

'আচ্ছা ঠিক আছে।'

'আপনি মনে কিছু নিবেন না হিমু ভাই। আপনার জন্যে আমি আছি। অন্য কারো জন্যে না।'

আমি মজনু মিয়ার টাকা-পয়সা মিটিয়ে মোরশেদ সাহেবের খোঁজে গেলাম। খিলগাঁয়ে তাঁর বাড়িতে তাঁকে পাওয়া গেল না। ঘর তালাবন্ধ। বাড়িওয়ালাকে খুঁজে বের করলাম। বয়স্ক ভদ্রলোক। তিনি আমাকে খুব আন্তরিকতার সঙ্গেই ঘরে নিয়ে বসালেন। বললেন, 'উনি বাসা ছেড়ে দিয়েছেন।'

আমি বললাম, 'কোথায় আছে জানেন?'

'জ্বি না।'

'বাসা ছেড়েছেন কবে?'

'গত পরশু। দু মাসের ভাড়া পাওনা ছিল। উনি ভাড়াটাড়া সব মিটিয়ে দিয়ে গেছেন। আমি বললাম, থাক্, ভাড়া দিতে হবে না। বাদ দেন। রাজি হলেন না।'

'জিনিসপত্রগুলো কোথায়?'

'জিনিসপত্র কিছু তো ছিল না। একটা খাট, কিছু চেয়ার-টেবিল। ঐসব একটা ঘরে তালা দিয়ে রেখেছি। বলেছি, এক সময় এসে নিয়ে যাবেন, কোনো অসুবিধা নাই। ভদ্রলোকের উপর মায়া পড়ে গিয়েছিল, বুঝলেন? ভালো চাকরি করছিল, সুন্দর সংসার — হঠাৎ কী হয়ে গেল দেখেন! সব ছারখার। যাবার সময় বাসার সামনে খোলা জায়গাটায় দাঁড়িয়ে খুব কাঁদছিলেন। দেখে মনটা খারাপ হয়ে গেল। আমার বড় বৌমা বলল, বাবা, উনাকে বলেন — বাসা ছাড়ার দরকার নাই। উনাকে থাকতে বলেন। এইগুলা হচ্ছে ভাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাবের কথা। সংসার তো ভাই ভাবের কথায় চলে না।'

'তা তো ঠিকই।'

'বিনা পয়সায় থাকতে দিলে আমার চলে কী করে! আমি তো এতিমখানা খুলি নাই। এই কথাই বৌমাকে বুঝায়ে বললাম।'

'উনি কী বললেন?'

'কিছু বলে নাই। চুপ করে ছিল। লক্ষ্মী মেয়ে। শ্বশুরের মুখের উপর কোনো কথা বলবে না। তারপর শুনি — রাতে ভাত না খেয়ে শুয়ে পড়েছে। আমি বললাম, ভাত খাও নাই কেন, মা? সে বলল, মানুষটার জন্যে মনটা খুব খারাপ লাগছে বাবা। ভাত খেতে ইচ্ছা করছে না। কি রকম করে কাঁদছিল! যাই হোক, মেয়েছেলের কথা বাদ দেন। মেয়েছেলে বিড়ালের জন্যেও কাঁদে। এখন বলেন আপনি উনার কে হন?'

'সম্পর্কে মামা হই।'

'ও আচ্ছা। খুশি হয়েছি আপনার সঙ্গে কথা বলে।'

আমি বললাম, 'আপনার বড় বৌমাকে একটু ডাকবেন?'

'কেন?'

'একটু দেখব। ভালোমানুষ দেখার মধ্যেও পুণ্য আছে। যদি অসুবিধা না হয় একটু ডাকুন।'

ভদ্রলোক বিস্মিত হয়েই তাঁর বড় বৌমাকে ডাকলেন। সাদাসিধা সরল চেহারার মেয়ে, দু বছরের একটা বাচ্চা কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কত বয়স হবে মেয়েটির? খুব বেশি হলে উনিশ–কুড়ি। তার কোলের শিশুটিও অবিকল তার মতো দেখতে। মা এবং শিশু যেন একই ছাঁচে তৈরী। আমি বললাম, 'আপনি কেমন আছেন?'

মেয়েটি জবাব দিল না।

আমি বললাম, 'আপনার ছেলেটার কি নাম রেখেছেন?'

মেয়েটি এই প্রশ্নেরও জবাব দিল না। বাচ্চা নিয়ে ভেতরে চলে গেল। বাড়িওয়ালা ভদ্রলোক বললেন, 'আমার বৌমা খুব লাজুক স্বভাবের। বাইরের কারোর সঙ্গে কথা বলতে পারে না।'

আমি বললাম, 'আমি কথা বলতে চাইও নি। শুধু দেখতে চেয়েছি। আচ্ছা ভাই, যাই।'

'আপনার ভাগ্নেকে বলবেন জিনিসপত্র সাবধানে রাখা আছে। যেন চিন্তা না করে।'

'জ্বি আচ্ছা, বলব। আপনার অনেক মেহেরবানি।'

৯

নীতুর একটি চিঠি এসেছে। নীতুর স্বভাবও দেখা যাচ্ছে ইয়াদের মতো। চিঠি পাঠিয়েছে ইংরেজিতে টাইপ করে। ডাকে পাঠায় নি, হাতে হাতে পাঠিয়েছে। নীতুর ম্যানেজার চিঠি নিয়ে এসেছে। তার উপর নির্দেশ, চিঠি আমার হাতে দিয়ে অপেক্ষা করবে এবং জবাব নিয়ে যাবে।

বড়লোকের ম্যানেজার শ্রেণীর কর্মচারীরা নিজের প্রভু ছাড়া সবার উপর বিরক্ত হয়ে থাকে। এই ভদ্রলোককে দেখলাম মহা বিরক্ত। প্রায় ধমকের স্বরে বলল, 'কোথায় থাকেন আপনি?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কেন বলুন তো?'

'এই নিয়ে দশবার এসেছি। বসে যে অপেক্ষা করব সেই ব্যবস্থাও নেই। মেসের অফিস বন্ধ। এক জনকে বললাম একটা চেয়ার এনে দিতে, সে আচ্ছা বলে চলে গেল। আর তার দেখা নেই।'

আমি গম্ভীর গলায় বললাম, 'এর পর যখন আসবেন একটা ফোল্ডিং চেয়ার সঙ্গে করে নিয়ে আসবেন।'

ম্যানেজারের মুখ কঠিন হয়ে গেল। মনে হচ্ছে এ-জাতীয় কথাবার্তা শুনে সে অভ্যস্ত নয়। নীতুর চিঠি বের করে বলল, 'চিঠি পড়ে জবাব লিখে দিন। আপা বলেছেন — জবাব নিয়ে যেতে।'

'এখন চিঠি পড়তে পারব না।'

ম্যানেজার হতভম্ব গলায় বলল, 'এখন চিঠি পড়তে পারবেন না?'

'জ্বি না।'

'চিঠি আপা পাঠিয়েছেন।'

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, 'আপাই পাঠাক আর দিদিমণিই পাঠাক, চিঠি এখন পড়ব না।'

'কখন পড়বেন?'

'তাও তো বলতে পারছি না। আমার মাথাধরা রোগ আছে। খারাপ ধরনের মাথাধরা। এখন সেটা শুরু হয়েছে। আমি খুব ঠাণ্ডা পানিতে অনেকক্ষণ ধরে গোসল করব। তারপর দরজা-জানালা বন্ধ করে ঘুমাব। ঘুম থেকে উঠে যদি দেখি মাথাব্যথা সেরেছে, তখন পড়তে পারি। আবার নাও পারি।'

'জরুরি চিঠি।'

'আমার ঘুমটা চিঠির চেয়েও জরুরি। আপনি বরং এক কাজ করুন, এখন চলে যান। রাতে একবার খোঁজ নেবেন।'

'আপাকে কি বলব আপনি চিঠি পড়তে চাচ্ছেন না?'

আমি ম্যানেজারের মুখের দিকে তাকালাম, সে আমাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে। মানুষজন দ্রুত বদলে যাচ্ছে — সবাই ভয় দেখাতে চায়। ভয় দেখিয়ে কাজ সারতে চায়।

কেউ ভয় দেখালে উল্টা তাকে ভয় দেখাতে ইচ্ছা করে। ম্যানেজার ব্যাটাকে চূড়ান্ত রকমের ভয় কী করে দেখানো যায়? মাথায় কিছুই আসছে না। ম্যানেজার কঠিন মুখ করে বলল, 'আমি কি উনাকে বলব যে উনি বলেছেন যখন উনার ইচ্ছা হয় তখন পড়বেন। এখন ইচ্ছা হচ্ছে না।'

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, 'বলতে পারেন।'

'আচ্ছা, বলব।'

'চিঠিটা সঙ্গে করে নিয়ে যান। রাতে যখন আসবেন তখন নিয়ে আসবেন।'

'আপনি কাজটা ঠিক করছেন না।'

'সবাই তো আর ঠিকঠাক কাজ করে না। কেউ কেউ ভুলভাল কাজ করে। আমি ভুলভাল কাজ করতেই অভ্যস্ত। আপনি চিঠি নিয়ে চলে যান।'

'জ্বি না, আমি অপেক্ষা করব।'

'বেশ, অপেক্ষা করুন। আমার ঘরে একটা চেয়ার আছে। বের করে নিয়ে যান। বারান্দায় বসুন। শুভ বিকাল।'

আমি চেয়ার বের করে দিলাম। দীর্ঘ সময় নিয়ে গোসল সারলাম। ম্যানেজার বসে আছে মূর্তির মতো। আমি দরজা বন্ধ করে ঘুমাতে গেলাম। ঘুম ভাঙল সন্ধ্যায়। দরজা না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খুলেই ডাকলাম, 'ম্যানেজার সাহেব।'

'জ্বি।'

'আপনি এখনো আছেন?'

'জ্বি।'

'সঙ্গে গাড়ি আছে?'

'আছে।'

'তাহলে তরঙ্গিনী স্টোরে চলে যান। একটা বল পয়েন্ট কিনে আনবেন। চিঠির জবাব লিখতে হবে। আমার কাছে একটা বল পয়েন্ট আছে। দশ টাকা দিয়ে কিনেছিলাম — লেখা দিচ্ছে না।'

'আমার কাছে কলম আছে।'

'আপনার কলমে কাজ হবে না। আমাকে লিখতে হবে নিজের কলমে।'

'তরঙ্গিনী স্টোর থেকেই কিনতে হবে?'

'জ্বি।'

'স্টোরটা কোথায়?'

'বলছি। আপনার কাছে বল পয়েন্টের দাম হয়তো তিন টাকা চাইবে কিন্তু আপনি দেবেন দশ টাকা। নিতে না চাইলে জোর করে দেবেন।'

ম্যানেজার নিশ্বাস ফেলে বলল, 'জ্বি আচ্ছা, দেব। আপনি দয়া করে চিঠিটা পড়ুন।' তার কঠিন ভাব এখন আর নেই। এখন সে ভীত চোখেই আমাকে দেখছে।

আমি দরজা খুলে চিঠি নিলাম। ম্যানেজার সাহেবকে তরঙ্গিনী স্টোরটা কোথায় বুঝিয়ে বললাম। ভদ্রলোক আর একবার বলল, 'অন্য কোনো জায়গা থেকে কিনে আনলে হবে না?'

আমি কঠিন গলায় বললাম, 'না।'

AMARBOI.COM

নীতু লিখেছে —

হিমু সাহেব,

আশা করি সুখে আছেন। অবশ্যি আমার আশা করা না করায় কিছু যায় আসে না। আপনি সব সময় সুখেই থাকবেন, এবং আপনার আশপাশের মানুষদের নানানভাবে বিভ্রান্ত করবেন, বিপদে ফেলবেন। অন্যদের সমস্যায় ফেলাতেও সুখ আছে। সেই সুখের ঘাটতি আপনার কখনো হয় না।

আপনি নিশ্চয়ই ইতোমধ্যে জেনেছেন যে আপনার বন্ধু অবশেষে আপনার সুচিন্তিত পরামর্শ গ্রহণ করেছেন। তিনি ভিখিরি হয়েছেন। ভিখিরির মতো সাজসজ্জা করে পথে পথে ঘুরছেন। এমন হাস্যকর ব্যাপার যে ঘটতে পারে তা কোনোদিনও কল্পনা করি নি। ইয়াদ বুদ্ধিমান নয় এই তথ্য আপনি যেমন জানেন, আমিও জানি। কিন্তু ও যে কতটা বোকা তা আপনিই চোখে আঙুল দিয়ে আমাকে দেখালেন।

ইয়াদের আত্মীয়স্বজনদের আমি বলেছি ব্যাপারটা আর কিছুই না, ইয়াদের একধরনের খেলা। ওরা ব্যাপারটা সেভাবেই নিয়েছে, এবং বেশ মজাও পাচ্ছে। কিন্তু আমি তো জানি ব্যাপারটা খেলা হলেও আপনার জন্যে খেলা, ইয়াদের জন্যে নয়। আপনি যে খেলা খেলছেন তা হল dangerous game. আশা করি আপনি জানেন খেলা কোথায় শেষ করতে হয়।

আমি দুজন লোক ইয়াদের পেছনে লাগিয়ে রেখেছি। ওরা সব সময় তার দিকে লক্ষ রাখছে। আমার ধারণা ছিল, দুদিন পার হবার আগেই ওর মোহভঙ্গ হবে এবং সে বাড়িতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফিরে আসবে। আমাকে জোর খাটিয়ে কিছু করতে হবে না। কিন্তু সে বাসায় ফিরছে না। আপনি এই চিঠি পাওয়ামাত্র এমন ব্যবস্থা করবেন যেন সে বাড়িতে ফিরে আসে। আমি একটি ব্যাপার খুব পরিষ্কার করে আপনাকে জানাতে চাই, তা হল — ও বোকা হোক, যাই হোক, ওকে আমি অসম্ভব ভালবাসি।

ভালবাসা মাপার যন্ত্র বের হয় নি। বের হলে আমার ভালবাসার পরিমাণ আপনাকে মেপে দেখাতাম। ওর কোনোরকম ক্ষতি আমি সহ্য করব না। কাউকে সেই ক্ষতি করতেও দেব না। ও কোথায় রাত্রি যাপন করে তা আমাদের ম্যানেজার সাহেব জানেন। উনিই আপনাকে সেখানে নিয়ে যাবেন।

ওর মাথা থেকে ভূত সরিয়ে আপনি ওকে আমার কাছে ফিরিয়ে দেবেন এবং আর কোনোদিনও ওর সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন না। আপনার জন্যে এই কাজ কঠিন নয়, বেশ সহজ। এই সহজ কাজের জন্যে আমি অনেক বড় মূল্য দিতে প্রস্তুত আছি। Tell me your price.

আরো কিছু কথা বলার ছিল, ক্লান্ত বোধ করছি।

নীতু

আমি চিঠি শেষ করে ডাকলাম, 'ম্যানেজার সাহেব!'

ভদ্রলোক তৎক্ষণাৎ সাড়া দিল, 'জ্বি, স্যার।'

'আপনাকে কি চিঠির জবাব নিয়ে যেতে বলেছে?'

'জ্বি।'

'বল পয়েন্ট এনেছেন?'

'জ্বি।'

'কত নিয়েছে?

'চার টাকা চেয়েছিল – আপনি দশ টাকা দিতে বলেছেন, দিয়েছি। নিতে চাচ্ছিল না। আপনার কথা বলে জোর করে দিয়ে এসেছি।'

'ভালো করেছেন।'

'আপনি কি চিঠির জবাব দেবেন?'

'না। তবে আপনাকে নিয়ে ইয়াদের খোঁজে যাব। চলুন যাওয়া যাক।'

'এখন গেলে উনাকে পাওয়া যাবে না। উনার একটা ঘুমাবার জায়গা আছে — রাত এগারটার দিকে সেখানে ফেরেন।'

'তাকে কি এখন ভিখিরির মতো লাগে?'

'জ্বি, লাগে।'

'ভিক্ষা শুরু করেছে?'

'জ্বি না।'

'চলছে কীভাবে?'

'তা ঠিক জানি না। কিছু টাকা-পয়সা নিয়ে বের হয়েছিলেন বলে মনে হয়।'

'খাওয়াদাওয়া করছে?'

'প্রথম দিন কিছু খান নি। রাতে একটা পাউরুটি খেয়েছেন।'

'তারপর?'

'আমি শুধু প্রথম দিনের খবরই জানি।'

'ওর দিকে লক্ষ রাখার জন্যে লোক রাখা আছে না?'

'জ্বি আছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ম্যানেজার সাহেব, আপনি নিজে কি খাওয়াদাওয়া করেছেন, না দুপুর থেকে এখানেই বসে আছেন?'

'খাই নি কিছু।'

'যান, খেয়ে আসুন।'

'জ্বি না?

'না কেন?'

ম্যানেজার জবাব দিল না। আমি বললাম, 'নীতু কি বলে দিয়েছে আমাকে এক মুহূর্তের জন্যেও চোখের আড়াল না করতে?'

'জ্বি।'

'তা হলে চলুন। আমার সঙ্গেই চলুন। আপনাকে খাইয়ে আনি।'

'লাগবে না।'

'আসুন যাই।'

'স্যার, আমি কিছু খাব না।'

১০

রাত এগারটায় ইয়াদের সন্ধানে বের হলাম।

ইয়াদ থাকে মিরপুর দশ নম্বরে, সিঅ্যান্ডবি গুদামে। গুদামের ভেতর গাদাগাদি করে রাখা রাস্তার কালভার্টের সিরামিক স্ল্যাব। দেখতে বিশাল আকৃতির সিলিন্ডারের মতো। তার একটিতে ইয়াদের সংসার। বাইরে থেকে ইয়াদ বলে ডাকতেই সে খুশি খুশি গলায় বলল, 'চলে আয়। মাথা নিচু করে ঢুকবি। দাঁড়া এক সেকেন্ড, বাতি জ্বালাই।' সে কুপি জ্বালল। আমি ঢুকলাম। ভক করে খানিকটা পচা দুর্গন্ধ নাকে ঢুকল।

'গন্ধে নাড়িভুঁড়ি উল্টে আসছে রে ইয়াদ!'

'প্রথম খানিকক্ষণ গন্ধ পাবি। তারপর পাবি না। মাথা নিচু করে ঢোক্।'

সিলিন্ডার স্ল্যাবের এক মাথা পলিথিন দিয়ে মোড়ানো, অন্য মাথায় চটের পর্দা। নিচে পুরোনো একটা কম্বল লম্বালম্বি বিছানো। কম্বলের উপর ইয়াদ হাসিমুখে বসে আছে।

'তুই আসবি জানতাম। ইচ্ছা করেই তোকে খবর দিই নি। তুই হচ্ছিস গ্রে হাউন্ড টাইপ। গন্ধ শুঁকে শুঁকে চলে আসবি। আমার সংসার কেমন দেখছিস?'

'মন্দ না।'

'মন্দ না মানে? একসেলেন্ট। শীত টের পাচ্ছিস?'

'না।'

'পুব-পশ্চিমে মুখ করা। উত্তরী বাতাস ভেতরে ঢোকার কোনো উপায় নেই। মশা লাগছে?'

'না।'

'এক মুখ পলিথিন দিয়ে ঢাকা, অন্য মুখে চটের পর্দা। মশা ঢোকার কোনো উপায় নেই।'

'এরকম আরামের জায়গার খোঁজ পেলি কোথায়?'

'এরচেয়েও আরামের জায়গা আছে। ভাড়া বেশি।'

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, 'ভাড়া দিতে হয়!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'অবশ্যই দিতে হয়।'

'এর ভাড়া কত?'

'দু টাকা।'

'মাসে দু টাকা?'

ইয়াদ বিরক্ত হয়ে বলল, 'তুই কি পাগলটাগল হয়ে গেলি? শায়েস্তা খাঁর আমল ভেবেছিস? পার নাইট দু টাকা। শীতকালে চার্জ বেশি। গরমকালে পার নাইট এক টাকা। মাসচুক্তির কোনো ব্যাপার নেই।'

'ভাড়া নেয় কে?'

'সর্দার আছে। সর্দার নেয়। সিঅ্যান্ডবির দারোয়ান নেয়, পুলিশ নেয়, অনেক ভাগাভাগি। পুরোপুরি জানি না।'

'দু টাকা ভাড়া দিয়ে কেউ থাকে?'

'অবশ্যই থাকে। কোনোটা খালি নেই। তা ছাড়া অনেক স্পেস। কোনো-কোনোটায় পুরো ফ্যামিলি আঁটে। চা খাবি?'

'তোর এখানে কি চা বানাবার ব্যবস্থা আছে?'

'আরে না! তবে কাছেপিঠেই আছে। ডাক দিলে দিয়ে যাবে। চা, সিগারেট, পান।'

'সুখে আছিস মনে হয়।'

'অবশ্যই সুখে আছি। কোনোরকম চিন্তাভাবনা নেই। কে কি বলল তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই — কী আরামের ঘুম যে হয়, তুই বিশ্বাস করতে পারবি না। আমার কি মনে হয় জানিস? আরামের ঘুম কী জিনিস এটা জানার জন্যেই আমাদের সবার কিছুদিনের জন্যে হলেও ভিখিরি হওয়া উচিত। তার উপর ভিখিরিদের মধ্যে কমিউনিটি ফিলিং যা আছে তারও তুলনা নেই। বাইরে থেকে আমাদের মনে হয় এক ভিখিরি অন্য ভিখিরিকে দেখতে পারে না, এটা খুবই ভুল কথা। সবাই সবার খোঁজ রাখে। ধর, সিগারেট খা।'

'সিগারেট ধরেছিস?'

'হুঁ, ধরেছি। হাইকোর্ট মাজারের কাছে এক রাতে গাঁজা খেয়েছি। দু টান দিয়ে মাথা ঘুরে পড়ে গেলাম। উঠলাম সকালে — হা-হা-হা।'

ইয়াদ গা দুলিয়ে হাসতে লাগল। আমি বললাম, 'নীতুর কথা মনে হয় না?'

ইয়াদ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'না।'

'একেবারেই না?'

'উহুঁ। তুই বলায় মনে পড়ল।'

'ও কেমন আছে জানতে চাস না?'

'ভালো আছে তো বটেই। খারাপ থাকবে কেন?'

'তোর আসল কাজ কেমন এগুচ্ছে?'

'এগুচ্ছে না। অবশ্যি আমি নিজেই গা করছি না। তাড়া তো কিছু নেই। হোক ধীরেসুস্থে। আগে ওদের মেইন স্ট্রিমের সঙ্গে মিশে নিই — তারপর।'

'ওদের মেইন স্ট্রিমের সঙ্গে এখনো মিশতে পারিস নি?'

'উঁহু। ওরা খুব চালাক, বুঝলি হিমু, চট করে ধরে ফেলে যে আমি ওদের এক জন না। বাইরের কেউ।'

'কিছু বলে না?'

'না, কিচ্ছু বলে না। চুপ করে থাকে। তবে আমার মতো অনেকেই আছে।'

'বলিস কী!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'নানান ধান্ধায় ভিখিরি সেজে ঘোরে। বিদেশি আছে বেশ কয়েকটা। এর মধ্যে একটা আছে নেদারল্যান্ডের, বিরাট চোর। চা খাবি কিনা তা তো বললি না। খাবি?'

'খাব।'

ইয়াদ চটের পর্দা সরিয়ে ডাকল, 'তুলসী, তুলসী, দুটা চা।'

'তুলসীকে দেখে রাখ্ — অসাধারণ একটা মেয়ে। আমি আমার জীবনে এত ভালো মেয়ে দেখি নি — কী যে বুদ্ধি! তোর তো অনেক বুদ্ধি, তোকেও সে এক হাটে কিনে অন্য হাটে বেচে ফেললে তুই টেরও পাবি না।'

'তুলসীর বয়স কত?'

'সাত–আট হবে। বেশি না।'

'ও কি ভিক্ষা করে?'

'গাবতলি বাসস্ট্যান্ডে চা বিক্রি করে। তুলসীর বাবা আর সে, দুজনের ব্যবসা। ভালো রোজগার।'

তুলসী চা নিয়ে ঢুকল। মেয়েটার গায়ে সুন্দর গরম স্যুয়েটার। মাথার চুল লাল। স্বর্ণকেশী বালিকা। ইয়াদ বলল, 'তুলসী হল আমার খুবই ক্লোজ ফ্রেন্ড।'

তুলসী আড়চোখে আমাকে দেখল, কিছু বলল না। ইয়াদ বলল,. 'চায়ের কাপ থাক্, পরে নিয়ে যাবি। হিমু, তুলসীকে কেমন দেখলি?'

'ভালো।'

'মারাত্মক বুদ্ধি! কি করে বুঝলাম জানিস? তুলসী আমাকে বলল, দুজন লোক আমার উপর নজর রাখছে। আমি কিচ্ছু বুঝি নি।'

'দুজন তাহলে তোর উপর নজর রাখছে?'

'হুঁ। নীতুর কাণ্ড। আমাকে সারাক্ষণ চোখে চোখে রাখা হল ওর অভ্যাস। কোনদিন দেখব টুটি–ফুটিকে নিয়ে উপস্থিত হয়েছে।'

'উপস্থিত হলে কী করবি?'

ইয়াদ গম্ভীর গলায় বলল, 'সত্যি সত্যি উপস্থিত যদি হয়, তাহলে বলব, আমার সঙ্গে থেকে যাও নীতু।'

'কি মনে হয় তোর, নীতু থাকবে?'

'কিছু বলা যায় না, থাকতেও পারে। এখানে থাকাটা কিন্তু আরামদায়ক। এক রাত থেকে যা, তুই নিজেই টের পাবি। থাকবি ?'

'উঁহু, আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।'

'কুপির ধোঁয়ায় দম বন্ধ হচ্ছে। কুপি নিভিয়ে দিলেই দেখবি — আরাম।'

ইয়াদ ফুঁ দিয়ে কুপি নিভিয়ে দিল। চারদিকে ঘন অন্ধকার। এমন অন্ধকার আমি আমার জীবনে দেখি নি।

'হিমু!'

'হুঁ।'

'ভিখিরিদের সঙ্গে আমার এক দিন–দুদিন থাকলে হবে না। অনেক দিন থাকতে হবে। এখনো ঠিকমতো ডাটা কালেক্ট শুরু করি নি, তবু অদ্ভুত অদ্ভুত তথ্য পাচ্ছি। একটা তোকে বলি — আমাদের ধারণা, মাসের এক–দুই তারিখের দিকে ভিখিরিরা বেশি ভিক্ষা পায়। লোকজনের হাতে বেতনের টাকা থাকে। তারা ভিক্ষা বেশি দেয়। ব্যাপার মোটেই তা না। সবচে' বেশি ভিক্ষা পায় মাসের শেষ সপ্তাহে। ইন্টারেস্টিং না?'

'হুঁ। ইন্টারেস্টিং।'

'রিসার্চের অনেক কিছু আছে। যারা ভিক্ষা দিচ্ছে তাদের নিয়েও রিসার্চ হওয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দরকার। এই দিকে কোনো কাজই হয় নি। ভিক্ষুকদের মধ্যে শ্রেণীভেদ আছে, এটা জানিস?'

'জানি না, তবে আন্দাজ করতে পারি।'

'নাস্তিকতা যে ভিখিরিদের মধ্যে সবচে' বেশি এটা জানিস?'

'আঁচ করতে পারি।'

'ফ্যামিলি স্ট্রাকচার ওদের ভেঙে পড়েছে। স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে থাকে, আবার স্ত্রী অন্য কারো সঙ্গেও কিছুদিন থেকে স্বামীর কাছে ফিরে আসে। স্বামীর বেলাতেও এটা সত্যি — এরা সম্পূর্ণ নতুন ধরনের এক সমাজ তৈরি করছে। সেই সমাজের আইনকানুন আলাদা। এরা যাযাবরদের মতো হয়ে যাচ্ছে। কোথাও একনাগাড়ে তিন রাতের বেশি থাকবে না। ঘুরে ঘুরে বেড়াবে। তোর কাছে ইন্টারেস্টিং লাগছে?'

'লাগছে।'

'ভিখিরিদের রোজগার সম্পর্কে আগে যে সমীক্ষা করেছিলাম সেটা পুরোপুরি ভুল। ভিখিরিদের মধ্যে নতুন মা যারা, অর্থাৎ যাদের বাচ্চার বয়স এক মাস দু মাস, তারা খুব ভালো রোজগার করতে পারে। তবে এইসব ক্ষেত্রে নতুন মার শরীর দুর্বল বলে বের হতে পারে না — বাচ্চাটা ভাড়া খাটে। চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ টাকা দৈনিক ভাড়া। এত সব তথ্য পাচ্ছি যে তুই কল্পনাও করতে পারবি না। এইসব তথ্য নিতে নিতেই এক জীবন কেটে যাবে।'

'এর মানে কি এই যে — তুই তোর জীবন এই গর্তে কাটিয়ে দিবি? নীতুর কাছে ফিরে যাবি না?'

ইয়াদ হাই তুলতে তুলতে বলল, 'দেখি।'

'আমি আজ যাচ্ছি।'

'কাল আসবি?'

'বুঝতে পারছি না — আসতেও পারি। তোর কিছু লাগবে? লাগলে বল, নিয়ে আসব।'

'কিছু লাগবে না।'

'টাকা-পয়সা লাগবে?'

'না। পকেটে রুমাল থাকলে রেখে যা। সর্দি হয়ে গেছে। রুমালের অভাবে সামান্য অসুবিধা হচ্ছে।'

ইয়াদের কাছ থেকে বের হয়ে বড় রাস্তায় নেমে দেখি গাড়ি নিয়ে ম্যানেজার অপেক্ষা করছে। আমি বললাম, 'আপনি এখনো যান নি? চলে যান।'

'আপনাকে পৌঁছে দিয়ে যাই স্যার।'

'আমি হেঁটে বাড়ি ফিরব। পৌঁছে দিতে হবে না।'

'আপাকে কী বলব?'

'আমি কয়েকদিনের মধ্যে তাঁর সঙ্গে দেখা করব। যা বলার আমি তখন বলব।'

'উনি খুব অস্থির হয়ে আছেন স্যার।'

'বুঝতে পারছি।'

'আগামীকাল সকালের দিকে আসতে পারেন না?'

'না।'

'কবে নাগাদ আসবেন? ঠিক দিনটা বললে আমার জন্যে ভালো হয়। আপা জিজ্ঞেস করবেন, কিছু বলতে না পারলে রাগ করবেন।'

'ম্যানেজার হয়ে জন্মেছেন — বসের রাগ তো সহ্য করতেই হবে। ভিখিরি হয়ে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্মালে কারোর ধার ধারতে হত না। বেঁচে থাকছেন যাদের দয়ার উপর তাদের সমীহ করতে হচ্ছে না, ইন্টারেস্টিং না?'

ম্যানেজার জবাব দিল না। দুঃখিত চোখে তাকিয়ে রইল। বেচারার জন্যে আমার মায়া লাগছে — কিন্তু কিছু করার নেই। নীতুর সঙ্গে দেখা করতে যাবার সময় হয় নি। নীতুকে অপেক্ষা করতে হবে।

১১

রূপার চিঠি এসেছে। কী অবহেলায় খামটা মেঝেতে পড়ে আছে! আরেকটু হলে চিঠির উপর পা দিয়ে দাঁড়াতাম। খাম খুলে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললাম — এত বড় কাগজে একটিমাত্র লাইন, তুমি কেমন আছ? নাম সই করে নি, তারিখ দেয় নি। চিঠি কোত্থেকে লেখা তাও জানার উপায় নেই। শুধু একটি বাক্য — তুমি কেমন আছে? প্রশ্নবোধক চিহ্নটি সাদা কাগজে কী কোমল ভঙ্গিতেই না আঁকা হয়েছে! আমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললাম এবং সঙ্গে সঙ্গে মনে হল রূপার আগের চিঠি পুরোটা পড়া হয় নি। কী লেখা ছিল সেই চিঠিতে? কোনোদিনও জানা যাবে না, কারণ চিঠি হারিয়ে ফেলেছি। নীতুকে জিজ্ঞেস করলে হয়তো জানা যাবে। চিঠিটা নীতু পড়েছে। নীতুর কাছে যেতে হবে। যেতে ভরসা পাচ্ছি না, কারণ ইয়াদের খোঁজ পাচ্ছি না। সে তার আগের জায়গায় নেই। তুলসী মেয়েটি ছিল। সে কিছু জানে না কিংবা জানলেও কিছু বলছে না।

নীতুর ম্যানেজারও জানে না। নীতু যাদের ইয়াদের পেছনে লাগিয়ে রেখেছিল তাদের ফাঁকি দিয়ে ইয়াদ সটকে পড়েছে। যে মানুষ ভোল পাল্টে ঢাকার ভিক্ষুকদের সঙ্গে মিশে গেছে তাকে খুঁজে বের করা খুব সহজ হবার কথা না। নীতু এবং তার আত্মীয়স্বজনরা সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। বিত্তবানদের শক্তি তুচ্ছ করার বিষয় নয়। এরা একদিন ইয়াদকে খুঁজে বের করবে। নীতু যখন তার সামনে এসে দাঁড়াবে তখন ইয়াদকে মাথা নিচু করে তার সঙ্গেই যেতে হবে, কারণ নীতুর আছে ভালবাসার প্রচণ্ড শক্তি। এই শক্তি অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা ঈশ্বর মানুষকে দেন নি। এই ক্ষমতা তিনি শুধু তাঁর কাছেই রেখে দিয়েছেন।

ইয়াদ কোনো সমস্যা নয়। সমস্যা হল মোরশেদ। সেও উধাও হয়ে গেছে। মজনু মিয়ার ভাতের হোটেলে সে খেতে আসে না। পুরোনো বাসায় যায় না। তাঁর আত্মীয়স্বজনদের ঠিকানা জানি না। তবে সে তার আত্মীয়স্বজনদের কাছে যাবে, তাও মনে হয় না।

সে একমাত্র এষার কাছেই যেতে পারে। কেন জানি মনে হচ্ছে তার কাছেও যায় নি। বড় শহরে হঠাৎ হঠাৎ কিছু লোকজন হারিয়ে যায় — কেউ তাদের কোনো খোঁজ দিতে পারেন না। মোরশেদও কি হারিয়ে গেছে? অদৃশ্য হয়ে গেছে? প্রকৃতি মানুষকে অনেক ক্ষমতা দিয়েছে। অদৃশ্য হবার ক্ষমতা দেয় নি। তবে মানুষের সেই অক্ষমতা প্রকৃতি পুষিয়ে দেবার ব্যবস্থাও করেছে — কেউ অদৃশ্য হতে চাইলে প্রকৃতি সেই সুযোগ করে দেয়।

একদিন গেলাম এষাদের বাড়ি। এষা দরজা খুলে আনন্দিত গলায় বলল, 'আরে আপনি!'

'কেমন আছেন?'

'ভালো আছি। ঐ যে আপনি গেলেন আর খোঁজ নেই। দাদিমা রোজ একবার জিজ্ঞেস করে লোকটা এসেছে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'উনি কি আছেন?'

'না, নেই। আমার কি ধারণা জানেন, আমার ধারণা আপনি খোঁজখবর নিয়ে আসেন। যখন দাদিমা থাকে না, তখনি উপস্থিত হন। আসুন, ভেতরে আসুন।'

আজ এষাকে অনেক হাসিখুশি লাগছে। মনে হচ্ছে তার বয়সও কমে গেছে। উজ্জ্বল রঙের শাড়ি পরেছে। তবে আজো খালি পা।

'ঐদিন আপনি দাদিমাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলেন। উনার ওষুধপত্র লেগেছিল। আপনি কিনে দিলেন। দাদিমা ঐ টাকা আপনাকে দিতে চাচ্ছেন। সে জন্যেই তিনি আপনাকে এত খোঁজ করছেন। আমি দাদিমাকে বললাম, তুমি শুধু শুধু ব্যস্ত হচ্ছ — টাকা দিলেও উনি নেবেন না।'

'টাকা নেব না এই ধারণা আপনার কেন হল?'

'আপনাকে দেখে, আপনার কথাবার্তা শুনে মনে হয়েছে। আমি মানুষকে দেখে অনেক কিছু বুঝতে পারি।'

'না, বুঝতে পারেন না। টাকা আমি নেব। সব মিলিয়ে একচল্লিশ টাকা খরচ হয়েছে। আজ আমি টাকাটা নিতেই এসেছি।'

'আপনি সত্যি বলছেন?'

'হ্যাঁ।'

'বসুন, টাকা নিয়ে আসছি।'

এষা টাকা নিয়ে এল। আমি উঠে দাঁড়ালাম। এষা বলল, 'আপনি বসুন।' আমি আবার বসলাম। এষা বসল আমার সামনে। সহজ গলায় বলল, 'আপনার সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না। আমি সামনের সপ্তাহে দেশের বাইরে চলে যাচ্ছি। আমেরিকার নিউজার্সিতে আমার মেজো ভাই থাকেন। ইমিগ্রেন্ট। তিনি আমার জন্যে গ্রিন কার্ডের ব্যবস্থা করেছেন। আমি তাঁর কাছে চলে যাব।'

'বাহ্, ভালো তো!'

'ভালো-মন্দ জানি না। ভালো-মন্দ নিয়ে মাথা ঘামাই নি।'

'ভালো হবারই সম্ভাবনা। নতুন দেশে, সম্পূর্ণ নতুন করে জীবন শুরু করতে পারবেন। এখানে থাকলে হঠাৎ হঠাৎ পুরোনো স্মৃতি আপনাকে কষ্ট দেবে। হয়তো হঠাৎ একদিন মোরশেদের সঙ্গে পথে দেখা হল। আপনি কী বলবেন ভেবে পাচ্ছেন না, তিনিও ভেবে পাচ্ছেন না। কিংবা ধরুন খিলগাঁয় আপনাদের বাসার সামনে দিয়ে যাচ্ছেন। হঠাৎ মনে হল, আরে, এই বাড়ির বারান্দায় চেয়ার পেতে জোছনা রাতে দুজন বসে কত গল্প করেছি . . .

এষা আমাকে থামিয়ে দিয়ে তীক্ষ্ণ গলায় বলল, 'এসব আমাকে কেন বলছেন?'

'এমনি বলছি।'

'শুনুন হিমু সাহেব! আপনি খুব সূক্ষ্মভাবে আমার মধ্যে একধরনের অপরাধবোধ সৃষ্টির চেষ্টা করছেন।'

'চেষ্টা করতে হবে কেন? আপনার ভেতর এমনিতেই কিছু অপরাধবোধ আছে। দেশ ছেড়ে চলে যাবার পেছনেও এই অপরাধবোধ কাজ করছে।'

'সেটা নিশ্চয়ই দূষণীয় নয়।'

'দূষণীয়। মানুষকে পুরোপুরি ধ্বংস করার ক্ষমতা রাখে এমন কটি জিনিসের একটি হল অপরাধবোধ। আপনি এই অপরাধবোধ ঝেড়ে ফেলুন।'

'কীভাবে ঝেড়ে ফেলব?'

'দেশ ছেড়ে যাবার আগে মোরশেদ সাহেবের সঙ্গে একটা সহজ সম্পর্ক তৈরি করুন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথা বলুন, গল্প করুন। তার একটি চাকরির ব্যবস্থা করে দেয়া যায় কিনা দেখুন। চাকরি খোঁজার ব্যাপারে আমি আপনাকে সাহায্যও করতে পারি। কিছু ক্ষমতাবান মানুষের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে।'

'হিমু সাহেব! আপনি নিতান্তই আজেবাজে কথা বলছেন। আমি এর কোনোটিই করব না। এগার তারিখ বেলা তিনটায় আমার ফ্লাইট। আমি অসম্ভব ব্যস্ত। তা ছাড়া ইচ্ছাও নেই।'

'টিকিট কাটা হয়েছে?'

'হ্যাঁ, মেজো ভাই টিকিট পাঠিয়েছেন। বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইট।'

আমি উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললাম, 'এষা, আপনি কিন্তু যেতে পারবেন না। আপনাকে থাকতে হবে এই দেশেই।'

'তার মানে!'

'মানে আমি জানি না। আমি মাঝে মাঝে চোখের সামনে ভবিষ্যৎ দেখতে পাই। আমি স্পষ্ট দেখছি আপনি মোরশেদ সাহেবের হাত ধরে বিরাট একটা আমগাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছেন।'

'আপনি কি আমাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছেন?'

'ভয় দেখাচ্ছি না। কি ঘটবে তা আগেভাগে বলে দিচ্ছি।'

'প্লিজ, আপনি এখন যান। আপনার সঙ্গে আমার কথা বলাই ভুল হয়েছে। শুনুন হিমু সাহেব, এগার তারিখ বেলা তিনটায় আমার ফ্লাইট — আপনার কোনো ক্ষমতা নেই আমাকে আটকানোর। প্লিজ এখন যান। আর কখনো এখানে এসে আমাকে বিরক্ত করবেন না।'

আমাকে দুটা টেলিফোন করতে হবে। রিকশা নিয়ে তরঙ্গিনী স্টোরে উপস্থিত হলাম। নতুন ছেলেটা কঠিন চোখে তাকাচ্ছে। আমি বললাম, 'বল পয়েন্ট কিনতে এসেছি। এই নিন দশ টাকা।' ছেলেটার কঠিন চোখে ভয়ের ছায়া পড়ল। সে আমাকে বুঝতে পারছে না। বুঝতে পারছে না বলেই ভয় পাচ্ছে।

'কয়েকদিন আগে এক ম্যানেজার সাহেবকে কলম কিনতে পাঠিয়েছিলাম। এসেছিল?'

ছেলেটা হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। তার চোখে ভয় আরো গাঢ় হচ্ছে।

'সেই কলমেও লেখা হচ্ছে না বলেই আরেকটা কেনার জন্যে আসা।'

'ভাইজান, আপনার পরিচয় কি?'

'আমার কোনো পরিচয় নেই। আমি কেউ না। আমি হলাম নোবডি। টেলিফোন ঠিক আছে?'

'জ্বি আছে।'

'দুটা টেলিফোন করব।'

প্রথম টেলিফোন বাদলকে। বাদল চমকে উঠে চিৎকার করল — 'কে, হিমুদা না?'

'হুঁ।'

'কোত্থেকে টেলিফোন করছ?'

'কোত্থেকে আবার? জেলখানা থেকে।'

'জেলখানা থেকে টেলিফোন করতে দেয়?'

'দেয় না, তবে আমাকে দিয়েছে। জেলার সাহেব ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।'

'তা তো দেবেনই। তুমি চাইলে কে "না" বলবে! তোমার কতদিনের জেল হয়েছে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ছ মাস।'

'সে কী! বাবা যে বলল, এক বছর।'

'এক বছরেরই হয়েছিল। ভালো ব্যবহারের জন্যে মাফ পেয়েছি।'

'তা হলে তোমার সঙ্গে আর মাত্র তিন মাস পর দেখা হবে।'

'হ্যাঁ।'

'আমার দারুণ লাগছে। গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।'

'তুই আমার একটা কাজ করে দে বাদল। এক জন লোককে খুঁজে বের করে দে। তাঁর নাম মোরশেদ।'

'কোথায় খুঁজব?'

'কোথায় যে সে আছে বলা মুশকিল। তবে আমার মনে হয় ১৩২ নম্বর খিলগাঁয় একতলা একটা বাড়ির সামনে সে গভীর রাতে একবার না একবার আসে। ঐ বাড়ির সামনে ফাঁকা জায়গাটায় সে একটা আমগাছ দেখতে পায়। আসলে কোনো গাছ নেই, কিন্তু লোকটা দেখে। গাছটা দেখার জন্যেই সে প্রতিরাতে একবার সেখানে যাবে। আমার তাই ধারণা।'

'বল কী!'

'ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। জেল থেকে বের হয়ে তোকে সব গুছিয়ে বলব। এখন তোর কাজ হচ্ছে ঐ লোকটাকে বের করা। এবং তাঁকে বলা সে যেন অবশ্যি ১১ তারিখ বেলা তিনটার আগেই এয়ারপোর্টে বসে থাকে।'

'কেন হিমুদা?'

'এক জন মহিলা ঐ সময় দেশ ছেড়ে যাবেন। লোকটার সঙ্গে মহিলার দেখা হওয়া উচিত। বলতে পারবি না?'

'অবশ্যই পারব। শুধু যে পারব তা না — আমি নিজেও এয়ারপোর্টে যাব।'

'তোকে যেতে হবে না। তুই শুধু খবরটা দে।'

আমি টেলিফোন নামিয়ে রাখলাম। মোরশেদ সাহেবকে আমি নিজেও খুঁজে বের করতে পারতাম, কিন্তু আমার অন্য কাজ আছে। আমাকে যেতে হবে ইয়াদের সন্ধানে। নীতুর সঙ্গেও দেখা করতে হবে।

১২

ইয়াদের বাড়ি সব সময় আলোয় আলোয় ঝলমল করে। সন্ধ্যার পর থেকেই এরা বোধহয় সব কটা বাতি জ্বালিয়ে রাখে। আজ ওদের বাড়ি অন্ধকার। গেট থেকে গাড়ি বারান্দা পর্যন্ত রাস্তার দু পাশের বাতিগুলো পর্যন্ত নেভানো। শুধু বারান্দায় বাতি জ্বলছে। আমি গেটের দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কেউ নেই নাকি?'

'আপা আছেন।'

'কুকুর দুটা কোথায় — টুটি-ফুটি?'

'ওরা বান্ধা আছে। ভয় নেই, যান।'

ভয় নেই বললেই ভয় বেশি লাগে। আমি ভয়ে ভয়ে এগুচ্ছি। বারান্দায় বেতের চেয়ারে নীতুকে বসে থাকতে দেখলাম। আজ তার গায়ে সাদা রঙের শাড়ি। সাদা শাড়িতে নীল ফুলের সুতার কাজ। গায়ের চাদরটাও সাদা। সাদা রং মেয়েদের এত মানায় আজ প্রথম জানলাম। নীতু আমাকে দেখে উঠে এল। সহজ গলায় বলল, 'আসুন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ভালো আছেন?'

'হ্যাঁ। ভালো। এখানে বসবেন, না ভেতরে যাবেন?'

'বারান্দাই ভালো।'

'হ্যাঁ, বারান্দাই ভালো। আপনি কি লক্ষ করেছেন বেশিরভাগ সময় আমি বারান্দায় বসে থাকি?'

'আমি লক্ষ করেছি।'

'আপনার তাড়া নেই তো? আপনার সঙ্গে অনেক কথা আছে। আমি চা দিতে বলি। টুটি–ফুটিকে খাবার দিয়ে আসি। আমি খাবার না দিলে ওরা কিছু খায় না।'

নীতু উঠে গেল। আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। ভেবেছিলাম নীতুকে খুব আপসেট দেখব। সে রকম মনে হচ্ছে না। আপসেট যদি হয়েও থাকে নিজেকে সামলে নিয়েছে। আমি লক্ষ করেছি ছোটখাটো ব্যাপারে যারা অস্থির হয় বড় ব্যাপারগুলোতে তারা মোটামুটি ঠিক থাকে।

ঘরে তৈরী সমুচা এবং পটভর্তি চা। ট্রে নীতু নিয়ে এসেছে। এই কাজ সে কখনো করে না। খাবার আনার অন্য লোক আছে।

'সমুচাগুলি এইমাত্র ভাজা হয়েছে, খান। ভালো লাগবে। সঙ্গে টক দেব?'

'না। টুটি–ফুটিকে খাবার দেয়া হয়েছে?'

'দেয়া হয়েছে।'

'ওরাও কি সমুচা খাচ্ছে?'

'না, ওরা সেদ্ধ মাংস খাচ্ছে। হলুদ দিয়ে সেদ্ধ করা মাংস। দিনে ওরা একবারই খায়।'

আমি সমুচা খেতে খেতে বললাম 'বিলেতি কুকুর একবার খায়, কিন্তু দেশিগুলো সারাক্ষণ খায় — কিছু পেলেই খেয়ে ফেলে।'

'ট্রেনিং দেয়া হয় না বলে সারাদিন খায়। ট্রেনিং দিলে ওরাও একবেলা খেত। চা ঢেলে দেব?'

'দিন।'

নীতু চা ঢেলে কাপ এগিয়ে দিল। আমি লক্ষ করলাম, 'সাদা শাড়ির সঙ্গে মিলিয়ে নীতু কানে মুক্তার দুল পরেছে।

'মিষ্টি হয়েছে?

'হয়েছে।'

নীতু চেয়ারে সোজা হয়ে বসল। বড় করে নিশ্বাস নিল। মনে হচ্ছে সে এখন কঠিন কিছু কথা বলবে।

'আপনি গিয়েছিলেন ইয়াদের কাছে?'

'জ্বি।'

'তাকে বলেছিলেন পাগলামি বন্ধ করে ঘরে ফিরে আসতে?'

'না।'

'আমিও তাই ভেবেছিলাম। আপনি তাকে দেখে খুব মজা পেয়েছেন। এক জনকে শুধু কথায় ভুলিয়ে ভিখিরিদের সঙ্গে ভিড়িয়ে দেয়া তো সহজ কাজ না। কঠিন কাজ। সবাই পারে না। আপনি পারেন।'

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, 'আমি ওকে কিছু বলি নি, কারণ বলার প্রয়োজন দেখি নি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কেন প্রয়োজন দেখেন নি?'

'ও ফিরে আসবে। ওর প্রতি আপনার ভালবাসা প্রবল, সেই ভালবাসা অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা ওর নেই।'

'বড় বড় কথা বলে আমাকে ভোলাতে চাচ্ছেন?'

'না। যা সত্যি তাই বললাম।'

'যা সত্যি তা আপনি কাউকে বলেন না, কারণ সত্যটা কি তা আপনি নিজেও জানেন না। আপনি বিভ্রম তৈরি করতে পারেন বলেই বিভ্রমের কথা বলেন। আমি খুব বিনীতভাবে আপনাকে একটা চিঠি লিখেছিলাম। আশা করেছিলাম আপনি আসবেন। আসেন নি। ইয়াদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছেন — তাও আমার কারণে যান নি। ইয়াদকে আপনি কানে মন্ত্র দিয়েছেন — তাকে বলেছেন যে দুজন লোক তার পেছনে লাগানো আছে। যে জন্যে সে ভোররাতে সবার চোখে ধুলা দিয়ে পালিয়ে যায়। আমি কি ঠিক বলছি না? চুপ করে থাকবেন না। উত্তর দিন।'

আমি বললাম, 'একটা সিগারেট কি খেতে পারি?'

নীতু নরম গলায় বলল, 'অবশ্যই খেতে পারেন। আপনার বন্ধু গাঁজা খেয়ে মাঠে পড়ে ছিল, আপনি সিগারেট খাবেন না কেন? তবে ভাববেন না আপনাকে আমি সহজে ছেড়ে দেব। আপনাকে আমি কঠিন শাস্তি দেব।'

'কী শাস্তি?'

'আপনি তো ভবিষ্যৎ বলে বেড়ান। কাজেই আপনি নিজেই অনুমান করুন। দেখি আপনার অনুমান ঠিক হয় কিনা।'

'অনুমান করতে পারছি না।'

'চা খাবেন আরেক কাপ? পটে চা আছে।'

'না, আর খাব না। আমি এখন উঠব। আর আপনি দুশ্চিন্তা করবেন না। ইয়াদ চলে আসবে।'

'সান্ত্বনার জন্যে ধন্যবাদ।'

নীতু হাসল। কিন্তু তার চোখ অসুস্থ মানুষের চোখের মতো ঝকঝক করছে। আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। নীতু বলল, 'আপনাকে কি শাস্তি দেব তা না বলেই চলে যাচ্ছেন যে! অনুমান করতে পারছেন না?'

'না।'

'একটু চেষ্টা করুন। চেষ্টা করলেই পারবেন।'

'পারছি না।'

'আচ্ছা যান।'

নীতু উঠে দাঁড়াল। আমি গেটের দিকে এগুচ্ছি — এবং ভয় পাচ্ছি। অকারণ তীব্র ভয়। মনে হচ্ছে শরীর ভারি হয়ে এসেছে। ঠিকমতো পা ফেলতে পারছি না। গেটের প্রায় কাছাকাছি চলে যাবার পর বুঝতে পারলাম নীতু কী শাস্তি দিতে যাচ্ছে। একবার ইচ্ছা করল চেঁচিয়ে বলি — 'না নীতু, না।'

তার সময় পাওয়া গেল না — টুটি-ফুটি উল্কার মতো ছুটে এল। মাটিতে পড়ে যাবার আগে এক ঝলক দেখলাম বারান্দায় আঙুল উঁচিয়ে নীতু দাঁড়িয়ে আছে। ধবধবে সাদা পোশাকে তাকে দেখাচ্ছে দেবী প্রতিমার মতো। নীতু হিসহিস করে বলল, 'Kill him, Kill him.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৩

আমি বাস করছি অন্ধকারে এবং আলোয়। চেতন এবং অবচেতন জগতের মাঝামাঝি। Twilight zone. আমার চারপাশের জগৎ অস্পষ্ট। আমি কি বেঁচে আছি? আমাকে ঘিরে অনেক লোকের ভিড়। এটা কি কোনো হাসপাতাল? আমার কোনো ক্ষুধাবোধ নেই, কিন্তু প্রবল তৃষ্ণা। পানি পানি বলে চিৎকার করতে ইচ্ছা করছে। চিৎকার করতে পারছি না। স্বপ্ন ও সত্য একাকার হয়ে গেছে। বাস্তব এবং কল্পনা পাশাপাশি হাত ধরাধরি করে এগুচ্ছে। আমি এদের আলাদা করতে চেষ্টা করছি, কিন্তু পারছি না।

মোটা গম্ভীর স্বরে এক জন কেউ বলছেন,

'হিমু সাহেব! হিমু সাহেব। আপনি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? জবাব দেবার দরকার নেই — জবাব দেবার চেষ্টা করবেন না। শুধু একটু আঙুল নাড়ানোর চেষ্টা করুন। আমি আপনার ডাক্তার। আপনি যদি আমার কথা শুনতে পান তাহলে পায়ের আঙুল নাড়ানোর চেষ্টা করুন।'

আমি প্রাণপণে পায়ের আঙুল নাড়াতে চেষ্টা করি। পারি কি পারি না বুঝতে পারি না। মোটা গলার ডাক্তার সাহেবের কথাও শুনতে পাই না। আশপাশের সব শব্দ অস্পষ্ট হয়ে আসে — তখন গভীর কোনো নৈঃশব্দ থেকে বাবার গলা শুনতে পাই —

'খোকা! খোকা! আমার কথা শুনতে পাচ্ছিস? শুনতে পেলে আঙুল-ফাঙুল নাড়াতে হবে না। মনে মনে বল শুনতে পাচ্ছি। তা হলেই আমি বুঝব। শুনতে পাচ্ছিস খোকা?'

'পাচ্ছি। তুমি আমাকে খোকা ডাকছ কেন? তুমিই তো নাম দিলে হিমালয়।'

'তোর মা খোকা ডাকত — এই জন্যে ডাকছি। শোন্ খোকা, তোর অবস্থা তো কাহিল — টুটি-ফুটি তোর পেটের নাড়িভুঁড়ি ছিঁড়ে ফেলেছে। আমি অবশ্যি খুব খুশি।'

'তুমি খুশি?'

'খুব খুশি। মহাপুরুষ হবার একটি ট্রেনিং বাকি ছিল — তীব্র শারীরিক যন্ত্রণার ট্রেনিং। সেটি হচ্ছে।'

'আমি কি মারা যাচ্ছি?'

'বলা মুশকিল। ফিফটি-ফিফটি চান্স। এটাও ভালো হল — ফিফটি-ফিফটি চান্সে দীর্ঘদিন থাকার দরকার আছে। এ এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা!'

'বাবা, তুমি কি সত্যি আমার সঙ্গে কথা বলছ, না এসব আমার মনের কল্পনা?'

'এটাও বলা মুশকিল, ফিফটি-ফিফটি চান্স। শতকরা পঞ্চাশ ভাগ সম্ভাবনা, পুরোটি তোর অসুস্থ থাকার কল্পনা। আবার পঞ্চাশ ভাগ সম্ভাবনা আমি কথা বলছি তোর সঙ্গে। বেশিক্ষণ কথা বলতে পারব না, খোকা। ওরা তোকে মর্ফিয়া দিচ্ছে। তুই এখন ঘুমিয়ে পড়বি।'

'আজ কী বার বাবা? কত তারিখ?'

'জানি না। তোরও জানার দরকার নেই। আমি এবং তুই আমরা দুজনই এখন বাস করছি সময়হীন জগতে। এই জগতটা অদ্ভুত খোকা। ভারি অদ্ভুত। এই জগতে সময় বলে কিছু নেই। আলো নেই, অন্ধকার নেই ... কিছুই নেই ...'

'আমার তারিখ জানার খুব দরকার। এগার তারিখ এষা চলে যাবে। মোরশেদ সাহেবের এয়ারপোর্টে যাবার কথা। উনি কি গেছেন? এষা কি তাঁর সঙ্গে ফিরে এসেছে?'

'তুই কি চাস সে ফিরে আসুক?'

'চাই।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তা হলে ফিরে এসেছে। সময়হীন জগতের মজা হচ্ছে, এই জগতের বাসিন্দারা যা চায় — তাই হয়। সমস্যা হচ্ছে এই জগতের কেউ কিছু চায় না।'

'হিমু সাহেব! হিমু সাহেব! আমি আপনার ডাক্তার। আপনি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? শুনতে পেলে পায়ের আঙুল নাড়ান। গুড, ভেরি গুড। দেখি, এবার হাতের আঙুল নাড়ান। কষ্ট হলেও চেষ্টা করুন। আপনি পারবেন। আপনি অবশ্যই পারবেন। ভেঙে পড়লে চলবে না — আপনাকে মনে জোর রাখতে হবে। সাহস রাখতে হবে।'

এক সময় আমার জ্ঞান ফেরে। ডাক্তার চোখের বাঁধন খুলে দেন। আমি অবাক হয়ে চারপাশের অসহ্য সুন্দর পৃথিবীকে দেখি। ফিনাইলের গন্ধভরা হাসপাতালের ঘরটাকে ইন্দ্রপুরীর মতো লাগে। মায়াময় একটি মুখ এগিয়ে আসে আমার দিকে —

'ছোটমামা, আমাকে কি চিনতে পারছেন? আমি মোরশেদ। চিনতে পারছেন?'

'পারছি। এষা কোথায়?'

'ও বারান্দায় আছে। ভেতরে আসতে লজ্জা পাচ্ছে। ওকে কি ডাকব?'

'না, ডাকার দরকার নেই।'

'আপনি কথা বলবেন না, ছোটমামা। আপনার কথা বলা নিষেধ।'

আমি কথা বলি না। চোখ বন্ধ করে ফেলি — আবারো তলিয়ে যাই গভীর ঘুমে। ঘুমের ভেতরই একটা বিশাল আমগাছ দেখতে পাই। সেই গাছের পাতায় ফোঁটা ফোঁটা জোছনা বৃষ্টির মতো ঝরে পড়ছে। হাত ধরাধরি করে দুজন হাঁটছে গাছের নিচে। মানব ও মানবী কারা এরা? কি ওদের পরিচয়? দুজনকেই খুব পরিচিত মনে হয়। কোথায় যেন দেখেছি — আবার মনে হয়, না তো, এদের তো কোনোদিন দেখি নি! অনেক দূর থেকে চাপা হাসির শব্দ ভেসে আসে। আমি চমকে উঠে বলি, 'কে আপনি? কে?'

ভারি গম্ভীর গলায় উত্তর আসে — আমি কেউ না, I am nobody!

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেঘের ছায়া

১

রেহানা গ্লাসভর্তি তেঁতুলের শরবত নিয়ে যাচ্ছিলেন, শুভ্রর ঘরের কাছে এসে থমকে দাঁড়ালেন। চাপা হাসির শব্দ আসছে। শুভ্র হাসছে। রাত একটা বাজে। শুভ্রর ঘরের বাতি নেভানো। সে অন্ধকারে হাসছে কেন? মানুষ কখনো অন্ধকারে হাসে না। কাঁদতে হয় অন্ধকারে, হাসতে হয় আলোয়। রেহানা ডাকলেন, 'শুভ্র!'

শুভ্র হাসি থামিয়ে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল, 'কি মা?'

'কী করছিস?'

'ঘুমোচ্ছিলাম, হঠাৎ ঘুম ভাঙল। রাত কত মা?'

'একটা বাজে। তোর কি কিছু লাগবে ?'

'না।'

শুভ্র আবার হাসছে। শব্দ করে হাসছে।

রেহানা চিন্তিত মুখে শরবতের গ্লাস নিয়ে শোবার ঘরে ঢুকলেন। কেন জানি শুভ্রকে নিয়ে তাঁর চিন্তা লাগছে। তাঁর মনে হচ্ছে শুভ্রর কোনো সমস্যা হয়েছে।

ইয়াজউদ্দিন সাহেব খালি গায়ে ফ্যানের নিচে বসে আছেন। কার্তিক মাস, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগছে। শীত নেমে গেছে। ঘুমাতে হয় গায়ে পাতলা চাদর দিয়ে। এই সময়ে খালি গায়ে ফ্যানের নিচে বসে থাকার অর্থ হয় না। ইয়াজউদ্দিন সাহেব বসে আছেন, কারণ তাঁর গরম লাগছে। অল্প অল্প ঘাম হচ্ছে। বুকে চাপা ব্যথা অনুভব করছেন। তাঁর ধারণা, তিনি হার্ট অ্যাটাক প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে যাচ্ছেন। অন্য যে কেউ এই অবস্থায় ঘাবড়ে যেত। ইয়াজউদ্দিন সাহেব খুব স্বাভাবিক আছেন। স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'গ্লাসে কী?'

'তেঁতুলের শরবত। বিট লবণ, চিনি, তেঁতুল। খাও, ভালো লাগবে।'

ইয়াজউদ্দিন সাহেব কোনো তর্কের ভেতর গেলেন না। গ্লাস হাতে নিলেন। রেহানার নির্বুদ্ধিতায় মাঝে মাঝে তিনি পীড়িত বোধ করেন। আজো করছেন। তাঁর কী সমস্যা রেহানা জানে না; রেহানাকে বলা হয় নি। অথচ সে তেঁতুলের সরবত নিয়ে এসেছে, এবং রেহানার ধারণা হয়েছে এই শরবত খেলে ইয়াজউদ্দিন সাহেবের ভালো লাগবে। কে তাঁকে এই সব চিকিৎসা শিখিয়েছে? বছর দুই আগে তাঁর একবার তীব্র পেটব্যথা শুরু হল।

রেহনা এক গ্লাস বরফশীতল পানি নিয়ে এসে উপস্থিত, পানির গ্লাস এগিয়ে দিয়ে বলল, 'পানিটা খাও, ভালো লাগবে।' তিনি খেয়েছেন। আজো তাই করলেন, হাত বাড়িয়ে তেঁতুলের শরবত নিয়ে দু চুমুক খেয়ে গ্লাস নামিয়ে রাখলেন। রেহানা বললেন, 'ভালো লাগছে না?'

'হ্যাঁ, ভালো লাগছে।'

'চিনি কম হয়েছে, আরেকটু চিনি দেব?'

'চিনি ঠিকই আছে।'

'শরীরটা কি এখন ভালো লাগছে?'

'হ্যাঁ, ভালো লাগছে। ফ্যান একটু বাড়িয়ে দাও।'

ইয়াজউদ্দিন সাহেবের শরীর মোটেই ভালো লাগছে না। নিশ্বাস নিতে একটু কষ্ট হচ্ছে। বসে থেকে স্বস্তি পাচ্ছেন না। শুয়ে পড়লে হয়তো ভালো লাগত। তিনি ঘড়ি দেখলেন, একটা দশ বাজে। ঘরে আলো জ্বলছে। আলো চোখে লাগছে। মানুষের অসুস্থতার প্রথম লক্ষণ হচ্ছে — আলো অসহ্য বোধ হওয়া। অসুস্থতা মানুষকে আলো থেকে অন্ধকারে নিয়ে যেতে চায়।

রেহানা বললেন, 'তুমি কি বারান্দায় এসে বসবে? বারান্দায় হাওয়া আছে। হাওয়ায় বসলে তোমার ভালো লাগবে।'

'চল বারান্দায় যাই।'

'শরবতটা খাবে না?'

'না।'

ইয়াজউদ্দিন স্ত্রীর সাহায্য ছাড়াই উঠে দাঁড়ালেন। বারান্দায় গিয়ে বসলেন। পুরোনো ধরনের এই বাড়ির পেছনে লম্বা টানা ঝুল বারান্দা। বারান্দার এক মাথায় তিনটি বেতের চেয়ার ছাড়া কোনো আসবাব নেই। চেয়ার তিনটি দেয়াল ঘেঁষে পাশাপাশি সাজানো। সাদা রং করা, গদি সবুজ। মাঝখানের চেয়ারটা তাঁর। দীর্ঘ দশ বছরে তিনি কখনো মাঝের চেয়ার ছাড়া কোথাও বসেন নি। আজ বসলেন। তিনি সর্ব দক্ষিণের চেয়ারে বসেছেন। মাঝেরটা খালি। তিনি ভেবেছিলেন, রেহানা এই ব্যাপারটা ধরতে পারবে। সে মনে হচ্ছে ধরতে পারে নি। রেহানা তাঁর পাশের চেয়ারেও বসে নি। মাঝখানে একটা খালি চেয়ার রেখে তৃতীয় চেয়ারটিতে বসেছে।

'রেহানা।'

'হুঁ।'

'শুভ্রর ঘরে বাতি জ্বলছে কেন? ও কি জেগে আছে?'

'হ্যাঁ, জেগে আছে।'

'এত রাত পর্যন্ত তো জেগে থাকার কথা না। আমার মনে হয় সে বাতি জ্বালিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। তুমি একটু দেখে এস তো।'

রেহানা উঠে চলে গেলেন। খালি গায়ে বারান্দায় বসে থাকায় তাঁর একটু শীত শীত লাগছে। বুকের চাপা ব্যথা একটু কমেছে বলে মনে হচ্ছে। পানিতে গুলে একটা অ্যাসপিরিনের চার ভাগের এক ভাগ এবং ঘুমের জন্যে দুটা পাঁচ মিলিগ্রামের ফ্রিজিয়াম খেয়ে শুয়ে পড়লে হয়। যে কোনো শারীরিক অসুস্থতায় গাঢ় ঘুম সাহায্য করে। শরীর তার নিজস্ব পদ্ধতিতে তার বিকল অংশ ঘুমের মধ্যে ঠিক করে ফেলে, কিংবা ঠিক করে ফেলার চেষ্টা করে। তিনি রেহানার জন্য অপেক্ষা করছেন। রেহানা ফিরছেন না। ইয়াজউদ্দিন সাহেব নিশ্চিত হলেন — শুভ্র জেগে আছে, সে মার সঙ্গে গল্প করছে। তারা দুজন কী কথা বলছে ইয়াজউদ্দিন সাহেবের শোনার ইচ্ছা করল। সেই ইচ্ছা স্থায়ী হল না। তাঁর বয়স

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চুয়ান্ন। এই পৃথিবীতে তিনি যে দীর্ঘ জীবন কাটিয়েছেন, তা বোধহয় বলা চলে। এই দীর্ঘ জীবনে তিনি অন্যায় এবং অনুচিত ইচ্ছাকে প্রশ্রয় দেন নি। মা এবং ছেলের গল্প আড়াল থেকে শোনার ইচ্ছা অবশ্যই অন্যায় ইচ্ছা।

শুভ্র খাটে হেলান দিয়ে বসে আছে। তার কোলে সাদা রঙের বালিশ। শুভ্রর গায়ের ফুলহাতা শার্টটাও ধবধবে সাদা। শুভ্র কনুইয়ে ভর দিয়ে মার দিকে ঝুঁকে আছে। তার মাথাভর্তি এলোমেলো চুল। চোখে চশমা নেই বলে শুভ্রর বড় বড় কালো চোখ দেখা যাচ্ছে। রেহানা মনে মনে নিশ্বাস ফেলে বললেন, আমার এই ছেলেটা এত সুন্দর হল কেন? ছেলেদের এত সুন্দর হতে নেই। শারীরিক সৌন্দর্য ছেলেদের মানায় না।

শুভ্র বলল, 'তাকিয়ে আছ কেন মা?'

রেহানা বললেন, 'মানুষ তো একে অন্যের দিকে তাকিয়েই থাকবে, বোকা। কখনো কি দেখেছিস দুজন চোখ বন্ধ করে মুখোমুখি বসে আছে?'

শুভ্র হাসল। রেহানা চোখ ফিরিয়ে নিলেন। শুভ্র যখন হাসে, তিনি চোখ ফিরিয়ে নেন। মা-বাবার নজর খুব বেশি লাগে। তাঁর ধারণা, শুভ্রকে হাসতে দেখলেই তিনি এত মুগ্ধ হবেন যে নজর লেগে যাবে।

'শুয়ে পড়, শুভ্র।'

'ঘুম আসছে না মা । ঘুমের চেষ্টা করলে ঘুম আরো আসবে না। কাজেই আমি ঘণ্টাখানিক জেগে থাকব। একটা কঠিন বই পড়ে ক্লান্ত হয়ে ঘুমাতে যাব।'

'এত রাতে বই পড়বি ? চোখের উপর চাপ পড়বে তো।'

'পড়ুক চাপ। যে ভাবে চোখ খারাপ হচ্ছে, আমার মনে হয়, এক সময় অন্ধ হয়ে যাব। অন্ধ হয়ে যাবার আগেই যা পড়ার পড়ে নিতে চাই মা।'

রেহানার বুক ধক ধক করে উঠল। শুভ্রকে কঠিন ধমক দিতে গিয়েও দিলেন না। ধমক দিলে বা কঠিন কিছু বললে শুভ্র বিষণ্ন চোখে তাকিয়ে থাকে। দেখতে খুব খারাপ লাগে।

'মা!'

'কি।'

'তুমি কি আমাকে হালকা করে এক কাপ চা খাওয়াতে পারবে ।'

'এত রাতে চা খেলে তো বাকি রাত আর ঘুমাতে পারবি না।'

'ঘুমাতে না পারলেই ভালো। বইটা শেষ করে ফেলতে পারব।'

'চায়ের সঙ্গে কিছু খাবি?'

'হ্যাঁ। এক স্লাইস রুটি গরম করে দিও। রুটির ওপর খুব হালকা করে মাখন দিতে পার। চিনি দিও না। গোলমরিচের গুঁড়া ছড়িয়ে দিও।'

ইয়াজউদ্দিন বারান্দায় বসে আছেন। অ্যাসপিরিন খান নি। তবে দুটা ফ্রিজিয়াম খেয়েছেন। নিজেই শোবার ঘরে ঢুকে ট্যাবলেট বের করেছেন। হাতের কাছে পানি ছিল না। তেঁতুলের শরবত দিয়ে ট্যাবলেট গিলতে হয়েছে। ঘুমের ওষুধ খাবার আধঘণ্টা পর বিছানায় যেতে হয়। তিনি আধঘণ্টা পার করার জন্যে অপেক্ষা করছেন। তার ঘুম এসে গেছে। চোখের পাতা ভারি হয়ে এসেছে। কয়েকবার হাই উঠেছে।

তিনি দেখলেন রেহানা ট্রেতে করে চা নিয়ে শুভ্রর ঘরে ঢুকছে। ইয়াজউদ্দিন সাহেবের ভ্রূ কুঞ্চিত হল। দুপুর রাতে সে ছেলেকে চা বানিয়ে খাওয়াচ্ছে কেন? অন্ধ ভালবাসার ফল কখনো মঙ্গলময় হয় না। এই ব্যাপারটা রেহানা কি জানে না? তিনি নানানভাবে নানান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভঙ্গিতে রেহানাকে এটা বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। রেহানা কিছুই বোঝে নি। তাঁর নিজের শরীর ভালো যাচ্ছে না। যে কোনো সময় ভয়ঙ্কর কিছু ঘটে যেতে পারে। তখন হাল ধরতে হবে শুভ্রকে। শুভ্রর সেই মানসিক প্রস্তুতি নেই। সে এখনো শিশু। রেহানা কি সেই শিশুকেই নানানভাবে বাঁচিয়ে রাখতে চাইছে না?

রেহানা এসে স্বামীর সামনে দাঁড়ালেন, কৈফিয়ত দেবার ভঙ্গিতে বললেন, 'শুভ্র চা খেতে চাচ্ছিল, কি একটা বই নাকি পড়ে শেষ করবে।'

ইয়াজউদ্দিন ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'চল, ঘুমাতে যাই।'

'তোমার শরীর কি এখন ভালো লাগছে?'

'হুঁ।'

'কাল সকালে এক জন ডাক্তার দেখিও।'

'দেখাব।'

তাঁরা শোবার ঘরে ঢুকলেন। রেহানা বলল, 'ফ্যান থাকবে, না বন্ধ করে দেব?' জানালা দিয়ে হাওয়া আসছে। ফ্যান বন্ধ করে দি?'

'দাও।'

তাঁরা ঘুমাতে গেলেন। ইয়াজউদ্দিন পায়ের উপর পাতলা চাদর টেনে দিলেন। তিনি নিজে এখন খানিকটা বিষণ্ন বোধ করছেন। তাঁর শরীর খারাপ করেছিল। বেশ ভালোই খারাপ করেছিল। কে জানে হয়তো ছোটখাটো একটা স্ট্রোক হয়েছে। তিনি নিজে সে ধাক্কা সামাল দেবার চেষ্টা করেছেন। রেহানাকে বুঝতে দেন নি। তিনি কাউকে বিচলিত করতে চান না। তবু খানিকটা বিচলিত রেহানা হতে পারত। সে তার ছেলেকে বলতে পারত — তোর বাবার শরীরটা ভালো না। বারান্দায় বসে আছে। তুই যা, বাবার সঙ্গে কথা বলে আয়। রেহানা কিছুই বলে নি। বললে শুভ্র বারান্দায় এসে বসত। উদ্বেগ নিয়ে প্রশ্ন করত, 'বাবা, তোমার কী হয়েছে?'

ছেলের সঙ্গে কথা বলতে পারলে তাঁর ভালো লাগত। রেহানা তাঁকে সে সুযোগ দেয় নি। ইয়াজউদ্দিন সাহেবের ধারণা, রেহানা তাঁকে ভালোমতো লক্ষ করে না। তাঁর আচার-আচরণ নিয়ে ভাবেও না। যদি ভাবত তাহলে লক্ষ করত — দ্বিতীয়বার বারান্দায় এসে তিনি মাঝখানের চেয়ারে বসেছেন। কেন বসেছেন? দুপাশে দুটি চেয়ার খালি রেখে তিনি কেন বসলেন? উত্তর কি খুব সহজ নয়? তিনি চাচ্ছেন তাঁর স্ত্রী এবং পুত্র তার দুপাশে বসুক।

'রেহানা।'

'হুঁ।'

শুভ্রর বয়স কত হল?'

'সাতাশ বছর তিন মাস।'

ইয়াজউদ্দিন নিঃশব্দে হাসলেন। ছেলের বয়স বছর এবং মাস হিসেবে রেহানা জানে। সে কি তার স্বামীর বয়স জানে? তাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় — আমার বয়স কত রেহানা? সে কি বলতে পারবে?

রেহনা বললেন, 'ওর এখন একটা বিয়ে দিয়ে দিলে কেমন হয়?'

'ও কি বিয়ের কথা কিছু বলছে?'

'না, বলছে না। ওকে বলতে হবে কেন? বিয়ের বয়স তো হয়েছে। সাতাশ বছর তো কম না ......'

'অনেকের জন্যে খুবই কম। সাতাশ বছরেও অনেকে সাত বছর বয়েসী শিশুর মতো থাকে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'শুভ্রকে নিশ্চয়ই তুমি শিশু ভাব না?'

ইয়াজউদ্দিন জবাব দিলেন না। বুকের চাপা ব্যথাটা আবার ফিরে এসেছে। একইসঙ্গে চোখ জড়িয়ে আসছে ঘুমে। ফ্যান বন্ধ করে দেয়া ঠিক হয় নি। গরম লাগছে। ভাপসা ধরনের গরম।

রেহানা উৎসুক গলায় বললেন, 'ঘুমিয়ে পড়েছ?'

'না।'

'তোমার কি জাভেদ সাহেবের কথা মনে আছে? পুলিশের এআইজি ছিলেন — বিয়ে করেছেন বরিশালে। মনে আছে?'

'আছে।'

'উনার এক ভাগ্নি আছে। ডাক নাম শাপলা — মেয়েটা খুব সুন্দর। টিভিতে গান গায়। বি গ্রেডের শিল্পী। নাটকও করে। ও লেভেল পাস করে ইউনিভার্সিটিতে ঢুকেছে। পলিটিক্যাল সায়েন্সে পড়ে। থার্ড ইয়ার। গায়ের রং শুভ্রর মতো না হলেও ফর্সা। তুমি কি মেয়েটাকে দেখবে?'

আমি দেখব কেন?'

'তোমার পছন্দ হলে শুভ্রর জন্যে আমি মেয়ের মামা জাভেদ সাহেবের কাছে প্রস্তাব দিতাম।'

'বিয়ে করবে শুভ্র। আমার পছন্দের ব্যাপার আসছে কেন?'

'শুভ্রর কোনো পছন্দ-অপছন্দ নেই, মতামত নেই। ওকে বিয়ের কথা বললেই হাসে...।'

ইয়াজউদ্দিন জড়ানো গলায় বললেন, 'এখন ঘুমাও। ভোরবেলা কথা বলব।' ইয়াজউদ্দিন পাশ ফিরে শুলেন। কোনোভাবে শুয়েই তিনি আরাম পাচ্ছেন না। বারান্দায় চটির আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। শুভ্র হাঁটছে। বারান্দার এ মাথা থেকে ও মাথায় যাচ্ছে।

'রেহানা।'

'হুঁ।'

'শুভ্র কি বারান্দায় হাঁটাহাঁটি করছে?'

'কই, না তো!'

'মনে হচ্ছে চটির শব্দ শুনলাম।'

'ভুল শুনেছ। শুভ্র চটি পরে না।'

'ও আচ্ছা।'

ইয়াজউদ্দিন চিৎ হয়ে শুলেন। তাঁর মস্তিষ্ক নিশ্চয়ই উত্তেজিত। উত্তেজিত মস্তিষ্কে চটির শব্দ শুনেছেন। তাঁর শরীর তাহলে ভালোই খারাপ হয়েছে। এমন কি হতে পারে যে তিনি ঘুমের মধ্যে মারা যাবেন! ঘুমিয়ে মৃত্যুর ব্যাপারটা প্রায় কখনো হয় না বললেই হয় — প্রকৃতি মানুষকে জাগ্রত অবস্থায় পৃথিবীতে নিয়ে আসে, নিয়েও যায় জাগ্রত অবস্থায়। তাঁর বেলায় নিশ্চয়ই ব্যতিক্রম ঘটবে না। তবু ভয় লাগছে।

'রেহানা!'

'কি।'

'পানি খাব।'

রেহানা উঠলেন। পানির জন্যে একতলায় যেতে হল। দোতলায় ছোট একটা ফ্রিজ আছে। সেখানে পানির বোতল রাখা হয় নি। ইয়াজউদ্দিন বরফশীতল পানি ছাড়া খেতে পারেন না। রেহানা পানির বোতল এবং গ্লাস নিয়ে দোতলায় উঠে এসে দেখেন, ইয়াজউদ্দিন খাটে পা ঝুলিয়ে বসে আছেন। তার মাথার উপর ফ্যান ঘুরছে। শোবার সময়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাতলা পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে শুয়েছিলেন। পাঞ্জাবি খুলে ফেলেছেন। তাঁর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

তিনি এক চুমুকে পানির গ্লাস খালি করলেন। ঘড়ি দেখলেন, তিনটা বাজতে চলল, রাত শেষ হবার খুব বেশি দেরি নেই।

'শুভ্র কি জেগে আছে?'

'মনে হয়। ঘরে বাতি জ্বলছে।'

'ওকে একটু ডাক তো।'

'এখানে আসতে বলব?'

'না। বারান্দায় এসে বসতে বল।'

'তুমি ঘুমাবে না?'

'আজ আর ঘুমাব না। ঘুম আসছে না।'

'চা খাবে? চা করে দেব?'

'দাও।'

রেহানা চা আনতে গেলেন। ইয়াজউদ্দিন বারান্দায় এসে বসলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শুভ্রও এসে বাবার পাশে বসল। শুভ্রর হাতে একটা বই। অন্ধকারে বইয়ের নাম পড়া যাচ্ছে না। বেশ মোটা বই।

শুভ্র বলল, 'জেগে আছ কেন, বাবা? এই সময় তো তোমার জেগে থাকার কথা না। সমস্যাটা কি?'

'শরীর ভালো লাগছে না। ঘুমাতে চেষ্টা করছি, ঘুম আসছে না।'

'তোমাকে খুব চিন্তিত লাগছে। তুমি কি কোনো কিছু নিয়ে চিন্তিত?'

'না।'

'আজ পত্রিকায় দেখলাম, তোমার কটন মিলে গণ্ডগোল হয়েছে। মিলের ম্যানেজারের পায়ের রগ কেটে দিয়েছে। তুমি কি এ ব্যাপার নিয়ে চিন্তিত?'

'আমি যখন ঘরে আসি তখন আমার বাইরের কর্মজগৎ ঘরে নিয়ে আসি না। মিলের ব্যাপারটা নিয়ে আমি চিন্তিত ঠিকই, কিন্তু আজকের শরীর খারাপের সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই। তুমি জেগে আছ কেন বল।'

'আমি তো প্রায়ই রাত জাগি।'

'এমনভাবে কথাগুলো বললে যেন রাত জাগা খুব মজার ব্যাপার।'

শুভ্র হালকা গলায় বলল, 'আমার কাছে ভালোই লাগে।'

'রাত জেগে তুমি কী কর?'

'কিছুই করি না। মাঝেমধ্যে পড়াশোনা করি। তবে বেশিরভাগ সময় চুপচাপ বসে থাকি। ভাবি।'

'কী ভাব?'

শুভ্র জবাব দিল না। হাসল। ইয়াজউদ্দিন সাহেব আগ্রহ নিয়ে ছেলের হাসি দেখলেন। শুভ্রর হাসি সুন্দর। দেখতে ভালো লাগে। সব শিশুর হাসি সুন্দর। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে হাসির সৌন্দর্য নষ্ট হতে থাকে। শুভ্রর হয় নি।

রেহানা চা নিয়ে এসেছে। চা আনতে তাঁর দেরি হবার কারণ বোঝা যাচ্ছে — শুধু চা আসে নি। আয়োজন দেখে মনে হচ্ছে সকালের ব্রেকফাস্ট চলে এসেছে। শুভ্র উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, 'আমি একটু আগে চা খেয়েছি। আমি কিছু খাব না। তোমরা খাও।'

ইয়াজউদ্দিন বললেন, 'তুমি বস শুভ্র। তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।'

শুভ্র বসল। রেহানা বললেন, 'আমি কি বসব, না চলে যাব?'

'বস, তুমিও বস।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইয়াজউদ্দিন চায়ের কাপ হাতে নিতে নিতে বললেন, 'কী বই পড়ছ?'

শুভ্র বলল– 'The End of Civilization.'

'ইন্টারেস্টিং বই?'

'না বাবা। কঠিন বই। নানান থিওরি। পড়তে ভালো লাগে না।'

'পড়তে ভালো লাগে না — তাহলে পড়ছ কেন?'

'যা আমার ভালো লাগে না তাও করে দেখতে ইচ্ছে করে।'

ইয়াজউদ্দিন সাহেব কথা খুঁজে পাচ্ছেন না। আবহাওয়াটা চট করে অন্য রকম হয়ে গেছে। এখন মনে হচ্ছে তিনি কোনো একটা মিটিঙে বসেছেন। কোম্পানির জরুরি বিষয় নিয়ে আলাপ করছেন শুভ্রর সঙ্গে। রেহানা তাঁর পিএ, সে নোট নিচ্ছে। এক্ষুনি পিপ করে ইন্টারকম বেজে উঠবে। রেহানা বলবে, 'স্যার, আপনার জরুরি কল। আপনি কথা বলবেন? লাইন দেব?'

বাস্তবে তা হল না। রেহানা খুশি খুশি গলায় বললেন, 'তুমি শুভ্রকে জিজ্ঞেস কর তো ও বিয়ে করতে চায় কিনা। 'শুভ্র হাসিমুখে মার দিকে তাকিয়ে আছে। যেন মার ছেলেমানুষিতে মজা পাচ্ছে।

ইয়াজউদ্দিন সাহেব বললেন, 'তোমার মা তোমার বিয়ে নিয়ে খুব একসাইটেড বোধ করছে। তুমি কি বিয়ে করতে চাও?'

শুভ্র বাবার চোখের উপর থেকে চোখ সরিয়ে মার দিকে তাকাল। বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে পরিষ্কার গলায় বলল, 'হ্যাঁ চাই।'

ইয়াজউদ্দিন সাহেব নড়েচড়ে বসলেন। তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, 'কোনো ছেলেকে যখন জিজ্ঞেস করা হয় সে বিয়ে করতে চায় কিনা তখন সে কিন্তু কখনো সরাসরি বলে না — চাই। তুমি এত সরাসরি বললে কেন শুভ্র?'

শুভ্র হাসতে হাসতে বলল, 'আমি মাকে খুশি করবার জন্যে বললাম। মা মনেপ্রাণে এটিই আমার মুখ থেকে শুনতে চাচ্ছিল।'

'তুমি কি বলতে চাচ্ছ তোমার মা চান বলেই তুমি হ্যাঁ বললে? তোমার নিজের ইচ্ছা নেই?'

'আমার নিজের ইচ্ছাও নেই, অনিচ্ছাও নেই।'

'তোমার বন্ধুদের মধ্যে কেউ কি বিয়ে করেছে?'

'এখনো করে নি তবে জাহেদ সম্ভবত করবে।'

'জাহেদ কে?'

'আমার বন্ধু। আমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু।'

'আমি দেখেছি তাকে?'

'না। আমার বন্ধুরা কখনো আমার কাছে আসে না। আমি তাদের কাছে যাই।'

'ও কী করে?'

'এখনো কিছু করে না। প্রাইভেট টিউশ্যানি করে।'

'তোমার কি মনে হয় না জাহেদ খুব দায়িত্বজ্ঞানহীনের মতো কাজ করছে?'

'ওর উপায় নেই, বাবা।'

ইয়াজউদ্দিন সাহেব একবার ভাবলেন জিজ্ঞেস করেন, উপায় নেই কেন? শেষে নিজেকে সামলে নিলেন। বাড়তি কৌতূহল দেখানোর প্রয়োজন তিনি বোধ করছেন না। কিন্তু তিনি প্রয়োজন বোধ না করলেও শুভ্র করছে। সে খুব আগ্রহ নিয়ে বলল, 'জাহেদ আসলে দারুণ সমস্যায় পড়েছে। ও যাকে বিয়ে করবে তার নাম কেয়া। বড় বোনের বাসায় থাকে। বড় বোন এবং দুলাভাই দুজনই বেচারিকে নানাভাবে যন্ত্রণা দিচ্ছে। দুবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রায় বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিল। একবার কেয়া রাত আটটার সময় বাড়ি ফিরেছে। তারা দরজা খোলে না। দরজা বন্ধ। বেচারি রাত এগারটা পর্যন্ত বাইরে দাঁড়িয়ে কাঁদল।'

ইয়াজউদ্দিন সাহেব বললেন, 'কেয়ার সঙ্গেও কি তোমার পরিচয় আছে?'

'হ্যাঁ, পরিচয় আছে। খুব ভালো মেয়ে। গম্ভীর হয়ে থাকে, কিন্তু মাঝে মাঝে এমন হাসির কথা বলে!'

'প্রাইভেট টিউশ্যানি সম্বল করে একটা ছেলে বিয়ে করে ফেলতে চাচ্ছে — তোমার কাছে কি হাস্যকর মনে হচ্ছে না?'

'জাহেদের কোনো উপায় নেই, বাবা। ওকে প্রাইভেট টিউশ্যানি করে খেতে হবে।'

'প্রাইভেট টিউশ্যানি করে খেতে হবে কেন?'

'ও বিএ পরীক্ষায় থার্ড ডিভশন পেয়েছে — ওর পরিচিত বড় আত্মীয়স্বজনও নেই। ওর ধারণা, ও কখনো কোনো চাকরি পাবে না।'

ইয়াজউদ্দিন সাহেব গোপনে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন, তাঁর ছেলে কাদের সঙ্গে মিশছে? এরাই কি তার বন্ধুবান্ধব? রেহানা একটু ঝুঁকে এসে আগ্রহ নিয়ে বললেন, 'শুভ্র, তুই কি জাভেদ সাহেবের ভাগ্নির সঙ্গে কথা বলে দেখবি? মেয়েটার নাম শাপলা। টিভিতে নাটক করে। খুব সুন্দর।'

শুভ্র হাসতে হাসতে বলল, 'তোমার মাথায় শুধু একটা জিনিসই ঘুরছে। শোন মা, তুমি যদি চাও নিশ্চয়ই আলাপ করে দেখব।'

'ওকে সঙ্গে করে কোনো একটা রেস্টুরেন্টে খেয়ে এলি। গল্প-টল্প করলি। ওর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বললেই ওকে তোর পছন্দ হবে। কথা বলবি?'

'কেন বলব না মা?'

ইয়াজউদ্দিন সাহেবের রেহানার কথাবার্তা পছন্দ হচ্ছে না। তিনি কিছু সিরিয়াস কতাবার্তা বলতে চাচ্ছিলেন। রেহানার উপস্থিতিতে তা সম্ভব হবে না। তিনি বললেন, 'ঘুম পাচ্ছে, চল ঘুমাতে যাওয়া যাক।' তিনি উঠে দাঁড়ালেন। রেহানা উঠলেন না। ছেলের পাশে বসে রইলেন। আগ্রহ ও উত্তেজনায় তাঁর চোখ চকচক করছে।

২

শুভ্রদের বাড়ির নাম 'কান্তা ভিলা।'

গেটের কাছে পেতলের নামফলক। রোজ একবার ব্রাসো ঘষে এই নাম ঝকঝকে করা হয়। গুলশান এলাকার আধুনিক বাড়িঘরগুলোর সঙ্গে এর মিল নেই—পুরোনো ধরনের বাড়ি। জেলখানা জেলখানা ভাব আছে। উঁচু দেয়াল। দেয়ালের উপরে কাঁটাতারের বেড়া। বাড়ির গেটটাও নিরেট লোহার। বাইরে থেকে গেটের ভেতর দিয়ে কিছু দেখার উপায় নেই। গেটের কাছে কলিংবেল আছে। অনেকক্ষণ বেল বাজালে তবেই দারোয়ান দরজা খুলে বিরক্ত মুখে জিজ্ঞেস করে, 'কে?' কারণ এ বাড়িতে যারা আসে তারা গেটের কলিংবেল বাজায় না। গাড়ির হর্ন বাজায়। এ বাড়িতে যেসব গাড়ি আসে তার প্রতিটির হর্ন দারোয়ান চেনে। হর্ন শুনে বুঝতে পারে কে এসেছে। গাড়ির হর্ন শুনলে সে ছুটে গিয়ে দরজা খোলে। গেটের কলিংবেল বাজায় খবরের কাগজের হকার, ধোপা, ইলেকট্রিক মিস্ত্রি, মাঝে মাঝে অসীমসাহসী কিছু ভিখিরি। এদের বেল শুনে ছুটে গিয়ে গেট খোলার কোনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রয়োজন নেই। ধীরেসুস্থে গেলেই হয়।

অনেকক্ষণ ধরেই বেল বাজছে। দারোয়ান গোমেজ গেট খুলছে না। সে মোড়ায় বসে খবরের কাগজ পড়ছে। বেল বাজছে, বাজুক। ভিখিরি হলে বেল বাজিয়ে ক্লান্ত হয়ে চলে যাবে। ভিখিরি না হলে ক্লান্ত হবে না। বাজাতেই থাকবে। এক সময় গেট খুললেই হল। তাড়া কিছু নেই।

গোমেজ হাত থেকে খবরের কাগজ নামিয়ে রাখল। বিরক্ত মুখে উঠে গিয়ে দরজা খুলল। গেটের বাইরে জাহেদ দাঁড়িয়ে আছে। গোমেজ জাহেদকে চেনে— শুভ্রর বন্ধু। এর আগেও কয়েকবার এসেছে, তবে কখনো গেটের ভেতরে ঢোকে নি। জাহেদ বলল, 'শুভ্র আছে?'

গোমেজ হাই তুলতে তুলতে বলল, 'না।'

এটা পরিষ্কার মিথ্যা কথা। শুভ্র ঘরেই আছে। গোমেজ কেন 'না' বলল সে নিজেও জানে না। তাকে কেউ মিথ্যা বলতে বলে নি। জাহেদ বলল, 'ওর সঙ্গে খুব দরকার ছিল, ও কোথায় গেছে জানেন?'

'না।'

'কখন বাসায় ফিরবে সেটা বলতে পারবেন?'

'উঁহু।'

জাহেদের মন খারাপ হয়ে গেল। আজ বাসের স্ট্রাইক। সে কলাবাগান থেকে গুলশান পর্যন্ত এসেছে অনেক যন্ত্রণা সহ্য করে। কিছু হেঁটে, কিছু শেয়ারের রিকশায়, কিছুটা টেম্পোতে। সুযোগ বুঝে টেম্পোর ভাড়া করে দিয়েছে দুগুণ। তার পকেটে এখন সাতটা টাকা আছে। এই সাত টাকায় কলাবাগান ফিরে যাওয়াই সমস্যা। তা ছাড়া প্রচণ্ড চায়ের পিপাসা পেয়েছে। এক কাপ চা এবং একটা বিসকিট না খেলেই নয়। পেটের আলসার খুব খারাপ পর্যায়ে আছে। ডাক্তার খালি পেটে চা নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। চা-বিসকিট খেতে গেলে তিন টাকা চলে যাবে। থাকবে মাত্র চার টাকা।

জাহেদ দারোয়ানকে বলল, 'ঘণ্টা দু-এক পর এসে খোঁজ নেই, কি বলেন?'

'নিতে পারেন।'

দারোয়ান গেট বন্ধ করে ভেতর থেকে তালাবন্ধ করে দিল। এ বাড়ির গেট সব সময় ভেতর থেকে তালাবন্ধ থাকে।

জাহেদ এক কাপ চা, দুটা টোস্ট বিসকিট খেল। লোভে পড়ে একটা কলাও খেয়ে ফেলল। আজ সকালে নাশতা খেতে পারে নি। দারুণ খিদে লেগেছে। অপরিচিত চায়ের দোকানে বসে সময় কাটানোও সমস্যা। কিছুক্ষণ বসে থাকলেই দোকানের মালিক সন্দেহজনক চোখে তাকাতে শুরু করে। সময় খারাপ, সবকিছুই দেখতে হয় সন্দেহের চোখে। তারচেয়েও বড় সমস্যা জাহেদের কাছে ঘড়ি নেই— দুঘণ্টার কতক্ষণ কাটল বোঝা যাচ্ছে না। কিছুক্ষণ পর পর একে ওকে 'কটা বাজে' জিজ্ঞেস করতে হচ্ছে। একটা সময় ছিল কটা বাজে জিজ্ঞেস করলে লোকজন খুশি হত। আগ্রহ করে সময় বলত। এখন রেগে যায়। এমনভাবে তাকায় যেন সময় জানতে চাওয়ার পেছনেও কোনো মতলব আছে।

জাহেদ দেড় ঘণ্টার মাথায় আবার বেল টিপল। দারোয়ান নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল, 'আসেন নাই। কিছু বলার থাকলে আমারে বলেন — খবর দিয়া দিব।'

জাহেদ বলল, 'ভায়া মিডিয়া বললে হবে না। সরাসরি বলতে হবে। বরং একটা চিঠি লিখে যাই।'

'লেখেন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কাগজ-কলম দিতে পারবেন?'

'না।'

জাহেদকে আবার সেই চায়ের দোকানে ফিরে যেতে হল। দোকানের মালিকের কাছ থেকে কাগজ-কলম নিয়ে সে লিখল —

'শুভ্র, আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। বুধবারে। তুই কি বরযাত্রী যাবার জন্য আমাকে একটা গাড়ি দিতে পারবি? —

দারোয়ানের কাছে চিঠি জমা দিয়ে সে কলাবাগান রওনা হল হাঁটতে হাঁটতে। হাঁটতে খারাপ লাগছে না, কিন্তু খিদেটা জানান দিচ্ছে। পেটে অল্প অল্প ব্যথাও শুরু হয়েছে। ব্যাথাটাকে আমল দেয়া ঠিক হবে না। তাছাড়া তুচ্ছ শারীরিক সমস্যা নিয়ে চিন্তার সময় নেই। মাথার সামনে ভয়াবহ সমস্যা। প্রথম এবং প্রধান সমস্যা হল — কেয়াকে কোথায় এনে তুলবে? সে নিজে থাকে ছোটমামার বাসায়। ভেতরের বারান্দায় ক্যাম্পখাট পেতে ঘুমায়। বৃষ্টির সময় অবধারিতভাবে ক্যাম্পখাটের খানিকটা বৃষ্টির পানিতে ভিজে। বউকে নিয়ে ক্যাম্পখাটে ঘুমানো সম্ভব না। ছোটমামার বাড়িতে দুটা কামরা। একটায় ছোট মামা-মামি থাকেন। অন্যটায় মামার তিন মেয়ে থাকে। বসার ঘর বলে কিছু নেই। থাকলে কোনো সমস্যা ছিল না। কয়েকটা দিন সোফায় পার করে দেয়া যেত। কেয়া ঘুমাত সোফায়, সে মেঝেতে কম্বল বিছিয়ে।

জাহেদ তার মামা মিজান সাহেবকে বিয়ের খবর দিয়েছে পরশু। রাতের ভাত খাবার পর। জাহেদ ভয়ে ভয়ে ছিল — খবর শুনে মামা না জানি কি করেন। তেমন কিছুই করেন নি। তিনি দীর্ঘ সময় জাহেদের দিকে তাকিয়ে থেকে বলেছেন- 'ও'। তিনি হতভম্ভ হয়ে গেছেন, বলাই বাহুল্য। এই অবস্থায় জাহেদ বিয়ে করতে যাচ্ছে কেন? বউকে খাওয়াবে কি? বউ থাকবে কোথায়? — কিছুই জানতে চান নি। জাহেদের মামি মনোয়ারা বললেন, 'সত্যি বিয়ে, না ঠাট্টা করছ?'

জাহেদ বলল, 'সত্যি সত্যি বিয়ে করছি, মামি। মেয়ের নাম কেয়া। এ বাড়িতে দুবার এসেছে। আপনি হয়তো দেখেছেন। কেয়ার নানি মৃত্যুশয্যায়। তিনি নাতনির বিয়ে দেখে যেতে চাচ্ছেন আর কেয়ার আপা-দুলাভাইও কেয়াকে আর পুষতে পারবেন না বলে ঘোষণা দিয়েছেন।'

'ওরা কী দেখে তোমার কাছে বিয়ে দিচ্ছে - তোমার আছে কী?'

জাহেদ কিছু বলল না। মনোয়ারা বললেন- 'বউ নিয়ে কোথায় উঠবে?'

জাহেদ বলল, 'এখনো কিছু ঠিক করি নি।'

'তোমার কি কোথাও ওঠার জায়গা আছে?'

'জ্বি না।'

'বিয়ের খরচপাতির টাকা-পয়সা আছে?'

জাহেদ মাথা চুলকে বলল, 'জ্বি না।'

মিজান সাহেব ঠিক আগের ভঙ্গিতে বললেন, 'ও!'

জাহেদের এই মুহূর্তে কিছুই নেই। পোস্টঅফিসে পাসবই খুলেছিল। টিউশ্যানির টাকার কিছু কিছু সেখানে রাখত। পাসবইয়ে সাতশ তেত্রিশ টাকা আছে। মার গলার একটা হার আছে দেড় ভরির। ওটা বিক্রি করলে বিয়ের খুচরা খরচ সামলে ফেলা যায়। বিয়ের খরচ বলতে বিয়ের শাড়ি, হলুদের শাড়ি। কিছু সেন্ট-ফেন্ট। কিন্তু মা বিশেষ করে বলে দিয়েছেন হারটা যেন জাহেদের বিয়ের সময় তার বউকে দেয়া হয়। এইসব সেন্টিমেন্ট নিয়ে ভাবলে এখন চলে না। সেন্টিমেন্টের দিন শেষ। আজকের দিন হল রিয়েলিটির দিন। হার বর্তমানে তার বড় বোন নীলিমার কাছে আছে। সেই হার পাওয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাবে কিনা তা নিয়ে জাহেদের ঘোর সন্দেহ দেখা দিয়েছে। দিন সাতেক আগে আনতে গিয়েছিল। নীলিমা বলল, 'হার পালিশ করতে দেয়া হয়েছে।' গতকাল জাহেদ আবার গেল। নীলিমা বলল, 'রসিদটা পাওয়া যাচ্ছে না।' বলেই এক ধরনের ঝগড়া শুরু করল। ঝগড়ার বিষয় হল— তার বিয়ের সময় মা কিছুই দেন নি। হাতের দুটা বালা দিয়েছে। তার মধ্যে সোনা নামমাত্র। জাহেদ বলল, 'এসব আমাকে বলে লাভ কী? আমি এর কী করব?'

নীলিমা বলল, 'হাতের বালা জোড়া মার ব্যবহারী জিনিস হলেও একটা কথা ছিল। আমি কিছুই বলতাম না। স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে রেখে দিতাম। দোকানের জিনিস।' কোনো এক কায়দা করে নীলিমা গলার হারটা রেখে দিলে জাহেদ বিরাট বিপদে পড়বে। এতটা নিচে আপা নামবে জাহেদ বিশ্বাস করে না। কিন্তু অবিশ্বাস্য জিনিস সংসারে ঘটছে। তাছাড়া অভাবী সংসারে ক্ষুদ্রতা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার।

জাহেদ বিয়ে করছে। কেউ কোনো রকম আগ্রহ দেখাচ্ছে না। নীলিমা একবারও জিজ্ঞেস করে নি, 'বৌ নিয়ে কোথায় উঠবি? সম্ভবত ভয়েই জিজ্ঞেস করে নি, যদি জাহেদ বলে বসে কয়েকটা দিন তোমার এখানে থাকব। সে হয়তো ভেবেছে, একবার বউ নিয়ে উঠলে আর তাকে তাড়ানো যাবে না। এরকম ভাবা অবশ্যি অন্যায়ও না। ভাবাটাই স্বাভাবিক।

জাহেদের ভরসা এখন তার বন্ধুবান্ধবরা। সে মুখচোরা স্বভাবের। কাউকে এখনো কিছু বলে নি। বলতে লজ্জা করছে। শুভ্রকে গাড়ির কথা বলেছে। গাড়ি পাওয়া যাবে। শুভ্রর কাছে কেউ কিছু চেয়ে পায় নি, তা কখনো হয় নি। গাড়ির ব্যবস্থা হবে। তবে শুভ্রর কানে খবরটা পৌঁছলে হয়। টেলিফোনে শুভ্রকে কখনো পাওয়া যায় না। সে টেলিফোন ধরে না। যে ধরে সে অবধারিতভাবে বলে, শুভ্র বাসায় নেই, কিংবা সে এখন ঘুমাচ্ছে। জাহেদ ঠিক করল, আজ রাত নটা–দশটার দিকে একবার টেলিফোনে চেষ্টা করবে। পাওয়া যাবে না। তবু একবার চেষ্টা করে দেখা। পাওয়া যেতেও তো পারে। নীলিমাদের বাসার কাছেই বড় একটা মিষ্টির দোকান। দোকান নতুন চালু হয়েছে বলেই সেখান থেকে টেলিফোন করতে দেয়। তবে দোকানে ঢুকে এমন ভাব করতে হয় যে প্রচুর মিষ্টি কেনা হবে। কেনার আগে একটু বাড়িতে টেলিফোন করে জেনে নেয়া।

জাহেদের দুলাভাই মোবাশ্বের আলি জাহেদকে দেখেই মুখ অন্ধকার করে ফেললেন। সব সময়ই করেন। আজ একটু বেশি করলেন। শুকনো গলায় বললেন, 'তোমার আপা তো নেই। নারায়ণগঞ্জ গেছে। আজ আসবে না।'

জাহেদ বলল, 'আপা গয়নাটা এনে রেখেছে কিনা জানেন দুলাভাই?'

'কোন গয়না?'

'ঐ যে মার গলার একটা হার। পালিশ করতে দিয়েছিল।'

'ও আচ্ছা— হ্যাঁ— একটা ঝামেলা হয়ে গেছে, বুঝলে? বিরাট ঝামেলা।'

জাহেদ হতভম্ব গলায় বলল, 'কী ঝামেলা?'

'দোকানই উঠে গেছে। হিন্দু দোকান ছিল, মনে হয় কাউকে কিছু না জানিয়ে ইন্ডিয়া চলে গেছে। ইন্ডিয়া যাওয়ার একটা ধুম পড়েছে। তবু খোঁজখবরের চেষ্টা করা হচ্ছে— কিছু হবে বলে মনে হয় না। ঐটার আশা তুমি ছেড়ে দাও।'

জাহেদ করুণ গলায় বলল, 'কী বলছেন দুলাভাই!'

'যা সত্য তাই বললাম। তবে তোমার বউকে গয়না আমরা একটা দিব। এখন পারব না। ধীরেসুস্থে দিব। তোমার আপা পরশুদিন আসবে। তখন এসে খোঁজ নিও। সে বিস্তারিত বলবে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বিস্তারিত কী বলবে?'

'কোন দোকানে জমা দিয়েছিল, কী হয়েছে শেষ পর্যন্ত এই সব আর কি। জানা না জানা অবশ্যি সমান।'

জাহেদ উঠে দাঁড়াল। মোবাশ্বের আলি বললেন, 'চলে যাচ্ছ?'

'জ্বি।'

'আচ্ছা যাও। চা খেতে চাইলে খেতে পার। কাজের মেয়েটাকে বললে চা বানিয়ে দেবে।'

'না, চা খাব না।'

জাহেদ ঘর থেকে বের হয়ে এল। ভেবে পেল না, একবার কেয়ার কাছে যাবে কিনা। এত সকাল সকাল শুভ্রকে টেলিফোন করা ঠিক হবে না। রাত নটার পর করতে হবে। নটা পর্যন্ত কী করবে? বরং কেয়ার সঙ্গে দেখা করে আসা যাক।

কেয়াদের বাসায় যেতে লজ্জা করে। অস্বস্তিও লাগে। কেয়ার বড় বোন তাকে সহ্যই করতে পারে না। অবশ্যি এই মহিলা হয়তো কোনো কিছুই সহ্য করতে পারে না। আজ পর্যন্ত জাহেদ তাঁকে মিষ্টি করে কথা বলতে শোনে নি। জাহেদের ইচ্ছা সময় এবং সুযোগ হলে সে ভদ্রমহিলাকে বলবে– বকুল আপা, ফুলের নামে আপনার নাম কিন্তু সবার সঙ্গে এমন কঠিন আচরণ করেন কেন? সেই সুযোগ হয়তো কখনোই হবে না।

জাহেদ কেয়াদের পাঁচতলার ফ্ল্যাটে উপস্থিত হল রাত নটায়। অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে পাঁচতলায় উঠতে হয়। পাঁচতলা পর্যন্ত ঘন অন্ধকার। এই অন্ধকারে সিঁড়ি ভাঙা খুবই ক্লান্তিকর ব্যাপার। সব সময় মনে হয় এই বুঝি সিঁড়ি শেষ হল, কিন্তু শেষ হয় না। এক সময় মনে হয় সিঁড়ির ধাপগুলোর উচ্চতার হেরফের ঘটছে। এক ধরনের টেনশন, সিঁড়িতে ঠিকমতো পা পড়ছে তো?

বেল টিপতেই জলিল সাহেব দরজা খুলে দিয়ে হাসিমুখে বললেন, 'আরে আসুন, আসুন। মনে মনে আমি আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। কেয়া ঘরেই আছে। বাচ্চাদের পড়াচ্ছে। বসুন, ডেকে দিচ্ছি।'

জলিল সাহেবের পরনে লুঙ্গি এবং গেঞ্জি। তিনি সেইভাবেই ভেতরে ঢুকে গেলেন। তিনি এ পরিবারের কেউ না। এদের একটি কামরা সাবলেট নিয়েছেন। মাসে সাতশ করে টাকা দেন। সাতশ টাকা কেয়া দেয়। সংসারে খুব কাজে লাগে। জলিল সাহেবকে পরিবারের এক জন বলেই মনে হয়। ব্যাপারটা জাহেদের ভালো লাগে না। এক জন বাইরের লোক কেন এমনভাবে ঘুরঘুর করবে? কেন সে কেয়াকে বলবে — 'কেয়া, দেখ তো আমার লুঙ্গি শুকিয়েছে কিনা। না শুকালে উল্টে দাও।'

কেয়ার মুখ শুকনো।

তাকে দেখে মনে হচ্ছে সে কোনো কিছু নিয়ে খুব চিন্তিত। সে ঘরে ঢুকেই বলল, 'কিছু বলবে?'

জাহেদ বলল, 'না। তোমার কি শরীর খারাপ?'

কেয়া বলল, 'শরীর ঠিকই আছে। এস আমার সঙ্গে— ছাদে যাই। ছাদে গিয়ে কথা বলি।'

কেয়া দরজার দিকে যাচ্ছে। পেছনে পেছনে যাচ্ছে জাহেদ। সে কিছুতেই বুঝতে পারছে না কেয়ার মন এত খারাপ কেন?

উঁচু দালানের ছাদ ভালো লাগে না। সব সময় এক ধরনের অস্বস্তি লেগে থাকে। মনে হয় পৃথিবী থেকে অনেক দূরে ছাদে উঠবার মুখে সিঁড়িটা ভাঙা। কেয়া বলল, 'আমার হাত ধর। সিঁড়ি ভাঙা।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাহেদ হাত ধরল। কত সহজ, কত স্বাভাবিক ভঙ্গিতে সে এই মেয়েটির হাত ধরতে পারছে! এই আনন্দের কী কোনো তুলনা হয়!

কেয়া রেলিং ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে। জাহেদ বলল – 'এমন ঘেঁষে দাঁড়িও না। রেলিং ভেঙে পড়ে যেতে পারে। আজকাল দালানকোঠা বানাতে সিমেন্ট দেয় না। বালি দিয়ে কাজ সারে। তুমি এত চুপচাপ কেন কেয়া? কিছু হয়েছে?'

'না, কী হবে! বিয়ের জোগাড়যন্ত্র কি সব হয়েছে?'

'কিছুটা। বরযাত্রীর জন্যে মাইক্রোবাস ব্যবস্থা করেছি।'

'কী এক বিয়ে, তার আবার বরযাত্রী!'

জাহেদ বলল, 'যত তুচ্ছ বিয়েই হোক, বিয়ে তো।'

কেয়া বলল, 'টাকা–পয়সা আছে তোমার কাছে?'

'আছে কিছু।'

'সেই কিছুটা কত?'

জাহেদ চুপ করে রইল। কেয়া ক্লান্ত গলায় বলল, 'বিয়ের শাড়ি তো আমাকে একটা কিনতে হবে। মোটামুটি ভালো একটা শাড়ি কেনা দরকার। আমার মেয়েরা বড় হয়ে মায়ের বিয়ের শাড়ি নিশ্চয়ই দেখতে চাইবে।'

'ভালো শাড়িই কিনব।'

কেয়া বলল, 'আমার নানি আমাকে কিছু টাকা দিয়েছেন। সামান্যই। চার হাজার টাকা। টাকাটা তুমি নিয়ে যাও।'

'টাকা লাগবে না।'

'লাগবে। তোমার কি অবস্থা সেটা আমার চেয়ে ভালো কেউ জানে না। ভালো কথা — বিয়ের পর আমি উঠব কোথায়?'

'এখনো ঠিক করি নি।'

'একটা কিছু ঠিক কর। তুমি আমাকে যেখানে নিয়ে যাবে — আমি সেখানেই যাব — শুধু বিয়ের পরেও এখানে ফেলে রেখ না।'

'তা করব না।'

'তুমি তো তোমার ছোটমামার সঙ্গেই থাক।'

'হুঁ।'

'বারান্দায় ক্যাম্পখাট পেতে ঘুমাও?'

'হুঁ।'

'বৃষ্টি হলে ভিজে যাও?'

'হুঁ।'

'আমাকেও কি সেই ক্যাম্পখাটে থাকতে হবে?'

জাহেদ চুপ করে রইল। কেয়া বলল, 'ক্যাম্পখাটে থাকতে আমার কোনো আপত্তি নেই। এই সব নিয়ে তুমি মন খারাপ করবে না। কষ্ট করে তোমার যেমন অভ্যাস আছে, আমারও আছে। শুধু যদি ....'

'শুধু যদি কী?'

কেয়া ক্ষীণ স্বরে বলল, 'শুধু যদি কয়েকটা দিন নিরিবিলি তোমার সঙ্গে থাকতে পারতাম। কেয়া ছোট্ট করে নিশ্বাস ফেলে বলল, তুমি দাঁড়াও এখানে। আমি টাকাটা নিয়ে আসি। তোমাকে এত ক্লান্ত লাগছে কেন? খুব হাঁটাহাঁটি করছ?'

'না।'

'টাকার জন্যে নানা ধরনের লোকজনের কাছে হাত পেতে বেড়াচ্ছ না তো?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'না।'

'কারো কাছে টাকার জন্যে হাত পাতবে না। মনে থাকে যেন। তুমি দাঁড়াও।'

পাঁচ মিনিটের ভেতর কেয়া চলে এল। তার হাতে ছোট্ট একটা ট্রে। পিরিচে ঢাকা এক কাপ চা। সঙ্গে দুটা টোস্ট বিসকিট।

'ঘরে কিছু নেই। বিসকিট দিয়ে চা খাও।'

জাহেদ চা খাচ্ছে। কেয়া তাকিয়ে আছে। কেন জানি তার বড় মায়া লাগছে। তার ইচ্ছে করছে জাহেদকে জড়িয়ে ধরে বসে থাকতে। বেশিরভাগ মেয়েরই কি এরকম হয়, না তার বেলাতেই হচ্ছে?

'এই খামে টাকা আছে। সাবধানে রাখ। আর শোন, তুমি একটা কাজ করবে — নিজের জন্যে একটা শার্ট এবং প্যান্ট কিনবে। নীল রঙের হাফ হাওয়াই শার্ট আর ধবধবে সাদা রঙের প্যান্ট। মনে থাকবে?'

'নীল শার্ট, সাদা প্যান্ট কেন?'

'একবার একটা ছেলেকে নীল শার্ট আর সাদা প্যান্ট পরে যেতে দেখেছিলাম। খুব সুন্দর লাগছিল। এখনো চোখে ভাসে।'

'ছেলেটাকে সুন্দর লাগছিল বলেই আমাকে সুন্দর লাগবে এমন তো কোনো কথা নেই।'

'তর্ক করবে না। যা করতে বলছি করবে।'

'আচ্ছা, আমি উঠি এখন?'

'না, বস আরো খানিকক্ষণ। কোনো কথা বলার দরকার নেই। চুপচাপ বসে থাক।'

তারা দুজনই চুপচাপ বসে রইল। কেয়ার বোনের ছোট মেয়েটি ছাদে এসে গম্ভীর গলায় বলল, 'ছোট খালা, মা তোমাকে ডাকে।'

কেয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে নিচে চলে গেল। যাবার সময় জাহেদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েও গেল না।

কেয়াদের বাড়ি থেকে বরে হয়ে জাহেদ শুভ্রর বাসায় টেলিফোন করল। রেহানা টেলিফোন ধরলেন এবং বললেন, 'শুভ্র তো শুয়ে পড়েছে। কী বলতে হবে তুমি আমাকে বল, আমি বলে দেব।'

জাহেদ হড়বড় করে বলল, 'কিছু বলতে হবে না। আমি আপনাদের বাড়ির দারোয়ানের কাছে একটা চিঠি দিয়ে এসেছি।'

রেহানা বললেন, 'শুভ্র চিঠি পেয়েছে।'

জাহেদ বাসায় ফিরল রাত এগারটার দিকে। খেতে গেল রান্নাঘরে। মনোয়ারা ভাত বেড়ে দিলেন। এত রাতে ভাত গরম থাকে না। আজ গরম আছে। গরম গরম ভাত। ডিমভাজা, ডাল। গরম ভাতের রহস্য হল — ভাত রান্না হয়েছে। মনোয়ারার মা ঢাকায় এসেছেন চিকিৎসার জন্যে। ভাতে টান পড়েছে। নতুন করে রাঁধতে হয়েছে।

মনোয়ারা বললেন, 'খাওয়ার পর চট করে শুয়ে পড়বে না। তোমার মামা তোমার সঙ্গে কথা বলবেন। 'জাহেদ বলল, 'কী কথা মামি?'

'কি কথা আমি কী করে বলব? আমাকে তো কিছু বলে নাই।'

'আপনি কিছুই জানেন না?'

'না, আমি কিছুই জানি না।'

মিজান সাহেব কথা খুব কম বলেন। বেশিরভাগ কথাবার্তাই তিনি হ্যাঁ হুঁ-র মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন। সেই তুলনায় আজ অনেক কথা বললেন। তাঁর কথার সারমর্ম হচ্ছে —

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাহেদ যেন বউ নিয়ে এ বাসায় না ওঠে। তাঁর সামর্থ্য ছিল না। তারপরেও তিনি দীর্ঘদিন জাহেদকে পুষেছেন। দুজনকে পোষার তাঁর সামর্থ্য নেই। বিয়ে করার মতো সাহস যখন জাহেদের আছে তখন নিশ্চয়ই স্ত্রীকে প্রতিপালনের ক্ষমতাও তার আছে। জাহেদ যদি তাঁর কথা না শুনে বউ নিয়ে এখানে ওঠে তাহলে ভয়াবহ কাণ্ড ঘটে যাবে।

জাহেদ চুপ করে শুনে গেল। কিছু বলল না। মিজান সাহেব কিছু শোনার জন্যেও অপেক্ষা করলেন না। এটা তাঁর স্বভাব না। তিনি নিজের কথা শেষ করে একটা সিগারেট ধরালেন। নিঃশব্দে সিগারেট শেষ করে ঘুমাতে গেলেন।

আজ সারাদিন জাহেদের খুব পরিশ্রম হয়েছে। বিছানায় শুয়ে পড়ামাত্র ঘুম এসে যাওয়ার কথা কিন্তু ঘুম এল না। সে সারা রাত জেগে কাটাল। শেষ রাতে তন্দ্রার মধ্যে কেয়াকে নিয়ে দুঃস্বপ্ন দেখল। জলিল সাহেব সেই দুঃস্বপ্নে কেয়াকে বউ বউ করে ডাকছেন।

৩

শুভ্র তার চশমা খুঁজে পাচ্ছে না। বিছানার পাশে রেখে সে বাথরুমে ঢুকেছিল চোখে পানি দিতে। বাথরুম থেকে বের হয়ে সে গেল বারান্দায়। এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত দুবার হাঁটল। ঠিক সন্ধ্যায় চশমা ছাড়া পৃথিবীকে দেখতে তার ভালো লাগে। সম্পূর্ণ অন্যরকম লাগে। চারদিকে অন্ধকার। এই অন্ধকারে বাতি জ্বলে উঠছে। চশমা ছাড়া এই বাতিগুলোকে অনেক উজ্জ্বল এবং ছড়ানো মনে হয়।

শুভ্রর ইচ্ছা করছিল আরো খানিকক্ষণ হাঁটতে, কিন্তু সময় নেই। আজ জাহেদের বিয়ে। সন্ধ্যা মেলাবার পরপর বরযাত্রী রওনা হবে। শুভ্র বরযাত্রীদের এক জন। সে মাইক্রোবাস নিয়ে যাবে। তার দেরি করার সময় নেই। শুভ্র ঘরে ঢুকল। চশমা খুঁজে পেল না। বিছানার পাশে এই সপ্তাহের টাইম পত্রিকা পাতা খোলা অবস্থায় আছে। পত্রিকার পাশে এক প্যাকেট ক্যাসো নাট। প্যাকেট খোলা হয় নি। বালিশের নিচে তার নোটবুক এবং পেনসিল। সবই আছে, চশমা নেই। শুভ্র তার শরীরে এক ধরনের কাঁপুনি অনুভব করল। চশমা হারালে তার এ রকম হয়। মাঝে মাঝে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। নিজেকে এত অসহায় লাগে! মনে হয় অচেনা অজানা দেশের হাজার হাজার মানুষের মাঝখানে সে হারিয়ে গেছে। চোখে দেখতে পাচ্ছে না, কথা বলতে পারছে না। শুধু বুঝতে পারে অসংখ্য মানুষ তাকে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। সে যেমন ওদের দেখতে পাচ্ছে না, ওরাও তাকে দেখতে পাচ্ছে না। সে ওদের কাছে অদৃশ্য মানব।

শুভ্র আতংকিত গলায় ডাকল, 'মা! মা!'

রেহানা প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘরে এলেন। শুভ্র ভাঙা গলায় বলল, 'আমার চশমা খুঁজে পাচ্ছি না, মা।'

'তোর চিৎকার শুনেই বুঝেছি। শান্ত হয়ে বস তো এখানে। চশমা যাবে কোথায়? ঘরেই আছে। চশমার তো পাখা নেই যে উড়ে ঘর থেকে পালিয়ে যাবে।'

'বালিশের কাছে রেখেছিলাম।'

'বালিশের কাছে রাখলে বালিশের কাছেই আছে।'

রেহানা বিছানায় কোনো চশমা দেখলেন না। খাটের নিচে পড়েছে বোধহয়। তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্রুত খাটের নিচটা দেখে নিলেন। শুভ্র বলল, 'মা, পাওয়া গেছে?'

'পাওয়া যাবে। তুই চুপ করে বসে থাক তো। ঘামতে শুরু করেছিস।'

'সন্ধ্যা মেলাবার সঙ্গে সঙ্গে বরযাত্রী রওনা হবে।'

'চশমা এক্ষুনি পাওয়া যাবে। তুই যথাসময়ে যেতে পারবি। তাছাড়া বরযাত্রী কখনো সময়মতো রওনা হতে পারে না। এক ঘণ্টা–দুঘণ্টা দেরি হবেই।'

'মা, তুমি কথা বলে সময় নষ্ট করছ। আমার খুব অস্থির লাগছে।'

'শুভ্রর আসলেই খুব অস্থির লাগছে। অন্যসময় এতটা অস্থির লাগত না। কারণ তখন শুভ্র জানত জরুরি অবস্থার জন্যে দুটা চশমা কাবার্ডে লুকানো আছে। আজ সেই চশমা দুটি নেই। শুভ্রর চোখ আরো খারাপ হওয়ায় ঐ চশমা দুটিতে নতুন গ্লাস লাগানোর জন্যে দোকানে পাঠানো হয়েছে। ভেরিলাক লেন্স লাগানো হবে। এক সপ্তাহ সময় লাগবে।

'মা, পাওয়া গেছে?'

'এখনো পাওয়া যায় নি। তবে পাওয়া যাবে। চশমা খুলে রেখে তুই কোথায় কোথায় গিয়েছিস বল তো?'

'কোথাও যাই নি। বাথরুমে গিয়ে চোখে পানি দিয়েছি।'

'তাহলে চশমা বাথরুমেই আছে। তুই হাতে করে নিয়ে বেসিনের উপর রেখে চোখে পানি দিয়েছিস। তারপর চশমার কথা ভুলে গেছিস।'

রেহানা বাথরুমে ঢুকলেন। চশমা সেখানে নেই। তিনি বারান্দায় গেলেন। বারান্দায় ছোট একটা টেবিল আছে। শুভ্র মাঝে মাঝে ঐ টেবিলে চশমা রেখে ভুলে যায় — আজো নিশ্চয়ই তাই হয়েছে। বারান্দার টেবিলে কিছু নেই। তিনি আবার শোবার ঘরে ঢুকলেন। চিন্তিত এবং ব্যথিত মুখে শুভ্র বসে আছে। তার ফর্সা কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। শুভ্র বলল, 'কী হবে মা!'

'কিচ্ছু হবে না। পাওয়া যাবে। তুই আমার সঙ্গে বারান্দায় এসে বস তো দেখি। আর আমরা দুজন চা খাই। আমি কাজের লোকদের বলছি। ওরা খুঁজে দেবে।'

'আমার চা খেতে ইচ্ছা করছে না, মা।'

'তুই এত অল্পতে অস্থির হোস কেন বল তো?'

'চশমা ছাড়া আমি অন্ধ। অন্ধ হওয়াটা কী খুব অল্প?'

'ইস্ ঘেমেটেমে একেবারে কী হয়েছিস! আয় আমার সঙ্গে।'

তিনি শুভ্রকে হাত ধরে বারান্দায় এনে বসালেন। দোতলা থেকে একতলায় নেমে বাবুর্চিকে বললেন খুব ভালো করে দুকাপ চা বানাতে। কাজের মেয়ে শাহেদা এবং কাজের ছেলে মতি মিয়াকে দোতলায় এসে শুভ্রকে চশমা খুঁজে দিতে বললেন। এ রকম কখনো করা হয় না। এ বাড়ির কাজের লোকদের কখনো দোতলায় আসতে দেয়া হয় না। ওদের কর্মকাণ্ড একতলাতেই সীমাবদ্ধ। দোতলায় যা কাজ রেহানাই করেন। তাঁর শুচিবায়ুর মতো আছে।

শুভ্র বলল, 'কটা বাজে মা?'

'খুব বেশি বাজে নি। মাত্র ছটা। তুই কাপড় পরে তৈরি হয়ে থাক। ড্রাইভারকে বলি মাইক্রোবাস বের করে রাখতে। তুই আমার সঙ্গে বসে চা খা। বোকা ছেলে! এত অল্পতে এমন নার্ভাস হলে চলে?'

'আমার দেরি হলে জাহেদ খুব অস্থির হয়ে পড়বে। আজ ওর বিয়ে। আজ কি ওকে অস্থির করা উচিত?'

'তোর দেরি দেখলে ও অস্থির হবে কেন?'

'ও তো কোনো গাড়ি–টাড়ি জোগাড় করতে পারে নি। আমাদের মাইক্রোবাসটা ওর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভরসা। এটাকেই ফুল-টুল দিয়ে সাজিয়ে বরের গাড়ি করা হবে।'

'তাহলে বরং এক কাজ করা যাক। মাইক্রোবাসটা পাঠিয়ে দেয়া যাক। তুই চশমা পাওয়ার পর আমার ছোট গাড়িটা নিয়ে যাবি।'

'এটা মন্দ না, মা।'

শুভ্র সাদা পাঞ্জাবি পরল। পাঞ্জাবির হাতা কুঁচকে ছিল। রেহানা নিজে ইস্ত্রি করিয়ে দিলেন। হালকা খয়েরি রঙের প্যান্ট। সাদা পাঞ্জাবি, ধবধবে সাদা স্যান্ডেল। শুভ্রকে রাজপুত্রের মতো লাগছে। রেহানা ছেলের সঙ্গে বসে চা খাচ্ছেন। শাহেদা এবং মতি মিয়া দোতলা উলট-পালট করে ফেলছে। শুভ্রর অস্থির ভাব অনেকটা কেটে গেছে। সে শান্ত ভঙ্গিতে বসে আছে। একবার শুধু জিজ্ঞেস করল, 'কটা বাজে মা?'

সাড়ে সাতটা বাজে, রেহানা ছেলেকে সেই খবর দিলেন না। বললেন, 'মাত্র সন্ধ্যা মিলিয়েছে। রাত বেশি হয় নি। তোর বন্ধুর বিয়ে হচ্ছে কোথায়? কম্যুনিটি সেন্টারে?'

'না। নাখালপাড়ায়। ওরা খুব গরিব। কম্যুনিটি সেন্টার ভাড়া করার মতো পয়সা নেই।'

'মেয়ের বাড়িতে বিয়ে হচ্ছে?'

'না, মেয়ের বোনের বাসায়। মেয়ের বাবা-মা নেই। বড় বোন মানুষ করেছেন। উনার বাড়িতেই বিয়ে হচ্ছে।'

'তুই কি ঐ বাড়ি চিনিস?'

'না মা।'

'চেনা থাকলে ভালো হত। সরাসরি ঐ বাড়িতে চলে যেতে পারতিস। বরযাত্রী নিশ্চয়ই এরমধ্যে রওনা হয়ে গেছে ... ।'

'চশমা মনে হচ্ছে পাওয়া যাবে না, মা!'

'অবশ্যই পাওয়া যাবে। কোথায় কোন ফাঁকে পড়েছে। তোকে আরো সাবধান হতে হবে, শুভ্র।'

শুভ্র হাসল। কী সুন্দর করে ছেলেটা হাসে। যতবার দেখেন ততবার রেহানার বুক ধক করে উঠে। পুরুষ মানুষকে এত রূপবান হতে নেই। শুভ্র বলল, 'মা, আমি ছাদে গিয়ে বসব। তুমি আমাকে ছাদে দিয়ে এস।'

'আমি বরং চশমার দোকানে টেলিফোন করে দেখি।'

'লাগবে না মা। আমার এখন আর যেতে ইচ্ছা করছে না। তুমি আমাকে ছাদে দিয়ে এস।'

রেহানা শুভ্রকে হাত ধরে ধরে ছাদে তুলে দিলেন। শুভ্র বলল, 'তুমি চলে যাও। আমি একা একা ছাদে হাঁটব।'

'ভয় পাবি তো!'

'ভয় পাব কেন?'

রেহানা নিচে নেমে গেলেন। তাঁর নিজেরও মন খারাপ লাগছে। শুভ্রর সামান্যতম কষ্টও তাঁর বুকে এসে লাগে। তিনি নিজের শোবার ঘরে ঢুকে তাঁর দূর সম্পর্কের বোন রিয়াকে টেলিফোন করলেন। রিয়া খুব আমুদে মেয়ে। ও এসে হৈচৈ করে শুভ্রর মন ভালো করে দেবে। ও বাসায় আছে কিনা সেটাই কথা। রিয়ার বরও হয়েছে রিয়ার মতো। দিনরাত চরকিপাক খাচ্ছে। রিয়ার বরের সঙ্গে বাইরে থাকার কথা।

রিয়াকে পাওয়া গেল। রেহানা বললেন, 'কী করছিস রিয়া?'

রিয়া হাসতে হাসতে বলল, 'ছটফট করছি।'

'ছটফট করছিস কেন?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আজ রাত বারটায় আমাদের বাড়িতে ভূত নামানো হবে। এই টেনশনে ছটফট করছি।'

'ভূত নামানো হবে মানে কী?'

'সুইডেন থেকে জামানের এক বন্ধু এসেছে। ও নাকি ভূত আনার ব্যাপারে এক্সপার্ট। খুব ভালো মিডিয়াম। তা তুমি হঠাৎ টেলিফোন করেছ কেন?'

'এমনি।'

'এমনি তুমি কখনো টেলিফোন কর না। কারণটা দয়া করে বলে ফেল।'

'শুভ্রর জন্যে খারাপ লাগছে।'

'কেন! ওর কী হয়েছে?'

'ওর মন খারাপ, বন্ধুর বিয়েতে যাবার কথা ছিল। যেতে পারে নি। চশমা হারিয়ে ফেলেছে।'

'চশমা হারানো তো ওর নতুন ঘটনা না। সব সময় হারাচ্ছে। গত বছর পিকনিকে গিয়ে চশমা হারিয়ে ফেলল। আমরা কত হৈচৈ করছি আর সে উবু হয়ে খুঁজেছে চশমা। বুবু, তুমি এক কাজ কর — দুতিন হাজার চশমা কিনে রঙিন সুতা দিয়ে ঘরের বিভিন্ন জায়গায় ঝুলিয়ে রাখ।'

রেহানা হাসলেন। রিয়া বলল, 'হাসি না, আমি সত্যি সত্যি বলছি। শুভ্র এখন কী করছে? চশমার শোকে দরজা বন্ধ করে কাঁদছে?'

'ছাদে হাঁটছে।'

'আমাকে টেলিফোন করার উদ্দেশ্য কি এই যে আমি এসে ওকে নিয়ে মন ভালো করে ফেরত দেব?'

'না, থাক, তোর প্রোগ্রাম আছে।'

'প্রোগ্রাম কিছু না। ভূতের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট। মানুষের অ্যাপয়েন্টমেন্ট যেমন বাতিল করা যায়, ভূতেরটাও যায়। আমি এসে ওকে নিয়ে যাচ্ছি। আর শোন, তুমি কি শুভ্রর বিয়ে-টিয়ে দেবার কথা ভাবছ?'

'মাত্র তো পাস করল।'

'ওর বয়স এখন কত যাচ্ছে — চব্বিশ না?'

'সাতাশ।'

'কী সর্বনাশ! বিয়ের বয়স তো চলে যাচ্ছে। আর দেরি করা ঠিক হবে না। আমার চেনা একটি মেয়ে আছে। আমার মতোই রূপবতী। বিহারি মেয়ে। বিহারি হলেও বোঝার উপায় নেই। বাঙালি কালচার ধরে ফেলেছে। রবীন্দ্রসংগীত গায়। জীবনানন্দের কবিতা পড়ে।'

'বাঙালি মেয়ের কি দেশে অভাব?'

'রূপবতী মেয়ের অভাব তো আছেই। তুমি আমার মতো আরেকজন খুঁজে বের কর— আমি তোমাকে এক হাজার টাকা দেব। শুভ্রকে তো আর যার-তার সঙ্গে বিয়ে দেয়া যাবে না। তার পাশে রাজকন্যা লাগবে। যাই হোক, বুবু, তুমি শুভ্রকে তৈরি হতে বল। আমি আসছি। বিহারি মেয়েটির একটা ছবি আমার কাছে আছে। আসার সময় কি নিয়ে আসব?'

'তুই নিজে আয়। ছবি-টবি কিছু আনতে হবে না।'

শুভ্র তাদের ছাদের ঠিক মাঝখানে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখ আকাশের দিকে। তবে চোখ বন্ধ। চোখ বন্ধ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকার কি মানে রেহানা বুঝলেন না। তিনি ডাকলেন, 'এই শুভ্র!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুভ্র মার দিকে তাকাল। রেহানা আনন্দিত গলায় বললেন, 'এই নে চশমা। পাওয়া গেছে। বারান্দায় যে ফুলের বড় টবটা আছে — ঐ টবের পেছনে পড়ে ছিল। শুভ্র মার হাত থেকে চশমা নিতে নিতে মৃদু স্বরে বলল, 'থ্যাংকস মা।' রেহানা বললেন, 'আমি তো ভেবেই পাচ্ছি না — চশমা ঐ খানে কীভাবে গেল।

'পাওয়া গেছে এটাই বড় কথা।'

'মাঝখান থেকে তোর যাত্রা নষ্ট। আর ঘণ্টাখানিক আগে পাওয়া গেলে কী ক্ষতি হত! তোর মন নিশ্চয়ই খারাপ।'

'না মা। মন ঠিক করে ফেলেছি।'

'কীভাবে ঠিক করলি?'

'আমার মন ঠিক করার কিছু নিজস্ব টেকনিক আছে।'

'আমাকে শিখিয়ে দে। আমারও তো প্রায়ই মন খারাপ থাকে।'

'আমার টেকনিক কাউকে শেখানো যাবে না। উদ্ভট সব টেকনিক। শুনলে তুমি ভাববে আমার মাথা খারাপ।'

'তোর মাথা খানিকটা খারাপ তো বটেই। শোন শুভ্র, তোর রিয়া খালা আসছে। তুই তার সঙ্গে ঘুরে আয়। তোর ভালো লাগবে।'

'আমি যাব না, মা। আমার কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে না।'

দুজন ছাদ থেকে নেমে আসছে। রেহানা বললেন, 'আমার হাত ধর। হাত ধরে ধরে নাম।'

'হাত ধরতে হবে না, মা। এখন চোখে চশমা আছে, সব দেখতে পাচ্ছি।'

'চশমা থাকলে বুঝি আর মার হাত ধরা যায় না!'

শুভ্র মার হাত ধরে থমকে দাঁড়াল। নিচু গলায় বলল, 'মা তুমি আমার চশমাটা লুকিয়ে রেখেছিলে, যাতে আমি আমার বন্ধুর বিয়েতে যেতে না পারি। তুমি চাও না আমি আমার দরিদ্র বন্ধুদের সঙ্গে মিশি। ওরা কিন্তু মা, আমাকে খুব পছন্দ করে। আমিও ওদের পছন্দ করি। তোমাকে যতটা করি ততটা করি না, কিন্তু করি

রেহানা চট করে কিছু বলতে পারলেন না। চশমার ব্যাপারটা শুভ্র এত সহজে ধরে ফেলবে তা তিনি অনুমান করেন নি। শুভ্র বলল, 'তুমি কি আমার কথায় রাগ করলে মা?'

রেহানা জবাব দিতে পারলেন না। গাড়ির হর্ন শোনা যাচ্ছে। রিয়া চলে এসেছে। সে গাড়ি থেকে নামছে না — ক্রমাগত হর্ন বাজিয়ে যাচ্ছে। শুভ্র বলল, 'ছোট খালা চলে এসেছে — চল মা, নিচে যাই।'

গাড়ির পেছনের সিটে রিয়া গা এলিয়ে বসে আছে। এই অন্ধকারেও সিনেমার নায়িকার মতো কালো চশমায় তার মুখ ঢাকা। চুল বাঁধা নেই। বাতাসে এলোমেলো হয়ে আছে। রিয়া জানালা দিয়ে মুখ বের করে বলল, 'শুভ্র, উঠে আয়।'

শুভ্র বলল, 'আমি আজ কোথাও যাব না, ছোট খালা।'

রিয়া ক্লান্ত গলায় বলল, 'মজুমদার সাহেব গাড়ি স্টার্ট দিন।' মজুমদার সাহেব যাকে বলা হল, শুভ্র তাকে আগে কখনো দেখে নি। ভদ্রলোকের মাথাভর্তি কাঁচা-পাকা চুল। ভারিক্কি চেহারা। চোখে গোল্ডেন ফ্রেমের গোল চশমা। ভদ্রলোক বললেন, 'উঠে আসুন না। আপনার খারাপ লাগবে না।'

রিয়া বলল, 'মজুমদার সাহেব, ওর সঙ্গে কথা বলে সময় নষ্ট করার কোনো মানে হয় না। ও যখন বলেছে যাবে না, তখন যাবে না। ওকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি।'

'রাগ করেছ খালা?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'অফকোর্স রাগ করেছি। আমি তো তোর মতো সুপারম্যান না যে আমার মধ্যে রাগ, ঘৃণা থাকবে না। তুই চশমা পেয়েছিস?'

'হুঁ।'

'পাঞ্জাবিতে তোকে দারুণ লাগছে রে শুভ্র! তোদের বাড়িতে কেন আসি না জানিস? যতবার আসি ততবারই মনে হয় তুই আগের চেয়ে সুন্দর হয়েছিস। অন্যের সৌন্দর্য আমি সহ্য করতে পারি না। মজুমদার সহেব, শুভ্রকে সিনেমার নায়কের মতো লাগছে না?'

'বাংলা ছবির নায়কের কথা বলছেন?'

'না না, শুভ্রকে লাগছে পিটার ও টুলের মতো। ফিগারেও মিল আছে। শুভ্র, উঠে আয় না। অনেকদিন তোর সঙ্গে গল্প করি না।'

'আজ ইচ্ছা করছে না, ছোট খালা।'

'তোর জন্যে আমি মেয়ে দেখে বেড়াচ্ছি, তুই জানিস? দুজন প্রাইমারি সিলেকশন পেয়েছে। তোর মা এক জনকে দেখেছিল, আমি বাতিল করে দিয়েছি।'

'ভালো করেছ।'

'তুই আয় শুভ্র — তোর সঙ্গে কথা আছে।'

'না, আজ না।'

মজুমদার সাহেব গাড়ি স্টার্ট দিলেন। শুভ্র গাড়ি বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইল। হঠাৎ করে তার মনে হচ্ছে কিচ্ছু করার নেই। ইদানীং এই অনুভূতি তার ঘন ঘন হচ্ছে। ছোট খালার সঙ্গে চলে গেলেও হত। না যাওয়ার পেছনে তার প্রধান যুক্তি হল — ছোট খালা রাতে তাকে ফিরতে দিত না। তার থেকে যেতে হত। অন্যের বাড়িতে থাকতে তার ভালো লাগে না। তার নিজের ধারণা সে অন্ধ। কোনো অন্ধ তার পরিচিত জায়গা ছাড়া স্বস্তি পায় না। সেও পায় না।

দারোয়ান গেট বন্ধ করে এগিয়ে আসছে। এই দারোয়ানের নতুন অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়েছে। দারোয়ান বলল, 'ভাইজান, বাগানে বসবেন? চেয়ার এনে দেব?'

'না।'

গোমেজ কৌতূহলী চোখে তাকে দেখছে। কী দেখছে এত আগ্রহ নিয়ে? শুভ্র বলল, 'কিছু বলবে গোমেজ?'

'জ্বি না। স্যার, আপনার চশমা পাওয়া গেছে?'

'হ্যাঁ, পাওয়া গেছে।'

শুভ্র মনে মনে হাসল। তার চশমা হারানো মনে হচ্ছে বিরাট ঘটনা হয়ে গেছে। কে জানে বাবা অফিস থেকে ফিরেও হয়তো জিজ্ঞেস করবেন, শুভ্র, চশমা পাওয়া গেছে?

বাবা আজ ফিরতে এত দেরি করছেন কেন? তাঁর অফিসে আবারো কি কোনো সমস্যা হয়েছে? শুভ্র তাঁর জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। বাবার ফিরতে দেরি হলে সে মাঝে মাঝে গেটের কাছে অপেক্ষা করে। অপেক্ষা করতে তার ভালো লাগে।

ইয়াজউদ্দিন সাহেব রাত দশটায় ফিরলেন। বাড়িতে তখন এক ধরনের চাঞ্চল্য দেখা দিল। তিনি অফিসের কাপড়ে দোতলায় ওঠেন না। একতলায় তিনি গরম পানিতে গোসল সারেন। নতুন এক সেট কাপড় এবং চটি জুতা পায়ে দোতলায় ওঠেন। দোতলায় না ওঠা পর্যন্ত সচরাচর কথা বলেন না। তাঁর সব কিছুই ঘড়ি ধরা। ডিনার খেতে বসেন নটা ত্রিশে। ঘুমাতে যান সাড়ে দশটায়।

আজ নিয়মে কিছু উলট–পালট হয়েছে। ইয়াজউদ্দিন সাহেব ডাইনিং রুমে যখন ঢুকলেন তখন দশটা কুড়ি বাজে। শুভ্র একা বসে আছে। টেবিলে খাবার দেয়া হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতি মিয়া একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে।

ইয়াজউদ্দিন সাহেব বললেন, 'তোমার মা কোথায় শুভ্র?'

'মা শুয়ে আছে, বাবা। তার মাথা ধরেছে। রাতে কিছু খাবেন না।'

'তোমার না আজ বন্ধুর বিয়েতে যাবার কথা ছিল — যাও নি ?

'না।'

'যাও নি কেন?'

শুভ্র বাবার দিকে তাকিয়ে হাসল। ইয়াজউদ্দিন সাহেব এই হাসির অর্থ জানেন। এই হাসির অর্থ হচ্ছে শুভ্র এ প্রসঙ্গে আর কিছু বলতে চায় না।

ইয়াজউদ্দিন সাহেব এক চামচ ভাত নিলেন। তিন–চার রকমের তরকারি আছে। কোনোটিই তাঁর মনে ধরছে না। তিনি ডালের বাটির দিকে হাত বাড়ালেন। ডাইনিং রুমে শুধু তিনি এবং শুভ্র। মতি মিয়া চলে গেছে। এ বাড়ির নিয়ম হচ্ছে সব খাবারদাবার টেবিলে সাজিয়ে কাজের লোকেরা দূরে সরে যাবে। এই নিয়ম ইয়াজউদ্দিন সাহেবের করা। তিনি তাঁর জরুরি কথাবার্তা যা বলার তা খাবার টেবিলেই বলেন। তিনি চান না বাইরের কেউ এসব কথাবার্তা শুনুক।

'শুভ্র!'

'জ্বি।'

'তোমাদের রেজাল্ট কবে হবে — তুমি কিছু জান?'

'খুব শিগ্‌গিরই হবার কথা।'

'এখন কী করবে কিছু ভেবেছ?'

'না।'

'দেশের বাইরে গিয়ে যদি পড়াশোনা করতে চাও, করতে পার।'

'আমার বাইরে কোথাও যেতে ইচ্ছা করে না।'

'কেন?'

শুভ্র আবারো হাসল। ইয়াজউদ্দিন সাহেব বললেন, পড়াশোনা করার জন্য যেতে না চাও, বেড়াবার জন্যে যাও। এরপর আর সময় পাবে না।'

'সময় পাব না কেন?'

'আমি অবসর নেব বলে ভাবছি। এক জীবনে প্রচুর পরিশ্রম করেছি। এখন আর আগের মতো পরিশ্রম করতে পারি না। পরিশ্রম করতে ভালোও লাগে না। এক জীবনে সঞ্চয় যা করেছি তা আমার কাছে যথেষ্ট বলেই মনে হয়। তোমাকে এই সঞ্চয় আমি বাড়াতে বলছি না। তুমি যা আছে তা শুধু ঠিক রাখবে।'

শুভ্র সহজভাবে বলল, 'তোমার কত টাকা আছে, বাবা?'

'চট করে বলতে পারব না। তবে আমাকে দেখে বা আমার জীবনযাপন পদ্ধতি দেখে আমার অর্থ–বিত্ত সম্পর্কে ধারণা করা সম্ভব না। আমি খুব লো প্রোফাইল মেইনটেইন করি।'

'তুমি বলতে চাচ্ছ তোমার প্রচুর টাকা?'

'হ্যাঁ।

টাকা তোমার কাছে কখনো ঝামেলা বলে মনে হয় নি?'

'টাকা ঝামেলা মনে হবে কেন? টাকার অভাবই ঝামেলা বলে মনে হয়েছে।'

শুভ্র কিছু বলতে গিয়েও বলল না। থেমে গেল। ইয়াজউদ্দিন সাহেব শান্ত স্বরে বললেন, 'তুমি কি কিছু বলতে চাচ্ছ?'

'না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বলতে চাইলে বলতে পার। আমি তোমার সঙ্গে ফ্রি ডিসকাশন করতে চাই। দেখ শুভ্র, আমি কঠোর পরিশ্রম করে টাকা করেছি। আমি মদ খাই না। জুয়া খেলি না। রিলাক্স করার জন্যে বিদেশের নাইট ক্লাবে যাই না। কঠিন নিয়মশৃঙ্খলায় জীবনযাপন করেছি। — কেন করেছি বলে তোমার ধারণা?'

'কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে কর নি। তোমার স্বভাবই হচ্ছে এরকম। একেক মানুষ একেক রকম।'

ইয়াজউদ্দিন সাহেব বেশ কিছুক্ষণ ভ্রূ কুঁচকে ছেলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। প্রসঙ্গ পরিবর্তন করলেন। হালকা গলায় বললেন, 'তোমার মা তোমাকে বিয়ে দিতে চাচ্ছেন। ঐদিন কোন এক মেয়ের কথা বললেন। বিয়ের ব্যাপারে তুমি কি কিছু ভাবছ?

'না, কিছু ভাবছি না।'

'তোমার পছন্দের কেউ কি আছে? থাকলে বলতে পার।'

শুভ্র হাসল। ইয়াজউদ্দিন সাহেব টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। মতি মিয়া অপেক্ষা করছিল — টি কোজি ঢাকা চায়ের পট নিয়ে ঢুকল। ইয়াজউদ্দিন সাহেব ডিনারের পর পর হালকা লিকারে এক কাপ চা খান। শুভ্র বাবার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। বাবার হাত ধোয়া হলে সে হাত ধুবে। শুভ্র বলল, 'তোমাকে একটা কথা বলা বোধহয় দরকার, বাবা, আমি স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে চাই। আমার টাকা-পয়সার দরকার নেই।'

'আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি না। তুমি কি এ বাড়িতে অস্বাভাবিক জীবনযাপন করছ?'

শুভ্র চুপ করে রইল। ইয়াজউদ্দিন তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, 'তোমার কি ভবিষ্যৎ কোনো পরিকল্পনা আছে?'

'হ্যাঁ আছে।'

'আমি কি জানতে পারি?'

'অন্য আরেকদিন বলব, বাবা।'

'আজ বলতে সমস্যা কী?'

'আজ তুমি আমার কথা মন দিয়ে শুনবে না। যে কোনো কারণেই হোক আজ তুমিও উত্তেজিত।'

'এস চা খাই।'

দুজন নিঃশব্দে চায়ের পেয়ালা হাতে বসল। ইয়াজউদ্দিন সাহেব কোনো একটা মজার কথা বলতে চাচ্ছেন। হালকা কোনো রসিকতা। এনেক্‌ডোটস। চায়ের টেবিলে এই কাজটা তিনি প্রায়ই করেন। আশ্চর্য! কোনো রসিকতা মনে পড়ছে না। তিনি আসলেই উত্তেজিত।

'মতি! মতি মিয়া!'

মতি এসে দাঁড়াল। মতিকে কি জন্যে ডেকেছেন ইয়াজউদ্দিন সাহেব মনে করতে পারলেন না।

'কটা বাজে মতি?'

মতি বিস্মিত হয়ে তাকাচ্ছে। প্রশ্নটা অর্থহীন। ইয়াজউদ্দিন সাহেবের হাতে ঘড়ি আছে, দেয়ালে ঘড়ি। এ বাড়ির এমন কোনো ঘর নেই যেখানে দেয়ালে ঘড়ি টিক টিক করছে না।

'স্যার, এগারটা বাজে।'

'আচ্ছা যাও।'

শুভ্র বলল, 'বাবা, তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে? তুমি ঘামছ।'

'শরীর খারাপ লাগছে না। গরম লাগছে। তুমি কি আমার সঙ্গে খানিকক্ষণ বারান্দায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বসবে?'

'অবশ্যই বসব।'

'অনেকদিন তোমার সঙ্গে কথা হয় না। আমি নিজে ব্যস্ত থাকি, তুমিও সম্ভবত ব্যস্ত থাক।'

'আমি তো ব্যস্ত থাকি না। আমার আসলে কিছুই করার নেই।'

'আমি শুনেছি সারাদিন তুমি বাসায় থাক না। কী কর?'

'রাস্তায় রাস্তায় ঘুরি, বাবা।'

'কেন?'

'কারণ নেই কোনো। এমনি।'

'কলাবাগানের এক বাসায় তুমি যাও। প্রায়ই যাও। কার বাসা?'

শুভ্র সহজ গলায় বলল, 'তুমি কী করে জানলে বাবা? 'ইয়াজউদ্দিন খানিকটা অস্বস্তির সঙ্গে বললেন, 'আমাকে খোঁজখবর রাখতে হয়। তুমি পৃথিবী সম্পর্কে অনভিজ্ঞ। যে কোনো সময় ঝামেলায় পড়তে পার। বাবা হিসেবে এইটুকু সাবধানতা নেয়া অন্যায় নয় নিশ্চয়ই।'

'ন্যায়-অন্যায়ের কথা বলছি না। আমার মজা লাগছে তাই জিজ্ঞেস করছি।'

'তুমি কোথায় যাও-না যাও সে সম্পর্কে একটা রিপোর্ট দেবার জন্যে আমি এক জনকে বলেছিলাম। সে রিপোর্ট দিয়েছে। পড়তে চাও?'

'না।'

'কলাবাগানে তুমি যে বাসায় যাও সেটা কার বাসা?'

'রিপোর্টে কি লেখা নেই?'

'লেখা আছে তবু তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই।'

'সাবেরের বাসা। সাবের কলেজে আমার সঙ্গে পড়ত। আইএ পাস করার পর মারা যায়। আমি ঐ বাসায় যাই সাবেরের বাবার সঙ্গে গল্প করার জন্যে। উনার নাম মাহিন। উনার সঙ্গে কথা বলতে আমার ভালো লাগে।'

'ভদ্রলোক কী করেন?'

'স্কুল মাস্টার ছিলেন। এখন অবসর নিয়েছেন। ঘরেই থাকেন।'

'শুভ্র, তুমি খোলাখুলি সবকিছু আমাকে বলছ না। ভদ্রলোক প্যারালিসিস হয়ে দীর্ঘদিন বিছানায় পড়ে আছেন। এই খবর আমার কাছে আছে।'

'এই তথ্যটা অপ্রয়োজনীয় বাবা।'

'কোনো তথ্যই অপ্রয়োজনীয় নয়। ঐ বাসায় মাহিন সাহেব ছাড়া আর কে থাকে?'

'তোমার রিপোর্টে কি লেখা নেই?'

'হ্যাঁ আছে। তারপরও তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই।'

শুভ্র বলল, 'তুমি বলছিলে বারান্দায় বসবে। চল বারান্দায় বসি। 'ইয়াজউদ্দিন সাহেব উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, 'মাহিন সাহেবের মেয়েটির প্রতি কি তোমার কোনো দুর্বলতা আছে? এই ব্যাপারটা আমি তোমার কাছ থেকে খোলাখুলি জানতে চাই।'

'আমি মাহিন সাহেবের সঙ্গে গল্প করার জন্যেই যাই। নীতু আপার সঙ্গে আমার কথাবার্তা হয় না বললেই চলে।'

'তুমি মেয়েটিকে আপা ডাক?'

'হ্যাঁ। উনি সাবেরের তিন বছরের বড়।'

তারা দুজন বারান্দায় এসে বসল। শুভ্র বলল, 'তুমি কি আর কিছু বলবে, বাবা?'

'হ্যাঁ, বলব। তুমি বছরখানিকের জন্যে দেশের বাইরে থেকে ঘুরে আস। তোমাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক বছরের ছুটি দেয়া হল। ফিরে এসে আমার সব দায়দায়িত্ব তুমি নেবে। একা একা ঘুরে বেড়ানোর মতো অবস্থা তোমার না। আমার ধারণা, তুমি একা একা চিটাগাং থেকে ঢাকাও যেতে পারবে না। কাজেই তোমাকে এক জন সফরসঙ্গী দেবার ব্যবস্থা করব। বিয়ে করে বউ নিয়ে যাবে।'

'মেয়েও কি তুমি ঠিক করে রেখেছ?'

'না, এখনো ফাইন্যাল করি নি। তবে দু-একজন যে নেই তাও না। আমি আগেও বলেছি, এখনো বলছি — তোমার নিজের কোনো পছন্দের মেয়ে থাকলে বলতে পার। তোমার মতামত গুরুত্বের সঙ্গেই বিবেচনা করা হবে। রাত অনেক হয়েছে। যাও, শুয়ে পড়। আমার নিজেরও ঘুম পাচ্ছে।'

ইয়াজউদ্দিন সাহেব উঠে পড়লেন। তিনি অবশ্যি সরাসরি তাঁর শোবার ঘরে ঢুকলেন না। শোবার ঘরের লাগোয়া স্টাডি রুমে ঢুকলেন। নিয়মের ব্যতিক্রম হওয়ায় ঘুম চলে গেছে। সময়মতো ঘুমাতে না গেলে তাঁর বড় ধরনের সমস্যা হয়। ঘুম ঘুম ভাব থাকে। কিন্তু ঘুম আসে না। ঘুম ঘুম ভাব নিয়ে বিছানায় শুয়ে থাকার কোনো মানে হয় না। তিনি শুভ্রর উপর তৈরি করা রিপোর্ট নিয়ে বসলেন। যাকে রিপোর্ট তৈরি করতে দিয়েছিলেন তাকে মনে মনে কয়েকবার 'গাধা' বলে গালি দিলেন। তাঁর মনে হল রিপোর্টের কিছু কিছু জায়গা বানানো। রিপোর্টের শুরুতেই লেখা — শুভ্র সাহেব বাড়ি থেকে বের হয়েই এক প্যাকেট সিগারেট কিনলেন।

শুভ্র তা করবে না। সে সিগারেট খায় না। অবশ্যি হতে পারে যে অন্য কারো জন্যে কিনেছে। মাহিন নামের ঐ ভদ্রলোকের জন্যে?

রেহানা স্টাডি রুমে ঢুকলেন। অবাক হয়ে বললেন, 'এত রাতে এখানে বসে আছ কেন? ঘুমাবে না?'

'ঘুমাব।'

'এস শুয়ে পড়ি। আমার নিজের শরীরও ভালো না। জ্বর এসেছে বলে মনে হয়।'

ইয়াজউদ্দিন সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। ক্লান্ত গলায় বললেন, 'আচ্ছা, শুভ্র কি সিগারেট খায়?'

'না।'

'তুমি নিশ্চিত যে খায় না?'

রেহানা হাসিমুখে বললেন, 'ও কী করে না করে আমি জানব না?'

ইয়াজউদ্দিন বিরক্ত গলায় বললেন, 'না, ও কী করে না করে তুমি জান না।'

৪

গলির ভেতর গাড়ি ঢোকে না।

শুভ্র গাড়ি রেখে হেঁটে হেঁটে জাহেদের বাসার সামনে এল। জাহেদের বাসায় কোনো কলিংবেল নেই। অনেকক্ষণ দরজার কড়া নাড়তে হয়। আজ কড়া নাড়তে হল না। বাড়ির বারান্দায় কাঠের চেয়ারে জাহেদ বসে আছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে তার উপর দিয়ে একটা ঝড় বয়ে গেছে। সে এখনো ঝড় কাটিয়ে উঠতে পারে নি।

ঝড়ের সূত্রপাত হয় গত রাতে। বিয়ের পর রাত এগারটার দিকে কেয়াকে নিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছোটমামার বাড়িতে এসে উঠল। তার আশা ছিল — নতুন বউ, কেউ কিছু বলবে না। নিতান্ত হৃদয়হীন মানুষও নতুন বউয়ের সামনে হৃদয়হীনতা দেখাবে না। তাছাড়া মিজান সাহেব হৃদয়হীন নন। হৃদয়হীন হলে দীর্ঘদিন জাহেদকে পুষতেন না।

কেয়াকে গাড়ি থেকে নামানোর পর মিজান সাহেব যে কাজটা করলেন, তাকে কোনো রকম নিয়মের মধ্যে ফেলা যায় না। তিনি শীতল গলায় বললেন, 'জাহেদ, তোকে বউ নিয়ে এ বাড়িতে উঠতে নিষেধ করেছিলাম। তুই কি মনে করে উঠলি?

জাহেদ বলল, 'কাল চলে যাব, মামা।'

'কালের কথা তো হয় নি। তুই এখন যাবি। এই মুহূর্তে যাবি।'

মনোয়ারা বললেন, 'আচ্ছা, তুমি চুপ কর তো। ও বউ নিয়ে ঘরে বসুক।'

মিজান সাহেব স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'শাট আপ। কোনো কথা বললে খুন করে ফেলব। জাহেদ, তুই এক্ষুনি বউ নিয়ে বিদেয় হ। এক্ষুনি।'

তিনি তাকাচ্ছেন অদ্ভুত ভঙ্গিতে। তাঁর চোখ লাল, ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে। তিনি থ করে একদলা থুতুও ফেললেন।

জাহেদ বলল, 'গাড়ি চলে গেছে মামা। রাতও অনেক হয়েছে। বারটার মতো বাজে।'

মিজান সাহেব হুংকার দিয়ে বললেন, 'গাড়ি ছাড়া তুই নড়তে পারিস না। কবে থেকে নবাব হয়েছিস? নবাবি কবে থেকে শিখেছিস? গাড়ি না থাকে রিকশায় যাবি। রিকশা না থাকলে হেঁটে যাবি। হারামজাদা কোথাকার!

মনোয়ারা কাঁদো-কাঁদো গলায় বললেন, 'কী হয়েছে তোমার! এরকম করছ কেন? ঘরে এসে বস তো। তিনি এসে স্বামীর হাত ধরলেন।'

মিজান সাহেব ঝটকা মেরে হাত সরিয়ে দিলেন। হুংকার দিয়ে বললেন — 'চুপ কর্ মাগী। তুই কোনো কথা বলবি না। আমি তোর সাথে বাহাস করছি না।'

জাহেদ পুরোপুরি হকচকিয়ে গেল। কেয়া অবাক হয়ে তাকাচ্ছে। তার ভয় ভয় করছে। এ কী ভয়ংকর অবস্থা! জাহেদ বলল, 'কেয়া, তুমি এখানে দাঁড়াও, আমি একটা বেবিট্যাক্সি নিয়ে আসি।'

মিজান সাহেব সহজ গলায় বললেন, 'দাঁড়িয়ে থাকবে কেন? একটা চেয়ার এনে দে, বসুক। তুই গিয়ে বেবিট্যাক্সি নিয়ে আয়।'

কেয়া বারান্দায় কাঠের চেয়ারে জড়োসড়ো হয়ে বসে রইল। জাহেদ গেল বেবিট্যাক্সি আনতে। এই অবস্থা হবে জানলে শুভ্রর মাইক্রোবাসটা রেখে দিত। কেয়াকে নিয়ে সে এত রাতে যাবে কোথায় বুঝতে পারছে না। কোনো একটা হোটেলে নিয়ে তুলবে? তুললেও মোটামুটি ভালো হোটেলে তুলতে হবে। ভালো হোটেলগুলো কোথায়? ভাড়াই বা কত?

আপার বাসায় যাওয়া যাবে না। আপা বিয়েতে আসে নি। জাহেদ শুভ্রর মাইক্রোবাস নিয়ে তাদের আনতে গিয়েছিল — সে চোখ-মুখ লাল করে বলেছে, 'তুই আমাকে নিতে এসেছিস? তোর এত বড় সাহস? তুই তোর দুলাভাইকে বলে গেছিস — আমি তোর গলার হার চুরি করেছি। তারপরেও আমাকে নিতে এসেছিস।'

জাহেদ বলল, 'আমি তো এমন কথা কখনো বলি নি, আপা?'

'তাহলে তোর দুলাভাই মিথ্যা কথা বলছে? আমি হলাম চোর, আর তোর দুলাভাই মিথ্যাবাদী? বের হ বাড়ি থেকে। বের হ বললাম।'

বেবিট্যাক্সিতে উঠার সময় কেয়া বলল, 'কোথায় যাবে কিছু ঠিক করেছ?' জাহেদ অস্পষ্ট একটা শব্দ করল। কেয়া ক্লান্ত গলায় বলল, 'আমাকে বড় আপার বাসাতেই রেখে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এস। পরে একটা কোনো ব্যবস্থা হবে। প্রচণ্ড মাথা ধরেছে।'

জাহেদ বলল, 'আচ্ছা।'

জাহেদ জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে। কেয়া হাত বাড়িয়ে জাহেদের হাত ধরল। কোনো কথা বলল না। জাহেদ বলল, 'কেয়া, আমি খুব লজ্জিত।'

কেয়া বলল, 'তোমার মামা কি অসুস্থ?'

জাহেদ বলল, 'না। মামা খুবই সুস্থ। আজ এরকম কেন করলেন কিচ্ছু বুঝতে পারছি না।'

'আমার মনে হয় তোমার মামা অসুস্থ। তাঁকে ভেতরে নিয়ে মাথায় পানি ঢালছিল।'

'তুমি সারাক্ষণ বাইরেই বসেছিলে?'

'হুঁ। একবার ভেবেছিলাম ভেতরে যাব। তারপর মনে হল, আমাকে দেখে রেগে যান কিনা। তুমি এক কাজ কর — আমাকে রেখে বাসায় চলে এস। তোমার মামার কী অবস্থা দেখ। হয়তো তাঁকে ডাক্তারের কাছে নিতে হবে।'

জাহেদ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। কেয়া বলল, 'ইচ্ছা করলেও আমি আপার বাসায় তোমাকে রাখতে পারব না। বাসায় ফিরে আপাকে কী বলব তাই বুঝতে পারছি না। কী বলা যায় বল তো?'

জাহেদ কিছু বলল না। অসংখ্য কথা সে জমা করে রেখেছিল আজ রাতে বলার জন্যে। কোনো কথাই এখন মনে পড়ছে না। মনে পড়লেও বলা সম্ভব না। কেয়া বলল, 'তুমি মন খারাপ কোরো না। আমাদের জীবনের শুরুটা খারাপ হয়েছে — শেষটা ভালো হবে। আমার মন বলছে ভালো হবে।'

ফ্ল্যাটবাড়ির কলাপসিবল গেট লাগিয়ে ফেলেছে। অনেক ডাকাডাকির পর গেট খোলা হল। কেয়া বলল, 'তোমার উপরে আসার দরকার নেই। তুমি এই বেবিট্যাক্সি নিয়েই বাসায় চলে যাও। কেয়া অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে। বিয়ের শাড়িতে তাকে যে কী অপূর্ব লাগছে তা কি সে জানে?'

AMARBOI.COM

বাসায় ফিরে জাহেদ দেখে সবকিছুই স্বাভাবিক। মামা ভেতরের বারান্দায় বসে চা খাচ্ছেন। মামার দুই মেয়ের ছোটটি ঘুমিয়ে পড়েছে। বড়টি বাবার পাশে বসে আছে। মিজান সাহেব বললেন, 'জাহেদ, চা খাবি?'

জাহেদ বলল, 'না।'

'বউমাকে কোথায় রেখে এসেছিস? তার বোনের বাড়ি?'

'হুঁ।'

'ভালো হয়েছে। তুই হাত-মুখ ধুয়ে শুয়ে পড়। বিয়েবাড়ির ধকল গেল। টায়ার্ড হয়েছিস নিশ্চয়ই। টায়ার্ড হবারই কথা। বরং এক কাজ কর — চা খা। চা খেয়ে তারপর ঘুমাতে যা। চা খেলে শরীরের টায়ার্ড ভাবটা কমবে। আমি চা খাওয়া কখন ধরি জানিস? — বিয়ের রাতে। এর আগে কোনোদিন চা খাই নি ..... হা-হা-হা।'

জাহেদ বলল, 'মামা, তোমার শরীর কি খারাপ?'

'না, শরীর ঠিক আছে। মাঝে মাঝে নিশ্বাসের কিছু কষ্ট হয়। আজ হচ্ছে না। ভালো আছি। বেশ ভালো আছি। তুই তাহলে শুয়ে পড়। আমি ঘুমাতে যাই।'

রাত দুটার দিকে জাহেদ ক্যাম্পাখাটে ঘুমাতে এল। সে নিশ্চিত, আজ রাতে তার ঘুম আসবে না। কিন্তু বিছানায় শোয়ামাত্র ঘুমে চোখ জড়িয়ে গেল। সে সকাল নটা পর্যন্ত ঘুমাল। ঘুম ভেঙে দেখে মামা বারান্দায় বেশ আয়োজন করে দাড়ি শেভ করতে বসেছেন। বাটিতে গরম পানি, সামনে আয়না। তিনি জাহেদের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বললেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তোর ঘুম ভাঙল?'

'হুঁ।'

'তুই পুরো সাত ঘণ্টা ঘুমিয়েছিস। ঘুমাতে গেছিস রাত দুটায়। এখন বাজে নটা। কাঁটায় কাঁটায় সাত ঘণ্টা। মানুষের ঘুম দরকার ছ ঘণ্টা। তুই এক ঘণ্টা এক্সট্রা ঘুমিয়েছিস।'

জাহেদ বলল, 'তুমি আজ অফিসে যাবে না, মামা? আটটার সময়ই তো অফিসে চলে যাও।'

মিজান সাহেব শরীর দুলিয়ে হাসলেন। যেন জাহেদ খুব হাসির কথা বলছে।

'রাতে তোর ঘুম কেমন হয়েছে?'

'ভালো।'

'আমার ঘুম ভালো হয় নি। বুঝলি — যখনি ঘুম আসে তখনি তোর মামি বলে, আস তোমার মাথায় একটু পানি ঢেলে দেই। তার ধারণা হয়েছে, আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কাল রাতে বউমার সামনে হৈচৈ করলাম — তোর মামিকে মাগী-ছাগী ডাকলাম — সেই থেকে ভেবে বসে আছে, আমার মাথা খারাপ। পানি ঢাললে যদি মাথা ঠিক হত তা হলে কি দেশে এত পাগল থাকত? পানি ঢেলে সব পাগল ঠিক করে ফেলা যেত। আমার মাথা ঠিকই আছে। গত রাতে হৈচৈ আমি ইচ্ছা করে করেছি এবং আমি ঠিকই করেছি। হৈচৈ না করলে বউ নিয়ে তুই স্থায়ী হয়ে যেতি। আর হৈচৈ যে করব সেটা তো আগেই বলে দিয়েছি। বলি নি আগে?

জাহেদ চুপ করে রইল। রান্নাঘর থেকে মামির কান্নার শব্দ আসছে। বড় মেয়েটা মাঝে মাঝে বারান্দায় এসে বাবাকে উঁকি দিয়ে দেখে চট করে সরে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে সে খুব ভয় পেয়েছে। মামার মাথা সত্যি সত্যি খারাপ হয়ে গেছে কিনা জাহেদ বুঝতে পারছে না। কথা বেশি বলছেন। ক্রমাগতই কথা বলছেন। ক্রমাগত কথা বলা কি পাগলের লক্ষণ? হতে পারে।

মিজান সাহেব দাড়ি শেভ করে টিফিন বক্সে খাবার নিয়ে অফিসে রওনা হয়ে গেলেন। স্বাভাবিক মানুষ। মোড়ের দোকান থেকে একটা সিগারেট কিনলেন, পান কিনলেন। একটার দিকে অফিসের দুজন সহকর্মী তাঁকে বাসায় নিয়ে এলেন। তাঁরা বিব্রত ভঙ্গিতে বললেন, 'উনার শরীরটা বোধহয় আজ ভালো না। কয়েকদিন বিশ্রাম করা দরকার।' জাহেদ বলল, 'কী হয়েছে?' তাঁরা বললেন, 'তেমন কিছু না। একটু মাথা গরমের মতো হয়েছে; কয়েকটা জরুরি ফাইল ছিঁড়ে ফেলেছেন। আমরা ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম। ঘুমের ওষুধ দিয়েছে। ওষুধ খাইয়ে দিয়েছি। ভালো ঘুম হলে সব ঠিক হয়ে যাবে। বিছানায় শুইয়ে রাখুন। ঘুমিয়ে পড়বেন। বেবিট্যাক্সিতেও ঘুমাচ্ছিলেন।'

মিজান সাহেব তখন থেকেই ঘুমাচ্ছেন। মনোয়ারা কাঁদতে কাঁদতে চোখ ফুলিয়ে ফেলেছেন। মেয়েরা এখনো কিছু জানে না। তারা স্কুলে। জাহেদ বারান্দায় কাঠের চেয়ারে চুপচাপ বসে আছে। কেয়ার খোঁজে একবার যাওয়া উচিত, তাও যায় নি। শুভ্রকে আসতে দেখে সে উঠে দাঁড়াল। শুভ্র বলল, 'তোর কী হয়েছে? এমন লাগছে কেন?'

জাহেদ বলল, 'মনটা খুব খারাপ। মামার শরীর ভালো না।'

'কী হয়েছে?'

'বুঝতে পারছি না কী হয়েছে।'

শুভ্র ইতস্তত করে বলল, 'তোর বিয়েতে আসতে পারি নি। কিছু মনে করিস নি তো? চশমা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। বিয়ের অনুষ্ঠান কেমন হয়েছে?'

'অনুষ্ঠান আবার কী? আমি তিনবার কবুল কবুল বললাম। কেয়া তিনবার বলল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যস। মামলা ডিসমিস। চা খাবি শুভ্র?'

'খাব।'

'বাসায় চা খাওয়ানোর কোনো উপায় নেই। মামি সিরিয়াস কান্নাকাটি করছে। চল্, মোড়ের দোকানটায় চা খাব।'

শুভ্র জাহেদের পেছনে পেছনে যাচ্ছে। বিয়েতে সে উপস্থিত হতে না পারায় জাহেদ যে রাগ করে নি তাতেই শুভ্র আনন্দিত।

'জাহেদ!'

'হুঁ?'

'কেয়া কোথায়? কেয়ার সঙ্গে একটু দেখা করব ভেবেছিলাম।'

'ও তার বোনের বাসায়। এখানে এত যন্ত্রণা, এর মধ্যে আর তাকে আনি নি।'

'তোর মামার অসুখটা কী?'

'এখনো ঠিক জানি না। মাথা গরম হয়ে গেছে। অফিসের ফাইল-টাইল ছিঁড়ে ফেলেছে। দুঃখ-ধান্দার মধ্যে থাকলে যা হয়। বাড়ি ভাড়া দেয়া হয় নি ছমাসের। প্রভিডেন্ট ফান্ডে এক পয়সা নেই। লোন নিয়ে নিয়ে সব শেষ। এক লোকের কাছ থেকে মামা দশ হাজার টাকা ধার করেছিলেন। সেই লোক দু-তিন দিন পর পর বাসায় এসে বসে থাকে। তাকে দেখলেই মামার চেহারা অন্যরকম হয়ে যায়। সব মিলিয়ে ভয়াবহ অবস্থা। তুই বুঝবি না। আয়, চা খাব।'

'কেয়া তার বোনের বাসায় কদিন থাকবে?'

'থাকবে কিছুদিন। এদিকের ঝামেলা না সামলে তো আনতেও পারছি না?'

'কেয়ার বোনের বাসার ঠিকানাটা আমাকে দিবি?'

'কেন?'

'তোদের বিয়েতে আমি একটা উপহার দেব। সামান্য উপহার। তবে কেয়ার খুব পছন্দ হবে। কাজেই তাকে দিতে চাই।'

'উপহারটা কী?'

'তোকে বলব না। তুই আমাকে একটা কাগজে ঠিকানাটা লিখে দে।'

'এখন যাবি?'

'না, এখন যাব না। এখন যাব মাহিন সাহেবের কাছে। সাবেরের বাবা মাহিন সাহেব। আমি প্রায়ই উনার কাছে যাই।'

জাহেদ চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বলল, 'জানি। তুই মোটামুটি একটা স্ট্রেঞ্জ চরিত্র। আরেক কাপ চা খাবি, শুভ্র ? চা-টা ভালো হয়েছে। খা আরেক কাপ। বলব দিতে?'

'বল।'

'তোর মাইক্রোবাসের ড্রাইভারকে ঐদিন কোনো বখশিশ-টখশিশ দেই নি। দেয়া উচিত ছিল। বেচারা নিশ্চয়ই একসপেক্ট করেছে। টাকাই নেই, বখশিশ কী দেব! খেতে বললাম। খেল না। বড়লোকের ড্রাইভার গরিবের বাড়িতে বোধহয় খায়ও না। বেশি জোরাজুরি করতেও সাহস হল না।'

শুভ্র কিছু বলল না। সে নিঃশব্দে চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছে। সে জাহেদের জন্যে দুহাজার টাকা নিয়ে এসেছে। কীভাবে তাকে দেবে বুঝতে পারছে না। তার লজ্জা লজ্জা লাগছে। জাহেদ আবার যদি কিছু মনে করে! শুভ্র শেষ পর্যন্ত টাকা না দিয়েই চলে এল। জাহেদ তাকে এগিয়ে দিতে গাড়ি পর্যন্ত এল এবং এক সময় বলল, 'তুই যে কত ভালো একটা ছেলে তা কি জানিস ?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫

এ বাড়ির কলিংবেলটা নষ্ট। টিপলে কোনো শব্দ হয় না। মাঝে মাঝে শক করে। শুভ্র কলিংবেল টিপেই বড় রকমের ঝাঁকুনি খেল। কলিংবেলে কোনো শব্দ হল না, কিন্তু ভেতর থেকে মাহিন সাহেবের গলা শোনা গেল। তিনি উল্লসিত স্বরে বললেন, 'শুভ্র এসেছে। দরজা খুলে দে।'

নীতু বাবাকে সকালের নাশতা খাইয়ে দিচ্ছে। পাতলা খিচুড়ি। চামচে করে মুখে তুলে দিতে হচ্ছে। মাহিন সাহেব দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসেছেন। নটা বেজে গেছে। বাবাকে নাশতা খাইয়ে নীতু অফিসে যাবে। এইসময় বাসে উঠাই এক সমস্যা। আজো হয়তো অফিসে দেরি হবে। বাবা দ্রুত নাশতা খাচ্ছেন না। এক এক চামচ মুখে নিয়ে অনেক দেরি করছেন। খিচুড়ি খাওয়ানো হলে চা খাওয়াতে হবে। চা খেতে কতক্ষণ লাগবে কে জানে। তাড়াহুড়া করা যাবে না। তাড়াহুড়া করলেই বাবা বলবেন — 'তোর দেরি হয়ে যাচ্ছে রে নীতু। তুই চলে যা। চা আজ আর খাব না।'

মাহিন সাহেব বললেন, 'শুভ্র দাঁড়িয়ে আছে, দরজা খুলে দে।'

'শুভ্র তুমি বুঝলে কী করে?'

'আমার স্মেলিং সেন্স খুব ডেভেলপ করেছে। আমি ওর গায়ের গন্ধ পাচ্ছি। চোখ যত নষ্ট হচ্ছে ঘ্রাণশক্তি তত বাড়ছে।'

'তোমার চোখ মোটেই নষ্ট হচ্ছে না। সব সময় আজেবাজে চিন্তা করবে না। নাও, হাঁ কর।'

'দরজা খুলে দিয়ে আয়।'

'কেউ আসে নি, বাবা। এলে দরজার কড়া নাড়ত।'

দরজার কড়া নড়ল। নীতু বিরক্তমুখে খিচুড়ির বাটি নামিয়ে দরজা খুলতে গেল। মাহিন সাহেব বললেন, 'আমার নাশতা খাওয়া হয়ে গেছে। তুই অফিসে চলে যা। চা আজ আর খাব না। আমার চা-টা বরং শুভ্রকে দে।'

নীতু দরজা খুলল। শুভ্র দাঁড়িয়ে আছে। নীতু শুকনো গলায় বলল, 'এস শুভ্র। আজ তুমি কতক্ষণ থাকবে?'

'কেন বলুন তো?'

'বেশিক্ষণ না থাকাই ভালো। বাবার শরীর ভালো না। তুমি যতক্ষণ থাকবে বাবা কথা বলতে থাকবেন। উনার দু রাত ঘুম হয় নি। ঘুম দরকার।'

'আমি বেশিক্ষণ থাকব না।'

'কিছু মনে করলে না তো?'

'না।'

'তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথাও আছে। তুমি কি আমার অফিসে একবার আসতে পারবে?'

'পারব। কবে আসব?'

'আজই আস না। বাবার সঙ্গে কথা শেষ করে চলে এস।'

'আচ্ছা।'

শুভ্র মাহিন সাহেবের শোবার ঘরে ঢুকল। ঠিক ঘর না, এটা এ বাড়ির স্টোর রুম। মাহিন সাহেব অসুস্থ হবার পর এই ঘর থাকার জন্যে বেছে নিয়েছেন। কোনো মতে একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খাট এ ঘরে পাতা হয়েছে। আর কোনো আসবাব রাখার জায়গা নেই। ঘরে একটি টেবিল ফ্যান আছে। সেই ফ্যান মাথার কাছে খাটের উপর বসানো। ঘরে জানালা নেই। ভেন্টিলেটরটা সাধারণ ভেন্টিলেটরের চেয়ে বড় বলে কিছু আলো-বাতাস ঢোকে।

মাহিন সাহেব দরাজ গলায় বললেন, 'কেমন আছ শুভ্র?'

'ভালো আছি।'

'আরাম করে পা তুলে বস। চাদর পরিষ্কার আছে। নীতু আজই চাদর বদলেছে। আমি জানতাম তুমি আসবে। তাই চাদর বদলাতে বললাম।'

শুভ্র পা তুলে বসল। নীতু চা নিয়ে ঢুকল। শুভ্রর সামনে রাখতে রাখতে বলল, 'তুমি যাবার সময় বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে যাবে। কয়েকদিন অফিসে যাবার সময় বাসায় তালা দিয়ে যেতে হচ্ছে। বাসায় বাবা ছাড়া কেউ নেই। বাড়িওয়ালার কাছে একটা চাবি আছে। তিনি একবার এসে খোঁজ নিয়ে যান। তালা আমাদের বসার ঘরে টেবিলের উপর আছে। শুভ্র, পরে তোমার সঙ্গে দেখা হবে।'

'জ্বি আচ্ছা।'

মাহিন সাহেব উজ্জ্বল চোখে তাকিয়ে আছেন। তাঁর মাথাভর্তি ধবধবে সাদা চুল। দুসপ্তাহ শেভ করা হচ্ছে না বলে মুখে খোঁচা খোঁচা সাদা দাড়ি। গায়ের চাদরও সাদা রঙের বলে তাঁকে ঋষি ঋষি দেখাচ্ছে।

'চায়ে চিনি হয়েছে শুভ্র?'

'হয়েছে। আপনার শরীর আজ কেমন?'

'অসম্ভব ভালো।'

'রাতে নাকি ঘুম হয় নি?'

'রাতে আমার কখনো ঘুম হয় না। এরা জানে না। এই বয়সে ঘুম না হওয়া কোনো বড় ব্যাপার না। শোন শুভ্র, তোমার সঙ্গে আমি এখন খুব জরুরি বিষয় নিয়ে কথা বলব। খুব জরুরি। আমি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সিদ্ধান্ত তোমাকে জানাব। খুব মন দিয়ে শোন।'

'আপনার সব কথাই আমি মন দিয়ে শুনি।'

'একমাত্র তুমিই শোন। আর কেউ শোনে না। দেখ শুভ্র, আমি সংসারে উপদ্রবের মতো আছি। পক্ষাঘাত সারার কোনো সম্ভাবনা নেই। অবস্থা দিন দিন খারাপ হচ্ছে। আগে বাঁ হাতটা নাড়াতে পারতাম, এখন তাও পারি না। শরীর অসুস্থ হলে মনও অসুস্থ হয়। আমার মনও এখন অসুস্থ। রাত-দিন চেঁচামেচি করি। আমার চেঁচামেচিতে অতিষ্ঠ হয়ে আমার স্ত্রী এক সপ্তাহ ধরে তাঁর ভাইয়ের বাসায় আছেন। কাজের মেয়ে ছিল। সে পালিয়েছে তিন দিন আগে। তুমি কি আমার কথা মন দিয়ে শুনছ।'

'শুনছি।'

'আমি এদের ঘাড়ে ভূতের মতো চেপে আছি। সিন্দাবাদের ভূত। এরা আমাকে কী করে ঘাড় থেকে নামাবে বুঝতে পারছে না।'

'এরা আপনাকে ঘাড় থেকে নামাতে চাচ্ছে এরকম মনে করছেন কেন?'

'মনে করাই তো স্বাভাবিক। নীতু বিয়ে করতে পারছে না আমার জন্যে। একটা ছেলের সঙ্গে তার ভাব-টাব হয়েছে বলে মনে হয়। ওদের অফিসেই কাজ করে। কয়েকবার এ বাড়িতে এসেছে। কখনো আমার সঙ্গে দেখা করে নি। নীতুর সঙ্গে গল্প করে চা-টা খেয়ে চলে গেছে। আমি যতদিন বেঁচে আছি নীতু বিয়ের ব্যাপারে চিন্তা করতে পারবে না। এটা হল বাস্তব কথা। আমি ওদের মুক্তি দিতে চাই। বুঝলে শুভ্র? চির মুক্তি!'

'কীভাবে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সেটা নিয়েই ভাবছি। আত্মহত্যা সহজ পথ, তবে খুবই নিম্নমানের পথ। আত্মহত্যা খুনের চেয়েও খারাপ। খুন করার পর অনুশোচনার একটা সুযোগ থাকে। আত্মহত্যার পর সেই সুযোগও থাকে না।'

'আপনি কি আত্মহত্যার কথা ভাবছেন?'

'এখনো ভাবছি না। অন্য আর কী পথ আছে খুঁজে বেড়াচ্ছি। পাচ্ছি না। আমি হয়েছি পরাশ্রয়ী। নিজে নিজে খেতে পারি না। অন্যকে খাইয়ে দিতে হয়। আমার কোনো উপার্জন নেই। বেঁচে থাকার জন্যে মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে হচ্ছে। আমার স্বাভাবিক মৃত্যু হলে সবদিক রক্ষা হত। চট করে তা হবে বলে মনে হয় না। আমার মানসিক শক্তি এখনো প্রবল। আমার মনে হচ্ছে, স্বাভাবিক মৃত্যুর জন্য আমাকে আরো সাত-আট বছর অপেক্ষা করতে হবে। সাত-আট বছর নীতু আমার জন্যে অপেক্ষা করবে — এটা উচিত না।'

শুভ্র বলল, 'আপনার জন্যে সিগারেট এনেছি। ধরিয়ে দেব?'

'দাও।'

শুভ্র সিগারেট ধরিয়ে মাহিন সাহেবের ঠোঁটে গুঁজে দিল। তিনি ধোঁয়া ছেড়ে তৃপ্তির গলায় বললেন, 'বেঁচে থাকতে আমার এখনো ইচ্ছা করে। এই যে ধোঁয়ার সঙ্গে নিকোটিন নিচ্ছি — শরীর আরাম পাচ্ছে। তোমার সঙ্গে কথা বলছি তাতেও আনন্দ পাচ্ছি। আনন্দের ব্যাপার এখনো আছে তবে তাকে প্রশ্রয় দেয়া ঠিক হবে কিনা সেটাই বিচার্য। সমস্ত জীবজগতের একটা সহজ নিয়ম আছে। অসুস্থ, দুর্বল, অক্ষম কাউকে জীবজগৎ সহ্য করে না। সাধারণত তাকে মেরে ফেলে কিংবা এমন ব্যবস্থা করে যেন মৃত্যু ত্বরান্বিত হয়। একটা কাক অসুস্থ হলে অন্য কাকরা কি করে জান?'

'না।'

'তাকে ঠুকরে ঠুকরে মেরে ফেলে। অসুস্থ কাক কোনো প্রতিবাদ করে না। চুপ করে বসে থাকে।'

'আপনি তো কাক না। আপনি মানুষ।'

'মানুষ হলেও আমি সমগ্র জীবজগতেরই একটা অংশ। জীবজগতের সবার জন্যে যা সত্যি — তা আমার জন্যেও সত্যি।'

'চাচা, আমার মনে হয় কোনো কারণে আপনার মন-টন খারাপ বলে এ জাতীয় চিন্তাভাবনা করছেন।'

'সহজে আমার মন খারাপ হয় না। তবে এখন হচ্ছে। তুচ্ছ বিষয় নিয়ে রেগে যাচ্ছি। এগারই সেপ্টেম্বর দিন সাবেরের মৃত্যুদিন। এরা দেখি এই দিনটার কথা ভুলে গেছে। কারোর মনেই নেই কী অসম্ভব যন্ত্রণা নিয়ে ছেলেটা আমার কোলে মারা গেল!'

'অনেক দিনের ব্যাপার চাচা।'

'হ্যাঁ, অনেক দিনের ব্যাপার। ভুলে যাওয়াই স্বাভাবিক। মানুষ বিস্মৃতিপরায়ণ। ভুলে যাবার মধ্যেও সে আনন্দ পায়। কিন্তু তুমি তো ভুল নি শুভ্র। তুমি তো ঠিকই উপস্থিত হয়েছ। হও নি? আজ কত তারিখ শুভ্র — এগারই সেপ্টেম্বর না?'

শুভ্র খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে নরম গলায় বলল, 'ও আমার খুব ভালো বন্ধু ছিল। ওর কথা আমার প্রায়ই মনে হয়।'

'ও ছিল তোমার বন্ধু। কিন্তু সে ছিল এ পরিবারের এক জন। এরা কেন তাকে ভুলে যাবে!'

'ভুলবে কেন। কেউ ভোলে নি।'

'সান্ত্বনা দেয়া কথা আমার ভালো লাগে না। তুমি সান্ত্বনার কথা আমাকে বলবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার এই ছেলেটির কথা কারো মনে নেই। মনে থাকলে এরা বুঝত কেন এই স্টোররুমে আমি থাকি। এদের ধারণা, আমি এখানে থাকি সবাইকে যন্ত্রণা দেয়ার জন্যে। কেউ বুঝতে চেষ্টা করে না — এটা আমার ছেলের ঘর। সে এখানে থাকত। ফ্যান নেই, আলো-বাতাস নেই — ছোট্ট একটা ঘরে শুয়ে স্বপ্ন দেখত। তুমি মাঝে মাঝে আমার কাছে আস — আমার কী যে লাগে! আমি আমার ছেলের ছায়া তোমার মধ্যে দেখি। ছেলেটা মরার সময় তুমি ছিলে না। ওর যন্ত্রণা যখন খুব তীব্র হত তখন সে আমাকে বলত, বাবা, শুভ্র যদি আসে ওকে ঘরে ঢুকতে দিও না। ও মানুষের কষ্ট সহ্য করতে পারে না। ও আমাকে দেখে কষ্ট পাবে।'

মাহিন সাহেবের চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগল। শুভ্র অন্যদিকে তাকিয়ে রইল। মাহিন সাহেব বললেন, 'আজ তুমি যাও। দরজায় তালা দিয়ে যাও।'

'আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে দেব?'

'দাও।'

শুভ্র আরেকটি সিগারেট ধরিয়ে মাহিন সাহেবের ঠোঁটে গুঁজে দিল।

'চাচা যাই?'

'আচ্ছা যাও। মে গড বি অলওয়েজ উইথ ইউ।'

নীতু মাথা নিচু করে টাইপ করে যাচ্ছে। সেকশনাল ইনচার্জ পরিমলবাবু একগাদা কাগজ ধরিয়ে দিয়ে বলেছেন, 'লাঞ্চের আগে শেষ করতে পারবেন না?' নীতু হতাশ চোখে কাগজগুলোর দিকে তাকিয়েছে। লাঞ্চের আগে শেষ করার প্রশ্নই ওঠে না। মুখের উপর না বলাও সম্ভব না।

'একটু স্পিডে টাইপ করে যান। মন লাগিয়ে স্পিডে করলে লাঞ্চের আগেই পারবেন। তিনটা করে কপি করবেন।'

নীতু কথা বলে সময় নষ্ট করল না। টাইপ শুরু করল। তার স্পিড ভালো। কিন্তু আজ স্পিড উঠছে না। শুভ্র চলে আসতে পারে। আজ না এলে ভালো হত। যদি আসে সে কী করবে! চলে যেতে বলবে? অন্য এক দিন আসতে বলবে? শুভ্রর সঙ্গে কথা বলা দরকার।

এক ঘণ্টা নীতু সমান তালে টাইপ করে গেল। মুহূর্তের জন্যেও থামল না। এখনো একগাদা কাগজ সামনে। পাঁচজন টাইপিস্ট আছে। কাগজগুলো সবার মধ্যে ভাগ করে দেয়া যেত ....

'নীতু আপা!'

নীতু মুখ তুলে তাকাল। ছোট নিশ্বাস ফেলে বলল, 'তুমি এসেছ?'

'জ্বি।'

'চল, ক্যান্টিনে গিয়ে বসি।'

নীতু উঠে দাঁড়াল। পাশের টেবিলের ইদরিস সাহেবকে বলে গেল সে ক্যান্টিনে গেছে, কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরবে।

'তালাবন্ধ করে এসেছ শুভ্র?'

'জ্বি।'

'অসুস্থ একজন মানুষকে তালাবন্ধ করে রেখে আসতে হচ্ছে। চিন্তা করতেই খারাপ লাগে। ব্যবস্থাটা অবশ্যি সাময়িক।'

ক্যান্টিন ফাঁকা। নীতু কোনার দিকের একটা চেয়ারে বসল। নোংরা ক্যান্টিন। মনে হচ্ছে তিন-চারদিন ধরে মেঝে ঝাঁট দেয়া হচ্ছে না। টেবিলে টেবিলে চায়ের কাপ। মাছি উড়ছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কিছু খাবে শুভ্র?'

'জ্বি না।'

'এরা খুব ভালো সিঙ্গারা বানায়। আমি লাঞ্চে দুটা সিঙ্গারা আর এক কাপ চা খাই। খেয়ে দেখ না।'

'আচ্ছা বলুন, সিঙ্গারা দিতে বলুন।'

নীতু উঠে গিয়ে সিঙ্গারা নিয়ে এল। শুধু সিঙ্গারা নয়, এক বোতল পেপসিও আছে।

'শুভ্র, পেপসি খাও তো তুমি?'

'জ্বি খাই।'

'খুব ঠাণ্ডা হবে না। সিঙ্গারা খেয়ে পেপসিটা খাও। এখানকার পানি ভালো না।'

'কী জন্যে ডেকেছেন, আপা?'

'বাবা সম্পর্কে তোমার সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে। তুমি তো প্রায়ই বাবার সঙ্গে কথা বল। আজো বললে, কিছু বুঝতে পারছ? কোনো পরিবর্তন লক্ষ করেছ?'

'জ্বি না। কী পরিবর্তনের কথা বলছেন?'

'বাবার মাথা ঠিক নেই, শুভ্র। বাসায় তালা দিয়ে আসার এও একটা কারণ। আমাদের বাড়িতে এমন কিছু মহামূল্যবান কোহিনূর নেই যে ঘর তালাবন্ধ করে আসতে হবে। বাবার মাথা পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেছে।'

'উনি কী করেন?'

'এখনো কিছু করছেন না। তবে খুব শিগ্‌গিরই করবেন। বাবা হুট করে কিছু করেন না। কোনো একটা বিষয় নিয়ে দীর্ঘদিন চিন্তাভাবনা করেন। তারপর কাজটা করেন। তখন হাজার যুক্তি দিয়েও তাঁকে টলানো যায় না। এখন তিনি কি ভাবছেন শুনবে? এখন ভাবছেন তিনি আমাদের ঘাড়ে সিন্দাবাদের ভূতের মতো চেপে আছেন। তিনি আমাদের মুক্তি দিতে চান। তোমাকেও নিশ্চয়ই বলেছেন।'

'হ্যাঁ, বলেছেন।'

'মার সঙ্গে এই নিয়ে ঝগড়া হল। মা কান্নাকাটি করে বাসা ছেড়ে চলে গেছেন। এখন মা ছোটমামার সঙ্গে আছেন। মাকে কি বলেছেন শুনবে?'

'বলুন।'

'মাকে বলেছেন — আমি তোমাদের কাছে বিরাট বোঝা। আমার জন্যে নীতুর বিয়ে হচ্ছে না। আমি চাই না আমার জন্যে আমার মেয়ের জীবন নষ্ট হোক। কাজেই আমি ঠিক করেছি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাব। তুমি আমাকে লোকজন বেশি চলাচল করে এমন একটা রাস্তার পাশে শুইয়ে রেখে এস। এ শহরে খুব কম করে হলেও পঞ্চাশ হাজার ভিক্ষুক বাস করে। রোড অ্যাকসিডেন্টে মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়, অনাহারে ভিক্ষুকের মৃত্যুর খবর পাওয়া যায় না। আমি এইভাবে আরো কিছুদিন বেঁচে থাকতে পারব বলে আমার ধারণা। মা বললেন, তোমাকে মুখে তুলে কে খাইয়ে দেবে? বাবা বললেন, তিনি পার্টনারশিপ ব্যবস্থায় আরেকজন অল্পবয়স্ক শিশু ভিক্ষুক সঙ্গে নেবেন। বাবার রোজগারের অর্ধেক সে পাবে। বিনিময়ে বাবাকে সে খাইয়ে দেবে। বাবার মাথা যে পুরোপুরি খারাপ হয়ে গেছে তুমি কি বুঝতে পারছ? তুমি চিন্তা করতে পার — এই লোক ইংরেজি সাহিত্যে অধ্যাপনা করেছেন!'

শুভ্র বলল, 'এমন কিছু ঘটেছে যার জন্যে চাচা হঠাৎ করে মনে করা শুরু করলেন যে তিনি বাড়তি বোঝা।'

'বাবা তো বোকা না শুভ্র। বাবা যথেষ্টই চালাক। তাছাড়া শারীরিকভাবে অক্ষম মানুষদের বুদ্ধি হঠাৎ করে অনেকখানি বেড়ে যায়। বাবা এক ধরনের বোঝা তো বটেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুমি আমার ছোট ভাইয়ের মতো। তবু তোমাকে বলি — আমার বিয়ে করার একটা সুযোগ ঘটেছে। কোনোদিন ঘটবে আমি ভাবি নি কিন্তু ঘটেছে। আগে একবার বিয়ে হওয়া মেয়ের আবার বিয়ে ঠিক হওয়া বড় ঘটনা। যার সঙ্গে বিয়ে ঠিকঠাক হয়েছে — তার মা-বাবা আছে। ছোট ভাইবোন আছে। আমি তো বিয়ের পর মা-বাবাকে নিয়ে ঐ বাড়িতে উঠতে পারি না।'

'উনি তো আপনার সমস্যা জানেন। উনি কী বলছেন ?'

'সে কিছুই বলছে না। আমি তাকে অপেক্ষা করতে বলছি। কতদিন সে অপেক্ষা করবে? তাছাড়া অপেক্ষা করবেই বা কেন?'

শুভ্র পেপসির গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে বলল, 'আপনি তাঁকে অপেক্ষা করতে বলেছেন কেন? আপনার কি ধারণা অপেক্ষা করলেই সমস্যার সমাধান হবে ?'

'তাকে অপেক্ষা করতে বলা ছাড়া আমি আর কী বলতে পারি?'

'আপনার কাছে কি এই সমস্যার কোনো সমাধান আছে?'

'না।'

শুভ্র ইতস্তত করে বলল, 'আমাকে আপনি কী করতে বলছেন?'

নীতু অসহিষ্ণু গলায় বলল, 'তোমাকেও কিছু করতে বলছি না। তুমি আবার কী করবে? তোমার জানা থাকা দরকার বলেই জানালাম। তুমি ইচ্ছা করলে পাগলামি চিন্তাভাবনা না করার জন্যে বাবাকে বলতে পার।'

'জ্বি আচ্ছা, আমি বলব।'

'শুভ্র, আমি বসতে পারব না। আমার অনেক কাজ আছে। আরেকদিন তোমার সঙ্গে কথা বলব।' নীতু উঠে দাঁড়াল। শুভ্র লক্ষ করল নীতুকে আসলেই খুব ক্লান্ত লাগছে। মুখে বয়সের দাগ পড়ে গেছে। চোখের নিচটা কালো হয়ে আছে।

নীতু চলে যাবার পরও শুভ্র খানিকক্ষণ বসে রইল। ক্যান্টিনে লোকজন আসতে শুরু করেছে। এখন বোধহয় লাঞ্চ টাইম। বাসায় ফিরতে ইচ্ছা করছে না।

৬

দুপুরের খাবার ইয়াজউদ্দিন সাহেব অফিসেই খান। খুব হালকা খাবার। এক বাটি স্যুপ। সামান্য সালাদ। এক টুকরা পাকা পেঁপে কিংবা অর্ধেকটা কলা। খাবার শেষে মগের মতো বড় একটা গ্লাসে এক মগ দুধ-চিনিবিহীন চা। চায়ের সঙ্গে দিনের দ্বিতীয় সিগারেটটি খাওয়া হয়। আজ তাঁর লাঞ্চ ঠিকমতো খাওয়া হয় নি। দু চামচ স্যুপ মুখে দিয়ে বাটি সরিয়ে রেখেছেন। সালাদ খান নি। পেঁপের টুকরার দুখণ্ড মুখে দিয়েছেন। চায়ের মগ সামনে আছে। ঠাণ্ডা হচ্ছে, তিনি চুমুক দিচ্ছেন না। পর পর তিনটি সিগারেট খাওয়া হয়ে গেছে। তিনি প্রচণ্ড টেনশন অনুভব করছেন, যদিও আচার-আচরণে তা প্রকাশ পাচ্ছে না। তাঁর সামনে এ সপ্তাহের নিউজউইক। তিনি আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স-এর উপর একটি প্রবন্ধ পড়ছেন। মন দিয়েই পড়ছেন।

তাঁর টেনশনের কারণ হচ্ছে — তিনি খবর পেয়েছেন আজ তাঁকে অফিস থেকে বের হতে দেয়া হবে না। অফিস ছুটি হবার পর কর্মচারীরা তাঁকে ঘেরাও করবে। দরজা আটকে তালা দিয়ে দেবে। তাঁর টঙ্গী সিরামিক কারখানার কর্মচারীরাও এসে যোগ দেবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাদের নয় দফা দাবির সব কটি তাকে মেটাতে হবে। আজ ভয়ংকর কিছু ঘটবে — এ ব্যাপারে কর্মচারীরা মোটামুটি নিশ্চিত। তবে তারা নিশ্চিত যে ইয়াজউদ্দিন সাহেব এখন পর্যন্ত কিছুই জানেন না। ইয়াজউদ্দিন সাহেব কর্মচারী সমিতির সব খবরই রাখেন। নেতাদের গোপন বৈঠকের খবরও তিনি জানেন। আজকের ঘেরাওয়ের ব্যাপারে তিনি কী করবেন এখনো ঠিক করেন নি। ব্যস্ত হবার কিছু নেই। হাতে সময় আছে। এরা প্রথম যা করবে তা হল — টেলিফোনের লাইন কেটে দেবে যাতে তিনি প্রয়োজনের সময় টেলিফোনে পুলিশের সাহায্য না চাইতে পারেন। পুলিশকে আগেভাগে জানিয়ে রাখা যায়, তবে তা করা ঠিক হবে না। পুলিশের কাছ থেকেই ওরা জেনে যাবে। এমন ব্যবস্থা করে রাখতে হবে যাতে পুলিশ ঠিক চারটার সময় খবর পায়।

ইয়াজউদ্দিন সাহেব মনিরুল হককে ডেকে পাঠালেন। মনিরুল হক কর্মচারী সমিতির সংস্কৃতি সম্পাদক। আজকের ঘেরাও আন্দোলনের সেই হচ্ছে প্রধান ব্যক্তি। প্রতিটি কাজ সে করছে আড়ালে থেকে। ভয়ংকর ব্যাপার হচ্ছে — ঘেরাওয়ের এক পর্যায়ে সে রেকর্ড রুমে আগুন লাগিয়ে দেবার একটা পরিকল্পনা করেছে। এটি কেন করছে তিনি জানেন না।

মনিরুল হক এসে বিনীত ভঙ্গিতে দাঁড়াল। ত্রিশ–বত্রিশ বছর বয়েসী ছেলে। এর মধ্যেই চুল পেকে গেছে। আজ বোধহয় সে ক্রমাগত পান খেয়ে যাচ্ছে — সবকটা দাঁত লাল। এখনো মুখে পান আছে। এই গরমেও সে একটা হালকা গোলাপি রঙের স্যুয়েটার পরে আছে।

'স্যার আমাকে ডেকেছেন?'

'হ্যাঁ ডেকেছি। তোমার খবর কি মনিরুল ইসলাম?'

'জ্বি স্যার, আপনার দোয়া।'

'মুখভর্তি পান নিয়ে আর কখনো আমার ঘরে ঢুকবে না। পান ফেলে মুখ ধুয়ে তারপর আস।'

মনিরুল ইসলাম হকচকিয়ে গেল। ঘর ছেড়ে গেল। ঠিক তখন শুভ্র পর্দার ফাঁক দিয়ে গলা বের করে বলল, 'বাবা আসব?' ইয়াজউদ্দিন সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, 'তুমি কোত্থে কে?'

শুভ্র হাসল।

'এস, ভেতরে এস।'

'তুমি কি খুব ব্যস্ত, বাবা? তোমাকে খুব চিন্তিত মনে হচ্ছে।'

'আমি কিছুটা ব্যস্ত, তবে চিন্তিত না। তুমি বস শুভ্র।'

শুভ্র বসল। ইয়াজউদ্দিন সাহেব তাঁর পিএকে ডেকে বলে দিলেন কেউ যেন এখন না আসে। মনিরুল ইসলামকে এক ঘণ্টা পরে আসতে বললেন। ইয়াজউদ্দিন সাহেব পঞ্চম সিগারেটটা ধরাতে ধরাতে বললেন, 'শুভ্র, তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি আজ সারাদিন কিছু খাও নি। তুমি পথে ঘুরছ এবং তোমার মাথা ধরেছে।'

'তোমার তিনটি ধারণাই সত্যি বাবা।'

'তুমি কি কিছু খাবে?'

'না।'

'কিছু বলার জন্যে এসেছ নিশ্চয়। বল।'

শুভ্র হাসিমুখে বলল, 'বাবা, তুমি তো জান আমার এক বন্ধু বিয়ে করেছে।'

'জানি। তোমার সেই বন্ধুর নাম জাহেদ। সে একজন প্রফেশন্যাল প্রাইভেট টিউটর, তার স্ত্রীর নাম কেয়া। বিয়েতে তোমার বরযাত্রী হবার কথা ছিল। চশমা হারিয়ে ফেলার কারণে তুমি যেতে পার নি। এখন বল কী বলবে —'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বাবা, আমি ওদরে দুজনকে খুব সুন্দর একটা উপহার দিতে চাই।'

'অবশ্যই দেবে। তোমার বন্ধুরা নিশ্চয়ই তোমার কাছে দামি গিফট আশা করে।'

'আমি নতুন ধরনের কোনো গিফট দেবার কথা ভাবছি। দামি কিছু না।'

'যেমন?'

'জয়দেবপুরে আমাদের যে বাগানবাড়ি আছে আমি ভাবছি ঐ বাড়িতে তাদের আমি কয়েকদিন থাকতে বলব। ওরা খুব পছন্দ করবে, বাবা। এত সুন্দর বাড়ি। এত সুন্দর বাগান। জোছনা রাতে ঝিলে যে নৌকা আছে সেখানে ওরা চড়বে। আমার ভাবতেই ভালো লাগছে।'

'চা খাবে শুভ্র?'

'না।'

'তোমার মাথা ধরা কি সেরেছে?'

'এখন নেই।'

'একটু বস, আমি আমার নিজের জন্যে চায়ের কথা বলি। এই চা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।'

'বাবা, আমার বন্ধু বিয়ে করে খুব সমস্যার মধ্যে পড়েছে। আমাকে কিছু বলে নি তবু আমার অনুমান জাহেদ কেয়াকে নিয়ে কোথাও উঠতে পারছে না। জয়দেবপুরের বাড়িতে ওরা যদি থাকতে পারে তাহলে জীবনের শুরুটা ওদের অসম্ভব সুন্দর হবে।'

'আমার কিন্তু তা মনে হয় না, শুভ্র। আমার মনে হয়, ওরা যদি ঐ বাড়িতে কদিন থাকে তাহলে ওরা হতাশাগ্রস্ত হবে। ওদের জীবনের শুরু হবে ভুল দিয়ে। হুট করে বিয়ে করে ঐ ছেলে যে সমস্যা তৈরি করেছে — তোমার জয়দেবপুরের বাগানবাড়ি সেই সমস্যার কোনো সমাধান নয়। তোমার বন্ধুর সমস্যা তাকেই সমাধান করতে হবে।'

শুভ্র কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'যে কোনো সুন্দর জিনিস কিন্তু আমরা অন্যের সঙ্গে শেয়ার করি। একটা ভালো গান শুনলে আমরা সেই গান অন্যদের শোনাতে চাই। একটা ভালো বই পড়লে অন্যদের সেই বই পড়তে বলি। আমাদের এত সুন্দর একটা বাড়ি, সেই বাড়ি অন্যদের সঙ্গে শেয়ার করলে কী ক্ষতি বাবা?'

'সব জিনিস শেয়ার করা যায় না। আমি একটা Crude উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা তোমাকে বোঝাই — মনে কর তুমি বিয়ে করলে। অসাধারণ একটি মেয়েকে বিয়ে করলে — যে মেয়ে তোমার কাছে মধুর সংগীতের মতো। তুমি কিন্তু সেই মধুর সংগীত তোমার বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারবে না। বাড়ির বেলাও এই কথাটা সত্যি। বাড়ি হল খুবই ব্যক্তিগত সামগ্রীর একটি — নিজের পোশাকের মতো। পোশাক যেমন তোমাকে ঢেকে রাখে, বাড়িও তোমাকে ঢেকে রাখে। তুমি কি আমার কথায় মন খারাপ করেছ?'

'হ্যাঁ, আমি সারা রাস্তা ভাবতে ভাবতে আসছিলাম ওদের দুজনকে কিছু বলব না। গাড়িতে করে জয়দেবপুরের বাড়িতে নামিয়ে রেখে বলব — আগামী এক সপ্তাহের জন্যে এই বাড়ি তোদের।'

'তুমি কি ওদের তুই করে বল?'

'জাহেদকে তুই করে বলি।'

'তোমার মুখে তুই শুনতে ভালো লাগে না, শুভ্র।'

'বাবা, আমি উঠি?'

'আচ্ছা যাও। আমার নিজেরও কিছু কাজ আছে। তোমার মাকে বল, আমার ফিরতে রাত হবে। সে যেন কোথায় যেতে চাচ্ছিল — একাই যেতে বলবে।'

'আচ্ছা।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আর এই নিউজউইকটা নিয়ে যাও। আর্টিফিসিয়েল ইন্টেলিজেন্স–এর উপর অসাধারণ একটা আর্টিকেল আছে। তোমার পড়তে ভালো লাগবে।'

শুভ্র হাত বাড়িয়ে নিউজউইক নিল। ইয়াজউদ্দিন সাহেব বেল বাজিয়ে মনিরুল ইসলামকে আসতে বললেন। মনিরুল ইসলাম ঢুকল। তার চোখে–মুখে ভীত ভাব স্পষ্ট।

'বস মনিরুল।'

মনিরুল বসল। ইয়াজউদ্দিন ঘড়ি দেখলেন। এখনো হাতে সময় আছে। তাঁকে চা দেয়া হয়েছে। চিনি ছাড়া চায়ে চুমুক দিতে দিতে বললেন, 'এই প্রতিষ্ঠানে তোমার চাকরি কতদিন হয়েছে?'

'স্যার, প্রায় ছবছর।'

'ছবছরে কী দেখলে?'

মনিরুল ঢোঁক গিলল। সে স্পষ্টতই ভয় পেয়েছে। ইয়াজউদ্দিন সাহেব বললেন, 'শোন মনিরুল, আমি যখন যাত্রা শুরু করেছিলাম তখন আমার সঙ্গে ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বোটানির একটি এমএসসি ডিগ্রি এবং তিনশ টাকা। আজ আমার সম্পদের পরিমাণ কয়েক কোটি টাকা। আমার লেগেছে ত্রিশ বছর। ত্রিশ বছরে এই অবস্থায় আসতে যে জিনিস লাগে তার নাম মস্তিষ্ক। সাদা রঙের থিকথিকে একটা বস্তু। ঠিক সাদাও না, অফ হোয়াইট। আমার মাথায় যে এই বস্তু প্রচুর পরিমাণে আছে তা কি তুমি জান, মনিরুল ইসলাম?'

'জানি স্যার।'

'আজ তোমাদের কী পরিকল্পনা, কখন কী করবে আমি যে তার সবই জানি তা কি তুমি জান?'

মনিরুল চোখ নামিয়ে নিল। ঢোঁক গিলল।

'আন্দোলন করার অধিকার অবশ্যই তোমাদের আছে। ঘেরাও করার অধিকারও হয়তো আছে। কিন্তু আগুন লাগিয়ে দেবার ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'আমি কিছু জানি না, স্যার।'

'তুমি হয়তো জান না। কিন্তু আমি জানি। আমি খুব ভালো করে জানি। এ জাতীয় পরিস্থিতি কী করে সামাল দিতে হয় তাও জানি। আমাকে এইসব ঠেকে শিখতে হয়েছে। তুমি বাসাবোতে থাক না?'

'জ্বি স্যার।'

'৩১ বাই ১, দক্ষিণ বাসাবো, দোতলা।'

'জ্বি স্যার।'

'দেখলে তোমাদের খোঁজখবর কত ভালো রাখি।'

'আপনি আমাকে কেন এইসব বলছেন, আমি স্যার কিছুই জানি না।'

'আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি যাও।'

'স্যার, আমি সাতে–পাঁচে থাকি না। ওরা মিটিং করল — আমি বললাম ....'

'মনিরুল ইসলাম, তুমি এখন যাও।'

ইয়াজউদ্দিন ঘড়ি দেখলেন। তিনটা কুড়ি বাজে। অপেক্ষা করতে হবে। ঠিক চারটায় ঘেরাও হবার আগে আগে পুলিশের সাহায্য চাইতে হবে। কোনো কারণে তিনি যদি টেলিফোন করতে না পারেন তাহলে অন্য কেউ যেন কাজটা করে দেয় সেই ব্যবস্থা করতে হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এরা কি এখানে বোমা–টোমা ফাটাবে? বোমা ব্যাপারটা সহজলভ্য হয়ে গেছে। নির্দোষ জর্দার কৌটায় ভরে ঘুরে বেড়ানো যায়। চারদিকে আতংক ছড়িয়ে দেবার জন্যে জর্দার কৌটাগুলোর তুলনা হয় না। সময় কাটানোর জন্যে ইয়াজউদ্দিন সাহেব শুভ্রর ফাইল ড্রয়ার থেকে বের করলেন। কাজটা তিনি নজুবুল্লাহ্‌কে দিয়েছিলেন। সাতদিনের রিপোর্ট দেবার কথা ছিল।

প্রতিদিন এক হাজার টাকা হিসেবে সাত দিনের জন্যে সাত হাজার। লোকটা আনাড়ি ধরনের কাজ করেছে। মাঝে মাঝে অতি চালাকি করতে গিয়ে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে চলে গেছে। এটা করেছে ফাইল মোটা করার জন্যে। ইয়াজউদ্দিন চোখ বুলাতে লাগলেন।

> *সোমবার*
> *১৩ই নভেম্বর ১৯৯২।*
> শুভ্র সাহেব বাড়ি থেকে বের হলেন দশটা একুশ মিনিটে। গেটের কাছে এসে দারোয়ানের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বললেন। আবার বাড়ির ভেতর ঢুকে গেলেন। তিনি বাড়ির বাইরের বারান্দায় কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে নিজের ঘরে ঢুকে গেলেন। আবার বের হলেন এগারটা বাজার দু মিনিট আগে। তার পরনে ছিল কালো প্যান্ট, সাদা শার্ট। পায়ে স্যান্ডেল।

পড়তে পড়তে ইয়াজউদ্দিনের ভ্রূ কুঞ্চিত হল। শুভ্র কী পরে ঘর থেকে বের হয়েছে তার এত বিতং করে লিখতে তাকে কে বলেছে?

> শুভ্র সাহেব রিকশা নিলেন রাস্তার মোড়ে এসে। রিকশার নম্বর — ঢাকা মিউনিসিপ্যালটি ৭১১। তিনি রিকশার হুড ফেলে দিলেন। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের কাছে এসে রিকশা ছেড়ে দিয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে অন্য একটা রিকশা নিলেন। এই রিকশার নম্বর — ঢাকা মিউনিসিপ্যালটি ২০০৩। এইবার তিনি রিকশার হুড ফেললেন না। তবে রিকশা হাইকোর্টের কাছাকাছি যাবার পর তিনি রিকশার হুড ফেলে দিলেন।

ইয়াজউদ্দিন সাহেব ঘড়ি দেখলেন। পুলিশকে টেলিফোন করার সময় হয়ে গেছে।

৭

মিজান সাহেব বেশ স্বাভাবিক আছেন। তিনি নাপিতের দোকান থেকে চুল কাটিয়েছেন। একেবারে কদমছাঁট। মাথাটা কালো রঙের কদম ফুলের মতোই দেখাচ্ছে। চুল কাটার জন্যেই তাঁকে অন্য রকম দেখাচ্ছে। এ ছাড়া তাঁর মধ্যে আর কোনো অস্বাভাবিকতা নেই। কথাবার্তা, চালচলন খুব স্বাভাবিক। হঠাৎ হঠাৎ স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে দু–একটা কুৎসিত বাক্য বলে আবার স্বাভাবিক হয়ে যান। যেমন, আজ দুপুরে ভাত খাওয়ার সময় সহজভাবে ভাত খাচ্ছিলেন, হঠাৎ মনোয়ারার দিক তাকিয়ে ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে বললেন, 'মাগী, তুই তরকারিতে লবণ দেস না কেন? আমার কি লবণ কেনার পয়সাও নাই?' মনোয়ারা কেঁদে ফেলতে যাচ্ছিলেন, কাঁদলেন না। কাঁদলে আবার কোন বিপত্তি ঘটে। তিনি ছুটে গিয়ে রান্নাঘর থেকে লবণ নিয়ে এলেন। ততক্ষণে মিজান সাহেব স্বাভাবিক। তিনি কোমল গলায় বললেন, 'মনু, তুমি এক সঙ্গে খেয়ে ফেল না কেন? এক সঙ্গে খেয়ে ফেললে ঝামেলা কমে। কাজের লোক একটা রাখতে হবে। কাজের লোক ছাড়া সংসার চালানো সম্ভব না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুমি একা কদিক দেখবে?'

সৌভাগ্যের সংবাদ বাড়ি বাড়ি দিয়ে আসতে হয়। দুর্ভাগ্যের সংবাদ দিতে হয় না। সবাই জেনে যায়। ঢাকায় মিজান সাহেবের সব আত্মীয়স্বজনই খবর পেয়ে গেছেন। তাঁরা দেখতে আসছেন। পাগল দেখা এবং পাগলের সঙ্গে কথাবার্তা বলার এক আলাদা মজা। মিজান সাহেব সবাইকেই আনন্দ থেকে বঞ্চিত করলেন। কোনো রকম পাগলামি দেখালেন না। সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কথা বললেন, হাসলেন।

জাহেদ সন্ধ্যাবেলা মামাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল। ডাক্তার মিজান সাহেবের অফিসের এক কলিগের ভায়রা ভাই। সেই কলিগই ব্যবস্থা করে দিয়েছে। মস্তিষ্ক বিকৃতির জন্যে খুব ভালো ডাক্তার। অর্ধেক ফী-তে তিনি রোগী দেখে দেবেন। অর্ধেক ফী-তে যে সব রোগী দেখা হয় তাদের পেছনে ডাক্তাররা অর্ধেকেরও কম সময় ব্যয় করেন। উপসর্গ শোনার আগেই ব্যবস্থাপত্র লেখা হয়ে যায়। তবে এই ডাক্তার অনেক সময় ব্যয় করলেন। নানান ধরনের প্রশ্ন-টশ্ন করে বললেন, 'আমি তো কিছু পাচ্ছি না। আমার মনে হয় আপনারা অকারণে বেশি দুশ্চিন্তা করছেন। উনার মূল সমস্যা কী?'

জাহেদ অস্বস্তির সঙ্গে বলল, 'হঠাৎ রেগে যান। মামির সঙ্গে কুৎসিত ব্যবহার করেন। গালাগালি করেন।'

'স্ত্রীর প্রতি মাঝে মাঝে রেগে যাওয়া কি খুব অস্বাভাবিক? আমরা সবাই কখনো কখনো রাগি।'

জাহেদ বলল, 'কিন্তু উনার মনে থাকে না যে উনি রেগেছেন। তাছাড়া মামা আগে কথা প্রায় বলতেন না, এখন প্রচুর কথা বলেন। সারাক্ষণই কথা বলেন।'

'উনার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেন?'

'জ্বি বলেন। রাত জেগে গল্প করেন।'

ডাক্তার সাহেব বললেন, 'আমার ধারণা, এক ধরনের নার্ভাস শকের ভেতর দিয়ে উনি গেছেন। স্নায়ুর উপর দিয়ে বড় ধরনের কোনো ঝড় বয়ে গেছে। ঝড়ের কারণে স্নায়ুর তন্ত্রীতে এক ধরনের ধাক্কা লেগেছে। সাময়িক বিকল অবস্থা যাচ্ছে। এটা কিছুই না। ঠিকমতো খাওয়াদাওয়া করতে হবে। ঘুমাতে হবে। সবচে' ভালো হয় যদি স্থান পরিবর্তন করা যায়। আপনি বরং আপনার মামাকে নিয়ে কোথাও যান, ঘুরে-টুরে আসুন।'

কথাবার্তা মিজান সাহেবের সামনেই হচ্ছে। তিনি গভীর আগ্রহ নিয়ে শুনছেন। ডাক্তার সাহেব থামতেই বললেন, 'এটা মন্দ বুদ্ধি না। জাহেদ, চল গ্রামের বাড়ি থেকে ঘুরে আসি। টাটকা-টাটকা খেজুরের রস খেয়ে আসি। অনেকদিন খেজুরের রস খাওয়া হয় না।'

ডাক্তার সাহেব বললেন, 'ভালো বুদ্ধি। যান, গ্রাম থেকে ঘুরে আসুন।'

জাহেদ তার মামাকে নিয়ে বিমর্ষ মুখে বের হয়ে এল। ডাক্তার সাহেব লম্বা প্রেসক্রিপ্শন করেছেন। নানান ধরনের ভিটামিন, হজমের ওষুধ, ঘুমের ওষুধ। তিনশ টাকা চলে গেল ওষুধে। মিজান সাহেব হাই তুলতে তুলতে বললেন, 'ওষুধে কোনো কাজ হবে না। আমার দরকার গ্রামের খোলা হাওয়া। রাত এগারটায় বাহাদুরাবাদ এক্সপ্রেস আছে। চল বাহাদুরাবাদ এক্সপ্রেসে চলে যাই। ট্রেনেও অনেকদিন চড়া হয় না। ভালোই হল। আজ লজ্জা ভেঙেই যাবে।'

মামাকে বাসায় রেখে জাহেদ গেল কেয়ার সঙ্গে দেখা করতে। পুরো দুদিন চলে গেছে কেয়ার সঙ্গে দেখা হয় নি। গতকাল একবার এসেছিল। লজ্জায় সিঁড়ি ভেঙে উঠতে পারে নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জলিল সাহেব দরজা খুলে দিয়ে হাসিমুখে বললেন, 'আরে দুলামিয়া যে! হা-হা-হা। আসুন, আসুন। আপনি আসবেন বুঝতে পারছিলাম।'

জাহেদ শুকনো গলায় বলল, 'কেমন আছেন?'

'আলহামদুলিল্লাহ। ভালো আছি। আপনার ব্যাপারটা কি বলুন দেখি? বিয়ে করে বউ ফেলে চলে গেলেন। নো পাত্তা। ব্যাপারটা কী? আমার আটত্রিশ বছরের জীবনে এমন ঘটনা শুনি নি।'

জাহেদ বলল, 'কেয়া আছে?'

'আছে, আছে — যাবে কোথায়? ঘরেই আছে। জ্বর হয়েছে শুনেছি। আমি ঠাট্টা করে বলেছি — বিরহ জ্বর। হা-হা-হা।'

'কেয়াকে একটু খবর দেবেন?'

'আরে কী মুশকিল! আমি খবর দেব কেন? আপনি হলেন এ বাড়ির জামাই। আপনি সুড়সুড় করে ভেতরে ঢুকে যান। আমি কে? আমি হলাম আউটসাইডার।'

জাহেদকে ভেতরে ঢুকতে হল না। কেয়া বের হয়ে এল। তার গায়ে জ্বর। একশ দুইয়ের কাছাকাছি। অসহ্য মাথার যন্ত্রণা। মনে হচ্ছে মাথা ছিঁড়ে পড়ে যাবে। কিন্তু সে বেশ স্বাভাবিক। জাহেদের দিকে তাকিয়ে হাসল। নরম গলায় বলল, 'চল ছাদে যাই।'

জলিল সাহেব চেঁচিয়ে বললেন, 'আরে না, ছাদে যাবে কেন? জ্বর নিয়ে ছাদে যাবার কোনো দরকার নেই। গল্প-গুজব যা করার এখানে বসেই কর। স্বামী-স্ত্রীর গল্প বলার তো কিছু নাই। হা-হা-হা।

কেয়া কিছুই বলল না। দরজা খুলে রওনা হল। তার গায়ে পাতলা একটা চাদর। চাদরে বোধহয় শীত মানছে না। সে অল্প অল্প কাঁপছে। সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় সে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যেতে ধরল। জাহেদ তাকে ধরে ফেলল। জাহেদ বলল, 'শরীর এত খারাপ করেছে কীভাবে?' কেয়া বলল, 'বুঝতে পারছি না। কাল রাতে অনেকক্ষণ ধরে গোসল করেছি। মনে হয় ঠাণ্ডা লেগেছে।'

AMARBOI.COM

'কাশি আছে?'

'আছে। শুনতে চাও?'

কেয়া হাসছে। জাহেদ বলল, 'ছাদের হাওয়ায় বসা বোধহয় ঠিক হবে না।'

'ঠিকই হবে। চুপ করে বস। তোমার মামা কেমন আছেন?'

'বুঝতে পারছি না। খুব ভালো মনে হচ্ছে না। মাথা বোধহয় খারাপ হয়ে গেছে কিংবা হতে যাচ্ছে।'

'ডাক্তার দেখিয়েছ?'

'হুঁ।'

'ডাক্তার কী বললেন?'

'ওষুধপত্র দিয়েছেন। গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যেতে বলছেন। পরিবেশ বদলাতে বললেন।'

'নিয়ে যাচ্ছ গ্রামের বাড়িতে?'

'হুঁ।'

'কবে?'

'আজ রাতের ট্রেনেই যেতে চাচ্ছেন। এখনো বুঝতে পারছি না।'

'নিয়ে যাও।'

'নিয়ে যেতে বলছ!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'হুঁ বলছি। তোমার নিজের উপর দিয়েও মনে হয় ঝড় যাচ্ছে। তোমারও চেঞ্জ দরকার। নয়তো পরে দেখা যাবে মামা যে পথে যাচ্ছে — ভাগ্নেও সেই পথে যাচ্ছে। দুজনই আইল্যান্ডে নেংটো হয়ে দাঁড়িয়ে ট্রাফিক কনট্রোল করছে।'

কেয়া হাসছে। কী সুন্দর লাগছে কেয়াকে! জাহেদ মনে মনে বলল, আমার সৌভাগ্যের শেষ নেই। কী চমৎকার একটি তরুণীকে আমি পাশে পেয়েছি।

কেয়া বলল, 'গম্ভীর হয়ে আছ কেন? আমার কথায় রাগ করেছ?'

'না, রাগ করব কেন?'

'আজ শেভ কর নি কেন?'

'তাড়াহুড়ায় সময় পাই নি।'

কেয়া নিচু গলায় বলল — 'বাসর রাতে তোমাকে বলার জন্যে সুন্দর একটা গল্প রেডি করে রেখেছিলাম। মনে হচ্ছে বাসর হতে অনেক দেরি। গল্পটা এখন বলব?'

'না, থাক। এখন শুনব না।'

'তোমাকে যে নীল একটা হাফশার্ট আর ধবধবে সাদা প্যান্ট কিনতে বলেছিলাম, কিনেছ?'

'না।'

'নেক্সট টাইম যখন আসবে সাদা প্যান্ট এবং নীল শার্ট যেন গায়ে থাকে।'

'আচ্ছা থাকবে।'

জাহেদ বলল, 'আমি বরং আজ যাই। মামাকে যদি দেশে নিয়ে যেতে হয় তাহলে গোছগাছ করতে হবে।'

'আচ্ছা যাও।'

'তুমিও নিচে চল। জ্বর নিয়ে ছাদে বসে থাকবে না।'

কেয়া বলল, 'আমি আরো কিছুক্ষণ থাকব। তুমি যাও।'

'ঠাণ্ডা লাগবে তো!'

'লাগুক। কালও অনেক রাত পর্যন্ত ছাদে ছিলাম।'

'কেন?'

কেয়া ক্লান্ত গলায় বলল, কী করব বল। কিছু ভালো লাগছে না। কাল ছাদে বসে কী ভাবছিলাম জান? ভাবছিলাম যদি আমাদের কখনো এক সঙ্গে থাকার সুযোগ হয় তাহলে পুরো এক রাত এবং এক দিন তোমাকে জড়িয়ে ধরে বসে থাকব। একটা সেকেন্ডের জন্যেও তোমাকে কোথাও যেতে দেব না।'

জাহেদ বলল, কয়েকটা দিনের ব্যাপার। আমি একটা ফ্ল্যাটের জন্যে সবাইকে বলেছি। দুরুমের ফ্ল্যাট।'

'ফ্ল্যাটের ভাড়া কীভাবে দেবে?'

'একটা ব্যবস্থা হবেই। যাই কেয়া।'

'আচ্ছা।'

আচ্ছা বলেও জাহেদ গেল না। দাঁড়িয়ে রইল। কেয়া বলল, 'কিছু বলবে?'

'বাসায় তোমার আপাকে কী বলেছ?'

'বলেছি একটা কিছু, তোমার শোনার দরকার নেই।'

'কী যে বিপদে পড়েছি কেয়া।'

'কোনো বিপদ না। তুমি চলে যাও।'

জাহেদ চলে গেল। কেয়া বসে আছে চুপচাপ। বাতাসে তার মাথার চুল উড়ছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৮

শুভ্র সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুমাল। রেহানা কয়েকবার খোঁজ নিয়ে গেলেন। এতক্ষণ তো শুভ্র ঘুমায় না। জ্বর–টর হয় নি তো? তিনি একবার কপালে হাত দিলেন। গা গরম লাগছে। সারাদিন রোদে রোদে ঘুরলে জ্বর তো আসবেই। সন্ধ্যায় রেহানা শুভ্রকে ডেকে তুললেন। সন্ধ্যাবেলা ঘুমাতে নেই। সন্ধ্যায় ঘুমালে আয়ু কমে যায়।

'শুভ্র, তোর কি শরীর খারাপ লাগছে, বাবা?'

'না।'

'গা গরম।'

'আমার গা ঠিকই আছে মা, তোমার হাত ঠাণ্ডা।'

'মুখ ধুয়ে আয়। চা দিয়েছি।'

'আমি আরো খানিকক্ষণ ঘুমাব, মা।'

'কী পাগলের মতো কথা বলছিস! তোর রিয়া খালার বাড়ি যাবি না?'

'আমার যেতে ইচ্ছা করছে না, মা।'

'কথা বাড়াবি না। উঠে আয়। রিয়া গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে। ওঠ্ তো বাবা। এই নে তোর চশমা।'

শুভ্র উঠে বসল। হাত বাড়িয়ে চশমা নিল। রেহানা বললেন, 'তোর সব কাপড় ইস্ত্রি করে রাখা আছে। পায়জামা পাঞ্জাবি। রিয়া বলেছে তোকে যেন পায়জামা পাঞ্জাবি পরানো হয়।'

'মা, আজ না গিয়ে অন্য একদিন যাব।'

'খানিকক্ষণ থেকে চলে আসবি। রিয়ার নাকি তোর সঙ্গে কি কথা আছে।'

'পাটি–ফার্টি না তো মা?'

'উঁহু, পার্টি না। পার্টি হলে রিয়া বলত। হাত ধর্ শুভ্র। আমার হাত ধরে বিছানা থেকে নাম।'

শুভ্র মার হাত ধরে বিছানা থেকে নামল।

রিয়াদের বাড়ির ড্রইংরুমে ঢুকে শুভ্রর চোখ ধাঁধিয়ে গেল। এত আলো চারদিকে ঝলমল করছে! শুধু যে আলো তাই না, খুব হৈচৈও হচ্ছে। ড্রয়িংরুমটা অনেক বড়, তারপরেও মনে হচ্ছে লোকজন গিজগিজ করছে। উঁচু ভল্যুমে সিডি বাজছে। যতক্ষণ জেগে থাকে ততক্ষণই সিডি প্লেয়ার বাজতে থাকে।

শুভ্রকে ঢুকতে দেখে রিয়া ছুটে এল। রিয়ার হাতে কাচের মাছ আকৃতির প্লেট। প্লেটভর্তি টুথপিকের মাথায় বসানো বিচিত্র কোনো খাবার। পার্টি হলেই রিয়া কোনো একটি বিচিত্র খাবার নিজে তৈরি করে। আজকের এই খাবারটি তার তৈরী। অতিথিরা কেউ এই খাবারে তেমন উৎসাহ দেখাচ্ছে না। অতিরিক্ত লবণের জন্যে মুখে দেয়া যাচ্ছে না।

রিয়া বলল, 'আয় শুভ্র।'

শুভ্র আতঙ্কিত গলায় বলল, 'পার্টি নাকি?'

'আরে না। পার্টি কোথায় দেখলি। কয়েকজনকে শুধু খেতে বলেছি। হাঁ কর দেখি, মুখে একটা খাবার দিয়ে দি। সল্টেড ড্রাই বিফ। মেক্সিকান খাবার। হান্টার বিফকে লবণে জেরে বানাতে হয়।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ছোট খালা, তুমি আমার কাছে দাও। নিজে খাচ্ছি, খাইয়ে দিতে হবে না।'

'মুখে তুলে দিলে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না। দেখি হাঁ কর। আর শোন, সবার সামনে আমাকে খালা ডাকবি না। আমি অনেক দূরের খালা — লতায়-পাতায় খালা। তোর চে' মাত্র দুবছরের বড়।'

'কী ডাকব?'

'নাম ধরে ডাকবি। মিষ্টি করে বলবি — রিয়া। কই হাঁ কর।'

শুভ্র হাঁ করল। সবাই তাকাচ্ছে তার দিকে। খুব অস্বস্তি লাগছে। কে যেন একটা কি রসিকতা করল। সবাই হো-হো করে হেসে উঠল। রিয়া বলল, 'আমাকে কেমন লাগছে?'

'ভালো।'

'ঠিকমতো তাকিয়ে তারপর বল — ভালো। চশমার ভেতর দিয়ে ভালো করে দেখ।'

'খালা, আমি এই ঘরে বেশিক্ষণ বসতে পারব না। আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।'

'এ ঘরে তোকে বেশিক্ষণ বসতে হবে না। তোকে অন্যঘরে নিয়ে যাচ্ছি — একটি মেয়ের সঙ্গে তোকে পরিচয় করিয়ে দেব। ওর সঙ্গে কথা-টথা বলে দেখ মনে ধরে কিনা। এক বছরের জন্যে তোকে নাকি বাইরে পাঠিয়ে দিচ্ছে। মেয়েটাকে যদি মনে ধরে ওকে নিয়ে যা। তার আগে আয় তোকে সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দি।'

রিয়া শুভ্রর হাত ধরে ঘরের মাঝখানে নিয়ে এল। রিয়া উঁচু গলায় বলল, এটেনশান প্লিজ। আমি এই পৃথিবীর সবচে' রূপবান ছেলেটির সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। এই ছেলে আমাকে খালা ডাকে — যদিও আমি তার খালা নই। এই ছেলে তার জীবনে কোনো পরীক্ষায় প্রথম ছাড়া দ্বিতীয় হয় নি। কোনো পরীক্ষায় সেকেন্ড হলে কেমন লাগে সে অভিজ্ঞতা এই ছেলের নেই। এর নাম শুভ্র ...

রিয়ার কথা শেষ হবার আগেই মোটামতো এক ভদ্রলোক বললেন, 'শুভ্র ভাই, এদিকে আসুন, আপনার পায়ের ধুলা দিয়ে যান। আমরা কপালে মাখি।'

সবাই আবারো হো-হো করে হেসে উঠল। রিয়া বলল, 'ফরিদ সাহেব, শুভ্রকে নিয়ে হাসি-তামাশা করবেন না। ও খুবই সেনসিটিভ। ছোটবেলায় কেউ ওকে কিছু বললে দৌড়ে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে কাঁদত। এখনো হয়তো এরকম করে। শুভ্র, তুই কি এখনো কাঁদিস?'

শুভ্র বলল, 'এখন কাঁদি না — এখন হাসি।'

শুভ্র, তাহলে হাসতে হাসতে পাশের ঘরে চলে যা। ঐ ঘরে তোর জন্যে একটা সারপ্রাইজ আছে। ডিনার রাত দশটার আগে দেয়া হবে না। ঘরে কোনো রান্না হয় নি — খাবার বাইরে থেকে আসবে।'

ফরিদ আনন্দের নিশ্বাস ফেলে বলল, 'বাঁচলাম। আমরা হান্টার বিফ খেয়ে আতংকের মধ্যে ছিলাম।'

সবাই আবারো হাসল। রিয়ার মুখ হাসিহাসি। পার্টি জমে গেছে। এক একবার এমন হয় — পার্টি জমতে চায় না। হৈচৈ হয়, খাওয়াদাওয়া সবই হয়, তারপরেও পার্টিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় না। পার্টি শেষ হলে খুব ক্লান্ত লাগে। আবার কোনো কোনো দিন হুট করে পার্টি জমে যায়। কেউ পার্টি ছেড়ে উঠতে চায় না। সামান্যতেই সবাই হেসে গড়াগড়ি করে। রিয়া আজ মনেপ্রাণে চাচ্ছে পার্টি জমে উঠুক। খুব ভালো করে জমুক। রাত একটা বেজে যাবে। কেউ বুঝতেও পারবে না এত রাত হয়েছে — । কেউ আগে আগে চলে যেতে চাইবে না। কেউ বলবে না — 'সরি, বেশিক্ষণ থাকতে পারব না, আমার জরুরি কাজ আছে। আমাকে বিদায় দিতে হবে। খুব এনজয় করেছি।' রিয়াকেই বলতে হবে — এটেনশান প্লিজ, দয়া করে আপনারা গাত্রোত্থান করুন। রাত একটা বেজে গেছে। তবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাবার আগে একটি গুড নিউজ শুনে যান। গুড নিউজটি শুভ্র প্রসঙ্গে .....

হ্যাঁ, রিয়া বিদেশি গল্প-উপন্যাসের মতো ব্যাপারটা করতে চায়। পার্টিতে এনগেজমেন্ট ডিক্লারেশন করার মতো ঘটনা ঘটাতে চায়। ইয়াজউদ্দিন সাহেব রিয়াকে অনুমতি দিয়েছেন। মেয়েটি সম্পর্কে আসল জায়গা থেকে গ্রিন সিগন্যাল পাওয়া গেছে। শুভ্র কী করবে না করবে তা নির্ভর করছে ইয়াজউদ্দিন সাহেবের উপর — শুভ্রর উপর না। তবে ইয়াজউদ্দিন অত্যন্ত বুদ্ধিমান। শুভ্রকে তিনি ব্যাপারটা বুঝতে দেবেন না। শুভ্র জানে না যে তার বাবা মেয়েটির সঙ্গে অনেকবার কথা বলেছেন। মেয়েটির পরিবার সম্পর্কে খোঁজখবর নেয়া হয়েছে। ইয়াজউদ্দিন সাহেবের কথামতোই আজকে এই পার্টির আয়োজন করা হয়েছে। বাইরে থেকে যে খাবার আসার কথা তার ব্যবস্থাও ইয়াজউদ্দিন সাহেবেরই করা।

রিয়া শুভ্রকে ড্রইংরুমের লাগোয়া একটা ঘরে নিয়ে গেল। ছেলেমানুষি খুশি খুশি গলায় বলল, 'শুভ্র, সোফায় যে তরুণীটি বসে আছে তুই তার সঙ্গে কথা-টথা বল। তাকে আনা হয়েছে তোকে কম্পানি দেয়ার জন্যে। পার্টি তুই সহ্য করতে পারিস না, আমি জানি — তোর জন্যে এক্সক্লুসিভ ব্যবস্থা। আমার মেলা কাজ, আমি যাচ্ছি —। এক ফাঁকে এসে তোদের কফি দিয়ে যাব।

রিয়া ঝড়ের মতো বের হয়ে গেল। মেয়েটি সহজ গলায় বলল, 'বসুন। দাঁড়িয়ে আছেন কেন। আমার নাম আনুশকা। ডাক নাম নীতু।'

শুভ্র অবাক হয়ে বলল, 'আশ্চর্য! আপনার নাম নীতু!'

নীতু বিস্মিত হয়ে বলল, 'এত অবাক হচ্ছেন কেন? নীতু নামটা কি আপনার কাছে খুব অপরিচিত লাগছে?'

'না, অপরিচিত লাগছে না। আমার এক পরিচিত মেয়ের নাম নীতু। আমি আমার জীবনে এত ভালো মেয়ে দেখি নি।'

'ভালো মেয়ে বলতে কী বুঝাচ্ছেন? ভালো ছাত্রী?

'সবকিছু নিয়েই ভালো। কিছু কিছু মানুষ আছে যাদের কাছে গেলে মনে পবিত্র ভাব হয়। নীতু আপা তাদের মধ্যে এক জন।'

'উনি আপনার আপা হন?'

'জ্বি। আমার বন্ধুর বড় বোন।'

'আপনি এখনো দাঁড়িয়ে আছেন। বসুন, বসে বসে আপনার নীতু আপার গল্প করুন।'

শুভ্র বসল। সে হঠাৎ লক্ষ করল আনুশকার সঙ্গে গল্প করতে তার ভালো লাগছে। ভালো লাগার অনেক কারণের মধ্যে একটি হয়তো এই যে মেয়েটি খুব আগ্রহ নিয়ে শুভ্রর গল্প শুনছে।

রিয়া এক ফাঁকে এসে দুজনের হাতে দুগ্লাস কোক ধরিয়ে দিয়ে কানে কানে শুভ্রকে বলল, 'মেয়েটা দারুণ না? পছন্দ হচ্ছে?'

শুভ্র হাসল। রিয়া বলল, 'ভালো কথা, খুব ভালো এক বোতল শ্যাম্পেন আছে। বোতলটা নিউ ইয়ার্স ডেতে খোলা হবে ভেবেছিলাম — তোর খালু খুলে ফেলেছে। শুভ্র, তুই কি এক চুমুক খেয়ে দেখবি?'

'না।'

'আচ্ছা বাবা, যা খেতে হবে না। তুই নীতুর সঙ্গে গল্প কর। গল্প করতে করতে যদি তোর ইচ্ছা করে নীতুর হাত ধরতে — ধরতে পারিস। নীতু কিছুই মনে করবে না। তাই না নীতু?'

নীতু হাসতে হাসতে বলল, 'আমি কিছু মনে করব না। কিন্তু শুভ্র কখনোই আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাত ধরতে চাইবে না।'

রিয়া বলল, 'কে বলেছে চাইবে না? খুব চাইবে!'

'উঁহু। পুরুষ মানুষ আমি খুব ভালো চিনি। ওরা তাদের নিজেদের যতটা চেনে আমি তারচেয়েও বেশি চিনি। শুভ্র সাহেব নীতু নামের এক জনের হাত ঠিকই ধরতে চাচ্ছেন, সেই একজন আমি নই।'

শুভ্র অবাক হয়ে মেয়েটির দিকে তাকাল। আশ্চর্য! মেয়েটি ঠিক কথাই বলেছে। এই নীতুর দিতে তাকিয়ে সে নীতু আপার কথাই ভাবছিল। কী আশ্চর্য কথা! তার হাত থেকে ছলকে খানিকটা কোক সাদা পাঞ্জাবিতে পড়ে গেল। নীতু শব্দ করে হেসে উঠল।

৯

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কে যেন কাঁদছে।

মাহিন সাহেব কান্নার শব্দ শুনছেন। সব শব্দ তাঁর চেনা। এই কান্নার শব্দ অপরিচিত। অবশ্যি তিনি জানেন কে কাঁদছে। এ বাসায় তিনি ছাড়া আর এক জন মানুষই বাস করে — নীতু। নীতুই কাঁদছে। নীতু ছাড়া আর কে হবে? কিন্তু এরকমভাবে কাঁদছে কেন? মাহিন সাহেব ডাকলেন, 'নীতু! নীতু!'

নীতু দরজা ধরে দাঁড়াল। মাহিন সাহেব বললেন, 'কী করছিলি?'

'রুটি বানাচ্ছিলাম। তুমি রুটি খাবে রাতে।'

'কাঁদছিলি নাকি?'

'না, কাঁদছিলাম না। কথায় কথায় আমি কাঁদি না। তাছাড়া কাঁদার মতো কিছু হয়ও নি।'

'আমি ভুল শুনলাম?'

'হ্যাঁ, তুমি ভুল শুনেছ। অনেক দিন থেকেই তুমি ভুল চিন্তা করছিলে। এখন তুমি ভুল শোনাও শুরু করেছ।'

'আয় আমার কাছে। বোস।'

'আমার রুটি বানাতে হবে, বাবা।'

'রুটি পরে বানালেও হবে। না বানালেও অসুবিধা নেই। রাতে আমি কিছু খাব না। তুই আমার কাছে এসে বোস।'

নীতু বাবার কাছে বসল। মাহিন সাহেব বললেন, 'মাঝে মাঝে আমার ইচ্ছা করে তোর মাথায় হাত রেখে আদর করি। ইচ্ছা করলেও পারি না। মহাশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা আমার সেই অধিকার হরণ করেছেন।'

নীতু বলল, 'তুমি কি কোনো দীর্ঘ বক্তৃতা দেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছ, বাবা? দীর্ঘ বক্তৃতা শোনার ইচ্ছা আমার নেই। ছোটবেলা থেকে তোমার দীর্ঘ বক্তৃতা এত শুনেছি যে বক্তৃতা ব্যাপারটা থেকে আমার মন উঠে গেছে।'

'তাও আমি জানি। বক্তৃতা দেয়া আমি বন্ধ করে দিয়েছি। এখন আমি আমার সব কথা শুভ্রর জন্যে জমা করে রাখি। সে এলে তাকে বলি।'

'ভালো। কথা শোনবার এক জন কেউ আছে।'

'তোর নেই?'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'না, আমার নেই। আমার কথা শোনবার কেউ নেই।'

মাহিন সাহেব গলার স্বর তীক্ষ্ণ করে বললেন, 'যে ছেলেটিকে তুই বিয়ে করতে যাচ্ছিস সে তোর কথা শোনে না?'

'তাকে কিছু বলতে ইচ্ছা করে না। সবাইকে সবকিছু বলা যায় না। আমি এখন যাই — তোমার খাবার রেডি করি।'

'কিছু রেডি করতে হবে না। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি কিছু খাব না।'

'সিদ্ধান্ত কখন নিলে?'

'গতকাল নিয়েছি। আজ তা কার্যকর করতে যাচ্ছি।'

'তার মানে এই দাঁড়াচ্ছে যে তুমি খাওয়া বন্ধ করে দিচ্ছ?'

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'আমার পক্ষে একা একা বাস করা সম্ভব না। আমি এক জন পরজীবী। রাস্তায় ভিক্ষা করে জীবনযাপন করব তাও সম্ভব না। অবাস্তব পরিকল্পনা।'

'না খেয়ে থাকার পরিকল্পনা বাস্তব?'

'এটিও অবাস্তব, তবে আমি কোনো বিকল্প পাচ্ছি না।'

'না খেয়ে না খেয়ে তুমি মারা যাবে এটিই কি তোমার পরিকল্পনা?'

'হ্যাঁ। তবে মৌলিক পরিকল্পনা না। আমার আগেও এক জন তা করে গেছেন। তাঁর নাম লিয়াওসিন – চৈনিক কবি। তিনি অবশ্যি করে গেছেন সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে। তিনি মৃত্যু কী, মৃত্যু কীভাবে মানুষকে গ্রাস করে তা জানার জন্য উপবাস শুরু করেন এবং ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগুতে থাকেন। তুই কি শুনতে চাস তাঁর অভিজ্ঞতার কথা?'

'না।'

'তোর শুনতে ভালো লাগবে। মৃত্যুর কাছাকাছি পৌছে যাবার সময় তিনি বেশ–কিছু ত্রিপদী কাব্য রচনা করেন। তার আক্ষরিক অনুবাদ ইংরেজিতে করা হয়েছে। ইংরেজি থেকে আমি কিছু কিছু বাংলা করেছিলাম। শুনবি?'

'না, শুনব না।'

'আচ্ছা একটা শোন–

"দিন হল রাত্রি, এবং রাত্রি হল দিন
মাথার ভেতর উঠল বেজে এক সহস্র বীণ।"

নীতু উঠে চলে গেল। মাহিন সাহেব দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। তিনি তাঁর পরিকল্পনায় মোটামুটি স্থির। খাওয়া বন্ধ। এই ভাবেই তিনি এখন মৃত্যুর দিকে এগুবেন। সবাইকে মুক্তি দিয়ে যাবেন। কাউকে আনন্দ দেবার ক্ষমতা এখন তাঁর নেই কিন্তু মুক্তি দেবার ক্ষমতা তাঁর অবশ্যই আছে। আবারো কান্নার শব্দ শুনছেন। রান্নাঘর থেকে কান্নার শব্দ আসছে। নীতুই কাঁদছে।

'নীতু! নীতু!'

নীতু ঘরে ঢুকল না। রান্নাঘর থেকেই বলল, 'কী?'

'তুই কি শুভ্রকে একটু খবর দিতে পারবি? ওর সঙ্গে আমার জরুরি কথা আছে। খুব জরুরি।'

'খবর দেব।'

'আজ খবর দিবি?'

'হ্যাঁ, আজই দেব।'

'তোর মাকে খবর দিতে পারবি? তোর মার সঙ্গেও আমার কথা বলা দরকার।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'মাকে খবর দেয়া যাবে না। মা ঢাকায় নেই। রাজশাহী গিয়েছেন। ছোট খালার মেয়ের বিয়ে।'

'যাবার সময় আমাকে কিছু বলেও যায় নি!'

'আমাকে বলে গেছে। আমি তোমাকে বললাম।'

মাহিন সাহেব করুণ গলায় বললেন, 'কয়েক মিনিটের জন্যে তুই কি আমার পাশে বসবি?'

নীতু কিছু না বলেই বাবার পাশে বসল। মাহিন সাহেব বললেন, 'তোর মা আমার ছাত্রীই ছিল। জানিস তো?'

'জানি। তোমাকে বিয়ে করার পর মার আর পড়াশোনা হয় নি – তাও জানি। তুমি কী বলবে বল – আমি শুনে চলে যাব। আমার অফিসের দেরি হয়ে যাবে।'

'থাক। কিছু বলব না।'

'তুমি যা বলতে চাচ্ছ তা অনুমান করতে পারছি। তুমি বলতে চাচ্ছ, এক সময় তোমার ছাত্রী তোমার প্রেমে পাগল হয়েছিল — ঘুমের ওষুধ পর্যন্ত খেয়েছিল — আজ সে রাজশাহী চলে গেল, তুমি কিছু জানলেও না। এটা বলার মতো কোনো ঘটনা না, বাবা। তুমি এক সময় উদাহরণ দিয়েছিলে — মৃগনাভির গন্ধও এক সময় শেষ হয়ে যায়। পড়ে থাকে এক খণ্ড পচা মাংসপিণ্ড।'

মাহিন সাহেব বললেন, 'আচ্ছা তুই যা।' নীতু উঠে চলে গেল। মাহিন সাহেব আবার ডাকলেন, 'নীতু!' নীতু!

নীতু এসে দাঁড়াল। মাহিন সাহেব বললেন, 'একটা সিগারেট ধরিয়ে আমার ঠোঁটে দিয়ে দিবি?' নীতু বলল, 'না। ঘরে সিগারেট নেই। থাকলেও দিতাম না।'

'তোকে দেখে এখন একটা কবিতা মনে পড়ছে – শুনবি? কোলরিজের কবিতা। বলব কয়েক লাইন?'

'বল।'

My heart leaps up when I behold
A rainbow in the sky;
So was it when my life began,
So is it now I am a man,
So be it when I shall grow old,
Or let me die!

নীতু বলল, 'এটা কোলরিজের কবিতা না, বাবা। ওয়ার্ডস ওয়ার্থের কবিতা। খুব কম করে হলেও দশ হাজার বার তুমি এই কবিতা আমাদের শুনিয়েছ। তোমার স্মৃতিশক্তিও নষ্ট হয়ে গেছে, বাবা।'

মাহিন সাহেব ক্লান্ত গলায় বললেন, 'ঠিক বলেছিস। স্মৃতিশক্তি নষ্ট হয়ে গেছে। পরজীবী প্রাণীর স্মৃতিশক্তির অবশ্যি তেমন প্রয়োজন নেই। তুই শুভ্রকে টেলিফোন করিস মনে করে।'

'করব।'

'আজই করবি। অফিসে গিয়েই করবি।'

'আচ্ছা।'

শুভ্রদের বাসার সামনে ছোটখাটো একটা ভিড়। কালোমতো রোগা এক জন তরুণী কাঁদছে। তরুণীর সঙ্গে দুটি মেয়ে। এদের বয়স ছ–সাত। এরা কাঁদছে না। তবে এদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দৃষ্টি ভয়ার্ত। মেয়ে দুটি মনিরুল ইসলামের কন্যা। তরুণী মেয়ে দুটির মা। তারা গত তিন দিন যাবৎ মনিরুল ইসলামের কোনো খোঁজ পাচ্ছে না। মানুষটা যেন হঠাৎ উধাও হয়ে গেছে। সকাল থেকে এরা 'কান্তা ভিলা'র সামনে দাঁড়িয়ে আছে। 'কান্তা ভিলা'র গেট খোলা হচ্ছে না। যে কোনো তরুণীকে কাঁদতে দেখলেই লোক জমে যায়। তরুণী রূপসী হলে তো কথাই নেই। লোক জমে গেছে। অভিজাত এলাকা বলেই ভিড় তত বেশি হয় নি। মনিরুল ইসলামের স্ত্রী একটা জিনিসই চায়। তা হল — বড় সাহেবের সঙ্গে কথা বলবে। বড় সাহেবের সঙ্গে দুটা কথা বলে চলে যাবে।

ইয়াজউদ্দিন খবর পেয়েছেন। তিনি ব্যাপারটায় কিছুমাত্র গুরুত্ব দিচ্ছেন না। গুরুত্ব দেয়ার মতো কোনো বিষয় এটা নয়। তা ছাড়া বাড়িতে তিনি তাঁর অফিসের কিংবা কারখানার কোনো কর্মচারীর সঙ্গে দেখা করেন না। তিনি গোমেজকে দিয়ে খবর পাঠালেন মেয়েটি যেন তাঁর অফিসে ঠিক বারটার সময় দেখা করে।

ইয়াজউদ্দিন সাহেব আজ অফিসে দেরি করে যাবেন। শুভ্রর চোখ দেখাতে হবে। চোখের ডাক্তাররা সাধারণত বিকেলে বসেন। ইয়াজউদ্দিন সাহেবের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা হয়েছে। ডাক্তার সাহেব শুভ্রকে দেখবেন সকালবেলা। তিনি শুভ্রকে নিয়ে যাবেন। রেহানা যাবেন না। কারণ ডাক্তার কি বলবেন বা বলবেন না ভেবে তাঁর খুব টেনশন হয়।

চোখের ডাক্তার প্রফেসর মনজুরে এলাহী শুভ্রর দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বললেন, 'কি খবর আমাদের শুভ্র বাবুর?'

মনজুরে এলাহী শুভ্রর চোখ ওর এগার বছর বয়স থেকে দেখে আসছেন। তখনো তিনি শুভ্র বাবু ডাকতেন— এখনো ডাকেন।

শুভ্র বলল, 'চাচা, আমি ভালো আছি।'

'তোমার চোখ কেমন আছে?'

'বুঝতে পারছি না। মনে হয় ভালোই আছে।'

'কোনো রকম সমস্যা হয়?'

'না।'

'হঠাৎ আলো বেড়ে যায় বা কমে যায়, এমন কি হয়?'

'হ্যাঁ হয়।'

'আচ্ছা বস দেখি এই চেয়ারে। রিলাক্সড হয়ে বস। চশমা খুলে ফেল। আমি এখন তোমার চোখে নানান রঙের আলো ফেলব। তুমি রংগুলো বলার চেষ্টা করবে।'

'আচ্ছা।'

'কোনো আলো ফেললে যদি এমন হয় যে চিনচিনে ব্যথা বোধ করছ বা অস্বস্তি বোধ করছ, তাও বলবে।'

'জ্বি আচ্ছা।'

আলো ফেলার পর্ব অনেকক্ষণ চলল। ডাক্তার সাহেব বললেন, 'শুভ্র, এখন আমি তোমার দুচোখে দুফোঁটা ওষুধ দেব। এট্রোপিন ড্রপ। এটা একধরনের এলকালয়েড। এই ওষুধ তোমার চোখের মণি ডাইলেট করে দেবে।'

শুভ্র বলল, 'আপনার যা ইচ্ছা করুন ডাক্তার চাচা। আমাকে কিচ্ছু বলার দরকার নেই। শুধু পরীক্ষা শেষ হবার পর বলবেন – আমি অন্ধ হয়ে যাচ্ছি কি যাচ্ছি না।'

'বোকার মতো কথা বোলো না, শুভ্র। অন্ধ হবে কেন?'

'আমার চোখ দ্রুত খারাপ হচ্ছে, ডাক্তার চাচা। এই জন্যেই প্রশ্ন করছি। যদি সত্যি অন্ধ হয়ে যাই — আগের থেকে জনতে চাই। আগে থেকে জানা থাকলে আমার সুবিধা।'

'কী সুবিধা?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সেই ভাবে ব্যবস্থা করব।'

মনজুরে এলাহী সাহেব বললেন– 'তোমার চোখ দ্রুত খারাপ হচ্ছে এটা সত্যি। রেটিনা থেকে যেসব অপটিক নার্ভ ব্রেইনে সিগন্যাল নিয়ে যাচ্ছে তারা দুর্বল হয়ে পড়েছে। তবে প্রসেসটা থামানো হয়েছে। এর আগে তোমার চোখ যতটা খারাপ ছিল এখনো ততটাই আছে। তার চেয়ে খারাপ হয় নি। এটা খুবই আশার কথা। ডিজেনারেশন প্রসেসকে থামানো গেছে।

'থ্যাংক ইউ, চাচা।'

'তুমি সব সময় আনন্দের ভেতর থাকতে চেষ্টা করবে। মনে আনন্দ থাকলে শরীর ভালো থাকে। শরীরের প্রাণবিন্দু হল মন। আমরা ডাক্তাররা বলি মস্তিষ্ক। কিন্তু আমরা নিশ্চিত না।'

ইয়াজউদ্দিন সাহেব ছেলেকে নিয়ে ফিরছেন। দুজনে বসেছেন পেছনের সিটে। ইয়াজউদ্দিন সাহেব এক হাতে শুভ্রর হাত ধরে আছেন। সাধারণত তিনি এমন করেন না। কিছু দূরত্ব ছেলের সঙ্গে তাঁর থাকে। আজ কোনো দূরত্ব অনুভব করছেন না।

'শুভ্র!'

'জ্বি।'

'ঐ দিন রিয়ার পার্টি তোমার কেমন লাগল?'

'ভালো লেগেছে।'

'পার্টি তো তোমার সচরাচর ভালো লাগে না। ঐ পার্টি ভালো লাগল কেন?'

'মূল হৈচৈ–এর সঙ্গে ছিলাম না। আলাদা ছিলাম।'

'নীতুর সঙ্গে কথা হয়েছে।'

'হ্যাঁ, হয়েছে।'

'মেয়েটিকে কি তোমার পছন্দ হয়েছে?'

'হ্যাঁ, হয়েছে।'

'ঐ মেয়েটির কোন দিক তোমার সবচে' ভালো লেগেছে?'

'বুদ্ধি। দারুণ বুদ্ধি।'

'আমার নিজেরও মেয়েটিকে দারুণ পছন্দ। তবে বুদ্ধির জন্যে নয়। আমার কাছে নীতুর বুদ্ধি এমন কিছু বেশি মনে হয় নি। আমার যা ভালো লেগেছে তা হল — মেয়েটি আশপাশের মানুষকে বুঝতে চেষ্টা করে। বেশিরভাগ মানুষই যা করে না। অথচ আশপাশের মানুষকে বোঝার চেষ্টা খুব জরুরি।'

'সবার জন্যেই কি জরুরি?'

'সবার জন্যে জরুরি নয় অবশ্য। কারো কারো জন্যে জরুরি। তোমার জন্যে খুব জরুরি। যে তোমার স্ত্রী হবে তার জন্যে আরো জরুরি। কারণ বিশাল কর্মকাণ্ড তোমাকে এবং তোমার স্ত্রীকে পরিচালনা করতে হবে। আমার অবসর নেবার সময় হয়ে এসেছে। আমার শরীর ভালো না। আমি বিশ্রাম নেব। তবে বিশ্রাম নেবার আগে দেখে যেতে চাই — সব গুছিয়ে ফেলেছি।'

শুভ্র বলল, 'বাবা, তুমি কি চাও যে আমি নীতু মেয়েটিকে বিয়ে করি?'

'হ্যাঁ, আমি চাই। তোমার পছন্দের কেউ যদি থাকত আমি বলতাম না। তোমার পছন্দের কেউ নেই। তোমাকে এ ব্যাপারে অনেক বার জিজ্ঞেস করা হয়েছে। তুমি প্রতিবারই না বলেছ।'

শুভ্র বলল, 'আমি ভুল বলেছি, বাবা। আমার পছন্দের এক জন আছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইয়াজউদ্দিন সাহেব হতভম্ভ হয়ে বললেন, 'তার নাম জানতে পারি?'

'হ্যাঁ পার। নীতু আপা। সাবেরের বোন।'

'শুভ্র, তুমি আমার সঙ্গে কোনো হেঁয়ালি করছ না তো।'

'না, হেঁয়ালি করছি না।'

'মেয়েটিকে তুমি আপা ডাক?'

'জ্বি।'

'আমি যতদূর জানি মেয়েটির আগে একবার বিয়ে হয়েছিল। সে বিয়ে টেকে নি।'

'তুমিই ঠিকই জান, বাবা। তোমার ইনফরমেশন কখনো ভুল হয় না।'

'মেয়েটির আরেকটি ছেলের সঙ্গে বিয়ে ঠিকঠাক হয়ে আছে – এও বোধহয় সত্য।'

'হ্যাঁ।'

'তুমি কি তোমার আবেগের কথা মেয়েটিকে বলেছ?'

'না, এখনো বলি নি। তবে বলব।'

'মেয়েটি বয়সে তোমার চেয়ে বড়?'

'জ্বি বাবা, বড়। বছর চারেকের বড়। সেটা কি কোনো বড় সমস্যা? চল্লিশ বছরের পুরুষ তো কুড়ি বছরের মেয়ে বিয়ে করছে।'

'শুভ্র, আমি তোমার সঙ্গে কোনো তর্কে যেতে চাচ্ছি না। তর্ক করার এটা কোনো উপযুক্ত সময় নয়। তা ছাড়া তুমি এখন যে ভঙ্গিতে আমার সঙ্গে কথা বলছ তাতে মনে হচ্ছে তুমি তর্ক শুনতে প্রস্তুত নও। একটা সময় আসে যখন সব যুক্তি অর্থহীন মনে হয়।'

'আমি তোমার যুক্তি খুব মন দিয়ে শুনি বাবা। এখনো শুনব।'

'এখন আমার নিজের মনও বিক্ষিপ্ত। অফিসে যাব। মনিরুল ইসলাম নামের আমার এক জন কর্মচারীর স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলব। মনিরুল ইসলামকে নাকি কদিন থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। যাই হোক, আমি অফিসে নেমে যাব। তুমি গাড়ি নিয়ে বাসায় চলে যাও। বাই দ্যা ওয়ে, তোমার মার সঙ্গে এ ব্যাপারে কোনো কথা বোধহয় এই মুহূর্তে না বলাই ভালো। তার শরীর ভালো না। সামান্য উত্তেজনা সহ্য করার ক্ষমতাও তার নেই।'

'আমি কি নীতু আপার সঙ্গে কথা বলতে পারি? দেখা করতে পারি তাঁর সঙ্গে?'

'এখন নয়।'

ইয়াজউদ্দিন সাহেব অফিসে নেমে গেলেন। ঠিক বারটায় মনিরুল ইসলামের স্ত্রীকে ডেকে পাঠালেন। সহজ গলায় বললেন, 'আপনার সমস্যা বলুন। কেঁদে কেঁদে বললে আমি কিছুই বুঝব না। শান্ত হোন। শান্ত হয়ে বলুন।'

ভদ্রমহিলার বক্তব্য ইয়াজউদ্দিন সাহেব পুরোটা শুনলেন। গভীর মনোযোগের সঙ্গে শুনলেন। তারপর বললেন, আপনার জন্যে আমার খুবই খারাপ লাগছে। আপনি অস্থির হয়ে পড়েছেন দেখতে পাচ্ছি। অস্থির হওয়াটাই স্বাভাবিক। যে কেউ অস্থির হবে। বড় বড় কারখানায় অনেক ধরনের রাজনীতি চলে। ইউনিয়ন ক্ষমতার ভাগবাটোয়ারা নিয়ে জটিলতা থাকে। সেটা ধ্বংসাত্মক পর্যায়ে চলে যায়। আমি পুলিশকে বলে দিচ্ছি যেন তারা একটা খোঁজ বের করার চেষ্টা করে। আপনি এখানকার ইউনিয়ন কর্মকর্তা যারা আছে তাদের সঙ্গে কথা বলুন। এরা অনেক কিছু জানে। জেনেও চুপ করে থাকে। মনে হচ্ছে আপনার কিছু আর্থিক সহায়তাও দরকার। আমি ক্যাশিয়ারকে বলে দিচ্ছি। সে আপনাকে কিছু টাকা দেবে। মনিরুল ইসলামের প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা।

ইয়াজউদ্দিন সাহেব স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। কারখানার সমস্যা সামলানো হয়েছে। খুব চমৎকারভাবেই সামলানো হয়েছে। আগামী দুবছর আর কোনো সমস্যা হবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১০

শুভ্র শুয়ে ছিল। মাঝে মাঝে কিছুই ভালো লাগে না। শুয়ে থাকতে ইচ্ছা করে। আজ মনে হয় সে রকম একটা দিন। আকাশ মেঘলা। বিছানা থেকে আকাশের মেঘ দেখা যায়। এই মেঘ সে আর কতদিন দেখতে পারবে? শুভ্র ছোট্ট করে নিশ্বাস ফেলল। রেহানা ঘরে ঢুকে বললেন, 'একটা মেয়ে তোকে টেলিফোন করেছে। বলেছে নীতু আপা। টেলিফোন ধরবি?'

'হ্যাঁ।'

'শুয়ে আছিস যখন শুয়ে থাক। আমি পরে টেলিফোন করতে বলি।'

'না, আমি যাচ্ছি।'

'মেয়েটা কে?'

'তুমি চিনবে না, মা। আমার বন্ধু ছিল সাবের – ওর বড় বোন।'

রেহানা বললেন, 'শুভ্র, আমার শোবার ঘরের টেলিফোন নাম্বার তুই সবাইকে দিয়ে বেড়াবি না। অপরিচিত কারোর টেলিফোন ধরতে আমার ভালো লাগে না। কাউকে যদি টেলিফোন দিতেই হয় – একতলারটা দিবি।'

'আচ্ছা'

'আমার কথায় আবার রাগ করলি না তো শুভ্র?'

'না, রাগ করি নি। তোমার উপর তো আমি কখনো রাগ করি না, মা।'

রেহানা বললেন, 'অন্যায় কিছু বললেও রাগ করবি না?'

'না।'

'কেন?'

'আমি ছাড়া তোমার কেউ নেই, মা। আমি রাগ করলে তুমি যাবে কোথায়?'

রেহানার চোখে পানি এসে গেল। তিনি চট করে অন্যদিকে তাকালেন। ছেলেকে তিনি তাঁর চোখের পানি দেখাতে চান না। শুভ্র টেলিফোন ধরল।

'হ্যালো, নীতু আপা?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি কেমন আছ?'

'ভালো আছি।'

'তোমাকে কখনো টেলিফোন করে পাওয়া যায় না। যখনই টেলিফোন করি, আমাকে বলা হয়, তুমি বাসায় নেই। কিংবা তুমি ঘুমাচ্ছ। বাসায় যখন থাক তখন কি সারাক্ষণ তুমি ঘুমিয়েই থাক?'

শুভ্র হাসল।

নীতু বলল, 'শুভ্র, তোমাকে আমার খুব দরকার। না ঠিক আমার না, আমার বাবার দরকার।'

'উনার কি শরীর ভালো নেই?'

'উনার কিছুই ভালো নেই। উনি গত দুদিন ধরে খাওয়াদাওয়া বন্ধ করেছেন।'

'কেন?'

'উনি ঠিক করেছেন — অনাহারে থেকে আস্তে আস্তে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাবেন। এক চৈনিক কবিও নাকি তাই করেছেন। কবির নাম হল — লিয়াও সিন কিংবা লিয়াও ঝিন। তুমি কি আসতে পারবে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'পারব।'

'বাবা তোমাকে কিছু বলতে চান। তুমি দয়া করে শোন উনি কী বলতে চাচ্ছেন।

'আপা, আমি আপনাকে একটা খুব জরুরি কথা বলতে চাই।'

'আমাকে আবার কী জরুরি কথা?'

'আপনি চুপ করে শুনুন। দয়া করে রাগ করবেন না।'

'এমন কী কথা যে রাগ করার প্রশ্ন আসে?'

'আমি আপনাকে খুব পছন্দ করি।'

'এটা তো রাগ করার মতো কথা না, শুভ্র। খুশি হবার মতো কথা। আমিও তোমাকে পছন্দ করি। বাবা তোমাকে যতটা পছন্দ করেন ততটা হয়তো না। কিন্তু কমও না।'

'আমি যে আপনাদের বাসায় প্রায়ই যাই — চাচার সঙ্গে দেখা করতেই যাই। কিন্তু যখন দেখি আপনি বাসায় নেই তখন ভয়ংকর খারাপ লাগে।'

'ও আচ্ছা।'

'প্রায়ই আমি আপনাকে স্বপ্নে দেখি। কাল রাতেও দেখেছি।'

'শুভ্র, তুমি কী বলতে চাচ্ছ আমি বুঝতে পারছি না। তোমার শরীর ভালো তো!'

'হ্যাঁ, শরীর ভালো নীতু আপা, এখন আমি আপনাকে একটা ভয়াবহ কথা বলব।'

'ভয়াবহ কথা তুমি বলে ফেলেছ বলে আমার ধারণা।'

'না, বলি নি। এখন বলব। নীতু আপা, আমি আপনাকে বিয়ে করতে চাই।'

নীতু চুপ করে রইল। মনে হচ্ছে হঠাৎ টেলিফোন ডেড হয়ে গেছে। শুভ্র বলল, 'আপনি কি আমার কথা শুনতে পেয়েছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি কি রাগ করেছেন?'

'টেলিফোনে না। মুখোমুখি আমি তোমার সঙ্গে কথা বলব।'

'আমি কি এখন আসব?'

'না এখন না। কাল এস। আমার কোনো ভালো শাড়ি নেই। শুভ্র, আমি সুন্দর একটা শাড়ি কিনব। আজই কিনব। কী রং তোমার পছন্দ বল তো?'

'নীতু আপা, আপনি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন?'

'বুঝতে পারছি না। তুমি আমার মাথা এলোমেলো করে দিয়েছ। তুমি কাল এস কাল আমি তোমার সঙ্গে কথা বলব। রাখি শুভ্র।'

১১

জাহেদ মহাবিপদে পড়েছে। মিজান সাহেব দেশের বাড়িতে পৌঁছে ঘোষণা দিয়েছেন এখানেই থাকবেন — আর শহরে ফিরবেন না। গ্রামে থাকার ব্যবস্থা নেই বললেই হয়। টিনের ঘর দুটির ভগ্নদশা। ভিটের ভেতর মানুষ সমান ঘাস গজিয়েছে। বাড়ির দরজা-জানালা লোকজনে খুলে নিয়েছে। খাট-চৌকি কিছুই নেই। মেঝেতে বিছানা করে ঘুমাতে হবে। মেঝেময় গর্ত। সাপের না ইঁদুরের, কে বলবে?

জাহেদ বলল, 'এর মধ্যে কি থাকবে? চল কোনো আত্মীয়স্বজনের বাড়ি গিয়ে উঠি। খাওয়াদাওয়া তো করতে হবে। খাব কী? এখানে তো আর হোটেল নেই।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিজান সাহেব বললেন, 'নিজের বাড়ি থাকতে পরের বাড়িতে থাকব, তোর কি ব্রেইন ডিফেক্ট হয়েছে, নিজের ভাঙা বাড়িই হচ্ছে অট্টালিকা। এইখানেই থাকব।'

'আর খাওয়াদাওয়া?'

'হাঁড়িকুড়ি কিছু আন। ইট পেতে আগুন করে রান্না হবে। পিকনিক হবে, বুঝলি? রোজ পিকনিক। নিজের বাড়ি থাকতে অন্যের বাড়ি আমি খাব না। শেষে বিষ-টিষ মিশিয়ে দেবে।'

'বিষ মিশাবে কেন?'

'আরে গাধা, চারদিকে শত্রু। জমিজমা সব বেদখল হল কী জন্যে? কারা এইসব নিল? তবে এসেছি যখন সব শায়েস্তা করে যাব। দরকার হলে মার্ডার করব। মামা ভাগ্নে যেখানে বিপদ নেই সেখানে। কিরে, পারবি না আমাকে সাহয্য করতে?'

জাহেদ চোখে অন্ধকার দেখছে। এ কী সমস্যা!

রাতে থাকার জন্যে চৌকি জোগাড় করা হয়েছে। চৌকির উপর তোশক বিছিয়ে বিছানা। খাবার ব্যবস্থা জাহেদের দূর সম্পর্কের এক খালার বাসায়। মিজান সাহেব কিছুতেই সেখানে খেতে যাবেন না। জাহেদ একা গিয়ে খেয়ে এল। বাটিতে করে খাবার নিয়ে এল। মিজান সাহেব সেই খাবারও মুখে দিলেন না। চোখ কপালে তুলে বললেন, 'অসম্ভব। তুই কি আমাকে মারতে চাস? স্বপাক আহার করব। নিজে রেঁধে খাব।'

তৃতীয় দিনের দিন সে প্রায় জোর করেই মামাকে নিয়ে ঢাকায় এসে নামল। ট্রেন থেকে তিনি নামলেন বদ্ধ উন্মাদ অবস্থায়। রিকশায় উঠে রিকশাওয়ালাকে করুণ গলায় বললেন, 'এরা আমাকে খুন করতে নিয়ে যাচ্ছে, বুঝলেন ভাই সাহেব। গ্রামের বাড়িতে সুখে ছিলাম, ভুলিয়ে ভালিয়ে এনেছে। গরু জবেহ্ করার বড় ছুরি আছে না? ঐটা দিয়ে জবেহ্ করবে। ঘুমের মধ্যে কাম সারবে। আল্লাহ্ আকবর বলে গলায় পোঁচ।'

তিনি বাসায় ঢুকলেন স্বাভাবিক ভঙ্গিতে। মনোয়ারাকে দেখে খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'কিরে মাগী — স্বামীকে খুন করাতে চাস? বেশ, খুন কর। কিচ্ছু বলব না। চিৎকারও দিব না। তবে খিয়াল রাখিস, আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। খুনের সময় আমাকে কিন্তু উত্তর-দক্ষিণে শোয়াবি। ভালোমতো গোসল দিবি। নাপাক অবস্থায় আল্লাহর কাছে যেতে চাই না।'

মনোয়ারা মাথা ঘুরে মেঝেতে পড়ে গেলেন। মিজান সাহেবের মেয়ে দুটি ভয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগল। তিনি তাদের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বললেন – 'খুকিরা, ভয়ের কিছু নেই। নির্ভয়ে থাক।'

জাহেদ পাড়ার ডাক্তার সাহেবকে ডেকে আনল। তিনি ঘুমের ইনজেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিলেন। জাহেদকে বললেন, 'রোগীর অবস্থা ভালো দেখছি না। যে কোনো সময় ভায়োলেন্ট পর্যায়ে চলে যেতে পারে। আপনি বরং কোনো একটা ক্লিনিকে ভর্তি করিয়ে দেন। বাচ্চা কাচ্চার সংসার। একটা দুর্ঘটনা ঘটতে কতক্ষণ? ইনজেকশনের এফেক্ট বিকেল পর্যন্ত থাকবে। এরমধ্যে একটা ব্যবস্থা করে ফেলুন। বনানীতে একটা ক্লিনিক আছে — নাম হল মেন্টাল হোম। ইলেকট্রিক শক দেবার ব্যবস্থা আছে। ঠিকানা আছে আমার কাছে — চার্জ বেশি। কিন্তু টাকার দিকে তাকালে তো এখন হবে না। দেব ঠিকানা?'

জাহেদ বলল, 'দিন।'

'আপনাদের বংশে পাগলের হিস্ট্রি আছে?'

'জ্বি না।'

'আজকাল অবশ্যি হিস্ট্রি ফিস্ট্রি লাগে না। এমনিতেই লোকজন পাগল হয়ে যাচ্ছে। খোঁজ নিলে দেখবেন ডিসপেনসারিগুলোতে নার্ভ ঠাণ্ডা রাখার ওষুধ সবচে' বেশি বিক্রি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়। ঘুমের ওষুধ ছাড়া কেউ ঘুমাতে পারে না।'

সন্ধ্যাবেলা জাহেদ তার মামাকে মেন্টাল হোমে ভর্তি করিয়ে দিয়ে এল। তিন হাজার টাকা অগ্রিম জমা দিতে হল। দৈনিক তিনশ টাকা হিসেবে দশ দিনের ভাড়া। এই তিনশ টাকার মধ্যে খাওয়া খরচ ধরা নেই। মনোয়ারা তাঁর গয়না বিক্রি করলেন। বেবিট্যাক্সি ভাড়া করে আত্মীয়স্বজনদের বাড়ি ঘুরতে লাগলেন ধারের জন্যে।

বিপদ একদিকে আসে না। নানানদিকে এক সঙ্গে এসে সাঁড়াশি আক্রমণ করে। মিজান সাহেবের বাড়িওয়ালা জাহেদকে নিজের বাড়িতে ডেকে নিয়ে গেলেন। চা খাওয়ালেন, পাপড় ভাজা খাওয়ালেন। অমায়িক ভঙ্গিতে বললেন, 'আপনার মামার খবর শুনলাম। খুবই দুঃখ পেয়েছি। দুঃখ পাবারই কথা। অতি ভদ্রলোক ছিলেন। মাসের তিন তারিখে মাসের ভাড়া পেয়েছি। কোনো দিন দেরি হয় নাই। শেষে কয়েকমাসে কিছু সমস্যা হয়েছে। সমস্যা হতেই পারে। দিন তো সমান যায় না। সাগরে যেমন জোয়ার ভাটা আছে — মনের জীবনেও জোয়ার ভাটা আছে। সবই বুঝি। কিন্তু জাহেদ সাহেব, আমার ব্যবস্থাটা কী?'

জাহেদ বলল, 'একটু সময় দিন। মামার অফিসে লোনের জন্য দরখাস্ত করছি — লোনটা পেলে প্রথমেই আপনার টাকাটা দিয়ে দেব।'

'আমাকে টাকা দিলে তো আপনার চলবে না। আপনাদের খরচপাতিও আছে না। পাগলের চিকিৎসা খুবই খরচের চিকিৎসা। আগে যক্ষ্মা ছিল রাজরোগ এখন রাজরোগ হল 'পাগলামি।' আমাকে কোনো টাকা-পয়সা দিতে হবে না।'

'বলেন কী?'

'সত্যি কথা বললাম ভাই। আমিও ভদ্রলোকের ছেলে। মানুষের বিপদ-আপদ বুঝি। আমাকে কোনো টাকা-পয়সা দিতে হবে না। তবে এই মাসের ২৮ তারিখের মধ্যে বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে। আমি অন্য জায়গায় ভাড়া দিয়ে দিয়েছি। ৩০ তারিখে ভাড়াটে চলে আসবে।'

'কী সর্বনাশের কথা!'

'কোনো সর্বনাশের কথা না ভাই। বাস্তব কথা। বাস্তব অস্বীকার করতে নাই। বাস্তব স্বীকার করে নিতে হয়। এখনো তিন-চার দিন সময় আছে। একটা বাসা ঠিক করে উঠে চলে যান। আমি আপনাকে সাহায্য করব। আমার ট্রাক আছে। ট্রাক দিয়ে মালপত্র পাঠানোর ব্যবস্থা করব। একটা পয়সা লাগবে না। শুধু পেট্রোলের খরচ হিসাবে কিছু ধরে দেবেন।'

জাহেদ বলল, 'আপনি তো ডেনজারাস লোক।'

'উপকার করতে গেলে ডেনজারাস লোক হতে হয়। এইজন্যে উপকার করতে নাই। ছমাসের ভাড়া মাফ করে দিলাম এটা চোখে পড়ল না? নেন ভাই ধরেন। সিগারেট খান। নাকি ধূমপান করেন না?'

জাহেদ সিগারেট নিল না। তার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে। সামান্য সিগারেটের ধোঁয়াতে সেই ভাঙা আকাশের কিছু হবে না।

'ভাইসাহেব এই হল আমার বক্তব্য। চা আরেক কাপ দিতে বলব?'

'বলুন।'

'শুনেছি আপনিও বিবাহ করেছেন?'

'ঠিকই শুনেছেন।'

জাহেদ কেয়ার সঙ্গে দেখা করতে গেল। কেয়ার দুলাভাই ঘরে ছিলেন। তিনি কঠিন ভঙ্গিতে বললেন, 'কী খবর?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাহেদ বলল, 'ভালো।'

'বোস।'

জাহেদ বসল। ভদ্রলোক শুকনো গলায় বললেন, 'তোমার ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারছি না। স্ত্রীকে এখানেই ফেলে রাখবে?'

'জ্বি না — একটু সমস্যা যাচ্ছে। সাময়িক সমস্যা। বাড়ি ভাড়া করেছি। সামনের সপ্তাহে নিয়ে যাব।'

'কোথায় বাড়ি ভাড়া করেছ?'

'ইয়ে সোবাহানবাগ। ফ্ল্যাট বাড়ি। দুই রুম। দুই বাথরুম।'

'ভাড়া কত?'

'ইয়ে ভাড়া এখনো সেটল হয় নাই — দুই হাজার চাচ্ছে — মনে হয় কিছু কমবে। ফার্নিচার টার্নিচার এখনো কেনা হয় নি। এইসব কেনাকাটা করছি। কেয়া কি আছে? গুলশান মার্কেট থেকে কিছু ফার্নিচার কিনব। ভাবছি ওকে সঙ্গে নিয়েই কিনি।'

'ও যেতে পারবে না। জ্বর।'

'জ্বর নাকি?'

'গোসল করে সারারাত ঠাণ্ডা বাতাসে বসে বুকে ঠাণ্ডা বাধিয়েছে। কারো কথা তো শোনে না।'

কেয়ার অনেক জ্বর। তবু সে বলল, সে যাবে। কেয়ার বড় বোন বললেন, 'তুই কি অসুখ আরো বাড়াতে চাস? ডাক্তার বলে গেল নিউমোনিয়ার লক্ষণ।'

কেয়া বলল, 'ঘরে বসে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। একটু ঘুরে আসি।'

'তুই ইচ্ছা করে অসুখ বাড়াচ্ছিস।'

'আমি চলে আসব আপা।'

কেয়া বলল, 'হুড ফেলে দাও।'

জাহেদ বলল, 'এই অবস্থায় হুড ফেলে দেব কি? তোমার তো সিরিয়াস ঠাণ্ডা লাগবে।'

'লাগুক।'

'তুমি আমার হাত ধরে বসে থাক। আজ অনেকক্ষণ ঘুরবে। তুমি ভালো আছ তো?'

'আছি।'

'নীল শার্টটা কিনেছ?'

'না, এখনো কিনি নি।'

'এখনো কেন নি। কবে কিনবে?'

'খুব শিগগিরই কিনব।'

'দুলাভাইকে যে দুরুমের ফ্ল্যাটের কথা বলছিলে — বানিয়ে বানিয়ে বলছিলে, তাই না?'

'হুঁ।'

'আমি বুঝতে পেরে মনে মনে হাসছিলাম। বানিয়েই যখন বলছ দুরুমের ফ্ল্যাট বললে কেন? বললে না কেন চার রুমের দখিন দুয়ারী ফ্ল্যাট। একটা সার্ভেন্টস রুম।'

'চল, ফিরে যাই কেয়া।'

'না, এখন ফিরব না। অনেক রাত পর্যন্ত ঘুরব। তোমার মামার অবস্থা কি?'

'অবস্থা ভালো না।'

'ভালো না হলে বলার দরকার নেই। খারাপ কিছু শুনতে ইচ্ছা করছে না। তুমি কি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাতে খেয়েছ?'

'না।'

'তাহলে চল তো — কোনো একটা ভালো রেস্টুরেন্টে চল। তুমি খাবে আমি দেখব। আমার সঙ্গে টাকা আছে।'

'তুমি সুস্থ হয়ে নাও তারপর একসঙ্গে দুজনে খাব।'

'না, আজই তুমি খাবে। আমি দেখব। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে অনেকদিন তুমি আরাম করে কিছু খাও না। তোমার স্বাস্থ্য যে কি খারাপ হয়েছে তা তুমি জান? আচ্ছা এক কাজ কর, হুড তুলে দাও। আমার খুব ঠাণ্ডা লাগছে। জ্বর বেড়েছে বোধহয়। দেখ তো। আচ্ছা এত সংকোচ করে গায়ে হাত দিচ্ছ কেন? আমি তোমার স্ত্রী।'

১২

ইয়াজউদ্দিন সাহেবের শরীর খারাপ লাগছে। সন্ধ্যাবেলা ডাক্তার এসে দেখে গেছেন। বলেছেন প্রেসার হাই। সিডেটিভ খেতে দিয়েছেন। ঘর অন্ধকার করে শুয়ে থাকতে বলেছেন। তিনি ঘর অন্ধকার করেই শুয়ে আছেন। রেহানা তেঁতুলের শরবত নিয়ে এসেছেন। তিনি বাধ্য শিশুর মতো শরবত খেলেন। গ্লাস নামিয়ে রেখে বললেন, 'শুভ্র কি ঘরে আছে?'

'হ্যাঁ আছে।'

'কী করছে?'

'জানি না তো। দেখে আসব?'

'দেখে আসতে হবে না। তুমি রিয়াকে টেলিফোনে আসতে বল। বলবে খুব জরুরি।'

'কী হয়েছে?'

'কিছু হয় নি। ভালো কথা, শুভ্র কি আজ দিনে কোথাও বের হয়েছিল?'

'না।'

'তুমি শুভ্রকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। আর শোন, আমি যতক্ষণ কথা বলব তুমি ঘরে ঢুকবে না।'

'কী ব্যাপার?'

'কোনো ব্যাপার না।'

'ডাক্তার তোমাকে চুপচাপ শুয়ে থাকতে বলেছে।'

'আমি চুপচাপ শুয়েই আছি।'

রেহানা চিন্তিত মুখে ঘর থেকে বের হলেন। শুভ্র তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘরে ঢুকল। ইয়াজউদ্দিন সাহেব বললেন, 'আমার পায়ের কাছের চেয়ারটায় বস শুভ্র, আমি তোমার সঙ্গে কিছু কথা বলব। পায়ের কাছে বসলে আমি তোমার মুখ দেখতে পারব।'

শুভ্র বলল, 'অন্ধকারে মুখ দেখবে কী করে?'

'টেবিলল্যাম্পটা জ্বালিয়ে দাও।'

শুভ্র বাতি জ্বালাল। ইয়াজউদ্দিন খাটে আধশোয়া হয়ে বসে আছেন। তার খালি গা। তাঁর সারা গায়ে বিন্দু বিন্দু ঘাম। খাটের মাথায় রাখা তোয়ালে দিয়ে তিনি শরীরের ঘাম মুছলেন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'শুভ্র!'

'জ্বি বাবা।'

'আমি তোমাকে কী পরিমাণ ভালবাসি তা কি তুমি জান?'

'জানি।'

'না, তুমি জান না।'

শুভ্র হেসে ফেলল। ইয়াজউদ্দিন সাহেব কঠিন গলায় বললেন, 'হাসলে কেন?'

'তোমার ছেলেমানুষিতে হাসছি বাবা। ছেলেকে ভালবাসায় তুমি আলাদা কিছু না। অন্য সব বাবাদের মতোই। পৃথিবীর সব বাবাই তাঁদের ছেলেমেয়েদের প্রচণ্ড ভালবাসেন। তুমি এমন কোনো বাবার কথা বলতে পারবে যে তাঁর ছেলেকে ভালবাসে না।'

শুভ্র তুমি কি আমার সঙ্গে তর্ক করতে চাচ্ছ?'

'তর্ক করতে চাচ্ছি না। তোমার লজিকের ভুল ধরিয়ে দিচ্ছি।'

'ভুল ধরিয়ে দিচ্ছ?'

'হ্যাঁ ভুল ধরিয়ে দিচ্ছি। তুমি সারাজীবন মনে করে এসেছ তোমার লজিক অভ্রান্ত। তুমি যা ভাবছ তাই সত্যি।'

'এ রকম মনে করার যথেষ্ট কারণ কি নেই?'

'কারণ আছে। তোমার মতো ভালো লজিক দিতে আমি এ পর্যন্ত শুধু এক জনকেই দেখেছি।'

'কে? তোমার নীতু আপা?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি কী তাকে বলেছ যে তাকে তুমি বিয়ে করতে চাও?'

'বলেছি।'

'সে কী বলেছে?'

'আগামীকাল আমাকে দেখা করতে বলেছেন।'

'তুমি তাহলে আগামীকাল তার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ, যাচ্ছি।'

'আমি যদি বলি যেও না। তারপরেও যাবে?'

'হ্যাঁ, যাব। তুমি কি আমাকে যেতে নিষেধ করছ?'

'না নিষেধ করছি না। তুমি অবশ্যই যাবে।'

ইয়াজউদ্দিন সাহেব দম নেবার জন্যে থামলেন। তোয়ালে দিয়ে আবার গায়ের ঘাম মুছলেন। তাঁর পানির পিপাসা হচ্ছে। হাতের কাছে রাখা পানির গ্লাসটা শূন্য। শুভ্র বলল, 'পানি এনে দেব বাবা?'

'দাও।'

শুভ্র পানি এনে দিল। তিনি এক নিশ্বাসে সবটুকু পানি খেলেন। শুভ্রর দিকে তাকিয়ে হাসলেন। শুভ্রও হাসল। ইয়াজউদ্দিন সাহেব বললেন, 'আমরা এমন ভাবে কথা বলছি যেন দুজন দুজনের প্রতিপক্ষ। তা কিন্তু না শুভ্র। আমরা আলোচনা করতে বসেছি। গল্প করতে করতে হাসিমুখে আলোচনা করা যায়।'

'আমি তোমাকে কখনোই প্রতিপক্ষ ভাবি না বাবা। কখনোই না।'

'না ভাবাই ভালো। আমি খুব শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী। তুমি যুদ্ধে আমার সঙ্গে পারবে না। হেরে যাবে।'

'না বাবা, তা হবে না। আমি হারব না। তুমিও আমাকে হারাতে পারবে না। তুমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভুলে যাচ্ছ আমি তোমারই ছেলে। তোমার যেমন হেরে অভ্যাস নেই — আমারও নেই।'

ইয়াজউদ্দিন সাহেব বালিশের নিচ থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করলেন। সিগারেট তাঁর জন্যে পুরোপুরি নিষিদ্ধ কিন্তু এখন তিনি সিগারেটের জন্যে প্রবল তৃষ্ণা বোধ করছেন।

'শুভ্র আমি যে অসুস্থ তা কি তুমি জান?'

'জানি বাবা।'

'পুরোপুরি বোধহয় জান না। আমি গুরুতর অসুস্থ। কাউকে তা বুঝতে দেই না। নিজের সমস্যা আমি নিজের মধ্যে রাখতে ভালবাসি।'

'আমিও তাই করি। আমিও নিজের কষ্ট নিজের ভেতর রাখার চেষ্টা করি। মা যখন আমাকে জাহেদের বিয়েতে যেতে দিল না — আমার খুব কষ্ট হয়েছিল। আমি তো মাকে কিছুই বলি নি। আমি আমার এই দরিদ্র বন্ধুকে সামান্য একটা উপহার দিতে চেয়েছিলাম। তুমি তা দিতে দাও নি। আমি তো কোনো অভিযোগ করি নি।'

'এখন করছ?'

'হ্যাঁ, এখন করছি। তুমিও করছ বাবা। কাজেই সমান সমান।'

'হ্যাঁ, সমান সমান।'

'বাবা, তুমি কি লক্ষ করছ আমি লজিকে তোমাকে হারিয়ে দিচ্ছি।'

'হ্যাঁ, লক্ষ করছি।'

'তুমি কি রেগে যাচ্ছ?'

'না, রেগে যাচ্ছি না।'

ইয়াজউদ্দিন সাহেব প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করতে করতে বললেন, 'টি ব্রেক নিলে কেমন হয় শুভ্র।'

শুভ্র বলল, 'ভালোই হয়।'

'আমার চায়ের তৃষ্ণা হচ্ছে। তোর মাকে চা দিতে বলি।

'বল এবং মাকে এখানে আসতে বল বাবা। মা কেন আলোচনার বাইরে থাকবে?'

'তার বাইরে থাকাই ভালো। আমি এখন কিছু কিছু কঠিন কঠিন কথা বলব। তোমাকে কঠিন কথা বললে তোমার মা সহ্য করতে পারে না। সে হৈচৈ করতে থাকবে। আমি হৈচৈ সহ্য করতে পারি না।'

'তোমার কঠিন কথাগুলো বল বাবা, শুনি।'

'কঠিন কথা হল, আমি আজ থেকে অবসর নিয়েছি। সমস্ত কর্মকাণ্ড থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছি। আমার যা আছে সবকিছু দেখার এবং সবকিছু চালিয়ে নেবার দায়িত্ব এখন তোমার। তবে ভয় পাবার কিছু নেই। একদল দক্ষ সেনাপতি তৈরি করা আছে। তারা তোমাকে চালিয়ে নিয়ে যাবে। তুমি ভুল করবে। ভুল করতে করতে শিখবে।'

'তুমি কী করবে?'

'আপাতত চিকিৎসার জন্যে বাইরে যাব। তোমার মাকে নিয়ে যাব। কিছুদিন ঘুরব বাইরে বাইরে। কতদিন তা জানি না।'

রেহানা চা নিয়ে ঢুকলেন। ভীত গলায় বললেন, 'রিয়াকে টেলিফোন পাওয়া যায় নি।' 'ইয়াজউদ্দিন সাহেব বললেন, 'ওকে লাগবে না। রেহানা আজ যে একটা বিশেষ দিন তা কি তুমি জান?' রেহানা চুপ করে রইলেন। ইয়াজউদ্দিন সাহেব ক্লান্ত গলায় বললেন, 'তুমি জান না। আমিও তাই ভেবেছিলাম। আজ আমার জন্মদিন।'

শুভ্র বলল, 'শুভ জন্মদিন বাবা।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইয়াজউদ্দিন সাহেব বললেন, 'থ্যাংক ইউ শুভ্র। থ্যাংক ইউ।'

তিনি রেহানার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এক জন ডাক্তারকে খবর দাও। আমার শরীর খুব খারাপ লাগছে। শুভ্র!'

'জ্বি।'

'বাতি নিভিয়ে চলে যাও। ভালো কথা, তোমার বন্ধু এবং বন্ধুপত্নীকে তুমি তোমার জয়দেবপুরের বাড়িতে কিছুদিন রাখতে চেয়েছিলে — ওদের নিয়ে যাও। এ ব্যাপারে আমি আগে যা বলেছিলাম — তা ঠিক বলি নি। আমি ভুল করেছি।'

'থ্যাংক ইউ বাবা।'

'তুমি এদের এখন সাহায্যও করতে পার — তোমার একটি টেলিফোনে তোমার বন্ধুর খুব ভালো চাকরি হবার কথা। দু একটা জায়গায় টেলিফোন করে দেখতে পার।'

ইয়াজউদ্দিন সাহেব চোখ বন্ধ করলেন। তাঁর খুব খারাপ লাগছে।

১৩

নীতুদের বাসার সামনে শুভ্র অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে। কলিংবেলে হাত দেবার সাহস পাচ্ছে না। কলিংবেলটা ভালো না। হাত দিলেই শক লাগে।

শুভ্র বেলে হাত রাখল। আশ্চর্য আজ শক করল না।

দরজা খুলে দিল নীতু। সহজ গলায় বলল, 'এস শুভ্র। তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছি। অফিসেও যাই নি। বেছে বেছে তোমার জন্যে এই লাল শাড়িটা পরলাম। যদিও লাল রং আমার পছন্দ নয়। দেখ তো ভালো লাগছে কিনা।

নীতু অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাসল।

শুভ্র বলল, 'চাচা কোথায়?'

'বাবা নেই। নেই বলায় মনে কোরো না তিনি মারা গেছেন। তিনি ভালোই আছেন। তাঁকে আজ ভোরে হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দিয়ে এসেছি। ডাক্তাররা এখন তাঁকে নল দিয়ে খাওয়াচ্ছেন। দাঁড়িয়ে আছ কেন শুভ্র, বস।'

শুভ্র বসল। নীতু বলল, 'চা খাবে, চা দেব? সেজেগুজে আছি এই অবস্থায় রান্নাঘরে যেতে ইচ্ছা করে না। তবু তুমি চাইলে যেতে হবে। বলা তো যায় না যদি সত্যি সত্যি তুমি আমাকে বিয়ে কর তাহলে তোমার কথা তো শুনতেই হবে। বয়সে ছোট হলেও তুমি তখন হবে আমার স্বামী। তাই না?'

নীতু খিলখিল করে হেসে ফেলল। হাসতে হাসতে তার চোখে পানি এসে গেল। সে শাড়ির আঁচলে চোখ মুছল। শুভ্র বলল, 'আপনি আমার সঙ্গে এ ভাবে কথা বলছেন কেন? আমি আমার মনের ইচ্ছার কথাটা আপনাকে বলেছি। আপনাকে অপমান করবার জন্যে বলি নি। আপা আপনি বসুন। আপনি ছটফট করছেন।'

নীতু বসল। শুভ্রর সামনেই বসল। নীতু আজ সত্যি সত্যি সেজেছে। তার গায়ে লাল সিল্কের শাড়ি — ঠোঁটে কড়া করে লাল লিপস্টিক দেয়া। শুভ্র কখনো নীতুর ঠোঁটে লিপস্টিক দেখে নি।

'শুভ্র।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'জ্বি।'

'তোমার প্রস্তাব শোনার পর আমার কি অবস্থা হল তোমাকে আগে বলি। প্রথম খুব হাসলাম। শব্দ করে হাসলাম। আমার পাশে যে টাইপিস্ট বসে — আরতি ধর। সে বলল, দিদি এত হাসছেন কেন? আমি তাকে বললাম, দারুণ একটা কাণ্ড হয়েছে। আমি একটা বিয়ের প্রস্তাব পেয়েছি। শুভ্র তুমি কি মন দিয়ে আমার কথা শুনছ?'

'শুনছি।'

'আরতি বলল, বিয়ের প্রস্তাব পেয়েছেন তাহলে তো ভালো কথা। এতে হাসির কী হল, ছেলে কেমন, কী করে? আমি বললাম, ছেলে রাজপুত্রের মতো এবং এই ছেলে জীবনে কোনো পরীক্ষায় কখনো সেকেন্ড হয় নি। তার টাকা-পয়সা যে কত আছে তা সে নিজেও জানে না।'

'শুভ্র আমার কথা শুনছ?'

'শুনছি।'

'আমাকে বিয়ের ইচ্ছা এখনো তোমার মনে আছে তো নাকি মত বদলেছ?'

'মত বদলাই নি।'

'গুড। এখন বল কেন বিয়ে করতে চাও? আমার রূপের জন্যে? আমি কি খুব রূপবতী?'

'আপনি রূপবতী। তবে রূপ তেমন বড় কিছু নয়।'

'ঠিক বলেছ। রূপ বড় কিছু নয়। অতি বিত্তবানদের কাছে রূপ বড় কিছু না কারণ রূপ তারা চারদিকে দেখছে। রূপ তাদের কাছে সহজলভ্য। রূপ নিম্নবিত্তদের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ। ঠিক বলছি না?'

'হ্যাঁ ঠিক বলছেন।'

'তাহলে বল কেন আমাকে তোমার এত পছন্দ হল? তোমার মুখ থেকে শুনি।'

'আপা আমি জানি না। বিশ্বাস করুন জানি না।'

'আমার মনে হয় আমি জানি। আমার শরীরটাই তোমাকে মুগ্ধ করেছে। লজ্জা পেও না শুভ্র তাকাও আমার দিকে। ভেরি গুড! এই তো তাকাচ্ছ। ভীতু টাইপের স্বামী আমার পছন্দ না।'

শুভ্র বলল, 'আপা আমি এক গ্লাস পানি খাব।'

'পানি এনে দিচ্ছি। কিন্তু খবরদার আপা ডাকবে না। যাকে বিয়ে করতে চাও তাকে আপা ডাকতে অস্বস্তি লাগছে না?'

নীতু পানি এনে দিল। শুভ্র পানি শেষ করল। নীতু বলল, 'আমার কথা বোধহয় এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। কেন জান? কাল রাতে ঘুম হয় নি। সারারাত ছটফট করেছি। বাবা জিজ্ঞেস করলেন, তোর কী হয়েছে? একবার ভাবলাম বলি, শুভ্র আমাকে বিয়ে করতে চাচ্ছে এই উত্তেজনায় আমার ঘুম হচ্ছে না। শেষে বললাম না। বাবাকে কষ্ট দিতে ইচ্ছে করল না। আমি কি করলাম জান শুভ্র? সারারাত বারান্দায় হাঁটাহাঁটি করলাম। দুবার মাথায় পানি ঢাললাম। তারপর ঠিক করলাম, তুমি যখন আসবে তখন তোমাকে বলব আমার শরীরটাই তো তোমার দরকার। বেশ তো শরীরটা কিছুক্ষণের জন্যে তোমাকে দেব। তার বদলে মোটা অংকের কিছু টাকা তুমি আমাকে দাও। টাকাটা পেলে আমার লাভ হবে। বাবাকে দিয়ে দিতে পারব। তিনি শান্ত হবেন। ঘর ভাড়া করে একা একা থাকবেন। তাঁর সেবার জন্যে কিছু লোকজন থাকবে। আমার বুদ্ধিটা ভালো না শুভ্র?'

শুভ্র এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। নীতু বলল, 'কথা বলছ না কেন? তুমি চাইলে আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সব কাপড় খুলে ফেলতে পারি। ঘরেও কেউ নেই। তবু তোমার কাছে যদি মনে হয় ঘরে বেশি আলো তাহলে জানালা বন্ধ করে দিতে পারি।'

শুভ্র কিছু বলার আগেই নীতু উঠে জানালা বন্ধ করে দিল। ঘর আবছা অন্ধকার হল। নীতু বলল, 'অন্যদিকে তাকাও শুভ্র। নগ্ন হয়ে প্রেমিকের সামনে আসা কঠিন নয়। কিন্তু প্রেমিকের সামনে নগ্ন হওয়া বেশ কঠিন।'

শুভ্র বলল, 'আপা কেন আপনি আমাকে কষ্ট দিচ্ছেন? আমি আপনাকে আর বিরক্ত করব না। চলে যাব। আমি কিন্তু আপা কখনোই আপনাকে অপমান করতে চাই নি। তবু আপনি আমার কথায় অপমানিত হয়েছেন। I am so sorry.'

নীতু লক্ষ করল শুভ্র কাঁদছে। ছোট শিশুদের মতোই কাঁদছে। নীতু কোমল গলায় বলল, 'তুমি সাবেরের বন্ধু। তোমাকে আমি তার মতোই দেখি। এবং পাগলের মতো পছন্দ করি। কেঁদো না শুভ্র — তুমি কাছে আস আমি তোমাকে আদর করে দি। সাবের যখন খুব মন খারাপ করত সে আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদত। আমি তাকে মাথায় হাত দিয়ে আদর করতাম।'

শুভ্র উঠে দাঁড়াল। শান্ত গলায় বলল, 'নীতু আপা আমি যাই। আপনি চাচাকে নিয়ে কোনো চিন্তা করবেন না। আমি সব ব্যবস্থা করে দেব। আমার এখন অনেক ক্ষমতা নীতু আপা। আমি এখন অনেক কিছু করতে পারি।'

নীতু কোমল গলায় বলল, 'আমি জানি। তোমার বাবা আমার কাছে এসেছিলেন। সব দায়িত্ব তোমার কাছে দিয়ে তিনি বিশ্রাম নিতে যাচ্ছেন সেই কথা আমাকে বলেছেন।'

'আর কী বলেছেন?'

নীতু হাসতে হাসতে বলল, 'আরেকটা অন্যায় অনুরোধ করেছিলেন। বলেছিলেন আমি যেন তোমাকে বিয়ে করতে রাজি হই। প্রত্যাখ্যানের অপমান থেকে তিনি তোমাকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তা হয় না শুভ্র। তুমি কি বুঝতে পারছ যে তা হয় না?'

'পারছি।'

'তোমার বাবাকে আমার রিগার্ডস দিও। চমৎকার মানুষ। আমার উনাকে পছন্দ হয়েছে। বুঝলে শুভ্র উনি যুক্তি দিয়ে আমাকে প্রায় বুঝিয়ে ফেলেছিলেন যে তোমাকেই আমার বিয়ে করা উচিত।'

'বাবা খুব ভালো যুক্তি দিতে পারেন।'

'আমার উনাকে খুব পছন্দ হয়েছে। আমি কাউকেই পা ছুঁয়ে সালাম করি না। আমার ভালো লাগে না। কিন্তু তাঁকে পা ছুঁয়ে সালাম করেছি।'

১৪

ইয়াজউদ্দিন সাহেবের মেসিভ হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। রেহানা স্বামীর হাত ধরে বসে আছেন। তিনি থরথর করে কাঁপছেন। অ্যাম্বুলেন্স খবর দেয়া হয়েছে — এখনো আসছে না। শুভ্র বাড়িতে নেই। রেহানা অস্থির হয়ে পড়েছেন। মনে হচ্ছে তিনি অচেতন হয়ে পড়বেন। ইয়াজউদ্দিন সাহেব স্ত্রীর অস্থিরতা দেখে হাসলেন। ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, 'শুভ্রর সঙ্গে দেখা হবে কিনা আমি বুঝতে পারছি না। যদি দেখা না হয়, যদি এই যাত্রাই আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেষ যাত্রা হয়, তাহলে তুমি শুভ্রকে বলবে অন্য দশজন বাবা তার ছেলেকে যতটা ভালবাসে আমি তাকে তারচে' অনেক বেশি ভালবাসি। তার মতো একটি ছেলের জন্ম আমি দিতে পেরেছি এই আনন্দই আমার জন্যে যথেষ্ট। আমি বিপুল অর্থ ও বিত্ত শুভ্রর জন্যে রেখে গেলাম — আমার দেখার খুব শখ শুভ্র এই অর্থ-বিত্ত দিয়ে কী করে। আমার এই শখ বোধ হয় মিটবে না। মনে হচ্ছে এ আমার শেষ যাত্রা।'

মৃত্যুর আগে কিছুক্ষণের জন্যে ইয়াজউদ্দিন সাহেবের জ্ঞান ফিরল, তিনি এদিক-ওদিক তাকালেন — হয়তো শুভ্রকে খুঁজলেন। তাঁর খুব ইচ্ছা শুভ্রকে একটু ছুঁয়ে দেখেন। তিনি ফিসফিস করে ডাকলেন, 'শুভ্র! শুভ্র!'

তাঁর চারপাশে একদল মুখোশ পরা ডাক্তার। কয়েকজন নার্স। সেই প্রিয় মুখ নেই।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুমি আমায় ডেকেছিলে ছুটির নিমন্ত্রণে

১

নবনী অনেকক্ষণ থেকে হাঁটছে। কতক্ষণ সে জানে না। তার হাতে ঘড়ি নেই। এ রকম অজ পাড়াগাঁয়ে ঘড়ির দরকারও নেই। তবে গায়ে চাদর থাকলে ভালো হত। শীত লাগতে শুরু করেছে। কিছুক্ষণ আগেও শীত ছিল না, এখন ঝপ করে শীত পড়ে গেছে। নবনী মনে মনে বলল, "বাহ্ আশ্চর্য তো!" মনে মনে বলার প্রয়োজন ছিল না, চেঁচিয়েও বলা যেত — আশপাশে কেউ নেই।

তার পরনে সবুজ রঙের সিল্কের শাড়ি। সিল্কের শাড়ি সে কখনোই পরে না। শীতের সময় সিল্ক পরলে গায়ে হিম হিম ভাব হয় — ভালো লাগে না। সবুজ রংটাও তার পছন্দ না। তার ধারণা, সবুজ গাছেদের রং — এই রং তাদেরই থাকা উচিত। সবুজ শাড়ি পরার পর তার নিজেকে খানিকটা গাছ গাছ মনে হচ্ছিল। এখন আর মনে হচ্ছে না। শীত লাগছে। গাছদের নিশ্চয়ই শীত লাগে না।

নবনী হাঁটতে হাঁটতে একটা বটগাছের কাছে চলে এসেছে। এটা যে একটা বটগাছ দূর থেকে বোঝা যায় নি। বেলা পড়ে এসেছে, চারদিক অস্পষ্ট, ছায়া ছায়া। নবনী এগুচ্ছিল পায়ে-চলা পথে। তার অভ্যাস মাটির দিকে তাকিয়ে হাঁটা। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ সে গাছটার সামনে পড়ে গেল। অন্ধকারের মধ্যে হুলস্থূল একটা ব্যাপার। বিশাল ঝুরি নেমেছে চারদিকে। পুরো গাছটাকে মনে হচ্ছে প্রকাণ্ড এক পাহাড়। নবনী বাচ্চাদের মতো গলায় চেঁচিয়ে বলল, 'মিস্টার বটগাছ! আপনি কোথেকে এলেন?' মনের আনন্দে এখানে চেঁচিয়ে কথা বলা যায়। কেউ শুনে ফেলবে না এবং ভুরু কুঁচকে ভাববে না — মেয়েটা পাগল নাকি?

সে চারদিকে তাকাল। কেউ কোথাও নেই। মাথার উপর কিছু পাখি উড়াউড়ি করছে। কী পাখি? 'কী আশ্চর্য, টিয়া!' নবনী আবারো চেঁচিয়ে বলল, 'টিয়া টিয়া, টিয়া!' কেউ শুনবে না। যত ইচ্ছা চেঁচানো যায়। আচ্ছা, এই জায়গাটা জনশূন্য কেন? মানুষজন তো নেই, গরুছাগলও নেই, কে জানে এই জায়গাটা হয়তো 'দোষী'। সব গ্রামে একটা 'দোষী' পথ থাকে। সন্ধ্যার পর ঐ পথে কেউ যায় না। একটা থাকে 'দোষী গাছ'। বেশিরভাগ সময়ই শ্যাওড়া গাছ। দোষী গাছের কাছে যাওয়াও নিষেধ। এই বটগাছটা

আবার দোষী না তো!

নবনী বলল, 'মিস্টার বটগাছ, আপনি দোষী না নির্দোষ?'

সে উত্তরের জন্য অপেক্ষা করল। মাথার উপর দিয়ে ট্যাঁ ট্যাঁ শব্দ করে ঝাঁকে ঝাঁকে টিয়া উড়ে যাচ্ছে। এত সুন্দর একটা পাখি এত বিশ্রী করে ডাকে! পাখি যত সুন্দর হয় তার ডাকও হয় তত কুৎসিত। চিড়িয়াখানায় একবার ময়ূরের ডাক শুনে তার হাত থেকে বাদামের ঠোঙা পড়ে গিয়েছিল।

নবনী এমনিতে বেশ ভীতু। ঢাকায় তাদের বাড়িতে রাতে ঘুম ভাঙলে মনে হয় খাটের নিচে কেউ এক জন বসে আছে। মশারির নিচ দিয়ে সে তার বরফশীতল হাত ঢুকিয়ে নবনীকে ছুঁয়ে দেবে। রাতে অন্ধকার ঘরে সুইচ জ্বালাতে গিয়ে তার সব সময় মনে হয় — সুইচ বোর্ডে হাত দিতে গিয়ে সে অন্য এক জনের হাতে হাত দিয়ে ফেলবে। অথচ সম্পূর্ণ অচেনা এই গ্রামে অন্ধকার হয় হয় অবস্থায়ও তার এতটুকু ভয় করছে না। বরং মজা লাগছে। বটগাছটার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করছে। নবনী বটগাছের একটা ঝুরিতে হাত রেখে বলল, 'মিস্টার বটগাছ, এটা কি আপনার হাত, না পা? আপনার গায়ের চামড়া এত খসখসে কেন?'

নবনীর হঠাৎ মনে হল, আচ্ছা বটগাছটা যদি এখন কথা বলে ওঠে তাহলে তার কেমন লাগবে? সে কি ভয় পাবে? বটগাছটা যদি বলে, 'নবনী, এটা আমার হাতও না, পা-ও না। আমরা তো মানুষ নই যে আমাদের হাত-পা থাকবে। আমরা হচ্ছি গাছ।' তাহলে কি নবনী ভয়ে চিৎকার করে উঠবে? মনে হয় না। ভয় পেলে আগেই পেত। আচ্ছা, সে ভয় পাচ্ছে না কেন এটাও তো এক আশ্চর্য ব্যাপার। পরিবেশ মানুষকে বদলে দেয় হয়তো। ঢাকা শহরে সে ছিল দারুণ ভীতু একটা মেয়ে। এখানে অসম্ভব সাহসী এক জন, যে হেঁটে হেঁটে একা চলে এসেছে প্রকাণ্ড এক বটগাছের কাছে।

নবনী ঠিক করল, পুরো গাছটা একটা চক্কর দিয়ে সে যে পথে এসেছিল সেই পথেই ফিরে যাবে। ডাকবাংলোয় পৌঁছতে পৌঁছতে অন্ধকার হয়ে যাবে। তাতে অসুবিধা হবে না। একটাই পথ। তাছাড়া গতকাল পূর্ণিমা গেছে। আজো কিছুক্ষণের মধ্যেই চাঁদ উঠবে। গতকাল কুয়াশা ছিল, আজ কুয়াশা নেই। চাঁদ উঠলে চারদিকে ঝলমল করতে থাকবে। নবনী আগে লক্ষ করে নি হঠাৎ লক্ষ করল বটগাছের গুঁড়িটা বাঁধানো। চারদিকে ঝুরি নেমেছে বলে বাঁধানো গুঁড়ি চোখে পড়ছে না।

এমন জংলা জায়গায় একটা প্রাচীন গাছ কে বাঁধিয়ে রেখেছে? কেউ কি এখানে এসে বসে? এখন কি কেউ চুপচাপ বসে আছে? নবনীর হঠাৎ একটু ভয় ধরে গেল। গা কেঁপে গেল। দ্রুত অন্ধকার হয়ে আসছে। গাছটাকে এখন আর ভালো লাগছে না। টিয়া পাখির শব্দ কানে বাজছে। মনে হচ্ছে এরা এখন অনেক নিচু দিয়ে উড়ছে। একটা পাখি তো প্রায় নবনীর মাথার চুল ছুঁয়ে গেল। নবনীকে দেখে পাখিগুলো কি বিরক্ত হচ্ছে? আচ্ছা কেউ কি নিশ্বাস ফেলল? নবনী পরিষ্কার নিশ্বাস ফেলার শব্দ শুনল। তার নিজের নিশ্বাস ফেলার শব্দই কি সে শুনেছে?

নবনী দাঁড়িয়ে পড়েছে। তার মনে হচ্ছে সে একা একা আর ডাকবাংলোয় ফিরতে পারবে না। তার সব সাহস চলে গেছে। এখন হয়তো সে পথই খুঁজে পাবে না। বটের ঝুরির আড়াল থেকে কে যেন কাশল। একবার না, পরপর দুবার। নবনী দারুণ চমকে বলল, 'কে? কে ওখানে?'

গাছের বাঁধানো গুঁড়িতে পা তুলে গুটিসুটি মেরে কে যেন বসে আছে। তার গায়ের চাদরটা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে— খয়েরি। নবনী উঁচু গলায় বলল, 'কে ওখানে বসে আছে?'

'জ্বি আমি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বের হয়ে আসুন দয়া করে।'

লোকটা যদি জবাব দিতে আরেকটু দেরি করত তাহলে কী কাণ্ড হত কে জানে। নবনী হয়তো হার্টফেল করত। গাছের ঝুরির ভেতর দিয়ে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে লোকটা বের হচ্ছে। দেখে ভয় পাওয়ার মতো চেহারা না। পঁচিশ–ত্রিশ বছরের এক জন মানুষ। পরনে পাজামা পাঞ্জাবি। গায়ে খয়েরি রঙের চাদর। চোখে চশমা। তাকে দেখে মনে হচ্ছে — নবনী যেমন ভয় পেয়েছে, সেও ভয় পেয়েছে। কেমন মুখ কাঁচুমাচু করে, খানিকটা কুঁজো ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। ভালোমতো তাকাচ্ছেও না নবনীর দিকে। ভালোমতো তাকালে দেখতে পেত পৃথিবীর সবচে' রূপবতী তরুণীটি তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

নবনী বলল, 'আপনি কে?'

'জ্বি, আমার নাম মবিনউদ্দিন।'

'এখানে কী করছিলেন?'

'কিছু করছিলাম না। বসে ছিলাম।'

'আপনি কী করেন?'

'আমি মাস্টারি করি।'

'স্কুল মাস্টার?'

'জ্বি না, আমি কলেজে শিক্ষকতা করি।'

নবনী কঠিন গলায় বলল, 'আমাকে বলা হয়েছে এখানে কোনো কলেজ নেই।'

'কলেজটা পাশের গ্রামে। মাঝে একটা নদী আছে। শিবসা নদী। শিবসা নদীর ঐ পাড়ে কলেজ। মমিনুন্নেসা মেমোরিয়েল কলেজ।'

'আপনার কলেজ ঐ গ্রামে, আপনি এখানে এসেছেন কেন?'

নবনী জেরা করার ভঙ্গিতে প্রশ্ন করছে। ধমকের সুরে প্রশ্ন। যেন ভীত মুখে দাঁড়িয়ে থাকা যুবকটি আসামি, সে ফরিয়াদী পক্ষের উকিল। কলেজের এক জন শিক্ষকের সঙ্গে এভাবে কথা বলা যায় না হয়তো। কিন্তু নবীনর খুব রাগ লাগছে। লোকটা কেন তাকে ভয় দেখাল?

'কথার জবাব দিচ্ছে না কেন? আপনি ঘাপটি মেরে এই গাছের নিচে বসে কী করছিলেন?'

'কিছু করছিলাম না। চুপচাপ বসে ছিলাম।'

'ধ্যান করছিলেন নাকি?'

মবিনউদ্দিন জবাব দিল না। কয়েকবার কাশল। এখনো সে মেয়েটির দিকে তাকাচ্ছে না। নবনী বলল, 'আপনি আমাকে দারুণ ভয় পাইয়ে দিয়েছেন। এত ভয় আমি জীবনে পাই নি। যাই হোক, আপনি আমাকে দয়া করে একটু এগিয়ে দিন। আমার ভয় কাটছে না। আমি ফিশারিজের ডাকবাংলোয় উঠেছি।'

'জ্বি আমি জানি। আপনি মন্ত্রী সাহেবের বড় মেয়ে।'

নবনীর ভয় কেটে গেল। লোকটি তাকে চিনতে পেরেছে। ভয় কাটার জন্যে এই যথেষ্ট। তাছাড়া কথা বলছে খুব ভদ্র ভঙ্গিতে। কলেজের টিচাররা এত ভদ্র ভঙ্গিতে কথা বলে না। তারা খিটখিটে ধরনের হয়। কে জানে গ্রামের কলেজের টিচাররা হয়তো এরকম। কিংবা এও হতে পারে, লোকটা তাকে চিনতে পেরেছে বলেই এত ভদ্রভাবে কথা বলছে। লোকটার সঙ্গে এতটা খারাপ ব্যবহার করা উচিত হয় নি। পরে সবাইকে বলে বেড়াবে — মন্ত্রীর মেয়ে আমাকে ধমক দিয়েছে। কেউ বুঝবে না, মন্ত্রীর মেয়ে না হলেও নবনী এই পরিস্থিতিতে এভাবেই কথা বলত।

নবনী গলার স্বর স্বাভাবিক করে ফেলে বলল, 'চলুন যাই। আমাকে এগিয়ে দিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপনার অসুবিধা নেই তো?

'জ্বি না।'

'আপনার সঙ্গে আমি রেগে রেগে কথা বলছিলাম। আপনি কিছু মনে করবেন না। আসলে আমি খুব ভয় পেয়েছিলাম, তারপর ভয়টা কেটে গেল। হঠাৎ ভয় কাটলে মানুষ রেগে যায় এই থিওরিটা কি আপনি জানেন?'

মবিন জবাব দিল না। সে মাথা নিচু করে হাঁটছে। নবনী যাচ্ছে আগে আগে, সে তার পেছনে পেছনে। একটু দূরত্ব নিয়ে হাঁটছে। নবনী পরিস্থিতি সহজ করার জন্যে বলল, 'আমি যে গাছটার সঙ্গে কথা বলছিলাম, তা কি শুনতে পেয়েছিলেন?'

'জ্বি।'

'কী বলছিলাম বলুন তো?'

'আপনি বলছিলেন, মিস্টার বটগাছ আপনি কোত্থেকে এলেন?'

'আপনি আমার কথা শুনে অবাক হন নি?'

'জ্বি না।'

'অবাক হন নি কেন?'

'আমি দূর থেকেই দেখেছি আপনি আসছেন। এই জন্যেই অবাক হই নি। আপনাকে না দেখে হঠাৎ যদি কথা শুনতাম তাহলে অবাক হতাম।'

'আমাকে একা একা আসতে দেখেও অবাক হন নি?'

'জ্বি না?'

'কেন অবাক হন নি?'

'আপনি তো প্রায়ই একা একা হাঁটেন।'

'আমি একা একা হাঁটি তাও জানেন?'

মবিন অস্বস্তির সঙ্গে বলল, 'জানি। সবাই জানে। এটা প্রায় গণ্ডগ্রামের মতো জায়গা। শহরের কেউ এলেই সবাই অবাক হয়ে দেখে। আর আপনি হচ্ছেন এক জন মন্ত্রীর মেয়ে। আপনি কী করছেন না করছেন সবাই লক্ষ রাখছে।'

'তাই নাকি?'

'জ্বি এটাই তো স্বাভাবিক। এখানে কোনো বড় ঘটনা তো ঘটে না। এক জন মন্ত্রীর মেয়ে একা একা হাঁটছে এটা বিরাট ঘটনা। আপনাকে নিয়ে কলেজের টিচার্স কমনরুমে আলোচনা হয়।'

'সে কী! কী আলোচনা?'

'আপনার শোনার মতো কিছু না। আমাদের তো আলোচনা করার কিছু নেই।'

'কলেজে আপনি কী পড়ান?'

'ইংরেজি সাহিত্য।'

'আপনাদের এটা কি ডিগ্রি কলেজ?'

'জ্বি না। ইন্টারমিডিয়েট কলেজ।'

'আপনি কি আমার নাম জানেন?'

'জ্বি জানি। আপনার নাম নবনী।'

নবনী হেসে ফেলল। নিতান্ত অপরিচিত এক জন কলেজের শিক্ষক, যে ভূতের মতো ঘাপটি মেরে বটগাছটির গুঁড়িতে বসেছিল সেও তার নাম জানে, আশ্চর্য হবার মতোই ঘটনা।

'আপনি কি আমার ছোট বোনের নাম জানেন?'

'জ্বি না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমারটা জানেন তারটা জানেন না কেন? তার নাম হল শ্রাবণী।'

মবিন কথা বলছে না। একা একা কথা চালিয়ে যাওয়া যায় না। হুঁ হাঁ বলার জন্যেও এক জনকে দরকার। নবনীর কথা বলতে ইচ্ছে করছে। এ রকম তার কখনো হয় না। কথা বলতে ইচ্ছা করে না।

'মবিন সাহেব!'

'জ্বি।'

'আমার ছোট বোনের নামটা আপনার কাছে কেমন লাগল তা তো বললেন না।'

'সুন্দর নাম।'

'শ্রাবণ মাসে জন্মেছে বলে শ্রাবণী। ও কী বলে জানেন? ও বলে — ভাগ্যিস আমার ভাদ্র মাসে জন্ম হয় নি। ভাদ্র মাসে জন্ম হলে তার নাম হত ভাদ্রী।'

নবনী হাসছে। আনন্দিত ভঙ্গিতে হাসছে।

তারা বড় রাস্তায় উঠে এল। এখন আর পথ হারানোর ভয় নেই। সোজা পথ। চোখ বন্ধ করেও যাওয়া যাবে। নবনী বলল, 'মেনি থ্যাংকস। আপনাকে আর আসতে হবে না। এখন আমি যেতে পারব।'

মবিন কিছু বলল না।

নবনী বলল, 'আপনাকে ডাকবাংলোয় নিয়ে চা খাইয়ে দিতে পারতাম। তা করতে পারছি না। আজ আমাকে বাবার কাছ থেকে বকা খেতে হবে। আপনাকে নিয়ে গেলে আপনিও বকা খাবেন। রেগে গেলে বাবা সবাইকে বকেন। টমিকেও বকেন। টমি হল আমাদের কুকুর। আচ্ছা তাহলে যাই। ভালো কথা, গাছের নিচে বসে কী করছিলেন তা তো বললেন না?'

'জোছনা দেখার জন্যে বসেছিলাম।'

'কী বললেন?'

'জোছনা দেখার জন্যে আমি মাঝে মাঝে গাছের গুঁড়িতে গিয়ে বসি। ওখান থেকে জোছনা সম্পূর্ণ অন্যরকম লাগে।'

'তাই নাকি?'

'জ্বি। দেখার মতো দৃশ্য। একবার সারারাত ছিলাম।'

'সারারাত কি আর জোছনা দেখতে ভালো লাগে?'

'জ্বি লাগে। জোছনা তো এক রকম থাকে না। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বদলায়। আপনি কি দেখবেন?'

নবনী বিস্মিত হয়ে বলল, 'কী বললেন?'

মবিন নিচু গলায় বলল, 'আপনি যদি জোছনা দেখতে চান তাহলে ...'

'তাহলে কী?'

মবিন ইতস্তত করে বলল, 'গতকাল পূর্ণিমা ছিল। আজ কিছুক্ষণের মধ্যেই চাঁদ উঠবে। গাছের গুঁড়িটা বাঁধানো। সুন্দর বসার জায়গা।'

নবনী তীক্ষ্ণ গলায় বলল, 'আপনি কি আমাকে নিমন্ত্রণ জানাচ্ছেন আপনার সঙ্গে অন্ধকার গাছের নিচে সারারাত বসে থাকার জন্যে?'

মবিন চুপ করে রইল। নবনী বলল, 'আপনার সাহস ও স্পর্ধা দেখে অবাক হচ্ছি। এমন অস্বাভাবিক প্রস্তাব আপনি দিলেন কীভাবে ? আপনার মাথা ঠিক আছে তো? 'কমন সেন্স' বলে একটি ব্যাপার আছে। কমবেশি সবারই তা থাকে। আপনার মনে হয় তাও নেই।'

'আমি ভেবেছিলাম ...

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কী ভেবেছিলেন আপনি? আপনার প্রস্তাবে আমি "কী আশ্চর্য! কী সুন্দর প্রস্তাব" বলে লাফিয়ে উঠব তারপর গাছের নিচে সারারাত বসে থাকব? আপনার কি যেন নাম বলেছিলেন?'

'মবিনউদ্দিন।'

'শুনুন মবিনউদ্দিন সাহেব। আপনি আমাকে অনেকদূর এগিয়ে দিয়েছেন। আপনাকে ধন্যবাদ। জোছনা দেখার নিমন্ত্রণের জন্যেও ধন্যবাদ। নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারছি না। আমি বয়সে আপনার ছোট। তবু আপনাকে একটা উপদেশ দিচ্ছি — এ জাতীয় নিমন্ত্রণ চট করে দেয়া যায় না। আচ্ছা, আমি যাচ্ছি।'

নবনী হন হন করে এগুচ্ছে। অনেকদূর এসে সে একবার পেছনে ফিরল। মবিনউদ্দিন রাস্তার এক পাশে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

২

নবনী ভেবেছিল ডাকবাংলোয়। পৌঁছানোমাত্র সে বকা খাবে। তার বাবা বন ও খনিজ সম্পদমন্ত্রী জামিল চৌধুরী নিশ্চয়ই থমথমে মুখে বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে আছেন। তাঁর সামনে একটা হ্যাজাক লাইট। একটু দূরে ওসি সাহেব শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে। ওসি সাহেবের পেছনে মাধবদি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সুরুজ মিয়া। সুরুজ মিয়া হাত কচলাচ্ছেন এবং তেলতেলে মুখে হাসছেন। এই মানুষটা ননস্টপ হাসতে পারেন। বকা খেলেও হাসেন। পান খাওয়া লাল দাঁত সর্বক্ষণ বের হয়ে থাকে। তবে তাতে তাঁকে খারাপ লাগে না। মনে হয়, ধবধবে সাদা দাঁতে এই মানুষটাকে মানাত না।

নবনীর খোঁজে নিশ্চয়ই লোকজন বের হয়ে গেছে। ডাকবাংলোর সামনে পুলিশের দুজন সেন্ট্রি থাকে। তারা নবনীর খোঁজে গেছে। ঝোপঝাড়ে পাঁচ ব্যাটারির টর্চের আলো ফেলছে। চারজন আনসারের একটা দল আছে, তারাও নিশ্চয়ই বের হয়েছে। নবনীর মা জাহানারা অস্থির হয়ে পড়েছেন। তাঁর বুক ধড়ফড় করছে। সামান্য উত্তেজনাতেই তাঁর বুক ধড়ফড় করে।

নবনী যা ভেবে রেখেছে তার কিছুই হল না। আজ দিনটা বোধহয় তার জন্যে শুভ। জামিল সাহেব বারান্দায় বসা। তাঁর মুখ গম্ভীর নয়, হাসি হাসি। ওসি সাহেব এ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। সুরুজ মিয়ার পান খাওয়া লাল দাঁত দেখা যাচ্ছে।

গেট দিয়ে ঢোকার সময় সেন্ট্রির পুলিশ দুজন একসঙ্গে স্যালুট দিল। নবনীর অস্বস্তি লাগছে। এরা সব সময় তাকে স্যালুট দেয় কেন? সে তো কেউ না। তারচে' বড় কথা স্যালুট দিলে নবনীর কী করণীয়? সে কি হাত তুলে সালাম নেবে? না মাথা ঝুঁকিয়ে হাসবে? বাবাকে জিজ্ঞেস করা দরকার। কখনো মনে থাকে না।

জামিল সাহেব মেয়েকে দেখে উঁচু গলায় বললেন, 'কাণ্ড দেখে যা।'

নবনী কাছে এসে কাণ্ড দেখল। জামিল সাহেবের পায়ের কাছে প্রকাণ্ড এক চিতল মাছ ধড়ফড় করছে। নবনী বলল, 'কী সর্বনাশ, এত বড় মাছ হয়!'

সুরুজ মিয়া হাসিমুখে বললেন, 'হয় আম্মা, কৃচিৎ হয়। এরে বলে রাজ-চিতল। গলাটা লাল। স্যারের ভাগ্যে মাছটা ছিল।'

নবনী বলল, 'আপনি এনেছেন এই মাছ?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'জ্বি আম্মা। সামান্য জিনিসে স্যার খুশি হবেন ভাবি নাই। স্যার খুশি হয়েছেন। আমার একেবারে চোখে পানি এসে গেছে।'

সুরুজ মিয়ার চোখে আবার পানি এসে গেছে। সত্যি সত্যি পানি। এক জন বয়স্ক লোক যার মাথার বেশিরভাগ চুল পাকা সে এত সহজে কেঁদে ফেলতে পারে? নবনী ভেবে পাচ্ছে না, এই লোকটা আসলেই কাঁদছে, না যে কোনো পরিস্থিতিতে চোখে পানি আনার দুর্লভ ক্ষমতা আয়ত্ত করেছে?

জামিল সাহেব দরাজ গলায় বললেন, 'খুশি হবারই কথা। এত বড় মাছ আজকাল তো চোখে পড়ে না। মাছটার ওজন কত হবে মনে হয়?'

'ওজন করাই নাই স্যার। ওজন করায়ে নিয়ে আসি।'

'না, থাক থাক, দরকার নেই।'

'অবশ্যই দরকার আছে স্যার। আপনার মুখের কথা হুকুমের বাবা। ওসি সাহেব, মাছটা ধরেন তো। একলা পারব না।'

দুজন মাছের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। শূন্যে ঝুলিয়ে যে দ্রুততার সঙ্গে বের হয়ে গেল তাতে মনে হয় আগামী কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ওজন না নিলে একটা বিপর্যয় ঘটে যাবে। জামিল সাহেব মেয়ের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। হাসতে হাসতে বললেন, 'তোর জন্যে একটা সারপ্রাইজ আছে।'

'কী সারপ্রাইজ?'

'বোস আমার পাশে। এখন অনুমান কর।'

'আমার M. Sc. রেজাল্ট হয়েছে?'

'উঁহু। শাহেদ এসেছে।'

'কী বললে?'

'হ্যাঁ শাহেদ। আমি চেয়ারম্যান সুরুজ মিয়ার সঙ্গে গল্প করছিলাম, হঠাৎ দেখি সুটকেস হাতে হেলতে দুলতে কে যেন আসছে। চেহারা দেখছি, তারপরেও বিশ্বাস হচ্ছে না। যা ভেতরে যা।'

নবনী ভেতরে গেল না। বসে রইল। বাবার সামনে থেকে উঠে যেতে এখন লজ্জা লাগছে।

জামিল সাহেব বললেন, 'কি, এখন খুশি তো? যা ভেতরে যা।'

নবনী নিচু গলায় বলল, 'যাব। তাড়া তো কিছু নেই।'

জামিল সাহেব সিগারেটের প্যাকেট বের করতে করতে আনন্দিত গলায় বললেন, 'ছোট ব্যাপার নিয়ে তোরা যে ঝগড়া মাঝেমধ্যে করিস, আমি রীতিমতো আতংকগ্রস্ত হই। তোদের বিয়ের ঝামেলা আমি এবার চুকিয়ে ফেলব। আর দেরি করা যাবে না।'

'বাবা, তোমাকে তো বলেছি রেজাল্ট না হলে বিয়ে করব না।'

'আচ্ছা সেটা দেখা যাবে। রেজাল্টের খুব বেশি দেরি আছে বলে তো মনে হয় না। এই সপ্তাহেই বের হবার কথা না? মা, আমাকে কফি দিতে বল তো।'

নবনী উঠে গেল। ঘরের ভেতর ঢুকতে তার লজ্জা লাগছে। চট করে শাহেদের সামনে সে পড়তে চাচ্ছে না। নিজেকে একটু গুছিয়ে নিতে হবে। চুল এলোমেলো হয়ে আছে। পা ভর্তি ধুলো। নবনী ধরেই নিয়েছিল শাহেদের সঙ্গে তার দেখা হবে না। দেখা হলেও সৌজন্য কথাবার্তার মতো হবে। "কেমন আছ?" "ভালো" জাতীয় অর্থহীন আলাপ।

জাহানারা রান্নাঘরে। সমুচা ভাজছেন। পনীরের সমুচা। ভাগ্যিস, ঢাকা থেকে পনীর নিয়ে এসেছিলেন। পনীরের সমুচা শাহেদের খুব পছন্দ। সে মিষ্টি খেতে পারে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডাকবাংলো ভর্তি হয়ে গেছে মিষ্টিতে। এত মিষ্টি কী করবেন তিনি জানেন না। ডাকবাংলোয় ফ্রিজ নেই। ইলেকট্রিসিটি যখন আছে একটা ফ্রিজ থাকতে পারত। তিনি ঠাণ্ডা পানি ছাড়া খেতে পারেন না। শীতকালেও তাঁর বরফের কুচি মেশানো ঠাণ্ডা পানি চাই।

নবনী রান্নাঘরে ঢুকে বলল, 'মা, বাবা কফি চাচ্ছে।'

জাহানারা মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'শাহেদের সঙ্গে দেখা হয়েছে?'

'এখনো হয় নি।'

'তুই এতক্ষণ ছিলি কোথায়?'

'একটু ঘুরতে গিয়েছিলাম।'

'শাহেদ যে এসেছে শুনেছিস?'

'হ্যাঁ।'

'আমি কিন্তু তোর বাবাকে বলেছিলাম — শাহেদ চলে আসবে। আজ সকালেও কেন জানি মনে হয়েছে।'

'তোমার অসাধারণ ইএসপি ক্ষমতার জন্যে অভিনন্দন। এখন বাবাকে কফি করে দাও।'

'কফি দেয়া যাবে না। সবাইকে এক সঙ্গে চা-নাশতা দেব। তুই যা, শাহেদের সঙ্গে কথা বলে আয়।'

'তোমার কোনো সাহায্য লাগবে না?'

'না, সাহায্য লাগবে না। আমি কবে তোর সাহায্য নিয়েছি? তুই রান্নাঘর থেকে যা তো।'

রান্নাবান্নার ব্যাপারে জাহানারা কারোর সাহায্যই নেন না। ডাকবাংলোয় এক জন বাবুর্চি আছে। তিনি নিজেও তাদের অনেকদিনের পুরোনো বুয়া মিলুকে সঙ্গে এনেছেন। এরা কেউ কিছু করছে না। শুকনো মুখে দূরে দূরে ঘুরছে। এদের কারোরই খাবার কোনো জিনিসে হাত দেয়ার হুকুম নেই। জাহানারার খারাপ ধরনের শুচিবায়ু আছে। নিজে তা স্বীকার করেন না। কেউ এই প্রসঙ্গে কিছু বললেও রেগে যান।

বাবুর্চিকে দিয়ে খাবার জিনিসে হাত না দেওয়ানোর পেছনে তাঁর বক্তব্য হচ্ছে — 'হাত দিয়ে তারা কখন কী করে তার ঠিক আছে? কিছুক্ষণ আগেই হয়তো নাক ঝেড়ে এসেছে। বেশিরভাগ মানুষই নাক ঝাড়ার পর হাত ধোয় না। মুছে ফেলে। আর যদি-বা ধোয়, কজন সাবান ব্যবহার করে? এরা অন্য জিনিসে হাত দিচ্ছে, দিক। কিন্তু খাবার জিনিসে হাত দেবে, সেই খাবার আমি খাব— তা হবে না।'

মিলু বলল, 'আপনের গরম লাগতেছে, সমুচা আমি ভাজি?' জাহানারা বললেন, 'না। তুই দূরে থাক। এই ঘর থেকে চলে যা।' মিলু একটু সরে গেল কিন্তু ঘর থেকে বের হল না।

মিলু প্রায় কুড়ি বছর ধরে তাদের সঙ্গে আছে। দশ বছর বয়সে ভিক্ষা করতে এসেছিল। জাহানারা তার সুন্দর মুখ দেখে অবাক হয়ে বললেন, 'ভিক্ষা করছিস কেন, বাসায় কাজ করবি? মিলু বলল, 'না।' তিনি মেয়েটাকে একটা জামা দিলেন। পাঁচটা টাকা দিলেন। বলে দিলেন, 'যদি কাজ করতে ইচ্ছে হয় চলে আসিস।' মেয়েটা পরের দিনই চলে এল। তিনি বললেন, 'কি রে থাকবি?'

'হুঁ।'

'নাম কি তোর?'

'কুদরতী।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'হুঁ।'

'হুঁ না বল জ্বি।'

'জ্বি।'

'পা ছুঁয়ে সালাম কর।'

মিলু পা ছুঁয়ে সালাম করল।

'জাহানারা বললেন, 'তোর চেহারা ছবি সুন্দর। তুই ভালোমতো থাক তোর ভালো হবে। বয়সকালে বিয়ে দিয়ে দেব। তোর বয়েসী মেয়ে পথেঘাটে ঘোরাও ঠিক না। থাকবি তো ঠিকমতো?'

'হুঁ।'

'হুঁ না–বল জ্বি।'

'জ্বি।'

'ভালোমতো থাকবি। আদব কায়দা শিখবি। কাজকর্ম শিখবি। সময় কালে আমি টাকা–পয়সা খরচ করে বিয়ে দেব।'

'জ্বি আচ্ছা।'

জাহানারা তাঁর কথা রেখেছেন। মিলুর বিয়ে দিয়েছেন তাঁদের ড্রাইভার রহমতের সঙ্গে। বিয়ের পরেও মিলু ঘরেই আছে। ছেলেপুলে হয় নি। একদিক দিয়ে সুবিধাই হয়েছে। ছেলেপুলে হয়ে গেলে নিজের কাছে রাখতে পারবেন না। যেখানে যান নিজের সঙ্গে রাখেন।

শাহেদকে কোথাও পাওয়া গেল না। ডাকবাংলোর সর্ব পশ্চিমের ঘরটা নবনীর ছোট বোন শ্রাবণীর। আর তিন মাস পরেই তার আইএসসি ফাইনাল পরীক্ষা। ছুটি কাটাতে এসেও সে নিরিবিলি পড়বে এই অজুহাতে ডাকবাংলোর সবচে' সুন্দর ঘরটা নিয়ে নিয়েছে। এই ঘরটা নাকি নিরিবিলি। তার ঘরের সঙ্গের বারান্দাটা নদীর দিকে। বারান্দায় দাঁড়ালেই নদী দেখা যায়। শীতকাল বলেই নদী শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। নদীর চেয়েও যা চোখে পড়ে তা হল নদীর চর। চাঁদের আলোয় বালির চর চিকচিক করে। অদ্ভুত লাগে দেখতে। শ্রাবণী এখানে আসার আগে দু সুটকেস ভর্তি বই নিয়ে এসেছে। এক সুটকেসে পাঠ্যবই। এক সুটকেসে গল্পবই। পাঠ্যবইয়ের সুটকেসের তালা খোলা হয় নি। গল্পের বইয়ের সুটকেস খোলা হয়েছে। সে ক্রমাগত গল্পের বই পড়ে যাচ্ছে। প্রতিটি বই তার আগেই পড়া। একবার না, কয়েকবার করে পড়া। তারপরেও এমন ভাবে পড়ছে যেন নতুন বই।

নবনী ঘরে ঢুকে দেখল, শ্রাবণী খাটে পা ঝুলিয়ে অদ্ভুত ভঙ্গিতে বসে আছে। তার হাতে বই। গলায় লালরঙা মাফলার। শ্রাবণীর গলায় লালরঙা মাফলারের মানে হল — টনসিলের সমস্যা হয়েছে। কিছুদিন পর পর তার টনসিলের সমস্যা হয়। ঢোঁক গিলতে পারে না। সে কাউকেই কিছু বলে না। একটা লাল মাফলার গলায় পেঁচিয়ে খাওয়াদাওয়া বন্ধ করে দেয় — ।

নবনী বলল, 'তোর কি গলাব্যথা?'

শ্রাবণী বই থেকে মাথা না তুলে বলল, 'হুঁ।'

'জ্বর আসে নি তো, গাল লাল লাগছে।'

'এসেছে। একশ এক পয়েন্ট ফাইভ।'

'কী পড়ছিস?'

'নির্বাচিত ভূতের গল্প। এখন পড়ছি পরশুরামের মহেশের মহা যাত্রা।'

'আজ কি সারাদিনই বই পড়লি?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'হুঁ। মাঝখানে একবার বাবা মাছ দেখতে ডাকলেন। মাছ দেখলাম। বাবাকে খুশি করার জন্যে বিকট চিৎকার দিলাম — 'ও মাগো! এটা কী? মাছ নাকি? ওয়াক থু। মাছ এত বড় হয়?'

নবনী হেসে ফেলল। শ্রাবণী হাসল না। পা নাচাতে লাগল। নবনী বলল, 'যত দিন যাচ্ছে ততই একটা ইন্টারেস্টিং ক্যারেক্টার হয়ে দাঁড়াচ্ছিস। ব্যাপারটা কেউ লক্ষ করছে না।'

শ্রাবণী হাই তুলতে তুলতে বলল, 'কেউ যে করছে না তা না, কেউ কেউ করছে। আচ্ছা আপা, এখন তুমি যাও। ভূতের গল্প একনাগাড়ে পড়তে হয়। মাঝখানে ইন্টারাপশান হলে পড়াই মাটি। মনে হচ্ছে তুমি শাহেদ ভাইকে খুঁজছ। খুঁজে না পেয়ে বিব্রত বোধ করছ। কাউকে মুখ ফুটে জিজ্ঞেসও করতে পারছ না। উনি গোসল করার জন্যে কুয়াতলায় গেছেন। ডাকবাংলোয় একটা কুয়া আছে, তুমি জান কিনা জানি না। কুয়ার পানি অসম্ভব পরিষ্কার। শাহেদ ভাই সেই পরিষ্কার পানিতে গা ধুবেন।'

'এই ঠাণ্ডায় কুয়ার পানি?'

'হ্যাঁ। উনার যেহেতু টনসিলের সমস্যা নেই, ঠাণ্ডা পানিতে কিছু হবে না।?

'কুয়ার পানিতে গোসলের বুদ্ধি কি তুই দিয়েছিস?'

শ্রাবণী পা নাচাতে নাচাতে বলল, 'হুঁ। গতকাল কুয়ার পানিতে আমি গোসল করে ঠাণ্ডা লাগিয়েছি। আজ লাগাবেন শাহেদ ভাই। আপা, এখন কি তুমি যাবে? গল্পটা শেষ করতে চাই। তুমি এক কাজ কর, কুয়ার পাড়ে চলে যাও। আমার বারান্দা দিয়ে নামার সিঁড়ি আছে। এস, তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি।'

'দেখাতে হবে না।'

নবনী কী করবে ঠিক ভেবে পেল না। শেষ পর্যন্ত কুয়াতলার দিকে রওনা হল। ডাকবাংলোর জায়গাটা অনেক বড়। কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা। পেছনে রীতিমতো আম কাঁঠালের বাগান। নবনীরা দুদিন পার করে দিয়েছে, এখনো ডাকবাংলোর চারপাশ ভালো করে দেখা হয় নি। সে জানতই না — এদের কুয়াতলাও আছে। ডাকবাংলোয় সাধারণত কুয়া থাকে না।

শাহেদ গোসল শেষ করে হি-হি করে কাঁপছে। তার গায়ে মোটা টাওয়েল। শাহেদ একা নয়। ডাকবাংলোর কেয়ারটেকার দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে হারিকেন। মালীও আছে। সে এতক্ষণ পানি তুলে দিচ্ছিল।

নবনী কুয়াতলার পাশে এসে দাঁড়াল। সহজ গলায় বলল, 'কেমন আছ?'

শাহেদ বলল, 'খুব খারাপ আছি। শ্রাবণীর কথা শুনে পুরোপুরি বিভ্রান্ত হয়েছি। সে বলেছে কুয়ার পানি গরম। আমি সরল মনে বিশ্বাস করেছি।'

'বললেই তো ওরা পানি গরম করে দিত।'

'তা তো দিতই।'

'তোমার আসতে অসুবিধা হয় নি?'

'হয়েছে। অনেক ঝামেলা করে আসতে হল।'

'এলে কেন ঝামেলা করে?'

শাহেদ হাসল। নবনী চোখ ফিরিয়ে নিতে গিয়েও নিতে পারল না। মনে মনে ভাবল, 'এত সুন্দর করে মানুষ হাসে কীভাবে?

'আমি হঠাৎ উপস্থিত হওয়ায় খুশি হয়েছ তো?'

নবনী জবাব দিল না। সে প্রচণ্ড খুশি হয়ে গেছে। তার এত আনন্দ হচ্ছে। ভাগ্যিস কেউ তা বুঝতে পারছে না। নবনী চায় না কেউ বুঝে ফেলুক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমি আসব — এটা নিশ্চয়ই আশা কর নি?'

'না।'

'খুশি হয়েছ কিনা তা তো বললে না।'

নবনী হালকা গলায় বলল, 'প্রচণ্ড রাগ করেছি। রাগে অন্ধ হয়ে গেছি। কেন এলে?' বলেই হেসে ফেলল।

তারা ডাকবাংলোর দিকে এগুচ্ছে। নবনী কেয়ারটেকারের হাত থেকে হারিকেন নিয়ে নিয়েছে। সে যাচ্ছে আগে আগে, শাহেদ পেছনে পেছনে আসছে।

'নবনী।'

'উঁ।'

'আমি যে হঠাৎ এখানে এসে তোমাকে চমকে দেব তা আগে থেকে ঠিক করা। সব প্রি–প্ল্যানড। প্রচণ্ড রকম ঝগড়া তোমার সঙ্গে হল, সেই ঝগড়াও কিন্তু প্ল্যানের একটা অংশ। যাতে তুমি ধারণা কর আমি আসব না। অবশ্যি পুরো ব্যাপারটা আমি যেভাবে চেয়েছিলাম সেভাবে হয় নি।'

'তুমি কীভাবে চেয়েছিলে?'

'আমি ঠিক করে রেখেছিলাম গভীর রাতে উপস্থিত হব। তুমি তখন ঘুমিয়ে পড়েছ। আমি তোমাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে খুব ক্যাজুয়েল ভঙ্গিতে বলব, এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানি দাও তো নবনী। হা–হা–হা।'

নবনী বলল, 'আমি তোমার সঙ্গে অকারণে ঝগড়া করেছি। তুমি কিছু মনে কোরো না। আমি লজ্জিত, খুব লজ্জিত। আমি ক্ষমা প্রার্থনা করে তোমার কাছে একটা দীর্ঘ চিঠি লিখছি।'

'আমি কিন্তু কোনো চিঠি পাই নি।'

'তুমি পাও নি। কারণ আমি চিঠি পাঠাই নি। চিঠি এখানেই আছে।'

'পড়তে পারব?'

'দেখতে পারবে। কিন্তু পড়তে পারবে না।'

'পড়তেই যদি না পারি তাহলে দেখে কী লাভ?'

'আমি আঠার পাতার একটা চিঠি লিখেছি। এটা জানবে। চিঠি না দেখলে কী করে বুঝবে।'

'সত্যি আঠার পাতার চিঠি?'

'হুঁ।'

'বল কী। আমি তো শুদ্ধ বাংলায় আঠারটা লাইন লিখতে পারি না। বাংলায় চিঠিপত্র লিখতে গিয়ে যা সমস্যা হচ্ছে। এক জন সেক্রেটারি রেখেছি। সে নাকি বাংলায় অনার্স করেছে। মজার ব্যাপার হচ্ছে সে আমার চেয়েও কম বাংলা জানে। সেদিন আমাকে এসে জিজ্ঞেস করল — স্যার Acceptance এর সুন্দর বাংলা কী হবে?'

'তুমি কী বললে?'

'আমি কিছুই বললাম না। ওর দিকে রাগী রাগী চোখে তাকিয়ে রইলাম। Acceptance এর সুন্দর বাংলা যদি আমি জানতাম তাহলে ওকে পাঁচ হাজার টাকা মাইনে দিয়ে রাখতাম?'

'সেটাও একটা কথা।'

জাহানারা নাশতার অনেক আয়োজন করেছেন। পনীরের সমুচা ছাড়াও লুচি ভেজেছেন। মুরগির কোরমা করেছেন। আলুর চপ তৈরি হয়েছে। ডাকবাংলোর খাবার ঘরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খাবার দেয়া হয়েছে। সবাই গোল হয়ে বসেছে। টেবিলটা বেশি বড়। মনে হচ্ছে কনফারেন্স রুম। তারা যেন খেতে বসে নি, জরুরি আলোচনায় বসেছে। শ্রাবণীর গলায় মাফলার নেই। মনে হয় গলাব্যথা কমেছে। এখন ইলেকট্রিসিটি নেই। হ্যাজাক জ্বলছে।

জাহানারা স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আচ্ছা, তোমাদের ইলেকট্রিসিটি এত ঘন ঘন যায় কেন?'

'আমাদের বলছ কেন? বিদ্যুৎ তো আমার দপ্তর না। আমার হল বন এবং খনিজ সম্পদ। বনের ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন থাকলে বল।'

শ্রাবণী বলল, 'আমার একটা প্রশ্ন আছে।'

'কী প্রশ্ন মা?'

'বাংলাদেশের বনে মোট কতগুলো ময়ূর আছে বাবা?'

'কতগুলো ময়ূর আছে তা তো বলতে পারব না। তবে রয়েল বেঙ্গল টাইগার কতগুলো আছে তা বলা যাবে। গত বৎসর সেনসাস হয়েছে।'

'রয়েল বেঙ্গল টাইগার কতগুলো আছে?'

''অফ হ্যান্ড বলতে পারব না মা। সেক্রেটারিকে জিজ্ঞেস করে জানতে হবে।'

'উনাকে কী করে জিজ্ঞেস করবে। এখানে তো টেলিফোন নেই।'

'ওয়্যারলেসে ম্যাসেজ পাঠিয়ে দেব। সব থানায় ওয়্যারলেস আছে।'

শাহেদ বলল, 'রয়েল বেঙ্গল টাইগারের সংখ্যা জানা কি খুব দরকার শ্রাবণী?'

শ্রাবণী বলল, 'হ্যাঁ দরকার। রয়েল বেঙ্গল টাইগারের সঠিক সংখ্যা না জানলে আমি আজ রাতে ঘুমাতে পারব না।' জামিল সাহেব হো-হো করে হেসে উঠলেন।

সুরুজ মিয়া মাছ নিয়ে ফিরে এসেছেন। মাছের ওজন হয়েছে একচল্লিশ কেজি। জামিল সাহেব বললেন, 'বাহ্ বাহ্, এক মনের বেশি। খুবই আশ্চর্য ব্যাপার।'

সুরুজ মিয়া বললেন, 'পাল্লা-পাথর নিয়ে এসেছি। আপনার সামনে একবার মাপব।'

'কোনো দরকার নেই।'

'স্যার, শখ করে এনেছি। আপনার সামনে একটু মাপি।'

মাপা হল। একচল্লিশ কেজি দুশ গ্রাম। শ্রাবণী বলল, 'আপনি তো বললেন, একচল্লিশ কেজি। দুশ গ্রাম বেশি হল কেন?'

'যখন প্রথম ওজন নিয়েছিলাম, মাছটা জিন্দা ছিল। এখন মাছটা মারা গেছে। মৃত্যুর পর ওজন বেড়ে যায় মা।'

'কেন?'

'মৃত্যুর পর মাটির টানে বাড়ে।'

জামিল সাহেব বললেন, 'সুরুজ মিয়া আপনি অনেক ঝামেলা করেছেন। এখন বাসায় গিয়ে বিশ্রাম করুন। মেনি থ্যাংকস।'

'মাছটা কাটায়ে তারপর যাব স্যার। এত বড় মাছ সবাই কাটতে পারে না। পেটি নষ্ট হয়ে যাবে। মাছ কাটার লোক এবং বঁটি নিয়ে এসেছি।'

'ভালো করেছেন।'

জামিল সাহেব ইতস্তত করে বললেন, 'মাছ যে কাটবে সে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তো? আমার স্ত্রী আবার এইসব ব্যাপারে — খানিকটা কি যেন বলে শুচিবায়ুর মতো আছে।'

সুরুজ মিয়া হাসিমুখে বললেন, 'আপনি এটা নিয়ে চিন্তা করবেন না, স্যার। আমি তারে সাবান দিয়ে গোসল করায়ে তারপর মাছের কাছে নিয়ে যাব। ময়লা হাতে মাছ ছোঁয়াও ঠিক না। আমি এখনি তারে গোসলে পাঠায়ে দেই।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্রাবণী বলল, 'চেয়ারম্যান চাচা, আপনার সঙ্গে আমার খুব জরুরি একটা কথা আছে। অসম্ভব জরুরি!'

'কী কথা মা?'

'সবার সামনে বলা যাবে না। আপনি আমার সঙ্গে বারান্দার ঐ মাথায় আসুন।

সুরুজ মিয়া বিস্মিত এবং আনন্দিত মুখে এগুলেন। বিস্মিত ও আনন্দিত হবার মূল কারণ হচ্ছে— মন্ত্রী সাহেবের মেয়ে তাকে চাচা ডাকছে। আফসোসের ব্যাপার হল, ডাকটা বাইরে কেউ শুনতে পায় নি। ওসি সাহেব সামনে নেই। সে শুনলেও কাজ হত। আর দশ জনের কাছে বলত।'

সুরুজ মিয়া বললেন, 'কী কথা আম্মা?'

'আপনি কি আমার জন্যে একটা জিনিস জোগাড় করে দিতে পারবেন?'

'অবশ্যই পারব। এখানে না পাওয়া যায়, ঢাকা থেকে নিয়ে আসব। রাত একটায় একটা ট্রেন আছে। ঐ ট্রেনে লোক পাঠায়ে দিব।'

'ঢাকা থেকে আনতে হবে না। আমার মনে হয় এখানেই পাওয়া যাবে। হয়তো আপনার বাড়িতেই আছে।'

'জিনিসটা কী?'

'একটা মই।'

'মই! মই কী জন্যে?'

'এই ডাকবাংলোর ছাদে উঠার ব্যবস্থা নেই। আমি মই দিয়ে ছাদে উঠব।'

'আমি এখনি মই নিয়া আসতেছি।'

'এখনি আনার দরকার নেই। এখন আনলে বাবা দেখে ফেলবেন, রেগে যাবেন। আপনি বরং কাল সকালে নিয়ে আসবেন। নটার আগে। নটা পর্যন্ত বাবা ঘুমিয়ে থাকেন। তিনি কিচ্ছু জানতে পারবেন না।'

সুরুজ মিয়া ভীত গলায় বললেন, 'স্যার যদি রাগ করেন তাহলে কাজটা করা কি ঠিক হবে আম্মা?'

'কোনো অসুবিধা নেই। আপনি তো আর জানেন না কি জন্যে আমি মই চেয়েছি। আমি আপনার কাছে চেয়েছি। আপনি সরল মনে এনে দিয়েছেন।'

৩

নবনীর ঘরটা ছেড়ে দেয়া হয়েছে শাহেদের জন্যে। ডাকবাংলোয় আরেকটা সুন্দর কামরা ছিল, অনেক বড়, এটাচড্ বাথ। কিন্তু সেই কামরায় জানালার একটা কাচ ভাঙা। ভাঙা জানালায় শীতের হাওয়া ঢুকছে। শাহেদকে এখানে থাকতে দেয়া যায় না। তা ছাড়া তার জ্বর আসছে বলে মনে হচ্ছে। অবেলায় কুয়ার পানিতে গোসলের ফল ফলতে শুরু করেছে। গা ম্যাজম্যাজ করছে। রাতে সে চিতল মাছের একহাত সাইজ পেটি খেতে পারে নি। খানিকটা মুখে দিয়েই বলেছে, 'খেতে খুব ভালো হয়েছে কিন্তু আমি খেতে পারছি না।' থার্মোমিটারে এখনো জ্বর পাওয়া যাচ্ছে না। জামিল সাহেব বললেন, 'ডাক্তার খবর দেব?'

শাহেদ বলল, 'এখানে ডাক্তার আছে?'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'এখানে নেই। মাধবনগরে এক জন এমবিবিএস আছেন। লোক পাঠিয়ে নিয়ে আসি? বেশিক্ষণ লাগবে না। যাবে আর আসবে। পাঠাব?'

'লাগবে না। ভালো ঘুম হলেই শরীর ঠিক হয়ে যাবে।'

'তাহলে রাত করার কোনো দরকার নেই। তুমি শুয়ে পড়।'

শাহেদ ঘুমাতে গেল। জাহানারা বার বার বলে দিলেন, 'কোনো অসুবিধা হলেই আমাদের ডেকে তুলবে। তাছাড়া আমাকে ডেকে তুলতেও হবে না। আমি বলতে গেলে সারারাত জেগেই থাকি। আমার ঘুম হয় না।'

'ঘুম হয় না কেন?'

'নতুন জায়গায় আমার ঘুম হয় না। ঘুমের ওষুধ খেলেও হয় না। দশ–পনের দিন এখানে থাকলে জায়গাটা পুরোনো হবে, তারপর ঘুম হবে। এই জন্যে বাড়ি ছেড়ে কোথাও যেতে চাই না। তোমার চাচা জোর করে নিয়ে এসেছেন। আগে একবার এসেছিলেন — তখন নাকি জায়গাটা খুব মনে ধরেছিল — খুব সুন্দর, হেনতেন, কত কথা।'

'জায়গা তো সুন্দরই।'

'সুন্দরের কী আছে? বাংলাদেশের সব জায়গাই তো এরকম। নদী, গাছপালা, মাঠ, আলাদা কিছু তো না। তাও যদি ডাকবাংলোটা সুন্দর হত। পাকা দালান করে রেখেছে। বাংলো হবে কাঠের। তার উপর দেখ — ইলেকট্রিসিটি আছে, কিন্তু অন্য কোনো সুযোগ–সুবিধা নেই। একটা ফ্রিজ নেই, ওয়াটার হিটার নেই। ইলেকট্রিসিটির যে অবস্থা! এই আছে, এই নেই। সারাক্ষণ হ্যাজাক জ্বালিয়ে রাখতে হয়। হিসহিস শব্দ আসে — আমার মনে হয় ঘরে সাপ ঢুকেছে। শাহেদ, শুতে যাবার আগে তোমার চা বা কফি খাবার অভ্যাস আছে?'

'অভ্যাস নেই। কিন্তু আজ এক কাপ গরম চা খাব।'

'তুমি তোমার ঘরে চলে যাও। আমি চা বানাচ্ছি।'

'আপনাকে বানাতে হবে না, চাচি। কাউকে বলুন, বানিয়ে দেবে।'

'কাউকে বলতে হবে না। চা আমিই বানাব। আমি নিজেও খাব। নিজের চা নিজে না বানালে আমি খেতে পারি না।'

চা নিয়ে এল নবনী। ট্রেতে করে এক কাপ চা, এক গ্লাস পানি। শাহেদ চা খাবার পর পর এক গ্লাস পানি খায়।

শাহেদ চাদর মুড়ি দিয়ে বিছানায় বসে আছে। তার হাতে গত সপ্তাহের টাইম। এ সপ্তাহের টাইম বের হয়ে গেছে। আগের সপ্তাহেরটা পড়া হয় নি। কোথায় যেন পড়েছিল — ছুটি কাটাতে এসে আপটুডেট কিছু পড়তে নেই। পুরোনো জিনিস পড়তে হয়। খবরের কাগজও পড়া যাবে না। পড়লেও মাসখানিক আগের বাসি কাগজ পড়তে হবে।

নবনী বলল, 'জ্বর কি এসে গেছে?'

'আমার মনে হচ্ছে এসেছে, থার্মোমিটার বলছে না। তোমাদের থার্মোমিটার নষ্ট না তো?'

নবনী শাহেদের কপালে হাত রেখে হাসিমুখে বলল, 'থার্মোমিটার নষ্ট, তোমার গা গরম। প্যারাসিটামল খাবে? প্যারাসিটামল আছে।'

'না। তুমি বস তো খানিকক্ষণ।'

নবনী বসল। শাহেদ বলল, 'আমি এসেই তোমাকে ঘরছাড়া করছি — তুমি ঘুমাচ্ছ কোথায় ?'

'শ্রাবণীর সঙ্গে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কাল জানালার কাচটা লাগিয়ে ফেললে — আমি ঐ ঘরে চলে যেতে পারব। তুমি ফিরে আসবে তোমার জায়গায়।'

'কেন, আমার ঘরে থাকতে কি তোমার ভালো লাগছে না।?'

'লাগছে। তবে আরো ভালো লাগত যদি তুমিও থাকতে।'

নবনী অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। শাহেদ এত সহজ ভাবে এমন সব কথা বলে যে দারুণ অস্বস্তি লাগে। যদিও অস্বস্তি লাগার হয়তো কিছু নেই। এ ধরনের কথা বলার অধিকার শাহেদের আছে।

'নবনী!'

'কি?'

'গম্ভীর হয়ে আছে কেন? একটু আগে যা বললাম তা শুনে মেজাজ খারাপ হয়ে গেল নাকি?'

'না।'

'মনে হচ্ছে মেজাজ কিছুটা খারাপ হয়েছে। আমি তোমার সঙ্গে খুব ভয়ে ভয়ে চলি। এমন সুপার সেনসেটিভ মেয়ে। তোমার উচিত ছিল ভিক্টোরিয়ান যুগে জন্মানো। তুমি ভুল সময়ে জন্মেছ।'

'চা ঠাণ্ডা হচ্ছে — চা খাও।'

'খাচ্ছি। চা খেতে খেতে কঠিন সুরে তোমাকে কিছু কথা বলব। রাগ কর আর যাই কর।'

'রাগ করব না। বল কী বলবে।'

'সত্যি রাগ করবে না?'

'না।'

'তোমার মধ্যে একধরনের অদ্ভুত শুচিবায়ু আছে। এই শুচিবায়ু থাকাটা কি উচিত?'

'আমার এমন কিছু নেই।'

শাহেদ হাসতে হাসতে বলল, 'আছে। খুব ভালোভাবেই আছে। তুমি নিজেও তা জান। এই কারণে তুমি নিজেও নিজের কাছে ছোট হয়ে থাক। সংকুচিত হয়ে থাক। গত বার আমার সঙ্গে যে ঝগড়াটা করলে — কেন করলে?'

'আমি তো বলেছি আমি লজ্জিত, দুঃখিত।'

'যত লজ্জিত বা যত দুঃখিতই হও এরকম পরিস্থিতি হলে তুমি আবারো ঝগড়া করবে, কান্নাকাটি করবে। অথচ কত সামান্য ব্যাপার।'

'আমি স্বীকার করছি সামান্য ব্যাপার।'

'তুমি মুখে বলছ স্বীকার করছি সামান্য ব্যাপার। আসলে স্বীকার করছ না। আমি কী করেছি — রিডার্স ডাইজেস্টের একটা মজার রসিকতা তোমাকে বলেছি।'

নবনী কঠিন স্বরে বলল, 'রসিকতাটা মোটেই মজার নয়।'

'এটা তোমার অভিমত, কিন্তু রিডার্স ডাইজেস্ট মনে করে রসিকতাটা মজার। যে কারণে তারা এটা ছেপেছে — রসিকতাটা হল ... ।'

'একবার তো বলেছ। আবার কেন?'

'আবারো শোন এবং আমাকে বল এটা শুনে হৈচৈ করার এবং কান্নাকাটি করার মানেটা কি। আমি গল্পের প্রতিটি স্টেপ ভেঙে ভেঙে বলব — এক জন রূপবতী তরুণী মেয়ে পার্টিতে গিয়েছে। সেখানে তার হঠাৎ বাথরুম পেল। সে ...

নবনী কঠিন মুখে বলল, 'প্লিজ স্টপ ইট।'

শাহেদ চুপ করে গেল। নিঃশব্দে চা শেষ করল। খানিকক্ষণ দুজনই চুপচাপ বসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকার পর আবার স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কথাবার্তা শুরু হল। শাহেদ বলল, 'তোমাদের ছুটি কেমন কাটছে?'

'খুব ভালো কাটছে। একেক জন একেক জনের মতো ছুটি কাটাচ্ছে। শ্রাবণী এই দুদিন তার নিজের ঘর থেকে বের হয় নি। গল্পের বই পড়ে যাচ্ছে। মা এই দুদিন রান্নাঘরে কাটিয়েছেন। বাবা বারান্দায় বসে বিভিন্ন লোকজনের সঙ্গে আলাপ করছেন।'

'আর তুমি? তুমি কী করছ?'

'আমি একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছি। একেক দিন, একেক জায়গায় যাচ্ছি।'

'আজ কোথায় গিয়েছিলে?'

'আজ একটা প্রাচীন বটগাছ দেখে এসেছি। তোমাকে নিয়ে একদিন যাব। ইন্টারেস্টিং বটগাছ।'

'ইন্টারেস্টিং কোন অর্থে?'

'বিশাল অর্থে। তাছাড়া বটগাছের গুঁড়ি বাঁধানো। ঝুরি নেমে অদ্ভুত দেখাচ্ছে।'

'বটগাছ ছাড়া আর কী দেখলে?'

'টিয়া পাখি দেখলাম। ঝাঁকে ঝাঁকে টিয়া পাখি।'

'টিয়া পাখিগুলোকেও কি ইন্টারেস্টিং মনে হয়েছে?'

'না। ওদের দেখে একটু ভয় ভয় লেগেছে।'

'ভয়ের কী আছে?'

'একসঙ্গে এত পাখি। তাছাড়া এরা খুব নিচু হয়ে উড়ছিল।'

শাহেদ শার্টের পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করল। নবনী বিস্মিত হয়ে বলল, 'তুমি সিগারেট ধরেছ নাকি?'

'কয়েক দিন হল সিগারেট টানছি। মনে হচ্ছে নেশা ধরে গেছে।'

'দিনে কটা খাও?'

'দিনে বেশি খাই না। রাতে খাই।'

'তুমি কি কোনো কিছু নিয়ে চিন্তিত?'

'হুঁ।'

'কী নিয়ে চিন্তিত?'

'সেটাই তো বুঝতে পারছি না।'

'তোমার কারখানায় কি কোনো সমস্যা আছে?'

'সমস্যা তো আছেই। ভয়ংকর লস খেয়েছি।'

'যত ভয়ংকর লস হোক, সেই লস সামলে নেবার ক্ষমতা তো তোমার আছে। আছে না?'

'হ্যাঁ আছে।'

'সিগারেট শেষ করে ঘুমাতে যাও। কাল কথা হবে।'

'আচ্ছা।'

নবনী উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, চা শেষ করে তুমি সব সময় পানি খাও। কই, আজ তো খেলে না।'

শাহেদ পানির গ্লাস হাতে নিল।

নবনী ইতস্তত করে বলল, 'তুমি আমার উপর রাগ করে আছ, তাই না?'

'না।'

'মুখ দেখে বুঝতে পারছি রাগ করেছ।'

'খানিকটা করেছি। তবে সব রাগ জলে ভেসে যাবে যদি তুমি যাবার আগে আমাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জড়িয়ে ধরে একটা চুমু খাও।'

নবনীর চোখ-মুখ শক্ত হয়ে গেল। সে অন্যদিকে তাকাল। শাহেদ বলল, 'তুমি দেখি পাথরের মতো শক্ত হয়ে গেছ। আমি কি ভয়ংকর অন্যায় কিছু বলেছি?'

নবনী কিছু বলল না। দরজা ধরে দাঁড়িয়ে রইল। শাহেদ বলল, 'আচ্ছা যাও — গুড নাইট, নবনী।'

নবনী যন্ত্রের মতো বলল,' গুড নাইট।'

বালিশ হাতে নবনী ছোট বোনের ঘরে ঘুমাতে গেল। দরজায় টোকা দিল। শ্রাবণী জেগে আছে। ঘরে বাতি জ্বলছে। তার নড়াচড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে। কিন্তু সে দরজা খুলছে না। নবনী দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলল, 'এই শ্রাবণী, দরজা খোল। কী হল তোর?'

শ্রাবণী দরজা খুলল। তার চোখে-মুখে স্পষ্ট বিরক্তি। সে হতাশ গলায় বলল, 'আপা, তুমি আমার সঙ্গে ঘুমাবে?'

'হ্যাঁ। অসুবিধা আছে?'

'আছে। আমি কারো সঙ্গে ঘুমাতে চাই না। একা ঘুমাতে চাই।'

'যথেষ্ট পাগলামি করেছিস। দরজা থেকে সরে দাঁড়া।'

শ্রাবণী দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়াল। করুণ গলায় বলল, 'তুমি কিন্তু দেয়ালের দিকে শোবে। আমি ঘুমাব বাইরের দিকে। এবং কাল থেকে তুমি অন্য কোথাও থাকার ব্যবস্থা করবে।'

'তোর সমস্যাটা কি?'

'সমস্যা আছে। তুমি বুঝবে না।'

'বুঝিয়ে বললেও বুঝব না?'

'না।'

'বলে দেখ। বুঝতেও তো পারি।'

শ্রাবণী হালকা গলায় বলল, 'আমি তো রাতে একনাগাড়ে ঘুমাই না আপা। কিছুক্ষণ ঘুমাই। আবার জেগে উঠি। আবার খানিকক্ষণ বই পড়ি। গান শুনি। তুমি বিরক্ত হবে।'

'অবশ্যই বিরক্ত হব। আমার তো শুনেই বিরক্তি লাগছে।'

'এই জন্যেই আমি চাই না তুমি আমার সঙ্গে ঘুমাও। আমি একা থাকতে চাই।'

নবনী বিছানায় উঠতে উঠতে বলল, 'গল্পের বই পড়ে তোর মাথা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। গল্পের বই পড়া তোর বন্ধ করতে হবে। একা একা থাকার অভ্যাসটাও তোর বদলাতে হবে। দুদিন হল আমরা এখানে আছি — দুদিন তুই কি একবারের জন্যেও ডাকবাংলো কম্পাউন্ডের বাইরে গিয়েছিস?'

শ্রাবণী জবাব দিল না। হাসল।

নবনী বলল, 'আয়, বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়ি। শুয়ে শুয়ে গল্প করি। শ্রাবণী বলল, 'আমার শুতে ইচ্ছে করছে না। এত সকালে আমি কখনো ঘুমাতে যাই না।'

'এক রাতে একটু ব্যতিক্রম হোক।'

শ্রাবণী বাতি নিভিয়ে ঘুমাতে এল। দুজনের জন্যে একটাই লেপ। নবনী হাসতে হাসতে বলল, 'তোর গায়ের সঙ্গে গা লেগে গেলে সমস্যা নেই তো আবার?'

'না, কোনো সমস্যা নেই।'

শ্রাবণী বোনকে জড়িয়ে ধরল। এখন মনে হচ্ছে বোনের সঙ্গে ঘুমাতে পেরে সে আনন্দিত। নবনী আদুরে গলায় বলল, 'তুই দিন দিন এত অদ্ভুত হচ্ছিস কেন রে?'

শ্রাবণী জবাব দিল না। লেপের ভেতর মাথা ঢুকিয়ে নিয়ে খিলখিল করে হাসল। নবনী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলল, ‘এত হাসছিস কেন?’

‘তুমি আমার সঙ্গে ঘুমাচ্ছ। আমার ভালো লাগছে, তাই হাসছি।’

‘একটু আগে তো উল্টো কথা বললি — আমাকে তোর ঘরে আসতেই দিতে চাস নি।’

শ্রাবণী আরো ভালোভাবে বোনকে জড়িয়ে ধরল। নবনী বলল, ‘হাত ছাড়, দম বন্ধ হয়ে আসছে।’

‘হোক দম বন্ধ, হাত ছাড়ব না। তুমি গল্প বল। গল্প শুনব।’

‘রাতদিন গল্পের বই পড়িস তুই, আর গল্প বলব আমি — এটা কেমন কথা? বরং তুই তোর পড়া বই থেকে একটা কিছু বল, আমি শুনি।’

‘উঁহু। তুমি বলবে আমি শুনব।’

‘আমি কী বলব?’

‘যা ইচ্ছা বল। এখানে এসে তোমার কেমন লাগছে সেইটা না হয় বল। তুমি যে একা একা ঘুরে বেড়াও — কোথায় কোথায় গেলে, কী দেখলে?’

নবনী হাই তুলতে তুলতে বলল, ‘গাছপালা ছাড়া এখানে আর কী আছে? গাছপালা দেখেছি। একটা বিশাল বটগাছ দেখলাম। ঝুরি নেমে একাকার। নিচটা বাঁধানো। তোকে নিয়ে একদিন না হয় যাব। ঐ বটগাছের বাঁধানো জায়গাটায় বসে জোছনা দেখব। খুব নাকি সুন্দর।’

‘কে বলেছে খুব সুন্দর?’

‘এখানকার কলেজের এক অধ্যাপক। মবিনউদ্দিন না কি যেন নাম।’

‘তার সঙ্গে দেখা হল কোথায়?’

নবনী গল্পটা বলল, বেশ গুছিয়েই বলল। বলতে গিয়ে লক্ষ করল গল্পটা বলতে তার ভালো লাগছে। শ্রাবণী শুনছেও খুব আগ্রহ করে। গল্প শেষ হবার পর শ্রাবণী বলল, ‘তুমি কি অধ্যাপক ভদ্রলোককে খুব কঠিন করে ধমক দিলে?’

‘মোটামুটি কঠিনভাবেই দিলাম।’

‘ভদ্রলোক কী বললেন?’

‘কিছু বলে নি। দাঁড়িয়ে ছিল চুপচাপ।’

‘ধমক দেবার পর তোমার কি মনে হয় নি — আহা, কেন ধমক দিলাম।’

‘না, মনে হয় নি। ধমক তার প্রাপ্য ছিল। কী করে সে তার সঙ্গে জোছনা দেখার জন্যে এমন একটা নির্জন জায়গায় যেতে বলে?’

‘আমি কিন্তু ভদ্রলোকের কোনো দোষ দেখছি না।’

‘দোষ দেখছিস না কেন?’

শ্রাবণী উঠে বসে হাত বাড়িয়ে টেবিল ল্যাম্প জ্বালাল। মুখ না দেখে কথা বলতে তার ভালো লাগছে না। নবনী বিরক্ত গলায় বলল, ‘বাতি জ্বালিয়েছিস কেন? বাতি নেভা।’

‘উঁহু। অন্ধকারে কথা বলতে ভালো লাগছে না। আপা, তুমি আমার যুক্তি শোন। যুক্তি শোনার পর তোমার মনে হবে ঐ অধ্যাপক ভদ্রলোক কোনো ভুল করেন নি। বরং তাঁকে ধমক দিয়ে তুমি ভুল করেছ।’

‘যুক্তি সকালে শুনব। এখন শুনতে ইচ্ছা করছে না।’

‘না, তোমাকে এখনই শুনতে হবে। এই যুক্তি আমার সকালে মনে থাকবে না। রাতের যুক্তি দিনে কাজ করে না। আপা শোন — ঐ অধ্যাপক ভদ্রলোকের কথা থেকেই মনে হচ্ছে তিনি বটগাছের কাছে প্রায়ই আসেন। এখানে বসে জোছনা দেখেন। নিশ্চয় জায়গাটা তাঁর অত্যন্ত প্রিয় — এবং জোছনাও খুব প্রিয়। তুমি কি accept করছ?’

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'করছি।'

'ভদ্রলোক বসে ছিলেন একা একা। তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নি — তুমি সেখানে উপস্থিত হবে। তিনি হঠাৎ তোমাকে দেখলেন। নির্জন জায়গা। অদ্ভুত পরিবেশ। সেখানে ঠিক স্বপ্নদৃশ্যের মতো অসম্ভব রূপবতী একজন তরুণী উপস্থিত হল। সাধারণ পরিবেশেই তোমাকে দেখলে লোকজন চমকে যায়। অস্বাভাবিক পরিবেশে তোমাকে দেখে ভদ্রলোক হতভম্ব হয়ে গেলেন। তাঁর মধ্যে এক ধরনের ঘোর সৃষ্টি হল। তাঁর কাছে এটা বাস্তব দৃশ্য না। এটা হয়ে গেল স্বপ্নদৃশ্য। তুমি হয়ে গেলে স্বপ্নের একটি মেয়ে। স্বপ্নে যা ইচ্ছা করে তাই বলা যায়। ভদ্রলোক তাই করলেন— তোমাকে নিমন্ত্রণ করলেন জোছনা দেখার জন্যে। ব্যাপারটা তোমার কাছে অস্বাভাবিক লাগলেও তাঁর কাছে মোটেই অস্বাভাবিক লাগল না। কারণ তুমি তো বাস্তবের মেয়ে না, তুমি ছিলে কল্পনার একটি মেয়ে।'

'চুপ কর্ গাধা। আমি হলাম কল্পনার মেয়ে। সে খুব ভালো করেই জানে আমি কে। আমি ডাকবাংলোয় আছি। আমার নাম পর্যন্ত জানে।'

'জানলেও তুমি তাঁর কাছে বাস্তবের কোনো চরিত্র না। বাস্তবের চরিত্ররা তোমার মতো সুন্দর হয় না। বাস্তবের চরিত্ররা এত সুন্দর করে সেজে একা একা বটগাছের কাছে যায় না। বটগাছের সঙ্গে গল্প করে না।'

'যথেষ্ট হয়েছে। বাতি নিভিয়ে ঘুমাতে আয়।'

শ্রাবণী বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়ল। হালকা গলায় বলল, 'তোমার জায়গায় আমি হলে কী করতাম জান আপা?'

'জানি।'

'বল তো কী করতাম?'

'তুই বলতি — চলুন যাই। আপনার জোছনা দেখে আসি। তারপর বসে থাকতি লোকটার সঙ্গে। আমরা পুলিশ নিয়ে তোকে খুঁজে বের করে আনতাম।'

শ্রাবণী হাসতে হাসতে বলল, কিছুটা হয়েছে, পুরোপুরি হয় নি। আমি ঠিকই বলতাম, চলুন যাই। বটগাছের কাছে গিয়ে বলতাম — আপনি গিয়ে বসুন, আমি আসছি। ভদ্রলোক বসতেন আর আমি নিঃশব্দে পালিয়ে চলে আসতাম। ভদ্রলোক আর আমাকে খুঁজে পেতেন না।'

'তাতে লাভ কী হত?'

'ভদ্রলোকের স্বপ্নটা আরো জোরালো করে দিতাম। তাঁর কাছে সারাজীবন মনে হত — তিনি ঐ রাতে সুন্দর একটা স্বপ্ন দেখেছেন।'

নবনী হাই তুলতে তুলতে বলল, 'গল্পের বই পড়া তোর পুরোপুরি বন্ধ করা উচিত। তোর মাথা এলোমেলো হয়ে গেছে। এখন ঘুমা দেখি।'

'আচ্ছা ঘুমাচ্ছি।'

নবনী অবাক হয়ে লক্ষ করল, শ্রাবণী সত্যি সত্যি ঘুমিয়ে পড়েছে। গাঢ়, গম্ভীর ঘুম। নবনীর ঘুম আসছে না। সে জেগে আছে। জানালা গলে জোছনার আলো ঢুকেছে। সুন্দর দেখাচ্ছে।

শ্রাবণীর সঙ্গে গল্প করতে ভালো লাগছিল। এখন কেমন যেন একা একা লাগছে। শাহেদ কি এখনো জেগে আছে। ঢাকায় সে অনেক রাত জাগত। এখানে কি জাগবে? শরীর খারাপ। শুয়ে পড়েছে নিশ্চয়ই।

নবনী খাট থেকে নামল। তার পানির পিপাসা পেয়েছে। সে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। বারান্দায় খুব হাওয়া। শীত লাগছে। সে খানিকক্ষণ শীত গায়ে মাখল। খুব সাবধানে এগুল শাহেদের ঘরের দিকে। ঘরে বাতি জ্বলছে। সে এখনো জেগে আছে। নবনী দরজায় হাত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাখল। দরজার ভেতর থেকে বন্ধ। সে কি ডাকবে শাহেদকে? না থাক। নবনী খাবার ঘরের দিকে এগুল।

খাবার ঘরে বাতি জ্বলছে। জাহানারা হাতলওয়ালা একটা চেয়ারে বসে উলের কি যেন বুনছেন। তাঁর পেছনে মিলু বুয়া দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চুল বিনি করে দিচ্ছে। নবনী বলল, 'মা ঘুমাও নি?'

'না। ঘুম আসছে না।'

'বসে বসে স্যুয়েটার বুনলে তো ঘুম আসবে না। বিছানায় শুয়ে ঘুমের চেষ্টা করতে হবে।'

'চেষ্টা করে লাভ নেই।'

'তুমি ঘুমাচ্ছ না ভালো কথা। মিলু বুয়াকে জাগিয়ে রেখেছ কেন? তাকে ঘুমাতে দাও।'

জাহানারা কিছু বললেন না। উল বুনেই যেতে লাগলেন। মিলু নবনীর দিকে তাকিয়ে ইশারায় আর কিছু না বলার জন্যে অনুরোধ করল।

৪

সুরুজ মিয়া মই নিয়ে এসেছেন।

ডাকবাংলোর পেছনে মই লাগানো হয়েছে। সুরুজ মিয়া নিজেই মই বেয়ে তরতর করে উঠলেন। নিশ্চিত হলেন যে মই ঠিক আছে। মই ভেঙে পড়ে গেলে তাঁর উপর দোষ পড়বে।

শ্রাবণী বলল, 'থ্যাংকস চেয়ারম্যান চাচা।'

সুরুজ মিয়া শুকনো মুখে বললেন, 'স্যার রাগই করেন কিনা।'

'বাবা রাগ করবে না। আপনি শুধু শুধু ভয় পাচ্ছেন।'

'আর কিছু লাগবে আম্মা? লাগলে বলবেন। লজ্জা করবেন না।'

'আপনাকে যা আনতে বলা হবে আপনি তাই আনবেন?'

'এত ক্ষমতা কি আমার আছে আম্মা! তবে চেষ্টা করব এইটা সত্য।'

'আসুন চেয়ারম্যান চাচা, আমার সঙ্গে চা খান।'

'জ্বি না আম্মা। আমি এখন যাই। স্যার ঘুম থেকে উঠলে একবার আসব। খোঁজ নিয়া যাব। আপনার কিছু লাগব কিনা তা তো আম্মা বলেন নাই। আমি হলাম আপনার বুড়ো ছেলে। ছেলেকে বলতে দোষ নাই।'

'আমার কিচ্ছু লাগবে না। ও আচ্ছা, একটা জিনিস লাগতেও পারে। এখনো বুঝতে পারছি না। আপনাকে পরে বলব।'

সুরুজ মিয়া চিন্তিত বোধ করছেন। মিনিস্টার সাহেবের ছোট মেয়েটা অন্য দশটা মেয়ের মতো না। একটু আলাদা। মাথা খারাপও হতে পারে। বড়লোকের মেয়েগুলোর মাথা একটু খারাপ এমনিতেই থাকে। আর এ হল ছোট মেয়ে — আদর পেয়েছে বেশি। এই মেয়েটা সম্পর্কে গতকাল রাতে একটা খবর পেয়ে তিনি খুবই চিন্তিত বোধ করেছেন। মিনিস্টার সাহেবকে জানাবেন কিনা বুঝতে পারছেন না। জানানো উচিত কিনা তাও বুঝতে পারছেন না। ওসি সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করতে গিয়েছিলেন। ওসি সাহেবও কোনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরামর্শ দিতে পারলেন না — শুধু বললেন, 'চিন্তার বিষয় হয়ে গেল। লক্ষ্য রাখতে হবে।'

ব্যাপার তেমন কিছু না। পুলিশের সেন্ট্রি খবরটা দিয়েছে। সে মিথ্যা বলে নি। মিনিস্টারের মেয়েকে নিয়ে মিথ্যা বলার সাহস তার হবে না।

সে দেখেছে মিনিস্টার সাহেবের ছোট মেয়ে রাত তিনটার দিকে একটা চাদর গায়ে দিয়ে একা একা বাড়ি থেকে বের হয়ে নদীর তীর পর্যন্ত গেল। খানিকক্ষণ হাঁটল — তারপর ফিরে এল। পুলিশের সেন্ট্রি কাছে যায় নি, দূরে দূরে থেকেছে। তবে লক্ষ্য রেখেছে।

এখানে অবশ্যি ভয়ের কিছুই নেই। খুবই নিরাপদ জায়গা। তবু অঘটন ঘটতে কতক্ষণ লাগে? অঘটন যে কোনো সময় ঘটতে পারে। তবে এখন আর ভয়ের কিছু নেই। সুরুজ মিয়া নদীর পাড়ে লোক রেখে দিয়েছেন। নৌকা বাঁধা আছে। নৌকায় দুজন মাঝি। তাদের কাজ হল ডাকবাংলোর দিকে তাকিয়ে থাকা। কাউকে আসতে দেখলেই এক জন নৌকায় থাকবে, অন্যজন ছুটে এসে তাঁকে খবর দেবে। তখন না হয় মিনিস্টার সাহেবকে খবর দেয়া যাবে। ব্যাপারটা হয়তো কিছুই না। আবার হয়তো অনেক কিছু। মইয়ের ব্যাপারটা ধরা যাক। এমন কিছু না। মই দিয়ে ছাদে ওঠার শখ বড় মানুষের ছেলেপুলেদের হবেই। কিন্তু মই দিয়ে ছাদে উঠে এই মেয়ে যদি নিচে ঝাঁপ দেয় তখন অবস্থাটা কী হবে? যে মেয়ে নিশিরাতে নদীর পাড়ে যেতে পারে সে অনেক কিছুই করতে পারে। মেয়েটার মধ্যে পাগলামি আছে। ভালো রকম পাগলামি আছে। সুরুজ মিয়ার ধারণা, মেয়েটার বড় বোনের মধ্যেও আছে। সেই মেয়েও একা একা ঘুরে বেড়ায়। পাগলামি বংশগত ব্যাপার। এক জনের কারোর থাকলে সবার মধ্যে খানিকটা চলে আসে। মিনিস্টার সাহেবের মধ্যে কি আছে? সুরুজ মিয়া এখনো তা ধরতে পারেন নি। তবে খানিকটা আছে বলে মনে হয়। না হলে থানার ওয়্যারলেস দিয়ে কেউ খবর পাঠায় — সুন্দরবনের বাঘের সংখ্যা কত? সুন্দরবনের বাঘের সংখ্যা দিয়ে কী হবে? এটা কি একটা জানার বিষয়?

শ্রাবণী সুরুজ মিয়ার সঙ্গে বাগানে হাঁটছে। সুরুজ মিয়া মেয়েটির হাবভাব বোঝার চেষ্টা করছেন। মেয়েটাকে তো বেশ সহজ স্বাভাবিকই মনে হচ্ছে। ভয় পাওয়ার বোধহয় কিছু নেই। ঐ দিন রাতে নদীর ঘাটে একা একা কেন গিয়েছিল জিজ্ঞেস করে ফেলবেন নাকি? রেগে না গেলেই হল। হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করতে হবে, যাতে রাগতে না পারে।

'আম্মা, একটা কথা বলব?'

'বলতে ইচ্ছে করলে অবশ্যি বলবেন।'

সুরুজ মিয়া ইতস্তত করতে লাগলেন। বোধহয় বলাটা ঠিক হবে না।

শ্রাবণী বলল, 'এমন কোনো কথা যা বলতে আপনার অস্বস্তি লাগছে?'

সুরুজ মিয়া মাথা চুলকাতে চুলকাতে বললেন, 'ভুলও হইতে পারে। মানুষ মাত্রই ভুল হয়।'

'বলে ফেলুন তো শুনি। এত প্যাঁচানোর কোনো দরকার নেই।'

'ইয়ে মানে — ব্যাপার হয়েছে কি — পুলিশের সেন্ট্রি আমারে বলল — আপনারে নাকি দেখেছে রাত তিনটার দিকে একা একা নদীর পাড়ে গেছেন?'

শ্রাবণী সহজ গলায় বলল, 'ঠিকই দেখেছে। আপনি এটা বলতে এত অস্বস্তি বোধ করছেন কেন?'

'না মানে, গভীর রাত!'

'গভীর রাত হয়েছে তো কী হয়েছে? ভরা পূর্ণিমা। ডাকবাংলোর সঙ্গে নদী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডাকবাংলোয় পুলিশ পাহারা। কাছেই একদল আনসার, ডাকলেই ছুটে আসবে। আমি ভয় পাব কেন?'

'না, ভয়ের কিছু নাই।'

'আমার অবশ্যি খানিকটা ভয় ভয় করছিল। কিন্তু এত সুন্দর লাগছিল — বালির উপর চাঁদের আলো। ভাবলাম, কাছে গিয়েই দেখে আসি। আপনার ধারণা কাজটা ভুল হয়েছে?'

'জ্বি না, আম্মা। ভুল হয় নাই। তবে স্যার শুনলে রাগ করবেন।'

'বাবা শুনেছেন। সকালবেলায় বাবাকে বলেছি। বাবা রাগ করেন নি। শুধু বলেছেন — নেক্সট টাইম এমন ইচ্ছা যদি হয় তাহলে যেন এক জন সেন্ট্রি সঙ্গে করে নিয়ে যাই।'

সুরুজ মিয়া এখন খানিকটা নিশ্চিন্ত বোধ করছেন। ব্যাপারটা যত জটিল শুরুতে মনে হয়েছিল — এখন দেখা যাচ্ছে তত জটিল নয়।

'চেয়ারম্যান চাচা!'

'জ্বি আম্মা!

'আপনার বাড়ি এখান থেকে কত দূরে?'

'বেশি দূরে না আম্মা। কাছেই।'

'চলুন তাহলে আপনার বাড়ি থেকে বেড়িয়ে আসি।'

সুরুজ মিয়া হকচকিয়ে গিয়ে বললেন, 'শুনে খুবই আনন্দ পেয়েছি আম্মা। কিন্তু স্যারকে না জিজ্ঞেস করে আপনাকে নিতে পারব না। স্যার অনুমতি দিলে একদিন নিয়ে যাব। বাড়ির মেয়েছেলেরাও আপনাকে আর বড় আম্মাকে দেখতে চায়।'

শাহেদের ঘুম ভেঙেছে। সে জানালা দিয়ে দেখছে শ্রাবণী এবং টুপি মাথায় বুড়ো ধরনের একজন লোক বাগানে হাঁটছে। শ্রাবণী হাত নেড়ে নেড়ে খুব গল্প করছে। শাহেদের জ্বর শেষ পর্যন্ত আসে নি। শরীর ঝরঝরে লাগছে। রাতে না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিল। এখন প্রচণ্ড খিদে বোধ হচ্ছে। শাহেদ বিছানা ছেড়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। হাত উঁচিয়ে শ্রাবণীকে ইশারা করল। শ্রাবণী এগিয়ে আসছে। তাকে রোগা রোগা লাগছে।

'গুড মর্নিং, শাহেদ ভাই।'

'গুড মর্নিং, শ্রাবণী।'

'এই মাত্র ঘুম থেকে উঠলেন?'

'হুঁ।'

'অনুমান করুন তো কটা বাজে?'

'আটটা।'

'হয় নি। বাজে মাত্র সাতটা। এই ব্যাপারটা আমি লক্ষ করেছি। গ্রামে এলেই দেখবেন সময় স্লো হয়ে যায়। এক ধরনের টাইম ডাইলেশন হয়। আপনার কাছে মনে হচ্ছে আটটা বাজে। আসলে বাজছে সাতটা।'

'ঐ বুড়ো ভদ্রলোক কে?'

'উনার নাম সুরুজ মিয়া। চেয়ারম্যান। চেয়ারম্যান শুনলেই খুব খারাপ ধরনের চরিত্রের কথা মনে আসে। উনি মোটেই সে রকম নন। নিতান্তই ভালো মানুষ। আমার জন্যে মই এনে লাগিয়ে দিয়েছেন।'

'কী এনে লাগিয়েছেন?'

'মই। ছাদে ওঠার মই। আপনি তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে ফেলুন, আপনার জন্যে চায়ের ব্যবস্থা করে আসি। কুয়ার পাশে বসে চা খান, দেখুন কী অদ্ভুত লাগে।'

'কুয়ার পাড়ে বসে চা খেতে হবে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কিংবা এক কাজ করা যেতে পারে। আমরা দুজন চায়ের কাপ নিয়ে ছাদে চলে যেতে পারি। আপা ঘুম ভেঙে যখন দেখবে আপনি নেই, তখন তার মাথা খারাপ হয়ে যাবে।'

'তোমার আপা কি এখনো ঘুমাচ্ছে?'

'মনে হয় ঘুমাচ্ছে। ডেকে তুলব?'

'দরকার নেই। তুমি বরং চা নিয়ে এস।'

শ্রাবণী রান্নাঘরে ঢুকল। রান্নাঘরে পিঠা বানানোর চেষ্টা হচ্ছে। জাহানারা ভাপা পিঠা বানাচ্ছেন। ঠিকমতো হচ্ছে না। ভেঙে যাচ্ছে। নবনীর ঘুম ভেঙেছে। সে মুখ ধুয়ে মার পাশে বসে আছে। মাকে সাহায্য করাই তার ইচ্ছা। কোনো উপায় নেই – জাহানারা তাকে কোনো কিছুতেই হাত দিতে দিচ্ছেন না। শ্রাবণী বলল, 'আপা শাহেদ ভাই কুয়ার পাড়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তোমাকে চা নিয়ে যেতে বলেছেন।'

নবনী লজ্জা পেয়ে গেল। জাহানারা মেয়ের এই লজ্জা উপভোগ করলেন। হাসি চাপতে চাপতে বললেন, 'চা-টা তুই নিজেই বানিয়ে নিয়ে যা। পিঠার হাঁড়ি নামিয়ে কেতলি বসিয়ে দে।'

নবনী বলল, 'সব তুমি করবে, চা-টাই বা শুধু শুধু আমি করব কেন? চা তুমি বানাবে।'

কুয়ার পাড়টা এত সুন্দর রাতে বোঝা যায় নি। কুয়ার চারপাশে চিকন চিকন পাতার অচেনা কিছু গাছ পুরো জায়গাটার উপর ছায়া ফেলে আছে। গাছের নিচ ঝকঝক করছে। একটা পাতাও পড়ে নাই। পরিষ্কার থাকারই কথা। সকাল-বিকাল দুবেলা ঝাঁট দেয়া হচ্ছে। মালী শাহেদকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে দুটা ফোল্ডিং চেয়ার নিয়ে এল। শাহেদ বলল, 'আপনাদের ডাকবাংলো খুব সুন্দর।'

মালী কিছু বলল না। এমনিতে সে প্রচুর কথা বলে। এখন চেয়ারম্যান সাহেব তাকে বলে দিয়েছেন—মুখ বন্ধ রাখবি, কোনো কথা বলবি না। কি বলতে কী বলবি সর্বনাশ হয়ে যাবে। যে সে লোক আসে নাই। মন্ত্রী। জাতসাপ।

ট্রেতে করে চা, টোস্ট বিসকিট নিয়ে নবনী আসছে। এই শীতের মধ্যেও ঘুম থেকে উঠেই সে গোসল করে হালকা গোলাপি রঙের শাড়ি পরেছে। কানে মুক্তার দুল। শাড়ির রং তার গায়ের রঙের সঙ্গে মিলেমিশে গেছে। সুন্দর দেখাচ্ছে নবনীকে। তার দিক থেকে চট করে চোখ ফিরিয়ে নেয়া সম্ভব না। শাহেদ বলল, 'আজ ভোরবেলা আয়নায় তুমি নিজেকে দেখেছ?'

'না। কেন?'

'না দেখে থাকলে খবরদার দেখবে না। নজর লেগে যাবে। নিজের নজর সবচে' বেশি লাগে। আজ তোমাকে দেখাচ্ছে স্বর্গের অপ্সরীদের মতো।'

'স্বর্গের অপ্সরীরা কি চা এবং টোস্ট নিয়ে আসে? তারা আনে অমৃত।'

'চা এখন অমৃতের মতো লাগবে।'

শাহেদ চায়ের কাপ তুলে নিল। নবনী বলল, বিসকিট খাও। নাশতা দিতে দেরি হবে। মা ভাপা পিঠা বানানোর চেষ্টা করছেন। পিঠা জোড়া লাগছে না। লাগবে বলেও মনে হয় না। রাতে ঘুম কেমন হয়েছিল?'

'খুব ভালো ঘুম হয়েছে। এক ঘুমে রাত কাবার।'

নবনী শাহেদের সামনে বসেছে। সে তার নিজের চায়ের কাপ হাতে নিতে নিতে বলল, 'জায়গাটা কী অদ্ভুত সুন্দর, লক্ষ করেছ?'

'হ্যাঁ, লক্ষ করলাম।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আর কী রকম নির্জন সেটা দেখেছ?'

'হ্যাঁ।'

নবনী বলল, 'ডাকবাংলোটা গ্রামের মূল বসতি থেকে অনেকখানি দূরে। নীলকর সাহেবরা বানিয়েছিল। তারা মানুষদের কাছ থেকে দূরে থাকতে চাইত।'

শাহেদ বলল, 'এই অঞ্চলে তো নীলের চাষ হবার কথা না। নীলকর সাহেব তুমি কোথায় পেলে?'

'আমি যা শুনেছি, তাই তোমাকে বললাম। সাহেবদের কবরখানাও নাকি আছে। এক সাহেবের স্ত্রী মারা গিয়েছিলেন – তাঁর কবর আছে। কবরে চার লাইনের কবিতা আছে।'

'কবরটা কোথায়?'

'আমি জানি না। শ্রাবণী জানে।'

'ওকে বল তো আমাকে দেখাতে।'

'বলব।'

শাহেদ হাসতে হাসতে বলল, 'কোথাও বেড়াতে এসে অবশ্যি কবর দেখে বেড়ানো কোনো কাজের কথা না।

নবনী উঠে দাঁড়াল। শাহেদ বলল, 'যাচ্ছ কোথায়? বোস না।'

'নাশতার ব্যবস্থা দেখি। মা যা শুরু করেছে – আজ কেউ নাশতা খেতে পারব বলে মনে হয় না।'

'নাশতা নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই, তুমি বোস।'

নবনী বসল। শাহেদ বলল, 'সুন্দর কোনো প্রেমের কবিতা আমার মুখস্থ নেই – থাকলে এখন তোমার দিকে তাকিয়ে আবৃত্তি করতাম। তুমি এত সুন্দর কেন?'

নবনী চট করে মাথা ঘুরিয়ে নিল। তার চোখে পানি এসে যাচ্ছে। সে চোখের পানি শাহেদকে দেখাতে চায় না।

শাহেদ বলল, 'আমার দিকে তাকাও, অন্যদিকে তাকিয়ে আছ কেন?'

নবনী বলল, 'কাল রাতে আমি তোমাকে রাগিয়ে দিয়েছি। এরকম আর হবে না।' শাহেদ হাসতে হাসতে বলল, 'তার মানে কি এই যে আমি যা চাইব তাই পাব?'

নবনী জবাব দিল না।

৫

কিছুদিন মন্ত্রিত্ব করলে বিস্মিত হবার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। মন্ত্রীরা কোনো কিছুতেই বিস্মিত হন না। জামিল সাহেবের ক্ষেত্রে তা ঘটে নি। তিনি সুরুজ মিয়ার কর্মক্ষমতায় বিস্মিত হয়েছেন এবং বিস্ময় চাপা দেবার চেষ্টা করছেন না। সুরুজ মিয়া যা করেছেন তা হল – ময়মনসিংহ থেকে একটা ফ্রিজ নিয়ে এসেছেন। ফ্রিজের সঙ্গে মেকানিক। মেকানিক এখন খুটখাট করে থ্রি-পয়েন্ট প্লাগ বসাচ্ছে। সুরুজ মিয়া একটু দূরে দাঁড়িয়ে হাত কচলাচ্ছেন।

জামিল সাহেব বললেন, 'এই ফ্রিজ আপনি নিজে কিনে এনেছেন?'

'জ্বি স্যার।'

'কেন?'

'ঐদিন শুনলাম বেগম সাহেবের ঠাণ্ডা পানি খাওয়ার অভ্যাস। উনার কষ্ট হইতেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শোনার পর মনটা খারাপ হয়ে গেল।'

'আমরা তো দুদিন পর চলে যাব, তখন ফ্রিজ কী করবেন?'

'অসুবিধা কিছু নাই, স্যার। রেখে দিব। আপনারা হইলেন মেহমান। আমি থাকতে মেহমানের কষ্ট – এটা তো স্যার অচিন্তনীয়।'

'এরকম সেবাযত্ন সব মেহমানদেরই করেন?'

'করার চেষ্টা করি, স্যার। তবে কেউ তো এদিকে আসেন না। রাস্তাঘাট ভালো না। তবু যাঁরা আসেন, যত্ন করার চেষ্টা করি। আমার ক্ষমতাও স্যার সামান্য। নাদান মানুষ।'

'আপনার ক্ষমতা মোটেই সামান্য নয়। আমি বিস্মিত হয়েছি। আপনি কি কিছু চান আমার কাছে? আপনার কোনো তদবির আছে?'

'জ্বি না স্যার, আমার কোনো তদবির নাই।'

'সত্যি বলছেন তো?'

'জ্বি স্যার, সত্যি।'

ফ্রিজ লাগানো হয়েছে। হালকা শোঁ শোঁ শব্দ আসছে। পানির বোতল ভর্তি করে রাখা হয়েছে। জাহানারা স্বস্তি বোধ করছেন। অনেকদিন পর আরাম করে পানি খাওয়া যাবে। তবে ফ্রিজের রং তাঁর পছন্দ হয় নি। কটকটে হলুদ রং। তাকালেই মাথা ধরে যায়।

জাহানারা বাইরের লোকদের সঙ্গে কথাবার্তা বিশেষ বলেন না। সুরুজ মিয়ার সঙ্গে বললেন।

'এত যন্ত্রণা করার কোনোই প্রয়োজন ছিল না। ঠাণ্ডা পানি আমাকে খেতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। যাই হোক, আপনাকে ধন্যবাদ।'

সুরুজ মিয়া বিনয়ে নিচু হয়ে বললেন, 'যা দরকার হবে আমাকে বলবেন বেগম সাহেব। কোনো সংকোচ করবেন না।'

'শাহেদ পাখি শিকারের কথা বলেছিল। শীতের পাখি। সম্ভব হবে?'

'অবশ্যই সম্ভব হবে। এটা পাখি শিকারেরই জায়গা। গত বৎসর কমিশনার সাহেব আর তাঁর স্ত্রী এসেছিলেন। পাখি শিকারের জন্যেই এসেছিলেন।'

জাহানারা বললেন, 'ব্যবস্থা করতে হবে নবনীর বাবাকে না জানিয়ে। উনি শুনলে রাগ করবেন। অতিথি পাখি মারা আইনে নিষেধ।'

'সব কথা স্যারকে জানানোর দরকার নাই। উনি কিছুই জানবেন না। আমি নৌকা, বন্দুক সব ব্যবস্থাই করে রাখব। ভোররাত্রে যাওয়া লাগবে। দুই আম্মাও কি সাথে যাবেন?'

'হ্যাঁ, ওরাও নিশ্চয়ই যেতে চাইবে।'

'কোনো অসুবিধা নাই বেগম সাব। আমি ব্যবস্থা করে খবর দিব।'

'আপনি হুট করে চলে যাবেন না। নাশতা খেয়ে যাবেন।'

'জ্বি আচ্ছা?'

সুরুজ মিয়া নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে দু একটা কাজ করলেন। বিকেলের মধ্যে খুঁটি বসিয়ে ব্যাডমিন্টন খেলার ব্যবস্থা করলেন। ব্যাডমিন্টন খেলার সাজসরঞ্জাম ঘরেই ছিল। গত বৎসর কমিশনার সাহেব ব্যাডমিন্টন খেলতে চেয়েছিলেন। সব জিনিসপত্র যখন জোগাড় হল তখন তাঁরা চলে গেলেন। সুরুজ মিয়া যত্ন করে তুলে রেখেছিলেন। এখন কাজে লেগেছে। এ জগতে কিছুই নষ্ট হয় না। এক সময় না এক সময় কাজে লাগে। মিনিস্টার সাহেবের পেছনে তার শ্রমও বৃথা যাবে না। এক সময় কাজে লাগবে।

বিকেল। রোদ পড়ে এসেছে।

শাহেদ খুব আগ্রহ নিয়ে ব্যাডমিন্টন খেলছে। একদিকে শাহেদ, অন্যদিকে শ্রাবণী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নবনীকে খেলার ব্যাপারে রাজি করানো যায় নি। সে নাকি জীবনে ব্যাডমিন্টন খেলে নি। শাহেদ বলল, 'এটা এমন কোনো খেলা না যে শিখতে হয়। র‍্যাকেট হাতে নিলেই খেলা যায়। সাহস করে র‍্যাকেটটা হাতে নাও।'

নবনী বলল, 'আমার এত সাহস নেই। আমি বরং দেখি। দেখতেই আমার ভালো লাগছে।'

শ্রাবণী বলল, 'দেখতে তোমার মোটেই ভালো লাগছে না। তুমি খুব বিরক্ত হয়ে তাকিয়ে আছে।'

'মোটেই বিরক্ত হয়ে তাকিয়ে থাকছি না। তুই যে হেরে ভূত হচ্ছিস, দেখে ভালো লাগছে।'

'আপা, আমি হেরে ভূত হচ্ছি না। শাহেদ ভাই কেমন খেলে আমি বোঝার চেষ্টা করছি। যখন বোঝা হয়ে যাবে তখন বাজির খেলা খেলব। সিরিয়াস বাজি ধরে খেলা হবে।'

'কী বাজি?'

'বাজির টার্মস এন্ড কন্ডিশানস পরে ঠিক করা হবে।'

শাহেদ নবনীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'প্রায় পনের বছর পর ব্যাডমিন্টন খেলছি। দারুণ লাগছে। আমি থরোলি এনজয় করছি।'

নবনী বলল, 'তাহলে এনজয় করতে থাক। আমি একটু ঘুরে আসি। খেলা শেষ হলে একসঙ্গে চা খাব।'

'ঠিক আছে। চা-নাশতা খেয়ে ইংরেজ সাহেবের স্ত্রীর কবর দেখে আসব। কোথায় যেন কবরটা?'

শ্রাবণী বলল, 'জঙ্গলের ভেতর।'

ডাকবাংলো থেকে একা বেরুতে নবনীর ইচ্ছা করছিল না। সে রান্নাঘরে ঢুকে মাকে ধরল। আদুরে গলায় বলল, 'মা, চল তো আমার সঙ্গে, ঘুরে আসবে। সারাক্ষণ রান্নাঘরে বসে থাকার জন্যে তুমি নিশ্চয়ই বেড়াতে আস নি। চল আমার সঙ্গে।'

'কোথায়?

'পৃথিবীর সবচে' বড় বটগাছ তোমাকে দেখিয়ে আনব।'

'দিনের বেলা মনে করিস না কেন? এখন যাব কীভাবে? কাচ্চি বিরিয়ানি বসিয়েছি। এখন তো নড়াই যাবে না।'

নবনী একা একাই বের হল। গেটের বাইরে সেন্ট্রি পুলিশ দুজন একসঙ্গে স্যালুট দিল। নবনীর জানতে ইচ্ছে করল, স্যালুট দেয়ার সময় এরা কীভাবে। কিছু নিশ্চয়ই ভাবে। তাদের ভালো লাগে না নিশ্চয়ই। আচ্ছা, এরা কি শ্রাবণীকেও স্যালুট দেয়? শ্রাবণীকে জিজ্ঞেস করতে হবে।

'আম্মা, কোথায় যান?'

নবনী থমকে দাঁড়াল। সুরুজ মিয়া ছুটতে ছুটতে আসছেন।

সুরুজ মিয়ার মুখভর্তি পান। নবনীর কাছে এসে রাস্তার উপর পানের পিক ফেললেন। টকটকে লাল পিক। নবনীর মনে হল, মানুষটা রক্ত-বমি করছে।

'কোথায় যান আম্মা?

'কোথাও না। হাঁটতে বের হয়েছি। দৃশ্য দেখছি।'

'দেখার কিছু নাই। গণ্ডগ্রাম জায়গা। কিছু গাছপালা।'

'গাছপালাই আমার কাছে খুব সুন্দর লাগছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

‘রাস্তা খারাপ। বড় ধুলা। হাঁটার চাইতে নদীপথে যাওয়া ভালো। নৌকা একটা তৈরি রেখেছি ঘাটে। দুজন মাঝি আছে। যখন বলবেন নিয়ে যাবে।’

‘থ্যাংক ইউ।’

‘থানার একটা স্পিডবোট ছিল। তার আবার ডিজেল নাই। মেশিনেও কি জানি গণ্ডগোল। আমি ওসি সাহেবরে বললাম মেশিন সারাই করতে। ডিজেল আনতে। প্রয়োজনে কাজে না লাগলে স্পিডবোটের ফায়দা কি।’

‘আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই। বেড়াতে ইচ্ছা হলে নৌকা তো আছেই।’

‘নৌকা আম্মা চব্বিশ ঘন্টা আছে। তোশক দিয়ে বিছানা করা। যখন ইচ্ছা মাঝিকে বলবেন। আমাকেও বলতে পারেন। আমি হলাম আম্মা আপনার বুড়ো ছেলে।’

সুরুজ মিয়া সঙ্গে সঙ্গে আসছেন। নবনীর ভালো লাগছে না। সে একা একা হাঁটতে চাচ্ছিল। লোকটার মুখের উপর বলতেও পারছে না আপনি চলে যান। সুরুজ মিয়ার বোধহয় যাবার ইচ্ছাও নেই। হেলতে দুলতে আসছে। মনে হয় নবনীর সঙ্গে গল্প করে আরাম পাচ্ছে। নবনী লোকটাকে কী ডাকবে ভেবে পাচ্ছে না। শ্রাবণী কত সহজভাবে চাচা ডাকে। শ্রাবণীর মতো সহজভাবে চাচা ডাকতে পারলে মন্দ হত না।

‘চেয়ারম্যান সাহেব।!’

‘জ্বি আম্মা।’

‘ইংরেজ সাহেবের স্ত্রীর যে একটা কবর আছে সেটা কোথায়?’

‘কার কবর বললেন?’

‘ইংরেজ সাহেবের স্ত্রীর কবর। যে সাহেব এই ডাকবাংলোয় থাকতেন – তাঁর স্ত্রী। মহিলার নাম মারিয়া স্টোন।’

সুরুজ মিয়া বিস্মিত হয়ে বললেন, ‘এই রকম কোনো কবর তো আম্মা এই অঞ্চলে নাই। কবরের কথা আপনেরে কে বলেছে?’

নবনী ছোট্ট নিশ্বাস ফেলল। বোঝাই যাচ্ছে কবরের ব্যাপারটা শ্রাবণীর বানানো। কোনো বইয়ে পড়েছে বোধহয়।

সুরুজ মিয়া বললেন, ‘কবরের বিষয়টা কে বলেছে?’

‘মনে পড়ছে না, কে যেন বলেছে।’

‘আচ্ছা, আমি খোঁজ নিয়া দেখব।’

‘আপনাকে খোঁজ নিতে হবে না। অন্য কোনো ডাকবাংলো সর্ম্পকে শুনেছিলাম। এটার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছি।’

নবনী সড়ক ছেড়ে পায়ে চলা পথ ধরল। সুরুজ মিয়া বিস্মিত হয়ে বললেন, এই দিকে কই যান?’

‘একটা বটগাছ আছে। বটগাছটা দেখতে এসেছি।’

‘বটগাছ দেখার কী আছে, আম্মা?’

‘ঢাকা শহরে তো আর বটগাছ দেখার তেমন সুযোগ নেই। সুযোগ পাওয়া গেছে যখন, দেখে যাই।’

বটগাছের সামনে এসে নবনী থমকে দাঁড়াল। আজো প্রথম দিনের মতো বলতে ইচ্ছা করল, ‘হ্যালো মিস্টার বটগাছ, কেমন আছেন? বলা হল না। সঙ্গে সুরুজ মিয়া আছেন। তাঁর সামনে চুপ করে থাকাই ভালো।’

‘এই বটগাছটার বয়স কত হবে?’

‘বলা মুশকিল, আম্মা। তবে খুব পুরোনো গাছ।’

‘গাছের গুঁড়ি বাঁধানো। কারা বাঁধিয়েছে জানেন?’

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'জ্বি না আম্মা, জানি না। আমরা ছোটবেলা থেকেই দেখতেছি এই রকম।'

নবনী বলল, 'আসুন, ঐ খানে গিয়ে বসি।'

'না যাওয়াই ভালো, আম্মা।'

'না যাওয়াই ভালো কেন?'

'জংলা জায়গা। কেউ আসে না। সাপ–খোপ থাকতে পারে।'

'শীতকালে সাপ থাকবে না। আসুন যাই।'

বটের ঝুরির ফাঁক দিয়ে নবনী চট করে ঢুকে গেল। বাধ্য হয়ে পেছনে পেছনে সুরুজ মিয়া ঢুকলেন। তিনি খুব অস্বস্তি বোধ করছেন। মেয়েটার সঙ্গে এসে দেখি একটা সমস্যায় পড়া গেছে। না এসেও উপায় ছিল না। একটা মেয়েকে এভাবে একা একা ছেড়ে দেয়া যায় না।

নবনী বটগাছের গুঁড়ির কাছে এসে অবাক হয়ে গেল। কী অদ্ভুত কাণ্ড! সে দাঁড়িয়ে আছে মাঝখানে। চারদিক বটের ঝুরি দিয়ে ঘেরা। যেন বৃক্ষের দেয়াল। মনে হচ্ছে সুন্দর একটা দুর্গ। এই দুর্গের ভেতরে কেউ আসতে পারবে না। ভেতরটা খুব পরিষ্কার। একটা শুকনো পাতাও পড়ে নেই। সিমেন্টের বাঁধানো অংশটি বেশ প্রশস্ত। ইচ্ছে করলে যে কেউ শুয়ে থাকতে পারে। কালো সিমেন্ট। দেখলেই হিম হিম ভাব হয়।

নবনী বলল, 'কী অদ্ভুত জায়গা দেখেছেন চেয়ারম্যান চাচা?'

এই প্রথম নবনী চাচা বলল, 'তার খুব খারাপ লাগল না।'

সুরুজ মিয়া বললেন, 'চলেন আম্মা যাই।'

'যাই যাই করছেন কেন? বসুন না।'

'সন্ধ্যা হইতে বেশি বাকি নাই। চলেন যাই। আরেকদিন দিনের বেলায় আসলেই হবে।'

'সন্ধ্যা হোক। দেখি এখান থেকে সন্ধ্যা হওয়া দেখতে কেমন লাগে।'

সুরুজ মিয়া খুবই দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন। এই মেয়ে মনে হচ্ছে সমস্যায় ফেলে দেবে। জংলা জায়গায় সন্ধ্যা পর্যন্ত বসে থাকতে চাইলে তো বিরাট সমস্যা হবে। স্যার শুনলে শুধু যে মেয়ের উপর রাগ করবেন তা না। তার উপরও রাগ করবেন। রাগ করবারই কথা।

'চেয়ারম্যান চাচা!'

'জ্বি আম্মা।'

'একটা কাজ করতে পারবেন ?'

সুরুজ মিয়া শংকিত গলায় বললেন, 'কী কাজ?'

'আমি এখানে অপেক্ষা করি। আপনি শ্রাবণীকে নিয়ে আসেন। ও দেখুক কী সুন্দর জায়গা!'

'আম্মা কী বললেন?'

'আমি বলছি, যদি আপনার কষ্ট না হয় তাহলে শ্রাবণীকে একটু নিয়ে আসুন।'

সুরুজ মিয়া চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়লেন। ভালো যন্ত্রণায় পড়া গেল। মেয়েটার সঙ্গে আসা বিরাট বোকামি হয়েছে। এমন বোকামি তিনি সচরাচর করেন না। পনের বছর ধরে তিনি এই অঞ্চলের চেয়ারম্যান। বোকা লোকের পক্ষে এতদিন চেয়ারম্যান থাকা সম্ভব না। আজ মনে হচ্ছে তিনি নিজেকে যত বুদ্ধিমান মনে করেন আসলে তত বুদ্ধিমান নন।

'আম্মা চলেন, আজ যাই। আরেকদিন দিনের বেলায় ছোট আম্মাকে নিয়ে আসবেন। বটগাছ তো চলে যাবে না আম্মা, এইখানেই থাকবে। গাছের তার জায়গা ছেড়ে যাওয়ার উপায় নেই। তাছাড়া সন্ধ্যাবেলা একা একা থাকা ঠিকও না। দুনিয়া তো ভালো জায়গা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না। দুনিয়া খুবই মন্দ জায়গা। আপনি হইলেন মেয়ে মানুষ। আমাকে দেখেন, পুরুষ মানুষ, বয়শ পঞ্চাশের উপর – বলতে গেলে দিন শেষ। এই আমিই সন্ধ্যার পর একা বার হই না।'

'কেন বার হন না? ভূতের ভয়?'

'মানুষের চেয়ে বড় ভূত আর কিছু নাই। মানুষ হইল সবচে' বড় ভূত। দুইবার আমারে মারার চেষ্টা করেছে। একবার বেড়া ভাইঙ্গা ঘরে ঢুইকা দাও দিয়া কোপ দিল। সেই বছরই পাকা দালান দিলাম। আরেকবার সইন্ধ্যাকালে ...'

নবনী বলল, 'থাক, শুনতে চাচ্ছি না। চলুন ফিরে যাই।'

সুরুজ মিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'চলুন আম্মা।'

সারাপথ নবনী একটি কথাও বলল না। সুরুজ মিয়াও চুপ করে রইলেন।

নবনী গেট দিয়ে ঢুকেই থমকে দাঁড়াল।

ডাকবাংলোর সামনে বেশ ভিড়। দুটা পাজেরো জিপ দাঁড়িয়ে আছে। একটা জিপের পেছনের চাকা পাংচার হয়েছে। চাকা বদল করা হচ্ছে। ডাকবাংলোর সামনে চেয়ার পাতা হয়েছে। চেয়ারেও দুটা দল। একটা দলের সঙ্গে আছেন জামিল সাহেব। অন্য দলটি খানিকটা দূরে। নবনীর মনে হল, বেশ উৎসব উৎসব ভাব। সন্ধ্যাবেলায় এত বড় দল কোত্থেকে এসেছে কে জানে। এরা কি এখানে থাকবে?

নবনী সবাইকে পাশ কাটিয়ে যাওয়াই ঠিক করল। ডাকবাংলোর পেছনের দরজা দিয়ে ঢোকাই ভালো। কেউ দেখবে না। লাভ হল না। সবাই তাকে দেখল। আগ্রহ এবং কৌতূহল নিয়ে তাকাল। জামিল সাহেব বললেন, 'ঐ দেখুন আমার বড় মেয়ে, ওর নাম নবনী।'

নবনী স্লামালিকুম বলবে কি বলবে না কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করল। ঠিক করল, বলবে না। এতদূর থেকে স্লামালিকুম বলা অর্থহীন। চেঁচিয়ে বলতে হবে। এরচে' মাথা নিচু করে হেসে ঘরে ঢুকে পড়াই ভালো।

পেছনের দরজা দিয়ে ঢোকার সময় প্রথমই শ্রাবণীর ঘর পড়ে। ঘরে বাতি জ্বলছে। দরজা খোলা। শ্রাবণী মোড়ায় বসে আছে। টিনের বড় গামলা ভর্তি গরম পানিতে তার বাঁ পা ডুবানো। শ্রাবণীর হাতে বই, তবে গল্পের বই না। পাঠ্যবই। ফিজিক্সের বই।

নবনী বলল, 'তোর কী হয়েছে?'

'পা মচকে ফেলেছি। শাহেদ ভাইয়ের একটা রং সার্ভিস রিটার্ন করতে গিয়ে — পা পিছলে আলুর দম।'

'বেশি ব্যথা পেয়েছিস?'

'সিরিয়াস ব্যথা পেয়েছি। বিকট চিৎকার। মার ধারণা, পা ভেঙে ফেলেছি। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বুক ধড়ফড় শুরু হল। ইন্টারেস্টিং এক সিচুয়েশন। শাহেদ ভাই এমন মন খারাপ করলেন যেন তিনি নিজেই ব্যাডমিন্টন র‍্যাকেট দিয়ে বাড়ি মেরে আমার পা ভেঙেছেন।'

নবনী বলল, তোকে দেখে তো কিছু বোঝা মুশকিল। আসলে পা ভাঙে নি তো?'

'না ভাঙে নি। ফোলা কমে গেছে। ভাঙলে এত তাড়াতাড়ি ফোলা কমত না।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে নবনী বলল, 'আচ্ছা ভালো কথা ইংরেজ মহিলার কবরটা যেন কোথায়?'

শ্রাবণী হাই তুলতে তুলতে বলল, 'কাছেই।'

'নিয়ে যাবি আমাকে?'

'পা ফেলতে পারি না। নিয়ে যাব কীভাবে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'মহিলার কবর যে বুঝলি কী করে?'
'নাম লেখা আছে। মারিয়া স্টোন না কি যেন। নারে শেষে কবিতা আছে।'
'কী কবিতা?'

'The bells will ring
The birds will sing.'

'রিং–এর সঙ্গে সিং–এর সহজ মিল।'
শ্রাবণী বলল, 'স্বামী বেচারা নিজেই বোধহয় লিখেছে, ভালো মিল পায় নি। কবর নিয়ে এত কথা জিজ্ঞেস করছ কেন?
'এমনি।'
নবনী মার খোঁজে গেল। জাহানারা রান্নাঘরে ছিলেন না। বিছানায় শুয়ে ছিলেন। ঘর অন্ধকার। তাঁর মাথার কাছে মিলু বুয়া দাঁড়িয়ে আছে। সন্ধ্যার পর থেকে সে সব সময় মার কাছে থাকবে। নবনী বলল, 'মা তুমি রান্নাঘর থেকে নির্বাসিত। ব্যাপার কি বল তো?'
জাহানারা ক্লান্ত গলায় বললেন, 'মাথাটা হঠাৎ ঘুরে উঠল। প্রেসার বেড়েছে বোধহয়।'
'প্রেসার মেপে দেব?'
'না। তুই আমাকে ঠাণ্ডা এক গ্লাস পানি খাওয়া।'
নবনী ঠাণ্ডা পানি নিয়ে এল। জাহানারা পানি খেয়ে আবার শুয়ে পড়লেন। নবনী বসল মার পাশে। জাহানারা মেয়ের কোলে একটা হাত রাখলেন। নরম গলায় বললেন, 'এতক্ষণ শাহেদ ছিল। তুই আসার একটু আগে গেল। তোর খোঁজেই বোধহয় গিয়েছে।'
'আমাকে কোথায় খুঁজবে?'
'কি না কি এক বটগাছ আছে। তোর সেখানে যাবার কথা। শ্রাবণী ওকে তাই বুঝিয়েছে।'
'মা, শ্রাবণী যে প্রচুর মিথ্যা কথা বলে তুমি জান?'
'এই বয়সে সবাই মিথ্যা বলে।'
'আমি বলতাম?'
'বলেছিস নিশ্চয়ই। এখন মনে নেই।'
'শ্রাবণী বানিয়ে বানিয়ে বলেছে – এখানে কোন জঙ্গলের মধ্যে নাকি এক ইংরেজ মহিলার কবর আছে। মারিয়া স্টোন নাম।'
'আমাকেও বলেছে।'
'ওর হাবভাব আমার ভালো লাগছে না, মা।'
'ওকে নিয়ে চিন্তা করিস না। ও ঠিকই আছে। আয়, আমরা অন্য কিছু নিয়ে কথা বলি।'
'কী নিয়ে কথা বলতে চাও?'
'তোকে নিয়ে বলি। আজ শাহেদ তোর বিয়ের ব্যাপারে কথা বলল।'
'নিজ থেকেই বলল, নাকি তুমি জিজ্ঞেস করলে?'
'নিজ থেকেই বলল, তার মা খুব অসুস্থ। তার মা চাচ্ছেন বিয়েটা তাড়াতাড়ি হোক।'
'সে তো তার মায়ের অসুখের কথা কিছু বলে নি।'
'শাহেদ কখনো তার সমস্যার কথা বলে না। ও অনেকটা আমার মতো।'
নবনী হাসতে হাসতে বলল, 'তোমার কি কোনো সমস্যা আছে, মা?'
'আছে।'
'কী সমস্যা?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'শুনতে চাস?'

'হুঁ চাই। আমার ধারণা, তুমি এই পৃথিবীর একমাত্র সমস্যাবিহীন মহিলা। একটা পরিষ্কার রান্নাঘর। রান্নার জিনিসপত্র এবং ফ্রিজের ঠাণ্ডা পানি। এই কটা জিনিস পেলেই তোমার হয়ে গেল।'

জাহানারা বিছানায় উঠে বসলেন। নবনী লক্ষ করল, তার মা উত্তেজনায় অল্প অল্প কাঁপছেন। নবনী বলল, 'কী ব্যাপার মা?'

'না, কোনো ব্যাপার না। তুই আমার সমস্যার কথা শুনতে চেয়েছিস। সমস্যা শুনে যা।'

'থাক মা, আমি কিছু শুনতে চাচ্ছি না। তুমি এরকম করছ, আমার ভালো লাগছে না। মিলু বুয়া, তুমি মাকে এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানি এনে দাও তো।'

জাহানারা আবার শুয়ে পড়লেন। ক্লান্ত গলায় বললেন, 'তোর এবং শ্রাবণীর বিয়ে হবার জন্যে আমি অপেক্ষা করছি। বিয়ে হয়ে গেলেই আমার দায়িত্ব শেষ – তখন . . .'

'তখন কী?'

জাহানারা বললেন, 'এখন ঘর থেকে যা। কথা বলতে ভালো লাগছে না।'

৬

জামিল সাহেব খুবই উত্তেজিত ভঙ্গিতে বসে আছেন। উত্তেজিত এবং আনন্দিত। সুরুজ মিয়া চেয়ারম্যান একজন হরবোলা খবর দিয়ে এনেছেন। চল্লিশ পঁয়তাল্লিশের মতো বয়স। বড় বড় চোখ। ভয়ংকর রোগা। অতিরিক্ত লম্বার কারণেই বোধহয় খানিকটা কুঁজো। খালি পা। সবুজ একটা লুঙ্গি পরনে। এই শীতেও গায়ে পাতলা একটা ফতুয়া ছাড়া কিছু নেই।

নবনী এসে বসল বাবার পাশের চেয়ারে। শ্রাবণীও এল খোঁড়াতে খোঁড়াতে। শাহেদও আছে। সে একটু দূরে বসেছে। মনে হয় তেমন উৎসাহ বোধ করছে না। দুটি পাজেরো জিপে অতিথি যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের একদল চলে গেছেন। অন্য একটা দল এখনো আছেন। মনে হয় তারা থেকে যাবেন।

শ্রাবণী বলল, 'ব্যাপার কি?'

সুরুজ মিয়া বললেন, 'ব্যাপার নিজের কানে শোনেন আম্মা। এর নাম মোস্তাক হরবোলা। দুনিয়ার যত ডাক আছে মোস্তাক জানে। বাড়ি নবীনগর, খবর দিয়া আনছি।'

মোস্তাক কদমবুসি করতে এগিয়ে এল। নবনী 'কী সর্বনাশ!' বলে লাফিয়ে সরে যেতে গিয়েও যেতে পারল না। মোস্তাক শুধু যে নবনী এবং শ্রাবণীকে সালাম করল তা নয়, উপস্থিত সবাইকে আরেকদফা করল। কেউ তেমন আপত্তি করছে না। সবাই মজা পাচ্ছে।

সুরুজ মিয়া বললেন, 'মোস্তাক, শুরু কর।'

মোস্তাক দুহাত দিয়ে মুখ ঢাকল। হরবোলার ডাক দেবার সময় মুখ দেখানোর নিয়ম নেই। হাত দিয়ে মুখ ঢেকে রাখতে হয়। মোস্তাক যন্ত্রের মতো গলায় বলল,

উপস্থিত হাজেরাইন। আমার নাম হরবোলা মোস্তাক। বাড়ি নবীনগর।

পিতার নাম ইসহাক আলি। মা আমেনা বেগম। এক্ষণ শুনবেন পাখির ডাক। পাখির মধ্যে সেরা পাখি হইল কাউয়া। ভদ্র সমাজ যারে বলেন কাক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কা–কা–কা।

মোস্তাক কাক ডাকতে লাগল। নবীন এবং শ্রাবণী স্তম্ভিত। এ তো সত্যি কাকের ডাক। মানুষের ডাক এ হতেই পারে না। কোনো মানুষের পক্ষে কাকের এমন ডাক অনুকরণ সম্ভব নয়।

'ভদ্র সমাজ, কাকের বন্ধু হইল গিয়া আফনের কোকিল পক্ষী। দেখতে কাকের মতো। চেহারা আসল না, ভদ্রসমাজ – আসল হইল গুণ। এইবার শোনেন কোকিল পক্ষীর ডাক।'

মোস্তাক কোকিল ডাক ডাকতে শুরু করল। শ্রাবণী মুগ্ধ গলায় বলল, 'আশ্চর্য! খুবই আশ্চর্য হবার মতো ব্যাপার!'

'ভদ্র সমাজ, উপস্থিত হাজেরাইন। কোকিল পক্ষীর ডাক এক মতোন না।

একেক সময়ে একেক মতো। শীতকালে এক ডাক ডাকে, গরম কালে পৃথক এক ডাক ডাকে।'

হরবোলা মোস্তাক বিভিন্ন ঋতুতে কোকিলের ডাক ডাকল। শ্রাবণী আবার বলল, 'আশ্চর্য! খুবই আশ্চর্য হবার মতো ব্যাপার।'

পাখির পর হল পশুর ডাক – গুরু, ছাগল, শেয়াল।

তারপর হল পতঙ্গের ডাক – ঝিঁঝি পোকা, মৌমাছি, মশা, বোলতা।

জামিল সাহেব বললেন, 'তুমি বাঘের ডাক পার না?'

'জ্বি না স্যার। বাঘের ডাক কোনোদিন শুনি নাই। শুনলে পারব।'

সুরুজ মিয়া বললেন, 'একবার শুনলেই পারবে। বড়ই ওস্তাদ। এ স্যার মানুষের ডাকও পারে।'

নবনী বলল, 'মানুষের ডাক আবার কী?'

মোস্তাক আলি বলল, 'আছে, মানুষের ডাকও আছে।'

শ্রাবণী বলল, 'দেখি শোনান তো। আমি মানুষের ডাক শুনতে চাই।'

'শুনলে আফনে রাগ হইবেন।'

শ্রাবণী বিস্মিত হয়ে বলল, 'কী অদ্ভুত কথা, শুনলে রাগ হব কেন?'

মোস্তাক সঙ্গে সঙ্গে অবিকল শ্রাবণীর মতো গলায় বলল, 'কী অদ্ভুত কথা, শুনলে রাগ হব কেন?'

সবাই বিস্ময়ে দীর্ঘ সময় চুপ করে রইল। সবার আগে কথা বললেন জামিল সাহেব। তিনি হতচকিত গলায় বললেন, 'মানুষের ভয়েসের এমন রিপ্রডাকশান যে হতে পারে, আমার ধারণার বাইরে ছিল। অবিশ্বাস্য' uncanny.

তিনি মানিব্যাগ বের করে দুটা নতুন একশ টাকার নোট এগিয়ে দিলেন। মোস্তাক আবার কদমবুসি করে টাকা নিল। কদমবুসি একজনকে করল না, সবাইকে করল।

সুরুজ মিয়া তৃপ্ত গলায় বললেন, 'এর চেহারা ভালো মানুষের মতো, কিন্তু আসলে বিরাট বদ। কেউ মারা গেলে সে করে কি– রাত–দুপুরে ঐ বাড়িতে উপস্থিত হয়। মরা মানুষের গলায় ঐ বাড়ির লোকজনের নাম ধরে ডাকে। বাড়ির ভেতরে তখন ভয়ে কান্নাকাটি শুরু হয়ে যায়। কত মার খেয়েছে বলার নাই। একবার তো মারতে মারতে হাত ভেঙে দিল।'

মোস্তাক আলি মনে হচ্ছে তার মার খাওয়ার কথা শুনে খুব মজা পাচ্ছে। খিকখিক করে হাসছে।'

শ্রাবণী বলল, 'বাবা, আমি উনার পারফরমেন্সে মুগ্ধ হয়েছি। আমি কি আমার নিজের পক্ষ থেকে উনাকে কিছু গিফট দিতে পারি?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'অবশ্যই পার।'

শ্রাবণী গিফট আনার জন্যে উঠে গেল। নবনী লক্ষ করল, শ্রাবণী এখন আর খুঁড়িয়ে হাঁটছে না। ঠিকমতোই হাঁটছে। মনে হয় পায়ের ব্যথা সেরে গেছে। শ্রাবণী সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে এল। তার হাতে দুটা পাঁচশ টাকার নোট। সে মোস্তাক আলির দিকে নোট দুটি এগিয়ে দিয়ে বলল, 'আমার এই উপহার গ্রহণ করলে আমি খুব খুশি হব।'

মোস্তাক চোখ বড় বড় করে সবার দিকে তাকাচ্ছে। হাত বাড়াচ্ছে না। সে পুরোপুরি হকচকিয়ে গেছে। জামিল সাহেব বললেন, 'ও দিচ্ছে, তুমি নিচ্ছ না কেন?' নাও।'

মোস্তাক টাকা নিয়ে তৎক্ষণাৎ শিশুদের মতো শব্দ করে কাঁদতে শুরু করল। সে তার দীর্ঘ জীবনে এক সঙ্গে কখনো এত টাকা পায় নি। শ্রাবণী দাঁড়াল না, নিজের ঘরে চলে গেল।

সুরুজ মিয়া বিব্রত গলায় বললেন, 'কাঁদছিস কেন রে গাধা? কান্না বন্ধ কর্।' মোস্তাক আলি আরো শব্দ করে কাঁদতে লাগল। সুরুজ মিয়া মোস্তাকের হাত ধরে তাকে বাইরে নিয়ে এলেন।

শ্রাবণীর ঘরের দরজা বন্ধ।

জামিল সাহেব দরজায় টোকা দিয়ে বললেন, 'আসব মা?'

শ্রাবণী বলল, 'এস বাবা।'

জামিল সাহেব ঘরে ঢুকলেন। মেয়ের বিছানায় পা তুলে বসলেন। তাঁর হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। তিনি বললেন, 'তোর ঘরে সিগারেট খাবার অনুমতি আছে তো?'

'অনুমতি নেই, তবে তুমি খেতে পার।'

'জানালাটা ভালো করে খুলে দে, ধোঁয়া চলে যাবে।'

শ্রাবণী জানালা খুলে দিল। জামিল সাহেব বললেন, 'তোর সুন্দরবনের বাঘের খবর চলে এসেছে। লাস্ট সেনসাস রিপোর্ট। বাঘ-বাঘিনীর সংখ্যা সবই আছে। এই সঙ্গে স্পটেড ডিয়ারের সংখ্যাও আছে। এই যে কাগজটায় লেখা।'

'থ্যাংকস বাবা। মেনি থ্যাংকস।'

জামিল সাহেব সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে বললেন, 'নবনীকে দেখছি না। নবনী কোথায়?'

'শাহেদ ভাইয়ের সঙ্গে নদীর দিকে হাঁটতে গেছে।'

'ও দেখি সারাদিন হাঁটাহাঁটির মধ্যেই আছে। তোর হাঁটতে ভালো লাগে না?'

'না।'

'তোর পায়ের অবস্থা কি? ব্যথা সেরেছে?'

'হুঁ।'

জামিল সাহেব চুপচাপ সিগারেট টানতে লাগলেন। শ্রাবণী বলল, 'বাবা, আমার মনে হয় তুমি আমাকে কিছু বলতে এসেছ। এখন বুঝতে পারছ না বলা ঠিক হবে কিনা। দ্বিধার মধ্যে পড়েছ। বলে ফেল।'

জামিল সাহেব বললেন, 'একটু আগে তুই যে কাণ্ডটা করেছিস তা আমার পছন্দ হয় নি। সেই কথাই বলতে এসেছি।'

'কোন কাণ্ডের কথা বলছ? হরবোলাকে যে এক হাজার টাকা দিয়েছি, সেটা?'

'হ্যাঁ। এক হাজার কেন, ইচ্ছে হলে তুই পাঁচ হাজার টাকা দিবি – সেটা কোনো কথা না। কিন্তু যেখানে আমি দুশ টাকা দিয়েছি সেখানে তুই আমাকে ডিঙিয়ে এক হাজার টাকা দিলি। তুই আমাকে ছোট করলি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বাবা, আমি ওর কাণ্ডকারখানা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। আমি ভেবেছিলাম, আমরা যেমন মুগ্ধ হয়েছি, তুমিও লোকটাকে ঠিক সে রকম মুগ্ধ করবে। কিন্তু তুমি তাকে মাত্র দুশ টাকা দিলে। আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল।'

'এই দরিদ্র দেশে দুশ টাকা মাত্র না মা। তোর কাছে মাত্র মনে হয়েছে। ওর কাছে এই ছিল অপ্রত্যাশিত। ও প্রচণ্ড রকম খুশি হয়েছিল।'

'হ্যাঁ, খুশি অবশ্যি হয়েছিল। কিন্তু তুমি তার খুশি হবার ক্ষমতা অতিক্রম করতে পার নি। আমি করেছি। এক হাজার টাকা পেয়ে কি রকম ভেউ ভেউ করে কাঁদছিল। ওর কান্না দেখে আমার নিজের চোখে পানি এসে গেল। যে কাজটা আমি করলাম সে কাজটা তুমি কেন করতে পারলে না? তোমার তো টাকার অভাব নেই।'

'টাকা থাকলেই সব সময় এমন দেয়া যায় না। পাবলিক ফিগারদের দিকে সবার চোখ থাকে। সবাই বলবে, জামিল সাহেব দুহাতে টাকা ছড়ায়। কোথায় পায় এত টাকা?'

'কে কি ভাববে না ভাববে তাই মেনে আমাদের চলতে হবে?'

'তোমাকে না চললেও চলবে। কিন্তু আমাকে চলতে হবে।'

শ্রাবণী নিচু গলায় বলল, 'বাবা, আমি তোমাকে হার্ট করে থাকলে ক্ষমা চাচ্ছি। আমি কাউকেই হার্ট করতে চাই না। কিন্তু আমার ভাগ্য এত খারাপ যে সবাইকেই হার্ট করি।

জামিল সাহেব উঠতে উঠতে বললেন, 'আচ্ছা ঠিক আছে। এটা এমন কিছু না। Let us forget it.'

শ্রাবণী কাঁদছে। বাবা কঠিন কিছু বললেই তার চোখে পানি আসে।

AMARBOI.COM

৭

একটু আগে চাঁদ উঠেছে। আলো এখনো স্পষ্ট হয় নি। স্বপ্ন স্বপ্ন আলো। নবনী এবং শাহেদ হাঁটছে। নবনী তার অভ্যাসমতো মাটির দিকে তাকিয়ে হাঁটছে। পায়ের নিচে চকচকে সাদা বালি। নবনীর মনে হচ্ছে চিনির দানার উপর দিয়ে হাঁটছে। খানিকটা বালি এনে জিভে ছোঁয়ালে মিষ্টি লাগবে। নবনী নিচু হয়ে কিছু বালি হাতে নিল। শাহেদ বলল, 'কী করছ?'

'কিছু করছি না। বালি নিয়ে খেলছি। তুমি হাতে নিয়ে দেখ কী ঝকঝকে বালি! হাত পাত, তোমার হাতে কিছু বালি দিয়ে দি।'

শাহেদ বলল, 'শ্রাবণীর মধ্যে তো আছেই, তোমার মধ্যেও অনেক ছেলেমানুষি আছে।'

নবনী বলল, 'আমাদের সবার মধ্যেই আছে। তোমারও আছে।'

'থাকলেও চাপা পড়ে আছে। পাথর চাপা।'

'পাথরটা সরিয়ে ফেল। তারপর আমার সঙ্গে কিছু ছেলেমানুষি কর।'

শাহেদ হাসতে হাসতে বলল, 'কী করতে বলছ?'

'তোমার যা করতে ইচ্ছা হয় কর। জুতা খুলে ফেলে চল আমরা ঐ চরে চলে যাই। মাঝখানে পানি খুব অল্প। হাঁটু–পানিও না।'

'চল যাই।'

তারা চরে গিয়ে উঠল। চরের বালি আরো পরিষ্কার। ঝকঝক করছে। নবনী বলল, 'তোমার কাছে কি মনে হচ্ছে না সাদা চাদর বিছানো?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমার কাছে বালি বিছানো বলেই মনে হচ্ছে। ছেলেরা বাই নেচার প্রাকটিক্যাল ধরনের হয়। কল্পনাবিলাস ছেলেদের এমনিতে কম। আমার আরো কম। আমি হলাম ব্যবসায়ী মানুষ।'

'ব্যবসায়ী মানুষের কল্পনাশক্তি থাকে না?'

'খুব কম থাকে। তুমি একজন কবি-সাহিত্যিকের নাম বলতে পারবে না যে ব্যবসায়ী। চরের বালি দেখে আমার জানতে ইচ্ছে হচ্ছে বাণিজ্যিকভাবে এই বালি নিয়ে বিক্রি করা যায় কিনা।'

'কেন বাজে রসিকতা করছ? এস বসি।'

'তোমার সুন্দর শাড়ি নষ্ট হয়ে যাবে না?'

'হোক নষ্ট।'

তারা পাশাপাশি বসল। নবনী হালকা গলায় বলল, 'তুমি হঠাৎ চলে আসায় আমি যে কী পরিমাণ খুশি হয়েছি তা কোনোদিন তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারব না। আমার ছুটিটাই অন্য রকম হয়ে গেছে।'

'তোমার ভাবভঙ্গি দেখে আমি অবশ্যি কিছু বুঝতে পারি নি। শ্রাবণী বরং অনেক হৈচৈ করেছে।'

'আমি শ্রাবণীর মতো না। আনন্দিত হলেও চুপ করে থাকি। কষ্ট পেলেও চুপ করে থাকি।'

'গাছের মতো?'

'হ্যাঁ, গাছের মতো। নিজের আনন্দ বা দুঃখের কোনো কথাই কাউকে জানাতে ইচ্ছা করে না।'

শাহেদ সিগারেটের প্যাকেট বের করতে করতে বলল, 'একজন কেউ বোধহয় থাকা দরকার যাকে সব কথা বলা যায়।'

'হয়তো দরকার। আমি ঠিক করেছি কি জান? আমি সারা জীবনে শুধু এক জন মানুষ রাখব যাকে সবকিছু বলব। কখনো দ্বিতীয় কেউ থাকবে না।'

'সেই ভাগ্যবান এক জনটি কি আমি?'

নবনী ছোট করে নিশ্বাস ফেলে বলল, 'এখনো ঠিক জানি না।'

'এখনো জানি না মানে!'

'সত্যি জানি না।'

'যে ছেলেটিকে তুমি দুদিন পর বিয়ে করতে যাচ্ছ তাকে তুমি সব কথা বলতে পারবে না?'

'হয়তো পারব। কিন্তু আমি এখনো জানি না। স্বামী হলেই তাকে সব কথা বলা যায় তা তো না। বেশিরভাগ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কিন্তু অনেক দূরত্ব থাকে। আমার বাবা-মাকে দিয়েই দেখি - তাঁরা দীর্ঘদিন পাশাপাশি বাস করছেন। রাতের পর রাত একই খাটে ঘুমাচ্ছেন। বাবার অসুখ হলে মা রাত জেগে সেবা করছেন। কিন্তু কী ভয়ঙ্কর দূরত্ব তাঁদের মধ্যে! আমার ধারণা, মা সারা জীবন এমন কাউকে পান নি যাকে সব কথা বলতে পারেন, আবার বাবাও হয়তো কাউকে পান নি যাকে সব বলতে পারেন।'

'তাঁদের হয়তো দরকার নেই।'

'হ্যাঁ, তাও হতে পারে। তাদের হয়তো প্রয়োজন নেই কিন্তু আমার আছে। আমি একজন কাউকে আমার সব কথা বলতে চাই।'

শাহেদ সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বলল, 'আমাকে বিবেচনার মধ্যে রাখতে পার। তোমার সব গোপন কথা শুনতে হলে কী সব গুণাগুণ থাকতে হবে তা অবশ্যি জানি না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তুমি আমার কথাগুলি খুব হালকাভাবে নিচ্ছ।'

'হালকাভাবে নিচ্ছি না নবনী। আমি খুব সিরিয়াসলি নিচ্ছি। তোমাকে আমি ঠিক বুঝতে পারি না।'

'বুঝতে না পারার মতো কী করলাম?'

'অনেক কিছুই তুমি কর। তুমি আমাকে কনফিউজ করতে চাও।'

'একটা উদাহরণ দাও।'

'থাক, উদাহরণ দিতে চাচ্ছি না।'

নবনী বলল, 'তোমার কিছু মনে পড়ছে না বলে উদাহরণ দিতে পারছ না। মনে পড়লে নিশ্চয়ই দিতে।'

শাহেদ বলল, 'মনে পড়লেও দিতাম না। উদাহরণ দেয়া মানে ঝগড়া করা। এখানে আমি ঝগড়া করতে চাই না। আমি অন্য কিছু চাই।'

নবনী ক্ষীণ গলায় বলল, 'কী চাও?'

'তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই তুমি বলেছিলে, আমি যা চাব তাই পাব।'

নবনী বলল, 'চল উঠা যাক। আমাদের নিতে আসছে।'

'কে নিতে আসছে?'

'রহমত ভাই আসছে— ঐ দেখ।'

নবনী উঠে দাঁড়াল। রহমত লম্বা লম্বা পা ফেলে এদিকেই আসছে। শাহেদ বলল, 'ওকে চলে যেতে বল। আমার বসে থাকতে ভালো লাগছে। বসি আরো কিছুক্ষণ।'

নবনী বলল, 'আমার বসে থাকতে ভালো লাগছে না। শীত লাগছে।'

শাহেদ বলল, 'মনে হচ্ছে হঠাৎ তুমি আমার উপর রেগে গেছ। তোমাকে রাগানোর মতো কিছু কি করেছি?'

নবনী জবাব দিল না। ডাকবাংলোর দিকে হাঁটতে শুরু করল। পেছনে পেছনে শাহেদ আসছে। চাঁদের আলো এখন আরো পরিষ্কার হয়েছে। অস্পষ্ট ছায়া ছায়া ভাব দূর হয়েছে।

ঘরে ঢুকে নবনী দেখল জাহানারা শোবার ঘর অন্ধকার করে শুয়ে আছেন। তাঁর মাথার চুলে বিলি করে দিচ্ছে মিলু বুয়া। নবনী বলল, 'কী হয়েছে?' জাহানারা বললেন, 'মাথা কেমন জানি করছে। তোরা খেয়ে নে। আমি উঠতে পারব না।'

'বেশি খারাপ লাগছে, মা?'

জাহানারা জবাব দিলেন না। নবনী বলল, 'ডাক্তারকে খবর দিতে বলব?'

জাহানারা বিরক্ত গলায় বললেন, 'কাউকে খবর দিতে হবে না। তুই যা।'

নবনী বের হয়ে এল। জাহানারা মিলুকে দরজা বন্ধ করে দিতে বললেন। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ হয়ে গেল।

রাতে শ্রাবণীও কিছু খেল না। তার নাকি গলা ব্যথা করছে। খাবার টেবিলে জামিল সাহেবও গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন। নবনী বলল, 'তোমারও কি শরীর খারাপ লাগছে বাবা?'

'না, আমার শরীর ঠিকই আছে। তোর মাকে নিয়ে সমস্যা। রাতে ঘুমায় না। জেগে বসে থাকে। কাল রাত তিনটার সময়ে উঠে দেখি সে ডাইনিং হলে বসে আছে। উলের কি যেন বানাচ্ছে। আমি বললাম, কী বানাচ্ছ? সে বলল, কিছু না।'

নবনী বলল, 'নতুন জায়গায় মার ঘুম আসে না।'

জামিল সাহেব তিক্ত গলায় বললেন, 'নতুন জায়গা পুরাতন জায়গা কিছু না – কোনো জায়গাতেই তার ঘুম আসে না। বাড়িতেও তো ঘুমায় না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শাহেদ বলল, 'ভালো কোনো ডাক্তার-টাক্তার দেখানো দরকার মনে হয়।'

জামিল সাহেব বললেন, 'ভালো ডাক্তারের তো অভাব নেই। প্রচুর আছে। দেশে আছে। বিদেশে আছে। দেখাতে না চাইলে কীভাবে কী করব! ছুটি কাটাতে এসে যদি এমন অসুখ-বিসুখের যন্ত্রণায় পড়ি তাহলে ভালো লাগে? রান্না ছাড়াও তো এই পৃথিবীতে আরো কাজকর্ম আছে!'

নবনী বলল, 'বাবা, তুমি বেশি রেগে যাচ্ছ।'

'আমি খুব কম রেগেছি, মা, খুবই কম। আমি সবাইকে সবার মতো থাকতে দেই। কারোর ছুটি নষ্ট করতে চাই না। আমার থিওরি হল – বেড়াতে এসেছি। বেড়াতে এসে যে যেভাবে আনন্দ পেতে চায় – পাক। তোর মা রান্নাঘরে দরজা বন্ধ করে বসে থাকতে চাচ্ছে – থাক। শ্রাবণী একবার রাত তিনটার সময় একা একা নদীর পাড়ে গেল। আমি রাগ করেছি, কিন্তু কিছুই বলি নি। এখন শুনলাম সে একটা মই জোগাড় করেছে – ছাদে উঠবে। ছাদ এমন কী জিনিস যে মই এনে উঠতে হবে?'

নবনী হেসে ফেলল। মেয়ের হাসিমুখ দেখে জামিল সাহেবও কিছুক্ষণের মধ্যে হেসে ফেললেন। শাহেদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'পারিবারিক অনেক সমস্যা তোমার সামনেই আলাপ করলাম। তোমাকে পরিবারের এক জন ধরি বলেই তা করেছি। আমি আমার সমস্যা বলে বেড়াই না। ইচ্ছাও করে না। সময়ও নেই।'

শাহেদ প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্য বলল, 'এত জায়গা থাকতে আপনি এখানে ছুটি কাটাতে কেন এসেছেন, চাচা?'

'যুবক বয়সে একবার এখানে এসেছিলাম। পাখি শিকারের জন্যে এসেছিলাম। এই ডাকবাংলোয় ছিলাম। এখান থেকে দশ মাইল দূরে 'মাহিন্দার জলা' নামে একটা বিলের মতো আছে। সেখানে পাখি শিকারের জন্যে গিয়েছিলাম। অদ্ভুত দৃশ্য! আবারো সেই দৃশ্য দেখার জন্যেই এসেছি। দৃশ্য কি দেখব – যন্ত্রণায়-যন্ত্রণায় অস্থির!'

'এবারো কি পাখি শিকারে যাবেন?'

'পাগল হয়েছ। মন্ত্রী হয়ে পাখি শিকারে গেলে উপায় আছে? সব পত্রিকায় ফ্রন্ট পেজে ছবি চলে যাবে। তবে তোমরা যাও, দেখে আস। পাখি শিকারের দরকার নেই। ব্যাপার কি দেখে আস। থানার একটা স্পিডবোট আছে। নষ্ট ছিল। ঠিক করেছে। কাল ভোরে তোমাদের নিয়ে যাবে।'

'আপনি যাবেন না?'

'না, আমি যাব না। আমি সঙ্গে থাকলে তোমরা মন খুলে হৈচৈও করতে পারবে না। তাছাড়া এদিকে আমার কিছু কাজও আছে।'

শাহেদ বলল, 'বেড়াতে এসেছেন, এখন আবার কাজ কি? আপনিও চলুন। সবাই মিলে হৈচৈ করে আসি।'

জামিল সাহেবের খাওয়া হয়ে গেছে। তিনি হাত ধুতে ধতে বললেন, 'আমি যেতাম। পাখি দেখার জন্যেই এসেছি। কিন্তু এখন যদি যাই – আমাকে একা যেতে হবে। নবনীর মাকে সঙ্গে নেয়া যাবে না। এই ভাবে যাওয়া যায় না।'

শাহেদ বলল, 'আমরা উনাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজি করব।'

'পারবে না। পৃথিবীর সব কাজ পারবে। এই কাজটা পারবে না। আমার অ্যাডভাইস হচ্ছে – চেষ্টা করতেও যেও না। তার মেজাজ এখন আকাশে উঠে আছে। চেষ্টা করতে যাবে, সে একটা বিশ্রী কাণ্ড করবে। আমি চাই না এখন একটা বিশ্রী কাণ্ড হোক। নবনী!'

'জ্বি বাবা।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তোর মাকে কিছু খাওয়াতে পারিস কিনা দেখ। সে দুপুরেও কিছু খায় নি।'

জাহানারার ঘরের দরজা বন্ধ। তিনি দরজা খুললেন না। ভেতর থেকে মিলু বলল, 'আফা, আপনেরে চইল্যা যাইতে বলছে।' নবনী বলল, 'ঠাণ্ডা পানি এনেছি মা। দরজা খোল। পানিটা রেখে যাই।' জাহানারা কঠিন গলায় বললেন, 'পানি লাগবে না। তুই ঘুমাতে যা।'

নবনী ঘুমাতে এল অনেক রাতে। বারটা পার করে। শ্রাবণী জেগে আছে। গভীর মনোযোগে বই পড়ছে। গল্পের বই না, পাঠ্যবই। সব গল্পের বই সুটকেসে ঢুকিয়ে তালা দিয়ে দেয়া হয়েছে। এখন শুরু হয়েছে পাঠ্যবইয়ের পালা। নবনী বলল, 'এখনো জেগে আছিস! তোর না গলাব্যথা?'

শ্রাবণী বলল, 'শুধু গলাব্যথা না আপা। জ্বর এসেছে। কপালে হাত দিয়ে দেখ।'

নবনী কপালে হাত দিল। আসলেই জ্বর। বেশ জ্বর। নবনী বলল, 'তুই এই জ্বর নিয়ে দিব্যি পড়াশোনা করে যাচ্ছিস?'

'হুঁ। আমি কোনো কিছুকেই পাত্তা দেই না। তাছাড়া আমার হচ্ছে ভালুক জ্বর। এই আছে এই নেই। তোমার সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্প করে যখন বিছানায় শুতে যাব তখন দেখবে জ্বর নেই।'

'তুই কি কিছু খাবি? খিদে লেগেছে?'

'না। তেঁতুলের আচার খেতে ইচ্ছে হচ্ছে। সেটা তো এখানে পাওয়া যাবে না। কাল চেয়ারম্যান চাচাকে বলব।'

নবনী খাটে বসতে বসতে বলল, 'তুই খুব সুখে আছিস।'

শ্রাবণী বলল, 'হ্যাঁ সুখে আছি। আমাকে কেউ অসুখী করতে পারবে না। আমাকে অসুখী করা খুব কঠিন। তুমি আমার মতো না। তোমাকে এক সেকেন্ডে অসুখী করা যায়।'

'চুপ কর তো। আয়, ঘুমাতে আয়।'

শ্রাবণী বাতি নিভিয়ে ঘুমাতে গেল। বোনকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'আজ আমরা খানিকক্ষণ গল্প করব। কেমন আপা?'

'আচ্ছা। গল্প কর, আমি শুনি।'

'শাহেদ ভাই আসায় ভালোই হয়েছে। তোমার সঙ্গে আমি খানিকক্ষণ গল্প করার সুযোগ পাচ্ছি।'

'এমনিতে বুঝি আমার সঙ্গে গল্প করার সুযোগ পাস না?'

'উঁহু, পাই না। রাতে পাশাপাশি শুয়ে গল্প করার অন্যরকম আনন্দ। আচ্ছা আপা, আজ নাকি তুমি ঐ মাস্টার সাহেবের খোঁজে গিয়েছিলে?'

'কে বলল?'

'আমি অনুমান করছি। চেয়ারম্যান চাচা বললেন, তুমি বটগাছের কাছে গিয়েছিলে। সেখান থেকে ধারণা করলাম, তুমি নিশ্চয়ই ইংরেজির অধ্যাপকের সন্ধানে গিয়েছ।'

'আমি গাছটাই দেখতে গিয়েছিলাম – কারো সন্ধানে যাই নি।'

'রেগে যাচ্ছ কেন, আপা? সাধারণ কথা বলছি – তুমি রেগে যাচ্ছ। ঐ ভদ্রলোক সম্পর্কে তোমার এক ধরনের কৌতূহল আছে বলেই আবারো তুমি বটগাছটার কাছে গিয়েছ। তুমি মনে মনে আশা করছিলে যে বটগাছের কাছে ঐ ভদ্রলোকের দেখা পেয়ে যাবে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমি এমন কিছুই ভাবি নি। তুই কি মনের ডাক্তার হয়ে গেছিস?'

শ্রাবণী হালকা গলায় বলল, 'আমাদের সমস্যা কি জান আপা? আমরা বেশিরভাগ সময়ই জানি না আমরা কী চাই। যেটা চাই বলে মনে হয় – আসলে সেটা চাই না। তুমি তীব্রভাবে শাহেদ ভাইয়ের সঙ্গ কামনা করছ। এটা এক ধরনের ভ্রান্তিও হতে পারে। হয়তো তুমি অন্য কিছু চাচ্ছ – বুঝতে পারছ না।'

নবনী বিরক্ত হয়ে বলল, 'এইসব কথা তুই কোন উপন্যাস থেকে বলছিস?'

শ্রাবণী খিলখিল করে হেসে ফেলল। নবনী বলল, 'হাসি বন্ধ কর। রাগে গা জ্বলে যাচ্ছে।'

শ্রাবণী আরো শব্দ করে হেসে উঠল। অনেক কষ্টে হাসি থামিয়ে বলল, 'তোমার রাগ আমি আরো.বাড়িয়ে দিচ্ছি। এই যে শাহেদ ভাইয়ের কথাই ধর। শিক্ষিত, বুদ্ধিমান, কৃতী এবং সুপুরুষ একজন মানুষ। নিজের উপর তাঁর প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস। তাঁর ধারণা, নিজেকে তিনি ভালো করেই জানেন। আসলে কিন্তু জানেন না।'

'তার মানে কি?'

'আমার ধারণা – তোমার চেয়ে আমি – আমি শ্রাবণী চৌধুরী তাঁর কাছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। চট করে রেগে যেও না আপা – প্রমাণ দিচ্ছি। আমি এই শীতের মধ্যে তাকে কুয়োর পানিতে গোসল করতে বললাম, তিনি যথারীতি গোসল করে ঠাণ্ডা বাধালেন। আমি বললাম, শাহেদ ভাই কুয়োতলায় চা খেতে খুব ভালো লাগে। উনি রেগুলার সেখানে চা খাওয়া শুরু করলেন। বিকেলে আমরা ব্যাডমিন্টন খেলছিলাম। তুমি চুপচাপ একা বসে ছিলে। তিনি তোমাকে ফেলে আমার সঙ্গে ব্যাডমিন্টন খেলতেই আনন্দ পাচ্ছিলেন। খেলাটা তাঁর কাছে জরুরি ছিল না। আমার সঙ্গটা অনেক জরুরি ছিল। এই যে তিনি সব কাজকর্ম ফেলে এখানে ছুটে এলেন তার পেছনে তোমার যতটা ভূমিকা, আমার ধারণা – আমার নিজের ভূমিকা অনেক বেশি।'

নবনী বলল, 'তোর জ্বর অনেক বেড়েছে। তুই অসুস্থ মেয়ের মতো কথা বলছিস। এসব সুস্থ কোনো মেয়ের কথা না। এসব হল বিকারগ্রস্ত মেয়ের কথা। সমস্যা শাহেদের না, সমস্যা তোর।'

শ্রাবণী হাই তুলতে তুলতে বলল, 'আমার কোনোই সমস্যা নেই, আপা। আমার সমস্যা থাকলে এত সহজে এইসব কথা তোমাকে বলতে পারতাম না। সমস্যা কোথায় আমি তোমাকে ধরিয়ে দিলাম। আমি যা বলছি তা যে জ্বরের ঘোরে অসুস্থ হয়ে বলছি তাও কিন্তু না। আমি যা বলেছি তা প্রমাণ করে দিতে পারব।'

'কীভাবে?'

কাল আমাদের তিনজনের পাখি শিকারে যাবার কথা। শেষ মুহূর্তে আমি বলব, 'যাব না। তখন দেখবে শাহেদ ভাই বলবেন, থাক, বাদ দাও। যাওয়া বাতিল হয়ে যাবে।'

নবনী ক্ষীণ স্বরে বলল, 'তুই এমন সব অদ্ভুত কথা বলছিস কেন রে শ্রাবণী? তোর কী হয়েছে?'

'আমার কিছুই হয় নি, আপা। যা সত্যি আমি তাই বলছি।'

'যা সত্যি তা তুই বলছিস না। দিনরাত গল্পের বই পড়ে পড়ে তোর মাথা অন্য রকম হয়ে গেছে। তুই বানিয়ে বানিয়ে প্রচুর মিথ্যা কথা বলছিস। এখানে কোনো ইংরেজ মহিলার কবর নেই। তুই আমাকে বললি, কবর আছে – আমি খোঁজ নিলাম ...'

নবনী থেমে গেল। আর কথা বলা অর্থহীন। শ্রাবণী ঘুমিয়ে পড়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৮

নবনী খুব ভোরে ঘর থেকে বের হল। শ্রাবণী তখনো ঘুমাচ্ছে। কোলবালিশ জড়িয়ে এলোমেলো হয়ে শুয়ে আছে। তার শোয়া দেখে মনে হবে বাচ্চা একটা মেয়ে। প্রচণ্ড শীতেও গায়ে কখনো লেপ থাকে না। ভোরবেলার দিকে খুব শীত পড়ে। আজো পড়েছে। শ্রাবণীর গায়ে লেপ নেই। কোলবালিশ জড়িয়ে সে শীতে কাঁপছে। ঘর থেকে বের হবার সময় নবনী ছোট বোনের গায়ে লেপ তুলে দিল। কেমন বাচ্চাদের মতো ঘুমিয়ে থাকে। বড় মায়া লাগে!

নবনীর নিজেরও শীত লাগছে। শাড়িটা ভালোমতো গায়ে জড়িয়ে সে ডাকবাংলোর মূল বারান্দায় চলে এল। শাহেদ বারান্দায় বসে আছে। এত ভোরে সে কখনো ওঠে না। শাহেদ নবনীকে দেখে খুশি খুশি গলায় বলল, 'গুড মর্নিং প্রিন্সেস'। নবনী বলল, 'গুড মর্নিং।'

শাহেদ বলল, 'আজ কেন জানি ভোর পাঁচটার সময় ঘুম ভেঙে গেছে। তারপর হাজার চেষ্টা করেও ঘুম আসে না। শেষমেষ বারান্দায় এসে বসে আছি। কী প্রচণ্ড কুয়াশা হয়েছে দেখছ?'

'হ্যাঁ, খুব কুয়াশা।'

'আজ তো আবার স্পিডবোটে করে বেড়াতে যাবার কথা। কুয়াশা না কাটলে যাব কীভাবে? রওনা হতে অনেক দেরি হবে।'

নবনী কিছু বলল না। শাহেদ বলল, 'তোমার ঘুম ভেঙেছে, ভালো হয়েছে। চল কুয়াশার মধ্যে হেঁটে আসি। মর্নিং ওয়াক। তার আগে আমাকে চা খেতে হবে। নবনী, চা বানাতে পারবে?'

'পারব না কেন?'

'তাহলে দয়া করে চা বানিয়ে নিয়ে এস। আমি কুয়োতলায় যাচ্ছি। কুয়োতলা বেশ একটা ইন্টারেস্টিং জায়গা। শ্রাবণীর কথা প্রথম বিশ্বাস করি নি। এখন দেখি কুয়োতলায় বসে চা খেতে অন্যরকম লাগে।'

'তুমি যাও কুয়োতলায়, আমি চা নিয়ে আসছি।'

নবনী রান্নাঘরে ঢুকে দেখে জাহানারা ইতিমধ্যেই চুলায় কেতলি বসিয়ে ময়দা মাখছেন। লুচি তৈরি হবে। জাহানারা বললেন, 'তোকে এমন দেখাচ্ছে কেন রে নবু?'

'কেমন দেখাচ্ছে?'

'মনে হচ্ছে শরীর খুব খারাপ। রাতে ঘুম হয় নি?'

'হয়েছে।'

'জ্বর-টর আসে নি তো নবু?'

'উহুঁ।'

'দেখি কাছে আয়, গায়ে হাত দিয়ে দেখি।'

'তুমি তো ময়দা মাখছ। গায়ে হাত দেবে কী করে?'

জাহানারা বললেন, 'তুই আমার গালের সঙ্গে তোর গাল লাগা। তাতেই বুঝব।'

নবনী এসে মাকে জড়িয়ে ধরল। জাহানারা নবনীর মুখ দেখতে পেলেন না। তিনি বুঝতে পারছেন নবনী কেঁপে কেঁপে উঠছে। তাঁর বুকে একটা ধাক্কা লাগল।

'নবু, মা, কী হয়েছে তোর?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কেন জানি মা কিচ্ছু ভালো লাগছে না।'

'ভালো না লাগার মতো কিছু কি হয়েছে?'

'না।'

'তুই তো মাঝে মাঝে অকারণেই শাহেদের সঙ্গে ঝগড়া করিস। ঝগড়া হয় নি তো?'

'না, ঝগড়া হয় নি। দুকাপ চা বানাও তো মা।'

'তুই বানিয়ে নিয়ে যা। আমার হাত বন্ধ। শাহেদের কাপে চিনি আধ চামচ বেশি দিবি। ও চিনি বেশি খায়। ঐ তাকের উপর টি-ব্যাগ আছে।'

নবনী চা বানাচ্ছে। জাহানারা ময়দা মাখা বন্ধ করে মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। তিনি অবশ্যি প্রায়ই মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। যত দিন যাচ্ছে, মেয়েটা ততই সুন্দর হচ্ছে। এত সুন্দর যে মাঝে মাঝে মেয়েটাকে তাঁর রক্ত-মাংসের মানুষ বলেই মনে হয় না।

নবনী বলল, 'মা, তোমার জন্যে এক কাপ চা বানাব?'

'না।'

'না কেন? খাও না মা। মেয়ের হাতে বানানো চা খাওয়া যায়। এস, আমরা দুজনে বসে চা খাই।'

'আচ্ছা ঠিক আছে।'

নবনী শাহেদের চায়ের কাপ হাতে উঠে গেল। খাবার ঘরে গিয়ে ডাকল, 'মিলু বুয়া'! মিলু দৌড়ে এল। নবনী খানিকটা অস্বস্তির সঙ্গে বলল, 'এই চা-টা তোমার শাহেদ ভাইকে একটু দিয়ে আস তো। কুয়োতলায় আছে। পিরিচ দিয়ে ঢেকে নিয়ে যাও।'

মিলু চায়ের কাপ হাতে নিতে নিতে বলল, 'আম্মার শইল রাইতে খুব খারাপ গেছে।'

'কী হয়েছে?'

'মাথাত নাকি খুব যন্ত্রণা হইছে। বারিন্দার এই মাথায় ঐ মাথায় হাঁটছেন।'

'ডাকলে না কেন আমাকে?'

'ডাকতে চাইছিলাম। আম্মা নিষেধ করল।'

'তুমি চা নিয়ে যাও, মিলু বুয়া। ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।'

জাহানারা মেয়ের সঙ্গে বসে চা খাচ্ছেন। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে না রাতে তাঁর শরীর খারাপ করেছিল। তবে তাঁকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে। নবনী বলল, 'গত রাতে তোমার একেবারেই ঘুম হয় নি, তাই না?'

'হয়েছে কিছু। চেয়ারে বসে বসে ঘুমিয়েছি।'

'মিলু বুয়া বলছিল খুব নাকি মাথার যন্ত্রণা হচ্ছিল?'

'মাথার যন্ত্রণা তো সব সময়ই হয়। সেটা কিছু না।'

'আমার মনে হয় ভালোমতো ডাক্তার দেখানো উচিত। নয়তো পরে হঠাৎ ধরা পড়বে মাথায় টিউমার হয়েছে। আমরা আগে কিছু বুঝতে পারি নি। এবার ঢাকা গিয়ে তুমি খুব ভালো করে চিকিৎসা করাবে।'

'আচ্ছা করাব।'

'কথা দিচ্ছ কিন্তু মা।'

'আচ্ছা।'

নবনী চা শেষ করে বাবার খোঁজে গেল। জামিল সাহেব এমনিতে খুব ভোরে ওঠেন। ফজরের নামায পড়েন। এখানে এসে নিয়মের ব্যতিক্রম হচ্ছে। তিনি ভোরে উঠতে পারছেন না। আজ তাঁরও ব্যতিক্রম হয়েছে। তিনি ফজর ওয়াক্তে উঠে নামায পড়েছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখন আবার ঘুম পাচ্ছে। ঘুমিয়ে পড়বেন কিনা ভাবছেন। নবনীকে ঢুকতে দেখে তিনি আনন্দিত গলায় বললেন, 'আমার বড় মেয়ে কেমন আছেন গো?'

'ভালো আছি, বাবা।'

'ছুটি কেমন লাগছে?'

'খুব ভালো লাগছে।'

'আজ তোদের প্রোগ্রাম কি?'

'স্পিডবোটে করে পাখি দেখতে যাব।'

'যা কুশায়া পড়েছে! রওনা হতে হতে বেলা হয়ে যাবে। আসল দৃশ্য কিছু দেখতে পাবি না।'

'নকলটাই দেখব, বাবা। আসল দৃশ্যের চেয়ে নকল দৃশ্য সব সময় অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং হয়।'

জামিল সাহেব হো-হো করে হাসলেন। মনে মনে বললেন, বাহ্, মেয়েটা তো খুব সুন্দর করে কথা বলল। মেয়ে দুটার সঙ্গে কথা বলাই হয় না। দিনের বেশিরভাগ সময় কাটে মিটিং-এ। বাকি সময়টা আজেবাজে লোকদের তদবির শুনে। সিনিয়রকে ডুবিয়ে জুনিয়র প্রমোশন পেয়েছে, সেই তদবির। ঢাকা থেকে কুষ্টিয়ায় বদলি করে দিয়েছে, বদলি ফেরানোর তদবির। একজন এসেছিল ওয়াসার পানির লাইন কেটে দিয়েছে- লাইন বসানোর তদবিরে। সামান্য পানির লাইন বসানোয় মন্ত্রীর তদবির লাগে। ঘাড় ধরে লোকটাকে বের করে দেবার ইচ্ছা হয়েছিল। তা করেন নি বরং হাসিমুখে তার সমস্যা শুনেছেন, এবং সেক্রেটারিকে বলেছেন ওয়াসার একজিকিউটিভ ইনজিনিয়ারকে বলে দিতে। মন্ত্রী পর্যন্ত যারা পৌঁছতে পারে তারা ক্ষমতাবান মানুষ। এদের অগ্রাহ্য করতে নেই।

তিনি কাউকে অগ্রাহ্য করেন না। সবার সমস্যাই শোনেন। শুধু নিজের মেয়েদের কোনো কথা শোনার সময় পান না। ছুটির সাত দিন পুরোপুরি মেয়েদের সঙ্গে কাটাবেন ভেবেছিলেন - তাও হচ্ছে না।

'নবনী মা, বোস তো আমার পাশে।'

নবনী বসল। জামিল সাহেব বললেন, 'মার মুখটা এমন মলিন কেন? কী হয়েছে আমার মার?'

'আমার কিছু হয় নি, বাবা। সম্ভবত মার কিছু হয়েছে। রাতে ঘুমাচ্ছে না।'

'এটা তো নরম্যাল। সে রাতে কখনো ঘুমায় না। আমার ধারণা, ঘুম এলেও জেগে থাকে।'

'এরকম করতে করতে দেখবে একদিন খুব অসুস্থ হয়ে পড়বে।'

'তা তো পড়বেই। কিন্তু তোর মাকে কে বোঝাবে? আমার সাধ্যের বাইরে। আমি চেষ্টা কম করি নি।

অনেক চেষ্টা করেছি। এখন হাত ধুয়ে ফেলেছি। তোরা চেষ্টা করে দেখ কিছু করতে পারিস কিনা। মনে হয় না পারবি। তোর মার কথা বাদ দে। তোদের কথা বল। ছুটি কেমন লাগছে?'

'একবার তো বলেছি বাবা — ভালো লাগছে।'

'এখানে যা দেখার দেখেছিস?'

'হুঁ।'

'মনু মিয়ার দিঘি দেখেছিস।'

'না। সেটা আবার কোথায়?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সুরুজ মিয়াকে বললেই নিয়ে যাবে। নৌকায় যেতে হবে। এখান থেকে তিন--চার মাইল হবে।'

'বিরাট দিঘি?'

'মোটামুটি বিরাটই আছে। ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হল পানি লাল। গাঢ় লাল। ভয়ে কেউ দিঘিতে নামে না। অদ্ভুত মিথ আছে দিঘি নিয়ে। সুরুজ মিয়া জানে নিশ্চয়ই।'

'পানি লাল কেন, বাবা?'

'ঠিক জানি না। কে যেন বলেছিল লাল শৈবালের কারণে পানি হয়েছে লাল। এসব তোদের সায়েন্সের ব্যাপার। তোরাই তো ভালো জানবি।'

'আমি আমার পাঠ্যবইয়ের বাইরে কিছু জানি না, বাবা। শ্রাবণী হয়তো জানে। তার কাজই বই পড়া।'

কুয়াশা কেটেছে।

স্পিডবোট চলে এসেছে। রওনা হতে দেরি হবে। সুরুজ মিয়া ছাতা আনতে গেছেন। রোদ চড়লে ছাতা না থাকলে কষ্ট হবে। শ্রাবণী বাইরে যাবার জন্যে তৈরি হয়েছে। আজ এই প্রথম সে শাড়ি পরল। নবনীকে বলল, 'তোমার মুক্তার কানের দুলজোড়া আমাকে দাও তো আপা।' নবনী দুল পরিয়ে দিল। শাহেদ বলল, 'শ্রাবণীকে তো আজ অদ্ভুত লাগছে! নবনী দেখেছ, কী অপূর্ব লাগছে শ্রাবণীকে?'

নবনী বলল, 'হ্যাঁ অপূর্ব লাগছে।'

শাহেদ বলল, 'শাড়ি হচ্ছে অসম্ভব সুন্দর একটা পোশাক। শোন শ্রাবণী, এখন থেকে তুমি সব সময় শাড়ি পরবে।'

শ্রাবণী বলল, 'আচ্ছা শাহেদ ভাই, আপনাকে একটা ধাঁধা জিজ্ঞেস করছি। বলুন তো দেখি আমি, আপনি এবং একটি শাড়ি। এই তিন জিনিসের মধ্যে একটা সুন্দর মিল আছে। মিলটা কোথায়?'

শাহেদ অবাক হয়ে বলল, 'আমি তো মিল পাচ্ছি না।'

'না ভাবলে পাবেন কী করে? ভেবে তারপর বলুন। আপা, তুমি বলতে পারবে?'

'না, আমি বলতে পারব না।'

শ্রাবণী হাসতে হাসতে বলল, 'মিলটা হল তিনটিরই শুরুর অক্ষর হচ্ছে 'শ'।' শ্রাবণী, শাহেদ এবং শাড়ি।

নবনী ছোটবোনের দিকে তাকিয়ে আছে। সে কিছু একটা বলতে গিয়েও বলল না। নিজেকে সামলে নিল।

শ্রাবণী বলল, 'আপা, তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে। এস আমার সঙ্গে।'

'কোথায় যাব?'

'খানিকটা দূরে যেতে হবে। মিনিট দশেক হাঁটতে হবে।'

'ডাকবাংলোর ভেতরে বলা যাবে না?'

'না।'

শাহেদ বলল, 'আমি কি তোমাদের সাথে আসতে পারি?'

'না। বোনে বোনে কথা হবে, এখানে আপনার কোনো স্থান নেই।'

'আমি সঙ্গে আসি। তোমাদের কথা বলার সময় না হয় দূরে সরে যাব।'

'অসম্ভব। আপনাকে নেয়াই যাবে না।'

নবনী এবং শ্রাবণী হাঁটছে। কেউ কোনো কথা বলছে না। জংলামতো একটা জায়গায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসে শ্রাবণী থমকে দাঁড়াল। আপার দিকে তাকিয়ে বলল, 'এখন এই বনের ভেতরে ঢুকতে হবে।'

নবনী বলল, 'কথাগুলি কি বনের ভেতর ঢুকে বলবি?'

'কথা না। তোমাকে একটা জিনিস দেখাব।'

'কী জিনিস?'

'মারিয়া স্টোনের কবর। তুমি আমাকে অবিশ্বাস করেছিলে। তুমি ভেবেছিলে আমি মিথ্যা কথা বলছি। আমি সত্যি কথাই বলি, আপা। কিছু কিছু মানুষ আছে যাদের সত্যি কথা মিথ্যার মতো মনে হয়। আমি সে রকম একজন। এস বনে ঢুকি, বেশিদূর যেতে হবে না। অল্প কিছুদূর গেলেই দেখবে।'

নবনী ক্লান্ত গলায় বলল, 'আমি তোর কথা বিশ্বাস করছি। আমি দেখতে চাচ্ছি না।'

'তোমাকে দেখতে হবে। এতদূর এসে তুমি না দেখে যেতে পারবে না।'

'তুই কেন আমার সঙ্গে এরকম করছিস?'

'তুমি আমাকে মিথ্যাবাদী ভাববে, তা হবে না।'

'আমি তোকে মিথ্যাবাদী ভাবছি না।'

'এক সময় ভেবেছিলে।'

'হ্যাঁ, এক সময় ভেবেছিলাম। I am sorry for that.'

'এস আপা, দুমিনিটের মাত্র পথ। চোরকাঁটা আছে। শাড়ি খানিকটা উপরে তুলতে হবে। ভয় নেই, কেউ দেখবে না।'

তারা কবরের কাছে এসে দাঁড়াল। একটা কালো পাথরের ক্রসচিহ্ন। পেছনে কালো পাথরে খোদাই করে লেখা, মারিয়া স্টোন। দীর্ঘ ইংরেজি কবিতা। এপিটাপ। প্রথম দু লাইন –

The bells will ring,
The birds will sing.

শ্রাবণী বলল, 'আপা দেখলে?'

'হ্যাঁ দেখলাম।'

'শাহেদ ভাই সম্পর্কে যে কথাগুলো বলেছি সেগুলিও যে সত্যি তা কি তুমি বিশ্বাস করছ?'

নবনী জবাব দিল না। শ্রাবণী বলল, 'পাখি দেখতে যাবার জন্যে আমরা সব তৈরি হয়ে আছি। এখন আমি যদি বলি – শাহেদ ভাই, আপনি আপাকে নিয়ে যান। আমার মচকানো পা আবার ব্যথা করছে। আমি যেতে পারব না। তাহলে শাহেদ ভাই যাবে না। সে থেকে যাবে। আমি কি প্রমাণ করব?'

'না।'

'যা সত্যি তা স্বীকার করে নেয়াই কি ভালো না? আমি জানি এখন তোমার কষ্ট হচ্ছে। এটা কিন্তু অনেক ভালো। কষ্টটা বিয়ের পর হবার চেয়ে আগে হওয়াই ভালো।'

'তুই চুপ কর্।'

তারা নিঃশব্দে ডাকবাংলোয় ফিরে এল। ডাকবাংলোর গেটের কাছে শাহেদ দাঁড়িয়ে আছে। তার মাথায় ক্রিকেট খেলোয়াড়দের মতো সাদা টুপি। তাকে সুন্দর দেখাচ্ছে। শাহেদ চেঁচিয়ে বলর, 'তোমরা এত দেরি করেছ? যাত্রার সব আয়োজন সম্পন্ন। ডাকবাংলোয় ঢোকার দরকার নেই – তোমরা এখান থেকে সরাসরি স্পিডবোটে উঠবে। তোমাদের ব্যাগ-ট্যাগ সব তোলা হয়েছে। পানির বোতল নেয়া হয়েছে। ফ্লাস্ক ভর্তি চা নেয়া হয়েছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্রাবণী বলল, একটা ক্ষুদ্র সমস্যা হয়েছে, শাহেদ ভাই।'

'কী ক্ষুদ্র সমস্যা।'

'হাঁটতে গিয়ে আমার মচকে যাওয়া পা গর্তে পড়েছে। আমার মুখ দেখে বোঝার উপায় নেই যে ব্যথায় আমি ছটফট করছি। কাজেই আমি যেতে পারছি না। আমাকে গরম পানিতে পা ডুবিয়ে বসে থাকতে হবে।'

শাহেদ হতভম্ব গলায় বলল, 'সে কী?'

'তাতে আপনাদের প্রোগ্রামের কোনো রকম হেরফের হবে না। আপনি আপাকে নিয়ে যাবেন। হৈচৈ করে আসবেন।'

নবনী এক দৃষ্টিতে বোনের দিকে তাকিয়ে আছে। তার চোখে পলক পর্যন্ত পড়ছে না। শাহেদ বলল, 'তিনজন মিলে যাব ঠিক করেছি, এখন দুজন যাব, তা কি করে হয়! তাছাড়া পাখি শিকারে তোমার আগ্রহই সবচে' বেশি ছিল।'

'আগ্রহ এখনো আছে। সুন্দর সুন্দর পাখি গুলি করে মেরে ফেলার দৃশ্য খুব ইন্টারিস্টেং হবার কথা কিন্তু উপায় নেই। পায়ে দারুণ ব্যথা।'

শাহেদ বলল, 'তাহলে প্রোগ্রাম বাদ দেয়া যাক। তোমার পায়ের ব্যথা কমুক, তারপর যাব। আজই যেতে হবে এমন তো কথা নেই। নবনী, তুমি কী বল?'

নবনী সহজ গলায় বলল, শ্রাবণীর পায়ের ব্যথা-ট্যথা কিছুই নেই। ও ভালোই আছে। ও যাবে পাখি দেখতে। ও তোমার সঙ্গে তামাশা করছে। আমি যেতে পারব না। আমার পাখি শিকার ভালো লাগে না। তাছাড়া মার শরীর খুব খারাপ। আমি মার সঙ্গে থাকব। একজন ডাক্তার এনে মাকে দেখাব।'

শাহেদ বলল, 'তুমি কি সত্যি যাবে না?'

'না। তাতে অসুবিধা নেই। তুমি শ্রাবণীকে নিয়ে ঘুরে এস। এঁরা কষ্ট করে এত আয়োজন করেছেন। এখন না যাওয়া ঠিক হবে না।'

শাহেদ বলল, 'সেটাও সত্যি।'

নবনী বলল, 'দেরি না করে তোমরা রওনা হয়ে যাও।'

নবনী ডাকবাংলোয় ঢুকে পড়ল। কিছুক্ষণের মধ্যেই স্পিডবোট চালু করার ভট্ ভট্ শব্দ কানে এল।

৯

নবনী নিজের ঘরে শুয়ে আছে। ভুল বলা হল। নিজের ঘর না, শ্রাবণীর ঘর। এই মুহূর্তে ডাকবাংলোয় তার নিজের কোনো ঘর নেই। নবনীর ইচ্ছা করছে, শ্রাবণীর মতো কোলবালিশ জড়িয়ে নিশ্চিত মনে খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে থাকে। খুব ক্লান্ত লাগছে। মন ক্লান্ত হলেও শরীরও বোধহয় ক্লান্ত হয়ে যায়। ঘরটায় প্রচুর আলো। জানালার পর্দা সরিয়ে দেয়া, ঘরে রোদ ঢুকছে। চোখে আলো লাগছে। চারদিক অন্ধকার করে শুয়ে থাকলে বোধহয় ভালো লাগত। বিছানা থেকে উঠে পর্দা টেনে দিতেও ইচ্ছা করছে না। আল্‌সী লাগছে।

আস্তে করে কে যেন দরজায় হাত রাখল। নবনী বলল, 'কে?

জামিল সাহেব বললেন, 'আমি।'

'এস বাবা।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জামিল সাহেব এসে ঢুকলেন। তাঁর মুখও বিষণ্ন। তিনি বললেন, 'হঠাৎ তোর আবার কী হল?' নবনী বিছানায় উঠে বসতে বসতে বলল, 'বুঝতে পারছি না। খুব ক্লান্ত লাগছে। খুব ঘুম পাচ্ছে। মনে হচ্ছে অনেকদিন আরাম করে ঘুমাচ্ছি না।'

'বেড়াতে এসে সবাই একসঙ্গে অসুখ বাধিয়ে ফেলা তো কোনো কাজের কথা না। যাই হোক, আমি শামসুদ্দিনকে খবর দিয়েছি...'

'শামসুদ্দিন কে?'

'ডাক্তার। এমবিবিএস। শুনেছি ভালো ডাক্তার।'

নবনী বলল, 'বাবা, চল আমরা ঢাকায় চলে যাই। এখানে আর ভালো লাগছে না।'

জামিল সাহেব বললেন, 'সেটাই ভালো। আমিও একটু আগে তাই ভাবছিলাম। এখানে হঠাৎ বড় ধরনের কোনো অসুখ-বিসুখ হলে মুশকিলে পড়ে যাব। নবনী, তুই শুয়ে না থেকে বরং উঠে বস। শুয়ে থাকলে অসুখকে প্রশ্রয় দেয়া হয়।'

নবনী উঠে বসল। জামিল সাহেব বললেন, 'তুই তোর পরীক্ষার রেজাল্ট নিয়ে চিন্তিত না তো?

'না।'

'আমার মনে হয় পরীক্ষার রেজাল্টের চিন্তাই তোকে আপসেট করে রাখছে। এত চিন্তা করতে নেই— যা হবার হবে। আমার ধারণা, ভালোই হবে।'

নবনী হাসতে হাসতে বলল, 'পরীক্ষা ভালোই হবে। আমি পরীক্ষার সব প্রশ্নের জবাব জানি। অন্য কোনো প্রশ্নের জবাব জানি না।'

'এর মানে কি?'

'কোনো মানে নেই, বাবা। কথার কথা বললাম।'

জামিল সাহেব সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, 'ছুটি কাটানোর ব্যাপারে আমরা এখনো অভ্যস্ত হয়ে উঠি নি। ছুটি ব্যাপারটা বাঙালি কালচারে নেই। আমাদের ছুটি মানে মামার বাড়িতে গিয়ে কিছুদিন থেকে আসা। তার ফল এই হয়েছে যে সত্যিকার অর্থে ছুটি কাটানো বিষয়টা আমরা জানি না। বাইরে বেড়াতে এলে হাজারো সমস্যায় হাবুডুবু খাই। একজন রাতে ঘুমায় না। একজনের বিষণ্নতা রোগ হয়। দরজা বন্ধ করে শুয়ে থাকে।'

নবনী বলল, 'তুমি কি আমার উপর রাগ করছ, বাবা?'

'না, রাগ করছি না। তুই যেমন কথার কথা বললি, আমিও কথার কথা বললাম।'

জামিল সাহেব উঠে পড়লেন। নবনী বলল, 'বাবা, তুমি কি যাবার আগে জানালার পর্দাটা টেনে দিয়ে যেতে পারবে?'

'পারব।'

জামিল সাহেব জানালার পর্দা টেনে দিলেন। দরজা ভিজিয়ে দিয়ে গেলেন। ঘর অবশ্যি পুরোপুরি অন্ধকার হল না। এই ভালো। ঘুমানোর জন্যে অন্ধকার ভালো। চুপচাপ শুয়ে থাকার জন্যে দরকার আধো আলো আধো অন্ধকার।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, শাহেদের সঙ্গে তার পরিচয়— এরকম আধো আলো এবং আধো অন্ধকারে। তারা তখন থাকত শ্যামলী। জামিল সাহেব মন্ত্রী হন নি। তবুও বেশ ক্ষমতাবান মানুষ। বাড়িতে দারোয়ান আছে, মালী আছে, কুকুর আছে। একদিন বর্ষাকালে ভর সন্ধ্যাবেলায় নবনী শুয়ে আছে— তার মাথা ধরেছে। মিলু বুয়া এসে বলল, 'একজন লোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসছে।'

নবনী বিস্মিত হয়ে বলল, 'আমাদের ক্লাসের কোনো ছাত্র?'

'জিজ্ঞেস করি নাই।'

'জিজ্ঞেস করে এস। আর ছাত্র যদি না হয় তাহলে জিজ্ঞেস কর – আমার কাছে কী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চায়?'

মিলু বুয়া ফিরে এসে জানাল – 'ছাত্র না। ভদ্রলোক একটা জরুরি কাজে এসেছেন নবনী বিরক্ত হয়ে বলল, 'আমার সঙ্গে কারোরই কোনো জরুরি কাজ নেই – চলে যেতে বল।'

মিলু বলল, 'আপনে নিচে গেলে ভালো হয় আফা – সাথে অতবড় একটা ছবি নিয়া আসছে।' নবনী নিচে নামল। বসার ঘরে ঢুকে প্রথমে যে জিনিসটা চোখে পড়ল, তা হল বিশাল একটা পেইনটিং। বর্ষার ছবি। আকাশে ঘন কালো মেঘ। খোলা প্রান্তরে কয়েকটা তাল গাছ। ছবিটা দেখেই মনে হচ্ছে – এই বুঝি বৃষ্টি নামল। ছবি থেকে চোখ ফেরানো কষ্ট। এত সুন্দর ছবি যে নিয়ে এসেছে সেই মানুষটা দাঁড়িয়ে আছে। সুন্দর চেহারা, ভদ্র একজন যুবক। মেরুন রঙের একটা হাফশার্ট, সাদা প্যান্ট। মানুষটা হাসছে খুব সুন্দর করে।

নবনী বলল, 'কী ব্যাপার?'

যুবক বলল, 'আমার নাম শাহেদ। ছবিটা কি আপনার পছন্দ হয়েছে?'

'খুব সুন্দর ছবি। ছবি নিয়ে এসেছেন কেন?'

'ছবি যদি আপনার পছন্দ হয় আপনি কিনতে পারেন। আমাকে ছবির সেলসম্যান বলতে পারেন।'

নবনী বিস্মিত হয়ে বলল, 'আপনি কি মানুষের বাড়ি বাড়ি ছবি বিক্রি করেন?'

'অনেকটা তাই।'

'এই ছবি আপনার আঁকা?'

'আমার এক বন্ধুর আঁকা। আমি ছবি আঁকতে পারি না। ভালো ছবি, মন্দ ছবিও বুঝি না।'

'দাম কত?'

'আমার বন্ধু দশ হাজার টাকা চাচ্ছে।'

'কী সর্বনাশ!'

'দশ হাজার টাকা শুনে কী সর্বনাশ বলা ঠিক হচ্ছে? এই টাকা তো আপনাদের কাছে কিছুই না।'

নবনী হেসে ফেলে বলল, 'আমার বাবার কাছে সম্ভবত কিছুই না। কিন্তু আমার কাছে অনেক টাকা। এই মুহূর্তে আমার কাছে দুশ টাকা আছে। যাই হোক, আপনি ছবি রেখে যান। আমি বাবাকে জিজ্ঞেস করব।'

'কবে খোঁজ নিতে আসব?'

'কাল আসুন।'

'জ্বি আচ্ছা।'

শ্রাবণী সব শুনেই বলেছে, 'আপা, ঐ ভদ্রলোক তোমার কাছে ছবি বিক্রি করতে আসেন নি। ছবি বিক্রি করতে এলে বাবার কাছেই আসতেন। তিনি তোমার কাছেই এসেছেন। মিলু বুয়াকে বলেছেন— 'এ বাড়ির বড় মেয়ে নবনীকে ডাক।' তিনি তোমার নাম জেনেই এসেছেন। আমার ধারণা, ভদ্রলোক তোমাকে কোথাও দেখেছেন, দেখার পরই তাঁর মাথা খারাপের মতো হয়েছে। সেটাই স্বাভাবিক। তিনি তোমার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে সুন্দর একটা অজুহাত বের করেছেন। দশ হাজার টাকা খরচ করে নিজেই ছবিটা কিনেছেন।'

নবনী বলল, 'তোর রিসেন্টলি পড়া কোনো উপন্যাসে কি এরকম কিছু আছে?'

'উঁহু নেই। তবে আমার অনুমান সত্যি। বাজি রাখতে চাও? পাঁচশ টাকা বাজি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'পাঁচশ না। দুশ টাকা বাজি। আমার কাছে দুশ টাকা আছে।'

'বেশ দুশ টাকা।'

শ্রাবণী বাজি জিতে গেল। সব বাজিতেই সে জিতে যায়। বাজির ভাগ্য সবার ভালো থাকে না।

দরজায় টোকা পড়ছে। নবনী বলল, 'কে?'

মিলু বলল, 'বড় আফা, আম্মা আপনেরে ডাকে।'

নবনী দরজা খুলে বের হয়ে এল।

জাহানারা ভেতরের বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে আছেন। তাঁর মুখ শুকনো। চোখ লাল। তঁর মাথার চুল ভেজা। মাথা দপদপ করছিল। কিছুক্ষণ আগেই মাথায় পানি ঢেলেছেন। চুল শুকায় নি।

নবনী বলল, 'ডেকেছ মা?'

জাহানারা বললেন, 'তোর কী হয়েছে?'

নবনী বলল, 'কিছু হয় নি তো।'

'আমার কাছে লুকাবি না। বল্ কী হয়েছে?'

নবনী চুপ করে রইল। জাহানারা বললেন, 'শ্রাবণী কেন এমন সেজেগুজে হাসতে হাসতে গেল, আর তুই কেন দরজা বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে আছিস?'

নবনী মার দিকে তাকিয়ে রইল। জাহানারা ক্লান্ত গলায় ডাকলেন, 'মিলু, মিলু!'

মিলু ছুটে এল। জাহানারা বললেন, 'আমাকে মাথাধরার ওষুধ এনে দে। প্রচণ্ড মাথা ধরেছে।'

নবনী বলল, 'মা, তুমি শুয়ে থাক। তোমাকে দেখেই মনে হচ্ছে তোমার খুব শরীর খারাপ।' জাহানারা উঠে দাঁড়ালেন। তিনি ঠিকমতো পা ফেলতে পারছেন না। নবনী এসে জাহানারার হাত ধরল। জাহানারা বললেন, 'তোকে আমি কিছু কথা বলব, তুই আয় আমার সঙ্গে।'

১০

স্পিডবোটের মেশিন বিকল হয়েছে।

স্টার্ট দিলে ভট্ ভট্ শব্দ ঠিকই হয়, প্রপেলার ঘোরে না। সুরুজ মিয়া বললেন, 'এ তো বড়ই যন্ত্রণা হল!' স্পিডবোটের চালক প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। তার গা বেয়ে ঘাম পড়ছে। কোনো কাজ হচ্ছে না। তারা মাঝনদীতে থেমে আছে। অল্প বাতাস আছে। নৌকা দুলছে। শ্রাবণী বলল, 'আমার তো এই অবস্থাটা ভালো লাগছে। ভট্ ভট্ শব্দে মাথা ধরে গিয়েছিল। চেয়ারম্যান চাচা!'

'জ্বি আম্মা।'

'আপনি এক কাজ করুন। আমাদের দুজনকে নামিয়ে দিন। আমরা চায়ের ফ্লাস্ক, খাবারদাবার নিয়ে এখানেই নেমে যাই। আপনারা দেখুন কিছু করতে পারেন কিনা। করতে না পারলেও ক্ষতি নেই। শাহেদ ভাই, স্পিডবোট চালু না হলে আপনার কোনো সমস্যা আছে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কোনো সমস্যা নেই।'

সবুজ মিয়া বললেন, 'ফিরতে খুব সমস্যা হবে আম্মা। বেজায় সমস্যা— ফিরতে হবে উজানে।'

শাহেদ বলল, 'ফেরার সময় আসুক, তখন দেখা যাবে।'

তারা নেমে পড়ল। শ্রাবণী বলল, 'চলুন শাহেদ ভাই, আমরা কোনো একটা গাছের নিচে বসি। আপনার দায়িত্ব হচ্ছে সুন্দর একটা গাছ খুঁজে বের করা। আপনি ক্যামেরা এনেছেন না?'

'এনেছি।'

'তাহলে চুপচাপ বসে আছেন কেন? ছবি তুলুন। ইস্, আমার দারুণ লাগছে।'

'তোমার পায়ের ব্যথা কি সেরে গেছে?'

'সারে নি, এখনো ব্যথা নিয়েই হাঁটছি। আর আপনি এমনই মানুষ যে একবার ভদ্রতা করেও বলেন নি – শ্রাবণী, আমার হাত ধরে ধরে হাঁট। নাকি আপনি চান না আমি আপনার হাত ধরি?'

শাহেদ বলল, কষ্ট করার কোনো দরকার নেই। আমার হাত ধর।'

'এটা বলতে গিয়ে আপনার গলা কিন্তু কেঁপে গেছে শাহেদ ভাই।'

'গলা কাঁপবে কেন?'

শ্রাবণী খিলখিল করে হাসছে।

শাহেদ বলল, 'দেখি আমার হাত ধর তো।'

শ্রাবণী বলল, 'কেউ আবার কিছু মনে করবে না তো? আমাদের স্পিডবোটের চালককে দেখুন – কেমন ড্যাব ড্যাব করে তাকাচ্ছে।'

'তাতে কিচ্ছু যায় আসে না।'

শাহেদ বলল, 'তোমাকে এত খুশি খুশি লাগছে কেন?'

'জানি না কেন। জ্বর আছে বলেই হয়তো। গায়ে জ্বর থাকলে আমার খুব ফুর্তি লাগে।'

'তুমি অদ্ভুত মেয়ে।'

শ্রাবণী শাহেদের হাত ধরল। শাহেদ বলল, 'তোমার হাত এমন গরম কেন?'

'জ্বর এসেছে, এই জন্যে গরম। শাহেদ ভাই, আপনি কি জানেন যে আমার মধ্যে ভালুক–স্বভাব খুবই প্রবল।'

'সেটা আবার কী?'

'ভালুকদের ঝপ করে জ্বর আসে। আবার ঝপ করে চলে যায়। আমার এখন জ্বর এসেছে। আবার চলেও যাবে।'

তারা একটা শিমুল গাছের কাছে এসে দাঁড়াল। শ্রাবণী বলল, 'এই গাছটা আমার পছন্দ হয়েছে। আসুন, এই গাছের নিচে বসে চা খাওয়া যাক।'

শাহেদ বলল, 'গাছটা কাঁটায় ভর্তি।'

শ্রাবণী বলল, 'কাঁটা ভর্তি গাছই আমার ভালো লাগে। গোলাপ গাছও কাঁটা ভর্তি, শাহেদ ভাই!'

'হুঁ।'

'আপনি কি আপাকে বিয়ের ব্যাপারে সব ঠিকঠাক করে ফেলেছেন?'

'কেন বল তো?'

'এমনি জিজ্ঞেস করছি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শাহেদ চুপ করে রইল। শ্রাবণী বলল, 'সব ঠিকঠাক করে ফেললে ভিন্ন কথা। ঠিকঠাক করে না ফেললে নিজেকে ভালো করে জিজ্ঞেস করুন – আপার জন্যে আপনি কতখানি ভালবাসা আলাদা করে রেখেছেন?'

শাহেদ বলল, 'ঐ প্রসঙ্গ থাক।'

'ঐ প্রসঙ্গ থাকবে কেন? আপনার কি মনে হয় না ঐ প্রসঙ্গটা খুব জরুরি।'

'আজ থাক। অন্য সময় আলাপ করব। আজ হৈচৈ করতে এসেছি। চল হৈচৈ করি।'

শ্রাবণী কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, 'আপাকে ফেলে এসে আপনি যে আমার সঙ্গে হৈচৈ করছেন, আপনার খারাপ লাগছে না?'

'আচ্ছা শ্রাবণী, তুমি কী শুরু করেছ বল তো! চা দাও। চা খাই।'

শ্রাবণী বলল, 'আসুন, গান শুনতে শুনতে চা খাই।'

শাহেদ বিস্মিত হয়ে বলল, 'তুমি গান গাইবে? গান জান তুমি?'

'মোটামুটি জানি, তবে না জানার মতোই। দরজা বন্ধ করে যখন গান গাই তখন মনে হয় – ভালোই তো হচ্ছে – খোলামাঠে গান কেমন লাগবে জানি না। রিস্ক নিতে চাচ্ছি না। আমি কাঁধের ঝোলায় একটা ক্যাসেট প্লেয়ার নিয়ে এসেছি। আপনার কি ধরনের গান পছন্দ? রবীন্দ্রসংগীত না ধুম–ধাড়াক্কা। আমার কাছে সবই আছে।'

শ্রাবণী গান দিয়ে দিল। অরুন্ধতী হোমের গলায় অপূর্ব গান –

ওকে ধরিলে তো ধরা দেবে না –
ওকে দাও ছেড়ে দাও ছেড়ে
একি খেলা মোরা খেলেছি, শুধু নয়নের জল ফেলেছি –

শাহেদ অবাক হয়ে দেখল, শ্রাবণীর চোখ ভিজে উঠেছে। সে অবাক হয়ে শ্রাবণীর দিকে তাকিয়ে রইল। কী অপূর্ব লাগছে এই শ্যামলা মেয়েটিকে!

শ্রাবণীর চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ করে পানি পড়ছে। সে অশ্রুজল লুকানোর কোনো চেষ্টা করছে না।

১১

জাহানারার ঘর অন্ধকার। তিনি দরজা–জানালা সব নিজের হাতে বন্ধ করেছেন। নবনী অন্ধকার ঘরে তার মার পাশে বসে আছে। তার কেমন ভয় ভয় লাগছে। তার মনে হচ্ছে, মা যেন ঘোরের জগতে চলে যাচ্ছেন। কথাবার্তা ছাড়া ছাড়া। মার মধ্যে কি কোনো পাগলামি ভর করেছে? কেমন তীক্ষ্ণ গলায় কথা বলছেন। যেন মা না, অন্য কেউ। নবনী বলল, 'এরকম করছ কেন?'

'তোকে একটা কথা বলব।'

'এমন কী কথা যে বলার জন্যে দরজা বন্ধ করতে হবে?'

'কিছু কথা আছে অন্ধকারে বলতে হয়। আলোতে বলা যায় না।'

'মা, আমি শুনতে চাচ্ছি না।'

'তোকে শুনতে হবে।'

'মা প্লিজ, আমি শুনতে চাচ্ছি না। আমার ভয় লাগছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাহানারা তীব্র গলায় বললেন, 'ভয় আমারও লাগছে। জীবনটা কাটিয়ে দিয়েছি ভয়ে ভয়ে। আর ভালো লাগছে না। আমি মুক্তি চাই। আমি আরাম করে ঘুমাতে চাই। কত রাত আমি ঘুমাই না তুই জানিস?'

'মা তুমি শুয়ে থাক। আমি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি। আমি তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছি।'

'তুই আমাকে ঘুম পাড়াবি, তুই?'

জাহানারা উঠে বসলেন। হড়হড় করে বিছানা ভাসিয়ে বমি করলেন। নবনী ভয় পেয়ে ডাকল – 'মিলু বুয়া! মিলু বুয়া!'

জাহানারা কঠিন গলায় বললেন, 'ওকে এখন ডাকিস না। আমার কথা শেষ হোক, তারপর ডাকবি। শোন নবনী, ঐ মিলুর বাচ্চা কাচ্চা কেন হয় না জানিস? এগার বছর হল বিয়ে হয়েছে। কোনো ছেলেপুলে নেই। হবেও না কোনো দিন। কেন তুই শোন।'

'মা প্লিজ!'

'খবরদার প্লিজ বলবি না। খবরদার বললাম, আমার কথা শেষ করতে দে। মিলুর যখন সতের বছর বয়স তখন ওর পেটে বাচ্চা এসে গেল। তোর অতি ব্যস্ত বাবা নিজে তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল। বাচ্চা নষ্ট হল। তোর বাবার বুদ্ধি তো খুব বেশি। কাজেই বুদ্ধি করে লাইগেশনও করিয়ে আনল। এতে খুব সুবিধা— ছেলেপুলে হবার ভয় নেই। যন্ত্রণা নেই। বুঝতে পারছিস কিছু? কাল রাতের কথা শুনবি? কাছে আয়, কানে কানে বলি। মিলু আমার মাথা টিপে দিচ্ছিল। তোর বাবা তাকে আমার ঘর থেকে ডেকে নিয়ে গেল। কোনো রকম লজ্জা নেই, কোনো সংকোচ নেই। স্বাভাবিক একটা ব্যাপার। এই স্বাভাবিক ব্যাপার রাতের পর রাত, বছর পর বছরের চলছে। আমরা যখন বাইরে কোথাও যাই, মিলুকে সঙ্গে নিতে হয়। নবনী, আমার কথা বুঝতে পারছিস রে বোকা মেয়ে?'

জাহানারা আবারো হড়হড় করে বমি করলেন। নবনী ফিসফিস করে বলল, 'মা তুমি অসুস্থ।'

জাহানারা বললেন, 'হ্যাঁ আমি অসুস্থ। বাকি সবাই সুস্থ। তোর বাবা সুস্থ, তুই সুস্থ, শ্রাবণী সুস্থ। শুধু আমি বাদ পড়ে আছি। শুধু আমি। আমার চিকিৎসা দরকার। আমার খুব ভালো চিকিৎসা দরকার।'

'মা প্লিজ!'

'খবরদার, আমার কাছে আসবি না। যা দরজা খোল। তোর বাবাকে ডেকে আন, পুলিশ দুটাকে ডেকে আন। আনসারদের ডেকে আন। চেয়ারম্যান সুরুজ মিয়াকে আন। যে যেখানে আছে সবাইকে ডাক। আমি সবাইকে বলব। জনে জনে ডেকে বলব। তারপর ঘুমাব। আরাম করে ঘুমাব। ঘুমে আমার চোখ বন্ধ হয়ে আসে কিন্তু আমি ঘুমাতে পারি না।'

দরজায় শব্দ হচ্ছে। মিলু ক্ষীণ গলায় ডাকল – 'আম্মা দরজা খুলেন। কী হইছে আম্মা?'

জাহানারা চাপা গলায় বললেন, 'মেয়েটা আমারে আম্মা ডাকে। মিষ্টি করে আম্মা ডাকে। দরজা খুলে দে নবনী। আমার মেয়ের জন্যে দরজা খুলে দে।'

নবনী দরজা খুলে বের হয়ে এল। তার সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে। নবনীর পেছনে পেছনে জাহানারা বের হয়ে এলেন। উঁচু গলায় বললেন – 'তোমরা সবাই কোথায় – আমার কথা শুনে যাও। আস সবাই। আস। খুবই মজার গল্প। হি–হি–হি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১২

নবনী একা একা বটগাছের গুঁড়ির বাঁধানো অংশে বসে আছে। রাত অনেক হয়েছে। আকাশে চাঁদ উঠেছে। চারদিকে সুন্দর জোছনা। নবনীর মনে হচ্ছে সে একটা দুর্গের ভেতর আছে। বৃক্ষের দুর্গ। এই দুর্গ ভেদ করে কেউ তার কাছে আসতে পারবে না। ক্রমাগত ঝিঁঝি ডাকছে। শীতের বাতাস বইছে। নবনীর ঘুম পাচ্ছে। তার খুব ইচ্ছে করছে এখানে ঘুমিয়ে পড়তে। এত ক্লান্তি লাগছে। কিন্তু তার মন শান্ত। মনে হচ্ছে তার কোনো দুঃখবোধ নেই। সে কি নিজেই গাছ হয়ে যাচ্ছে? গাছদের জীবনে নিশ্চয়ই কোনো তীব্র দুঃখবোধ থাকে না।

'আপা!'

নবনী তাকাল। শ্রাবণী এসেছে। সে আসবে নবনী জানত। সে শ্রাবণীর জন্যেই অপেক্ষা করছিল। শ্রাবণী এসে বসল বোনের পাশে। নবনী বলল, 'দেখেছিস কী সুন্দর!'

শ্রাবণী বলল, 'হ্যাঁ।'

নবনী বলল, 'ইংরেজির ঐ অধ্যাপক ভদ্রলোকের মতো আজ সারারাত আমি এখানে বসে জোছনা দেখব।'

শ্রাবণী বলল, 'আমিও দেখব। আমি তোমার জন্যে চাদর নিয়ে এসেছি, আপা। নাও, চাদরটা গায়ে দাও।'

নবনী কোনো আপত্তি করল না। চাদর গায়ে দিল। শ্রাবণী বলল, 'আপা শোন, আমার দিকে তাকাও। আমার দিকে তাকিয়ে একটা কথা শোন।'

নবনী তাকাল। শ্রাবণী খুব সহজ স্বরে বলল, 'এই পৃথিবীতে তোমার চেয়ে বেশি আমি কাউকে পছন্দ করি না। তুমি যে কত ভালো একটা মেয়ে তা শুধু আমি জানি। আর কেউ জানে না। কেউ কোনোদিন জানবেও না। আমি কি তোমাকে কষ্ট দিতে পারি আপা? ভুলেও ভেব না তোমার প্রিয়জনকে আমি কেড়ে নেব। তোমার যে প্রিয় সে আমারও প্রিয়।'

নবনী ছোট্ট করে নিশ্বাস ফেলল।

শ্রাবণী বলল, 'আমি তোমার জন্যে অসম্ভব সুন্দর একটা জীবন চাই। এমন সুন্দর জীবন, যা শুধু গল্পে উপন্যাসে পাওয়া যায়। আমি কখনো চাই না, তোমার জীবনটা মার মতো হয়। আমি যা করেছি এই জন্যেই করেছি। তোমার যত ভ্রান্তি ছিল সব দূর করে দিলাম। এমনিতে তুমি কিছু বুঝতে পারছিলে না। কাজেই খুব কঠিনভাবে তোমাকে বুঝিয়ে দিলাম।

'মার ব্যাপারটা তুই জানতি?'

'কেন জানব না, আপা? আমার অনেক বুদ্ধি।'

নবনী কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'আমি এত বোকা হয়েছি কেন রে শ্রাবণী? আল্লাহ্ কেন আমাকে এত বোকা করে বানাল?'

নবনী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। শ্রাবণী তার বোনকে শক্ত করে দুহাতে জড়িয়ে ধরে রেখেছে। শ্রাবণীকে এখন একটা বৃক্ষের মতোই লাগছে। যেন সে বোনের চারদিকে কঠিন দেয়াল তুলে দিয়েছে। যেন এই দেয়াল ভেদ করে পৃথিবীর কোনো মালিন্য নবনীকে স্পর্শ করতে না পারে।

আকাশ থেকে জোছনা গলে গলে পড়ছে। শীতের বাতাসে যেন সেই জোছনা ভাসতে ভাসতে ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। শ্রাবণী ফিসফিস করে বলল, 'কাঁদে না আপা। কাঁদে না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পোকা

১

আলতাফ হোসেন নামের শেষে অনেকগুলো অক্ষর।

আলতাফ হোসেন বি. এ. (অনার্স), এম. এ., বি. টি., এল. এল. বি.।

প্রতিটি অক্ষরের পেছনে কিছু ইতিহাস আছে। যেহেতু 'পোকা'র নায়ক আলতাফ হোসেন সেহেতু তার ইতিহাস জানা থাকলে পোকার বিষয়বস্তু বুঝতে সুবিধা হবে। অনার্স থেকে শুরু করা যাক। আলতাফের ইচ্ছা ছিল পাসকোর্সে পড়া। তার দূর সম্পর্কের মামা এ. জি. অফিসের সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট বজলুর রহমান বললেন, 'অনার্স পড়। শুনতে ভালো লাগে।' আলতাফ হোসেন ক্ষীণ গলায় বলল, ইন্টারমিডিয়েটের রেজাল্ট খারাপ, অনার্সে ভর্তি হতে পারব না, মামা।' বজলুর রহমান বললেন, 'চেষ্টা করে দেখ। কত আজেবাজে সাবজেক্ট আছে— পল সায়েন্স, ফল সায়েন্স।' আলতাফ অনেক খুঁজে পেতে জগন্নাথ কলেজে অনার্সে ভর্তি হয়ে গেল। বজলুর রহমান বললেন, 'খাটাখাটনি করে পড়। খাটাখাটনি কখনো বৃথা যায় না। কথায় আছে— খাটে মানুষ ঘাঁটে না।'

আলতাফ প্রচণ্ড খাটাখাটনি করল। অনার্স পরীক্ষার রেজাল্ট বের হবার পর সে তার মামার পা ছুঁয়ে সালাম করল। ক্ষীণ গলায় বলল, 'রেজাল্ট হয়েছে মামা।' বজলুর রহমান বিছানায় শুয়ে ছিলেন। তিনি উঠে বসলেন। উৎসাহ নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী রেজাল্ট?'

'থার্ড ক্লাস পেয়েছি, মামা।'

বজলুর রহমান সাহেবের উৎসাহ মরে গেল। তিনি হতাশ গলায় বললেন, 'এত পড়াশোনা করে শেষে থার্ড ক্লাস?'

'জ্বি মামা।'

'থার্ড ক্লাস ডিগ্রি নিয়ে চাকরি-বাকরি তো কিছুই পাবি না। এখন করবি কী?'

'আপনি বলে দিন, মামা।'

'এম. এ. দিয়ে দে। এম. এ. পাস থাকলে থার্ড ক্লাসের দোষ কাটা যায়। ভালোমতো পড়াশুনা করে এম. এ. দে। খাটাখাটনি কর। কথায় আছে— খাটে মানুষ ঘাঁটে না।'

আলতাফ হোসেন খুব ভালোমতো পড়াশোনা করে এম. এ. দিল। রেজাল্ট বের হবার পর যথারীতি পা ছুঁয়ে মামাকে সালাম করল। বজলুর রহমান শংকিত গলায় বললেন, 'কি রে, এবারো থার্ড ক্লাস?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'জ্বি মামা।'

'থার্ড ক্লাসের তুই তো দোকান দিয়ে ফেলেছিস রে গাধা।'

আলতাফ হোসেন ক্ষীণ স্বরে কি যেন বলল, পরিষ্কার বোঝা গেল না। তার বেশিরভাগ কথাই পরিষ্কার বোঝা যায় না। তবে তার চোখ ভিজে উঠল। বজলুর রহমান বললেন, 'যা হবার হয়ে গেছে। এখন চাকরি-বাকরি খোঁজ। রোজগারপাতির চেষ্টা তো দেখা দরকার। আমার ঘাড়ে বসে কতদিন খাবি? আর থার্ড ক্লাস নিয়ে মন খারাপ করিস না। ডিগ্রিটাই সবাই দেখবে, ক্লাস কে দেখবে? এত সময় কার আছে? তাছাড়া থার্ড ক্লাস পাওয়াও সহজ না। এক চান্সে পেয়েছিস, এটা কম কথা না।'

মামার উপদেশমতো আলতাফ হোসেন চাকরির খোঁজে লেগে গেল। দুবছর অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে চাকরি খুঁজল। কিছু হল না। বজলুর রহমান বললেন, 'বি. টি. দিয়ে ফেল। বি. টি. থাকলে স্কুলের চাকরি পেয়ে যাবি। স্কুলের চাকরিতেই আজকাল মজা। প্রাইভেট টিউশ্যানি করবি, দুই হাতে টাকা কামাবি। স্কুল মাস্টারি আজকাল কেউ করতে চায় না, ঐ লাইনে চাকরি খালি আছে।'

আলতাফ হোসেন বি. টি. পাস করল। স্কুলের কোনো চাকরি জোগাড় করা গেল না। স্কুলে সায়েন্স গ্র্যাজুয়েট চায়, এম. এ., বি. টি. চায় না। আরো দুবছর গেল। বজলুর রহমান বললেন, 'এল. এল. বি.-টা দিয়ে দিবি নাকি? আইনের একটা ডিগ্রি থাকলে সুবিধা হবে। আলতাফ হোসেন এল. এল. বি. ডিগ্রি নিয়ে নিল। চাকরির কোনো সুবিধা হল না।

বজলুর রহমান হতাশ হয়ে একদিন বললেন, 'বিয়ে করবি? অনেক সময় বিয়ে করলে ভাগ্য ফেরে। কথায় আছে— স্ত্রী ভাগ্যে ধন। দেখবি বিয়ে করে?'

আলতাফ হোসেন অস্পষ্ট গলায় বলল, 'জ্বি আচ্ছা।'

চাকরি পাওয়া না গেলেও বিয়ের মেয়ে পেতে অসুবিধা হল না। আট-দশটি মেয়ের সন্ধান পাওয়া গেল। এই মেয়েগুলোর অভিভাবকদের কথা শুনলে মনে হতে পারে এরা বেকার ছেলেই খুঁজছিল। একজন তো বলেই ফেলল, 'পাত্র হিসেবে বেকার ছেলের তুলনা নেই। এরা খুব স্ত্রীভক্ত হয়ে থাকে। চাকরি-বাকরি নেই তো, তাই স্ত্রীকে খুব মানে। আরে ভাই, চাকরি তো একসময় হবেই। রিজিক আল্লার হাতে, মানুষের হাতে থাকলে চিন্তার বিষয় ছিল।'

বজলুর রহমান মেয়ে দেখে বেড়াতে লাগলেন। আষাঢ় মাসের ৯ তারিখে বিয়ের কথা পাকা করে এক কেজি বাসি সন্দেশ হাতে বাসায় ফিরলেন। মেয়ের নাম হোসনে আরা। লালমাটিয়া কলেজে বি. এ. পড়ে। গায়ের রং ময়লা হলেও মাথাভর্তি চুল।

বজলুর রহমান রাতে খেতে বসে খুব আগ্রহের সাথে হোসনে আরার লম্বা চুলের গল্প করতে গিয়ে লক্ষ করলেন, তাঁর স্ত্রী মনোয়ারা কোনো রকম আগ্রহ দেখাচ্ছে না। শুধু তাঁর মেয়ে দুলারী চোখ বড় বড় করে শুনছে। বজলুর রহমান তৃপ্ত গলায় বললেন, 'মেয়ের চুল ১.২২ মিটার লম্বা।'

কেউ তেমন বিস্মিত হল না, শুধু দুলারী বলল, 'তুমি কি গজফিতা দিয়ে মেপেছ?'

'আমি মাপব কেন? ওরা নিয়মিত মাপে।'

'তাহলে তো আমাদেরও মাপতে হবে। তুমি একটা গজফিতা কিনে এন তো বাবা।'

তিনি বিরক্ত গলায় বললেন, 'তুই এমন বাঁকা কথা বলছিস কেন? কী হল?'

দুলারী বলল, 'এক মিটার সমান কত ফুট তুমি কি জান, বাবা?'

'না, জানি না।'

'তোমার উচিত ছিল ওদের জিজ্ঞেস করা। মিটারের হিসাব তো সবাই জানে না,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গজ–ফুটের হিসাব জানে।'

বজলুর রহমান চিন্তিত মুখে মেয়ের দিকে তাকালেন। মেয়েটা কেমন যেন কাটা কাটা কথা বলছে। ধমক দেবেন কিনা বুঝতে পারছেন না। দুলারী তাঁর বড়ই আদরের মেয়ে। তাকে ধমক দেয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব না। তাছাড়া দুদিন পর মেয়ের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। বাপের বাড়িতে যে কটা দিন থাকবে আদরে থাকুক।

দুলারী বড়ই খেয়ালি ধরনের মেয়ে। ইন্টারমিডিয়েটে পড়তে পড়তে পড়া ছেড়ে দিল। বই নিয়ে বসলেই তার নাকি মাথা ধরে। বজলুর রহমান মেয়ের বিয়ে দেয়ার চেষ্টা করলেন। সে বিয়েও করবে না।

'মূর্খ অবস্থায় বিয়ে করব নাকি? শ্বশুরবাড়িতে রোজ কথা শুনতে হবে। আগে ইন্টারমিডিয়েট পাস করি, তারপর বিয়ে।'

বজলুর রহমান বিস্মিত হয়ে বললেন, 'তুই তো পড়াশোনাই ছেড়ে দিয়েছিস, পাস করবি কীভাবে?'

'মাথা–ধরা রোগটা কমলেই পড়াশোনা শুরু করব।'

চার বছর ঘরে বসে থাকার পর দুলারী আবার কলেজে ভর্তি হয়েছে। নিয়মিত কলেজে যাচ্ছে। রাত জেগে পড়াশোনা করছে। এমন খেয়ালি মেয়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলা মুশকিল। বজলুর রহমান তাল মিলিয়ে চলার চেষ্টা বাদ দিয়েছেন। মেয়ের সঙ্গে কথা যা বলার তা তিনি মেয়ের মার মাধ্যমে বলার চেষ্টা করেন। এই যে মেয়ে এখন ক্যাট ক্যাট করে কথা বলছে, তাকে একটা ধমক দেয়া উচিত, তা দিতে পারছেন না। দুলারীকে ধমক দেয়ার সমস্যা আছে। ধমক দিলে সে কিছুই বলবে না, নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেবে। তার দরজা বন্ধ মানে ভয়াবহ ব্যাপার। একবার কাঠমিস্ত্রি এনে দরজা কাটাতে হয়েছিল। করাত–ফরাত এনে কেলেঙ্কারি কাণ্ড।

দুলারী বলল, 'বাবা, তুমি কি হোসনে আরা বেগমের লম্বা চুলের কোনো সেম্পল এনেছ?'

'না।'

'ভুল করেছ। সেম্পল আনা দরকার ছিল।'

বজলুর রহমান নিজেকে সামলাতে পারলেন না। স্ত্রীকে বললেন, 'তোমার মেয়েকে এখান থেকে যেতে বল তো।'

দুলারী উঠে চলে গেল। বজলুর রহমান বললেন, 'ওর কী হয়েছে?'

মনোয়ারা চাপা গলায় বললেন, 'সর্বনাশ হয়েছে!'

'সর্বনাশ হয়েছে মানে?'

'খাওয়া শেষ কর, তারপর বলব।'

বজলুর রহমান তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করতে গিয়ে গলায় কৈ মাছের কাঁটা লাগিয়ে ফেললেন। কৈ মাছের কাঁটা কৈ মাছের মতোই জীবন্ত হয়ে থাকে, যতই সময় যায় কাঁটা ততই ভেতরের দিকে ঢুকতে থাকে। বজলুর রহমান ব্যথায় অস্থির হলেন। একটু পর পর বলেন, 'এর চেয়ে মরণ ভালো ছিল।' এই সময়ে স্বামীকে দুঃসংবাদ দেয়া ঠিক হবে কিনা মনোয়ারা বুঝতে পারেন না। বজলুর রহমান যখন বললেন, 'কী ঘটনা বল।' তখন তাঁকে ঘটনা বলতে হল। ঘটনা শুনে বজলুর রহমানের চোখ কপালে উঠে গেল। তিনি কৈ মাছের কাঁটার ব্যথা ভুলে গেলেন। থমথমে গলায় বললেন, 'হারামজাদা আলতাফ কোথায়? হারামজাদার চামড়া ছিলে লবণ মাখিয়ে সিলিং ফ্যানের সাথে ঝুলিয়ে দেব। ডাক হারামজাদাকে।'

মনোয়ারা বললেন, 'ও বাসায় নেই।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'দুলারীকে ডাক।'

'ওকে ডাকা যাবে না।'

ঘটনা আসলেই ভয়াবহ। দুলারী আজ সকাল দশটায় কলেজে যাবার জন্যে তৈরি হয়ে মার কাছে রিকশা ভাড়া চাইতে এসে খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলেছে, 'মা, আমি এখন একটা কথা বলব, শুনেই হৈচৈ শুরু করবে না। কথাটা হল, আমি আলতাফ ভাইকে বিয়ে করব। হোসনে আরা-ফোসনে আরার কথা ভুলে যাও।'

মনোয়ারা হতভম্ব গলায় বললেন, 'কী বললি?'

দুলারী বলল, 'কী বলেছি তা তো শুনেছ। ভালো করেই শুনেছ। আবার জিজ্ঞেস করছ কেন? রিকশা ভাড়া দাও, মা। দশ টাকা দেবে। ছেঁড়া নোট দিও না আবার। একদিন ছেঁড়া নোট নিয়ে যা যন্ত্রণায় পড়েছিলাম!'

মনোয়ারা রিকশা ভাড়া এনে দিলেন এবং ভাবলেন দুলারী ঠাট্টা করছে। ঠাট্টা তো বটেই। ঠাট্টা ছাড়া আর কি?

তিনি রোজ দুপুরে শরৎচন্দ্রের দেবদাস উপন্যাসের শেষ দশ পাতা পড়ে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমাতে যান। আজ ঘুমাতে পারলেন না। যোহরের নামায পড়লেন এবং মেয়ের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

দুলারী কলেজ থেকে ফিরে সহজ গলায় বলল, 'পানি দাও তো মা, পিপাসা হয়েছে।'

মনোয়ারার বুক থেকে পাষাণ নেমে গেল। যাক, কোনো সমস্যা তাহলে নেই। তিনি পানি এনে দিলেন। হাসিমুখে বললেন, 'আজ কলেজে কী হল রে?' দুলারী বলল, 'কিছু হয় নি। তুমি কি বাবাকে বলেছ?

'কী বলব?'

'কলেজে যাবার আগে তোমাকে যে বলে গেলাম?'

'কী বলে গেলি?'

'তুমি ভালোই জান কী বলে গেছি। তুমি বাবাকে বলে রাজি করাবে। না হলে...'

'না হলে কী?'

'তোমরা রাজি না হওয়া পর্যন্ত আমি দরজা বন্ধ করে বসে থাকব। দরজা খুলব না, ভাত খাব না।'

'তুই কি পাগল হয়ে গেছিস?'

'হ্যাঁ।'

'তোর বাবা তোকে খুন করে ফেলবে।'

'খুন করলে খুন করবে।'

দুলারী সত্যি সত্যি তার ঘরের দরজা বন্ধ করে ফেলল। অবশ্যি মনোয়ারা দরজায় ধাক্কা দিতেই দরজা খুলল। তবে ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'তোমাদের চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিলাম, মা। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কিছু না করলে আমি র‍্যাটম খাব।' এই হল ঘটনা।

বজলুর রহমান বললেন, 'র‍্যাটম কী?'

'র‍্যাটম হল ইঁদুর-মারা বিষ। ঘরে এক ফাইল ছিল, সেটা এখন দুলারীর কাছে।'

বজলুর রহমান দীর্ঘ সময় ঝিম ধরে বসে রইলেন। গলায় বিঁধে থাকা মাছের কাঁটার কথা তাঁর মনে রইল না। মনোয়ারা বললেন, 'এখন কী করবে?'

বজলুর রহমান থমথমে গলায় বললেন, 'হারামজাদাকে আমি খুন করব। হারামজাদা কোথায়?'

'রোজ তো এই সময় বাসাতেই থাকে, আজ কোথায় যেন গেছে।'

'মাছ কাটার বঁটিটা আমার কাছে দাও, তারপর দেখ কী করি। শুয়োর কা বাচ্চা।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমার মনে হয় আলতাফ কিছু জানে না। তোমার মেয়েটা শয়তানের ঘোড়া, হাড়–বজ্জাত। বঁটি দিয়ে কাটতে হয় ওকে কাট।'

'পালের গোদা আগে শেষ করি। তারপর তোমার মেয়েকে ধরব। আমি এখন কবি নজরুল। আমার চক্ষে পুরুষ–রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই। বঁটি কই? বঁটি আন।'

বঁটি আনার আগেই আলতাফ হোসেন উপস্থিত হল। বজলুর রহমান বললেন, 'কোথায় গিয়েছিলি?'

'রাস্তায় হাঁটতে গিয়েছিলাম, মামা। মাথা জাম হয়ে ছিল, ভাবলাম একটু হাঁটি।'

'মাথা জাম হয়ে ছিল?'

'জ্বি মামা।'

'এখন জাম দূর হয়েছে ?'

'জ্বি না। এখনো আছে।'

'সারা জীবনের জন্যে জাম দূর করার ব্যবস্থা করছি। এই জীবনে আর জাম লাগবে না।'

'জ্বি আচ্ছা।'

আলতাফ ভেতরের দিকে রওনা হল। বজলুর রহমান হুংকার দিলেন, 'যাস কোথায়?'

'ভাত খেতে যাই, মামা।'

ক্ষুধার্ত মানুষের সঙ্গে রাগারাগি করা যায় না। বজলুর রহমান অনেক কষ্টে নিজেকে সামলালেন, গম্ভীর গলায় বললেন, 'যা, ভাত খা। ভাত খেয়ে বিছানা–বালিশ নিয়ে বিদায় হয়ে যাবি। এই জীবনে তোর মুখ দর্শন করতে চাই না।'

আলতাফ অবাক হয়ে বলল, 'কোথায় যাব?'

'কোথায় যাবি আমি কি জানি? যেখানে ইচ্ছা যা। মনোয়ারা, হারামজাদাটাকে ভাত দাও।'

আলতাফ ভয়ে ভয়ে বলল, 'কী হয়েছে মামা?'

'ভাত খেয়ে আয়, তারপর বুঝবি কত ধানে কত চাল।'

আলতাফ বলল, 'ভাত দিন মামি।'

মনোয়ারা বললেন, 'ভাত টেবিলে বাড়া আছে, নিজে নিয়ে খাও।'

আলতাফ ভাত খেল। মামার কথামতো সুটকেস গুছাল। মামা তাকে যেতে বলেছেন, কাজেই যেতে হবে। মামার সঙ্গে তর্ক করা বা তাঁর অবাধ্য হওয়া তার পক্ষে সম্ভব না। বজলুর রহমান বললেন, 'কোথায় যাবি কিছু ভেবেছিস?'

'জ্বি না, মামা।'

'রেল স্টেশনে চলে যা। খবরের কাগজ বিছিয়ে প্লাটফরমে শুয়ে থাকবি।'

'জ্বি আচ্ছা।'

আলতাফ নিচু হয়ে মামাকে সালাম করল। বজলুর রহমানের ইচ্ছা করছিল লাথি দিয়ে শুয়োরের বাচ্চাকে চিৎ করে ফেলে দেন, অনেক কষ্টে নিজেকে সামলালেন। আলতাফ চলে গেল। সারা রাত বজলুর রহমানের ঘুম হল না। কৈ মাছের কাঁটার যন্ত্রণাতেই ঘুম হল না। ভোররাতে ঠিক করলেন, মেডিকেল কলেজে যাবেন। এই যন্ত্রণা পোষার কোনো মানে হয় না। মেডিকেল কলেজে একা যাওয়া যায় না, কাউকে সঙ্গে নিতে হয়। তিনি আলতাফের খোঁজে কমলাপুর রেল স্টেশনে গেলেন। সে সত্যি সত্যি একটা ইত্তেফাক বিছিয়ে তার উপর গম্ভীর হয়ে বসে আছে। মামাকে দেখেই সে বলল, 'কাঁটা এখনো আছে মামা?'

'না। কাঁটা তুলতে যাচ্ছি। তুই চল আমার সঙ্গে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সুটকেস নিয়ে যাব?'

'নিয়ে যাবি না তো কার কাছে রেখে যাবি?'

বজলুর রহমান কাঁটা তুললেন। আলতাফকে নিয়ে বাসায় ফিরলেন। আলতাফের এক হাতে সুটকেস, অন্য হাতে কাগজে মোড়া মাছের কাঁটা। মামার গলার কাঁটা সে ফেলে আসতে রাজি হয় নি। কাগজে মুড়ে নিয়ে এসেছে। বাসায় ফিরে বজলুর রহমান স্ত্রীকে ডেকে বললেন, 'গাধাটার সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ে দিতে আপত্তি আছে ? আপত্তি না থাকলে ঝামেলা চুকিয়ে দাও।

'মনোয়ারা বললেন, 'দেখ, তুমি যা ভালো বোঝ। তবে বিয়ে দেয়াই ভালো। তোমার মেয়ে হয়েছে কচ্ছপের মতো। কামড় দিয়ে যেটা ধরবে সেটা আর ছাড়বে না। বিয়ে না দিলে শেষমেষ কী করে বসে কে জানে। র‍্যাটম নিয়ে বসে আছে।'

'ওর কপালে আছে র‍্যাটম। জীবন্ত র‍্যাটম। তোমার মেয়েকে বল, র‍্যাটমের সঙ্গে বিয়ের ব্যবস্থা হচ্ছে। তবে একটা কথা শুনে রাখ— এই মেয়ের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক শেষ। বিয়ের পর এদের আমি ঘাড় ধরে বের করে দেব। এই বাড়ির দরজা চিরকালের জন্য বন্ধ।'

'ওরা যাবে কোথায়? খাবে কী?'

'সেটা ওদের ব্যাপার।'

'বিয়ে কবে দিচ্ছ?'

'গাধাটাকে জিজ্ঞেস করে একটা তারিখ ঠিক কর।'

আলতাফকে জিজ্ঞেস করা হল, সে মাথা নিচু করে বলল, 'বিয়ে করব না।'

বজলুর রহমান কঠিন গলায় বললেন, 'ফাজলামির জায়গা পাস না! বিয়ে করবি না মানে? তোর ঘাড়ে বিয়ে করবে।'

'চাকরি-বাকরি নাই।'

'কোনো অজুহাত শুনতে চাই না, আগামী রোববার তোর বিয়ে।'

'জ্বি আচ্ছা, মামা।'

'হাতে মাছের কাঁটা নিয়ে ঘুরছিস কেন? ফেল্ মাছের কাঁটা।'

আলতাফ মাছের কাঁটা ফেলে দিল।

'ঘরের ভেতর ফেললি কী মনে করে? যা, রাস্তায় ফেলে দিয়ে আয়।'

আলতাফ কাঁটা হাতে বের হয়ে গেল। বজলুর রহমান মনোয়ারাকে বললেন, 'দুলারীকে গিয়ে বল, রোববারে বিয়ের তারিখ হয়েছে।'

মনোয়ারা বললেন, 'আর একটু চিন্তাভাবনা করলে হত না?'

'একবার যখন বলেছি রোববার, তখন রোববারই হবে। মানুষের জবানের দাম আছে।'

'কিছু সময় তো লাগবেই। বিয়ের কেনাকাটা করব না?'

'গাধার সঙ্গে বিয়ের আবার কেনাকাটা কি? কেনাকাটার নামও মুখে আনবে না।'

'আমাদের একটাই মেয়ে।'

'একটাই হোক আর দশটাই হোক, কেনাকাটা হবে না। এটা আমার ফাইনাল কথা। তোমার পছন্দ হলে ভালো, পছন্দ না হলেও ভালো।'

আলতাফ ফিরে এসেছে। ভীত চোখে তাকাচ্ছে মামার দিকে। বজলুর রহমান বললেন, 'কিছু বলবি?'

'কাঁটা রাস্তায় ফেলে দিয়ে এসেছি, মামা।'

'আহ! বিরাট কাজ করেছিস। আয় কোলে এসে বোস, আদর করি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলেই তাঁর মনে হল, আলতাফ সত্যি সত্যি তাঁর কোলে বসার জন্যে এগিয়ে আসতে পারে। প্রথম শ্রেণীর গাধারা করতে পারে না হেন কাজ নেই।

আলতাফ অবশ্যি মামার কোলে বসার চেষ্টা করল না। ঘরের সিলিং ফ্যানের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর মুখে মাথা চুলকাতে লাগল। তাকে দেখে মনে হতে পারে, ফ্যান কেন ঘোরে এই রহস্য নিয়ে সে এখন চিন্তিত।

বজলুর রহমান হুংকার দিয়ে বললেন, 'ঐ গাধা, ফ্যানের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছিস কেন? সিলিং ফ্যান আগে কখনো দেখিস নি? চোখ নামা।'

আলতাফ চোখ নামাল।

'যা আমার সামনে থেকে।'

আলতাফ ঘর থেকে বের হয়ে এল। আসন্ন বিয়ের আনন্দে তাকে খুব উল্লসিত বলে মনে হল না। বজলুর রহমান শুকনো মুখে বসে রইলেন। তাঁর মনোকষ্টের যথেষ্ট কারণ আছে। দুলারীর বিয়ে বলতে গেলে ঠিকই হয়ে আছে। ছেলের ফুপা-ফুপু এসে মেয়ে দেখে হাতে আঙটি পরিয়ে গেছেন। অতি সস্তা ধরনের আঙটি। রং দেখে মনে হয় পেতলের। আঙটি সাইজেও ছোট। যাতাযাতি করে ঢোকাতে গিয়ে দুলারীর আঙুলের চামড়া উঠে গেল। হুলস্থূল ধরনের বড়লোকরা উপহারের ব্যাপারে হাড়-কেপ্পন হয়। ওরা হুলস্থূল ধরনের বড়লোক। ছেলের চেহারা ভালো। মাথায় অবশ্যি চুল নেই। এই বয়সে টাক পড়ে গেছে। এটা তেমন গুরুতর কোনো সমস্যা না। ছেলেরা মাথার চুল দিয়ে কী করবে? এদের তো আর মাথায় বেণি করতে হবে না? তাছাড়া পয়সাওয়ালা লোকদেরই মাথায় টাক পড়ে। আজ পর্যন্ত তিনি মাথায় টাকওয়ালা কোনো ভিক্ষুক দেখেন নি। যারা ভিক্ষা করে বেড়ায় তাদের মাথাভর্তি ঘন চুল থাকে।

আলতাফ হারামজাদাটারও মাথাভর্তি ঘন চুল। একসময় সেও ভিক্ষুক-টিক্ষুক কিছু হবে। একে দয়া দেখানো ভুল হয়েছে। বিরাট ভুল হয়েছে। মিসটেক অব দি সেঞ্চুরি।

বজলুর রহমানের ধারণা তিনি ভুল করেন না। এই ভুল এখন ভেঙে গেছে। দুধকলা দিয়ে কালসাপ পুষেছেন। কালসাপকে বাড়ির ত্রিসীমানায় আসতে দেয়া উচিত ছিল না। তিনি শুধু যে আসতে দিয়েছেন তাই না, বলতে গেলে আদর করে ঘরে স্থান দিয়েছেন। তাও দিতেন না। গ্রহের ফেরে এই কাজটা করতে হয়েছে। ঘটনাটা এ রকম—বজলুর রহমানের ছোটবোন মিনুর ছেলে হল আলতাফ।

বজলুর রহমান মিনুকে পছন্দ করেন না। মিনুর স্বামী মোবারক হোসেনকে দু চোখে দেখতে পারেন না। মোবারক হোসেনের একটা ডিস্‌পেনসারি আছে। সেই ডিস্‌পেনসারিতে আয়-উন্নতি বলে কিছু নেই। কারণ ডিস্‌পেনসারি খোলা এবং বন্ধ করার কোনো নিয়মকানুন নেই। যখন ইচ্ছা হল মোবারক ডিস্‌পেনসারি খুলে বসে আছে। যখন ইচ্ছা ডিস্‌পেনসারি বন্ধ করে বাসায় চলে আসছে। ডিস্‌পেনসারির বেশিরভাগ ওষুধ নিজেই খেয়ে ফেলছে। এই হল অবস্থা। মিনু যখন অসুস্থ হল সে তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল না। নিজেই চিকিৎসা করে। ওষুধ যে বেচে সে নাকি ডাক্তারের বাবা।

ডাবল অ্যাকশান এন্টিবায়োটিক প্লাস উপবাস চিকিৎসাপদ্ধতি নামে তার নিজস্ব চিকিৎসা পদ্ধতি চলল। এই চিকিৎসা পদ্ধতিতে নিরম্বু উপবাসে থেকে এন্টিবায়োটিক খেতে হয়। এতে ওষুধের অ্যাকশান নাকি ডাবল হয়ে যায়। শরীরে পুষ্টি না থাকলে শরীরের জীবাণুদেরও পুষ্টি থাকে না। এরা আধমরা অবস্থায় থাকে—তখন কড়া এন্টিবায়োটিক পড়লে আর দেখতে হবে না।

মোবারক হোসেনের চিকিৎসা পদ্ধতির কারণেই মিনু আঠার দিন জ্বরভোগের পর মারা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেল। মোবারক হোসেন আলতাফকে কোলে নিয়ে মৃত্যুসংবাদ দিতে এল।

বজলুর রহমান গম্ভীর মুখে মৃত্যুসংবাদ শুনলেন। দীর্ঘ সময় চুপচাপ থেকে বললেন, 'ডাক্তার শেষ পর্যন্ত দেখাও নি?'

মোবারক হোসেন বললেন, 'ডাক্তার আর কী দেখাব? ডাক্তাররা কী জানে?'

'ডাক্তাররা কিছু জানে না। তুমি সব জান?'

'আপনাদের দোয়ায় ওষুধ নিয়ে ঘাঁটাঘাটি করে যা শিখেছি, ভালোই শিখেছি।'

'এখন এই দুধের শিশু কে পালবে?'

'আলতাফের কথা বলছেন? তাকে নিয়ে মোটেই চিন্তা করবেন না। আমিই পালব। তা ছাড়া তাকে দুধের শিশু বলা ঠিক না। দুবছর হয়ে গেছে। কথা প্রায় সবই বোঝে। বলতে পারে না। পিরিচে ভাত মাছ দিলে কপ কপ করে খায়।'

'ও আচ্ছা।'

মোবারক হোসেন অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে বলল, 'আলতাফ, ইনি তোমার মামা হন। বড় মামা। বল তো— মামা।'

আলতাফ বলল, "উঁ উঁ।'

মোবারক হৃষ্টচিত্তে বলল, 'ও এইভাবেই কথা বলে। মামা বলতে বলেছি তো, কজেই সে দুবার বলেছে উঁ-উঁ। কারণ মামা শব্দটায় দুটা অক্ষর। মা বলতে বললে একবার উঁ বলবে। কারণ মা হল এক অক্ষরের শব্দ।'

'বাবু বল তো 'মা'।

আলতাফ বলল, 'উঁ।'

মোবারক হোসেন আনন্দিত স্বরে বলল, 'দেখলেন ছেলের বুদ্ধি!'

বজলুর রহমান থমথমে গলায় বললেন, 'গতকাল তোমার স্ত্রী মারা গেছে। আজ তুমি দাঁত বের করে হাসছ!'

'অন্য প্রসঙ্গে হাসছি। ছেলের বুদ্ধি দেখে হাসছি। সব বাবারাই ছেলেমেয়ের বুদ্ধির পরিচয় পেলে খুশি হয়ে হাসে।'

'তোমার বুদ্ধিমান ছেলেকে নিয়ে তুমি বিদায় হয়ে যাও। আর কোনোদিন যেন তোমাকে এ বাড়িতে না দেখি।'

'জ্বি আচ্ছা। কিছু খরচ-বরচ কি দিবেন?'

'কী খরচ?'

'হাত একেবারে খালি। গোর দিতে অনেক খরচপাতি— কাফনের কাপড়ই আপনার দশ গজ। মার্কিন লংক্লথ সস্তাটা হল নিন আপনার পঁচিশ . . .'

'দূর হও বললাম। দূর হও। ভক ভক করে মুখ থেকে কীসের গন্ধ বেরুচ্ছে। মদ্য পান করেছ?'

'জ্বি না। মদ খাই না। একটু কাশির মতো হয়েছিল, দুবোতল কফ সিরাপ এক সাথে খেয়ে ফেলেছি। কফ সিরাপে কিছু এলকোহল থাকে। তবে খুব সামান্য।'

বজলুর রহমান কঠিন গলায় বললেন, 'বিদায় হও। বিদায়।'

মোবারক হোসেন বিদায় হল।

বজলুর রহমানের রাগ বেশিক্ষণ থাকে না। সেদিন সন্ধ্যাবেলাতেই মনে হল কাজটা ঠিক হয় নি, কিছু পয়সা দিয়ে দেয়া উচিত ছিল। বড় ভাই হিসেবে তাঁরও একটা দায়িত্ব আছে। অপ্রিয় হলেও দায়িত্ব পালন করতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে এও মনে হল — এ জাতীয় লোকদের কোনো সাহায্য করতে নেই। এদের সাহায্য করার অর্থই হচ্ছে এদের প্রশ্রয় দেয়া। টাকার অভাবে একজন মৃত মানুষের কবর হবে না এটাও বিশ্বাস্য নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বজলুর রহমান রাত এগারটার দিকে ঠিক করলেন— খোঁজ নিতে যাবেন। যাওয়া হল না। প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি শুরু হল। বাসার সামনে একহাঁটু পানি জমে গেল। তিনি গেলেন পরদিন।

মোবারকের বাড়ির দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। অনেকক্ষণ ধাক্কাধাক্কি করার পর মোবারক দরজা খুলল। পুরোপুরি খুলল না, সামান্য ফাঁক করে ভীত গলায় বলল, 'কে?'

বজলুর রহমান বললেন, 'আমি। দরজা খোল।'

মোবারক দরজা খুলল। তার মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে কোনো কারণে ভয় পেয়েছে। চোখ রক্তবর্ণ। ঠোঁটের পাশ দিয়ে কষ গড়াচ্ছে। তারচেয়ে বড় কথা হাত পা কাঁপছে। মৃত বাড়িতে অনেক লোকজন থাকার কথা। আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী। একটা মানুষ নেই। তবে ভেতর থেকে বিজবিজ শব্দ আসছে। বজলুর রহমান বললেন, 'শব্দ কীসের?'

মোবারক হোসেন নিচু গলায় কী বলল এক বিন্দু বোঝা গেল না।

বজলুর রহমান বললেন, 'এ রকম করছ কেন?'

'ভেতরে এসে দেখেন।'

'কী দেখব?'

'বিরাট বিপদে পড়েছি।"

বজলুর রহমান মোবারকের সঙ্গেই তার শোবার ঘরে ঢুকলেন। তাঁর হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। ঘরভর্তি তেলাপোকা। হাজার হাজার বললেও কম বলা হবে— লক্ষ লক্ষ পোকা। তাদের হাঁটা, পাখায় পাখায় ঘষাঘষি থেকেই বিজবিজ শব্দ আসছে। পোকাদের মাঝখানে শান্তমুখে বসে আছে আলতাফ। তার চোখে ভয় বা বিস্ময় কিছুই নেই। সে বজলুর রহমানকে দেখে দুবার বলল, 'উঁ উঁ।'

বজলুর রহমান বললেন, 'ব্যাপারটা কী'?

মোবারক ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল, 'তেলাপোকা।

'তেলাপোকা সে তো দেখতেই পাচ্ছি। কোথে কে এল এত তেলাপোকা?'

'জানি না।'

'অন্য ঘরেও আছে, না শুধু এই ঘরে?'

'এই ঘরে। মিনুর ডেডবডি এই ঘরে ছিল। তেলাপোকায় খেয়ে ফেলেছে।'

'তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?'

'জ্বি না, মাথা খারাপ হয় নাই। সত্যি কথা বলতেছি। আপনার কাছে টাকার জন্য গিয়েছিলাম। না পেয়ে মনটা খুব খারাপ হল।

'বাবুকে ঘরে রেখে আবার বের হলাম টাকার সন্ধানে।'

'তাকে তুমি খালি বাড়িতে রেখে গেলে?'

'জ্বি। ভেবেছিলাম তাড়াতাড়ি ফিরে আসব। ঝড়বৃষ্টিতে আটকা পড়ে গেলাম। ফিরে দেখি এই অবস্থা।'

'তুমি একটা দুধের শিশুকে খালি বাড়িতে, একটা ডেডবডির পাশে বসিয়ে চলে গেলে!'

'জ্বি। না গিয়ে তো উপায় ছিল না। হাতে নাই একটা পয়সা।'

'একটা মানুষ মারা গেছে — কোনো লোকজন নাই। এইটাই-বা কেমন কথা?'

'কাউকে বলি নাই তো।'

'বল নাই কেন ?'

'কী দরকার! বললেই লোকজন এসে গিজগিজ করবে। হেন কথা তেন কথা বলবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দরকার কী?'

'তোমার মাথা পুরোপুরি খারাপ।'

'জ্বি না, ভাই সাহেব। মাথা ঠিক আছে।'

'আমি এই ছেলেকে সাথে নিয়ে যাচ্ছি। কয়েকদিন থাক আমার এখানে। তুমি অবস্থা ঠিকঠাক করে তারপর নিয়ে যাবে।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'আর এই নাও এক হাজার টাকা।'

'আপনাকে এক সপ্তাহের মধ্যে ফেরত দিয়ে দিব।'

'ফেরত দিতে হবে না।'

'আমি ফেরত দিয়ে দিব। এক সপ্তাহের মধ্যে ফেরত দিব।'

মোবারক হোসেন এক সপ্তাহের মধ্যে টাকা ফেরত দিতে এল না। বরং আরো টাকা ধার করতে এল। সে নাকি ভয়াবহ ঝামেলায় পড়েছে। পুলিশের ধারণা, সে তার স্ত্রীকে খুন করেছে। তারপর রটিয়েছে তেলাপোকা খেয়ে ফেলেছে।

মোবারক কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, 'পুলিশ বড় যন্ত্রণা করতেছে ভাইসাব। শুধু টাকা চায়।'

'খুন করেছ নাকি?'

'জ্বি না, আমি খুন করব কেন?'

'তোমার চোখ-মুখ দেখে তো মনে হয় করেছ?'

'জ্বি না। তবে পুলিশের ধারণা, করেছি। ৩০২ ধারায় কেইস দিবে বলে মনে হয়। আপনি একটু আমার হয়ে সাক্ষ্য দিবেন।'

'বজলুর রহমান আঁতকে উঠে বললেন, 'আমি আবার কি সাক্ষ্য দিব?'

'তেলাপোকা যে খেয়ে ফেলেছে এইটা একটু বলবেন। আপনি তো নিজের চোখে তেলাপোকা দেখেছেন।'

'আমি কিছুই দেখি নাই। টাকা দিতেছি, টাকা নিয়ে যাও। আমি যেন কোনো ঝামেলায় না পড়ি।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'আর শোন, তোমার ছেলে নিয়ে যাও।'

'জ্বি, নিয়ে যাব। আজকেই নিয়ে যেতাম, আজ আবার এখান থেকে রমনা থানায় যাব। টাকা আপনার কাছ থেকে যা পাব সবটা পুলিশকে দিয়ে দিব। কালপরশু এসে নিয়ে যাব।'

মোবারক আর ফিরে আসে নি। পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে। মামলা চলাকালীন সময়ে সে মারা গেছে জেল হাজতে। আলতাফ থেকে গেছে এই বাড়িতে। তার আত্মীয়স্বজন কেউ তাকে নিতে আসে নি। মনে হয় সবাই হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে।

২

বারই চৈত্র, রোববার, আজিমপুর কম্যুনিটি সেন্টারে বিয়ে হয়ে গেল।

আলতাফ আগে থাকত রান্নাঘরের পাশে খুপড়ি মতো জানালাবিহীন একটা ঘরে। বিয়ের পর সে উঠে গেল দোতলায় দুলারীর ঘরে। তার জীবনযাত্রায় পরিবর্তন বলতে এইটুকুই। তবে স্ত্রীর ভাগ্যের কারণেই হোক কিংবা অন্য যে কোনো কারণেই হোক সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটি চাকরি পেয়ে গেল। ভালো চাকরি, সিটি ব্যাংকের অ্যাসিস্ট্যান্ট কেশিয়ার। বেতন তিন হাজার টাকা, মেডিকেল আছে, যাতায়াতের এলাউন্স আছে।

বজলুর রহমান বললেন, 'এই গাধাকে যে চাকরি দিয়েছে, সে আরো বড় গাধা, রামগাধা। তাকে ঘাড় ধরে দেশ থেকে বের করে দেয়া উচিত।'

মনোয়ারা বললেন, 'এত ঘন ঘন গাধা বোলো না তো। দুলারী মনে কষ্ট পাবে।'

'কষ্ট পেলে পাবে, গাধাকে গাধা বলব না তো কী বলব? ক্যাঙ্গারু বলব?'

'কিছুই বলতে হবে না, মেয়ের জামাই চাকরি পেয়েছে— এ তো ভালো কথা। বেচারা নিজের চেষ্টায় জোগাড় করেছে। মন্ত্রী-মিনিস্টার ধরাধরি করতে হয় নি। কত আনন্দের ব্যাপার।'

'আনন্দ দুদিন পর টের পাবে। টাকা-পয়সার গণ্ডগোলের জন্যে বাবাজীকে যখন জেলে নিয়ে ঢুকাবে তখন বুঝবে আনন্দ কাহাকে বলে। কয়েকটা দিন সবুর কর, এক সপ্তাহ, এর মধ্যেই রেজাল্ট আউট হয়ে যাবে। এক সপ্তার বেশি যদি গাধাটাকে কেউ চাকরিতে রাখে, আমি নিজের কান কেটে কুত্তার লেজে সুতা দিয়ে বেঁধে দেব।'

মাসখানিক কেটে গেল, চাকরি যাওয়ার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। সকাল আটটায় টিফিন বক্সে টিফিন নিয়ে আলতাফ রওনা হয়। আলতাফের সঙ্গে যায় দুলারী। সে তাকে বাসস্টপ পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসে। দুলারীর হাতে থাকে একটা চটের ব্যাগ। সেই ব্যাগে থাকে একটা পানির বোতল, ছোট্ট ফ্লাস্কে এক কাপ গরম দুধ এবং এক কৌটা পানের মসলা।

দুলারীর কাণ্ডকারখানায় বজলুর রহমান বড়ই বিরক্ত। মনোয়ারাকে একদিন ডেকে বলে দিলেন, 'দুলারী সঙ্গে যায় কেন? গাধাটা কি বাসস্টপ চেনে না? দুলারীকে নিষেধ করে দেবে। বাড়াবাড়ি আমি পছন্দ করি না। ঢং বেশি হয়ে যাচ্ছে।'

মনোয়ারা নিষেধ করেছেন। আদুরে গলায় বললেন, 'কী দরকার রোজ রোজ সাথে যাওয়ার? তোর বাবা রাগ করে।'

দুলারী হাই তুলতে তুলতে বলেছে, 'করুক রাগ।'

'বাড়াবাড়ি বেশি হচ্ছে।'

'মোটেই বেশি হচ্ছে না। তুমি তা ভালো করেই জান।'

বাড়াবাড়ি বেশি হচ্ছে না এটা অবশ্যি সত্যি। স্বামীকে নিয়ে ঢলাঢলি, ছাদে হাঁটাহাঁটি, অকারণ হাসাহাসি এইসব কিছুই হচ্ছে না। সন্ধ্যা না হতেই দরজা বন্ধ করে এরা গুজগুজ করে গল্পও করে না। খুব অন্যায় জেনেও তিনি কয়েকবার আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে দেখেছেন। আলতাফ চেয়ারে ঝিম ধরে বসে থাকে। দুলারী নিজের কাজ করে। যেন কেউ কাউকে চেনে না। বজলুর রহমান সব শুনে বলেছেন, 'ঝিম ধরে বসে থাকে না, ঘুমায়। চতুষ্পদ জন্তুরা ঘুমায় দাঁড়িয়ে। ও ঘুমায় বসে। এইটুকুই যা তফাৎ। আর কোনো তফাৎ নেই।' মনোয়ারা একদিন কথায় কথায় দুলারীকে জিজ্ঞেসও করে ফেললেন, 'আলতাফ কি চেয়ারে বসে বসে ঘুমায় নাকি রে?'

দুলারী বিরক্ত হয়ে বলেছে, 'চেয়ারে বসে ঘুমাবে কেন? এইসব কী আজেবাজে কথা বল?'

'প্রায়ই দেখি চোখ বন্ধ করে চেয়ারে বসে থাকে।'

'তাতে অসুবিধা কি?'

'না, অসুবিধা আর কি! দেখতে খারাপ লাগে।'

'তোমাকে দেখতে বলেছে কে?'

'তুই এমন ক্যাট ক্যাট করছিস কেন? আমি একটা কথার কথা বললাম।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ওকে নিয়ে তোমরা সারাক্ষণ সমালোচনা কর আমার ভালো লাগে না। বেচারা কারো সাতে নেই পাঁচে নেই, চুপচাপ থাকে, আর তোমরা . . .'

'কী যন্ত্রণা! কেঁদে ফেলছিস কেন? আমরা কী এমন বললাম?'

'বাবা তো তাকে সারাক্ষণই গাধা বলছে। চুপচাপ থাকলেই মানুষ গাধা হয়ে যায়? চুপচাপ থাকাটা কি অপরাধ?'

'অপরাধ হবে কেন? একেবারে ঝিম ধরে থাকে তো, তাই . . .

'মোটেই ঝিম ধরে থাকে না, বসে বসে ভাবে।'

'কী ভাবে?'

'নানান কিছু নিয়ে ভাবে, তোমরা বুঝবে না। ও পোকাদের নিয়ে ভাবে।'

'পোকাদের নিয়ে ভাবে!'

'হ্যাঁ। পোকামাকড় এইসব নিয়ে ভাবে।'

মনোয়ারা শুকনো গলায় বললেন, 'পোকামাকড়দের নিয়ে ভাবা তো ভালো কথা। শুনে খুব আনন্দ হচ্ছে।

'তুমি আবার বাবাকে এসব বলতে যেও না। বাবা কি বুঝতে কী বুঝবে। বাবা তো আবার সবকিছু বেশি বোঝে।'

'আরে না, তোর বাবাকে সব কথা বলার দরকার কি? পুরুষ মানুষকে সব কথা বলতে নেই, এতে সংসারের শান্তি নষ্ট হয়। তা ইয়ে, আলতাফ কি দিনরাত পোকাদের নিয়েই ভাবে?'

দুলারী বিরক্ত গলায় বলল, 'দিনরাত পোকাদের নিয়ে ভাববে কেন? ওর কি আর কাজকর্ম নেই। মাঝেমধ্যে ভাবে। তুমি আবার বাবাকে কিছু বলতে যেও না।'

'পাগল হয়েছিস, তাঁকে বলার দরকার কি?'

মনোয়ারা সেই রাতেই স্বামীকে ফিসফিস করে পোকার ব্যাপারটা বললেন।

বজলুর রহমান বললেন, 'আরে, গাধাটার তো ব্রেইন ডিফেক্ট হয়ে গেছে। পোকা নিয়ে ভাবে মানে? পোকা নিয়ে ভাবার কী আছে? গাধাটাকে ডাক।'

'থাক, ডাকতে হবে না।'

'অবশ্যই ডাকতে হবে। অবহেলা করার ব্যাপার এটা না।'

'পরে একসময় ওকে আলাদা করে ডেকে মানে দুলারী যাতে কিছু বুঝতে না পারে।'

বজলুর রহমান বিরক্ত গলায় বললেন, 'কোনো রকম আর্গুমেন্টে যাবে না। আই হেট আর্গুমেন্ট। তুমি গাধাটাকে ডেকে আন। আজই এর ফয়সালা হওয়া উচিত। পোকাদের নিয়ে ভাবে, পোকাদের রবীন্দ্রনাথ হয়েছে। হারামজাদা!'

মনোয়ারা ডাকতে গেলেন। দুলারী বলল, 'এই রাতদুপুরে বাবা ডাকছে কেন?'

মনোয়ারা ক্ষীণ গলায় বললেন, 'ঐ অফিসে কাজকর্ম কেমন হচ্ছে তাই জিজ্ঞেস করবে।'

'তুমি পোকার ব্যাপার বাবাকে কিছু বল নি তো?'

'না।'

আলতাফ মামার ঘরে ঢুকে ভয়ে ভয়ে বলল, 'মামা ডেকেছেন?'

বজলুর রহমান বললেন, 'বোস। মামা ডাকবি না, খবরদার।'

'কী ডাকব?'

'কিছুই ডাকতে হবে না। ডাকাডাকির পালা শেষ।'

আলতাফ বসল। বজলুর রহমান গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, 'তুই নাকি পোকাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়ে ভাবিস?'

'জ্বি মামা?'

'কী ভাবিস?'

'তেমন কিছু না, মামা। ওদের সঙ্গে কথা-টথা বলি, ওরা যখন চুপ করে থাকে তখন ভাবি।'

বজলুর রহমান হতভম্ব হয়ে বললেন, 'ওদের সঙ্গে কথা বলিস?'

'জ্বি মামা।'

'কবে থেকে কথা বলাবলি শুরু হয়েছে?'

'যখন আপনার এখানে আসলাম তখন থেকে।'

'আমার এখানে এসেছিস দুবছর বয়সে, তখন থেকে পোকাদের সঙ্গে তোর দোস্তি?'

'দোস্তি না মামা। ওরা যে আমাকে ঠিক পছন্দ করে তা না। সবাই আমাকে ভয় পায়। ভয়ের কারণে কিছু কিছু কথা শোনে।'

'পোকারা তাহলে তোর ভয়ে কম্পমান ?'

আলতাফ হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। বজলুর রহমান মনে মনে বললেন, 'গাধাটার তো আসলেই ব্রেইন ডিফেক্ট হয়ে গেছে। ব্রেইনে ইলেকট্রিক শক দিতে হবে।' তিনি স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ঘটনা শুনছ তো? পোকারা আমাদের আলতাফকে হেডমাস্টার সাহেবের মতো ভয় পায়। আলতাফের ভয়ে তারা থরহরি কম্পমান।'

'আপনি যত বলছেন ওরা তত ভয় পায় না মামা। কিছুটা ভয় পায়।'

'ভয়ের চোটে ওরা কী করে ? তোকে দেখলেই স্লামালিকুম দেয় ?'

'তা না, তবে ডাকলে আসে।'

বজলুর রহমান স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'শুনলে তো, আলতাফ ডাকলেই পোকারা যে যেখানে থাকে ছুটে আসে।' মনোয়ারা অস্বস্তির সঙ্গে বললেন, 'আরেকদিন এইসব নিয়ে কথা হবে। আজ রাত অনেক হয়েছে।' তিনি হাই তোলার ভঙ্গি করলেন।

বজলুর রহমান বললেন, 'রাত যতই হোক ব্যাপারটার ফয়সালা হওয়া দরকার।' আলতাফ, দেখি তুই তোর এক পোকা ডেকে আন।'

'একটা তেলাপোকা ডেকে আনব মামা?'

'ডাক, তেলাপোকাই ডাক। তেলাপোকাই-বা খারাপ কি?'

আলতাফ চোখ বন্ধ করে বিড়বিড় করল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উড়তে উড়তে ঘরে একটা তেলাপোকা ঢুকল। বসল সিলিং ফ্যানের পাখায়।

আলতাফ বলল, 'এই, নিচে নাম।'

পোকা নিচে নামল। বসল মেঝেতে। আলতাফ বলল, 'শুঁড় দুটা নাড়্ তো।'

তেলাপোকা শুঁড় নাড়াতে লাগল। বজলুর রহমান নিজের অজান্তেই আয়াতুল কুরসি সুরাটা মনে মনে পড়ে ফেললেন।

আলতাফ বলল, 'মামা, ওকে কি চলে যেতে বলব?'

'বল্।'

আলতাফ বলল, 'চলে যা।'

পোকা গেল না। শুঁড় নাড়তে লাগল। একবার পাখা তুলে উড়ার ভঙ্গি করল। আবার পাখা নামিয়ে ফেলল।

মনোয়ারা বললেন, 'কই যাচ্ছে না তো।'

'যেতে চাচ্ছে না মামি। এরা সবসময় কথা শোনে না।'

তেলাপোকা চক্রাকারে ঘুরছে। আলতাফ বলল, 'এই, ঘোরা বন্ধ কর।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘোরা থেমে গেল।

'যা, চলে যা।'

পোকা নড়ল না। স্থির হয়ে গেল।

বজলুর রহমান গম্ভীর গলায় বললেন, 'যেতে না চাইলে কি আর করা!' আলতাফ বলল, 'মামা, আমি যাই? ঘুম পাচ্ছে।'

বজলুর রহমান গম্ভীর গলায় বললেন, 'যা।'

আলতাফ উঠে চলে গেল। বজলুর রহমান এবং মনোয়ারা দুজনের কেউই অনেকক্ষণ কোনো কথা বললেন না। চুপচাপ বসে রইলেন। মনোয়ারা প্রথম নীরবতা ভংগ করলেন। ফিসফিস করে বললেন, 'এটা কী হল?'

বজলুর রহমান রাগী গলায় বললেন, 'কীসের কথা বলছ?'

'পোকা তো সত্যি সত্যি ওর কথা শোনে।'

'কোন কথাটা শুনেছে?'

'ওর কথা শুনে পোকা ঘরে এসেছে।'

'তোমারও কি মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? পোকা কথা শুনবে মানে? কাকতালীয়ভাবে একটা তেলাপোকা ঘরে এসেছে। এই হল ব্যাপার। ঝড়ে বক মরে গেছে, আর ফকির সাহেব বললেন, দেখলি, দোয়া কুনুত পড়ে ফুঁ দিলাম আর বক মরে পড়ে গেল। ব্যাপার এর বেশি কিছু না।'

'শুঁড় নাড়তে বলল, শুঁড় নাড়ল।'

'কী যন্ত্রণা! পোকা শুঁড় নাড়ে না? কুকুর যেমন লেজ নাড়ে পোকা নাড়ে শুঁড়। ওদের কাজই হল শুঁড় নাড়া।'

'আমার ভয়-ভয় লাগছে।'

'ফালতু কথা বলবে না। ভয়ের এর মধ্যে কী আছে?'

বজলুর রহমান ঘুমাতে গেলেন। তাঁর ভালো ঘুম হল না। রাতে কয়েকবার উঠলেন। পানি খেলেন, বাথরুমে গেলেন। যতবারই বাথরুমে গেলেন ততবারই লক্ষ করলেন তেলাপোকাটা যায় নি। মেঝেতে ঘুরঘুর করছে। অবশ্যি এটা আগের পোকা নাও হতে পারে। হয়তো অন্য একটা। চায়নিজদের মতো সব তেলাপোকাও দেখতে একরকম। একটার সঙ্গে অন্য একটা আলাদা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব না। তাঁর মনে হল পোকাটা তাঁর দিকে তাঁকিয়ে আছে। শুধু যে তাকিয়ে আছে তাই না, ঘাড় ঘুরিয়ে তাঁকে দেখার চেষ্টা করছে। তিনি পোকাটার গায়ে থু করে থুতু ছিটিয়ে দিলেন, তারপরেও সেটা নড়ল না বরং তাঁর দিকে খানিকটা এগিয়ে এল। এ কী যন্ত্রণা! তিনি বললেন, 'যা হারামজাদা।'

পোকাটা থমকে গেল। এখন আবার শুঁড় নাড়ছে।

'শুঁড় নাড়া বন্ধ কর্ হারামীর বাচ্চা।'

পোকাটা শুঁড় নাড়া বন্ধ করল। বজলুর রহমান এক দৃষ্টিতে পোকাটার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

৩

আজ অসহ্য গরম। বিকেলে এক পশলা বৃষ্টি হয়েছিল, এতে গরম আরো বেড়েছে। এই গরমেও আলতাফের ঘরের দুটি জানালাই বন্ধ। শুধু যে বন্ধ তাই না, পর্দাও টেনে দেয়া। জানালা খোলা রেখে আলতাফ ঘুমাতে পারে না। ঘরে আলো থাকলেও সে ঘুমাতে পারে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না। আলতাফের অভ্যাসে দুলারী অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে, এখন আর তার খারাপ লাগে না। এই ঘরের সঙ্গে এটাচড্ বাথরুম আছে। বাথরুমও অন্ধকার। চল্লিশ পাওয়ারের একটা বাল্ব ছিল, আলতাফ সেই বাল্ব খুলে রেখেছে। অন্ধকারে আলতাফের অসুবিধা হয় না, তবে দুলারীর হয়। সে একটা টর্চলাইট নিয়ে বাথরুমে যায়।

আজকের অন্ধকার অন্যসব রাতের চেয়েও বেশি, কারণ বাসার সামনে স্ট্রিট ল্যাম্পের বাল্ব আবার চুরি হয়েছে। অন্ধকার বাথরুমে আলতাফ হাত–মুখ ধুচ্ছে। দুলারী খাটের উপর মশারি খাটাচ্ছে। আন্দাজের উপর খাটাচ্ছে, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। দুলারী বলল, 'আজ খুব গরম।'

আলতাফ বলল, 'হুঁ।'

'একটা জানালা খুলে দেই?'

'না।'

'মশারির ভেতর ফ্যানের বাতাস ঢোকে না। গরম লাগে।'

'মশারি খাটিও না।'

'মশারি না খাটালে উপায় আছে? মশা খেয়ে ফেলবে না?'

'মশা খাবে না, ওদের না করে দেব।'

আলতাফের কথায় অন্য কেউ চমকে উঠত, 'দুলারী চমকাল না, এরকম কথা সে প্রায়ই শোনে। দুলারী মশারি খুলে ফেলল। আলতাফ তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বাথরুম থেকে বেরুল। দুলারী বলল, 'বাবা তোমাকে কেন ডেকেছিলেন?'

'পোকাদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন।'

'তুমি বলেছ?'

'হুঁ।'

'কেন বলেছ?'

'মামা জানতে চাইলেন তাই বললাম। না বলার কী আছে?'

'বাবা কি তোমার কথা বিশ্বাস করেছেন?'

'বিশ্বাস করবেন না কেন?

'আমার মনে হয় না বাবা তোমার কথা বিশ্বাস করেছেন। তোমাকে নিয়ে এখন নিশ্চয়ই মার সঙ্গে হাসাহাসি করছেন। সাধারণ কিছু বললেই বাবা হাসাহাসি করেন, আর এখন বলছ অদ্ভুত কথা।'

'মামা আমাকে স্নেহ করেন। তা ছাড়া অদ্ভুত কথা তো কিছু বলি নাই।'

'বাবা তোমাকে মোটেই স্নেহ করেন না। সারাক্ষণ গাধা ডাকেন।'

আলতাফ হাই তুলতে তুলতে বলল, 'ঘুম পাচ্ছে, চল শুয়ে পড়ি।'

দুলারী বলল, 'তুমি আমার একটা কথা শোন। এইসব কথা তুমি কাউকে বলবে না। কাউকে কিছু বলার দরকার নেই।'

আলতাফ বিছানায় উঠতে উঠতে বলল, 'আমি নিজ থেকে বলি না, মামা জিজ্ঞেস করলেন . . .

'জিজ্ঞেস করলেও কিছু বলবে না। তোমাকে নিয়ে কেউ হাসাহাসি করলে আমার ভালো লাগে না। রাগ লাগে, কান্না পায়।'

আলতাফ পাশ ফিরতে ফিরতে সহজ গলায় বলল, 'পোকাগুলো তো সারাক্ষণ হাসাহাসি করে।'

'করুক। ওদের হাসি তো আর কেউ বুঝতে পারছে না।'

আলতাফ কিছু বলল না। ঘর নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। দুলারী বলল, 'ঘুমিয়ে পড়েছ?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলতাফ জবাব দিল না। তার নিশ্বাস ভারি হয়ে এসেছে। হাত-পা লম্বালম্বি ছড়ানো। মনে হচ্ছে তালগাছের একটা লম্বা গুঁড়ি। এই এক ঘুমেই সে রাত কাবার করে দেবে। সকালে দুলারী জেগে উঠে দেখবে— আলতাফ একই ভঙ্গিতে শুয়ে আছে। দুলারী ছোট করে নিশ্বাস ফেলল। তার আরো কিছুক্ষণ গল্প করার ইচ্ছা ছিল।

মাথার উপর ফ্যান ঘুরছে, তবু গরম কমছে না, গরমে মাথা ধরে যাচ্ছে। মশা কামড়াচ্ছে। মশারা এখন আর আলতাফের কথা শুনছে না। দুলারী মনে মনে হাসল। মানুষটা কী অদ্ভুত বিশ্বাস নিয়েই না আছে— পোকারা তার কথা শোনে। অবশ্যি এরকম বিশ্বাস থাকা দোষের কিছু না। তার এই বিশ্বাসে তো কারো কোনো ক্ষতি হচ্ছে না। আলতাফের চেয়েও কত ভয়ংকর সব বিশ্বাস নিয়ে পৃথিবীতে লোকজন বাস করে। নিজের প্রস্রাব নিজেই গ্লাসে করে খেয়ে ফেলছে— এতে নাকি শরীর রোগহীন হয়। আরেকবার দুলারী পত্রিকায় পড়েছে, শিকাগোতে এক লোক আট বছর বয়েসী একটা মেয়েকে খুন করে তার জরায়ু বের করে খেয়ে ফেলেছে। এতে নাকি যৌবন অক্ষয় হয়। এদের তুলনায় আলতাফের বিশ্বাস তো খুব সাধারণ। তাছাড়া কে জানে আলতাফ হয়তো পোকাদের কথা বুঝতেও পারে। অসম্ভব কিছু না। সোলায়মান পয়গম্বর পৃথিবীর সব পশুপাখিদের কথা বুঝতেন।

দুলারী পাশ ফিরল। মশা খুব কামড়াচ্ছে। টেবিলের উপর একটিন মর্টিন আছে। স্প্রে করে ঘরে ছড়িয়ে না দিলে মশারা তাকে ঘুমাতে দেবে না। দুলারী সাবধানে বিছানা থেকে নামল। টেবিলটা কোন দিকে দুলারী বুঝতে পারছে না। অন্ধকার হলেই মানুষ দিকহারা হয়ে পড়ে। পশ্চিমকে মনে হয় উত্তর, উত্তরকে মনে হয় দক্ষিণ।

দুলারী ওষুধ স্প্রে করে দিল। ঘরে এখন হাসপাতাল-হাসপাতাল গন্ধ। নাক জ্বালা করছে। মশার কামড়ের চেয়ে নাক জ্বালা বরং ভালো। দুলারী বিছানায় ফিরে এল। আলতাফ অস্ফুট শব্দ করল। বিড়বিড় বিড়বিড় করে কি যেন বলে যাচ্ছে। দুলারী বলল, 'কী বলছ?' আলতাফ বলল, 'হুঁ।'

'ঘুমাচ্ছ?

'হুঁ।'

'মশার ওষুধ দিয়েছি। তোমার খারাপ লাগছে না তো?'

'হুঁ।'

'আজ একেবারে গায়ে ফোসকা পড়ে যাবার মতো গরম পড়েছে।'

'হুঁ।'

'ইচ্ছে করছে গায়ের সব কাপড় খুলে ফেলতে।'

'হুঁ।'

দুলারী জানে এই 'হুঁ' অর্থহীন। যাই জিজ্ঞেস করা হোক আলতাফ বলবে— 'হুঁ।' ঘুমের মধ্যেই বলে যাবে। দুলারীর ঘুম আসছে না। একা জেগে থাকা বেশ কষ্টের। জেগে থাকলেই কথা বলতে ইচ্ছা করে। ঘুমন্ত মানুষের সঙ্গে কথা বলার কোনো মানে হয় না, তবে আলতাফ ঘুমের মধ্যেই হুঁ হুঁ করে, এও মন্দ না।

'এই শোন।'

'হুঁ।'

'অফিসে তোমার কাজকর্ম কেমন হচ্ছে?'

'হুঁ।'

কেউ আবার ভাবছে না তো তুমি পাগল কিংবা বোকা?'

'হুঁ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমি একদিন তোমাদের অফিসে যাব। তোমাকে জানিয়ে যাব না, না জানিয়ে যাব। চুপি চুপি যাব। বোরকা পরে যাব যাতে তুমি চিনতে না পার। নিজের চোখে দেখে আসব তুমি কী কর।'

'হুঁ।'

'তোমাদের অফিসে ক্যান্টিন আছে? থাকলে ক্যান্টিনে চা খাব।'

গরম যেন আরো বাড়ছে। গা বেয়ে ঘাম ঝরছে। দুলারীর মনে হল, গায়ের কাপড় খুলে ফেললে কেমন হয়? অন্ধকারে কে আর দেখতে আসছে? আলতাফ যে জেগে উঠবে তাও না। আর জাগলেও বাতি জ্বালবে না। দুলারী তার গায়ের সব কাপড় খুলে ফেলল। এখন একটু আরাম লাগছে। গায়ে বাতাস লাগছে। আবার নিজেকে কেমন জানি পোকা-পোকা লাগছে। পোকাদের গায়ে কোনো কাপড় থাকে না। আলতাফ বিড়বিড় করেই যাচ্ছে। কী বলছে সে? দুলারী শোনার চেষ্টা করছে। অর্থহীন সব শব্দ— কিঁছ খিঁচ ঝিঁঝ ঝিঁঝ। পোকারা কি এমন শব্দ করে? দুলারী আলতাফের গায়ে হাত রাখল। কী ঠাণ্ডা শরীর!

'এই শুনছ? শুনছ?'

'হুঁ।'

'পানি খাবে?'

'খাব।'

'তোমার ঘুম ভেঙেছে?'

'ভেঙেছে।'

আলতাফ উঠে বসল। বিস্মিত গলায় বলল, 'তুমি নেংটো হয়ে শুয়ে আছ কেন?'

ঘর অন্ধকার, আলোর সামান্যতম ইশারাও নেই। এর মধ্যে মানুষটা বুঝল কী করে তার গায়ে কাপড় নেই? দুলারী অস্বস্তির সঙ্গে বলল, 'বড় গরম!'

আলতাফ বলল, 'ও আচ্ছা।' দুলারী অন্ধকারেই হাতড়ে হাতড়ে পানির বোতল এবং গ্লাস নিয়ে এল। আলতাফ এক চুমুকে পানি শেষ করেই আবার শুয়ে পড়ল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তার নিশ্বাস ভারি হয়ে গেল। সে তলিয়ে গেল গভীর ঘুমে।

দুলারীর শরীর জ্বালা করছে। বুক ধক ধক করছে। সে আবারো ডাকল, 'এই, এই।' 'আলতাফ বলল, 'কি?'

'ঘুমিয়ে পড়েছিলে নাকি?'

'হুঁ।'

'এখনো কি ঘুমাচ্ছ? তুমি তো আবার ঘুমের মধ্যেও হুঁ হুঁ কর।'

'না ঘুমাচ্ছি না।'

দুলারী ক্ষীণ স্বরে বলল, 'তোমার সঙ্গে গল্প করতে ইচ্ছা করছে।'

'গল্প কর।'

'তুমি একটা গল্প বল। আমি শুনি।'

আলতাফ বলল, 'আমি তো গল্প জানি না।'

'সত্যি জান না?'

'না।'

'তাহলে কথা বল। যা ইচ্ছা বল। তোমার কথা শুনতে ভালো লাগে।'

আলতাফ পাশ ফিরতে ফিরতে বলল, 'আমার কথা বলতে ভালো লাগে না। তুমি বল আমি শুনি।'

দুলারী আলতাফের গায়ে হাত রাখতে রাখতে বলল, 'আমাকে বিয়ে করে তুমি কি খুশি হয়েছ?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'খুশি–অখুশির কী আছে?'

'তুমি আমাকে ভালবাস না?'

আলতাফ ক্লান্ত গলায় বলল, 'ভালবাসাবাসির এখানে কী আছে? পোকারা ব্যবস্থা করে দিয়েছে বলে তুমি আমাকে বিয়ে করেছ।'

'পোকারা ব্যবস্থা করে দিয়েছে?'

'হ্যাঁ। ওরা তোমার মাথাটা গণ্ডগোল করে রেখেছে বলেই তুমি সারাক্ষণ আমার জন্য পাগল হয়ে থাক।'

'এইসব তুমি কী বলছ?'

আলতাফ হাই তুলতে তুলতে বলল, 'এতদিন আমি তোমাদের এখানে আছি, কখনো তো আমার জন্য তোমার টান ছিল না। হঠাৎ বিয়ের জন্যে পাগল হয়ে গেলে। পোকারা তোমাকে পাগল বানিয়ে দিল। এরা এইসব পারে।'

দুলারী রাগী গলায় বলল, 'পোকারা এটা করল কেন?'

'পোকারা করল কারণ ওরা আমাকে খুব পছন্দ করে। ওরা বোধহয় ভেবে বের করেছে— তোমাকে বিয়ে করলেই আমার ভালো হবে। ওরা আমার ভালো দেখেছে।'

'তোমার পোকামাকড়ের ব্যাপার আমি মোটেই বিশ্বাস করি না।'

'আচ্ছা।'

'এ ধরনের গাঁজাখুরি গল্প আমার সঙ্গে কখনো করবে না।'

'আচ্ছা।'

'তুমি ঘুমাতে চাইলে ঘুমাও, আর কথা বলতে ইচ্ছা করছে না।'

'আচ্ছা।'

আলতাফ পাশ ফিরল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল। বাকি রাতটা দুলারী কাটাল নির্ঘুম। নানান অদ্ভুত চিন্তাভাবনা তার মাথায় আসতে লাগল। যেন সে একটা পোকা হয়ে গেছে। খুব সুন্দর একটা পোকা। অনেকেই তাকে দেখতে আসছে। আলতাফও এল। সে মুগ্ধ গলায় বলল, "বাহ্ কী সুন্দর! কী সুন্দর! এই, তোমরা একটা ক্যামেরা নিয়ে আস। আমি দুলারীর একটা ছবি তুলে রাখি।"

আলতাফ ছবি তুলছে। কী অদ্ভুত কাণ্ড— আলতাফও একটা পোকা হয়ে গেছে! দুলারী বলল, 'এই, শোন শোন।' আলতাফ পোকাদের ভাষায় বলল, 'খিছ খিছ খিছ।' দুলারী এর মানে বুঝতে পারল। এর মানে হল— "দুলারী, হাসিমুখে তাকাও। আমি ছবি তুলছি। ছবি তোলার সময় কেউ এমন গম্ভীর হয়ে থাকে?"

পোকাদের ভাষার এই হল মজা। মাত্র তিনটা শব্দ— খিছ খিছ খিছ। অথচ কত কিছ বোঝা যাচ্ছে।

৪

বজলুর রহমান সাধারণত ফজর ওয়াক্তে জেগে উঠেন। নামায পড়ে মর্নিং ওয়াকে যান। ঘণ্টাখানিক হাঁটাহাঁটি করে নাশতা খান। এই রুটিনের নড়চড় খুব একটা হয় না। আজ হল। গত রাতে বলতে গেলে ঘুম একেবারেই হয় নি। শেষ রাতের দিকে চোখ একটু ধরে এসেছিল, ওমনি বিশ্রী বিশ্রী স্বপ্ন দেখতে শুরু করলেন। স্বপ্নে একটা ধবধবে সাদা রঙের তেলাপোকা এসে তাঁকে ইংরেজিতে বলল, 'How are you Mr. B. Rahman?' তিনি বাংলায় বললেন, 'যা, ভাগ।' তেলাপোকা বিস্মিত হয়ে বলল, (এবার হিন্দিতে),' কিয়া তুম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আংরেজি নেহি জানতে?'

আতঙ্কেই বজলুর রহমানের ঘুম ভেঙে গেল। রাতটা বিছানায় বসে বসেই কাটিয়ে দিলেন।

এখন সকাল নটা। তিনি নাশতা খেতে খাবার ঘরে এসেছেন। তাঁর মাথা ভার ভার হয়ে আছে। চোখ জ্বালা করছে। তিনি লক্ষ করলেন, রুটি গলা দিয়ে নামছে না। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে। এক টুকরা রুটি মুখে নিয়ে অনেকক্ষণ চিবানোর পর পানি দিয়ে গিলে ফেলতে হচ্ছে। একরাত ঘুম না হওয়ার এত সমস্যা? তিনি বিরক্তমুখে ডাকলেন, 'মনোয়ারা!'

'কি?'

'যদি খুব কষ্ট না হয় তাহলে কাছে এসে একটু শুনে যাও।'

মনোয়ারা দ্রুত উঠে এলেন। কুণ্ঠিত গলায় বললেন, 'কাঁচা আমের আচার বানাচ্ছি। দুলারী কদিন থেকে বলছে। কী জন্যে ডেকেছ?'

বজলুর রহমান স্ত্রীকে কেন ডেকেছেন মনে করতে পারলেন না, তবে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হলেন। কারণ তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে তাঁর রাতের ঘুমের কোনো অসুবিধা হয় নি। গত রাতে কী ঘটেছে না-ঘটেছে তাও বোধহয় মনে নেই। 'রাতে ঘুম হয়েছিল?'

'যা গরম! ঘুম কি আসে?'

'দেখে তো মনে হয় মরার মতো ঘুমিয়েছ।'

মনোয়ারা হকচকিয়ে গেলেন। মনে হচ্ছে মরার মতো ঘুমিয়ে তিনি অপরাধ করেছেন। বজলুর রহমান বললেন, আলতাফকে ডাক, ওর সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।'

'ও তো অফিসে চলে গেছে।'

'অফিস দশটায়, এখন বাজে নটা।'

'বাস পায় না, ভিড় হয়, এইজন্যে আগে আগে যায়।'

'দুলারীকে ডাক।'

'ও তো আলতাফের সঙ্গে গেছে। আলতাফকে বাসে উঠিয়ে দিয়ে কলেজে চলে যাবে।'

তিনি থমথমে গলায় বললেন, 'আলতাফকে কি কোলে করে বাসে তুলে দিতে হয়?' মনোয়ারা বললেন, 'তুমি চট করে রেগে যাচ্ছ। তোমার শরীর মনে হয় খারাপ। দেখি, জ্বর আছে কিনা। ও আল্লা, জ্বর আছে তো। বেশ জ্বর। যাও, বিছানায় গিয়ে শুয়ে থাক। 'বজলুর রহমান শোবার ঘরে চলে গেলেন। ঘরে ঢুকেই তাঁর ভ্রূ কুঞ্চিত হল। তেলাপোকাটা এখনো ঘুরঘুর করছে। বজলুর রহমানকে দেখে পরিচিত ভঙ্গিতে কাছে এগিয়ে এল। এটা কাল রাতের তেলাপোকা কিনা তা বোঝা যাচ্ছে না। অন্য একটাও হতে পারে। ঘরে তেলাপোকার উপদ্রব হয়েছে, পোকা মারার ওষুধ কিনতে হবে। আজই কিনতে হবে। এখন কিনে আনলেই হয়। পরে মনে থাকবে না।

বজলুর রহমান জ্বর নিয়েই পোকা মারার ওষুধ কিনতে বের হলেন। বাজারে অনেক ধরনের ওষুধ আছে— Kill Them, Finish, Rouche Killer, Vanish. তিনি কিনলেন দুফাইল 'কিল দেম'। নামটা সুন্দর। কিল দেম। তাদের মার, শুধু মার, মেরে শেষ করে দাও। শুয়োরের বাচ্চা। এদের শুয়োরের বাচ্চা বলা ঠিক না। এরা তারচেয়েও খারাপ। কিল দেম বোতালের গায়ে লেখা— এটি বিষাক্ত অসুধ। স্প্রে করার সময় হাতে গ্লাভস্ পরে নেবেন। রাতের বেলায় ঘরের কোনায়, কমোডে, বেসিনে, ভাড়ার ঘরে ছড়িয়ে দেবেন। পরপর তিনরাত ওষুধ দেবেন। পনের দিন বিরতির পর আবার ওষুধ দেবেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওষুধের তেজ কেমন পরীক্ষা করার জন্যে বজলুর রহমান দিনের বেলাতেই ওষুধ স্প্রে করলেন। গ্লাভস্ ছাড়াই করলেন, তিনি গ্লাভস্ কিনতে ভুলে গিয়েছিলেন।

Kill Them ওষুধ হিসেবে মন্দ না। পোকাটার গায়ে স্প্রে করার সঙ্গে সঙ্গে কাজ হল। পোকাটা একবার উড়ার চেষ্টা করেই চিৎ হয়ে পড়ে গেল। কয়েকবার শুঁড় নেড়েই স্থির হয়ে গেল। বজলুর রহমান হৃষ্টচিত্তে বললেন, শুয়োর কা বাচ্চা।' বলেই মরা পোকাটার গায়ে আরো কয়েকবার 'কিল দেম' স্প্রে করে দিলেন। তার মনে হিংস্র এক ধরনের আনন্দ হল। অনেক দিন তিনি এধরনের আনন্দ পান নি। প্রচণ্ড আনন্দের জন্যেই ঘাম দিয়ে তাঁর জ্বর চলে গেল। ক্ষুধা বোধ হল।

দুলারী কলেজ থেকে ফিরতেই মনোয়ারা তাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে ফিসফিস করে বললেন, 'তোর বাবার সঙ্গে কিন্তু খুব সাবধানে কথা বলবি। খুব সাবধান!'

দুলারী ভীত গলায় বলল, 'বাবার কী হয়েছে?'

'বুঝতে পারছি না। মনে হয় রাতে গরমের জন্যে ভালো ঘুম হয় নি। সকাল থেকে ছট্‌ফট্ করছে। কি যেন দোকান থেকে কিনে এনেছে। ঘরে ঘরে দিচ্ছে। বোটকা গন্ধ।'

'জিনিসটা কী?'

'জানি না। জিজ্ঞেস করি নি। যা মেজাজ করে রেখেছে জিজ্ঞেস করতেও ভয় লাগে। তুই তোর বাবার সঙ্গে সাবধানে কথা বলিস। না ডাকলে কাছে যাবি না।'

'আচ্ছা।'

বজলুর রহমান মেয়েকে ডাকলেন না। দুলারী নিজ থেকেই কৌতূহলী হয়ে বাবার ঘরে ঢুকল। ক্ষীণ গলায় বলল, 'কেমন আছ বাবা?'

বজলুর রহমান জবাব দিলেন না। মেয়ের দিকে তাকালেনও না। দুলারী বলল, 'তোমার কি শরীর খারাপ?'

'না। জ্বর ছিল, এখন নেই।'

'দেখে কিন্তু মনে হচ্ছে শরীর খারাপ। মা বলছিল তোমার রাতে ঘুম হয় নি। ঘুম না হওয়ারই কথা। যা গরম! আমারও রাতে ঘুম হয় নি।'

'আলতাফ! আলতাফের ঘুম হয়েছে?'

'ঘুম নিয়ে তো ওর কোনো সমস্যা নেই বাবা। ভর-দুপুরে ওকে যদি একটা কম্বল দিয়ে ছেড়ে দাও, ও আরাম করে নাক ডাকিয়ে ঘুমাবে।'

বজলুর রহমান মেয়ের কথায় তেমন মজা পেলেন না। তাঁর মুখ আরো কঠিন হয়ে গেল। তিনি শুকনো গলায় বললেন, 'ওর মাথাটা কি খারাপ?'

দুলারী হকচকিয়ে গিয়ে বলল, 'মাথা খারাপ হবে কেন?'

'কাল রাতে আমাকে বলল, ও পোকাদের কথা শুনতে পায়। পোকারাও ওর কথা শোনে। এইসব হাবিজাবি।'

'বাবা, এটা হল ওর একটা খেয়াল।'

'খেয়াল?'

'হ্যাঁ, খেয়াল। ও অবশ্যি বিশ্বাস করে।'

'তুই বিশ্বাস করিস?'

'ফিফটি ফিফটি করি বাবা।'

'ফিফটি ফিফটি মানে?'

'কিছুটা করি কিছুটা করি না। মানুষ পোকার কথা কী করে শুনবে, এটা যখন মনে হয় তখন বিশ্বাস করি না। আবার যখন দেখি ও মশাদের কামড়াতে নিষেধ করল, অমনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মশারা কামড়ানো বন্ধ করল, তখন কিছুটা বিশ্বাস হয়।'

বজলুর রহমান থমথমে গলায় বললেন, 'মশারা ওর কথায় কামড়ানো বন্ধ করে দেয়? সব গান্ধিবাদী মশা?'

দুলারী বলল, 'সবসময় যে কামড়ানো বন্ধ করে তা না, মাঝে মাঝে করে।'

বজলুর রহমান বালিশের নিচ থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করতে করতে বললেন, 'আলতাফের স্থান হওয়া উচিত পাগলাগারদে। শুধু ওর একার না — তোরও। মিয়া বিবি দুজনেরই। কোনো মানুষ যদি একনাগাড়ে অনেক দিন পাঁঠার সঙ্গে থাকে, তাহলে তার গা থেকে পাঁঠার মতো গন্ধ বের হয়। এই-ই নিয়ম। তোর গা থেকেও পাঁঠার মতো গন্ধ বেরুচ্ছে।'

'এরকম করে কথা বলছ কেন বাবা?'

'তোদের চাপকানো উচিত। তা না করে ভদ্র ভাষায় কথা বলছি। যা আমার সামনে থেকে।'

দুলারী কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, 'আমি জানি তুমি ওকে দেখতে পার না। আমাকেও না। আমরা তোমার সঙ্গে থাকব না। আলাদা বাসা নেব।'

'যা ইচ্ছা কর। এখন আমার সামনে থেকে যা।'

দুলারী প্রায় ছুটে বের হয়ে গেল।

৫

আলতাফ মাথা নিচু করে লেজার বইয়ে লিখে যাচ্ছে। একটা দশ বাজে, টিফিন টাইম। অফিসের মূল হলঘর প্রায় ফাঁকা। সবাই ভিড় করেছে ক্যান্টিনে।

গনি সাহেব আলতাফের পাশের টেবিলে বসেন। তিনি পান মুখে দিতে দিতে বললেন, 'করছেন কী আলতাফ সাহেব?'

আলতাফ হাসল। গনি সাহেব বললেন, 'একটা থেকে দুটা হচ্ছে রেস্ট পিরিয়ড। রেস্ট পিরিয়ডে কাজ করলে আয়ু কমে যায়। রেস্ট পিরিয়ডে অফিসের কোনো কাজ করবেন না। যত জরুরি কাজই থাকুক হাত গুটিয়ে বসে থাকবেন। পান খাবেন। সিগারেট খাবেন। পা নাড়বেন। খবরের কাগজ পড়বেন। কিন্তু ভুলেও কাজ করবেন না।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'খাওয়াদাওয়া করেছেন?'

'জ্বি।'

'চা খাবেন নাকি? চলুন চা খেয়ে আসি।'

'আমি দুপুরে চা খাই না।'

'চায়ের কোনো সকাল-দুপুর নেই। আসুন তো আমার সঙ্গে।'

আলতাফ মাথা নিচু করে বলল, 'এখন কোথাও যাব না।'

গনি সাহেব বিস্মিত হলেন। তাঁর মুখের উপর কেউ কখনো না বলে না। এই অফিসে তিনি অতি জনপ্রিয় একজন মানুষ। পরপর কয়েক বছর ধরেই অফিসার্স ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট। তিনি যে নিজ থেকে চায়ের দাওয়াত দিলেন এটা কম কথা না। কিন্তু মানুষটা বোধহয় এর গুরুত্ব ধরতে পারছে না। মনে হচ্ছে নির্বোধ ধরনের মানুষ। কেউ না বললে তা হজম করা গনি সাহেবের স্বভাব নয়। তিনি আলতাফের সামনে চেয়ার টেনে বসলেন। হাসিমুখে বললেন, 'অফিসের কাজকর্ম কেমন হচ্ছে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'জ্বি ভালো হচ্ছে।'

'অসুবিধা হলে বলবেন।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'বড় কর্তাদের সাথে ঝামেলা হলেও বলবেন। আগের দিন এখন নেই, বুঝতে পারছেন?'

আলতাফ চুপ করে রইল। গনি সাহেব যথেষ্ট বিরক্ত হলেন। একটা বোকাবোকা ধরনের লোককে কাছে টানা যাচ্ছে না, এ কেমন কথা? লোকটা কি তার গুরুত্ব বুঝতে পারছে না? বিপদে না পড়লে বুঝতে পারবে না। বিপদে শিগ্‌গিরই পড়বে। তখন ছুটে আসতে হবে তাঁর কাছেই। দাঁত থাকতে মানুষ দাঁতের মর্যাদা বোঝে না, এ তো অতি পুরাতন কথা।

'যাই আলতাফ সাহেব।'

'আচ্ছা।'

আলতাফ পাঁচটা পর্যন্ত চেয়ারে বসে রইল। পাঁচটার ঘণ্টা পড়ার পর ফাইল গোছাতে শুরু করল, ঠিক তখন বড় সাহেবের পিয়ন এসে বলল, 'স্যার আফনেরে বুলায়।' যে কোনো বুদ্ধিমান মানুষ পিয়নের ডাকের ধরন থেকে বুঝে ফেলবে বড় সাহেবের মেজাজ ঠিক না। আলতাফ কিছু বুঝতে পারল না।

বড় সাহেবের নাম মনসুর আলি। ছোটখাটো ধরনের মানুষ। তিনি প্রচণ্ড গরমেও স্যুট পরে থাকেন। তাঁকে দেখে মনে হয় তিনি কারোর সাতে পাঁচে থাকেন না। কিন্তু তারপরও তাঁর ছায়া দেখলেই অফিসের সবাই চমকে উঠে। তিনি সচরাচর নিচের স্তরের কর্মচারীদের ডাকেন না। তাঁর নীতি হল — দূরত্ব বজায় রেখে চলার নীতি। আলতাফের মতো একজন জুনিয়র কর্মচারী, যে মাত্র সেদিন কাজে যোগ দিয়েছে তাকে খাস কামরায় ডাকার কারণ কি? গনি সাহেব চিন্তিত মুখে অপেক্ষা করতে লাগলেন। ঘটনা না জেনে যাওয়া যায় না।'

বড় সাহেবের ঘরটা প্রকাণ্ড। ওয়াল টু ওয়াল কার্পেট। এয়ারকুলারের কাঁটা এত নিচে নামানো যে ঘরে ঢুকলেই শীতের কারণে শরীরে কাঁপন ধরে যায়। ঘরের আলোও কম। সবকিছু পরিষ্কার দেখা যায় না। এত কম আলোতেও বড় সাহেব চোখে সানগ্লাস পরে থাকেন। এই অফিসের অতি পুরাতন কর্মচারী সগীর মিয়াও কোনোদিন সানগ্লাস ছাড়া বড় সাহেবকে দেখে নি। অফিসের সবার ধারণা, বড় সাহেবের একটা চোখ নষ্ট বলেই তিনি কালো চশমায় চোখ ঢেকে রাখেন।

আলতাফ ঘরে ঢুকে ক্ষীণ গলায় বলল, 'স্যার ডেকেছেন?'

বড় সাহেব বললেন, 'আপনার নাম আলতাফ হোসেন?'

'জ্বি স্যার।'

'কাজে যোগ দিয়েছেন কবে?'

'দুমাস হয়েছে স্যার।'

'বসুন।'

আলতাফ বসল। বড় সাহেব খানিকটা ঝুঁকে এসে বললেন, 'এই ফাইলটা আপনার তৈরি করা না? জুন মাসের এক্সপেনডিচার ফাইল।'

'জ্বি স্যার, আমার করা।'

'ফাইল ঘাঁটতে গিয়ে একটা কাগজ পেলাম, মনে হচ্ছে আপনারই হাতের লেখা। দেখুন তো এটা আপনার হাতের লেখা কিনা।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বড় সাহেব পুরো ফাইলটাই এগিয়ে দিলেন। আলতাফ কাগজটার দিকে তাকিয়ে নিচু গলায় বলল, 'এটা আমারই লেখা।'

'কী লিখেছেন এখানে?'

আলতাফ চুপ করে রইল। বড় সাহেব বললেন, 'আমি এই লেখার পাঠোদ্ধার করার চেষ্টা করেছি। আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি।'

আলতাফ বলল, 'এই পাতাটা স্যার ভুল করে ফাইলে দিয়ে দিয়েছি।'

'আমারও তাই ধারণা।'

বড় সাহেব ফাইলটা আবার নিজের কাছে নিলেন। ভ্রূ কুঁচকে লেখাটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। গুটি গুটি করে বিচিত্র কিছু জিনিস লেখা —

বড় সাহেব অস্বস্তির সঙ্গে বললেন, জিনিসটা কী?

'কিছু না স্যার।'

'যা লিখেছেন তা কি অর্থহীন, না কোনো অর্থ আছে?'

'অর্থ আছে স্যার। পোকাদের নিয়ে একটা লেখা লিখেছি স্যার।'

'কাদের নিয়ে লিখেছেন?'

'পোকাদের নিয়ে। যেমন তেলাপোকা, মাকড়সা, শুয়োপোকা .

'সাংকেতিক ভাষায় লিখেছেন?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'জ্বি স্যার।'

'সাংকেতিক ভাষা আপনি জানেন, না নিজে তৈরি করেছেন?'

আলতাফ হোসেন ইতস্তত করে বলল, 'আমি তৈরি করেছি স্যার। তবে পোকারা আমাকে সাহায্য করেছে।'

'পোকারা আপনাকে সাহায্য করেছে?'

'জ্বি স্যার। এখানে দুধরনের সাংকেতিক ভাষা আছে। প্রথমটা তেলাপোকাদের কাছ থেকে নেয়া। দ্বিতীয়টা পেয়েছি ঘুনপোকাদের কাছ থেকে।'

'ঘুনপোকা?'

'জ্বি স্যার, ঘুনপোকা। আমি যে টেবিলে কাজ করি সেই টেবিলে অনেক ঘুনপোকা থাকে। ওরা আমাকে লিখতে সাহায্য করেছে। স্যার, আমি এখন উঠি?'

'বসুন, আরো কিছুক্ষণ বসুন। তাড়া আছে?'

'জ্বি না স্যার, তাড়া নেই।'

'আসুন, চা খাওয়া যাক। আপনি চা খান তো?'

'দিনে দুকাপ চা খাই স্যার। সকালে এক কাপ আর বিকালে এক কাপ।'

'এখন তো বিকাল, এখন খাওয়া যেতে পারে।'

বড় সাহেব বেল টিপলেন। বেয়ারাকে চা দিতে বললেন। চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বললেন, 'এখানে কী লিখেছেন একটু পড়ুন তো শুনি।'

'পোকাদের সাহায্য ছাড়া তো স্যার পড়া যাবে না।'

'তার মানে কি এই যে এ লেখা আপনি কখনো পড়তে পারবেন না?'

'পড়তে পারব। পোকা থাকলেই পড়তে পারব। আপনার ঘরে কোনো তেলাপোকা বা ঘুনপোকা নেই। আমি কি স্যার আমার টেবিলে গিয়ে পড়ে নিয়ে আসব?'

'থাক, আরেক দিন দেখা যাবে।'

বড় সাহেব উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, 'আপনি কি এইসব ব্যাপার নিয়ে অফিসের কারো সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেন?'

'না স্যার।'

'না করাই ভালো। অফিস হল অফিসের কাজকর্মের জন্যে, পোকাদের সাংকেতিক ভাষা লেখার জন্যে না। ঠিক বলেছি না?'

'জ্বি স্যার।'

আলতাফ বড় সাহেবের ঘর থেকে বের হয়ে দেখল, গনি সাহেব অস্থির হয়ে অপেক্ষা করছেন।

'আলতাফ সাহেব, 'ব্যাপারটা কী?'

'কিছু না।'

'বড় সাহেবের ঘরে এতক্ষণ কী করলেন?'

'চা খেয়েছি।'

গনি সাহেবের মুখ কঠিন হয়ে গেল। তিনি এই অফিসের যথেষ্ট ক্ষমতাবান ব্যক্তি। অফিসার্স ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট, অথচ তাঁকে এখনো বড় সাহেব তাঁর অফিসে চা খেতে বলেন নি। চা খাওয়া দূরে থাক, রুমে কখনো ডাকেন নি। এর মানেটা কী?

'শুধু চা-ই খেলেন, না আরো কিছু আলাপ-টালাপ হল?'

'পোকাদের নিয়ে কথা বলেছি।'

'বুঝতে পারলাম না, কাদের নিয়ে কথা বলেছেন?'

'তেলাপোকা, ঘুনপোকা, মকড়সা — এদের নিয়ে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গনি সাহেব হাসিমুখে বললেন, 'আচ্ছা, আচ্ছা। মনে মনে বললেন, গভীর জলের মাছ, Deep water fish. পোকাদের নিয়ে কথা বলা হচ্ছিল। আমার সঙ্গে মামদোবাজি, পোকার চাটনি বানিয়ে খাইয়ে দেব। তখন বুঝবে পোকা কী জিনিস।

'আলতাফ সাহেব।'

'জ্বি।'

'চলুন আপনাকে রিকশায় তুলে দিয়ে আসি।'

'আমি বাসে করে যাই।'

'চলুন তাহলে বাসস্টপ পর্যন্ত যাই।'

গনি সাহেব ভেবেছিলেন, যেতে যেতে আরো কিছু কথা বের করা যাবে। লাভ হল না। আলতাফ হ্যাঁ হুঁ ছাড়া কিছুই বলল না। ব্যাটা আসলেই গভীর জলের মাছ। তাঁর আগেই টের পাওয়া উচিত ছিল। টের পান নি। এখন থেকে ব্যাটাকে চোখে চোখে রাখতে হবে। খাতির জমাতে হবে। সবচে' ভালো হয় বাসা চিনে এলে। ছুটির দিনে বাসায় চলে যেতে হবে।

'আলতাফ সাহেব!'

'জ্বি।'

'আপনার বাসা কোথায়?'

'মগবাজারে।'

'মগবাজারে কোথায়?'

'রেল ক্রসিঙের কাছে।'

'বলেন কী! আমার এক রিলেটিভ থাকে, আমি আসি প্রায়ই। দেখি একবার যাব আপনার বাসায়। ঠিকানাটা বলেন?'

আলতাফ ঠিকানা বলল। গনি সাহেব নোটবই বের করে ঠিকানা লিখে রাখলেন। মনে মনে ভাবলেন, কাল ছুটির দিন আছে, সন্ধ্যাবেলার দিকে চলে যাবেন। ব্যাটা ভুল ঠিকানা দিয়েছে কিনা কে জানে। গভীর জলের মাছ! ভুল ঠিকানা দিতেও পারে।

AmarBoi.com

৬

রাতে বজলুর রহমান কিছু খেলেন না। তাঁর গায়ে জ্বর নেই। কিন্তু শরীর খারাপ লাগছে। মাথা ঘুরছে। প্রেসারটা একবার দেখানো উচিত, মনে হচ্ছে সমস্যাটা প্রেসারঘটিত। গত রাতে ঘুম হয় নি। প্রেসার রোগীদের একরাত ঘুম না হলে অনেক সমস্যা হয়। বজলুর রহমান রাত নটা বাজার আগেই হিপনল নামের একটা ঘুমের ওষুধ এবং আধকাপ দুধ খেয়ে বিছানায় চলে গেলেন। বাতি নিভিয়ে দিলেন। মনোয়ারাকে বলে দিলেন— 'কেউ যেন হৈচৈ না করে। হৈচৈ করলে কারবালা হয়ে যাবে।'

বজলুর রহমানের আশংকা ছিল আজো ঘুম আসতে চাইবে না। আয়োজন করে ঘুমাতে গেলে ঘুম আসে না— এটাই নিয়ম। ঘুমের ওষুধ আরো সমস্যা করে। তিনি যে কবার ঘুমের ওষুধ খেয়েছেন, সে কবারই সারারাত জেগে কাটিয়েছেন। এক ফোঁটা ঘুম হয় নি।

আজ রাতে সে রকম হল না। দেখতে দেখতে ঘুমে চোখ জড়িয়ে এল। তৃপ্তির ঘুম। এমন আরাম করে তিনি বহুকাল ঘুমান নি। তাঁর ঘুম ভাঙল গভীর রাতে। দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভাঙল। তিনি দেখলেন — মেঝে ছেয়ে গেছে তেলাপোকায়। তারা এগুচ্ছে তাঁর খাটের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিকে। কুড়ি–পঁচিশটা না, হাজারে হাজারে পোকা। সবাই একসঙ্গে শুঁড় নাড়ছে। পা ফেলছে তালে তালে। অনেকটা সৈন্যদের মার্চের ভঙ্গিতে। তিনি ঘুমের মধ্যেই বললেন, 'এই, স্টপ, স্টপ।'

পোকাদের বাহিনী থমকে গেল। তারপর আবার এগুতে শুরু করল। তিনি ঘুম ভেঙে বিছানায় উঠে বসলেন। কাঁপা গলায় ডাকলেন, 'মনোয়ারা! মনোয়ারা!'

'মনোয়ারা উঠে বসলেন।'

'বাতি জ্বাল।'

মনোয়ারা বাতি জ্বালালেন। বজলুর রহমান ভীত গলায় বললেন, "দেখ তো মেঝেতে কিছু আছে নাকি।'

'কিছু নেই।'

'না দেখে কথা বলবে না। কষ্ট করে বিছানা থেকে নাম। তারপর বল। তোমার কোমরে তো বাত হয় নি যে বিছানা থেকে নামা যাবে না।'

মনোয়ারা বিছানা থেকে নামলেন।

'কিছু দেখছি না তো।'

'খাটের নিচটা দেখ।'

খাটের নিচেও কিছু দেখা গেল না। বজলুর রহমান বললেন, 'ঠাণ্ডা পানি দাও। পানি খাব।'

মনোয়ারা চিন্তিতমুখে পানি আনতে গেলেন। লোকটার হয়েছে কী? স্বপ্ন দেখেছে এটা বোঝা যাচ্ছে। এই বয়সে স্বপ্ন দেখে কেউ এমন বিকট চিৎকার দেয়?

বজলুর রহমান শান্তমুখে পানি খেলেন। মনোয়ারা বললেন, 'খিদে হয়েছে? কিছু খাবে?'

'না।'

'কী স্বপ্ন দেখেছ?'

বজলুর রহমান কিছু বললেন না। স্ত্রীর সব প্রশ্নের জবাব তিনি দেন না। খামাখা সময় নষ্ট। মনোয়ারা জবাবের জন্য খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে বাথরুমে গেলেন অযু করতে। রাত শেষ হয়ে আসছে। ফজরের অযু করে রাখা যায়। মনোয়ারা বাথরুমের বাতি জ্বালিয়ে বিকট চিৎকার করলেন।

বজলুর রহমান বললেন, 'কী হয়েছে?'

'কিছু না।'

'কিছু না, তাহলে চিৎকার করছ কেন?'

'পোকা।'

'কী বললে?'

'হাজারে হাজারে তেলাপোকা। ওয়াক থু। কী ঘেন্না!'

মনোয়ারা ধড়াম করে বাথরুমের দরজা বন্ধ করে দিলেন। তাঁর গা গুলাচ্ছে। তিনি তাঁর বাহান্ন বছর জীবনে একসঙ্গে এত তেলাপোকা দেখেন নি। বজলুর রহমান বললেন, 'গাধাটাকে ডাক।'

'কাকে ডাকব?'

'আলতাফকে ডাক।'

'ওকে ডাকব কেন?'

'যা করতে বলছি কর।'

মনোয়ারা আলতাফকে ডাকতে গেলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলতাফ মরার মতো ঘুমায়। ঘুম ভাঙানো দুঃসাধ্য ব্যাপার। সঙ্গদোষে মানুষ নষ্ট। দুলারীর ঘুমও এখন ভাঙে না। মনোয়ারা প্রাণপণে দরজা ধাক্কাচ্ছেন। কারো কোনো সাড়া নেই। অনেকক্ষণ পর দুলারী জড়ানো গলায় বলল, 'কে?'

'আমি।'

'কী হয়েছে মা?'

'আলতাফকে তোর বাবা ডাকছে।'

'কেন?'

'বাথরুম ভর্তি তেলাপোকা।'

'তেলাপোকা তো বাথরুমেই থাকবে। এর জন্যে শুধু শুধু বেচারার ঘুম ভাঙাব? সারাদিন অফিস করে আসে।'

'ডেকে তোল না মা। তোর বাবা রাগ করবে।'

'করুক রাগ। আমি ডাকতে পারব না। আর ডাকলেও লাভ হবে না। ওর ঘুম ভাঙবে না।'

মনোয়ারা ফিরে এসে দেখেন, বজলুর রহমান বাথরুমে কিল দেম স্প্রে করছেন। তাঁর চোখে-মুখে হিংস্র আনন্দ। তিন হৃষ্ট গলায় বললেন, 'মেরে সাফ করে দিয়েছি। ভুষ্টিনাশ করে দিয়েছি। সান অব এ বিচ। ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দেখ নি।'

মনোয়ারা বাথরুমে উঁকি দিয়ে চমকে উঠলেন। সত্যি সত্যি সব পোকা মরে পড়ে আছে। বাথরুমের মেঝেটাকে মনে হচ্ছে মেরুন কার্পেটে ঢাকা। বজলুর রহমান বললেন, 'দেয়াশলাই নিয়ে আস, আগুন জ্বালিয়ে দেব। বোন-ফায়ার হবে।'

'মরেই তো গেছে, আগুন জ্বালানোর দরকার কী?'

'দরকার আছে, তুমি বুঝবে না। তোমাকে যা করতে বলছি কর। কেরোসিন আর আগুন নিয়ে আস। কেরোসিন ঢেলে আগুন জ্বেলে দেব।'

'শেষে ঘরে আগুন-টাগুন লেগে একটা কাণ্ড হবে।'

'তোমাকে যা করতে বলেছি কর। ফালতু তর্ক যথেষ্ট করেছ। Enough is enough.'

মনোয়ারা কেরোসিন আর দেয়াশলাই আনতে গেলেন। আগুন লাগানোর উত্তেজনায় বজলুর রহমান আলতাফের কথা ভুলে গেছেন এটা একটা বড় ব্যাপার। নয়তো আরো যন্ত্রণা হত। ঘরে এখন কেরোসিন আছে কিনা কে জানে। বোতলের ভেতর খানিকটা থাকার কথা, না থাকলে ভয়াবহ কাণ্ড হবে।

কেরোসিন ছিল। মনোয়ারা কেরোসিনের বোতল এবং দেয়াশলাই নিয়ে বাথরুমে ঢুকে দেখেন, সব তেলাপোকা একত্র করে বেসিনে রাখা হয়েছে। বেসিন প্রায় আধাআধি ভরা। বজলুর রহমান আনন্দিত গলায় বললেন, কটা পোকা আছে বল তো?'

মনোয়ারা বললেন, 'ছয় হাজার।'

'তোমার আন্দাজ বলে কিছু নেই। এখানে পোকা আছে মোট ২১৩টা।'

'তুমি বসে বসে গুনেছ?'

'না গুনলে জানব কী করে?'

বজলুর রহমান কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিলেন। পট পট শব্দ হতে থাকল। উৎকট গন্ধে ঘর ভরে গেল। মনোয়ারা বললেন, 'শব্দ হচ্ছে কীসের?'

'পেট ফেটে যাচ্ছে তার শব্দ। পেট ফেটে সাদা সাদা কি যেন বের হচ্ছে।'

মনোয়ারা বললেন, 'ওয়াক থু!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁর নাড়িভুঁড়ি উল্টে বমি আসছে। ঘরময় উৎকট গন্ধ। মনোয়ারা অনেক কষ্টে বমি আটকে রাখছেন। বমি করলে বজলুর রহমান রেগে যেতে পারেন।

'মনোয়ারা!'

'হুঁ।'

'আগুন হল পোকার একমাত্র ওষুধ। Only Medicine.'

'হুঁ।'

বজলুর রহমান হাসিমুখে বললেন, 'সব পোকা মেরে ফেলা ঠিক হয় নি। দু একটা রেখে দেয়া উচিত ছিল। মিসটেক হয়ে গেছে। বিগ মিসটেক।'

'দু একটা রেখে দিলে কী হত?'

'ওরা গিয়ে অন্যদের খবর দিত। অন্যদের আক্কেল গুড়ুম হয়ে যেত। হা-হা-হা।'

বজলুর রহমান বেসিনে আরো কেরোসিন ঢেলে দিলেন। গন্ধ আরো বিকট হল। মনোয়ারা বললেন, 'ওয়াক থু!' বজলুর রহমান বিরক্ত গলায় বললেন, 'কথায় কথায় ওয়াক থু বলবে না। ওয়াক থু-র কী আছে?'

'গন্ধে টিকতে পারছি না।'

'টিকতে না পারলে চলে যাও। দাঁড়িয়ে থাকতে বলেছে কে?'

মনোয়ারা মেয়ের ঘরে চলে গেলেন। মেয়েকে সব জানানো দরকার। তাঁর কিছুই ভালো লাগছে না। মানুষটা এরকম করছে কেন? দুলারী জেগেই ছিল। মনোয়ারা একবার ডাকতেই উঠে এল। বিরক্ত গলায় বলল, 'কী হয়েছে?'

'তোর বাবার কাণ্ডকারখানা আমার ভালো লাগছে না।'

'কী করছে বাবা?'

'পোকা পোড়াচ্ছে।'

'সেটা আবার কী?'

'তুই নিজের চোখে না দেখলে বুঝবি না।'

দুলারী নিচে নেমে এল। বজলুর রহমান মেয়েকে দেখে হাসিমুখে বললেন, 'একটা কলম আর ফুলস্কেপ কাগজ আন তো।'

'কেন?'

'পোকা মারার পাকা হিসাব থাকা দরকার। মোট ২১৪টা খতম। দিনের বেলা মারলাম একটা, রাতে মেরেছি দুই শ তের। সব মিলিয়ে টু হানড্রেড এন্ড ফর্টিন।'

'আচ্ছা।'

'মেরে সব সাফ করে দেব। রোজ রাতে বোন-ফায়ার হবে। জ্বাল জ্বাল, আগুন জ্বাল।'

দুলারী বাবার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। আনন্দে বজলুর রহমানের চোখ ঝলমল করছে। দুলারী বলল, 'তোমার কী হয়েছে বাবা?'

'কী হবে আবার?'

'কেমন যেন অদ্ভুত করে তাকাচ্ছ!'

'তোকে খাতা-কলম আনতে বলছি, আন্।'

দুলারী কাগজ-কলম আনতে গেল। যাবার সময় শুনল — তার বাবা গুনগুন করে গানের সুর ভাজছেন। হিন্দি গানের সুর — লালা লা। লালা লা। হচ্ছেটা কী? বাবা কি পুরোপুরি পাগল হয়ে গেছেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৭

দুপুরে লাঞ্চ ব্রেকের সময় মনসুর আলি তাঁর বেয়ারাকে বললেন, 'আলতাফ সাহেবকে আসতে বল।' বেয়ারা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে গেল। আলতাফের কাছে গিয়ে অন্যদিনের মতো তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করল না। চোখ বড় বড় করে বলল, 'বড় সাব আপনেরে ডাকে। এক্ষণ চলেন। এক্ষণ।'

আলতাফ টিফিন বক্স খুলেছে। দুটা আটার রুটি, একটা ডিম, একটা কলা। এক কোনায় সামান্য আচার। সে কখনো আচার খায় না। তারপরও দুলারী প্রতিদিন টিফিন বক্সের এক কোনায় খানিকটা আচার দিয়ে দেয়। আলতাফ কলাটা বের করল। ফল সবার শেষে খাওয়া উচিত। সে সবার আগে খায়। ধীরে ধীরে কলার খোসা ছাড়াতে তার ভালো লাগে।

আলতাফ কলার খোসা ছাড়াচ্ছে, বেয়ারা বিরক্ত হয়ে বলল, 'বড় সাহেব ডাকছেন তো।' আলতাফ সহজ গলায় বলল, 'এখন যেতে পারব না। খাচ্ছি।'

বেয়ারা এমন চোখে তাকাচ্ছে যেন তার জীবনের সবচে' আশ্চর্যজনক ঘটনাটি সে এই মুহূর্তে ঘটতে দেখছে। গনি সাহেব উঠে এসে বললেন, কী হয়েছে?'

'বড় সাহেব খবর দিলেন, উনি যাবে না।'

'যাবেন না কেন আলতাফ সাহেব?'

'খাচ্ছি তো।'

'আপনার মাথাটা খারাপ কিনা সেটাই তো বুঝতে পারছি না। পরে খাবেন। খাওয়া পালিয়ে যাবে না। যান শুনে আসুন।'

আলতাফ অনিচ্ছার সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। গনি সাহেব কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন, 'ভয় পাবেন না, আমরা পেছনে আছি। We are behind you' 'আলতাফ বিস্মিত হয়ে বলল, 'ভয় পাব কেন?' গনি সাহেব গলা আরো নামিয়ে দিয়ে বললেন, 'বড় সাহেবরা কেরানিদের সঙ্গে প্রেমালাপ করার জন্যে ডাকে না। এটা শুধু খেয়াল রাখবেন, তাহলেই বুঝবেন ভয় পাবার কিছু আছে কিনা।'

'বড় সাহেব বললেন, কী খরব আলতাফ সাহেব?'

আলতাফ অস্বস্তির সঙ্গে বলল, 'খবর ভালো স্যার।'

'বসুন। করছিলেন কী?'

'টিফিন খেতে যাচ্ছিলাম স্যার।'

'খেয়ে ফেলেন নি তো?'

'জ্বি না।'

'গুড। আমার সঙ্গে খাবেন। খেতে খেতে আপনার কথা শুনি। ঐদিন ঠিকমতো শোনা হয় নি।'

মনসুর আলি সাহেব নিজেই প্লেট এগিয়ে দিলেন। বড়লোকের খাবার খুব সাধারণ হয়। স্যান্ডউইচ এবং চা। আলতাফের পেটের একটা কোনা শুধু ভরল। সে দুপুরে চা খায় না। চা খাওয়ার জন্যে কেমন জানি লাগছে। পেটে ভুটভাট শব্দ হচ্ছে।

'আলতাফ সাহেব!'

'জ্বি স্যার।'

'ঐ দিন পোকাদের ব্যাপারে কি যেন বলছিলেন, আবার বলুন।'

'কী বলেছিলাম মনে নেই স্যার।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'পোকারা আপনাকে লেখার ব্যাপারে সাহায্যে করে — এইসব।'

'তা স্যার করে।'

'একটু বুঝিয়ে বলুন। বলতে কোনো বাধা নেই তো?'

'জ্বি না। তবে কাউকে বলি না।'

'বলেন না কেন?'

'দুলারী পছন্দ করে না। দুলারীর ধারণা, এই সব শুনলে লোকে আমাকে পাগল ভাববে।'

'দুলারীটা কে?'

'আমার মামাত বোন। লালমাটিয়া কলেজে বিএ পড়ে।'

'পোকার ব্যাপারটা শুধু সে-ই জানে ?'

'আমার মামা-মামিও জানেন।'

'তাঁরা কি আপনাকে পাগল ভাবেন?'

'জ্বি না, ভাবেন না। তাঁরা আমাকে খুব স্নেহ করেন।'

'এবার বলুন আপনার পোকার কথা।'

'বলার মতো কিছু নাই স্যার। পোকাদের আমরা খুব তুচ্ছ করি। ওদের তুচ্ছ করা ঠিক না। এরকম তুচ্ছ করলে এরা রেগে যেতে পারে। এরা সহজে রাগে না। একবার রেগে গেলে মুশকিল।'

'ও আচ্ছা।'

'মানুষের চেয়ে ওদের বুদ্ধি অনেক অনেক বেশি।'

'ও আচ্ছা। আপনার কি ধারণা ওদের স্কুল-কলেজ আছে?'

'ওদের ব্যাপারটা ঠিক আমাদের মতো না। ওরা সবাই একসঙ্গে চিন্তা করে, একসঙ্গে ভাবে। এইভাবে তারা শেখে। যেমন স্যার, মনে করুন, একটি তেলাপোকা আপনার রান্নাঘরে আছে, আরেকটা আছে আমাদের অফিসে। রান্নাঘরের পোকাটা কী ভাবছে তা আমাদের পোকাটা জানে।'

'আপনি এইসব থিওরি ভেবে ভেবে বের করেছেন?'

'ওরা আমাকে বলেছে।'

'ও আচ্ছা। কীভাবে বলল? ডেকে বলল?'

'মাঝে মাঝে ওরা আমাকে স্বপ্ন দেখায়।'

'সবই তাহলে স্বপ্নে পাওয়া?'

'স্বপ্ন ছাড়াও ওরা আমাকে বলে।'

মনসুর আলি সরু চোখে তাকিয়ে রইলেন। আলোচনা তিনি চালিয়ে যাবেন কিনা বুঝতে পারছেন না। কোনো প্রয়োজন অবশ্য নেই। তবে কথা শুনতে মজা লাগছে। পৃথিবীতে বিচিত্র ধরনের মানুষ আছে। সেই বিচিত্র মানুষদের একজন এই মুহূর্তে তাঁর সামনে বসে আছে, যাকে পোকারা অনেক কিছু বলে।

'আপনি কি সিগারেট খান আলতাফ সাহেব?'

'জ্বি না, স্যার।'

'সিগারেট খাওয়ার ব্যাপারে কি পোকাদের কোনো বিধিনিষেধ আছে?'

'জ্বি না, স্যার।'

কথাটা বলেই মনসুর আলির একটু খারাপ লাগল। কারণ তিনি এই মানুষটাকে নিয়ে মজা করছেন। বিচিত্র মানুষদের নিয়ে সবাই মজা করে। এটা এদের স্বাভাবিক পরিণতি। কিছুদিনের মধ্যেই হয়তো দেখা যাবে অফিসের সবাই একে ডাকছে — 'পোকাবাবু।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি আলতাফ সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়েছেন। নির্বিরোধী লোক। অফিসের কাজে অতিদক্ষ। কাজকর্ম ফেলে রেখেই এই লোকটি যদি পোকা পোকা করত তাহলে ভিন্ন কথা ছিল। তা তো করছে না। পোকা হল লোকটার পাস্ট টাইম।

'আলতাফ সাহেব!'

'জ্বি স্যার।'

'আপনার এই পোকার ব্যাপারটা কতদিনের? অর্থাৎ কতদিন থেকে আপনি পোকাদের ব্যাপারগুলো বুঝতে পারছেন?'

'অনেক দিনের ব্যাপার স্যার। খুব ছোটবেলার।'

'বলুন তো শুনি।'

'আমি স্যার বলতে পারব না।'

'বলতে কি কোনো নিষেধ আছে?'

'নিষেধ নেই কিন্তু বলতে ইচ্ছা করে না। এটা স্যার আমি দুলারীকেও বলি নাই।'

'দুলারী নামের আপনার মামাত বোনকে আপনি সবকিছুই বলেন?'

'জ্বি স্যার, বলি। হঠাৎ হঠাৎ গভীর রাত্রে আমার ঘুম ভেঙে যায়। তখন বলতে ইচ্ছা করে। শেষ পর্যন্ত বলা হয় না। আমার মনে হয় পোকারাই বাধা দেয়। ওরা তো আমাদের নিয়ন্ত্রণ করে। আমরা বুঝতে পারি না।'

'পোকারা আমাদের নিয়ন্ত্রণ করে?'

'জ্বি স্যার করে। এই যে আপনি এত ক্যান্ডিডেট থাকতে আমাকে চাকরি দিয়েছেন। পোকাদের কারণে দিয়েছেন। পোকারা আপনাকে বাধ্য করেছে। বোর্ডের মেম্বাররা আমাকে চাকরি দিতে চায় নি। আপনি জোর করে দিয়েছেন।'

'আপনার তাই ধারণা?'

'ধারণা না স্যার, এটাই সত্যি। এই যে আপনি কালো চশমা পরে থাকেন, পোকারা সেটা করেছে।'

'বুঝতে পারছি না।'

'আপনার ঘরভর্তি ছোট ছোট পোকা। আপনি যাতে এদের দেখতে না পারেন এই জন্যে পোকারা আপনাকে কালো চশমা পরিয়ে রাখে। আপনি মনে করছেন, আপনি নিজের ইচ্ছায় কালো চশমা পরছেন। আসলে তা না।'

'এইগুলো পোকারা আপনাকে বলেছে?'

'জ্বি না স্যার, এইগুলো আমার অনুমান।'

মনসুর আলি গম্ভীর গলায় বললেন, 'আচ্ছা যান। কাজ করুন, অনেক গল্প করা হল।' আলতাফ নিজের চেয়ারে ফিরে আসামাত্র গনি সাহেব ছুটে এলেন। গলার স্বর নামিয়ে প্রায় ফিসফিস করে বললেন, 'সমস্যাটা কী?'

'কোনো সমস্যা নেই।'

'স্যার কী নিয়ে আলাপ করলেন?'

'পোকা নিয়ে।'

গনি সাহেব মনে মনে বললেন, হারামজাদা, আমার সঙ্গে রসিকতা! আমি তোর পাছা দিয়ে পোকা ঢুকায়ে দেব। বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা। এমনিতে অবশ্যি সহজ গলায় বললেন, 'আচ্ছা, আচ্ছা। পোকা নিয়ে কথা বলা খুব ভালো। বলুন, কথা বলুন।'

মনসুর আলি বেলা তিনটার দিকে চোখ থেকে কালো চশমা খুললেন। তাঁর চোখ জ্বালা করতে লাগল। আলো তাঁর একেবারেই সহ্য হয় না। বেয়ারাকে বললেন জানালার পর্দা সরিয়ে দিতে। পর্দা সরানোর পরেও ঘরে তেমন আলো হল না। কারণ জানালা বন্ধ এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানালার কাচে নীল রং করা। জানালা খুলতে হলে এয়ারকুলার বন্ধ করতে হয়। মনসুর আলি এয়ারকুলার বন্ধ করে জানালা খুলতে বললেন। জানালা খোলা খুব সহজ ব্যাপার হল না। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকায় সব জং ধরে গেছে। মিস্ত্রি ডাকিয়ে জানালা খুলতে হল। মনসুর আলি তাঁর রিভলভিং চেয়ারে বসে দেখলেন, সারি সারি পোকা তাঁর টেবিলের পা বেয়ে উপরের দিকে উঠছে। তাঁর প্রথমে মনে হল পিঁপড়া। এরা বর্ষার সময় ডিম নিয়ে শুকনো আশ্রয়ের খোঁজে যায়। ভালো করে লক্ষ করে দেখলেন, পিঁপড়া না, অন্য কোনো পোকা। লালচে রং। দশটা করে পা। শুধু যে টেবিলেই পোকা তা না। মেঝেতে পোকা। দেয়ালে পোকা। দেয়ালের পোকাগুলোর রং সাদা। দেয়ালের রঙের সঙ্গে মিশে আছে, খুব ভালো করে লক্ষ না করলে বোঝাই যায় না। মেঝেতেও পোকা। এদের রং আবার নীলচে। মেঝের কার্পেটের সঙ্গে সেই রঙের কিছু মিল আছে। তাঁর মাথা ধরে গেল। প্রচণ্ড মাথা ধরল। মাথাধরার অবশ্যি যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। অনেকদিন পর চোখে কড়া আলো এসে লেগেছে। নিয়মের ব্যতিক্রম করে মনসুর আলি আজ অফিস ছুটি হওয়ার এক ঘণ্টা আগেই বাড়ি চলে গেলেন।

৮

আলতাফ বাড়ি ফিরে দেখে দুলারী শুকনো মুখে বারান্দায় দাঁড়িয়ে। আলতাফ বলল, 'কী হয়েছে?' দুলারী কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, 'কিছু হয় নি।' আলতাফ বলল, 'তুমি আজ কলেজে যাও নাই?'

'কলেজে কী করে যাব? বাসায় কত কাণ্ড হচ্ছে।'

'কী কাণ্ড?'

'বাবার মাথা পুরোপুরি খারাপ হয়ে গেছে।'

'ও আচ্ছা।'

আলতাফ এমনভাবে 'ও আচ্ছা' বলল যেন মাথা পুরোপুরি খারাপ হয়ে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। রোজই হয়। দুলারী বলল, 'তুমি তাড়াতাড়ি একজন ডাক্তারের কাছে যাও।'

'আচ্ছা।'

'আমিও যাব, বাবার কী হয়েছে ডাক্তারকে বুঝিয়ে বলব। তুমি বলতে পারবে না। বাবাকে সঙ্গে নেয়া যাবে না।'

'আচ্ছা।'

'কোন্ ডাক্তারের কাছে যাওয়া যায় বল তো?'

বিধুবাবু পাড়ার হোমিওপ্যাথ। ভালো ডাক্তার। রোগীর ভিড় লেগেই আছে। আগে তাঁর ফী ছিল পাঁচ টাকা। সম্প্রতি দশ টাকা করেছেন। তবে পুরোনো রোগীদের বেলায় এখনো পাঁচ টাকা।

বিধুবাবু দুলারীকে দেখেই বললেন, 'তোর বাবার গলার কাঁটা দূর হয়েছে তো?' গলার কাঁটার একটাই ওষুধ। হোমিওপ্যাথি। চিকিৎসাশাস্ত্রে গলার কাঁটার আর কোনো ওষুধ নেই।

বিধুবাবুর এই এক সমস্যা — একবার কোনো ওষুধ দিলে বছরের পর বছর মনে থাকে। চার-পাঁচ বছর পরেও বিধুবাবুর সঙ্গে যদি দুলারীর দেখা হয় তিনি হাসিমুখে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলবেন, 'তোর বাবার গলার কাঁটাটার অবস্থা কী?'

তাঁর ওষুধে কাঁটা দূর হয় নি এটা বললে ঘণ্টাখানিক বক্তৃতা শুনতে হবে। দুলারী সে কারণেই প্রসঙ্গ পাল্টে ফেলল। করুণ গলায় বলল, চাচা, বাবাকে একটা ওষুধ দিন।

'হয়েছি কী?'

'মাথা গরম হয়েছে। বাবা চারদিকে শুধু তেলাপোকা দেখতে পাচ্ছেন।'

'ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম না।'

'দুপুরবেলা ঘুমাতে গিয়েছেন, চাদর গায়ে দিয়েই চিৎকার শুরু করলেন, পোকা! পোকা! আমরা ছুটে গেলাম। দেখি, বাবা থরথর করে কাঁপছেন। অথচ একটা পোকাও নেই। কিন্তু বাবা চারদিকে পোকা দেখছেন।'

'ও আচ্ছা।'

'বাথরুমে যখন যান তখন সেখানেও পোকা দেখেন। বেসিনে পোকা, মেঝেতে পোকা, কমোডে পোকা, কিন্তু আমরা দেখি না।'

'হুঁ।'

'ঘুমের মধ্যেও তেলাপোকা দেখেন। বিকেলে মাথায় হাত বুলিয়ে অনেক কষ্টে ঘুম পাড়িয়েছি, হঠাৎ জেগে উঠে বললেন, আমার সারা শরীরে পোকা উঠে গেছে। দেখতে পাচ্ছিস না?'

বিধুবাবু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'ও কিছু না, বিকার হয়েছে। পেট গরমের জন্যে হয়েছে। হজমের গণ্ডগোল হলে হয়। পিত্ত নষ্ট হয়ে যায়। সেখান থেকেই বিকার। আর্নিকা টু হানড্রেড এককোঁটা খাইয়ে দে, আর দেখতে হবে না। আর্নিকা হল বিকারের বাবা।'

'এক ফোঁটাতেই কাজ হবে?'

'আধা ফোঁটাতেও হবে। আধা ফোঁটা করা যায় না বলেই এক ফোঁটা। হোমিওপ্যাথির মজা এখানেই। তাহলে এক গল্প শোন। নাইনটিন ফিফটি থ্রি-র ঘটনা...'

'গল্পটা আরেক দিন শুনব চাচা।'

'আরে শুনে যা, পরে মনে থাকবে না। আমার কাছে একবার এক রোগী এসেছেন। আমি অনেক বিচার-বিবেচনা করে তাঁকে দিলাম কেলিফস ফোর হানড্রেড। আমি তাঁকে বললাম, ওষুধ নিয়ে যান, খেতে হবে না। দৈনিক একবার শুঁকবেন। এতেই রোগ আরোগ্য হবে।'

'হয়েছিল?'

'হবে না মানে? কী বলিস তুই? এটা কি এলোপ্যাথি পেয়েছিস যে ইনজেকশন দিয়ে দিয়ে শরীর মোরব্বা বানিয়ে ফেলব, তারপরেও রোগ সারবে না? তোর বাবাকে যে ওষুধ দিলাম নিয়ে যা, দুটা ডোজ পড়ুক, তারপর দেখবি হানিম্যানের মাহাত্ম্য।'

বিধুবাবুর ওষুধ বজলুর রহমান খেতে রাজি হলেন না। রাগী গলায় বললেন, 'আমার কী হয়েছে? ওষুধ দিচ্ছিস কেন?'

দুলারী ক্ষীণ গলায় বলল, 'তুমি চারদিকে পোকা দেখছ এইজন্যে ওষুধ।'

'আমাকে ওষুধ দিচ্ছিস কোন বিবেচনায়? পোকাদের ওষুধ দে যেন ওরা আমার সামনে না আসে।'

'বাবা, তুমি চোখে ভুল দেখছ।'

'আমি চোখে ভুল দেখছি। আর তোরা সব শুদ্ধ দেখছিস? ফাজলামির একটা সীমা থাকা দরকার। যা আমার সামনে থেকে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুলারী পালিয়ে গেল। বজলুর রহমান সন্ধ্যাবেলা পোকা মারার আরো সব ওষুধ কিনে আনলেন। বিষাক্ত সব ওষুধ। খালি হাতে স্প্রে করা যায় না। গ্লাভস্ পরে নিতে হয়। তিনি গ্লাভস্ও কিনে আনলেন। রাতে খেতে বসে ভাতের নলা মুখের কাছে নিয়ে নামিয়ে রাখলেন, 'মনোয়ারা বললেন, কী হয়েছে?'

'ভাতে তেলাপোকার গন্ধ। মুখে নেয়া যাচ্ছে না।'

'নতুন চালের ভাত গন্ধ হবে কেন?'

'সেটা আমাকে জিজ্ঞেস করছ কেন? ভাতকে জিজ্ঞেস কর।'

'ঘরে পোলাওয়ের চাল আছে। দেই তোমাকে চারটা ফুটিয়ে?'

'দাও।'

বজলুর রহমান সেই চালের ভাতও খেতে পারলেন না। মুখের কাছে নিয়ে ফেলে দিলেন। ক্ষিপ্ত গলায় বললেন, 'এখন তো আরো বেশি গন্ধ। মনে হচ্ছে তেলাপোকা সিদ্ধ করে নিয়ে এসেছ।'

রাতে কিছু না খেয়েই তিনি বিছানায় গেলেন। বালিশে মাথা রেখেই লাফ দিয়ে বিছানায় উঠে বসলেন। মনোয়ারা ভয়ে ভয়ে বললেন, 'কী হয়েছে?'

বজলুর রহমান থমথমে গলায় বললেন, 'বিছানা–বালিশ ধুতে মনে থাকে না?' কর কী সারাদিন? পোকার গন্ধে ঘরে থাকা যায় না।'

'ধোয়া একটা চাদর দেই?'

'কিচ্ছু দিতে হবে না।'

দুলারী ভয়ে ভয়ে বলল, 'বাবা, তুমি বুঝতে পারছ না তোমার শরীর খারাপ করেছে। বিধু চাচার ওষুধটা খেয়ে নাও। তোমার পায়ে পড়ি বাবা।'

বজলুর রহমান বললেন, 'নিয়ে আয় তোর ওষুধ।'

বজলুর রহমান বাকি রাতটা বারান্দার চেয়ারে বসে কাটালেন। তাঁর সঙ্গে জেগে রইলেন মনোয়ারা এবং দুলারী। শুধু আলতাফ যথাসময়ে ঘুমাতে গেল। দুলারী কাঁদো–কাঁদো গলায় বলল, 'বাবার এত বড় অসুখ, তুমি দিব্যি ঘুমাতে যাচ্ছ! তোমার কি মায়াদয়া নেই?'

আলতাফ হাই তুলতে তুলতে বলল, 'পোকাদের সঙ্গে কথা হয়েছে। ওরা মামার উপর রাগ করেছিল। আমি বুঝিয়ে বলেছি। সকালবেলা ঠিক হয়ে যাবে।'

দুলারী রাগ চাপতে চাপতে বলল, ' পোকা–বিষয়ে তুমি আর কোনো কথা আমাকে বলবে না।'

'আচ্ছা।'

'একজন মানুষ পোকার ভয়ে মারা যেতে বসেছে আর তুমি আরাম করে ঘুমাতে যাচ্ছ।'

'পোকাদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই। ওরা মানুষের ক্ষতি করে না।'

'কে বলল তোমাকে?'

'ওরাই বলেছে। ওরা জানে মানুষ খুব অসহায়, এই জন্যেই ওরা মানুষকে রক্ষা করে চলে। পোকারা যদি ঠিক করে তাহলে তারা একদিনে পৃথিবীর সব মানুষ শেষ করে দিতে পারে।'

'আজেবাজে কথা বলবে না তো। তোমার ঘুম দরকার, তুমি ঘুমাও।'

আলতাফ ঘুমিয়ে পড়ল।

বিধুবাবুর আর্নিকা টু হানড্রেড ওষুধের জন্যেই হোক কিংবা আলতাফের কারণেই হোক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভোরবেলায় বজলুর রহমান নিতান্তই সাধারণ মানুষ। আগ্রহ করে সকালের নাশতা খেলেন। মনোয়ারা ভয়ে ভয়ে বললেন, 'রুটিতে তেলাপোকার গন্ধ পাচ্ছ না তো?'

বজলুর রহমান ক্ষিপ্ত গলায় বললেন, 'সব সময় উদ্ভট কথা। রুটিতে তেলাপোকার গন্ধ হবে কেন? রুটি কি তেলাপোকার পাউডার দিয়ে বানায়?'

মনোয়ারা তৃপ্তির হাসি হাসলেন।

৯

বেলা এগারটা।

মনসুর সাহেব আলতাফকে নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে গেছেন। তাঁদের দুজনের সামনেই কফির মগ। আলতাফ কফিতে একটা চুমুক দিয়েই মগ নামিয়ে রেখেছে। সে কিছুতেই ভেবে পাচ্ছে না এমন কুৎসিত জিনিস মানুষ কী করে খায়।

মনসুর সাহেবের ঘর অন্ধকার। চোখে কালো চশমা। গতকাল কিছু সময় চশমা ছাড়া ছিলেন। এতেই মাথা-যন্ত্রণা শুরু হয়েছে। এখনো তার রেশ আছে। অফিসের কাজে মন বসছে না বলেই আলতাফকে ডেকে এনেছেন। লোকটিকে তাঁর যথেষ্ট ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে। কথা বলে আরাম পাওয়া যায়। লোকটি এতে প্রশ্রয় পেয়ে যাচ্ছে কিনা কে জানে। এদের প্রশ্রয় দেয়া ঠিক না। প্রশ্রয় পেলেই মানুষ ঘাড়ে উঠে যেতে চেষ্টা করে। মনসুর সাহেব ঠিক করে রেখেছেন, আজই শেষ দিন। আর কোনো গল্পগুজব হবে না।

'আলতাফ সাহেব!'

'জ্বি স্যার।'

'কফি খাচ্ছেন না যে?'

'ভালো লাগছে না স্যার।'

'অভ্যাস না থাকলে ভালো না লাগারই কথা। আপনি কি ধূমপান করেন?'

'জ্বি না।'

'ধূমপানও অভ্যাসের ব্যাপার। অভ্যাস না থাকলে সিগারেটের ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে আসবে। আবার যারা অভ্যস্ত তারা পাগল হয়ে থাকে এই ধোঁয়াটার জন্য।'

'জ্বি স্যার।'

মনসুর সাহেব সিগারেট ধরিয়ে তাঁর রিভলভিং চেয়ারে হেলান দিলেন। খানিকটা ইতস্তত করে বললেন — 'পোকাদের ভাষায় যে কাগজে কিছু লেখা লিখেছিলেন সেটার বিষয়বস্তু সম্পর্কে বলুন।'

মনসুর সাহেব ড্রয়ার থেকে কাগজটা বের করলেন। আলতাফ কাগজটা হাতে নিল। নিচু গলায় বলল, 'স্যার, আমি তো ওদের সাহায্য ছাড়া পারব না।'

'ওদের সাহায্য নিয়েই করুন।'

'তাহলে আমার নিজের টেবিলে চলে যাই?'

'যান। লাঞ্চ টাইমে আসবেন। তখন দেখব।'

আলতাফ উঠে দাঁড়াল। মনসুর সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, 'পোকা প্রসঙ্গে এটাই হবে আপনার সঙ্গে আমার শেষ বৈঠক।'

'জ্বি আচ্ছা, স্যার।'

'আপনার টেবিলে একটা ফাইল পাঠিয়েছি সকালবেলায়। পেয়েছেন?'

'পেয়েছি স্যার।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ফাইলটা খুব জরুরি। আপনি কাজকর্ম সাবধানে করেন বলে আপনাকে পাঠানো হল। ফাইলে নোট দেয়া আছে। সেই নোট দেখে কাজ শেষ করবেন। আজ বাসায় যাওয়ার সময় ফাইলটা নিয়ে যাব।'

'জ্বি আচ্ছা।'

মনসুর সাহেব বিরক্ত বোধ করছেন। বিরক্তিটা নিজের উপর। সামান্য বিষয় নিয়ে তিনি মাথা ঘামাচ্ছেন। সামান্য বিষয় নিয়ে মাথা ঘামানো তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নয়। তিনি চোখ থেকে কালো চশমা খুললেন। চোখ জ্বালা করতে লাগল। টেবিলের পায়ে সারি সারি পোকা দেখা যাচ্ছে। অথচ কাল বেয়ারাকে বলে দিয়েছেন সারা ঘরে যেন খুব ভালো করে এরোসল স্প্রে করে দেয়। এরোসল কিনে আনার টাকাও দিয়েছেন।

আসলে এই ঘরটাই স্যাঁতসঁ্যাতে। ট্রপিকেল দেশের একটা ভেজা ঘরে পোকা থাকবেই। ঘরের কার্পেট রোদে দেয়া দরকার। আজ দেয়া যেত। আকাশ মেঘলা হয়ে আছে, বৃষ্টি নামতে পারে। তাঁকে অপেক্ষা করতে হবে রোদের জন্যে। কড়া রোদের জন্যে। কড়া রোদ উঠলেই এই ঘরের যাবতীয় আসবাব তিনি ছাদে নিয়ে যাবেন। শুধু অফিসের আসবাব না — নিজের বাড়ির আসবাবও। বাড়িতেও একই অবস্থা। গতকালই প্রথম লক্ষ করলেন।

তিনি আলো সহ্য করতে পারেন না। কাজেই বাড়িও অন্ধকার করে রাখেন। চোখের সমস্যাটা দীর্ঘদিন ধরে বিব্রত করছে। দেশের এবং বিদেশের অনেক ডাক্তারই দেখিয়েছেন। সর্বশেষ যিনি দেখেছেন তাঁর নাম প্রফেসর জেনিংস। আমেরিকান ডাক্তার। তিনি এক পর্যায়ে বললেন, 'তোমার চোখে কোনো ত্রুটি নেই। সমস্যাটা মানসিক। তুমি একজন মানসিক রোগের ডাক্তারের সঙ্গে কথা বল।' মনসুর সাহেব ডাক্তারের কথায় রেগে গিয়েছিলেন। আমেরিকান ডাক্তারদের এই সমস্যা। যখন কিছু ধরতে পারে না তখন বলে বসে — 'সমস্যাটা মানসিক।'

সেই মানসিক রোগের ডাক্তার তিনি দেখিয়েছিলেন। তিনিও কিছু ধরতে পারেন নি। ধরতে পারার কথা নয়। তাঁর জীবনে বড় কোনো দুর্ঘটনা কিংবা বড় কোনো আঘাতের ঘটনা ঘটে নি। প্রথম যৌবনে স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে। সে তো অনেকেরই হয়। তিনি আর বিয়ে করেন নি। চোখের সমস্যা তখনি দেখা দিতে শুরু করে।

মনসুর সাহেবের চোখ জ্বালা করছে। অনেকক্ষণ হল তাঁর চোখে চশমা নেই। চোখ জ্বালা করারই কথা। তিনি চশমা চোখে দিয়ে ডাকলেন — 'মকবুল!'

তাঁর ব্যক্তিগত বেয়ারা মকবুল ছুটে এল।

'কাল ঘরে এরোসল দিয়েছিলে?'

'একটা পুরা বোতল দিছি স্যার।'

'কাছে আস তো।'

মকবুল ভয়ে ভয়ে কাছে এগিয়ে এল। মনসুর সাহেব সহজ গলায় বললেন, 'টেবিলের গায়ে এই যে পোকা, এদের দেখতে পাচ্ছ?'

'পাচ্ছি স্যার।'

'কী পোকা এগুলি জান?'

'জানি না স্যার।'

'একটা পরিষ্কার বোতল জোগাড় কর। বোতলে কয়েকটা পোকা ভর।'

'জ্বি আচ্ছা স্যার।'

মকবুল বোতল আনতে ছুটে গেল। মনসুর সাহেব টেলিফোন হাতে তুলে নিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগে টেলিফোন করবেন। ডঃ ওসমান সেখানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছেন। বিলেতে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। ভালো পরিচয়। বিদেশের অন্তরঙ্গতা দেশে এলে থাকে না। তাঁদের রয়ে গেছে। মাঝে মাঝে তাঁদের কথা হয়। মনসুর সাহেব ঠিক করলেন ওসমানকে জিজ্ঞেস করবেন — এই পোকাগুলোর নাম কি? এতে লাভ কী হবে? আপাতত তিনি কোনো লাভ দেখতে পাচ্ছেন না। জানার জন্যেই জানা। মকবুল খালি বোতল নিয়ে এসেছে। বোতলে পোকা ভরার চেষ্টা করছে। ফাঁকে ফাঁকে বড় সাহেবের দিকে তাকাচ্ছে। মনসুর সাহেব খুব বিরক্তি বোধ করছেন।

গনি সাহেব লক্ষ করলেন আলতাফ চোখ বন্ধ করে আছে। দীর্ঘ সময় চোখ বন্ধ করে থাকে, তারপর চোখ খুলে কাগজে কি–সব যেন লিখে আবার চোখ বন্ধ করে ফেলে। গনি সাহেব এগিয়ে গেলেন।

'কী করছেন আলতাফ সাহেব?'

আলতাফ চোখ মেলে শান্ত গলায় বলল, 'এখন যান।'

'করছেনটা কী?'

'একটা জরুরি কাজ করছি।'

'আমি তো দেখছি চোখ বন্ধ করে আছেন, মাঝে মাঝে বিড়বিড় করছেন।'

'প্লিজ, এখন বিরক্ত করবেন না।'

'এমন কী কাজ যে চোখ বন্ধ করে থাকতে হয়? চোখ বন্ধ করে একটা কাজই ভালো করে করা যায়। তার নাম ঘুম।'

'গনি সাহেব, দয়া করে আমাকে বিরক্ত করবেন না।'

'আচ্ছা ভাই, আচ্ছা। আর বিরক্ত করব না। আপনি বড় সাহেবের পেয়ারের লোক। বিরক্ত করে শেষে কোন্ ঝামেলায় পড়ি! শেষে দেখা যাবে চাকরিই খতম। নো জব। ছেলেমেয়ে নিয়ে না খেয়ে থাকতে হবে।'

আলতাফ কিছু বলল না। চোখ বন্ধ করে ফেলল। তাকে পোকাদের সাহায্য নিয়ে লেখাটা শেষ করতে হচ্ছে। তারা তেমন সাহায্য করে না। একটা শব্দ বলে আবার সেটা দিয়ে অন্য শব্দ বলে। আলতাফ লিখেছে —

হে মানব সম্প্রদায়। তোমাদের জন্যে আছে অন্ধকার ভবিষ্যৎ। কারণ তোমরা অন্ধকারের জীব। তোমাদের সৃষ্টি হয়েছিল অন্ধকারের জন্যে। তোমরা সেখানেই ফিরে যাবে। ফিরে যেতে হবে শুরুতে।

একই লেখা আবার অন্যভাবে লিখতে হয়েছে। কারণ পোকারা কিছু কিছু শব্দ বদলে দিয়েছে। আলতাফ আবার লিখল —

অভিবাদন মানব সম্প্রদায়! তোমাদের জন্য আছে মঙ্গলময় অন্ধকার। কারণ তোমাদের মঙ্গল অন্ধকারে। মঙ্গলের জন্যে তোমাদের সৃষ্টি। তোমরা সৃষ্টিতে ফিরে যাবে। এক বিন্দুতেই আদি ও অন্ত।

এ নিয়ে মোট চারটা অনুবাদ তৈরি হল। আলতাফ এই চারটার মধ্যে কোন্‌টা রাখবে বুঝতে পারছে না। পোকারা বলছে — কোনোটা ফেলা যাবে না। প্রতিটিই সত্য। সত্য এক ও অভিন্ন নয়। সত্যের অনেক ছবি। প্রতিটি ছবি আলাদা আলাদা সত্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১০

ডঃ ওসমান বোতলে ভর্তি পোকাগুলির দিকে তাকিয়ে আছেন। মনসুর বললেন, 'এদের নাম কি?'

ডঃ ওসমান হাসিমুখে বললেন, 'এদের নাম হল পোকা। ইনসেক্ট।'

'কী পোকা?'

'বৈজ্ঞানিক নাম চাও, না সাধারণ নাম হলেই চলবে?'

'সাধারণ নাম জানলেই হবে।'

এরা এক ধরনের উইপোকা। উইপোকার অনেক ভ্যারাইটি আছে। এটা হল বিশেষ এক ভ্যারাইটি। এরা সাধারণত মৃত জীবজন্তুর গায়ে ঘুরে বেড়ায়। দেখতে পিঁপড়ার মতো হলেও পিঁপড়াদের সঙ্গে তাদের খানিকটা প্রভেদ আছে। পিঁপড়ারা মৃত জীবজন্তু খেয়ে ফেলে। এরা খায় না। শুধু ঘুরে বেড়ায়।

'কেন?'

'কেন তা জানি না। ওদের জিজ্ঞেস করা হয় নি।'

ডঃ ওসমান শরীর দুলিয়ে হাসতে লাগলেন। মনসুর সাহেব বন্ধুর হাসিতে যোগ দিতে পারলেন না। রসিকতা কখনোই তাঁকে আকর্ষণ করে না। হাসি থামিয়ে ওসমান সাহেব বললেন,

'মনসুর!'

'হুঁ।'

'হঠাৎ পোকা নিয়ে মেতেছ কেন? পোকা তোমার বিষয় না।'

'মানুষের বিষয় তো বদলায়।'

'তোমার কি বদলেছে?'

'বুঝতে পারছি না। আচ্ছা, আরেকটা কথা — পোকাদের কি বোধশক্তি আছে? মানে চিন্তা বা কল্পনা করার ক্ষমতা আছে?'

'বোধ চিন্তা কল্পনা এইসব উচ্চমার্গের বিষয়ের জন্যে দরকার মস্তিষ্ক, ঘিলু। তা পোকাদের নেই বললেই হয়। ওরা বেঁচে থাকে instinct-এর উপর। ওদের চালিকাশক্তি instinct, মস্তিষ্ক নয়।'

'ঘিলুর পরিমাণ বেশি থাকলেই বোধ, চিন্তা এবং কল্পনা এইসব বেশি থাকবে?'

'অবশ্যই।'

'গরু এবং গাধার মাথায় তো অনেকখানি মগজ থাকে। অন্তত মুরগির চেয়ে বেশি থাকে। কিন্তু গরুর বোধ বা বুদ্ধি কোনোটাই মুরগির চেয়ে বেশি না।'

ডঃ ওসমান কিছুক্ষণ স্থির চোখে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'তোমার মূল সমস্যাটা বল। তারপর যুক্তি-তর্কে যাওয়া যাবে।'

'সমস্যা কিছু না।'

'কিছু না বললে তো হবে না। কিছু-একটা তো আছেই। Whit is that?'

মনসুর সাহেব সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, 'আমাদের অফিসের একজন কর্মচারী — তার ধারণা, সে পোকাদের সঙ্গে কম্যুনিকেট করতে পারে। পোকারা তার সঙ্গে কথা বলে।'

ওসমান সাহেব মোটেই চমকালেন না। স্বাভাবিক গলায় বললেন, 'পৃথিবীতে অনেক লোক আছে যারা জ্বিন, পরী বিশ্বাস করে — । এদের সঙ্গে তারা কথা বলে। অনেকে আছে যারা প্রেতাত্মার সঙ্গে কথা বলে। তাতে কি যায় আসে। পৃথিবীতে কোটি কোটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষ। তাদের অতি ক্ষুদ্র এক ভগ্নাংশ কী বলছে না বলছে তা মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাদের স্থান হওয়া উচিত পাগলাগারদে।'

'পাগলাগারদে?'

'অবশ্যই পাগলাগারদে।'

'শুধু শুধু একটা লোক কেন বলবে — সে পোকাদের কথা বুঝতে পারে?'

'অন্যদের বোকা বানানোর জন্যে বলবে। তোমার অফিসের ঐ কর্মচারী তোমাকে এই কথা বলেছে, কারণ, সে তোমাকে বোকা বানাতে চেয়েছে। তার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। তুমি বোকা বনেছ। কারণ তুমি খানিকটা হলেও ব্যাপারটা বিশ্বাস করেছ।'

'আমার অফিসের ঐ কর্মচারীটা বোকা ধরনের। আমার মনে হয় না সে আমাকে বোকা বানাতে চায়।'

'তাহলে ধরে নিতে হবে — তোমার ঐ কর্মচারীটির মাথা খারাপ। কায়দা করে তাকে দু-একটা প্রশ্ন করলেই পুরো ব্যাপার বের হয়ে যাবে। তুমি কি তাকে জেরা করেছ?'

'না।'

'জেরা কর। সহজ জেরা না। ঘাঘু উকিলের জেরা। দেখবে সব বের হয়ে আসবে। তারপর তাকে গলাধাক্কা দিয়ে অফিস থেকে বের করে দাও। এ জাতীয় লোক প্রতিষ্ঠানের জন্যে ক্ষতিকর।'

মনসুর সাহেব চুপ করে রইলেন। ওসমান সাহেব বললেন, 'তোমার হয়ে আমি তাকে প্রশ্ন করতে পারি। করব ?'

'বেশ তো কর। এখনি চল আমার সঙ্গে। যাবে ?'

ওসমান সাহেব বললেন, 'যাওয়া যেতে পারে।'

তাঁরা অফিসে পৌঁছলেন পাঁচটার কিছু পরে। আলতাফকে পাওয়া গেল না। সে ঠিক পাঁচটায় অফিস থেকে বের হয়ে গেছে।

ওসমান সাহেব বললেন, 'লোকটার বাসায় যাওয়া যায়। সেটাই ভালো হবে। বাসার ঠিকানা জানা আছে?'

মনসুর সাহেব বললেন, 'ঠিকানা বের করা কোনো সমস্যা না। তুমি কি সত্যি যাবে?'

'হ্যাঁ যাব।'

'চল যাই। যদিও আমার এখন মনে হচ্ছে আমরা খানিকটা বাড়াবাড়ি করছি।'

ওসমান সাহেব কিছু বললেন না। তাঁর মুখের বিরক্ত ভাব আরো স্পষ্ট হল। তিনি কোনো রকম আগ্রহ বোধ করলেন না। তবে তা মনসুর সাহেবকে জানাতেও চান না। ক্ষমতাবান বন্ধুদের সামান্য আগ্রহকেও বড় করে দেখতে হয়। এটাই নিয়ম। "একটা লোক পোকার সঙ্গে কথা বলে" — ব্যাপারটাই হাস্যকর। হাস্যকর জেনেও তিনি প্রশ্রয় দিচ্ছেন, কারণ মনসুরকে প্রশ্রয় দিতে হয়। সবাই দেবে। সমাজ এটা ঠিক করে দিয়েছে।

১১

অনেকক্ষণ ধরে দরজার কড়া নড়ছে। সন্ধ্যাবেলা কেউ এলে বজলুর রহমান অত্যন্ত বিরক্ত হন। বেকুব লোকজন বেছে বেছে সন্ধ্যাবেলা মানুষের বাসায় যায়। এদের কানে ধরে ঠাশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে মাথায় একটা বাড়ি দেয়া উচিত। সভ্য সমাজে বাস করে এই কাজ করা সম্ভব না। বজলুর রহমান দরজা খুললেন। দুজন লোক দাঁড়িয়ে। একজনের চোখে আবার সন্ধ্যাবেলাতেই কালো চশমা।

'এটা কি আলতাফ সাহেবের বাসা?'

বজলুর রহমান বিরক্ত গলায় বললেন, 'এটা আলতাফের বাসা হবে কেন? এটা আমার বাসা। বাসাও না, এটা হল বাড়ি। আমার নিজের বাড়ি।'

'আলতাফ সাহেব কি ভাড়াটে?'

'হ্যাঁ, ভাড়াটে বলা যায়। তবে ওর কাছ থেকে ভাড়া নেই না। আমি ওর মামা। আপনারা কে?'

'আমরা উনার অফিসেই আছি।'

'কলিগ?'

'জ্বি, কলিগ। আলতাফ সাহেব কি বাসায় আছেন?'

'না, নেই। কাঁচা বাজারে পাঠিয়েছি। ঘরে দুদিন ধরে বাজার নেই। আপনারা বসুন, এসে পড়বে।'

'আসতে কি দেরি হবে?'

'দেরি হবার কথা না। তবে গাধা টাইপের ছেলে তো — হতেও পারে। কিছুই বলা যায় না।'

'আমরা না হয় কিছুক্ষণ বসি?'

'বসুন।'

বজলুর রহমান বসার ঘর খুলে দিলেন। ঘর অন্ধকার। বজলুর রহমান বিরক্ত গলায় বললেন, 'অন্ধকারে বসে থাকতে হবে। ইলেকট্রিক লাইনে গণ্ডগোল হয়েছে। বাতি জ্বলে না। গাধাটাকে বলেছি একটা মিস্ত্রি ডেকে আনতে। সেটা মনে থাকে না। আপনারা বসুন, দেখি ঘরে মোম-টোম কিছু আছে কিনা।'

মনসুর সাহেব বললেন, 'আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না।'

'ব্যস্ত হচ্ছি না। ঘরে মোমবাতি আছে কিনা সেটা খোঁজা কোনো ব্যস্ততা না। আপনারা চা খাবেন?'

ওসমান সাহেব বললেন, 'অসুবিধা না হলে খেতে পারি।'

'অসুবিধা তো হবেই। সন্ধ্যাবেলা হল কাজকর্মের সময়, নামাযের সময়। তার উপর ঘরে নেই কাজের লোক। অসুবিধা হবে না তো কি?'

'তাহলে থাক।'

'থাকবে কেন? চা খেতে চেয়েছেন, খাবেন। অসুবিধা হলেও ব্যবস্থা হবে।'

বজলুর রহমান ঘর ছেড়ে বের হয়ে গেলেন। ওসমান সাহেব নিচু গলায় বললেন, 'ইন্টারেস্টিং কারেক্টার। এই পরিবারের একজন সদস্য পোকার সঙ্গে কথা বলবে, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এটাই স্বাভাবিক।'

মোমদানে মোমবাতি নিয়ে ঘরে ঢুকল দুলারী। মনসুর সাহেব এবং ডঃ ওসমান দুজনই চমকে উঠলেন। অসম্ভব রূপবতী একজন তরুণী। মোমবাতি হাতে ঘরে ঢুকতেই ঘরের চেহারা পাল্টে গেল। দুলারী বলল, 'ও এসে পড়বে। আপনারা একটু বসুন। আমি চা দিচ্ছি। বাবা নামায পড়ছেন। আপনাদের কিছুক্ষণ একা একা বসতে হবে।'

মনসুর সাহেব বললেন, 'কোনো অসুবিধা নেই।'

দুলারী বলল, 'আপনারা কি ওর অফিস থেকে এসেছেন?'

'জ্বি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'অফিসে কি কোনো ঝামেলা হয়েছে?'

'না, কোনো ঝামেলা হয় নি। আপনার পরিচয় কি জানতে পারি?'

দুলারী লজ্জিত গলায় বলল, 'আমি ওর স্ত্রী।'

তাঁরা দুজন আবারো একটা ধাক্কা খেলেন। বড় ধরনের ধাক্কা। আলতাফ টাইপের লোকদের যেন এ রকম স্ত্রী মানায় না। এরকম স্ত্রী থাকা উচিতও নয়। এদের স্ত্রীরা হবে হাবাগোবা ধরনের। কালো, রোগা মুখে মেছেতার দাগ। ঘরের কাজ সারতে সারতে যাদের নাভিশ্বাস উঠবে। যাদের কোলে সব সময় রোগাভোগা একটা শিশু থাকবে। যার একমাত্র লক্ষ্য থাকবে মায়ের বুকের দুধের দিকে।

দুলারী চা নিয়ে ঢুকল। শুধু চা। মনসুর সাহেব লক্ষ করলেন কাপ পরিষ্কার, পিরিচে চা জমে নেই। তারচেয়েও বড় কথা — তিনটা কাপ। মেয়েটিও বোধহয় তাদের সঙ্গে চা খাবে। এইসব পরিবারে এ ধরনের ভদ্রতা ঠিক আশা করা যায় না। এরা সচরাচর সর–ঠাণ্ডা চা কাজের লোক দিয়ে পাঠিয়ে দেয়। একটা পিরিচে থাকে মিয়ানো টক স্বাদের কিছু বাসি চানাচুর।

মনসুর সাহেব বললেন, 'সরি, আপনাকে কষ্ট দিলাম।'

দুলারী বলল, 'কষ্ট কিসের? কোনো কষ্ট না।' বলেই খানিকটা অস্বস্তির সঙ্গে বলল, 'ওর অফিসে কোনো ঝামেলা হয় নি তো?'

মনসুর সাহেব বললেন, 'না, কোনো ঝামেলা হয় নি। আপনি কোনো দুশ্চিন্তা করবেন না।'

দুলারী বলল, 'ওকে নিয়ে আমি খুব দুশ্চিন্তার মধ্যে থাকি।'

ওসমান সাহেব কৌতূহলী গলায় বললেন, 'দুশ্চিন্তা কেন?'

'এমনি দুশ্চিন্তা।'

ওসমান সাহেব খানিকটা ঝুঁকে এসে বললেন, 'উনার পোকার ব্যাপারটা কি আপনি জানেন?'

দুলারী হকচকিয়ে গেল। নিজেকে সে চট করে সামলে নিয়ে বলল, 'ঐসব কিছু না।'

'আপনার সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা হয় না?'

'মাঝেমধ্যে বলে।'

'কী বলে?'

দুলারী শংকিত গলায় বলল, পোকা নিয়ে কি অফিসে কোনো সমস্যা হয়েছে?'

মনসুর সাহেব বললেন, 'না, কোনো সমস্যা হয় নি। উনি বলছিলেন, পোকাদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ আছে। শুনে আমি কৌতূহল বোধ করছি। এরকম তো সাধারণত শোনা যায় না। ব্যাপারটা কি সত্যি?'

'জানি না।'

'আপনার সঙ্গে এ নিয়ে কোনো আলাপ হয় না?'

'ও কথা–টথা বিশেষ বলে না।'

'আপনাদের বিয়ে হয়েছে কতদিন হল?'

'অল্পদিন।'

'আচ্ছা, আলতাফ সাহেবের এক মামাত বোন আছে— দুলারী। সে কি এ বাড়িতে আছে ?'

দুলারী চমকে উঠে বলল, 'আমার নামই দুলারী।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনসুর সাহেব অস্বস্তির সঙ্গে বললেন, 'আচ্ছা আচ্ছা। আলতাফ সাহেব তার মামাত বোনের কথা আমাকে বলেছিলেন, কিন্তু তাকেই বিয়ে করেছেন তা বলেন নি।'

'ও নিজ থেকে কিছু বলবে না। জিজ্ঞেস করলে উত্তর দেবে। জিজ্ঞেস না করলে চুপ করে থাকবে।'

'আপনি পোকাদের ব্যাপারে তাঁকে কিছু জিজ্ঞেস করেন নি?'

'করেছি।'

'উনি কী বলেন — আসলেই পোকারা তাঁর সঙ্গে কথা বলে?'

'হুঁ।'

'আপনি তাঁর কথা বিশ্বাস করেন?'

'হুঁ।'

'কেন বিশ্বাস করেন? আপনি কোনো প্রমাণ পেয়েছেন?'

'না।'

'তাহলে বিশ্বাস করেন কেন?'

'ও তো কখনো মিথ্যা কথা বলে না।'

আলতাফ এই পর্যায়ে বাজারের ব্যাগ হাতে ঘরে ঢুকল। মনসুর সাহেবকে দেখে সে মোটেই অবাক হল না। যেন এটাই স্বাভাবিক। অফিসের বড় সাহেবকে সন্ধ্যাবেলা ঘরে বসে থাকতে দেখা যেন খুবই সাধারণ ঘটনা। মনসুর সাহেবই আগ বাড়িয়ে কথা বললেন, 'আলতাফ সাহেব, ভালো আছেন?'

'জ্বি স্যার।'

'বাজার করে ফিরলেন?'

'জ্বি স্যার।'

'আপনার সঙ্গে কথা বলার জন্যে এসেছি। আমার বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি। উনি ডঃ ওসমান। মাস্টারি করেন। আপনি বরং হাত-মুখ ধুয়ে আসুন।'

'জ্বি আচ্ছা, স্যার।'

'আমরা অসময়ে এসে আপনার অসুবিধা করলাম না তো?'

'জ্বি না।'

মনসুর সাহেব কৈফিয়ত দেবার মতো ভঙ্গিতে বললেন, 'পোকামাকড় হচ্ছে আমার বন্ধুর বিষয়। সে এই বিষয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ায়। তার আগ্রহেই আপনার কাছে আসা।'

'জ্বি আচ্ছা, স্যার।'

'যান, আপনি হাত-মুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে আসুন।'

আলতাফ চলে গেল। আলতাফের সঙ্গে দুলারীও বের হয়ে গেল। তার অনেক কাজ। রান্না চড়াতে হবে। ঘরে মসলা নেই। মসলা পিষতে হবে। বাজারের গুঁড়া মসলা বজলুর রহমান খান না। ঘরে কাজের লোক নেই।

ডঃ ওসমান মনসুর সাহেবের দিকে ঝুঁকে এসে বললেন, 'বেকুব ধরনের মানুষ বলে মনে হচ্ছে।'

মনসুর কিছু বললেন না। ডঃ ওসমান বললেন, 'এদের পেছনে সময় নষ্ট করার কোনো মানে হয় না।'

'চলে যেতে চাও?'

'এসেছি যখন বসি।'

আলতাফ এসে সামনে বসল। তার বসার ভঙ্গিতে কোনো রকম দ্বিধা বা সংকোচ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখা গেল না। ডঃ ওসমান হাসিমুখে বললেন, 'আলতাফ সাহেব, আপনার পোকাদের বিষয়ে কিছু বলুন।'

'কী বলব?'

'যা বলতে চান বলুন।'

'কিছু বলতে চাই না, স্যার।'

'বলায় সমস্যা আছে?'

'জ্বি না। ইচ্ছা করে না।'

ওসমান সাহেবের ভ্রূ কুঁচকে উঠল। লোকটা যে নির্বোধ এ বিষয়ে তিনি পুরোপুরি নিঃসন্দেহ হলেন। একমাত্র নির্বোধরাই অফিসের বড় সাহেবের সামনে এমন ভঙ্গিতে কথা বলার সাহস পায়। ওসমান সাহেব কঠিন গলায় বললেন, 'আমি শুনেছি পোকাদের সঙ্গে আপনার ভাবের আদান-প্রদান হয়।'

আলতাফ চুপ করে রইল। ওসমান সাহেব অসহিষ্ণু স্বরে বললেন, 'জবাব দিচ্ছেন না কেন? ওদের চিন্তাভাবনা আপনি নাকি বুঝতে পারেন?'

'সবসময় পারি না। ওরা যখন ইচ্ছা করে তখনই শুধু বুঝি। ওরা ইচ্ছা না করলে পারি না।'

'ওদের কথা বুঝতে হলে তো ওদের বুদ্ধিবৃত্তি আপনার স্তরে আসতে হবে।'

'ওদের অনেক বুদ্ধি, স্যার।'

'তাই নাকি?'

'জ্বি।'

'ওদের বুদ্ধির একটা প্রমাণ দিতে পারেন?'

আলতাফ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'আমার বাসায় যে তেলাপোকা আছে সে যে কোনো সময় আমেরিকার একটা তেলাপোকার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে। মানুষ তা পারে না।'

ডঃ ওসমান হেসে ফেলতে যাচ্ছিলেন। অনেক কষ্টে হাসি থামিয়ে বললেন, 'তাহলে তো ইচ্ছা করলে আপনি যে কোনো মুহূর্তে একটা খবর তেলাপোকার মাধ্যমে আমেরিকায় পাঠিয়ে দিতে পারেন। আপনি একটা কাজ করুন তো...'

'কী কাজ?'

'আমার এক ভাই থাকে ক্যালিফোর্নিয়ার পেনসিলভেনিয়ায়। তার ঠিকানা দিচ্ছি। আপনি তেলাপোকার মাধ্যমে খবর এনে দিন ওদের ছেলেমেয়ে কটি। তাহলে বুঝব আপনার তেলাপোকার ক্ষমতা আছে। পারবেন না?'

'জ্বি না, স্যার।'

'পারবেন না কেন?'

আমরা যেমন ঠিকানা বলি — এত নং বাড়ি, এই রাস্তার নাম — সেটা তেলাপোকাদের অজানা। আমি আমেরিকা বললেও কিছু বুঝবে না। তারা জায়গা চেনে গন্ধ দিয়ে। ওদের কাছে এক এক জায়গার এক এক রকম গন্ধ।

'ও আচ্ছা, একেক জায়গার একেক রকম গন্ধ।'

'জ্বি স্যার।'

'ভালো। নতুন জিনিস জানা গেল।'

'এরা মানুষের চিন্তাভাবনা কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করে।'

'এটাও নতুন তত্ত্ব। আপনি বলতে চাচ্ছেন যে, আমরা কী করব না করব তা ঠিক করে দেবে পোকারা?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'জ্বি স্যার। এরা খুব সূক্ষ্মভাবে করে। চট করে ধরা যাবে না।'

'আপনার মতো দুই–একজন লোক শুধু ধরতে পারে, তাই না?'

'জ্বি।'

মনসুর সাহেব এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। তিনি চুপ করে থাকবেন বলেই ভেবেছিলেন, এখন আর কথা না বলে পারলেন না। বিরক্ত গলায় বললেন, 'তাহলে তো আলতাফ সাহেব, আমাদের ধরে নিতে হয় যে পোকাদের প্রচণ্ড ক্ষমতা।'

'ঠিক বলেছেন, স্যার। অসম্ভব ক্ষমতা। একবার পৃথিবী জুড়ে প্লেগ মহামারি হল। কোটির উপর মানুষ মারা গেছে। পোকারাই এটা করেছে।'

'আমি যতদূর জানি প্লেগ ছড়িয়েছিল ইঁদুর।'

'প্লেগের জীবাণু এনে দিয়েছিল তেলাপোকারা। তারা ইঁদুর দিয়ে ছড়িয়ে দিয়েছে। পোকারা মানুষদের যেমন নিয়ন্ত্রণ করে, অন্য জীবজন্তুদেরও নিয়ন্ত্রণ করে।'

ওসমান সাহেব হাসি চাপবার জন্য কয়েকবার কাশলেন। আলতাফ বলল, 'স্যার, এই পৃথিবীটা পোকাদের। ওরা আমাদের থাকতে দিচ্ছে বলেই থাকতে পারছি। অর্থাৎ আমরা ওদের করুণায় বেঁচে আছি।'

ওসমান সাহেব বললেন, 'আপনার কথা শুনে আনন্দিত হলাম। মজা পাওয়া গেল। শেষ প্রশ্ন — পোকারা এইসব কথা বলার জন্যে আপনাকে খুঁজে বের করল? আরো তো লোক ছিল — নাকি তাদের মতে আপনিই একমাত্র জ্ঞানী ব্যক্তি? আপনাকে ওদের পছন্দ করার কারণ কি?'

'ওদের জিজ্ঞেস করি নি।'

'সময় পেলে জিজ্ঞেস করবেন। আজ উঠি?'

'জ্বি আচ্ছা, স্যার।'

উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে ওসমান সাহেব বললেন, 'পোকাদের একটা ডেমনস্ট্রেশন হলে মন্দ হত না। আলতাফ সাহেব পোকাদের সঙ্গে কথা বলছেন। আমরা শুনছি, এরকম একটা কিছু। পারবেন আলতাফ সাহেব?'

'আলতাফ বলল, জ্বি না স্যার।'

'কিছু মনে করবেন না আলতাফ সাহেব। আমার ধারণা, আপনি অন্যদের বোকা বানিয়ে আনন্দ পান। এই কাজটি করবেন না।'

আলতাফ কিছু বলল না। ওসমান সাহেব বললেন, 'আপনার উচিত কোনো সাইকিয়াট্রিস্টের সঙ্গে কথা বলা। মানুষকে ভাঁওতা দিয়ে বেড়ানো এক ধরনের অসুস্থতা। বুঝতে পারছেন?

'পারছি স্যার। কিন্তু আমি সত্যি কথাই বলছি।'

'সত্যি কথা বললে তো ভালোই।'

ঠিক তখন উড়তে উড়তে ঘরে একটা তেলাপোকা ঢুকল। পোকাটা বসল ওসমান সাহেবের পায়ের কাছে।

আলতাফ চমকে উঠে বলল, 'ওকে স্যার মারবেন না।'

ওসমান সাহেব পোকাটাকে মারতেন না। পোকা মেরে আনন্দ পাবার বয়স তাঁর নেই। কিন্তু আলতাফের কথা শুনেই সম্ভবত — জুতো দিয়ে পিষে ফেললেন।

পথে নেমেই ওসমান সাহেব বললেন, 'মনসুর, তোমার প্রথম কাজ হচ্ছে— এই মহা বেকুবকে তুমি অফিস থেকে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দেবে। তোমার দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে — আমার সময় নষ্ট করার জন্য জরিমানা দেবে। বড় ধরনের জরিমানা।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১২

বড় সাহেব জরুরি একটা ফাইল দিয়েছিলেন। সেই ফাইল আলতাফ ড্রয়ারে তালাবন্ধ করে রেখেছিল। আশ্চর্যের ব্যাপার, ফাইলটা নেই! ড্রয়ার ঠিকই তালাবন্ধ। ড্রয়ারের চাবি আলতাফের কাছে।

গনি সাহেব পান চিবুতে চিবুতে কাছে এসে বললেন, 'সমস্যাটা কি?'

আলতাফ বলল, 'ফাইল পাচ্ছি না।'

'তালাবন্ধ ছিল?'

'হুঁ।'

'তাহলে তো বিরাট সমস্যা। চিন্তার বিষয়। ভালো করে চিন্তা করে দেখুন বাসায় নিয়ে যান নি তো?'

'না।'

'এ অফিসে তো এ রকম কখনো হয় নি। বদরুল সাহেবকে ইনফর্ম করুন।'

'তাঁকে ইনফর্ম করব কেন?'

গনি সাহেব বিরক্তমুখে বললেন, 'আপনি তো ভাই বড় প্যাঁচালের লোক। তাঁকে ইনফর্ম করবেন না কেন? তিনি হচ্ছেন আপনার সেকশনের চার্জে। যে কোনো সমস্যা হলে আগে তাঁকে বলতে হবে। নাকি আপনি ঘোড়া ডিঙিয়ে খাস খাবেন? সরাসরি চলে যাবেন বড় সাহেবের কাছে? আপনার নৌকা তো আবার বড় খুঁটিতে বাঁধা।'

আলতাফ ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারছে না। কেউ কি ড্রয়ার খুলে ফাইল নিয়ে গেছে? কেন নেবে? স্টোর-ইন-চার্জের কাছে সবার ড্রয়ারেরই চাবি থাকে। তিনি কি কোনো কারণে খুলেছেন? অসম্ভব কিছু না। বড় সাহেব হয়তো ফাইল চেয়েছেন। স্টোর-ইন-চার্জ খুলে দিয়েছেন। এ ছাড়া আর কি হতে পারে?

আলতাফ স্টোর-ইন-চার্জ খায়রুল কবিরকে খুঁজে বের করল। খায়রুল কবির আকাশ থেকে পড়লেন।

'কী বলছেন আপনি! আমি কেন আপনার ড্রয়ার খুলব? এ ধরনের এলিগেশন সাবধানে দেবেন।'

'আমি এলিগেশন দিচ্ছি না। জানতে চাচ্ছি।'

'ব্যাপার একই। বড় সাহেবের সঙ্গে দহরম-মহরম বলে ধরাকে সরা দেখছেন? পেয়েছেন কী আপনি? কী ভাবেন আমাকে?'

'আপনি শুধু শুধু রাগ করছেন।'

'আপনার সঙ্গে কোনো কথা বলতে চাচ্ছি না। দয়া করে বিদেয় হোন। আপনার সাহস দেখে অবাক হচ্ছি। আমাকে সরাসরি চোর বললেন —'

'চোর তো বলি নি —।'

'অবশ্যই বলেছেন। ভেবেছেন কী আপনি?'

আলতাফ হতভম্ব হয়ে গেল। এই লোকটা এমন করছে কেন? কেন শুধু শুধু রেগে যাচ্ছে? সে নিজের জায়গায় ফিরে এল। কী করবে বুঝতে পারছে না। বড় সাহেবকে জানানো উচিত। সাহসে কুলাচ্ছে না। ভয় ভয় লাগছে। আলতাফ ড্রয়ার বন্ধ করে ক্যান্টিনের দিকে রওনা হল। ক্যান্টিনে সে কখনো আসে না। এই প্রথম আসা। কোনার দিকে একটা খালি টেবিলে একা একা বসে রইল। ক্যান্টিনের বেয়ারা এক কাপ চা না চাইতেই দিয়ে গেল। অসময়ে চা খাওয়া তার অভ্যাস নেই। তবু সে চায়ে চুমুক দিচ্ছে। কিছুতেই ভেবে পাচ্ছে না অফিসের মানুষগুলো তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করছে কেন। সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তো কারো সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে না।

'এই যে আলতাফ সাহেব! কী করছেন একা একা?'

গনি সাহেব চা নিয়ে এগিয়ে এলেন।

'আলতাফ সাহেব! বসব আপনার সঙ্গে?'

'বসুন।'

'আপনি তো দেখি বিরাট ভেজাল লাগিয়ে ফেলেছেন।'

'কী ভেজাল লাগিয়েছি?'

'স্টোর-ইন-চার্জ খায়রুল কবির সাহেবকে আপনি নাকি চোর বলেছেন? উনি তো দারুণ রেগেছেন। আমি ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করেছি। লাভ হয় নি। উনি বোধহয় বড় সাহেবের কাছে কমপ্লেইন করতে যাবেন। আমার সে রকম মনে হল।'

আলতাফ কিছু বলল না। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। গনি সাহেব বললেন, 'আপনার তো চিন্তার কিছু নেই। বড় সাহেব হলেন আপনার খাতিরের লোক। সিগারেট খাবেন নাকি আলতাফ সাহেব?'

'আমি সিগারেট খাই না।'

'খেয়ে দেখুন। টেনশনের সময় কাজে লাগে। ব্রেইন পরিষ্কার হয়। এই সময় ব্রেইনটা পরিষ্কার থাকা দরকার। বড় সাহেবকে ফাইলের ব্যাপারে কী বলবেন ভেবে রাখুন। উনি দারুণ রেগেছেন। আপনাকে এক্ষুনি ডেকে পাঠাবেন।'

গনি সাহেব সিগারেট ধরিয়ে তৃপ্তির নিশ্বাস ফেললেন। তৃপ্তি ষোলআনা হচ্ছে না। আলতাফ তেমন ভয় পাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না। আশ্চর্য মানুষ! ভয়ে অস্থির হয়ে যদি তাকে ধরে পড়ত, কান্নাকাটি করত, সে সামাল দিতে চেষ্টা করত। হারানো ফাইলও তো মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। আলতাফ পাথরের মতো মুখ করে বসে আছে। ভয়ভীতির কোনো লক্ষণ নেই। চাকরি এখনো কনফার্ম হয় নি। এক কথায় চাকরি চলে যাবে — সেই চিন্তাও মাথায় নেই।

'নিন, সিগারেট নিন আলতাফ সাহেব।'

'আমি সিগারেট খাই না।'

'আহা, একটা খেলে কিছু হবে না।'

'জ্বি না।'

'আচ্ছা থাক। খেতে হবে না। আর শুনুন, এত চিন্তা করবেন না। চিন্তা করে লাভ তো কিছু নেই। যা হবার হবেই।'

আলতাফ ছোট্ট করে নিশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল। গনি সাহেব বললেন, 'যাচ্ছেন কোথায়? বড় সাহেবের কাছে? নিজ থেকে যাওয়া ঠিক হবে না। বড় সাহেব ডাকুক, তারপর যাবেন। এর মধ্যে ভেবে ভেবে একটা প্ল্যান অব অ্যাকশান বের করুন।'

বড় সাহেবের খাস বেয়ারা মকবুল এসে ঢুকল। গনি সাহেবের দিকে তাকিয়ে বলল, 'স্যার আপনেরে ডাকে।'

গনি সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, 'আমাকে কেন? তুমি বোধহয় ভুল করছ। উনি আলতাফ সাহেবকে ডাকেন।'

'জ্বে না। আপনেরে ডাকেন। স্পষ্ট কইরা বলছেন — গনি।'

গনি সাহেব দরজার বাইরে থেকে বললেন, 'স্যার আসব?'

বড় সাহেব বললেন, 'ইয়েস। কাম ইন প্লিজ।'

তিনি ঘরে ঢুকে হাসিমুখে বললেন, 'কেমন আছেন স্যার?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বড় সাহেব তার উত্তর না দিয়ে বললেন, 'বসুন।'

তিনি বসলেন। বসতে বসতে তাঁর মনে হল — কিছু একটা হয়েছে। দুয়ে দুয়ে চার মিলছে না। ব্যাপারটা কী?

মনসুর সাহেব ফাইলে চোখ বুলাচ্ছিলেন। ফাইল বন্ধ করে তাকালেন। তাঁর চোখ কালো চশমার আড়ালে বলে গনি সাহেব বড় সাহেবের চোখের ভাব ধরতে পারলেন না। তাঁর অস্বস্তি আরো বাড়ল।

'গনি সাহেব!'

'জ্বি স্যার।'

'ব্যাপারটা কী বলুন তো?'

'কী ব্যাপার স্যার? আমি তো কিছু জানি না।'

'আমি আলতাফ সাহেবকে একটা জরুরি ফাইল দিয়েছিলাম, সেটা জানেন?'

'জ্বি না স্যার। আমি তো কিছুই জানি না। কী ফাইল?'

মনসুর আলি জবাব দিলেন না। স্থির চোখে তাকিয়ে রইলেন। গনি সাহেব সঙ্গে সঙ্গে বুঝে গেলেন, তিনি একটা বড় বোকামি করেছেন। ফাইল সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না তা বলা ঠিক হয় নি। কারণ এর মধ্যে স্টোর-ইন-চার্জ খায়রুল কবির নিশ্চয়ই বড় সাহেবের সঙ্গে কথা বলেছে। কথা প্রসঙ্গে তার কথা আসতে পারে। আসাটাই স্বাভাবিক।

'গনি সাহেব!'

'জ্বি স্যার।'

'ফাইল সম্পর্কে আপনি কিছুই জানেন না দেখে অবাক হচ্ছি। একটু আগে খায়রুল কবির এসেছিলেন। তিনি বললেন, আপনি এই ফাইল হারানোর ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তিত।'

'ও আচ্ছা। আমি স্যার কিছুক্ষণ আগেই জেনেছি। আগে কিছুই জানতাম না। আমি ভেবেছি, আপনি জানতে চাচ্ছেন আগে কিছু জানতাম কিনা।'

মনসুর সাহেব ড্রয়ার খুলে সিগারেটের কেইস থেকে সিগারেট বের করলেন। গনি সাহেব বললেন, 'আমি স্যার খুব চিন্তা করছি — এটা হল কী করে? ড্রয়ারে তালাবন্ধ করা ফাইল হাওয়ায় তো উড়ে যেতে পারে না।'

'আপনার কী মনে হয়? কোথায় গেছে?'

'বুঝতে পারছি না। তবে আলতাফ সাহেব বাসায় নিয়ে যেতে পারেন। মাঝে মাঝে তিনি বাসায় ফাইল নিয়ে যান।'

'তাই নাকি?'

'জ্বি।'

'ও আচ্ছা।'

'স্যার, আমি কি চলে যাব?'

'একটু বসুন।'

মনসুর আলি সিগারেট টানতে লাগলেন। গনি সাহেব এই ঠাণ্ডা ঘরে বসেও ঘামতে লাগলেন।

'গনি সাহেব!'

'জ্বি স্যার।'

'ফাইলটা খুব জরুরি। আজ সন্ধ্যার মধ্যে আপনি এটা বের করে দেবেন।'

'আমি কোথেকে বের করব?'

'আপনি খুব কর্মঠ মানুষ। আপনার বুদ্ধি-শুদ্ধিও পরিষ্কার। আপনি কীভাবে বের করবেন তা আপনি জানেন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'স্যার, আপনার কথায় আমি মর্মাহত।'

'মর্মাহত হবার কিছু নেই। এখন যান — ফাইলের ব্যাপারে ব্যবস্থা করুন।'

গনি সাহেব বের হয়ে এলেন। তাঁর কান ঝাঁ ঝাঁ করছে। বড় সাহেব লোকটি ক্ষমার অযোগ্য একটা কাজ করেছে। সরাসরি চোর বলেছে। এর একটা বিহিত হওয়া দরকার। ধরাকে সরা জ্ঞান করছে। কত বড় সাহস! এত সাহস সে পেল কোথায়? খায়রুল কবির কিছু বলেছে নাকি? বলে ফেলতে পারে। বোকা টাইপের লোক। মনে হচ্ছে, বড় সাহেব তাকে প্যাঁচে ফেলে দু-একটা প্রশ্ন করেছেন, আর সে ভর ভর করে পেটের সব কথা বলে ফেলেছে।

গনি সাহেব অতি দ্রুত চিন্তা করছেন। যে ভাবেই হোক বড় সাহেবকে একটা শিক্ষা দিতে হবে। চোর বলার জন্যে হাতজোড় করে ক্ষমা চাইতে হবে। শুধু হাতজোড় করে ক্ষমা চাইলেই হবে না, কাগজপত্রেও থাকতে হবে। ইউনিয়ন কী জিনিস এটা বড় সাহেবকে টের পাইয়ে দিতে হবে। কিছু জরুরি টেলিফোন করা দরকার। বড় সাহেবকে ঘেরাও করতে হলে শুধু অফিসের লোক দিয়ে হবে না। কোটা লাগবে। কত ধানে কত চাল তা জানার সময় হয়ে গেছে। গনি সাহেব আলতাফের টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলেন। আলতাফ শুকনো মুখে বসে আছে। একে একটা শিক্ষা দিতে হবে। শালা স্পাই! স্পাইগিরি বের করে দিতে হবে। হাত-পা ভেঙে হাসপাতালে দাখিল হয়ে গেলে আর স্পাইগিরি করবে না।

'আলতাফ সাহেব!'

'জ্বি।'

'বড় সাহেবের কাছ থেকে আসছি।'

'ও আচ্ছা।'

'বড় সাহেবের ধারণা, আপনার ফাইল আমরা চুরি করেছি।'

আলতাফ চুপ করে রইল। গনি সাহেব বললেন, 'আপনি স্যারকে এই কথা বলেছেন। তাই না?'

'আমি কিছু বলি নি।'

'স্পাইগিরি করছেন? পেয়েছেনটা কী?'

আলতাফ তাকিয়ে রইল। গনি সাহেব ক্যান্টিনের দিকে রওনা হলেন। মাথা গরম করলে চলবে না। মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। বড় ঝামেলার সময় মানুষ মাথা ঠিক রাখতে পারে না বলেই ঝামেলা সামাল দিতে পারে না। তিনি পর পর দুকাপ চা খেয়ে সিগারেট ধরালেন। মাথা এখন খানিকটা শান্ত হয়েছে — ঘেরাও করার পরিকল্পনা এখন আর সুন্দর পরিকল্পনা বলে মনে হচ্ছে না। অন্য চাল চালতে হবে। মারাত্মক কোনো চাল। বড় সাহেব সে চাল ধরতে পারবেন না। কী চাল দেয়া যায়? হারানো ফাইল ফেরত দেয়া যায়। বড় সাহেবকে যদি বলা হয় ফাইল পাওয়া গেছে আলতাফের বাসায় — তাহলেই হল। খুব বিনয়ের সঙ্গে বলতে হবে। এতে বড় সাহেবের গালে একটা চড় দেয়া হবে। মোলায়েম চড়।

ফাইল গনি সাহেবের কাছেই আছে। তাঁর ড্রয়ারে তালাবন্ধ অবস্থায় আছে। যা করতে হবে তা হল — ফাইলটা লুকিয়ে নিয়ে চলে যেতে হবে আলতাফের বাসায়। আলতাফকে বলতে হবে — ভাই, আপনার বাসার কাগজপত্রগুলো একটু খুঁজে দেখুন। এমনও তো হতে পারে যে আপনি মনের ভুলে ফাইল নিয়ে বাসায় চলে এসেছেন। হতে পারে না? একটু খুঁজে দেখুন। আমিও আপনার সঙ্গে খুঁজি। দুজন খুঁজতে থাকবে — তখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গনি সাহেব চেঁচিয়ে বলবেন — পাওয়া গেছে, পাওয়া গেছে। 'এই তো পাওয়া গেছে। আপনার খাটের নিচেই ছিল। যাক, বাঁচা গেল! সবচে' ভালো হয় — ফাইলটা যদি আলতাফ সাহেবকে দিয়েই ফেরত পাঠানো হয়।

গনি সাহেব আরেকটা সিগারেট ধরালেন। পুরো পরিকল্পনাটা আরো ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখতে হবে কোনো ভুলক্রটি থেকে গেল কিনা। সামান্য ভুল থাকাও ঠিক হবে না।

ফাইলটা যে তাঁর ড্রয়ারে আছে এই খবর অফিসের আর একজনমাত্র মানুষ জানে — স্টোর-ইন-চার্জ খায়রুল কবির। তাঁর নিজের লোক। তাছাড়া তিনিই চাবি দিয়ে ড্রয়ার খুলেছেন। কাজেই এই খবর বাইরে ছড়াবে না। খায়রুল কবির সাহেব অবশ্যি মাথা গরম লোক। ফট করে মাথা গরম হয়ে যায়। এই জাতীয় লোক মাথা গরম অবস্থায় বেফাঁস কথা বলে ফেলতে পারে। তাকে সাবধান করে দিতে হবে।

গনি সাহেব উঠলেন। আলতাফের টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলেন।

'আলতাফ সাহেব!'

'জ্বি।'

'আপনার বাসায় আজ সন্ধ্যায় একটু যাব।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'বিবাহ করেছেন তো — তাই না?'

'জ্বি।'

'ভাবীর হাতে এক কাপ চা খেয়ে আসব।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'অধিকাংশ অফিসেই দেখি কর্মচারীদের মধ্যে কোনো সদ্ভাব নেই। এটা ঠিক না। অফিসের বাইরেও আমাদের একটা জীবন আছে। তাই না?'

'জ্বি।'

গনি সাহেব খায়রুল কবির সাহেবের খোঁজে গেলেন। তাঁকে এখন বেশ হাসিখুশি দেখাচ্ছে। টেনশন অনেকখানি কমে গেছে। তাঁর মাথায় একটাই চিন্তা। ফাইলটা কী করে আলতাফের বাসায় নিয়ে যাবেন। শীতকাল হলে সমস্যা ছিল না— কোটের ভেতর নিয়ে যেতে পারতেন। গরমকাল হওয়ায় ঝামেলা হয়ে গেছে। বাজারের ব্যাগে করে নিয়ে যাওয়া যায়। তাঁর সঙ্গে বাজারের ব্যাগ আছে। অফিস-ফেরত হাতিরপুল কাঁচাবাজার থেকে কিছু সবজি নিয়ে যাবার কথা। আজ আর নেয়া হবে না।

অফিস ছুটি হবার ঠিক আগে আগে মনসুর সাহেবের টেলিফোন বেজে উঠল। টেলিফোন করেছেন ডঃ ওসমান। কিন্তু তাঁর গলার স্বর অন্যরকম। মনসুর সাহেব গলা চিনতে পারছেন না। মনে হচ্ছে, অনেক দূর থেকে পাতলা গলায় কে যেন কথা বলছে — মনসুর সাহেব বললেন, 'হ্যালো, কে? কে কথা বলছেন?'

'আমি বলছি। আমি!'

'কিছু মনে করবেন না। আমিটা কে?'

'ওসমান।'

'ও আচ্ছা। তোমার ঠাণ্ডা লেগেছে নাকি? গলার স্বর চিনতে পারছি না।'

'তোমাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। আমি নিজেও আমার গলার স্বর চিনতে পারছি না।'

'হয়েছে কী?'

'ভয়াবহ কিছু হয় নি, তবে যা হয়েছে তাকে ঠিক অগ্রাহ্য করাও ঠিক না।'

'কী হয়েছে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তুমি বাসায় আস, তারপর বলব।'

'আসছি। এখনি আসছি।'

'বাই দ্যা ওয়ে, তোমাদের অফিসের কর্মচারী — কি যেন নাম — আলতাফ না? ও কি আছে?'

'থাকার কথা না — এখন বাজছে পাঁচটা। সে কাঁটায় কাঁটায় পাঁচটা বাজলে বিদেয় হয়ে যায়। তবু খোঁজ নিচ্ছি। কেন বল তো?'

'ওকে আমার দরকার। তাকে নিয়ে আসতে পারবে?'

'দরকার হলে অবশ্যই নিয়ে আসব।'

মনসুর সাহেব আলতাফের খোঁজে লোক পাঠালেন। তাকে পাওয়া গেল না। সে ঠিক পাঁচটার সময়ই বের হয়ে গেছে।

আলতাফ অফিস থেকে সরাসরি বাসায় ফেরে। ফেরার সময় বাসে প্রচণ্ড ভিড় হয়। ভিড় কমার জন্যে সে ইদানীং অফিসের পাশে একটা মিউনিসিপ্যালটি পার্কে অপেক্ষা করে। পার্কটি মিউনিসিপ্যালটির কর্মকর্তারা শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্য তৈরি করলেও এটি এখন ভিক্ষুক এবং নেশারুদের দখলে। নেশারুরা আসে সন্ধ্যার পরে। তাদের সঙ্গে আলতাফের দেখা এখনো হয় নি। তবে পার্কের স্থায়ী ভিক্ষুকরা আলতাফকে চেনে। তারা এই লোকটির স্বভাব-চরিত্রও জানে। তারা জানে, এই সাহেব পার্কে ঢোকার মুখে দুটাকার বাদাম কিনবে। পার্কের সবচে' উত্তরের বেঞ্চির এক কোনায় চুপচাপ বসে বাদাম খাবে। খাবে খুব ধীরে ধীরে। দুটাকার বাদাম শেষ করতে করতে তার সময় লাগবে এক ঘণ্টার উপর। তখন সে উঠে দাঁড়াবে — যাবে বাসস্ট্যান্ডের দিকে। এই লোকের কাছে ভিক্ষা চেয়ে কোনো লাভ হবে না জানে বলেই ভিক্ষুকরা কেউ এখন আর তাকে বিরক্ত করে না।

আলতাফ বসে আছে বেঞ্চিতে। তার হাতে বাদামের ঠোঙা এবং খানিকটা ঝাল লবণ। আলতাফ বাদাম ভেঙে মুখে দিচ্ছে। দুটাকার ঠোঙায় বাদাম থাকে ১৮ থেকে ২৫টা। আজ বাদাম বেশি দিয়েছে — আজ বাদাম আছে ত্রিশটা। শেষ করতে অন্য দিনের চেয়ে বেশি সময় লাগবে। লাগুক। তেমন তাড়া নেই। তবে আকাশের অবস্থা ভালো না। মেঘ ডাকছে। বৃষ্টি হবে। ভালো বৃষ্টি হবে। বৃষ্টি শুরু হলে ভিজতে হবে। ভিজতে তার খারাপ লাগে না। একটাই শুধু সমস্যা হয়। ভেজা কাপড়ে বাসে উঠতে দেয় না। ভিজে গেলে হেঁটে হেঁটে ফিরতে হবে। আলতাফ ছোট্ট করে নিশ্বাস ফেলল। আজ তার মনটা খারাপ। শুধু যে খারাপ তাই না — বেশ খারাপ।

সে বুঝতে পারছে না সবাই মিলে তার সঙ্গে মিথ্যা কথা বলছে কেন? সে তো সবই বুঝতে পারছে। গনি সাহেবের কাছে ফাইলটা বর্তমানে আছে। তিনি এই ফাইল নিয়ে আজ রাতে এক সময় তার বাসায় যাবেন এবং বলবেন, 'আলতাফ সাহেব, আপনার বাসাটা একটু পরীক্ষা করে দেখব। এমন তো হতে পারে, মনের ভুলে ফাইলটা ফেলে গেছেন।'

আলতাফ জানে গনি সাহেবের বাজারের ব্যাগে বর্তমানে ফাইলটা আছে। ফাইলটা নিয়ে তাঁর অনেক কাজকর্ম আছে বলে তিনি আজ বাজারে যেতে পারবেন না। গনি সাহেবের স্ত্রী বলে দিয়েছেন, ঘরে কোনো সবজি নেই। সবজি লাগবে। আজো সবজি কেনা হবে না। অথচ এই মহিলা মাছ-মাংস কিছু খেতে পারেন না।

সব তথ্য পোকারা আলতাফকে জানাচ্ছে। কেন জানাচ্ছে সে জানে না। কীভাবে জানাচ্ছে তাও বুঝতে পারে না। জানতে না পারলেই বোধহয় ভালো হত। মনের কষ্ট কম হত। এরা তাকে দেখতে পারছে না কেন? সে কি কোনো অন্যায় করেছে?

বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে শুরু করেছে। আলতাফ উঠে দাঁড়াল। হালকা ফোঁটা পড়ছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাসস্ট্যান্ডে লোকজন নেই। ইচ্ছা করলে বাসে ওঠা যায়। কিন্তু উঠতে ইচ্ছা করছে না।

হেঁটে হেঁটে যাওয়া যাক। পৌঁছতে সন্ধ্যা পার হয়ে যাবে। তাড়া নেই কিছু। আর বাসায় ফিরতে দেরি হলেই ভালো। ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই গনি সাহেব চলে যাবেন। তাঁর সঙ্গে দেখা হোক তা আলতাফ চাচ্ছে না। বৃষ্টির বেগ বাড়ছে। আলতাফ নির্বিকার ভঙ্গিতে বৃষ্টির ভেতর দিয়ে এগুচ্ছে। লোকজন অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকে দেখছে। বৃষ্টিতে ভিজে অনেকেই রাস্তায় হাঁটে, তবে তাদের মধ্যে এক ধরনের তাড়া থাকে। কেউ এমন নির্বিকার ভঙ্গিতে হাঁটে না।

১৩

বজলুর রহমান বললেন, 'কাকে চান?'

গনি সাহেব বললেন, আমি আলতাফ সাহেবের খোঁজে এসেছি।

'ও তো এখনো বাসায় ফিরে নাই।'

'সে কী! পাঁচটার সময় উনি অফিস থেকে বের হলেন।'

বজলুর রহমান বিরক্তমুখে বললেন, 'এই গাধার কি কিছু ঠিক আছে? কিছু ঠিক নাই। অফিসে কী করে তাই আমি বুঝি না। আসুন, ভেতরে এসে বসুন।'

গনি সাহেব অন্ধকার বসার ঘরে ঢুকলেন। বজলুর রহমান বললেন, 'আপনাকে অন্ধকার ঘরে বসে থাকতে হবে। গাধাটাকে বলেছিলাম চল্লিশ পাওয়ারের একটা বাল্ব এনে লাগাতে। লাগিয়েছে ঠিকই কিন্তু বাল্ব জ্বলছে না। সমস্যাটা কোথায় সে দেখবে না?'

গনি সাহেব বললেন, 'স্যার, আপনি কাইন্ডলি একটা হারিকেন আনুন। আমি দেখে দিচ্ছি। মনে হয় কোথাও লুজ কানেকশন আছে।'

'না, না, আপনি কী দেখবেন?'

'কোনো অসুবিধা নেই, স্যার। আলতাফ সাহেব আমার কলিগ। খুবই বন্ধু মানুষ।'

বজলুর রহমান খুশি হলেন। হারিকেন জ্বালিয়ে নিয়ে এলেন। গনি সাহেব কী করলেন কে জানে — বাতি জ্বলে উঠল। বজলুর রহমান হৃষ্টচিত্তে বললেন, 'বাবা, তুমি আরাম করে বস, চা খাও। ঘরে কিছু আছে কিনা কে জানে? মনে হয় শুধু চা খেতে হবে।'

'কোনো অসুবিধা নেই, স্যার। চা না পেলেও হবে। আমার চায়ের তেমন অভ্যাস নেই। আলতাফ সাহেব কখন ফেরেন?'

'কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। আগে সকাল সকাল ফিরত। এখন শুনেছি অফিস ছুটির পর কোন এক পার্কে গিয়ে বসে থাকে।'

'কেন?'

'কে বলবে কেন? ওর কি মাথার ঠিক আছে? ব্রেইন ডিফেক্ট।'

'চাচাজী, এসব কী বলছেন!'

'তোমাদের কলিগ, তোমরা জান না? কী করে অফিস চালায় সেটাই তো আমি বুঝি না। কাজকর্ম কিছু পারে?'

'উনি তো চাচাজী কাজকর্মে খুব ভালো। তবে ...'

'তবে কী?'

'রিসেন্টলি একটা সমস্যা হয়েছে।'

বজলুর রহমান আগ্রহ নিয়ে বললেন, কী সমস্যা?

'থাক স্যার, বলতে চাচ্ছি না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'না, না, তুমি বল। কোনো অসুবিধা নাই।'

'অফিসের একটা জরুরি ফাইল হারিয়ে ফেলেছেন। আমাদের বড় সাহেব আবার খুবই রাগী। তিনি ভয়ংকর রেগেছেন। অথচ আলতাফ সাহেবের কোনো মাথাব্যথা নেই।'

'ওর মাথাব্যথা থাকবে কেন? ওর কি মাথা বলে কিছু আছে?'

'বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করে দুএকটা কথা বললে হত, তাও বলবেন না। এই বাজারে যদি চাকরি চলে যায় তাহলে অবস্থাটা, চাচাজী, একটু চিন্তা করুন।'

'চাকরি তো যাবেই। আরো আগেই যাওয়া উচিত ছিল। এখনো কেন যায় নি তাই তো আমি ভেবে পাই না।'

বজলুর রহমান অত্যন্ত আনন্দিত বোধ করছেন। তাঁর কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলে যাচ্ছে। এটাই তাঁর আনন্দের বিষয়। গনি সাহেব গলা নিচু করে বললেন, 'আমার ধারণা, উনি ফাইলটা বাসায় নিয়ে এসেছিলেন, তারপর অফিসে নিতে ভুলে গেছেন। আমি এসেছি একটু খুঁজে দেখতে। উনার তো মাথাব্যথা নেই।'

বজলুর রহমান দরাজ গলায় বললেন 'যাক, গাধাটার চাকরি চলে যাক। তুমি এই নিয়ে চিন্তা করবে না।'

'তবু স্যার, আমি ভাবছি একটু যদি খুঁজে দেখি, উনি তো খুঁজবেন না।'

'ও কিছুই করবে না। ও শুধু দরজা বন্ধ করে ঝিম ধরে বসে থাকবে। আর পোকা নিয়ে ভাববে।'

গনি সাহেব ইতস্তত করে বললেন, 'উনি কখন আসেন কে জানে। আমরা কি এই ফাঁকে খুঁজে দেখব?'

'দেখতে চাও, দেখ। আমি দুলারীকে বলছি, ও তোমাকে তাদের ঘরে নিয়ে যাবে।'

দশ মিনিটের মাথায় গনি সাহেব ফাইল হাতে দোতলা থেকে নেমে এলেন। বজলুর রহমানকে দেখে তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'পাওয়া গেছে চাচাজী। খাটের নিচে খবরের কাগজের সঙ্গে ছিল।'

বজলুর রহমান বললেন, 'পাওয়া গেছে বলে এত আনন্দিত হয়ো না। আবার হারাবে। কে জানে কাল অফিসে যাওয়ার সময় হয়তো বাসে ফেলে রেখে যাবে।'

গনি সাহেব বললেন, 'আপনাকে কি চাচাজী একটা ছোট্ট রিকোয়েস্ট করব? যদি কিছু মনে না করেন।'

'মনে করাকরির কী আছে? বল কি রিকোয়েস্ট?'

'ফাইলটা আলতাফ সাহেবের হাতে না দিয়ে আপনি নিজে যদি নিয়ে যান। বড় সাহেবকে একটু বুঝিয়ে বলেন। স্যার তো খুব রেগে আছেন।'

'কোনো অসুবিধা নেই। আমিই বলব।'

'আমি যে এসেছিলাম এটা যদি না বলেন তাহলে খুব ভালো হয়। বড় সাহেব আমাকে আবার ঠিক পছন্দ করেন না। উনি যদি শোনেন একজন ফাইল হারিয়েছে আর আমি ছোটাছুটি করছি তাহলে আরো রেগে যাবেন।'

'না না, তুমি নিশ্চিন্ত থাক। তোমার কথা কিছুই বলব না।'

গনি চা খেলেন। মুড়ি খেলেন। দুলারীর সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করলেন। দুলারীর কাজের মেয়ে নেই শুনে দুঃখিত হলেন। যাবার সময় বলে গেলেন, 'কাল সকালের মধ্যে কাজের মেয়ের ব্যবস্থা করবেন।'

এই কাজটা তিনি অবশ্যি ভালো পারেন। কাজের মেয়ের সাপ্লাই চ্যানেল তাঁর খুব ভালো। অফিসের অনেকেরই তিনি এই উপকার করেছেন। দুলারীর জন্যেও একটা ব্যবস্থা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতে হবে। তাঁর নিজের বাসায় এই মুহূর্তে দুজন আছে। তাদের একজনকে দিয়ে যেতে হবে।

আলতাফ বাসায় ফিরল রাত নটার কিছু আগে। সে ভিজে চুপসে গেছে। চোখ লাল। দুলারী বলল, 'আবার বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে এসেছ? কতক্ষণ ভিজেছ বৃষ্টিতে?'

'অনেকক্ষণ।'

'হাত-পা একদম নীল হয়ে গেছে। চোখ লাল। আজ নির্ঘাত তোমার জ্বর আসবে।'

'হুঁ।'

'তোমাদের অফিসের একজন কলিগ আজ বাসায় এসেছিলেন। নাম হল গনি সাহেব। কি যেন খোঁজাখুজি করলেন।'

'হুঁ।'

'খুবই ভালো লোক। আমার কোনো কাজের লোক নেই শুনে খুব দুঃখ করলেন। বলেছেন, কাল সকাল দশটার মধ্যে একজনকে দিয়ে যাবেন।'

'হুঁ।'

'তুমি তো ঘুমাচ্ছ না, তাহলে এমন হুঁ হুঁ করছ কেন? যাও, বাথরুমে গিয়ে কাপড় ছাড়। ভাত দিয়ে দি। আজ আবার মার শরীরটাও খারাপ। মা শুয়ে আছেন।'

'হুঁ।'

দুলারী টেবিলে ভাত বেড়ে আলতাফকে নিতে এসে দেখে আলতাফ ঘর অন্ধকার করে শুয়ে আছে। তার গা গরম। আলতাফ বলল, 'আমার ভালো লাগছে না। আমি কিছু খাব না।

'দুধ এনে দেই এককাপ। দুধ খাও?'

'না। তুমি বাতি নিভিয়ে দাও।'

দুলারী বাতি নিভিয়ে দিল। তার খানিকটা মন খারাপ হল। বৃষ্টি হচ্ছে দেখে সে আজ তেহারী রান্না করেছে। এই জিনিসটা আলতাফ খুব পছন্দ করে খায়।

'দুলারী!'

'কি?'

'আমার মাকে যে পোকা খেয়ে ফেলেছিল তাকি তুমি জান?'

'এসব কী ধরনের কথা?'

'তুমি জান কিনা বল।'

'জানি, বাবা বলেছিলেন।'

'আমার চোখের সামনে তারা মাকে খেয়ে ফেলল।'

'চুপ কর তো।'

'আচ্ছা চুপ করলাম। দরজা-জানালা বন্ধ করে ঘর অন্ধকার করে দাও।'

১৪

ওসমান সাহেব থাকেন ধানমণ্ডি আট নম্বরে। চার ইউনিটের নতুন ফ্ল্যাট বাড়িগুলোর তিনতলায়। ফ্ল্যাটটি কিনেছেন ওসমান সাহেবের স্ত্রী রেবেকা। ভদ্রমহিলা ডাক্তার এবং পসারওয়ালা বড় ডাক্তার। এদের কোনো ছেলেপুলে নেই। স্বামী-স্ত্রী দুজনে বিশাল বাড়িতে বাস করেন। কুকুর, বেড়াল এবং পাখি পোষেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনসুর সাহেব ওসমানদের ফ্ল্যাট বাড়িতে কলিংবেল টিপলেন রাত দশটায়। কলিংবেলে শব্দ হল না। কড়া নাড়তে হল। শব্দ করেই নাড়তে হল। বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। ইলেকট্রিসিটি নেই। তবে ঘরে আলো আছে। চার্জলাইট জ্বলছে। ওসমান সাহেব দরজা খুলে বললেন, 'এত দেরি! আমি সন্ধ্যা থেকে অপেক্ষা করছি।'

'বৃষ্টি দেখে ভাবছিলাম বৃষ্টি কমলে আসব। মনে হচ্ছে কমবে না, তাই বৃষ্টির মধ্যেই এসেছি।'

'খেয়ে আস নি তো?'

'না।'

'গুড। আমি পূর্বাণী থেকে খাবার আনিয়েছি। আজ রাতে থেকে গেলে অসুবিধা হবে? রেবেকা বাসায় নেই। একা আছি। তুমি থাকলে দুজন মিলে বেচেলারদের মতো সারারাত গল্প করব।'

'বেচেলাররা সারারাত গল্প করে না। এটা নব্য স্বামী-স্ত্রীদের ব্যাপার। রেবেকা কোথায়?'

'ওর সঙ্গে ভয়াবহ ধরনের ঝগড়া হয়েছে। প্রায় ছাড়াছাড়ি পর্যায়ের ঝগড়া। ও তার বাবার বাসায় চলে গেছে। মনে হচ্ছে আর ফিরবে না।'

মনসুর সাহেব কিছু বললেন না। তেমন গুরুত্বও দিলেন না। রেবেকা প্রায়ই প্রচণ্ড রকমের ঝগড়া করে তার বাবার বাসায় চলে যায়, আবার ফিরে আসে। এবারো আসবে। এদের একের অন্যকে ছাড়া গতি নেই।

ওসমান সাহেব বললেন, 'এস খেতে বসে যাই। প্যাকেট করা খাবার ঠাণ্ডা হয়ে গেলে মুশকিল।'

টেবিলভর্তি খাবার। শিভাস রিগেলের পেটমোটা বোতল। এই ব্যাপারটিও পুরোনো। ওসমান সাহেব মদ্যপান করেন শুধু যখন রেবেকার সঙ্গে তাঁর ঝগড়া হয় তখন। মনসুর হাসতে হাসতে বললেন, 'ঝগড়া মনে হয় গুরুতর পর্যায়ে হয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'কী নিয়ে ঝগড়া?'

'সেটা বলার জন্যেই ডেকেছি।'

'আলতাফকেও আনতে বলেছিলে — তাকেও বলতে চাচ্ছিলে?'

'হ্যাঁ, তাকেও বলতে চাচ্ছিলাম। ঝগড়ার সূত্রপাত তাকে নিয়েই। তুমি খেতে শুরু কর, আমি বলি। খানিকটা হুইস্কি দেই? হুইস্কি থাকলে গল্প শুনে আরাম পাবে।'

মনসুর কৌতূহলী হয়ে তাকালেন।

'তোমার মনে আছে বোধহয়, আলতাফের বাসায় আমি একটা তেলাপোকা মেরেছিলাম। আলতাফ তাতে দুঃখিত হয়েছিল।'

'আলতাফ দুঃখিত হয়েছিল কিনা জানি না, তুমি তেলাপোকা মেরেছিলে তা মনে আছে।'

'বাসায় ফিরলাম, শরীর কেমন ঘিন ঘিন করতে লাগল। সারাক্ষণ মনে হতে লাগল জুতার নিচে তেলাপোকার রক্ত-মাংস লেগে আছে। প্রথমেই কাজের ছেলেটিকে দিয়ে জুতা ধুয়ালাম। আমার মনে হল, সে ঠিকমতো ধোয় নি। সাবান দিয়ে নিজে ধুলাম। মনে হল, সর্বনাশ হয়েছে! আমার হাতে রক্ত লেগে গেছে। গোসল করলাম। ভাবটা দূর হল না। শরীর ঘিন ঘিন করতে লাগল।

রাতে ভাত খেতে পারলাম না। রেবেকা ফিরল রাত দশটায়। ততক্ষণে আমার প্রায় মাথা-খারাপের মতো হয়ে গেছে। আমার ধারণা হয়ে গেছে, তেলাপোকার রক্ত-মাংস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সারা বাড়িতে ছড়িয়ে পড়েছে। দুজন কাজের লোককেই ঘর মুছতে লাগিয়ে দিয়েছি। বালতি ভর্তি পানিতে ডেটল গুলে ওরা মেঝে ন্যাকড়া দিয়ে মুছছে এবং অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাচ্ছে। রেবেকা ঘরে ঢুকে বলল, কী হয়েছে?'

আমি ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করলাম। ব্যাখ্যা করার সময় বুঝলাম, 'আমি নিতান্ত বোকার মতো কথা বলছি। না, বোকা না, পাগলের মতো কথা বলছি।

রেবেকা বলল, 'তুমি নিওরোটিক পেশেন্টের মতো আচরণ করছ।'

আমি বললাম, 'আমি মোটেই নিওরোটিক পেশেন্টের মতো আচরণ করছি না। আমি যা অনুভব করছি তা বলছি।'

রেবেকা কাজের লোক দুটিকে ধোয়াধুয়ি বন্ধ করতে বলল। ঝগড়া শুরু হল এই পর্যায়ে। কুৎসিত ঝগড়া। আমি একেবারে তুই-তোকারির পর্যায়ে চলে গেলাম। চিৎকার করে বলতে লাগলাম — তোর সঙ্গে বাস করে আমি নিওরোটিক পেশেন্ট হয়েছি। বুঝেছিস? তোর ধবধবে সাদা গায়ের রঙের জন্যে তো তোর খুব অহংকার। এই সাদা রঙের জন্যে তোকে দেখায় সাদা তেলাপোকার মতো। সাদা তেলাপোকা কখনো দেখেছিস? এরা থাকে কমোডের ভেতরে। তোর গায়েও তেলাপোকার মতোই গন্ধ। তার পরেও কিছু বলি না। সহ্য করি।

রেবেকা আমার কথাবার্তা শুনে হতভম্ব হয়ে গেল। এক পর্যায়ে বলল - তোমার ঘুমানো দরকার। আমি পেথিড্রিন ইনজেক্‌শনের একটা এম্পুল রেখে যাচ্ছি। ইসমাইলকে বললেই সে তোমার শরীরে পুশ করে দেবে। আমি চলে যাচ্ছি।

এর উত্তরে আমি আরো সব কুৎসিত কথা বলতে লাগলাম। এমন সব কুৎসিত কথা যে, তুমি শুনলে তিনতলা থেকে লাফ দিয়ে নিচে পড়ে যাবে। উদাহরণ দেব? শুনতে চাও?

'না, শুনতে চাই না।'

'শুনতে না চাওয়াই ভালো।'

মনসুর বললেন, 'তুমি মদ্যপানটা মনে হয় বেশি করছ?'

'তা ঠিক, বেশিই করেছি। আমার অবস্থায় পড়লে তুমি বাথটাবে মদ ভর্তি করে তার ভেতরে শুয়ে থাকতে। আসল স্টোরিটা শোন। আসল স্টোরিতে এখনো আসি নি।'

'বল আসল স্টোরি।'

'রেবেকা রাতেই চলে গেল। আমি কাজের লোক দুটিকে বললাম, তোমরা ননস্টপ ঘর মুছে যাও। আমি না বলা পর্যন্ত থামবে না। তারপর হুইস্কির একটা বোতল নিয়ে বসলাম। তুমি ভালো করেই জান আমি প্রফেশনাল মাতাল নই। বিদেশে পড়াশোনার জন্যে যখন গিয়েছিলাম তখন মাঝেমধ্যে খেতাম। দেশে এসে ছেড়ে দিয়েছিলাম। ইদানীং কখনো কখনো খাওয়া হয়। তা-ও যখন বন্ধুবান্ধব আসে, তখন। যাই হোক, রাত একটার ভেতর ২৫০ মিলিলিটারের স্কচ্ হুইস্কির একটা পুরো বোতল শেষ করে ফেললাম। মাতাল হলাম না। শুধু অনুভব করলাম, মাথাটা ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। আমি নিজেও সাবানের বড় একটা ফেনা হয়ে গেছি। বাতাসে ভাসতে শুরু করেছি। হার্ড লিকার চার পেগের বেশি আমি খেতে পারি না। আমার বমি-ভাব হয়। পুরো বোতল খেয়েও আমার কিছু হল না। শুধু বাথরুম পেতে লাগল। আমার তখন বাথরুমে যেতেও ইচ্ছা করছে না। মনে হচ্ছে চেয়ারে বসেই কাজ সেরে ফেলি। মেঝে তো ধোয়া হচ্ছেই। যাই হোক, বাথরুমে গেলাম। এই অংশটা মন দিয়ে শোন—। খুব মন দিয়ে শুনবে।'

'আমি তোমার সব অংশই মন দিয়ে শুনছি।'

'এই অংশটা অনেক বেশি এটেনশন দিয়ে শুনতে হবে। বাথরুমে ঢুকেছি। বাতি জ্বালিয়ে দরজা বন্ধ করতেই এক ধরনের হামিং সাউন্ড হতে লাগল। যেন লক্ষ লক্ষ কোটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোটি মানুষ খুব নিচু গলায় কথা বলছে। লো ফ্রিকোয়েন্সি সাউন্ড আসছে কমোডের ভেতর থেকে। আমি অবাক হয়ে কমোডের কাছে গিয়ে নিচু হয়ে তাকাতেই গায়ের সমস্ত রক্ত জমে গেল। দেখি, কমোডভর্তি তেলাপোকা। তারপর দেখি শুধু কমোড নয়, বাথরুমের মেঝে থিক্‌থিক্ করছে পোকায়। অথচ ঘরে ঢোকার সময় ছিল না। কখন এল? কোথেকে এল? হঠাৎ দেখি পোকারা আমার গা বেয়ে ওঠার চেষ্টা করছে। অন্য যে কেউ হলে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেত। আমি বুঝলাম — অতিরিক্ত মদ্যপানের জন্যে আমার হেলুসিনেশন হচ্ছে। আসলে কোনো পোকা নেই কিন্তু আমার মস্তিষ্ক পোকা দেখছে। বাথরুমের দেয়ালগুলো একটু আগেই সাদা দেখেছি — এখন দেখি ব্রাউন রং। তেলাপোকায় দেয়াল ঢেকে গেছে। আমি তখন এদের কথাও শুনতে পেলাম। পারিষ্কার শুনলাম — এরা বলছে ...'

'কী বলছে?'

'কী বলছে তা তোমাকে বলতে চাচ্ছি না। কারণ ওরা তো আসলে কিছু বলছে না। যা বলার আমার মস্তিষ্কই আমাকে বলছে। যাই হোক, আমি কী করলাম শোন। বাথরুম থেকে বের হয়ে এলাম। আমার গা ভর্তি তেলাপোকা। এদের নিয়েই বের হয়েছি। কাজের লোক দুটি তখনো মেঝে ঘষে যাচ্ছে। আমি তাদের সামনে দাঁড়িয়ে বললাম — তোমরা কি আমার গায়ে তেলাপোকা দেখতে পাচ্ছ? ওরা ভয়ে ভয়ে বলল, জ্বি না স্যার। আমি বললাম, তাহলে যাও, ইসমাইলকে ডেকে আন। আমাকে পেথিড্রিন ইনজেকশন নিতে হবে। ইসমাইল এসে আমাকে পেথিড্রিন ইনজেক্‌শন দিল। আমার ঘুম ভাঙল পরদিন দুপুর দুটায়। আমি তখন পুরোপুরি সুস্থ। তেলাপোকা ব্যাপারটা আর মাথায় নেই।'

'এই তোমার গল্প?'

'হ্যাঁ।'

'আলতাফকে এই গল্প শুনাতে চাচ্ছিলে কেন?'

'ওর কারণে এই ব্যাপারটা আমার মাথায় ঢুকে গেছে বলেই ওকে শুনাতে চাচ্ছিলাম। আমার ইচ্ছা ছিল— ওকে বলব যেন পোকা নিয়ে সে আর কখনো কারো সঙ্গে কোনো কথা না বলে। এই হাস্যকর ব্যাপারটা যেন সে আর কারো মাথায় ঢুকিয়ে না দেয়।'

মনসুর বললেন, 'ব্যাপারটা তোমার মাথা থেকে পুরোপুরি দূর হয়েছে?'

'হ্যাঁ, হয়েছে। তবে আমি পোকা নিয়ে খুব ভাবতে শুরু করেছি। অন্য এক দৃষ্টিভঙ্গিতে এদের দেখার চেষ্টা করছি।'

'অন্য দৃষ্টিভঙ্গি মানে?'

'ওদের প্রতি একটা সিমপেথিটিক এটিচুড তৈরি হয়েছে।'

মনসুর গম্ভীর হয়ে বললেন, 'সিমপেথিটিক এটিচুডের ব্যাপারটা বুঝলাম না।'

ওসমান গলা নিচু করে বললেন, 'আমার কেন জানি মনে হচ্ছে আলতাফের কথা সত্যি হতেও পারে। পোকাদের কিছু স্ট্রেঞ্জ ব্যাপার আছে, যা থেকে ধারণা করা অস্বাভাবিক না যে এদের বুদ্ধি আছে, ভালোভাবেই আছে। যেমন ধর, যখন কোনো বিশেষ জায়গায় আণবিক বোমার টেস্টিং হয় তখন যে জায়গায় এই টেস্টিং করা হয় তার এক মাইলের ভেতর কোনো পোকামাকড় বিশেষ করে তেলাপোকা থাকে না। এরা মনে হয় কোনো এক অদ্ভুতভাবে খবর পেয়ে যায় যে এখানে নিউক্লিয়ার বোমা টেস্টিং হবে। খবর পেয়ে সরে পড়ে। ইন্টারেস্টিং না?'

'সত্যি হয়ে থাকলে ইন্টারেস্টিং।'

'হিরোশিমা এবং নাগাসাকিতে আণবিক বোমা ফাটার পর এর আশপাশের অঞ্চলগুলো তেলাপোকায় ছেয়ে গিয়েছিল। আমার ধারণা, এরা এসেছে হিরোশিমা ও নাগাশাকি থেকে। এরা বুঝে গিয়েছিল এখানে বোমা ফাটবে, কাজেই সরে গিয়েছিল।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'এই খবর পেলে কোথায়?'

'কোথায় যেন পড়েছিলাম।'

'সত্যি?'

'সত্যি তো বটেই। সমুদ্রগামী জাহাজ থেকে হঠাৎ দেখা যায় ইঁদুর আর তেলাপোকা নেমে পড়ছে। তখন বুঝতে হবে জাহাজটা পানিতে ডুবে যাবে বা এই জাতীয় কিছু একটা হবে। এরা খবরটা পায় কীভাবে?'

মনসুর বললেন, 'তুমি বলতে চাচ্ছ পোকাদের বুদ্ধি আছে। তারা ইন্টেলিজেন্ট।'

'নিশ্চিত করে কিছু বলছি না, তবে সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছি না।'

'একসময় তুমিই কিন্তু বলেছ ওদের মস্তিষ্ক নেই। কাজেই বুদ্ধি থাকবে না। এখন অন্য কথা বলছ।'

'তা বলছি। এখন কালেকটিভ ইন্টেলিজেন্সের কথা মাথায় আসছে। অর্থাৎ আলাদাআলাদাভাবে এক একটা পোকা বুদ্ধিমান নয়— কিন্তু তাদের সবাইকে একত্র করলে তারা বুদ্ধিমান। প্রচণ্ড বুদ্ধিমান। এত বুদ্ধিমান যে এরা মানুষকে ব্যবহার করছে। মানুষ তা-ই বুঝতে পারছে না। মানুষ এদের হাতে খুবই অসহায়।'

'হ্যাঁ অসহায়। পঙ্গপালের কথা ভেবে দেখ। পঙ্গপালের আক্রমণ ঠেকানোর কোনো বুদ্ধি কি মানুষের আছে? মেশিনগান দিয়ে ঠেকাবে? পৃথিবীতে বিউবোনিক প্লেগ ছড়িয়েছিল ইঁদুর। ১৩৪৭ থেকে ১৩৫১ – এই পাঁচ বছরে প্লেগে সারা পৃথিবীতে মানুষ মারা গেছে ৭৫ মিলিয়ন। ঊনবিংশ শতাব্দীতেও বিউবোনিক প্লেগ হল — মানুষ মারা গেল ২০ মিলিয়ন। যেমন হঠাৎ করে অসুখটা এসেছিল তেমনি হঠাৎ করে চলে গিয়েছে। আমার এখন মনে হচ্ছে, এইগুলো পোকাদের সাবধানবাণী। পোকারা মানুষদের সাবধান করে দিচ্ছে। তারা বলছে— হে মানব সম্প্রদায়, সাবধান। আমরা কিন্তু ইচ্ছা করলেই তোমাদের শেষ করে দিতে পারি। তোমাদের অতি আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান কোনো কাজেই লাগবে না।'

মনসুর সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, 'এদের দক্ষতা থাকলে মানুষকে এরা শেষ করে দিচ্ছে না কেন? মানুষ তো নানানভাবে এদের বিরক্ত করছে। ইনসেকটিসাইড ছড়াচ্ছে— পোকামাকড় মারার কত কায়দা-কৌশল বের করছে। পোকাদের যদি এতই বুদ্ধি তাহলে ওরা চুপ কেন?'

ওসমান গলার স্বর নিচু করে বললেন, 'এই বিষয়েও আমার একটা হাইপোথিসিস আছে। মানুষকে এরা শেষ করছে না, কারণ মানুষকে তাদের প্রয়োজন। মানুষের টেকনোলজি প্রয়োজন। শুধুমাত্র মানুষেরই ক্ষমতা আছে মহাশূন্য জয় করার। মানুষ একদিন সৌরজগতের বাইরেও পা বাড়াবে, কিন্তু পোকাদের এই ক্ষমতা নেই। তারা যদি পৃথিবীর বাইরে ছড়িয়ে পড়তে চায় তাহলে মানুষের সাহায্য নিতেই হবে।'

'পৃথিবীর বাইরে ছড়িয়ে পড়ার তাদের দরকার কী?'

'দরকার আছে। বুদ্ধিমান প্রাণীর লক্ষণ হল, সে চেষ্টা করবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নিজেকে ছড়িয়ে দিতে — পোকারা তাই করছে। মানুষ যখন মঙ্গলগ্রহ থেকে যাবে বৃহস্পতির উপগ্রহে, এরাও যাবে মানুষের সঙ্গে। বুঝতে পারছ?'

'পারছি, কিন্তু তুমি কি এই হাইপোথিসিস বিশ্বাস কর?'

'বিশ্বাস করি না — আবার অবিশ্বাসও করি না। আলতাফ নামের তোমার ঐ লোকটির সঙ্গে আমার কথা বলতে হবে।'

মনসুর গম্ভীর গলায় বললেন, 'আলতাফের সঙ্গে তোমার কথা বলতে হবে না। কথা বলার পরিণাম তো দেখতেই পাচ্ছি। তোমার উচিত বিশ্রাম নেয়া এবং মাথা থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পোকামাকড় পুরোপুরি দূর করা। যেভাবে হুইস্কি খাচ্ছ, মনে হয় একটা কেলেংকারি করবে। যাও, ঘুমাতে যাও।'

'রাত খুব একটা বেশি হয় নি।'

'দুটা বাজে। দুটা অনেক রাত।'

মনসুর উঠে দাঁড়ালেন। এখনো ইলেকট্রিসিটি আসে নি। মনে হয় আজ রাতে আর আসবে না। বৃষ্টি থামে নি। মাঝখানে কিছুটা কমেছিল, এখন আবার মুষলধারে শুরু হয়েছে।

বাথরুম থেকে অদ্ভুত একটা শব্দ আসছে। কীসের শব্দ? মনসুর কৌতূহলী হয়ে উঁকি দিলেন। অন্ধকার বাথরুম। চার্জলাইটের আলো বাথরুম পর্যন্ত পৌঁছে নি। তিনি পকেট থেকে দেয়াশলাই বের করলেন। দেয়াশলাই জ্বালাবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সারা শরীর কেঁপে উঠল — এসব কী? হাজার হাজার কোটি কোটি পোকা তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। শুঁড় নাড়ছে। এটা কি এক ধরনের হেলুসিনেশন? অবশ্যই তাই। ওসমানের কথা শুনে তিনি প্রভাবিত হয়েছেন। আলতাফ প্রভাবিত করেছিল ওসমানকে। তাঁকে দিয়ে অন্য আরেকজন প্রভাবিত হবে। এক সময় দেখা দেবে মাস হিস্টিরিয়া। দেয়াশলাইয়ের কাঠি নিভে গেছে। তিনি এখন আর কিছুই দেখছেন না, শোঁ শোঁ শব্দ শুনছেন।

শব্দটা কমোডের ভেতর থেকে আসছে। দেয়াশলাইয়ের আরেকটা কাঠি কি জ্বালাবেন? তাঁর সাহস হল না।

১৫

দুলারী আলতাফের মাথার কাছে বসে আছে। জ্বরে মানুষটার গা পুড়ে যাচ্ছে। থার্মোমিটার থাকলে জ্বর দেখা যেত। থার্মোমিটার নেই। জ্বর কমানোর জন্যে কিছু একটা করা দরকার। কী করবে দুলারী বুঝতে পারছে না। দুটা প্যারাসিটামল খাওয়ানো উচিত। ঘরে কোনো প্যারাসিটামল নেই। মাথায় পানি ঢালা উচিত। দোতলায় এক ফোঁটা পানি নেই। পানি ঢালতে হলে বালতিতে করে একতলা থেকে নিয়ে আসতে হবে। দুলারী তাও করত কিন্তু মানুষটা তাকে ছাড়ছে না। তার হাত ধরে বসে আছে। এত শক্ত করে হাত চেপে ধরে আছে যে হাত ব্যথা করছে।

আলতাফ ক্ষীণ স্বরে ডাকল, 'দুলারী!'

দুলালী বলল, কি?

'খুব খারাপ লাগছে।'

'মাকে ডেকে আনব?'

'না। এখন কটা বাজে দুলারী?'

'রাত দুটা।'

আলতাফ অনেক কষ্টে পাশ ফিরল। দুলারী বলল, 'বাবাকে ডেকে তুলি। বাবা তোমার জন্যে ডাক্তার নিয়ে আসুক।'

'না।'

'তুমি আমার হাতটা ছাড়, আমি তোমার জন্যে পানি নিয়ে আসি। মাথায় পানি ঢালতে হবে।'

'না।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি তোমার জন্যে পানি আনতে যাচ্ছি না। তুমি এত শক্ত করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার হাত চেপে ধরবে না। আমার হাত ব্যথা করছে। আচ্ছা, আমার হাতটা একটু ছাড় তো, বাতি জ্বালাই। অন্ধকারে বসে থাকতে আমার ভয় ভয় লাগছে।'

আলতাফ দুলারীর হাত ছাড়ল না। বরং আরো শক্ত করে হাত চেপে ধরল। দুলারীর ভয় ভয় করছে। তার হঠাৎ করে মনে হচ্ছে, তাদের খাটের নিচটা তেলাপোকায় ভর্তি হয়ে গেছে। পোকারা আলতাফকে দেখতে আসছে, আরো আসবে। ঘর ভর্তি হয়ে যাবে পোকায়। কেন তার এরকম মনে হচ্ছে সে জানে না। আলতাফকে জিজ্ঞেস করলে কি কোনো লাভ হবে? আলতাফ কি কিছু বলবে?

দুলারী বলল, 'এই শোন, শোন!'

'উঁ।'

'ভয় লাগছে। আমার ভয় লাগছে।'

'উঁ।'

'আমার কেন জানি মনে হচ্ছে, খাটের নিচটা পোকায় ভর্তি হয়ে গেছে। আমার প্রচণ্ড ভয় লাগছে!'

'উঁ।'

'এই দেখ শোঁ শোঁ শব্দ হচ্ছে। পোকারা কি এরকম শব্দ করে?'

'উঁ।'

'এরকম উঁ উঁ করবে না। শুনতে বিশ্রী লাগছে। হাতটা ছাড়, আমি বাতি জ্বালাব।'

'না।'

দুলারী প্রায় জোর করে আলতাফের হাত ছাড়িয়ে দিল। বাতি জ্বালাল। উঁকি দিল খাটের নিচে। সারি সারি তেলাপোকা চুপচাপ অপেক্ষা করছে। একটিও নড়ছে না। দুলারী বলল, 'যা! যা!' এতেও কিছু হল না। আলতাফ ক্লান্ত গলায় বলল, 'এরা যাবে না। এরা থাকবে। তুমি এদের কিছু বোলো না। বাতি নিভিয়ে দাও।'

দুলারী বাতি নেভাল। তার কান্না পাচ্ছে। সে কী করবে বুঝতে পারছে না। এত রাতে বাবা-মাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলতে ইচ্ছা করছে না।

১৬

ভোরবেলাতেই বজলুর রহমান হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার বিধুবাবুর দরজার কড়া নাড়তে লাগলেন। দুলারীর কাছ থেকে খবর পেয়েছেন আলতাফের জ্বর। সারারাতই নাকি জ্বর গেছে। এখন খুব বাড়ছে। ডাক্তার না ডাকলেই নয়।

অনেকক্ষণ কড়া নাড়ার পর বিধুবাবু দরজা খুলে হাসিমুখে বললেন, 'তোমার মাছের কাঁটার অবস্থা কী?'

বজলুর রহমান হতভম্ব হয়ে বললেন, কী বলছ তুমি! সে তো ব্রিটিশ আমলের কথা। আমার গলা থেকে তো কবেই কাঁটা গেছে, এখন তোমার মাথায় বিঁধে আছে। কাঁটা বিঁধা মাথা নিয়ে ডাক্তারি কর কীভাবে? যাই হোক, তুমি আস আমার সঙ্গে। আলতাফকে দেখবে।'

'ওর কী হয়েছে? গলায় কাঁটা?'

'গলায় কাঁটার ব্যাপারটা মাথা থেকে দূর কর। ওর জ্বর।'

'চল দেখি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিধুবাবু আলতাফের কপালে হাত দিয়েই প্রায় লাফিয়ে উঠার জোগাড় করলেন — 'সর্বনাশ! এ তো অনেক জ্বর।' রাগে বজলুর রহমানের গা জ্বলে গেল। অনেক জ্বর বলেই তো ডাক্তার ডেকে আনা। কুসুম-কুসুম জ্বর হলে কে আনত?

বিধুবাবু রোগীকে দেখে-টেখে শুকনো গলায় বললেন — 'অবস্থা তো কেমন-কেমন মনে হচ্ছে — ইয়ে।' বজলুর রহমান বললেন, 'ইয়েটা কী?'

'না মানে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়াই ভালো। জ্বর খুব বেশি।'

বজলুর রহমানের ইচ্ছা হল, বিধুবাবুকে ধরে একটা আছাড় দেন। এমনি মুখে বড় বড় কথা — ক্যানসার সারাই, হাঁপানি সারাই, এইড্স রোগ সারাই। আর সামান্য একটু জ্বর দেখে মুখ শুকিয়ে আমশি! ধাক্কা দিয়ে দোতলার বারান্দা থেকে নিচে ফেলা দেয়া উচিত।

তিনি তা করলেন না। নিজেকে সামলালেন। অনেক কাজ আছে। কাজগুলো আগে শেষ করা দরকার। যেমন আলতাফের অফিসে ফাইলটা দিয়ে আসতে হবে। প্রতিমাসে ঠিক সময় ইলেকট্রিসিটি বিল দেয়ার পরেও তাঁর ঘরে ইলেকট্রিসিটির লাইন কেন কেটে দিল সেই খোঁজটাও নেয়া দরকার। আলতাফকে হাসপাতালে নিতেই যদি হয়, সন্ধ্যার দিকে নিলেই হবে।

বজলুর রহমান আলতাফের ফাইল বগলে নিয়ে প্রথমে আলতাফের কাছে গেলেন। অফিসের ঠিকানাটা দরকার। আলতাফ ঠিকানা বলল, 'বেশ ভালোভাবেই বলল। অফিসটা কোন জায়গায় বুঝিয়ে দিল।

এটা একটা ভালো লক্ষণ। জ্বরে আলতাফের মাথা খারাপ হয়ে যায় নি। বেশি জ্বর উঠলে মাথা-খারাপের মতো হয়ে যায়।

'আলতাফ!'

'জ্বি।'

'তোর ফাইলটা দিয়ে আসি।'

'আচ্ছা।'

'তোর বড় সাহেবকে বুঝিয়ে বলব যে, বাই মিসটেক তুই ফাইলটা নিয়ে চলে এসেছিলি।'

'আচ্ছা।'

'উনাকে রিকোয়েস্ট করব যাতে ভুলটা বড় করে না দেখেন। মানুষমাত্রই ভুল করে। ভুল করাই মানবধর্ম।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'তুই চিন্তা করিস না। শুয়ে থাক। দুলারী তোর মাথায় পানি ঢালুক।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'হাসপাতালে যদি নিতেই হয়, সন্ধ্যার দিকে নিয়ে যাব।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'তুই কি কিছু বলবি?'

আলতাফ বিড়বিড় করে বলল, 'সবাই আসতে শুরু করেছে, মামা।'

'কী বললি?'

'পোকারা আসতে শুরু করেছে।'

'বুঝতে পারছি না — পরিষ্কার করে বল কে আসছে?'

'পোকারা আসছে।'

'আসুক না, অসুবিধা কী?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ওরা আমাকে খেয়ে ফেলার জন্যে আসছে মামা।'

'তোকে খাবে কেন? ওদের কি খাওয়ার অভাব পড়েছে?'

'আমাকে ওরা পছন্দ করে তো মামা, এই জন্যেই খেয়ে ফেলবে।'

'পছন্দ করলেই খেয়ে ফেলতে হবে? আমি তোকে পছন্দ না করলেও তুই তো আমাকে পছন্দ করিস। তাই বলে কি তুই আমাকে খেয়ে ফেলেছিস, না খাওয়ার কথা চিন্তা করছিস?'

'পোকাদের চিন্তাভাবনা তো মানুষের মতো না মামা। ওরা অন্যভাবে চিন্তা করে।'

'করুক অন্যভাবে চিন্তা। তুই ভাবিস না।'

'আমার ভয় লাগছে মামা। দূর দূর থেকে পোকারা আসতে শুরু করেছে।'

বজলুর রহমান সান্ত্বনার স্বরে বললেন, 'তুই কোনো চিন্তা করিস না। তোকে খেয়ে ফেলবে বললেই হল? আমরা আছি কী জন্যে? দরকার হলে ঘরের চারকোনায় DDT পাউডার দেব। DDT পাউডার মারাত্মক জিনিস — পোকার বাবাও আসতে পারবে না। তুই চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাক্ — মোটেও চিন্তা করবি না।'

'জ্বি আচ্ছা।'

বজলুর রহমান ব্যাপারটাতে তেমন গুরুত্ব দিলেন না। জ্বর বেশি বাড়লে লোকজন অসংলগ্ন কথা বলে। আলতাফ তাই করছে। বজলুর রহমান ফাইল হাতে অফিসের দিকে রওনা হলেন।

১৭

'আমার নাম বজলুর রহমান। আমি আলতাফ হোসেনের মামা।'

'ও আচ্ছা। বসুন।'

'আমি স্যার ফাইলটা নিয়ে এসেছি।'

মনসুর সাহেব অবাক হয়ে বললেন, 'কী ফাইল?'

'একটা জরুরি ফাইল যে আপনি আলতাফকে দিয়েছিলেন, ফাইলটা হারিয়ে গিয়েছিল — ঐ ফাইল।'

মনসুর সাহেব অবাক হয়ে বললেন, 'সেই ফাইল আপনি কোথায় পেলেন?'

'গাধাটা বাসায় নিয়ে গিয়েছিল। তারপর ভুলে গেছে। এ রকম যে হবে জানা কথা।'

'আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ফাইলটা হারালে আমাদের খুব ক্ষতি হয়ে যেত।'

বজলুর রহমান বললেন, 'আলতাফের মতো লোক যখন আছে তখন ভবিষ্যতে আরো অনেক ক্ষতি হবে। করবেন কী! উপায় তো কিছু নেই।'

'চা খান।'

'চা খাব না। চলে যাব। ফাইলটা পৌঁছে দিতে এসেছিলাম। দিলাম। ঐ দিন তো আপনিই আমার বাসায় গিয়েছিলেন।'

'জ্বি।'

'আপনি যে বড় সাহেব দেখে মনেই হয় না। আপনাকে একটা জরুরি কথা বলি— আলতাফকে কখনো গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজ দেবেন না। এলেবেলে ধরনের কাজ দেবেন। সে সুন্দর করে করবে। গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজ দিয়েছেন কি ভজঘট করে ফেলবে। মাথা ঠিক নেই তো!'

'মাথার ঠিক নেই?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

‘জ্বি না। ছোটবেলায় তার মাকে পোকায় খেয়ে ফেলল— সেই থেকে মাথাটা খারাপ। সারাক্ষণ পোকা–পোকা করে।’

‘উনার মাকে পোকায় খেয়ে ফেলেছিল নাকি?’

‘জ্বি। সে এক ভয়াবহ দৃশ্য! বলতে গেলে শশার মতো কচ্‌কচ্‌ করে খেয়ে ফেলেছে। আপনাকে আর বলতে চাই না। বললে হয়তো দুপুরে ভাত খেতে পারবেন না। স্যার, উঠি তাহলে?’

‘উঠবেন?’

‘উপায় নেই স্যার, উঠতেই হবে। আলতাফের জ্বর। ভুল বকছে। বলছে — পোকা আসছে — খেয়ে ফেলবে — এইসব হাবিজাবি। তাকে হাসপাতালে নেয়া দরকার।’

‘জ্বর তাহলে খুব বেশি?’

‘বেশি মানে? বগলের নিচে থার্মোমিটার দিলে — থার্মোমিটারে আগুন ধরে যাবে এমন অবস্থা। স্যার, তাহলে ইজাজত দেন — বিদায় নেই। ঐদিন বাসায় গিয়েছিলেন, চিনতে পারি নি। তেমন সমাদর করতে পারি নি। আরেকবার যদি আসেন — বড় খুশি হব।’

‘আচ্ছা, যাব আরেকবার।’

মনসুর সাহেব অবাক হয়ে ফাইলটার দিকে তাকিয়ে আছেন। ভয়ংকর রাগ হওয়া উচিত। লোকটা এরকম একটা কাজ করে কী করে? আর করার পরেও নির্বিকার থাকে কীভাবে? আশ্চর্যের ব্যাপার, আলতাফের উপর তাঁর কোনো রাগ লাগছে না। বরং প্রচণ্ড রকম মায়া হচ্ছে। তিনি পরিষ্কার বুঝতে পারছেন — আলতাফ এই ফাইল বাসায় নিয়ে যায় নি। গনি নিয়ে গেছে। গনি যে একটা বাজারের ব্যাগে ভরে ফাইল নিয়ে গেছে, তা–ও তিনি জানেন। কীভাবে জানেন? কে তাকে বলল? কেউ তো বলে নি। গনি ঐ বাড়িতে কী কী কথা বলেছে তা–ও তিনি জানেন। এটা কীভাবে হয়? সকাল দশটায় ঐ বাড়িতে গনির একটা কাজের মেয়ে দিয়ে আসার কথা। সে কি দিয়ে এসেছে?

মনসুর সাহেব বেল টিপে বেয়ারাকে ডাকলেন, সহজ স্বরে বললেন, ‘গনি সাহেবকে আসতে বল।’

গনি আসুক। তার সঙ্গে কথা বলতে হবে।

‘স্লামলিকুম স্যার। আমাকে ডেকেছেন?’

‘বসুন গনি সাহেব। ভালো আছেন?’

‘জ্বি স্যার, ভালো।’

‘বসুন, দাঁড়িয়ে আছেন কেন?’

গনি বসলেন। মনসুর সাহেব হাই তুলতে তুলতে বললেন, ‘চা বা কফি কিছু খাবেন?’

‘চা একটু খেতে পারি স্যার। ঐদিন ঠাণ্ডা লেগে বুকে কফ বসে গেছে। গরম চা খেলে ভালো লাগবে। দুধ যেন না দেয় স্যার। আমাকে একজন বলেছে — চায়ের মধ্যে দুধ বিষের মতো কাজ করে।’

মনসুর সাহেব গনির চায়ে দুধ দিতে নিষেধ করলেন। তারপর ঝুঁকে এসে বললেন, ‘ঐদিন আপনি আলতাফের বাসায় গিয়েছিলেন?’

গনি হকচকিয়ে গেলেন কিন্তু নিজেকে সামলে নিলেন। সহজভাবে বললেন, ‘জ্বি স্যার।’

‘সঙ্গে একটা বাজারের ব্যাগ নিয়ে গিয়েছিলেন?’

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'জ্বি স্যার।'

'ব্যাগে কী ছিল?'

'কিছু ছিল না স্যার।'

'আলতাফ সাহেবের বাসায় সকাল দশটার ভেতর একটা কাজের লোক দেয়ার কথা ছিল। কই, দেন নি তো!'

গনি অস্বস্তি বোধ করছেন। এই লোকটা এত কিছু জানে কোত্থেকে? কে বলেছে?

'কী, কথা বলছেন না কেন? সকাল দশটায় একজনকে দেয়ার কথা না?'

'যাকে দেব বলেছিলাম সে গত রাতে হঠাৎ বরিশাল চলে গেছে। আমার স্ত্রীকে বলেছে — ভাইয়ের অসুখের খবর পেয়ে যাচ্ছে। আসলে ভাঁওতাবাজি। আমি থাকলে যেতে পারত না।'

চা এসে গেছে। মনসুর সাহেব চায়ে চুমুক দিতে দিতে বললেন, 'না, ভাঁওতাবাজি না। ঐ মেয়েটার নাম পারুল। পারুলের ভাইয়ের আসলেই খুব অসুখ।'

গনি থতমত গলায় বলল, 'আপনি কী করে জানেন?'

মনসুর সাহেব শীতল গলায় বললেন, 'আমি সবকিছুই জানি।'

এটি পুরোপুরি সত্যি। মনসুর সাহেবের শরীর কাঁপছে। গা ঝিম ঝিম করছে। আসলে তিনি কোথায় কী ঘটছে সব জানেন। এই তো এখন ওসমানকে দেখতে পাচ্ছেন। সে বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে পা দোলাচ্ছে। ওসমানের হাতে একটা বই। বইটার নাম Winter of discontent. ব্যাপারটা সত্যি না মিথ্যা এক্ষুনি বের করা যায়। ওসমানকে টেলিফোন করলেই হয়।

কে তাকে সব জানাচ্ছে? পোকারা জানাচ্ছে? পোকারা কী ঘটছে তা বলে দিচ্ছে?

গনি সাহেব ফ্যাসফ্যাসে গলায় বললেন, 'স্যার, আমি একটা ভুল করেছি। আপনার কাছে ক্ষমা চাই স্যার।'

'যান, ক্ষমা করা হল। চা শেষ না করে চলে যাচ্ছেন কেন? চা শেষ করুন, তারপর যান।' গনি সাহেব চুক্ চুক্ করে চা খাচ্ছেন। মনসুর সাহেব টেলিফোন করলেন ওসমানকে।

'কী করছ ওসমান?'

'বারান্দায় বসে আছি। কিছু করছি না।'

'বই পড়ছ না?'

'বই হাতে নিয়ে বসে আছি, পড়ছি না।'

'বইটার নাম কি?'

'Winter of discontent.'

সন্ধ্যা সাতটার মতো বাজে। অফিসের দারোয়ানরা এবং মনসুর সাহেবের একজন পিওন ছাড়া আর কেউ নেই। মনসুর সাহেব দরজা বন্ধ করে ভেতরে বসে আছেন। তাঁর ঘর অন্ধকার। তাঁর বেয়ারা কিছুটা ভয় পাচ্ছে। স্যারের কী হয়েছে? এই অন্ধকারের মধ্যে তিনি বাতি নিভিয়ে বসে আছেন কেন?

তিনি করছেন কী? দেখার বা জানার উপায় নেই। কারণ দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। ছিটকিনি লাগিয়ে দেয়া। এয়ারকুলার চলছে না। মাথার ওপর ফ্যানও ঘুরছে না। ঘরের ভেতরটা অসহ্য গরম। তবে গরমে মনসুর সাহেবের খারাপ লাগছে না।

মনসুর সাহেবের ঘর নিকষ অন্ধকার। এই অন্ধকারে তিনি চেয়ারে পা তুলে চুপচাপ বসে আছেন। নিজেকে কিছু প্রশ্ন করছেন এবং প্রশ্নের উত্তর পাচ্ছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনসুর — আমি আমার এই অদ্ভুত ক্ষমতা লক্ষ করছি। কোথায় কী ঘটছে আমি সঙ্গে সঙ্গে ধরতে পারছি। ছবির মতো দেখছি। এর মানে কী?

উত্তর — তোমার চেতনার বিস্তৃতি ঘটেছে। তোমার চেতনা ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীময়।

মনসুর — এই চেতনার বিস্তৃতি তো আপনা–আপনি ঘটার কথা না। কেন ঘটল?

উত্তর — আমরা সাহায্য করেছি বলে ঘটল।

মনসুর — তোমরা কারা?

উত্তর — আমরা অতি ক্ষুদ্র প্রাণী। তোমরা যাদের পোকা বল, আমরা তাই। আমাদের এককভাবে কোনো বুদ্ধি নেই, কিন্তু আমাদের সমষ্টিগত বুদ্ধি সীমাহীন। বুদ্ধি মানেই ক্ষমতা। তোমাকে আমাদের সেই ক্ষমতার কিছুটা দেখালাম। কেমন দেখলে আমাদের ক্ষমতা?

মনসুর — তোমাদের ক্ষমতা যদি থেকে থাকে তাহলে তা অবশ্যই বিস্ময়কর।

উত্তর — এখনো যদি বলছ? এখনো অবিশ্বাস?

মনসুর — হ্যাঁ, অবিশ্বাস। আমার ধারণা, পুরো ব্যাপারটাই আমার উত্তপ্ত মস্তিষ্কের কল্পনা।

উত্তর — আমাদের ক্ষমতার আরেকটা নমুনা তোমাকে দেখাই — তাহলে হয়তো তোমার বিশ্বাস হবে।

মনসুর — আমার বিশ্বাসের জন্যে তোমরা এত ব্যস্ত কেন?

উত্তর — আমরা খুবই ব্যস্ত, কারণ তোমাকে আমাদের পছন্দ হয়েছে। যাদের আমরা পছন্দ করি তাদের আমরা খেয়ে ফেলি। হি–হি–হি।

মনসুর — আচ্ছা, মানুষ কি তোমাদের শত্রু?

উত্তর — মানুষ আমাদের শত্রুও না, বন্ধুও না। মানুষ এবং পোকামাকড় হচ্ছে প্রকৃতির ক্ষুদ্র পরীক্ষার অতি ক্ষুদ্র একটা অংশ।

মনসুর — সেটা কী রকম?

উত্তর — প্রকৃতি দেখতে চেয়েছিল — কোন প্রাণী শ্রেষ্ঠ? সমষ্টিগত বুদ্ধি যাদের তারা শ্রেষ্ঠ, না একক বুদ্ধির প্রাণী মানুষ শ্রেষ্ঠ।

মনসুর — প্রকৃতি কি দেখল?

উত্তর — আমরা জানি না, কারণ প্রকৃতি প্রশ্নের জবাব দেয় না।

মনসুর — মানুষ একক বুদ্ধির প্রাণী হলেও তার বুদ্ধির একটি সমষ্টিগত দিক আছে। সে অন্যের জ্ঞান গ্রহণ করে।

উত্তর — তা ঠিক, কিন্তু সে একই সঙ্গে সমস্ত জ্ঞান ধারণ করতে পারে না। এটা ভয়াবহ সীমাবদ্ধতা। মানুষ এই সীমা জানে না বলেই সীমাবদ্ধতা জানে না।

মনসুর — পোকারা কী এটা জানে?

উত্তর — জানে এবং পোকারা এমন অনেক কিছু জানে যা মানুষ এখনো কল্পনাও করতে পারে না।

মনসুর — আমাকে কি তা বলা যাবে?

উত্তর — হ্যাঁ, বলা যাবে। কিন্তু তোমার মস্তিষ্ক তা ধারণ করতে পারবে না। মানুষের একক মস্তিষ্কের জন্যে এই জ্ঞান অনেক বেশি ভারি।

মনসুর — আমি জানতে চাই।

উত্তর — কী জানতে চাও?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনসুর	সবকিছু জানতে চাই।
উত্তর	মূল প্রশ্নের উত্তরটি জানলেই অনেক জানা হবে।
মনসুর	মূল প্রশ্ন কী?
উত্তর	'প্রাণ' কি? কেন প্রাণ সৃষ্টি হল?
মনসুর	হ্যাঁ বল — আমাকে বল — What is life?
উত্তর	সত্যি জানতে চাও?
মনসুর	চাই। অবশ্যই চাই।
উত্তর	আরো তো প্রশ্ন আছে, সেসবের উত্তর চাও না? যেমন — তুমি কে? তুমি কোথেকে এসেছ? তুমি কোথায় যাচ্ছ?
মনসুর	হ্যাঁ চাই, উত্তর জানতে চাই।
উত্তর	'সময় কী তা কি জানতে চাও? এই পৃথিবীর সবচে' রহস্যময় ব্যাপার হল সময়। সময়টা কি জানতে চাও না?
মনসুর	চাই।
উত্তর	আমরা যা জানি সবই তোমাকে জানাব। তোমাকে আমরা আমাদের একজন করে নেব।
মনসুর	তা কীভাবে সম্ভব?
উত্তর	সম্ভব। খুবই সম্ভব। আমরা তোমাকে ছড়িয়ে দেব আমাদের মধ্যে। আগেই তো বলেছি যাকে আমরা পছন্দ করি তাকে আমরা ছড়িয়ে দেই নিজেদের মধ্যে।
মনসুর	তোমরা তাকে মেরে ফেল?
উত্তর	প্রাণ কী তা তোমরা জান না বলেই এই কথা বললে। প্রাণ কী জানা থাকলে বুঝতে যে প্রাণের বিনাশ নেই — রূপান্তর আছে।
মনসুর	মানুষ থেকে আমি পোকা হব?
উত্তর	ক্ষতি কী?

AmarBoi.com

মনসুর সাহেব লক্ষ করলেন, তাঁর ঘরভর্তি পোকা। একটি–দুটি নয়, হাজারে হাজারে পোকা। লক্ষ কোটি পোকা কিলবিল করছে।

তিনি দরজা খুলে বের হতে চাইলেন। দরজা খুঁজে পেলেন না। তেলাপোকা সমস্ত দরজা ঢেকে ফেলেছে। তিনি চিৎকার করে উঠতে চাইলেন — মুখ হাঁ করতেই অসংখ্য পোকা মুখের ভেতর ঢুকে পড়ল।

তাঁর চেতনা পুরোপুরি বিলুপ্ত হবার আগে আলতাফের কথা ভাবলেন। আলতাফকে সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেলেন। তাঁর মতো আলতাফকেও পোকা ঢেকে ফেলেছে। মাংস ছিঁড়ে খেতে শুরু করেছে। কত দ্রুতই না তারা খাচ্ছে। মনসুর সাহেব চেঁচিয়ে উঠতে গেলেন— 'এ কী করছ? তোমরা এটা কী করছ?' সঙ্গে সঙ্গে উত্তর হল — 'ভয় পেও না। ভয়ের কিছু নেই — প্রাণ এক ও অবিনাশী। তোমার প্রাণ এবং এক একটি পোকার প্রাণ আলাদা কিছু না। আমরা এক ও অভিন্ন।'

তিনি বার বার নিজেকে বলছেন, এটা ভুল! এটা মায়া! এটা ভ্রান্তি! আসলে কিছুই ঘটছে না। কিছুই ঘটছে না। কিছু না।

তিনি ভয় পেলেন না। কারণ তিনি বুঝতে পারছেন, আসলে কিছুই ঘটছে না। সবই ভ্রান্তি এবং এক ধরনের হেলুসিনেশন। নিজেকে সামলাতে পারলেই হেলুসিনেশনের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। নিজেকে সামলাতে হবে। মনসুর সাহেব চোখ বন্ধ করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বললেন, 'আমি কিচ্ছু দেখছি না। আমি কিচ্ছু দেখছি না।' তিনি মাথার ভেতর খিক্ খিক হাসি শুনলেন। পোকারা কি হাসে? এ কেমন হাসি? মাথার ভেতর তাঁকে পোকারা ডাকছে — 'মনসুর! মনসুর!'

'বল।'

'আমরা আছি। আমাদের অগ্রাহ্য কোরো না।'

তোমরা আছ ঠিকই, কিন্তু এখন আমি যা দেখছি সবই ভুল।'

'না, ভুল নয়। আমাদের ক্ষমতাকে অগ্রাহ্য কোরো না। তুমি কেন রোদের দিকে তাকাতে পার না? কেন সব সময় চোখে কালো চশমা দিয়ে রাখ তা কি বলব? তাহলে বিশ্বাস করবে?'

'না, বিশ্বাস করব না।'

লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি পোকা মনসুর সাহেবের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। মনসুর জানেন এটা সত্যি নয়। এক ধরনের মায়া, কুহক, ভ্রান্তি। কিন্তু আসলেই কি তাই?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জল জোছনা

১

তিনি ঘুমের মধ্যে শুনলেন— শোঁ শোঁ শব্দ হচ্ছে। ঘুমের মধ্যেও চেতনার খানিকটা অংশ কাজ করে। সেই অংশ তাঁকে বলল, তুমি স্বপ্ন দেখছ। ভয় পাবার কিছু নেই। আরেকটি অংশ বলল, না স্বপ্ন না। ঝড় হচ্ছে। তুমি জেগে ওঠ। জানালা বন্ধ কর। সাইড টেবিলের ড্রয়ারে টর্চলাইট আছে কিনা দেখ।

তিনি জাগলেন না। ঘুমের মধ্যেই পাশ ফিরলেন। শোঁ শোঁ শব্দ হতেই থাকল। এক সময় এই শব্দের সঙ্গে খিলখিল হাসির শব্দ যুক্ত হল। ঝড় এবং হাসি একসঙ্গে যায় না। কিছু একটা হচ্ছে যা তিনি বা তাঁর মস্তিষ্কের ঘুমন্ত অংশ ধরতে পারছে না। তাঁর অস্বস্তি বাড়ল। তিনি জেগে উঠলেন।

ঝড়–টড় কিছু না। বাথরুমে তাঁর স্ত্রী রেবেকা হেয়ার ড্রায়ার দিয়ে চুল শুকোচ্ছেন। শোঁ শোঁ শব্দ আসছে হেয়ার ড্রায়ার থেকে। রেবেকার পাশে তাঁর বড় মেয়ে নীতু। সম্ভবত সে–ই হাসছে। তিনি বালিশের নিচ থেকে হাতঘড়ি বের করলেন। রাত সাড়ে তিনটা। এই সময়ে কেউ হেয়ার ড্রায়ারে চুল শুকায়। কী হচ্ছে? নাকি এখনো তিনি স্বপ্নের মধ্যেই আছেন? মানুষের স্বপ্ন মাঝে মাঝে খুব জটিল এবং খাপছাড়া হয়ে থাকে।

তিনি বিছানায় উঠে বসলেন, আর তখনই রাত সাড়ে তিনটায় রেবেকার চুল শুকানোর রহস্য তাঁর কাছে স্পষ্ট হল। বাড়ির সবাই আজ বেড়াতে যাচ্ছে। শেষ রাতে রওনা হবার কথা, গন্তব্য দিনাজপুর। থাকবে রামসাগরে ফরেস্টের ডাকবাংলোয়। ঐ ডাকবাংলোই তাঁদের 'বেস পয়েন্ট।' এখান থেকে নানান জায়গায় ঘুরবে। কোথায় কোথায় যাবে বা কতদিন থাকবে তিনি কিছুই জানেন না। তাঁকে বলাও হয় নি। কেউ প্রয়োজন বোধ করে নি। একটা সময় আসে যখন সংসারের কাছে মানুষের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়। তাঁরও প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে।

তিনি বিছানা থেকে নামলেন। নিঃশব্দে নামতে চেষ্টা করলেন, পারলেন না। সাইড টেবিলে হাত লাগল। পিরিচ দিয়ে ঢেকে রাখা পানির গ্লাস গড়িয়ে পড়ল। মেঝেতে পড়ার আগেই তিনি ক্রিকেট বল ক্যাচ করার মতো গ্লাস ধরে ফেললেন। তাঁর ভালো লাগল। পঞ্চাশ বছর বয়সেও Reflex action ঠিক আছে। রাত সাড়ে তিনটায় মূর্তির মতো চুপচাপ বিছানায় বসে থাকার কোনো মানে হয় না। তিনি বিছানা থেকে নামলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রেবেকা বাথরুম থেকে বের হয়ে এলেন। রেবেকার পেছনে পেছনে এল নীতু। রেবেকা বললেন, 'সরি, তোমার ঘুম ভাঙিয়ে ফেললাম।'

'তোমরা ভাঙাও নি। এই সময় এমনিতেই আমার ঘুম ভাঙে।'

মনজুর স্ত্রীর দিকে বিস্ময় নিয়ে তাকালেন। রেবেকা সুন্দর করে সেজেছে। সবুজ রঙের শাড়ি। গলায় সবুজ পাথরের হার। সবুজ পাথরগুলোকে কী বলে, পান্না না ফিরোজা? রেবেকার বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। তাকে দেখে কে বলবে? পঁচিশ–ছাব্বিশ বছরের ঝকঝকে তরুণীর মতো লাগছে। মনজুর হাসিমুখে বললেন, 'তোমরা কি রাত একটা থেকেই সাজসজ্জা করছ?'

রেবেকা জবাব দিলেন না। জবাব দিল নীতু। সে আনন্দিত গলায় বলল, 'আমরা দুটা থেকে রেডি হচ্ছি। সূর্য ওঠার আগে রওনা হব তো, এই জন্যেই এত তাড়া। আমরা সকালের নাশ্‌তা কোথায় খাব জান বাবা? আমরা সকালের নাশ্‌তা খাব জাতীয় স্মৃতিসৌধে। সুন্দর আইডিয়া না?'

'সুন্দর আইডিয়া। জায়গাটা কি খুব প্যানারোমিক?'

নীতু বিস্মিত গলায় বলল, 'তুমি জাতীয় স্মৃতিসৌধ দেখ নি?'

'কাছে গিয়ে দেখি নি। আরিচা রোড ধরে যাবার সময় দূর থেকে দেখেছি।'

রেবেকা বললেন, 'তোর বাবা তাঁর অফিস এবং সিঙ্গাপুর, ব্যাংককের অফিস ছাড়া কিছু দেখে নি। ব্যবসা দেখতে দেখতেই তার সময় চলে যায়, আর কী দেখবে?'

মনজুর সিগারেটের প্যাকেট হাতে নিতে নিতে বললেন, 'সবাই সবকিছু এনজয়ও করে না। গাছপালা, জঙ্গল এইসব আমাকে ঠিক এট্রাক্ট করে না। রেবেকা, আমি ঠাণ্ডা এক গ্লাস পানি খাব। কাউকে বল বরফ দিয়ে আমাকে এক গ্লাস পানি দিতে।'

রেবেকা নিজেই পানি আনতে গেলেন। নীতু বলল, 'স্মৃতিসৌধের বাগানে বসে ব্রেকফাস্টের আইডিয়া তোমার কাছে কেমন লাগছে বাবা?'

'খুব সুন্দর আইডিয়া। কার আইডিয়া, তোর মার?'

'না। জহির চাচার।'

'সেও যাচ্ছে নাকি?'

'হ্যাঁ।'

রেবেকা পানি নিয়ে এসেছেন। তিনি পানির গ্লাস নামিয়ে রাখলেন। গ্লাসে দুটুকরা বরফ ভাসছে। মনজুর গ্লাস হাতে নিলেন, কিন্তু চুমুক দিলেন না। বরফের টুকরা দুটি গলার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন। ফ্রিজের বোতলে রাখা ঠাণ্ডা পানি তিনি খেতে পারেন না। বেশি ঠাণ্ডা লাগে। তাঁর নিয়ম হচ্ছে, সাধারণ এক গ্লাস পানিতে দুটুকরা বরফ মিশিয়ে নেয়া।

রেবেকা নীতুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুই দেরি করছিস কেন? শাড়ি পরবি বলছিলি, পরে ফেল। তোর ঘরে সব রেখে এসেছি।'

'কমলা রঙের শাড়ি পরব না মা। চোখে কট্ কট্ করে। আমিও তোমার মতো সবুজ পরব। হয় সবুজ, নয় নীল।'

'তুই কমলাটাই পরবি। এক এক বয়সের জন্য এক এক শাড়ি। তোর বয়সী মেয়েদের শাড়ি হল— কমলা এবং লাল।'

'আমার চেয়ে কম বয়সীদের কী শাড়ি মা?'

'ওদের জন্য গোলাপি।'

'আমার ইচ্ছা করছে তোমার মতো সবুজ শাড়ি পরতে।'

'তোকে যা পরতে বলেছি তাই পর।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নীতু শাড়ি পরতে গেল। খুব আগ্রহ নিয়ে গেল তা মনে হল না। মনজুর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমাকে সুন্দর লাগছে।'

রেবেকা বললেন, 'থ্যাংকস।'

'সবুজ শাড়িতে খুব মানিয়েছে। নীতু সবুজ পরতে চাচ্ছে, পরুক। আমার মনে হয় ওকেও মানাবে।'

'এসব নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না।'

মনজুর পানি শেষ করলেন। চারটা প্রায় বাজতে চলেছে। আরো ঘণ্টাখানিক ঘুমানো যায়। ঘুম আসবে কিনা সেটাই হল কথা। পঞ্চাশ পার-হওয়া মানুষদের ঘুম একবার ভেঙে গেলে আর আসে না। বিছানায় এপাশ-ওপাশ করাই সার হয়। তিনি শুয়ে পড়লেন। শীত শীত লাগছে। কার্তিক মাস। শেষ রাতের দিকে শীত শীত করে। মাথার ওপর ফ্যান ঘুরছে। ফ্যান বন্ধ করলে হয়তো গরম লাগবে। তিনি হাই তুলতে তুলতে বললেন, 'জহির যাচ্ছে শুনলাম।'

'হ্যাঁ যাচ্ছে। তোমার কি কোনো আপত্তি আছে?'

'আপত্তি থাকবে কেন?'

রেবেকা তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, 'তোমার প্রশ্নের ধরন দেখে মনে হচ্ছে, আপত্তি আছে। আপত্তি থাকলে বল।'

মনজুর হাই তুলতে তুলতে বললেন, 'আমি স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন করেছি।'

'না কর নি। তুমি কোনো কিছু নিয়েই প্রশ্ন কর না। আজ হঠাৎ জানতে চাচ্ছ জহির সঙ্গে যাচ্ছে কিনা, এর মানে কি?'

'কোনো মানে নেই রেবেকা।'

'সে যে মাঝেমধ্যে এ বাড়িতে আসে, আমাদের এখানে-ওখানে বেড়াতে নিয়ে যায়, সে বিষয়ে তোমার কি কিছু বলার আছে?'

মনজুর গম্ভীর গলায় বললেন, 'আছে।'

'বলে ফেল।'

'সে যা করে তার জন্যে আমার তাকে ধন্যবাদ দেয়া উচিত। ওর সঙ্গে দেখা হয় না বলে ধন্যবাদ দেয়া হয় না। আমি নানান কাজে ব্যস্ত থাকি। তোমাদের কোথাও নিয়ে যাওয়া হয় না। জহির এই দায়িত্ব পালন করে। সো নাইস অব হিম।'

'সেটা আমাকে না বলে তাকেও তো বলতে পার।'

'বলব, দেখা হলেই বলব। দেখাই হয় না। রেবেকা, ফ্যানটা অফ করে দিয়ে যাও— ঠাণ্ডা লাগছে।'

রেবেকা ফ্যান অফ করলেন। মনজুর পাশ ফিরে শুলেন। বাথরুমে বাতি জ্বলছে। বাতি না নেভা পর্যন্ত ঘুম আসবে না। বাতি নেভানোর কথা রেবেকাকে বলতে পারছেন না। কোথাও বেড়াতে যাবার আগে মেয়েরা দীর্ঘ সময় বাথরুমে থাকতে পছন্দ করে। তাঁর ধারণা, প্রয়োজন ছাড়াই তারা বাথরুমের দরজা বন্ধ করে চুপচাপ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে।

রেবেকা তা করলেন না। বাথরুমের বাতি নেভালেন। ঘর অন্ধকার হয়ে গেল। মনজুর জড়ানো গলায় বললেন, 'গুড নাইট।' বলেই মনে হল— কিছুক্ষণের মধ্যেই সকাল হচ্ছে— এখন বোধহয় গুড নাইট বলা ঠিক হল না। 'বনভয়াজ' বলা যেত।

রেবেকা বললেন, 'যাচ্ছি, কেমন? টেলিফোন নাম্বার লিখে রেখে গেলাম। ফ্রিজের গায়ে মেগনেট দিয়ে আটকানো। প্রয়োজনে যোগাযোগ করতে পারবে। অবশ্যি জানি, প্রয়োজন পড়বে না। তবু নাম্বার রইল।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনজুর জবাব দিলেন না। রেবেকা ইদানীং কাটা-কাটা ভঙ্গিতে কথা বলায় অভ্যস্ত হয়ে গেছে। সহজভাবে কিছুই বলতে পারে না। চুপচাপ থাকাই ভালো। শুয়ে থাকাও অর্থহীন। ঘুম আর আসবে বলে মনে হচ্ছে না। দুটা পাঁচ মিলিগ্রামের ফ্রিজিয়াম খেয়ে ঘুমাতে গিয়েছিলেন। এর প্রভাব ভোর চারটা পর্যন্ত থাকার কথা না। রেবেকা ঘর থেকে বের হবার পর-পরই তিনি বিছানা ছাড়লেন। চোখে-মুখে পানি দিলেন। আয়নায় নিজেকে কুৎসিত লাগছে। মুখভর্তি খোঁচা খোঁচা সাদা দাড়ি। তাঁর মাথার চুল এখনো কালো, কিন্তু দাড়ি-গোঁফ পেকে সাদা হয়ে গেছে। এরকম হওয়াটা কি যুক্তিযুক্ত? তাঁর আঠার বছর বয়সে দাড়ি-গোঁফ গজাল। কাজেই মাথার চুলের চেয়ে এদের বয়স আঠার বছর কম। চুল পাকারও আঠার বছর পর দাড়ি-গোঁফ পাকার কথা।

তিনি খানিকক্ষণ গালে হাত বুলালেন। চট করে শেভ করে ফেললে হয়। ইচ্ছা করছে না। তিনি বাথরুমের বড় টাওয়েলটা গায়ে জড়িয়ে বের হয়ে এলেন। নীতুকে দেখতে ইচ্ছে করছে। কমলা রঙের শাড়িতে তাঁর আঠার বছরের মেয়েটাকে কেমন দেখাচ্ছে? বেচারির শখ ছিল সবুজ শাড়ির। মার মতো হতে চাচ্ছিল। মেয়েটা তার মায়ের মতো রূপবতী হয় নি। গায়ের রং হয়েছে কালো। নীতুর মনে এ নিয়ে গোপন কষ্ট আছে। তিনি তা জানেন। গোপন কষ্ট থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। এই দেশে কালো মেয়েদের কেউ রূপবতী বলে না।

নীতু বাবাকে দেখে চেঁচিয়ে বলল, 'বাবা, তুমি!'

মনজুর সাহেব অবাক হয়ে বললেন, 'ভূত দেখার মতো চমকে উঠলি যে! টাওয়েল গায়ে আমার বারান্দায় আসাটা কি এতই অস্বাভাবিক ব্যাপার?'

'মোটেই অস্বাভাবিক না। কিন্তু আমার চমকে ওঠার কারণ আছে। কারণটা হচ্ছে — এই কিছুক্ষণ আগে হঠাৎ করে আমার মনে হল — বাবা বের হয়ে এসে আমাকে বলবে — নীতু, আমি যাচ্ছি তোদের সাথে।'

'এটা হল তোর উইশফুল থিংকিং।'

'তাও জানি।'

'তোকে তো কমলা রঙের শাড়িতে সুন্দর লাগছে।'

'সত্যি সুন্দর লাগছে, বাবা?'

'হ্যাঁ সুন্দর। যেই দেখবে সেই বলবে, সুন্দর।'

'জহির চাচা অবশ্যি কিছুক্ষণ আগে বলেছেন, 'আমাকে নাকি অবিকল জলপরীর মতো লাগছে।'

'ও কি জলপরী দেখেছে আগে?'

নীতু খিলখিল করে হেসে ফেলল। তিনি বিস্মিত হয়ে মেয়ের হাসি শুনলেন। এমন আনন্দময় শব্দে তিনি কাউকে হাসতে শোনেন নি। যেন রিনঝিন শব্দে একসঙ্গে অনেকগুলো রূপার নূপুর বেজে উঠেছে।

'বাবা!'

'ইয়েস মাই লিটল ডিয়ার।'

'আমার একটা অনুরোধ রাখবে?'

'না।'

'আগেই না বলে ফেললে কেন? তুমি তো জান না আমার অনুরোধটা কি? আগে শুনবে, তারপর যা বলার বলবে।'

'তোর অনুরোধ কি অনুমান করতে পারছি বলেই আগেভাগে 'না' বললাম। তোর অনুরোধ হচ্ছে — আমি যেন তোদের সঙ্গে যাই।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নীতু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, 'অনুরোধে কাজ হবে না। তাই না বাবা?'

'না, কাজ হবে না। আমার অসংখ্য সমস্যা। এর মাঝখান থেকে বিনা নোটিশে আমি সময় বের করতে পারব না।'

'মনে কর, হঠাৎ তুমি অসুস্থ হয়ে পড়েছ।'

'আমি তো অসুস্থ হই নি।'

'মনে কর।'

'মনে করাও সম্ভব না। তাছাড়া তোরা একভাবে প্ল্যান করেছিস। আমি হঠাৎ সঙ্গে গেলে প্ল্যানে গণ্ডগোল হবে।'

'তোমার সব মিথ্যা যুক্তি। আসলে তুমি যাবে না।'

'তাও ঠিক।

নীতু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। মনজুর সাহেব কোমল গলায় বললেন, 'তোরা রওনা হচ্ছিস না কেন?'

'রওনা হব। জহির চাচা রওনা হবার আগে এক কাপ কফি খেতে চাচ্ছেন। কফি তৈরি হচ্ছে।'

'জহির এসেছে নাকি?'

'হ্যাঁ এসেছেন।'

'আমাকেও কফি দিতে বল, জহিরের সঙ্গে বসেই কফি খাই।'

জহিরকে দেখাচ্ছে ক্রিকেট খেলোয়াড়ের মতো। মাথায় সাদা টুপি। পরনে সাদা প্যান্ট-শার্ট। পায়ে সাদা কেডস্ জুতা। বয়সও কম লাগছে। বয়স কম লাগার রহস্যটা ধরা যাচ্ছে না। রঙচঙা শার্ট গায়ে থাকলে বয়স কম লাগার একটা যুক্তি দাঁড়া করানো যেত। পায়ে কেডস্ জুতা এবং মাথার টুপি একটা কারণ হতে পারে।

জহির মনজুরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হ্যালো গ্রেটম্যান। গুড মর্নিং।' মজনুর হাসলেন।

জহির বললেন, 'তোকে মিসরের মমীর মতো লাগছে কেন রে?'

'মিসরের মমীর মতো লাগছে নাকি?'

'অবিকল মিসরের মমী। গায়ে তোয়ালে থাকায় মমীর ইলিউশানটা আরো জোরালো হয়েছে।'

'মমীদের গায়ে তোয়ালে থাকে?'

'কাঁধে চাদরের মতো একটা কি যেন থাকে।'

মনজুর হাই তুললেন। জহির বললেন, 'তুই কি এই সময়েই উঠিস না আজ ঘুম ভেঙেছে?'

'আজ ভেঙেছে।'

জহির হাসতে হাসতে বললেন, 'এরা তোর ঘুম ভাঙিয়েছে। এদের সাহস তো কম না। কোটিপতির ঘুম ভাঙানো!'

'তোরা রেডি?'

'ইয়েস স্যার। গাড়িতে মালপত্র তোলা হয়েছে। আমি কফির জন্যে অপেক্ষা করছি। কফিতে গুনে গুনে তেরটা চুমুক দিয়ে গাড়িতে উঠব।'

'তের চুমুক কেন?'

'বিষে বিষক্ষয়। যাত্রার আগে তেরবার কোনো একটা কাজ করলে যাত্রার দোষ নাস্তি হয়ে যায়।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'এই তথ্য পেয়েছিস কোথায়?'

'এটা হল জিপসী কালচার। জিপসীরা ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। কোথাও যাবার আগে এরা তেরবার মদের গ্লাসে চুমুক দেয়। তুই আছিস কেমন বল। তোর সঙ্গে তো দেখাই হয় না। বাজারে গুজব — তুই নাকি জাহাজ কিনছিস? Sea going Vessel.'

'ভাবছি। এখনো প্ল্যানিং পর্যায়ে।'

'যদি সত্যি সত্যি জাহাজ কিনে ফেলিস, তাহলে জাহাজের নামটা আমাকে রাখতে দিস। স্কুল জীবনের দরিদ্র বন্ধুর এই একটা অনুরোধ। তুই কিনবি জাহাজ— আমি রাখব নাম।'

'কী নাম?'

জল জোছনা। খুব কাব্যিক নাম না?'

'হুঁ।'

'আমার সেকেন্ড রিকোয়েস্ট হচ্ছে — কোনো এক জোছনা রাতে তুই তোর ঐ জাহাজে করে আমাকে সমুদ্র দেখিয়ে আনবি, পারবি?'

'পারব।'

'তোর জাহাজের ক্যাপ্টেনকে বলে রাখবি, ফুল-মুন আকাশের মাঝামাঝি যখন আসবে তখন সে যেন জাহাজের ইনজিন বন্ধ করে দেয় এবং জাহাজের সব বাতি নিভিয়ে দেয়।'

'আচ্ছা বলে দেব।'

'আমি কিন্তু ঠাট্টা করছি না। আমি সিরিয়াস।'

'আমিও সিরিয়াস।'

amarboi.com

কফি নিয়ে রেবেকা ঢুকলেন। জহির উজ্জ্বল মুখে বললেন, 'রেবেকা, গুড নিউজ।' তোমার কোটিপতি স্বামী তার জাহাজের নাম জল জোছনা রাখতে রাজি হয়েছে বলে মনে হয়।'

রেবেকা বললেন, 'তাড়াতাড়ি কফি শেষ কর। সূর্য ওঠার আগে আমাদের রওনা হবার কথা।'

জহির বললেন, 'সূর্য ওঠার আগে আমাদের রওনা হওয়া যাবে না। আমাদের রওনা হতে হবে সূর্য উদয়ের পর। অন্ধকারে গৃহত্যাগ করতে নেই। জিপসীরা কখনো অন্ধকারে ঘর ছাড়ে না।'

'তুমি কি জিপসী?'

জহির কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে বললেন, 'যখন আমি ঘরে থাকি তখন গৃহী, যখন পথে নামি তখন আমি জিপসী।

A bag of flower
Spider full of can
Truth is meaningless
To a Gypsy man.

মনজুর কফির কাপ নামিয়ে রাখলেন। অতিরিক্ত চিনি দেয়া হয়েছে। সমস্ত মুখ মিষ্টি হয়ে আছে। তিনি উঠে দাঁড়ালেন। জহির বলল, 'চলে যাচ্ছিস?'

'হুঁ।'

'এখন কী করবি, আবার বিছানায় শুয়ে পড়বি?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বলতে পারছি না। তবে শুয়ে পড়তেও পারি। আমি তো আর জিপসী ম্যান না। আমি সাধারণ মানুষ।'

'তুই কিন্তু আমাদের সঙ্গে গেলে পারতিস। আমরা রামসাগরে জোছনা দেখব। আগামীকাল পূর্ণিমা।'

'নেক্সট টাইম। বনভয়াজ।'

বারান্দায় নীতুর সঙ্গে আবার দেখা। সে রেলিঙে হেলান দিয়ে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আছে। তাকে খুব নিঃসঙ্গ লাগছে। মেয়েটাকে কমলা শাড়িতে ভালো দেখাচ্ছে না। তিনি মিথ্যা করে বলছেন, সুন্দর। শরীরের সৌন্দর্য যেভাবে দেখা যায় মনের সৌন্দর্য সেভাবে দেখা গেলে খুব ভালো হত। তাহলে নীতুকে অবশ্যই জলকন্যার মতো লাগত।

নীতু বলল, 'তুমি ভালো থেক, বাবা।'

'ভালো থাকব মা।'

'আরেকটা কথা — আগামীকাল রাত ঠিক একটার সময় তুমি যেখানেই থাক আকাশের চাঁদের দিকে তাকাবে।'

'কেন?'

'ঐ সময় আমিও রামসাগর থেকে চাঁদের দিকে তাকাব। এবং মনে মনে ভাবব তুমিও তাকাচ্ছ। মনে থাকবে বাবা?'

মনজুর সাহেব জবাব দিলেন না। নীতু ছোট্ট নিশ্বাস ফেলে বলল, 'চুপ করে আছ কেন? পারবে না?'

তিনি বললেন — 'রফিককে বল আমার ব্যাগ গুছিয়ে গাড়িতে নিয়ে তুলতে। আমি যাচ্ছি তোদের সঙ্গে।'

নীতু কয়েক সেকেন্ড যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল, তারপরই ছুটে এসে বাবাকে জড়িয়ে ধরল। তিনি অবাক হয়ে লক্ষ করলেন, তাঁর আঠার বছরের মেয়ে সাত বছরের বালিকার মতো কাঁদছে।

রেবেকা বারান্দা দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন। বিস্মিত গলায় বললেন, 'কী হয়েছে?'

মনজুর অপ্রস্তুত স্বরে বললেন, 'কিছু হয় নি।'

'নীতু কাঁদছে কেন?'

'আনন্দে কাঁদছে।'

'কীসের এত আনন্দ?'

নীতু চোখ মুছতে মুছতে বলল, 'বাবা আমাদের সঙ্গে যাচ্ছে, মা।'

রেবেকা বিস্মিত হয়ে বললেন, 'তুমি কি সত্যি সত্যি যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ।'

'কেন বল তো?'

'মত বদলেছি। এখন মনে হচ্ছে ঘুরে আসি।'

'মতটা কেন বদলালে তাই জানতে চাচ্ছি।'

নীতু বলল, 'তুমি এত জেরা করছ কেন? বাবা যেতে চাচ্ছেন এটাই হচ্ছে বড় কথা।'

মনজুর নিজের ঘরে ঢুকলেন। কিছু কাপড় জামা দ্রুত গুছিয়ে নিতে হবে। তাঁর জন্যে সবার দেরি হোক তা তিনি চান না। অফিস সেক্রেটারিকে খবর দিয়ে যেতে পারলে ভালো হত। এত সকালে তাঁর ঘুম ভাঙানো কি ঠিক হবে? ঠিক হবে না। ঠিক না হলেও ঘুম ভাঙাতে হবে। তিনি টেলিফোন সেটের সামনে বসলেন। ছবার রিং হবার পর ঘুম ঘুম গলায় ওপাশ থেকে বলল, 'কে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনজুর সাহেব কিছু বলবার, আগেই লাইন কেটে গেল। তিনি যতবারই টেলিফোন করছেন ততবারই ওপাশ থেকে এনগেজড টোন আসছে। রেবেকা পাশে এসে দাঁড়ালেন। মনজুর বললেন, 'কিছু বলবে?'

'হ্যাঁ।

'বল। তুমি যে রকম মুখ গম্ভীর করে রেখেছ দেখে ভয় ভয় লাগছে।'

'তুমি কি সত্যি যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ যাচ্ছি।'

'ব্যাগ গুছাব?'

'গুছিয়ে দাও।'

রেবেকা বললেন, 'নীতু তোমাকে এমন কী বলেছে, যে চট করে সব কাজ ফেলে আমাদের সঙ্গে যেতে রাজি হলে?'

'নীতু কিছু বলে নি। আমি নিজ থেকেই ঠিক করলাম।'

'তুমি সহজে মত বদলাও না। আমার ধারণা নীতু নিশ্চয়ই বিশেষ কিছু বলেছে।'

মনজুর সাহেব হাসলেন। আবার টেলিফোনে চেষ্টা করতে লাগলেন। রেবেকা কঠিন গলায় বললেন, 'তুমি দয়া করে টেলিফোনের বোতাম টেপা বন্ধ কর। আমার প্রশ্নের জবাব দাও। কী বলেছে নীতু।'

মনজুর ছোট্ট নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'নীতু বলেছে বাবা তুমি যদি আমার সঙ্গে না যাও তাহলে আমি আত্মহত্যা করব। ইঁদুর মারা বিষ খাব।'

রেবেকা মুখ কালো করে সরে গেলেন। তাঁর চোখে পানি এসে গেছে। এই পানি তিনি গোপন রাখতে চান। কাজেই স্বামীর সামনে থেকে সরে যাওয়া ছাড়া তাঁর উপায় ছিল না।

AMARBOI.COM

২

বার সিটের মাইক্রোবাস। খুব কায়দার গাড়ি। স্কাই লাইট আসার ব্যবস্থা আছে। বসার সিটগুলো আলাদা আলাদা — রিভলভিং। যাত্রীরা মুখোমুখি বসতে পারে। সামনে ছোট টেবিলও আছে। গাড়ির জানালায় রঙিন পর্দা। পর্দার কারণে গাড়িকে গাড়ি মনে হয় না। চলমান বাড়ি বলে মনে হয়।

এই গাড়ি গত বছর কেনা হয়েছে। তেমন ব্যবহার হয় নি। এখনো নতুন গন্ধ রয়ে গেছে। গাড়ি চালাচ্ছে ইসমাইল। সে অতি দ্রুত চালায়। আজ বড় সাহেব আছেন, তাকে খুব সাবধানে চালাতে হচ্ছে। বড় সাহেব সম্পর্কে তাদের ভেতর যে কথা প্রচলিত, তা হচ্ছে— বড় সাহেবকে দেখে মনে হয় তিনি কিছুই বোঝেন না, আসলে সবই বোঝেন। গাড়ি চালাতে গিয়ে সামান্য ভুল করলে তিনি কিছু বলবেন না। তাকাবেনও না। কিন্তু তাঁর ঠিকই মনে থাকবে।

ইসমাইল চেষ্টা করছে কোনোরকম ঝাঁকুনি ছাড়া গাড়ি চালাতে। অনেক আগে থেকে স্পিড ব্রেকার লক্ষ করতে হচ্ছে। গিয়ার চেঞ্জ করতে হচ্ছে সাবধানে। নতুন গাড়ি—গিয়ার শক্ত, মাঝে মাঝে ঝাঁকুনি দিচ্ছে। ইসমাইল অস্বস্তি বোধ করছে।

মনজুর সাহেব বললেন, 'ইসমাইল মিয়া!'

ইসমাইলের হাত কেঁপে গেল। সে শান্ত ভঙ্গিতে বলল, 'জ্বি স্যার।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তোমার ছেলে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়েছিল?'

'জ্বি স্যার।'

'রেজাল্ট কী?'

'পাস করেছে স্যার।'

'কোন ডিভিশন?'

'সেকেন্ড ডিভিশন।'

'আচ্ছা।'

ইসমাইল স্বাভাবিক হল। যদিও তার বিস্ময়বোধ দূর হল না। ছমাস আগে একবার সে স্যারকে কথায় কথায় বলেছিল ছেলের কথা। স্যার ঠিকই মনে রেখেছেন। এরকম মালিকের সঙ্গে কাজ করে আরাম আছে। ইসমাইল গাড়ির গতি খানিকটা বাড়িয়ে দিল। আরিচা রোডে দ্রুত গাড়ি চালাতে হয়। একেক রোডের একেক নিয়ম।

নীতু বাবার পাশে বসেছে। সে সব সময় জানালার পাশে বসে। আজ বসে নি। বাবাকে জানালা ছেড়ে দিয়েছে। নীতুর পাশে তার মা। তারা মুখোমুখি বসতে পারত, তা বসে নি। জহির তাদের পেছনের সিটের পুরোটা দখল করে আধশোয়া হয়ে আছে। পা মেলে দিয়েছে। মাথার নিচে দুটা বালিশ। তাঁর সঙ্গে গাদাখানিক ম্যাগাজিন। বর্তমানে একটি 'Omni পত্রিকা গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়ছে।

মনজুর বললেন, 'বেড়াতে এসে জহির কি সব সময় ম্যাগাজিন নিয়ে পড়ে থাকে, না আজই পড়ছে?' প্রশ্ন করা হয়েছে রেবেকাকে। রেবেকা তার জবাব দিলেন না। জবাব দিল নীতু। সে চাপা গলায় বলল, 'জহির চাচা যখন যে জিনিসটা করার না সেটা করেন। বেড়াতে গিয়ে বেশির ভাগ সময় তিনি ঘুমিয়ে কাটান।'

জহির পেছনের সিট থেকে বললেন, 'ঠিক বললে না নীতু। আমি একবারই শুধু সারাদিন ঘুমিয়েছিলাম। তার কারণ হল— সারারাত জেগেছিলাম।'

মনজুর বললেন, 'এবারো কি এরকম রাত জাগার প্রোগ্রাম আছে?'

'আছে। আজ রাতটা কাটাতে হবে জেগে। কারণ আজ পূর্ণিমা। আমার হিসাব মতো বিকেল পাঁচটার মধ্যে রামসাগর পৌঁছে যাব। গোসল করে খানিকক্ষণ রেস্ট নিয়ে শুরু হবে নিশিপালন।'

'খাবার-দাবারের ব্যবস্থা কি?'

'সব ব্যবস্থা করা আছে। বাবুর্চি রান্না করে রাখবে। বাবুর্চির নাম মুসলেহউদ্দিন। আমার জানামতে বাঙালি রান্নায় সে পৃথিবীতে দুনম্বর।'

নীতু বলল, 'এক নম্বর কে?'

'এক নম্বর হলেন আমার এক চাচি। নেত্রকোনা থাকেন। একবার তোদের তাঁর রান্না খাওয়াব। তবে না খাওয়াই ভালো।'

'না খাওয়া ভালো কেন চাচা?'

'একবার উনার রান্না খেলে অন্য কোনো খাবার মুখে রুচবে না। এই জন্যে না খাওয়া ভালো।'

মনজুর বললেন, 'তোর সেই দুনম্বর বাবুর্চি সব রান্নাবান্না করে রাখবে?'

'হ্যাঁ, করে রাখবে। তুই চাইলে কী রান্না করবে— তাও বলতে পারি।'

'কী রাঁধবে?'

'ছোট আলু দিয়ে মুরগির ঝোল। মটর ডাল এবং গরুর গোশতের একটা প্রিপারেশন। দুরকমের সবজি। কৈ মাছের দোপেঁয়াজা। তাকে টেলিফোনে বলে দেয়া হয়েছে।'

রেবেকা বললেন, 'কী রান্না হবে তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ কেন? যথাসময়ে খাবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাবে। তোমার অসুবিধা হবে না।'

নীতু বলল, 'বাবা তো কখনো আমাদের সঙ্গে যায় নি। বাবার ধারণা, আমরা অকূল সমুদ্রে পড়ব। ঠিক বলছি না বাবা?'

'হ্যাঁ ঠিক। ইউনিভার্সিটিতে পড়বার সময় আমরা কয়েক বন্ধু মিলে একবার তেঁতুলিয়া গিয়েছিলাম। ওখানকার ডাকবাংলোয় এক রাত ছিলাম। ছজন মানুষের জন্যে দুটা মাত্র বিছানা। কোনো বাবুর্চি ছিল না। সরারাত খিদেয় ছটফট করেছি এবং শীতে কেঁপেছি।'

'কিছুই খাও নি সারারাত?'

'ভেলি গুড় দিয়ে একগাদা করে মুড়ি খেয়েছি।'

'ভেলি গুড়টা কী?'

'ভেলি গুড় হল আখের গুড়।'

'তেঁতুলিয়া জায়গাটা কেমন বাবা?'

'আহামরি কিছু না। সাধারণ। বেড়াতে যাবার মতো জায়গা না।'

'তোমরা গিয়েছিলে কেন?'

'আমাদের প্ল্যান ছিল টেকনাফ দেখব, তারপর তেঁতুলিয়া দেখব। বাংলাদেশের দুই মাথা দেখা হবে।'

'প্ল্যানটা কার? তোমার?'

'না, আমার না।'

'কার প্ল্যান বাবা?'

'মনে পড়ছে না, মা।'

জহির মুখের সামনে থেকে 'Omni' পত্রিকা সরিয়ে দিয়ে বললেন, 'তোর স্মৃতিশক্তির খব প্রশংসা শুনি। প্রমাণ পাচ্ছি না। তেঁতুলিয়ায় আমিও ছিলাম।'

'ঠিক ঠিক। তুইও ছিলি — তেঁতুলিয়া যাবার আইডিয়াটাও ছিল তোর। আসলেই আমার মনে ছিল না। সরি।'

'সরি বলছিস কেন? সরি বলার কী আছে?'

'অন্যদের কথা ভুলে গেলেও তোর কথা ভোলা ঠিক হয় নি।'

জহির শান্তগলায় বললেন — 'আমার কথা ভুললে ক্ষতি নেই কিন্তু তেঁতুলিয়ায় আমরা একটি অপূর্ব দৃশ্য দেখেছিলাম। সেটা কি তোর মনে আছে?'

'তেমন কিছু তো মনে পড়ছে না।'

'বন্ধুবান্ধবকে ভুলে যাওয়া অপরাধ না, কিন্তু দৃশ্যটির কথা ভুলে যাওয়া অপরাধ।'

নীতু বলল, 'কী দৃশ্য চাচা?'

'আমি বলব না। আমি চাই তোর বাবা দৃশ্যটা মনে করবে। এবং তারপর বলবে তেঁতুলিয়া ভ্রমণ ছিল তাঁর জীবনের স্মরণীয় ঘটনা।'

নীতু বলল, 'বাবা, তোমার কি কিছু মনে পড়ছে?'

'উঁহু।'

জহির বললেন, 'সেই সময় সঙ্গে কারা ছিল মনে আছে? আমার কথা বাদ দে। অন্যদের কথা কি তোর মনে আছে?'

'মনে আছে। শাহেদ ছিল। আবদুল গনি ছিল। শমসের ছিল। আরেকটা হিন্দু ছেলে ছিল। জোর করে তাকে একবার গরুর গোশত খাইয়ে দেয়া হল। চিৎকার করে কান্না। ওর নাম যেন কী?'

'সতীশ।'

'ইয়েস, সতীশ। এরা কে কোথায় জানিস?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'অবশ্যই জানি। আমার কাজই হল বন্ধুদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়ানো। তোর বাসায় এসে যেমন পড়ে থাকি। ওদের বাসায়ও তাই করি। আমি হলাম একজন মডার্ন জিপসী।'

'মডার্ন জিপসীরা কি বন্ধুদের বাসায় বাসায় ঘুরে বেড়ায়?'

'মডার্ন জিপসীরা জীবিকার জন্যে কোনো পরিশ্রম করে না। হেসেখেলে জীবন পার করে। বেড়াতে পছন্দ করে। তারা চায় ঝামেলামুক্ত জীবন।'

'তোর জীবন ঝামেলামুক্ত?'

'ইয়েস স্যার বিয়ে করে খানিকটা ঝামেলায় পড়েছিলাম। বেচারি তা বুঝতে পেরে চট করে মরে গেল। সেও মুক্তি পেল। আমিও পেলাম! মনজুর, আমার স্ত্রীর কথা তোর মনে আছে?'

মনজুর কিছুক্ষণ চুপ থেকে হালকা গলায় বললেন, 'আছে।'

'মহিলা কেমন ছিল নীতুকে একটু বল তো। ও আমার কাছে প্রায়ই জানতে চায়। আমি চুপ করে থাকি, কিছু বলি না। আচ্ছা থাক, তোর কাছে ঐ মহিলার গল্প আমরা পরে শুনব। রামসাগরে জোছনা দেখতে দেখতে শুনব। সেটাই শোভন হবে, কারণ মহিলার নামও জোছনা।'

নীতু বলল, 'চাচা, আপনি না বলেছিলেন উনার নাম মীরা!'

'তার অনেকগুলো নাম ছিল। জোছনা হচ্ছে সেই অনেক নামের এক নাম।'

'উনার আর কী নাম ছিল?'

'আমি ডাকতাম — রামী।'

'রামী আবার কেমন নাম?'

'মীরাকে উল্টো করে ডাকতাম রামী। আমার সঙ্গে খুব উল্টো ধরনের আচরণ করত তো, কাজেই আমি নামটা উল্টে দিলাম।'

'উনি রাগ করতেন না?'

'না। আমাদের চুক্তি ছিল — বিয়ের প্রথম দুবছর কেউ কারো উপর রাগ করব না। দুবছরের আগেই তো মামলা ডিসমিস। সে ফট করে মরে গেল। রাগারাগির আনন্দ আমরা কেউ পাই নি।'

'উনাকে জোছনা নামে কে ডাকত?'

'তোর বাবা ডাকত।'

নীতু বাবার দিকে তাকাল। সে বাবার মুখে কোনো ভাবান্তর দেখল না। রেবেকার মুখও ভাবলেশহীন। তিনি বললেন, 'ইসমাইল, গানের ক্যাসেটটা দিয়ে দাও। গান শুনতে শুনতে যাই।'

ইসমাইল যন্ত্রের মতো ক্যাসেট চালু করল। পোলকা মিউজিক হচ্ছে। ঝড়ের মতো বাজনা। খানিকক্ষণ শুনলেই নেশা ধরে যায়। নীতু লক্ষ করল, জহির চাচা গানের তালে তালে মাথা নাড়ছেন।

নীতু হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল—'তাজমহল! তাজমহল! বাবা দেখ বাংলাদেশী তাজমহল। জানালা দিয়ে তাকাও বাবা।'

মনজুর জানালা দিয়ে তাকালেন। কিছু দেখলেন না। নীতু বলল, 'ড্রাইভার চাচা, গাড়ি থামান। গাড়ি ব্যাক করতে হবে। বাবাকে তাজমহল দেখাব।'

ইসমাইল গাড়ির গতি কমিয়ে আনল। মনজুর জহিরকে বললেন, 'বাংলাদেশী তাজমহল ব্যাপারটা কি?'

'এখানে এক ভদ্রলোক একটা মসজিদ বানিয়েছেন অবিকল তাজমহলের ডিজাইনে। তাজের গম্বুজের মতো গম্বুজ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ইন্টারেস্টিং তো।'

জহির হাই তুলতে তুলতে বললেন, 'এখানকার তাজমহলের স্থানীয় নাম বদমহল। যিনি বানিয়েছেন তাঁর নাম বদরুল। বদরুলের বদ এবং তাজমহলের মহল নিয়ে 'বদমহল।'

মনজুর হাসছেন। নীতু হাসছে। ইসমাইলের হাসি আসছে। সে প্রাণপণ চেষ্টা করছে না হাসতে। সাহেবের সামনে হেসে ফেলা ঠিক হবে না। এত বড় অভদ্রতা সে করতে পারে না। শুধু রেবেকা চুপ করে আছেন। তাঁর চোখ বন্ধ। বদমহল দেখার প্রতি তিনি কোনো আগ্রহ দেখাচ্ছেন না।

স্মৃতিসৌধে তারা ঢুকতে পারল না। মালয়েশিয়ার চিফ অব স্টাফ এসেছেন। তিনি ফুলের মালা দেবেন। কঠিন নিরাপত্তা। সকাল নটা পর্যন্ত কাউকে ঢুকতে দেবে না।

নীতু বলল, 'কী মুশকিল! আমরা নাশতা খাব কোথায়?'

মনজুর বললেন, 'স্মৃতিসৌধে বসেই যে নাশতা খেতে হবে এমন তো কোনো নিয়ম নেই। পথে কোথাও খেয়ে নিলেই হবে।'

জহির বলল, 'পথে থামানোর দরকার নেই। আমরা বরং ঝড়ের গতিতে আরিচা চলে যাই। ফেরি পার হয়ে গেলে— বড় চিন্তা দূর হবে। আটটার আগে পৌঁছতে পারলে ভিড়ের চাপে পড়ব না।'

রেবেকা বললেন, 'আটটার আগে কি পৌঁছা যাবে?'

'ইসমাইলের উপর নির্ভর করছে। ইসমাইল যদি গাড়ির স্পিড একটু বাড়িয়ে দেয় তাহলে পারা যাবে।'

'স্পিড বাড়ানোর দরকার নেই। অ্যাকসিডেন্ট হবে।'

'অ্যাকসিডেন্ট হবে না। আমি তের চুমুক কফি খেয়েছি।'

নীতু বলল, 'আমি একটু নামব। মালয়েশিয়ার চিফ অব স্টাফকে দেখব।'

জহির বলল, 'দেখার কিছু নেই। বান্দরের মতো চেহারা।'

'কে বলল বাঁদরের মতো চেহারা?'

'আমার অনুমান। পৃথিবীর সবদেশে সবচে' খারাপ চেহারার মানুষ চিফ অব স্টাফ হয়।'

নীতু নামল গাড়ি থেকে। জহিরও নামলেন নীতুর সঙ্গে। অনেক চেষ্টা করেও মালয়েশিয়ার চিফ অব স্টাফকে দেখা গেল না। গাড়িতে উঠেই জহির বললেন, 'ইসমাইল মিয়া! একটু টেনে গাড়ি চালাতে পারবে?'

ইসমাইল বলল, 'পারব স্যার।'

'তাহলে একটু টেনে চালান।'

'জ্বি আচ্ছা, স্যার।'

ইসমাইলকে টেনে গাড়ি চালাতে বলা হলেও সে গাড়ির স্পিডোমিটার পঞ্চাশ কিলোমিটারে ধরে রাখল। সে গাড়ি চালায় বড় সাহেবের হুকুমে। বড় সাহেব গাড়িতে ঝাঁকুনি পছন্দ করেন না। দ্রুত গাড়ি চালালে আচমকা থামতে হবে। ঝাঁকুনি লাগবে। বড় সাহেব হুকুম দিলে ভিন্ন কথা। যে হুকুম দিচ্ছে বড় সাহেব তাকে পছন্দ করেন না। মুখে না বললেও এসব জিনিস বোঝা যায়।

মনজুর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমরা যখন বেড়াতে আস তখন কি এমন চুপচাপ বসে থাক? কোনো কথাবার্তা নেই— মূর্তির মতো বসে আছ।'

রেবেকা জবাব দিলেন না। নীতু বলল, 'মা এরকম চুপচাপ থাকে বাবা। কোনো কথা নেই। শুধু আমি আর জহির চাচা বকবক করি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কই, জহিরও তো চুপচাপ।'

জহির ম্যাগাজিন থেকে চোখ তুলে বললেন, 'আরিচা ঘাটে পৌঁছার পর ফেরিতে উঠব— তারপর বকবক শুরু করব। এখন আমি এক ধরনের টেনশানে আছি— ফেরিতে দেরি হবে কি হবে না— এই টেনশান। দেরি হলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

'কী সর্বনাশ?'

'সমস্ত প্রোগ্রাম বানচাল হয়ে যাবে।'

'কী রকম?'

'জোছনা দেখায় গণ্ডগোল হয়ে যাবে। আমার মনে হচ্ছে ফেরি মিস্ করব।'

নীতু বলল, 'চাচা এটা কি আপনি সিক্সথ সেন্স থেকে বলছেন?'

'না। বাস্তব জ্ঞান-বুদ্ধি থেকে বলছি। আমি বসে বসে গুনছি মোট কটা গাড়ি আমাদের ওভারটেক করল। ঢাকা থেকে রওনা হবার পর মোট একচল্লিশটা গাড়ি আমাদের ওভারটেক করেছে।'

মনজুর বিস্মিত হয়ে বললেন, 'তুই কি সত্যি সত্যি গাড়ি গুনছিস?'

'হ্যাঁ গুনছি। অকর্মা লোকজন এই সব গোনার কাজ খুব ভালো পারে।'

মনজুর বললেন, 'Quite interesting.'

নীতু বলল, 'জহির চাচার আরো অনেক ইন্টারেস্টিং ব্যাপার আছে, বাবা। উনার সিক্সথ সেন্স খুব প্রবল। অনেক কিছু আগেভাগে বলে দিতে পারেন।'

'সত্যি নাকি জহির?'

'না। সিক্সথ সেন্স-টেন্স কিছু না — চিন্তাভাবনা করেই যা বলার বলি। লোকে ভাবে সিক্সথ সেন্স। এখন আমি যদি বলি আরিচা ঘাটে দুঘণ্টা দেরি হবে এবং সত্যি সত্যি যদি তাই হয়, তাহলে তোরা ভাববি আমার সিক্সথ সেন্স। আসলে তা না। আমি বসে বসে গাড়ি গুনেছি।'

মনজুর বললেন, 'আচ্ছা এখন বল, কটা গাড়ি ওভারটেক করেছে? শেষবার বললি একচল্লিশটি— তারপর থেকে আমিও গুনছি। বল দেখি মিলিয়ে দেখি।

'একচল্লিশের পরে আরো সাতটা গাড়ি ওভারটেক করেছে। একটা ট্রাক। তিনটা বাস। আর তিনটা প্রাইভেট কার। হয়েছে?'

'হ্যাঁ। হয়েছে।'

'অবাক হয়েছিস?'

নীতু খুশি-খুশি গলায় বলল, 'জহির চাচার অদ্ভুত সব ব্যাপার আছে। তিনি মানুষকে দারুণ অবাক করতে পারেন।'

'তাই তো দেখছি।'

'যেতে যেতে আরো দেখবে। আচ্ছা বাবা, ছাত্র জীবনেও কি তিনি সবাইকে অবাক করতেন?'

'মনে পড়ছে না, মা।'

'তেঁতুলিয়ায় অদ্ভুত দৃশ্য কী দেখেছিলে সেটা কি মনে পড়েছে?'

'না।'

'মনে করার চেষ্টা করছ?'

'এতক্ষণ করছিলাম না। এখন করব। তবে মনে পড়বে বলে মনে হয় না।'

জহির বললেন, 'মনে পড়বে। আমার সিক্সথ সেন্স বলছে, আজ দিনের মধ্যেই মনে পড়বে। শুধু তেঁতুলিয়ার অদ্ভুত দৃশ্য না। আরো অনেক কিছুই মনে পড়বে।'

মনজুর কৌতূহলী চোখে জহিরের দিকে তাকালেন। জহির চাপা হাসি হাসতে হাসতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বললেন, 'তুই এখন আমার একটা অনুরোধ রাখ।'

'কি অনুরোধ?'

'এখন তুই দয়া করে তোর ড্রাইভারকে একটু স্পিডে চালাতে বল। কেউ ওভারটেক করলে আমার ভয়ঙ্কর রাগ লাগে।'

নীতু বলল, 'আমারও লাগে। আমার মনে হয় আমাকে রেসে হারিয়ে দিল।'

মনজুর বললেন, 'স্পিড দাও ইসমাইল।'

ইসমাইল গাড়ির গতি দেখতে দেখতে আশিতে নিয়ে এল। খোলা জানালা দিয়ে হুঁ-হুঁ করে হাওয়া আসছে। জহির বললেন, 'এখন গাড়িতে চড়ে মজা পাচ্ছি।'

নীতু বলল, 'অ্যাকসিডেন্ট হবে না তো, চাচা?'

জহির বললেন, 'না মা, অ্যাকসিডেন্ট হবে না।'

মনজুর বললেন, অ্যাকসিডেন্ট যে হবে না এটাও কি তুই বিচার-বিবেচনা থেকে বলছিস, না সিক্সথ সেন্স থেকে বলছিস?'

'বিচার-বিবেচনা করে বলছি। তোর এটা নতুন মাইক্রোবাস। কাজেই সিস্টেম ফেইলিওরের সম্ভাবনা নেই বললেই হয়। ইসমাইল মিয়া পাকা ড্রাইভার। আরিচার রাস্তায় সে দীর্ঘদিন বাস চালিয়েছে। সে চালাবে খুব সাবধানে। এমনিতেই সে সাবধানী, আজ আরো বেশি সাবধানে চালাবে। কারণ গাড়িতে তুই আছিস।'

'বেশি সাবধানে অনেক সময় ভুল হয়।'

'দুর্বল নার্ভের ক্ষেত্রে ভুল হয়। আমি ভুল করব কিন্তু ইসমাইল মিয়া কিংবা তুই করবি না।'

'বলতে চাচ্ছিস আমার নার্ভ দুর্বল, না?'

'উঁহু, তোর নার্ভ ইস্পাতের মতো।'

গাড়ি উড়ে চলেছে। জহির চুরুট ধরালেন। খুশি-খুশি গলায় ডাকলেন, 'ইসমাইল মিয়া!'

'কি স্যার।'

'একশ কিলোমিটার স্পিডে কখনো গাড়ি চালিয়েছেন?'

'চালিয়েছি স্যার।'

'আপনার মেক্সিমাম স্পিডের রেকর্ড কত?'

'একশ কুড়ি।'

'এখানে সেই রেকর্ড ভাঙতে পারবেন?'

'পারব।'

'দেখি ভাঙুন তো। আপনার বড় সাহেব কিছু বলবেন না।'

ইসমাইল মিয়া গাড়ির স্পিড বাড়াল না; কমিয়ে দিল।

তাকে বাধ্য হয়েই কমাতে হল। দূর থেকেই দেখা যাচ্ছে— সামনে বড় ধরনের কোনো সমস্যা হয়েছে। লাইন করে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। মনে হচ্ছে রোড ব্লকেজ।

ইসমাইল একটা ট্রাকের পেছনে তার গাড়ি থামাল।

নীতু বলল, 'কী হয়েছে?'

ইসমাইল নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল, 'অ্যাকসিডেন্ট। মানুষ মরেছে।'

'না দেখেই কী করে বললেন, মানুষ মারা গেছে।'

'মানুষ মরলে বোঝা যায় আফা।'

ইসমাইল গাড়ির জানালার কাচ নামিয়ে গলা বের করল। সামনের ট্রাকের পেছনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বসে থাকা হেল্পার দুজনকে জিজ্ঞেস করল, 'কী হইছে?'

হেল্পাররা জবাব দিল না। একজন পিচ করে থুতু ফেলল।

ইসমাইল মাথা ভেতরে টেনে নিয়ে বলল, 'অবস্থা খারাপ।'

জহির হাতের ম্যাগাজিন নামিয়ে রেখে গম্ভীর গলায় বললেন, 'আমারও মনে হচ্ছে অবস্থা খারাপ। আমাদের ফিরে যাওয়া ভালো। অপেক্ষা করলে আটকা পড়ে যাবার সম্ভাবনা।'

মনজুর সাহেব বললেন, 'তোর সিক্সথ সেন্স বলছে, না অনুমান করছিস?'

'দুটাই।'

রেবেকা বললেন, 'খোঁজ নিলেই হয়।'

জহির উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, 'আমি খোঁজ নিতে যাচ্ছি।'

নীতু বলল, 'চাচা আমি আসি?'

'না, তুমি বসে থাক।'

জহির গাড়ি থেকে নামতে পারলেন না। সামনের ট্রাকটা সিগন্যাল দিচ্ছে— পেছাবে। মাইক্রোবাস ব্যাক করতে হল। ট্রাক অতি দ্রুত ঘুরে গেল। ঝড়ের মতো রওনা হল ঢাকার দিকে। জহির বললেন, 'অবস্থা বেশ খারাপ বলেই মনে হচ্ছে। ট্রাকের পালিয়ে যাবার ঘটনা সচরাচর ঘটে না।' জহির গাড়ি থেকে নামলেন।

এ দেশের মানুষ চুপচাপ থাকে না। তারা সমস্যার কথা বলতে ভালবাসে। আজ অবস্থা ভিন্ন। অনেকগুলো গাড়ি লাইন করে দাঁড়িয়ে আছে। যাত্রীরা কেউ নামে নি। জহির একজনকে পেল যে বিরক্ত মুখে সিগারেট খাচ্ছে। তাকে বললেন, 'কি ব্যাপার?'

সে কঠিন মুখে বলল, 'জানি না।'

জহির সামনের দিকে এগুচ্ছেন। ঘটনা যেখানে ঘটেছে সেখানে যাওয়াই ভালো।

নীতু জানালা দিয়ে মাথা বের করে আছে। তার খুব ইচ্ছা করছে জহির চাচার সঙ্গে যেতে। ব্যাপারটা কি তাহলে দেখে আসা যায়। সে মেয়ে হয়ে জন্মানোয় যেতে পারছে না। যদি ছেলে হয়ে জন্মাত তাহলে নিশ্চয়ই যেতে পারত। এই পৃথিবীতে সবচে' সুখী বোধহয় ছেলেরা।

নীতু বলল, 'বাবা তোমার কি নিচে নামতে ইচ্ছা করছে না?'

মনজুর বললেন, 'না।'

রেবেকা বিরক্ত গলায় বললেন, 'শুধু শুধু কথা বলছিস কেন নীতু। চুপ করে বসে থাক।'

'আমরা বেড়াতে বের হয়েছি মা। চুপ করে বসে থাকার জন্যে বেড়াতে বের হই নি। বাড়িতে আমরা চুপ করে বসে থাকি।'

রেবেকা বললেন, 'আমার মাথা ধরেছে। বকবকানি শুনতে ভালো লাগছে না।'

নীতু বলল, 'তুমি যদি মূর্তির মতো বসে থাক তাহলে মাথা আরো ধরবে। কলেজে মাঝে মাঝে আমার প্রচণ্ড মাথা ধরে। তখন আমি হাসির গল্প করি। সবাইকে হাসাই; নিজেও হাসি। তখন মাথা ধরাটা একটু কমে।'

মনজুর বললেন, 'তোর কি প্রায়ই মাথা ধরে?'

'প্রায়ই না। মাঝে মাঝে। ধর মাসে একবার কি দুবার।'

'ডাক্তারের সঙ্গে কোনো কথা বলেছিস?'

'ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলব কেন? আমার অসুখ তো আমি নিজেই সারাতে পারি। মা আমি কি তোমার মাথা ধরা সারিয়ে দেব?'

রেবেকা কিছুই বললেন না। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলেন। নীতু বলল, এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গল্পটা শোন মা— ব্লাড ব্যাংকে যেমন রক্ত পাওয়া যায় তেমনি ব্রেইন ব্যাংকে পাওয়া যায় ব্রেইন। যাদের ব্রেইন নেই তারা ব্রেইন ব্যাংক থেকে ব্রেইন কিনতে পারে। একদিন এক লোক ব্রেইন কিনতে গিয়েছে। দাম জিজ্ঞেস করেছে। ব্রেইন ব্যাংকের ডিরেক্টর বলল, আমাদের অনেক ধরনের ব্রেইন আছে— আপনি কোনটা নেবেন? সবচে সস্তা হল লেখকদের ব্রেইন কারণ তাঁরা এটা খুব বেশি ব্যবহার করেন, এরচে' একটু দাম ব্যবসায়ীদের ব্রেইন; তাঁরাও বেশ ব্যবহার করেন। সবচে' দামি হল মিলিটারিদের ব্রেইন। কারণ তারা কখনো ব্যবহার করেন না। ওদের ব্রেইন বলতে গেলে নতুন থাকে।'

গল্প শুনে মনজুর হাসছেন। শব্দ করে হাসছেন। রেবেকার কোনো ভাবান্তর নেই। তিনি আগের মতোই চুপ করে বসে আছেন। মনজুর বললেন, 'তোর গল্পটা ইন্টারেস্টিং। তবে ভাব দেখে মনে হচ্ছে, তোর মার মাথা ব্যথা গল্প শুনে আরো বেড়ে গেছে।'

৩

ঘটনা ভয়াবহ।

কুড়ি মিনিট আগে একটা প্রাইভেট গাড়ি— পাজেরো জিপ এ্যাকসিডেন্ট করেছে। নয়–দশ বছরের এক বোন তার ছোট ভাইকে নিয়ে রাস্তা পার হচ্ছিল। তাদের চাপা দিয়ে পালিয়ে গেছে। ভাইটা সঙ্গে সঙ্গে মারা গেছে। বোন আহত হয়ে পড়ে ছিল, তাদের পাশ দিয়ে অনেক গাড়ি গিয়েছে, কেউ আহত মেয়েটিকে হাসপাতালে নেয়ার চেষ্টা করে নি। যে অল্প কজন গ্রামবাসী ছিল তারা প্রাণপণ চেষ্টা করেছে কোনো একটা গাড়ি থামাতে। কেউ থামে নি। তাদের এত সময় নেই।

ক্রমে ক্রমে লোক জড়ো হয়েছে। তারা রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে। জায়গায় জায়গায় রাস্তার উপর বসে জটলা পাকাচ্ছে।

জহির ঘটনার কেন্দ্রবিন্দুতে উপস্থিত হলেন এবং শিউরে উঠলেন। ছেলেটির থেঁতলানো শরীর রাস্তায় পড়ে আছে। কালো পিচের উপর লাল রক্ত— খানিকটা কালচে হয়ে এসেছে। এই দৃশ্য একবারের বেশি দ্বিতীয়বার দেখা যায় না। ভাই এবং বোনটির শবদেহ রাস্তায় আড়াআড়ি করে রাখা হয়েছে। রোড ব্লকের জন্যে গ্রামবাসী বোধহয় এই ছোট্ট শরীর দুটি ব্যবহার করছে।

খুব বেশি মানুষ এখনো জড়ো হয় নি। কুড়ি–পঁচিশজনের একটা দল। তারা রাস্তার পাশে গোল হয়ে বসে আছে। এদের মধ্যে কোনো মহিলা নেই। বাচ্চা–কাচ্চাও নেই। অ্যাকসিডেন্টের খবর এখনো ছড়িয়ে পড়ে নি। নিহতদের আত্মীয়স্বজন কেউ নেই। থাকলে চিৎকার করে কাঁদত। কেউ কাঁদছে না। মানুষ দলবদ্ধ হলেই আপনাআপনি দলের একজন নেতা হয়ে যায়। কুড়ি–পঁচিশজনের দলটির যে নেতা তার বয়স চল্লিশের মতো। পরনে লুঙ্গি এবং সবুজ কালো শার্ট। চোখ–মুখ কঠিন।

জহির তাঁর কাছে এগিয়ে গেলেন। বিনয়ী গলায় বললেন 'কী হয়েছে আমাকে একটু বলবেন?'

'কী হইছে আপনে শুনছেন। আবারো শুনতে চান ক্যান?'

'আপনারা কী চাচ্ছেন তাই জানতে চাচ্ছি।'

'আমরা কিছু চাই না।'

'রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছেন কেন?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'রাস্তা বন্ধ আপনেরে কে বলছে? চইল্যা যান। মরা দুই বাচ্চার উপর দিয়া গাড়ি চালাইয়া যান গিয়া। আমরা কিছু বলব না।'

'আপনারা কি পুলিশে খবর দিয়েছেন?'

'কেউরে খবর দেই নাই।'

'ডেড বডি দুটা এভাবে ফেলে না রেখে কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখলে কেমন হয়?'

'ক্যান, দেখতে ভালো লাগে না?'

লোকটি কঠিন দৃষ্টিতে তাকাল। তীব্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। জহির থমকে গেলেন। লোকটির চোখের দিকে তাকিয়েই বোঝা যাচ্ছে— অবস্থা অনেক জটিল হবে। অতি দ্রুত সরে পড়তে হবে।

গ্রামবাসী আসতে শুরু করেছে। তারা দলে দলে আসবে। আশপাশের স্কুল-কলেজের ছাত্ররা এদের সঙ্গে যুক্ত হবে। এদের সঙ্গে মিশবে কিছু সুযোগসন্ধানী দুষ্ট মানুষ, যাদের লক্ষ্য থাকবে লুটপাটের দিকে, ভাঙচুরের দিকে। পুলিশ আসবে। অল্পসংখ্যক আসবে। অবস্থা দেখে ভড়কে যাবে। ফেরত চলে যাবে। পুলিশ সব সময় যা করে তা হচ্ছে— প্রথম ঝড় বয়ে যেতে দেয়। ঝড়ের পর-পর এক ধরনের শান্ত ভাব আসে। পুলিশ আসে তখন। ঝড়ের প্রথম ধাক্কা তারা গায়ে নিতে চায় না। তার প্রয়োজন নেই।

জহির মাইক্রোবাসের দিকে ফিরছেন। একটা পাজেরো জিপ থেকে পঁচিশ-ত্রিশ বছরের যুবকের মাথা বের হয়ে এল। চোখে সানগ্লাস। সে বিরক্ত চোখে বলল, 'ব্রাদার, কি দেখে এলেন? নিগোসিয়েশন হচ্ছে?'

তিনি বললেন, 'হচ্ছে।'

'গুড। কী যে দেশের অবস্থা, সামান্য ব্যাপারেই রোড ব্লক।'

জহিরের ইচ্ছা হল, বলেন, 'ব্যাপার সামান্য না। দুটা ছোট ছোট বাচ্চা মারা গেছে।' তিনি কিছু বললেন না। কথা বলে নষ্ট করার সময় নেই। ঢাকা ফিরে যেতে হবে। প্রবল নিম্নচাপ ঝড়ে রূপান্তরিত হবার আগেই ফিরে যেতে হবে। সময় নেই।

জহির গাড়ি গুনতে গুনতে এগুচ্ছেন। তাঁদের আগে ষোলটি গাড়ি। পেছনে দশটি। গাড়ির সঙ্গে গাড়ি লেগে আছে। গাড়ি ঘুরানো সম্ভব নয়। প্রায় নটা বাজতে চলল। কড়া রোদ উঠেছে। আকাশ পরিষ্কার। আজ সুন্দর জোছনা হবে। জহির গাড়িতে উঠে এলেন। রেবেকা বললেন, 'সার্ভে রিপোর্ট কি?'

'রিপোর্ট ভালো না। বেশ কিছুক্ষণ আটকা থাকতে হবে।'

'বেশ কিছুক্ষণ মানে কতক্ষণ?'

'বলতে পারছি না।'

'আমাদের তাহলে করণীয় কি?'

'আমাদের করণীয় হচ্ছে ঢাকায় ফিরে যাওয়া। আমি সেই চেষ্টা করছি। ইতিমধ্যে ব্রেকফাস্ট সেরে ফেলা যাক।'

নীতু হাসিমুখে বলল, 'আপনার জন্যে একটা দুঃসংবাদ আছে চাচা।'

'কি দুঃসংবাদ মা?'

'ব্রেকফাস্টের জন্যে দুটা প্যাকেট আলাদা করা হয়েছিল। দুটার মধ্যে একটা এসেছে। অন্যটা আসে নি।'

'একটাতেই কাজ সারতে হবে।'

'সেই একটাতে আছে শুধু থালা-বাসন, চামচ, গ্লাস, ন্যাপকিন। আপনার খুব খিদে লাগলে— কাঁটাচামচ দিয়ে ন্যাপকিন ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে হবে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নীতু খিলখিল করে হাসছে। মনে হচ্ছে এমন আনন্দময় ঘটনা তার জীবনে আর ঘটে নি। জহির বললেন, 'খাওয়ার পানি আছে তো?'

'আছে।'

'কতটা আছে?'

'প্রচুর আছে। ইচ্ছা করলে আপনি গোসলও করতে পারেন।'

নীতু আবার হাসছে। জহির বললেন, 'এখানে অনিশ্চিত অবস্থায় বসে থাকার চেয়ে ঢাকায় ফিরে যাওয়াই কি ভালো না? মনজুর, তুই কী বলিস?'

'আমি কিছুই বলছি না। বেড়াতে যাবার প্ল্যান তোর। যা করার তুই করবি। তবে তোকে দেখে মনে হচ্ছে তুই ঘাবড়ে গেছিস।'

'ঘাবড়ে যাবার মতোই ব্যাপার ঘটেছে। দুটা বাচ্চা মারা গেছে অ্যাকসিডেন্টে। মনে হচ্ছে ঝামেলা হবে। সারাদিনই হয়তো রাস্তা বন্ধ থাকবে।'

'সারাদিন রাস্তা বন্ধ থাকবে না। কয়েক ঘণ্টার ব্যাপার। ঢাকা–আরিচা সড়ক খুব গুরুত্বপূর্ণ সড়ক। সারাদিন এটা বন্ধ থাকবে না।'

'আমার সিক্সথ সেন্স অন্য কথা বলছে।'

'বলুক।'

জহির গাড়ি থেকে নামলেন। নীতু বলল, 'মা, আমি চাচার সঙ্গে যাই? বসে থাকতে ভালো লাগছে না।

'রেবেকা বললেন, 'যা।'

নীতু গাড়ি থেকে নেমে গেল। দুটি বাচ্চা মারা গেছে এই খবরে সে মোটেই বিচলিত বোধ করছে না। হয়তো ভালো করে শুনেই নি।

নীতু গাড়ি থেকে নেমেই বলল, 'চাচা, আমার কাছে চুইংগাম আছে। খাবেন?'

'না।'

'খুব সুন্দর জায়গায় আমাদের গাড়ি থেমেছে। দেখুন রাস্তার দুধারে কী সুন্দর সুন্দর গাছ। এই গাছগুলোর নাম জানেন?'

'জানি। জারুল গাছ।'

'জারুল গাছে ফুল হয়?'

'হয়, বেগুনি রঙের ফুল।'

'চাচা, আপনাকে এমন চিন্তিত লাগছে কেন?'

'বুঝতে পারছি না, কেন?'

'চলুন আমরা অ্যাকসিডেন্টের জায়গাটা দেখে আসি।'

'না।'

'না কেন?'

'ডেড বডি দুটা পড়ে আছে। দেখলে তোর ভালো লাগবে না।'

জহির চুরুট ধরালেন। এখন কান্নার শব্দ শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। বাচ্চা দুটির বাবামা হয়তো চলে এসেছে।

'চাচা!'

'কি মা?'

'কে কাঁদছে চাচা?'

'জানি না তো মা। বাচ্চা দুটোর আত্মীয়স্বজন হবে।'

'একটা মেয়ে কাঁদছে।'

'হয়তো ওদের মা।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ওরা কি ভাইবোন?'

'হুঁ।'

'ওদের নাম কি?'

'নাম জানি না, মা। কাউকে জিজ্ঞেস করি নি।'

'আমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকি, আপনি ওদের নাম জেনে আসুন।'

'নাম দিয়ে কী হবে?'

'আমার নাম জানতে ইচ্ছা করছে।'

নীতু দাঁড়িয়ে রইল। জহির এগুচ্ছেন। তাঁর চুরুট নিভে গেছে। ঘোর পাওয়া মানুষের মতোই তিনি নেভা চুরুটে টান দিচ্ছেন। পাজেরো জিপের কাছে এসে তাঁকে থমকে দাঁড়াতে হল। জিপের ভেতর ক্যাসেট বাজছে। রবীন্দ্রসংগীত হচ্ছে।

সকরুণ বেণু বাজায়ে কে যায় বিদেশি নায়ে,
তাহারি রাগিণী লাগিল গায়ে।
সে সুর বাহিয়া ভেসে আসে কার
সুদূর বিরহ বিধুর হিয়ার
অজানা বেদনা, সাগরবেলার
অধীর বায়ে, বনের ছায়ে।

সুন্দর লাগছে গান শুনতে। পাজেরোর পেছনের সিটে বাইশ-তেইশ বছরের দুজন তরুণী। চালকের সিটে যে যুবক বসে আছে তার পাশেও অল্পবয়সী একটি মেয়ে। সম্ভবত যুবকটির স্ত্রী। এরা সবাই পেপারকাপে চা খাচ্ছে। জহিরকে দেখে যুবক মাথা বের করে বলল, 'কিছু হল ব্রাদার?'

জহির বলল, 'না।'

যুবকটি নিচু গলায় মেয়েগুলোকে কিছু বলল। সবাই একসঙ্গে হেসে উঠল। নিশ্চয়ই অপমানসূচক কিছু কথা। এই বয়সের যুবক-যুবতীরা বয়স্কদের নিয়ে রসিকতা করতে পছন্দ করে।

জহির বলল, 'আপনি কি আমাকে নিয়ে কিছু বললেন?'

যুবক তৎক্ষণাৎ বলল, 'জ্বি না স্যার। আপনি যান— নিগোসিয়েশন করুন। আপনি ছাড়া নিগোসিয়েশন হবে না।'

জহির এগিয়ে যাচ্ছে। যুবকটি মনে হয় আবারো কোনো রসিকতা করছে। সবাই হাসছে। তাদের দেড়শ গজ সামনে দুটি মৃতদেহ। এতে তাদের অসুবিধা হচ্ছে না। সম্ভবত এরা মৃতদেহ দুটি দেখে নি। শুধু শুনেছে। শুনে বিরক্ত বোধ করছে— দুটি প্রাণহীন দেহ তাদের আটকে ফেলেছে। তারা নড়তে পারছে না। এই অবস্থা তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

জহির আবার ঘটনার কেন্দ্রবিন্দুতে হাজির হল। Eye of the cyclone. প্রচুর লোক এর মধ্যে জড়ো হয়ে গেছে। বাচ্চা দুটির বাবামা আছেন। বাবা মৃত মেয়ের মাথা কোলে নিয়ে বসে আছেন। মাছি আসছে। তিনি মাছি তাড়াতে ব্যস্ত। মেয়ের গায়ে তিনি মাছি বসতে দেবেন না। ছেলের দেহের ধ্বংসাবশেষের দিকে তিনি ফিরেও তাকাচ্ছেন না। সম্ভবত এই দলামচা মাংসপিণ্ডকে তিনি নিজের সন্তান বলে স্বীকার করেন না। বাচ্চা দুটির মার বয়স অল্প। গ্রামের মেয়েরা অল্পদিনেই বুড়িয়ে যায়। এই মেয়ে তার শরীরে তারুণ্য ধরে রেখেছে। মেয়েটির বর্তমানে কোনো বোধশক্তি আছে বলে মনে হচ্ছে না। সে কিছুক্ষণ পর পর বলছে, গফুর, গফুর। ছেলেটির নাম গফুর। মেয়েটির কী নাম? জোছনা না তো?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জহিরের শরীর ঝিনঝিন করে উঠল। তাঁর মন বলছে— এই মেয়েটির নাম জোছনা।

জহির মায়ের গায়ে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা এক মহিলাকে জিজ্ঞেস করলেন— যে মেয়েটি মারা গেছে তার নাম কি?

মহিলা কিছুক্ষণ সন্দেহজনক চোখে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'জোছনা। এই মাইয়ার নাম জোছনা।'

'ইনিই কি জোছনার মা?'

'না। জোছনার মা মারা গেছে। এ সৎমা।'

'ও আচ্ছা।'

'আপনে কেডা?'

'আমি কেউ না। আমি দিনাজপুরের একজন যাত্রী।'

জড়ো-হওয়া লোকজনদের মধ্যে এক ধরনের চাঞ্চল্য দেখা গেল। একজন কে যেন বলল, 'ওসি সাহেব আসতেছেন। ওসি সাহেব।'

জহির দেখলেন, 'মোটর সাইকেলে চড়ে দুজন আসছেন। দুজনই সাদা পোশাকে। পুলিশের লোক বলে মনে হচ্ছে না। তবে পেছনের জনের হাতে ওয়াকিটকি। পরিশ্রম এবং উত্তেজনায় ওসি সাহেব ক্লান্ত।

তিনি মোটর সাইকেল থেকে নামতে নামতে বললেন, 'কী ব্যাপার? এখানে ইয়াছিন মোল্লা কে? ইয়াছিন মোল্লা আছে?'

রোগা একজন মানুষ এগিয়ে এল।

'স্লামালিকুম ওসি সাহেব!'

'ওয়ালাইকুম সালাম। খবর ভালো ইয়াছিন?'

'আমি ইয়াছিন মোল্লা না স্যার। আমি তার বড় ভাই।'

'নাম কি আপনার?'

'ছগির মোল্লা।'

'আপনি করেন কী?'

'জমি জিরাত আছে। বাজারে একখান ঘর আছে।'

'দেখি, আসেন দেখি আমার সঙ্গে।'

ছগির মোল্লা এগিয়ে যাচ্ছে। ওসি সাহেব তাকে আড়ালে নিয়ে যাচ্ছেন। ইয়াছিন মোল্লা এ অঞ্চলের একজন প্রভাবশালী মানুষ। ওসি সাহেব তাঁর সঙ্গে কোনো একটা আপোষে আসতে চাচ্ছেন। আপাতত ছগিরকে পাওয়া গেল। তাকে পাঠিয়ে ইয়াছিনকে আনা হবে।

জহিরের মনে হচ্ছে— ওসি সাহেব মানুষটা বুদ্ধিমান। পুলিশের লাইনের ঘাঘু লোক। সে সমস্যা মিটিয়ে ফেলবে।

ওসি সাহেব ছগিরকে নিয়ে এগুচ্ছেন। তাঁর পেছনে জনতার একটা ক্ষুদ্র অংশ। ওসি সাহেবকে হ্যামিলনের বংশিবাদকের মতো দেখাচ্ছে। তবে বাঁশির বদলে তাঁর হাতে 'ওয়াকিটকি'। ওসি সাহেব আচমকা থমকে দাঁড়ালেন। দলটাও দাঁড়িয়ে পড়ল।

'এই যে আপনার কী চান?'

'কেউ শব্দ করল না।'

'আমি ছগির মোল্লাকে গোপনে দু একটা কথা বলব। কী বললাম সেটা ছগিরের কাছে শুনে নেবেন। এই দেশে গোপন কথা সবাই জানে— প্রকাশ্য কথা কেউ জানে না। আপনারা এখানে দাঁড়ান। আর এক পা আসবেন না।'

সবাই দাঁড়িয়ে পড়ল। ওসি সাহেব ছগিরকে নিয়ে এগুচ্ছেন? ছগিরের ভয় ভয়

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাগছে।

'ছগির মোল্লা।'

'জ্বি স্যার।'

'ইয়াছিন মোল্লা কোথায়?'

'বাসায় ঘুমায়ে আছে। জ্বর হইছে।'

'জ্বর হোক আর কলেরা হোক, তাকে এক্ষুনি নিয়ে আসতে হবে। পারবেন না?'

'পারব স্যার।'

'এখানে দলের মাথাটা কে? গাড়ি আটকায়েছে কে?'

'সবাই মিল্যা আটকাইছে।'

'সবাই মিলেই আটকায় কিন্তু মাথা থাকে একটা। সেই মাথাটা কে?'

'জানি না স্যার।'

'না জানলে কী আর করা। আপনাকে যা করতে বলেছি করেন। ডবল মার্চ দৌড়ে যান।'

৪

রাতে ভালো ঘুম হয় নি বলেই বোধহয় মনজুর সাহেবের ঘুম ঘুম পাচ্ছে। তিনি পা মেলে দিয়েছেন। তাঁর চোখ বন্ধ। সিগারেটের তৃষ্ণা হচ্ছে। তিনি সিগারেট ছেড়েছেন অনেকদিন হল। তবু মাঝে মাঝে নেশা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। কিছুতেই তাকে পোষ মানানো যায় না। তিনি ইসমাইলকে সিগারেটের খোঁজে পাঠিয়েছেন। আশপাশে দোকানপাট নিশ্চয়ই আছে। রেবেকা বললেন, 'এভাবে শুয়ে আছ কেন? শুতে ইচ্ছে করলে মাথার নিচে বালিশ দিয়ে ভালোমতো শোও।'

'দাও, বালিশ দাও।'

রেবেকা বালিশ দিতে দিতে বললেন, 'তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে?'

'হুঁ।'

'আমাদের সঙ্গে বেড়াতে এসে তুমি দেখি ভালো ঝামেলায় পড়েছ।'

'ঝামেলা আর কি! ঝামেলা কেটে যাবে।'

'কেটে যাবে বলছ কেন?'

'সব ঝামেলাই কাটে। এই জন্যে বলছি ঝামেলা কেটে যাবে।'

'কতক্ষণে কাটবে সেটাই হচ্ছে কথা।'

মনজুর হাই তুলতে তুলতে বললেন, 'বেশিক্ষণ লাগবে না। পুলিশ এসে গেছে। ওরা সামাল দেবে।'

'কই, আমি তো পুলিশ দেখি নি।'

'সাদা পোশাকে এসেছে বলে বুঝতে পার নি। সাদা পোশাক মানে আলাপ–আলোচনা করে সমস্যা মেটাতে এসেছে। কাজেই আমার ধারণা, আধ ঘণ্টার মধ্যে গ্রিন সিগন্যাল পাবে।'

'তোমার কি খিদে পেয়েছে?'

'হুঁ।'

'এক প্যাকেট চকলেট আছে। চকলেট খাবে?'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'না। চকলেট খাবার বয়স নেই।'

'বেড়াতে বের হবার সময় বয়স ঘরে ফেলে রেখে বের হতে হয়।'

'কার কথা, জহিরের?'

'হ্যাঁ।'

'জহির মনে হয় মজার মজার কথা বলে।'

'সেটা নিশ্চয়ই কোনো দোষ না।'

'দোষের কথা বলছি না। আমি এপ্রিসিয়েট করছি।'

'তোমার কোনটা এপ্রিসিয়েশন আর কোনটা না, তা বোঝা কষ্ট।'

রেবেকা তাঁর হ্যান্ডব্যাগ খুলে রাংতামোড়া চকলেটের একটা সুদৃশ্য প্যাকেট বের করলেন। চকলেট ভাঙতে ভাঙতে বললেন, 'খাও, তোমার ভালো লাগবে।'

মনজুর হাত বাড়িয়ে চকলেট নিলেন, মুখে দিলেন না। রেবেকা বললেন, 'এই কিছুক্ষণের মধ্যে তোমার সঙ্গে যত কথা বললাম, গত এক বছরে বোধহয় এত কথা বলি নি।'

তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। গত পরশু সারাদিনে এবং রাতে তোমার সঙ্গে কটি কথা হয়েছে বল তো?'

'বলতে পারছি না।'

'দুটি মাত্র বাক্য। তুমি রাত এগারটায় ঘরে ফিরে বাথরুমে ঢুকে গেলে। বাথরুম থেকে বের হবার পর আমি বললাম, টেবিলে খাবার দিতে বলব? তুমি বললে, না। খেয়ে এসেছি। বলেই ঘুমুতে চলে গেলে। কাজেই চব্বিশ ঘণ্টায় আমি তোমাকে চার শব্দের একটি বাক্য বলেছি— তুমি তিন শব্দে জবাব দিয়েছ।'

'পরশু সারাদিন বাইরে ছিলাম। কাজেই পরশু দিনের স্টেটিসটিকস্ বাদ দিতে পার।'

'যে কোনো দিনের স্টেটিসটিকস্ই তুমি নাও না কেন— আমাদের কথাবার্তা কয়েকটি বাক্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।'

মনজুর এক টুকরা চকলেট মুখে দিতে দিতে বললেন, 'আমি কথা কম বলি এটা একটা কারণ হতে পারে।'

'তুমি কথা কম বল তা ঠিক, তবে সবার সঙ্গে না; আমার সঙ্গে। আমি যতদূর জানি, জহিরের স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলার জন্যে তুমি রোজ হেঁটে হেঁটে মালিবাগ থেকে পুরানা পল্টন চলে আসতে। ফিরতে ফিরতে এগারটা সাড়ে এগারটা বেজে যেত। কোনো কোনো রাতে ঝড়-বৃষ্টি হলে থেকে যেতে।'

'কে বলেছে, জহির?'

'কে বলেছে তা জরুরি নয়। ঘটনা সত্যি কিনা তা যাচাই করাটা জরুরি।'

'সেটাও জরুরি নয়।'

'তোমার জন্য নয়। আমার জন্য জরুরি।'

'কারোর জন্যই জরুরি নয়। পুরনো দিনের ফাইল সঙ্গে নিয়ে ঘোরা কাজের কথা না। বিশেষ করে বেড়াতে যাবার সময় ফাইলপত্র রেখে আসতে হয়।'

ইসমাইল ফিরে এসেছে। সে সিগারেট পায় নি, তবে কারো কাছ থেকে হয়তো একটা সিগারেট চেয়ে নিয়ে এসেছে। মনজুর সাহেব সিগারেট ধরালেন। ইসমাইল বলল, 'রাস্তা অল্প সময়ের মধ্যেই 'কিলিয়ার' হইব স্যার।'

মনজুর সাহেব বললেন, 'আচ্ছা, তুমি আশপাশেই থাক।' তিনি সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বললেন, 'রেবেকা, একটা ডেড ইস্যু নিয়ে কথা বলার জন্যে এটা শ্রেষ্ঠ সময় নয়। আরো সময় পাওয়া যাবে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রেবেকা বললেন, 'তুমি ভুল বলছ। সময় পাওয়া যাবে না। তোমার সময়ের খুব টানাটানি। আজ যখন একটা সুযোগ পাওয়া গেছে তখন কথা বলা যাক।'

'সুযোগ আরো পাবে।'

রেবেকা কঠিন গলায় বললেন, 'না। আমি আর সুযোগ পাব না। আমি মনস্থির করেছি তোমার সঙ্গে বাস করব না।'

'বুঝতে পারছি না, কী বলছ?'

'আরেকবার বলব?'

'না। আরেকবার বলতে হবে না। কবে ঠিক করেছ তুমি আর আমার সঙ্গে বাস করবে না?'

'বছর পাঁচেক আগে ঠিক করেছি।'

'এতদিন অপেক্ষা করলে কেন?'

'মেয়ের জন্যে অপেক্ষা করেছি। ওকে বুঝানোর ব্যাপার আছে।'

'ওকে বুঝিয়েছ?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার সিদ্ধান্ত ও মেনে নিয়েছে?'

'মেনে নিয়েছে বলেই তো মনে হয়। নীতু বোকা মেয়ে নয়।'

'বোকা মেয়ে নয় বলেই তো সমস্যা। বোকা মেয়েরা ঝামেলা করে না। বাবামার কথা মেনে নেয়। ঝামেলা করে বুদ্ধিমতীরা।'

'নীতু ঝামেলা করবে না।'

'এটা তাহলে আমাদের শেষ একত্র ভ্রমণ?'

'হ্যাঁ শেষ। শুরু এবং শেষ। আমরা কিন্তু এই প্রথম বাইরে যাচ্ছি।'

'এই প্রথম যাচ্ছি তা কিন্তু না। এর আগেও গিয়েছি। গত বছর সিঙ্গাপুর গেলাম। তুমি সঙ্গে ছিলে, নীতু ছিল।'

'তুমি বেড়াতে যাও নি। কাজে গিয়েছ। আমরা তোমার কাজের সঙ্গী হয়েছি। তুমি কাজ নিয়ে থেকেছ। আমি মেয়েকে নিয়ে একা একা মলে ঘুরেছি। আমাদের একসঙ্গে একটা রোজ গার্ডেনে যাবার কথা ছিল। শেষ পর্যন্ত তাও হয় নি।'

'তুমি কী ঠিক করেছ? আবার নতুন জীবন শুরু করবে?'

'নতুন করে জীবন শুরু করা বলতে তুমি যদি বিয়ে করা বোঝাও তাহলে তার জবাব হচ্ছে— না। আমার সেই বয়স নেই, ইচ্ছাও নেই। আমি আলাদা থাকব। নিজের পায়ে দাঁড়াব। নিজের ছোট্ট সংসার নিজের মতো করে সাজাব।'

'এখনকার সংসার নিজের সংসার না?'

'না।'

মনজুর বললেন, 'তুমি আমাকে পছন্দ কর না?'

রেবেকা বললেন, 'পছন্দ করি কিন্তু ভালবাসি না। পছন্দ এবং ভালবাসা এক জিনিস না। এইটুকু নিশ্চয়ই বোঝ?'

'তা বুঝি।'

মনজুর উঠে বসলেন। তিনি গাড়ি থেকে নামবেন। রেবেকার দিকে তাকিয়ে হালকা গলায় বললেন, 'নেমে খানিকক্ষণ হাঁটবে? গাড়ির ভেতর গরম হয়ে আছে।'

'না।'

'হাঁটতে তো দোষ নেই। পছন্দের মানুষের সঙ্গে হাঁটা যায়।'

'অপছন্দের মানুষের সঙ্গেও হাঁটা যায়। কিন্তু এখন আমার গাড়ি থেকে নামতে ইচ্ছা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করছে না। তুমিও বস। কয়েকটা কথা বলি।'

মনজুর বসলেন। স্ত্রীর পাশেই বসলেন। রেবেকা বললেন, 'তুমি আমার সামনে বস। এস For a change আমরা মুখোমুখি বসি।' মনজুর তাই করলেন। শুধু তাই না। সহজ ভাবে হাসলেন।

মনজুর বললেন, 'কী কথা বলবে? ঝগড়ার কথা?'

'না, ঝগড়ার কথা না। তুমি আমি আমরা দুজনই ঝগড়ার বয়স পার হয়ে এসেছি।'

'এখন আমাদের কীসের বয়স?'

রেবেকা শান্ত গলায় বললেন, 'Age of realization 'তুমি কি আমার কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দেবে?'

'হ্যাঁ, দেব।'

'তুমি জহিরের স্ত্রীর একটা আলাদা নাম দিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'জোছনা?'

'হ্যাঁ, জোছনা।'

'আলাদা নাম দিলে কেন? তার তো একটা নাম ছিলই।'

'জানতে চাচ্ছ কেন?'

'এমনি জানতে চাচ্ছি।'

'একদিন জহিরের বাসায় আমার রাতে খাবার দাওয়াত। খেতে বসেছি। মীরা বলল, মনজুর ভাই, আপনি আমাকে সুন্দর একটা নাম বেছে দিন তো— মীরা নামটা আমি বদলাব। আমাদের পাশের ফ্ল্যাটে এক মহিলা আছেন, তাঁর নামও মীরা। এমন ঝগড়াটে মহিলা আমি জীবনে দেখি নি। আপনি সুন্দর একটা নাম বেছে বার করুন।'

'তুমি জোছনা নাম বের করলে?'

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'কোনো কারণ নেই। সেই মুহূর্তে এই নাম মনে এসেছিল বলেই বলেছি। অন্য নামও মনে আসতে পারত। আমি রুবিনা বলতে পারতাম, রত্না বলতে পারতাম। তা না বলে জোছনা বলেছি। তার পরেও এই নাম বলার পেছনে একটা কারণ আছে।'

'কী কারণ?'

'জোছনা হল আমাদের জহিরের সবচেয়ে প্রিয় জিনিস। সে সব সময় জোছনা জোছনা করে। জোছনা রাতে সারারাত ছাদে বসে থাকে। আমি জহিরের কথা ভেবেই তার নাম জোছনা রেখেছি। এই যুক্তি কি তোমার কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হচ্ছে?'

রেবেকা ছোট্ট নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'হ্যাঁ, গ্রহণযোগ্য।'

'আমি কি এখন নেমে যেতে পারি?'

রেবেকা কিছু বললেন না। মনজুর গাড়ি থেকে নেমে গেলেন।

যাত্রীদের প্রায় সবাই গাড়ি থেকে নেমে গেছে। জায়গায় জায়গায় জটলা হচ্ছে। টকটকে লাল রঙের টাই পরা এক ভদ্রলোক চাপা গলায় বলছেন, 'কেউ কখনো শুনেছেন কোনো সভ্য দেশে রোড অ্যাকসিডেন্টের জন্যে রোড ব্লক হয়? রাস্তা কী দোষ করল? আমরা কী দোষ করলাম?'

লাল টাই-পরা মানুষটির পাশে যিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি বললেন, 'আমাদের দোষ হচ্ছে আমরা এই দেশে জন্মগ্রহণ করেছি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'দ্যাটস রাইট। এটা বিচিত্র একটা দেশ। এই দেশ রাস্তা পছন্দ করে না। আমাদের প্রথম কাজ হল রাস্তা বন্ধ করে দেয়া। এই দেশের নেতারা মাঠে ময়দানে বক্তৃতা দেবেন না। বক্তৃতা দেবেন রাস্তায়, যাতে মানুষের অসুবিধা হয়। এই দেশে যিনি যত বেশি মানুষের অসুবিধা করবেন— তিনি তত বড় নেতা। অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে— কী করা যাবে? অ্যাকসিডেন্ট তো হয়ই। ছোট্ট রাস্তা। গিজগিজ করছে মানুষ। এখনো হাইওয়েতে লোকজন ধান শুকায়। ছেলেমেয়েরা খেলা করে। এখানে অ্যাকসিডেন্ট হবে না তো কোথায় হবে? অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে— এম্বুলেন্স আসবে— পুলিশ আসবে। কিন্তু আসে নি। শুনতে পাচ্ছি, একজন ওসি সাহেব এসেছেন। আসার পর থেকে তিনি শুধু কানাকানি করে বেড়াচ্ছেন। এর সঙ্গে কানে কথা বলেন, ওর সঙ্গে কানে কথা বলেন। আপনারা কি কখনো শুনেছেন কোনো সভ্য দেশের পুলিশ শুধু কানাকানি করে বেড়ায়?'

একজন বলল, 'ভাই, আপনি বার বার সভ্য দেশ সভ্য দেশ করছেন কেন? আপনাকে কে বলেছে এটা সভ্য দেশ?'

অনেকেই হেসে উঠল। মনজুর সাহেব লক্ষ করলেন, দলটির মধ্যে তাঁর ড্রাইভার ইসমাইলও আছে। ইসমাইল হাসছে না। সে কঠিন চোখে তাকিয়ে আছে। মনে হচ্ছে এদের কথাবার্তা তার পছন্দ হচ্ছে না।

মাথার উপর কড়া রোদ। এমন কড়া রোদে মনজুর অনেকদিন হাঁটেন নি। হাঁটতে ভালো লাগছে। তিনি উদ্দেশ্যবিহীন হাঁটা হাঁটছেন না। মেয়েকে খুঁজছেন। এক জায়গায় কয়েকজন মহিলার জটলা দেখতে পেলেন। ডাব বিক্রি হচ্ছে। ষোল-সতের বছরের একটা ছেলে দুই কাঁদি ডাব নিয়ে এসেছে। এক একটা চার টাকা করে বিক্রি হচ্ছে। ডাবের দাম নিয়ে মহিলাদের মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছে।

'একটা ডাব চার টাকা। কোনো মানে হয়? ঢাকাতেই তো তিন টাকা করে ডাব পাওয়া যায়।'

মনজুর সাহেবের ইচ্ছা করছে, বলেন—'টাকায় তিন টাকা করে ডাব পাওয়া গেলে ঢাকায় গিয়ে খেয়ে আসুন।'

যে ছেলেটি ডাব বিক্রি করছে সে সম্ভবত নির্বোধ প্রকৃতির। কথা শুনে যাচ্ছে। কোনো জবাব দিচ্ছে না। তবে ডাব কাটায় সে ওস্তাদ। কচ করে এক কোপে কেটে ফেলছে। তার কাটার ভঙ্গি দেখলে মনে হয় ডাব কাটাটা খুব আরামদায়ক ব্যাপার।

এক স্থূলকায়া মহিলা বললেন, 'এই ছেলে ডাবটা মাঝখান দিয়ে দুফাঁক করে দাও। শাঁস খাব।'

ছেলে ডাব দুফাঁক করে দিল।

মহিলা বিরস গলায় বললেন, 'শাঁস খাব কীভাবে? এই ছেলে, চামচ জোগাড় করে দিতে পারবে?'

মনজুর এখন যথেষ্ট আগ্রহ বোধ করছেন। কী অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা! একজনকে দেখা গেল— ডাবের পানি চোখে-মুখে ছিটাচ্ছে। পানির অভাবেই কি ডাবের পানিতে মুখ ধোয়া হচ্ছে? না ডাবের পানি ব্যবহারের অন্য কোনো কারণ আছে?

'বাবা!'

মনজুর চমকে উঠলেন। নীতু পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। নীতু বলল, 'আমি অনেকক্ষণ থেকে লক্ষ করছি তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছ। কী দেখছ?'

'ডাব বিক্রি করা দেখছি।'

'ডাব বিক্রি করায় দেখার কী আছে?'

'যখন কিছুই দেখার নেই— তখন সামান্য জিনিসও দেখতে ভালো লাগে। তুই ডাব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খাবি?'

'উঁহু।'

'ডাবের শাঁস খাবি?'

'হ্যাঁ, খাব।'

মনজুর সাহেব ডাব কিনতে এগিয়ে গেলেন। ডাব পাওয়া গেল না। সব বিক্রি হয়ে গেছে। ডাবওয়ালা একটা পাঁচশ টাকার নোট হাতে হতভম্ব মুখে দাঁড়িয়ে আছে। এক মহিলা তিনটি ডাবের দাম পাঁচশ টাকা দিয়ে দিয়েছেন। তাঁর কাছে ভাঙতি নেই।

ভদ্রমহিলা রাগী গলায় বললেন, 'হাঁ করে দাঁড়িয়ে থেক না। ভাঙতি দাও।'

'ভাঙতি কই পামু?'

'আমি কী জানি— কোথায় পাবে?'

ছেলেটা পাঁচশ টাকার নোট এক হাত থেকে অন্য হাতে নিচ্ছে। ঝকঝকে নতুন একটা নোট। নোট হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে তার হয়তো ভালো লাগছে।

'কী আশ্চর্য! হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? বাকি টাকা ফেরত দে।'

'ভাঙতি নাই আম্মা।'

'ভাঙতি নাই। ভাঙতি জোগাড় কর। গাছের মতো দাঁড়িয়ে থাকলে— ভাঙতি কি আকাশ থেকে আসবে? যা ভাঙতি নিয়ে আয়।'

মনজুর লক্ষ করলেন, ভদ্রমহিলা তুমি করে শুরু করেছিলেন এখন তুই তুই করছেন। তুইয়ের নিচেও আরেকটা বাক্যধারা থাকলে মন্দ হত না।

নীতু বাবার হাত ধরে বিরক্ত গলায় বলল, 'এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে ভালো লাগছে না বাবা। চল, অন্য কোথাও যাই।'

'কোথায় যাবি?'

'মাঠের ঐ পাশে যে একটা বাড়ি দেখা যাচ্ছে, চল সেখানে যাই।'

'গাড়ি ছেড়ে বেশি দূরে যাওয়া ঠিক হবে না মা। যে কোনো মুহূর্তে হয়তো অল ক্লিয়ার দিয়ে দেবে।'

'দিক না। আমরা সবার শেষে যাব। আমাদের তো কোনো তাড়া নেই।'

'তোর কি যেতে খুব ইচ্ছা করছে?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে চল যাই।'

তারা রাস্তা ছেড়ে মাঠে নামল। কামিজ পরা একজন মহিলা প্রায় ছুটে এলেন। 'আপনারা কি বাথরুমের খোঁজে যাচ্ছেন? প্লিজ, আমাকে সঙ্গে নিন।'

নীতু বলল, 'আমরা বাথরুমের খোঁজে যাচ্ছি না।'

'ও সরি।'

মহিলা যে ভাবে দৌড়ে এসেছিলেন, ঠিক সে ভাবেই দৌড়ে চলে গেলেন।

ক্ষেতের আল ধরে দুজন এগুচ্ছে। প্রথম নীতু, নীতুর পেছনে পেছনে মনজুর সাহেব। কিছুদূর গিয়েই নীতু থমকে দাঁড়াল। লাজুক গলায় বলল, 'আমরা ঐ বাড়ি পর্যন্ত যাব না। এই গাছটার নিচে দাঁড়াব।'

'আচ্ছা বেশ তো!'

'এটা কী গাছ বাবা?'

'এর নাম সজনে গাছ। আচ্ছা, তুই কি আমাকে কিছু বলার জন্যে এখানে আলাদা করে নিয়ে এলি?'

'হ্যাঁ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বল্ কী বলবি?'

'মা যে তোমার সঙ্গে আর থাকবে না, তা কি তোমাকে বলেছে?'

'হ্যাঁ বলেছে।'

'কবে বলল?'

'আজ।'

'আমি তাই ভেবেছিলাম।'

মনজুর সাহেব অবাক হয়ে লক্ষ করলেন, নীতুর মুখ থেকে একটা মেঘ যেন সরে গেল। যেন এখন সে আনন্দিত। সমস্যার সমাধান হয়ে গেলে মানুষ যেমন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সেও যেন তা-ই ফেলেছে। মনজুর সাহেব বললেন, 'তোর মা আলাদা থাকবে, এতে মনে হয় তুই খুশি হয়েছিস।'

'হ্যাঁ বাবা, খুশি হয়েছি।'

'খুশি হবার কারণ কী মা?'

'অনেকদিন থেকে মা কষ্ট পাচ্ছিল। আর কষ্ট পাবে না। কারণ মাকে তুমি ভালবাস না বাবা।'

'ভালবাসি না?'

'না।'

'কী করে বুঝলি?'

'বোঝা যায়।'

'দুজন আলাদা হয়ে গেলে তুই কার সঙ্গে থাকবি?'

'মার সঙ্গে। তোমার একজন ভালো সঙ্গী আছে। মার অভাবও তুমি বুঝতে পারবে না। তুমি থাকবে কাজ নিয়ে। কাজ হল তোমার সঙ্গী। তুমি কাজ নিয়ে থাকবে। কিন্তু মার তো কোনো সঙ্গী নেই। আমি ছাড়া মার আর কে আছে? তুমিই বল বাবা— আমার কার সঙ্গে থাকা উচিত।'

'তোর মার সঙ্গেই থাকা উচিত।'

'থ্যাংক ইউ। চল আমরা যাই।'

মনজুর সাহেব নড়লেন না। দাঁড়িয়ে রইলেন। নীতুর সহজ কথাবার্তায় তিনি প্রায় চমকে গেছেন। মানুষ কত দ্রুত বড় হয়। এই মেয়ে এইতো সেদিন মাত্র কথা শিখল। র বলতে পারত না। যে কোনো কিছু দেখলেই ছুটে এসে বলত— 'ভূত কামল দিচ্ছে।'

রেবেকা মহা বিরক্ত হয়ে বলতেন, 'ভূত কামল দিচ্ছে আবার কী? বল, ভূত কামড় দিচ্ছে।'

মনজুর বলতেন, 'দিনে দুপুরে ভূত তাকে কামড়াবে কেন?'

রেবেকা তৎক্ষণাৎ বলত— 'তাইতো! এসব কে শেখাচ্ছে? কাজের মেয়েগুলো শেখাচ্ছে। ভালো কিছু শেখাবে না। প্রথমেই শিখিয়েছে ভূত। মা নীতু শোন— ভূত নেই। নেই না-না-না। নেই। বুঝেছ মা?'

'হুঁ।'

'বল তো ভূত নেই।'

নীতু আবার বলত, 'ভূত কামল দিচ্ছে।'

শৈশবের সেই ভূত কি নীতুকে এখনো কামড়ায়? মনজুর সাহেবের জানতে ইচ্ছা করল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫

ওসি সাহেবের নাম ফরিদউদ্দিন।

পুলিশ অফিসাররা সচরাচর রুক্ষ প্রকৃতির হয়ে থাকেন। ফরিদউদ্দিন তেমন না। তাঁকে খুব মাই ডিয়ার ধরনের মনে হয়। সবার সঙ্গে এমনভাবে কথা বলেন যেন দীর্ঘদিনের চেনা।

এখন তিনি ইয়াছিন মোল্লার সঙ্গে কথা বলছেন। কথা বলছেন ঘাড়ে হাত রেখে। ইয়াছিন মোল্লা জ্বর গায়েই চলে এসেছে। তার মুখ শুকনো।

'তুমি থাকতে এমন একটা ঝামেলা কী করে হয় বল তো ইয়াছিন? আরিচার রাস্তা বন্ধ হয়ে গেলে আমার চাকরি নিয়ে টানাটানি পড়বে। তুমি বুঝতে পারছ না?'

ইয়াছিন মিনমিনে গলায় বলল, 'আমি কী করব? আমার কথা কে শুনবে?'

'তোমার কথা শুনবে না মানে? একশ বার শুনবে। তুমি বলে দেখ।'

'কী বলব?'

'বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ডেডবডি দুটা তুলে নিয়ে যাও। বল যে শক্ত মামলা হবে। পাজেরো জিপ নিয়ে পালিয়ে যাবে, তা তো হবে না। হারামজাদাকে আমি জেলের ভাত না খাওয়ালে আমি ফরিদউদ্দিন না।'

'এরা শুনবে না ফরিদ ভাই।'

'না শুনে করবে কী? ডেডবডি কতক্ষণ রাস্তায় ফেলে রাখবে? গভর্নমেন্ট তার রাস্তা খুলবে না? দরকার হলে ফোর্স চলে আসবে। পুলিশে না কুলালে বিডিআর আসবে। আর্মি আসবে। মেরে তক্তা বানিয়ে দিবে। তুমি বুঝদার লোক। তুমি যদি না বোঝ ।
যাও, বুঝিয়ে বল।'

'খরচ-বরচ কিছু পাওয়া গেলে দেখতাম মানানো যায় কিনা।'

'খরচ-বরচ কে দিবে? ট্রাকের ধাক্কায় কিংবা বাসের ধাক্কায় মারা গেলে ইউনিয়ন থেকে টাকা বের করে দিতাম। কোনো অসুবিধা হত না। প্রাইভেট গাড়ি। বুঝতে পারছ না? যাই হোক, এই পাঁচশ টাকা নিয়ে যাও।— ডেডবডি তুলে নেয়ার খরচ।'

'মাত্র পাঁচশ?'

'আরে বাবা, এই পাঁচশ তো নিজের পকেট থেকে দিলাম। অ্যাকসিডেন্টের জিপ ধরা পড়ুক, কুড়ি হাজার টাকা সঙ্গে সঙ্গে পাওয়ায়ে দিব। না দিলে আমার নাম ফরিদউদ্দিন না। তুমি যাও, ছেলের বাবাকে আমার কাছে পাঠাও।'

ইয়াছিন চিন্তিত মুখে অগ্রসর হচ্ছে। ফরিদউদ্দিন সিগারেট ধরালেন। তাঁকে খুব চিন্তিত মনে হচ্ছে না। তাঁর মন বলছে তিনি সমস্যা সামলে ফেলেছেন। কলেজ বন্ধ থাকায় তাঁর সুবিধা হয়ে গেছে। কলেজের ছেলেপুলে দল বেঁধে উপস্থিত হয় নি। ইয়াছিন মোল্লাকে পেয়ে যাওয়াও ভাগ্যের ব্যাপার। অতি ধুরন্ধর লোক। সে কোনো না-কোনোভাবে সমালে দিবে।

সামলাতে না পারলে বিরাট যন্ত্রণা হবে। ফোর্স আনতে হবে। দুটার সময় খাদ্যমন্ত্রী যাবেন রংপুর। তার আগেই রাস্তা ক্লিয়ার করতে হবে। মনে হচ্ছে, পারা যাবে। গ্রামের লোক প্রচুর জড়ো হয়েছে ঠিকই, কিন্তু চুপচাপ আছে। তবে কিছুই বলা যায় না। হঠাৎ সবকিছু এলোমেলো হয়ে যেতে পারে।

ওয়াকিটকিতে এসপি সাহেব ম্যাসেজ দিচ্ছেন— কতদূর কী হচ্ছে জানতে চাচ্ছেন। ফরিদউদ্দিন বললেন, 'মনে হয় ঠিক হয়ে যাবে, স্যার।'

'পারবেন রাস্তা ক্লিয়ার করতে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'পারব স্যার।'

'ওদের কোনো দাবি–দাওয়া আছে?'

'দাবি–দাওয়ার কথা কিছু বলছে না, স্যার।'

'যদি বলে আপাতত মেনে নিবেন।'

'জ্বি আচ্ছা, স্যার।'

'আমার আসার কি দরকার আছে?'

'এই মুহূর্তে নাই।'

'দরকার হলে বলবেন— আমি স্ট্যান্ডবাই আছি।'

'জ্বি আচ্ছা, স্যার।'

'যদি কোনো কারণে রোড ব্লক না সরে তাহলে ফোর্স অ্যাপ্লাই করতে হবে।'

'দরকার হবে না, স্যার।'

'ভেরি গুড। একসেলেন্ট।'

ইয়াছিন মোল্লা মৃত ছেলেমেয়ে দুজনের বাবাকে নিয়ে এসেছে। এর সঙ্গে আড়ালে কথা বলতে পারলে ভালো হত। কিন্তু তা সম্ভব না— প্রায় শখানিক লোক তাদের ঘিরে ফেলেছে। ফরিদউদ্দিন কী বলবেন অতি দ্রুত চিন্তা করছেন। কোন লাইনে কথা বললে ভালো হবে বুঝতে পারছেন না।

ফরিদউদ্দিন বললেন, 'ভাই আপনার নাম?'

'শমসের। আমার নাম শমসের।'

'আপনি কেমন লোক বলেন তো দেখি, দুটা দুধের শিশুকে একা ছেড়ে দিয়েছেন?'

শমসের কাঁদতে শুরু করল। ফরিদউদ্দিন মনে মনে তৃপ্তির নিশ্বাস ফেললেন। ওষুধ কাজ করতে শুরু করেছে। বাবাকে অপরাধী করা হয়েছে। রাগের কিছু অংশ বাবার উপর এনে ফেলে দেয়া হয়েছে।

'আপনি তো জানেন— পাগলের মতো স্পিড দিয়ে এই রাস্তায় গাড়ি যায়। ড্রাইভারগুলো মানুষকে মানুষ মনে করে না। তারপরও কী মনে করে ছোট দুটা বাচ্চাকে একা একা রাস্তা পার হতে দিলেন? আপনি কোথায় ছিলেন?'

শমসের জবাব দিল না। ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লাগল। অন্য একজন চাপা গলায় কি যেন বলল। ফরিদউদ্দিন ভেতরে ভেতরে চমকালেন। কারণ এইসব ক্ষেত্রে চাপা গলার কথা বা ফিসফিস কথা ভয়াবহ হতে পারে!

'কে কথা বললেন?'

'জ্বি আমি।'

'আপনি কে? নাম কি?'

'আমার নাম ইসমাইল। আমি ড্রাইভার। মাইক্রোবাসের ড্রাইভার।'

'গাড়ির ড্রাইভার হয়ে এমন সময় কথা বলতে আসছেন— আপনার সাহস তো কম না! ড্রাইভাররা কেউ কোনো কথা বলবেন না। ড্রাইভারদের সঙ্গে আমার কোনো কথা নাই। আপনারা সব এক পদের। সুযোগ পেলেই মানুষ মারবেন। যান, আপনি আপনার গাড়িতে যান। যান বললাম।'

ইসমাইল গাড়ির দিকে রওনা হল। ফরিদউদ্দিন খুব তৃপ্তি বোধ করলেন। জনতার উপর এক ধরনের প্রভাব ফেলা হয়েছে। এই প্রভাবের মূল্য অনেক। তিনি শমসেরের ঘাড়ে হাত রেখে বললেন, 'দুটা লাশ সড়কের মাঝখানে ফেলে রেখে আপনি যে কাণ্ডটা করছেন— বাপ হয়ে এটা কি করা উচিত? এদের বাড়িতে নিয়ে যান। গোসল দেন। আল্লাহ খোদাকে ডাকেন। রোদের মধ্যে লাশ ফেলে রেখেছেন— এটা কী? কত বড়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গুনাহ্‌র কাজ করছেন আপনি জানেন না?'

'বাড়িতে নিয়া যাব?'

'অবশ্যই বাড়িতে নিয়ে যাবেন। আর বাড়িতেই থাকবেন। বাড়ি থেকে বের হবেন না। এসপি সাহেব আসবেন। থানায় কেইস দিয়েছেন?'

'জ্বি না।'

'থানায় কেইস দিতে হবে। আপনার থানায় আসার দরকার নাই। আমি সেকেন্ড অফিসারকে পাঠাব। কেইস হয়ে যাক— দেখবেন চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পাজেরো জিপের হারামজাদাকে ধরে আনব। প্রথমে হারামজাদাকে কানে ধরে একশবার উঠবোস করাব। তারপর অন্য কথা। মসজিদ আছে আশপাশে? কথা বলেন না কেন, মসজিদ আছে?'

'জ্বি স্যার, আছে।'

'মসজিদ থেকে খাটিয়া আনার ব্যবস্থা করেন। ডেডবডি সরাতে হবে।'

কেউ কোনো প্রতিবাদ করল না। এটা শুভ লক্ষণ। একজন কেউ প্রতিবাদ করলেই অবস্থা অন্য রকম হবে। ফরিদউদ্দিন ঘড়ি দেখলেন— এগারটার মতো বাজে। গাড়ির যে জট লেগেছে— তা দূর করতে ঘণ্টা দুই লাগবে।

ফরিদউদ্দিন আরেকটা সিগারেট ধরালেন। তিনি যুদ্ধজয়ের আনন্দ বোধ করছেন। এতবড় সমস্যার এত দ্রুত সমাধান হবে তিনি নিজেও ভাবেন নি।

তিনি ওয়াকিটকিতে খবর পাঠালেন। এসপি সাহেব বললেন, 'গুড, ভেরি গুড। গাড়ি কি চলতে শুরু করেছে?'

'এখনো না। দশ মিনিটের মধ্যে শুরু হবে।'

'ভেরি গুড। গুড জব।'

'থ্যাংক ইউ, স্যার।'

ফরিদউদ্দিন ওয়াকিটকি বন্ধ করে চারদিকে তাকালেন। তাঁকে ঘিরে ভিড় হয়ে আছে। তিনি গম্ভীর গলায় বললেন, 'ভিড় করবেন না। আপনারা যাত্রী যারা আছেন দয়া করে গাড়িতে বসুন। কুইক, কুইক।'

লাল টাই-পরা ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন। ফরিদউদ্দিনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি কি পুলিশ অফিসার?'

'জ্বি স্যার।'

'সামান্য রোড ব্লক দূর করতে আপনাদের এতক্ষণ লাগছে, এর কারণ কি? করেন কী আপনারা?'

ফরিদউদ্দিন মুখ হাসি-হাসি রাখার চেষ্টা করলেন। তবে মনে মনে বললেন, 'হারামজাদা।'

'সম্পূর্ণ অকারণে আমরা এতক্ষণ এখানে পড়ে আছি।'

'এক্ষুনি অল ক্লিয়ার হবে, স্যার।'

'বিনা অপরাধে শাস্তি। আমরা যে এখানে পড়ে আছি— আমাদের অপরাধটা কোথায়? বলুন আপনি— কী অপরাধ আমাদের? এই দেশে জন্মেছি। এটাই কি অপরাধ?'

ফরিদউদ্দিন মনে মনে বললেন, 'আরে শুওরের বাচ্চা, গাড়িতে গিয়ে উঠে বস্‌। প্যাঁচাল পাড়িস না। এত অল্পতে যে উদ্ধার পেলি এর জন্যে আমাকে ধন্যবাদ দে। আমার পায়ের ধুলা নিয়ে মাথায় মাখ।'

'কী, কথা বলছেন না কেন? বলুন, আমাদের অপরাধটা কী? আপনাকে বলতে হবে— 'ইউ গট টু সে।'

ফরিদউদ্দিন আবার বললেন, 'গাড়িতে গিয়ে বসুন, স্যার।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'গাড়িতে বসাবসি পরে হবে। ইউ আনসার মি। আপনি তো পুলিশের লোক?'

'জ্বি স্যার। আগেও একবার আপনাকে বলেছি।'

'পোস্ট কি?'

'ওসি।'

'শুনুন ওসি সাহেব। পুলিশের লোক হিসেবে আপনি বলুন, ঘুস খাওয়া ছাড়া আর কোন্ কাজটা আপনারা ভালোমতো পারেন?'

ফরিদউদ্দিন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চারদিকে তাকালেন। লোকটাকে কড়া ধমক দিয়ে ঠাণ্ডা করে দেয়া যায়—তবে লোকটা কে জানা নেই। হয়তো বড় কেউ। ইস্টাবলিশমেন্ট বিভাগের সেক্রেটারি, কিংবা মন্ত্রীর কোনো আত্মীয়। ধমক দিয়ে শেষে কোন বিপদে পড়েন কে জানে।

ফরিদউদ্দিন শান্ত গলায় বললেন, 'আপনি স্যার অকারণে রাগ করছেন। গাড়িতে উঠে বসুন। এক্ষুনি রাস্তা ক্লিয়ার হচ্ছে।'

'আমি আমার প্রশ্নের জবাব না নিয়ে গাড়িতে উঠব না। I want an answer.'

'কোন্ প্রশ্নের জবাব চাচ্ছেন?'

'আমি জানতে চাচ্ছি কোন্ অপরাধে আমাদের এখানে আটকে রাখা হল? আছে আমাদের কোনো অপরাধ?'

'জ্বি না, স্যার।'

মনজুর সাহেব গভীর আগ্রহ নিয়ে এদের কথা শুনছেন। ওসি সাহেবের কথাবার্তায় তিনি মুগ্ধ। এমন ঠাণ্ডা মাথা পুলিশদের মধ্যে দেখা যায় না। বেচারাকে অকারণে অপমান করা হচ্ছে। বেচারাকে সাহায্য করতে ইচ্ছা করছে।

মনজুর সাহেব লাল টাই-পরা মানুষটির দিকে তাকিয়ে শীতল গলায় বললেন, 'আমাদের অপরাধ আছে। অবশ্যই আছে।'

'কী অপরাধ?'

'একটা বাচ্চা মারা গেছে। আরেকজন আহত হয়ে পড়েছিল। একের পর এক গাড়ি পাশ দিয়ে চলে গেল কেউ থামে নি। কেউ আহত মেয়েটিকে হাসপাতালে নেয়ার চেষ্টা করে নি।'

'যারা করে নি সেটা তাদের ব্যাপার।'

'আমাদেরও ব্যাপার। আমরাও একই জিনিস করতাম।'

'আপনি হয়তো করতেন।'

'আপনিও করতেন। কয়েক ঘণ্টা আটকে আছেন বলে আপনি অস্থির হয়ে পড়েছেন। অথচ দুটা বাচ্চা মারা গেছে।'

'আপনি কে?'

'আমিও আপনার মতোই একজন।'

ফরিদউদ্দিন অস্থির হয়ে পড়েছেন— দুজনের কথাবার্তা এই মুহূর্তে বন্ধ হওয়া দরকার। সামান্য কথাবার্তা থেকে অনেক কিছু হয়ে যেতে পারে। একত্র হওয়া একদল মানুষের মতো ভয়ংকর আর কিছুই নেই। এরা বারুদ। আগুনের একটা ফুলকি পড়লেই আর দেখতে হবে না। আগুনের ফুলকি থাকে সামান্য কথাবার্তায়।

ফরিদউদ্দিন মনজুর সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'স্যার, আপনি গাড়িতে গিয়ে বসুন।'

লাল-টাই মুখ বিকৃত করে বলল, 'উনি গাড়িতে গিয়ে বসলে চলবে কেন? উনি মানবতাবাদী— উনি থাকবেন। বাচ্চাদের নামাযে জানাজায় শরিক হবেন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমার তো মনে হয়— আমাদের সবারই থাকা উচিত। অপরাধের প্রায়শ্চিত্তের দায়িত্ব অস্বীকার করা কি ঠিক? এতবড় একটা ঘটনা অথচ আমাদের মধ্যে তার কোনো ছাপ নেই। বেশ কিছু গাড়িতে ক্যাসেট বাজছে। গান শোনা হচ্ছে।'

ভিড়ের ভেতর থেকে একজন বের হয়ে এল। তার পরনে লুঙ্গি, গায়ে গেঞ্জি। সে তীব্র গলায় বলল, 'এই ব্যাটা লাল-টাই! চুপ থাক্ কইলাম' এক চড় দিয়া সিধা কইরা ফেলামু।'

লাল-টাই হতভম্ব হয়ে বলল, 'কী বলছে, কে এই লোক! তুমি কে? who are you?'

'আমি তোর তালুই।'

'এর মানে কী?'

'মানে তোর বাফেরে গিয়া জিগা। হারামীর পুত!'

প্রচণ্ড চড়ের শব্দ হল। ফরিদউদ্দিন দেখলেন — লাল-টাই রাস্তায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেছে। লুঙ্গি এবং গেঞ্জি গায়ের লোকটি থু করে একদলা থুতু ফেলে বলল, 'কোনো গাড়ি চলবে না। গাড়ি 'বন'। সব গাড়ি 'বন'।

ভিড়ের সবাই একসঙ্গে বলে উঠল— 'গাড়ি বন। গাড়ি বন!'

ফরিদউদ্দিনের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমল। পুরো ব্যাপারটা এখন তার আওতার বাইরে চলে যাচ্ছে।

লাল-টাই পরা মানুষটা উঠে বসতে যাচ্ছে। লুঙ্গি পরা লোকটা হুংকার দিয়ে উঠল — 'খবরদার, উঠবি না। খবরদার কইলাম। জানে মাইরা ফেলামু। শুইয়া থাক।'

ফরিদউদ্দিন লাল-টাই পরা লোকটির দিকে তাকিয়ে ক্লান্ত গলায় বললেন, 'শুয়ে থাকুন। নড়াচড়া করবেন না। প্লিজ।'

ফরিদউদ্দিন আরেকটি সিগারেট বের করলেন। রোদ বাড়ছে। ঝকঝক করছে আকাশ। রোদ আরো বাড়বে। তিনি ঘড়ি দেখলেন। খাদ্যমন্ত্রী যাবেন। তার আগে কি রাস্তা পরিষ্কার হবে?

লাল-টাই পরা লোকটা শুয়ে আছে। সে ভয় পেয়েছে— কী অদ্ভুত চোখেই না তাকাচ্ছে! পশুরা এ রকম করে তাকায়। সে আরেকবার উঠে বসার চেষ্টা করল। লুঙ্গি পরা মানুষটা বলল, 'খবরদার কইলাম, খবরদার।'

মনজুর সাহেব বললেন, 'উনি কেন রাস্তায় শুয়ে থাকবেন? এটা ঠিক না।'

লুঙ্গি পরা মানুষটি কঠিন গলায় বলল— 'আপনেও চুপ থাকেন। ভদ্দরলোকের কোনো দরকার নাই।'

ভিড়ের ভেতর থেকে চাপা আওয়াজ উঠল— 'দরকার নাই। ভদ্দরলোকের দরকার নাই।'

বিপদ একা আসে না। নানাদিক থেকে একসঙ্গে আসে। ফরিদউদ্দিনের ওয়াকিটকি কাজ করছে না। বোতাম টিপলেই ঝিঁঝি পোকার মতো একটা আওয়াজ হয়। ব্যাটারি কি ডাউন হয়ে গেছে? ফরিদউদ্দিন চারদিকে তাকালেন। কিছু কিছু চেনা মুখ দেখা যাচ্ছে। একজন হল— বুড্ডা, টঙ্গীর বুড্ডা। হারামজাদা চলে এসেছে তাহলে! কোনো সুযোগ এ ছাড়ে না। একটা ঝামেলা পাকিয়ে সে লুটপাটের চেষ্টা করবে। বুড্ডা একা এসেছে, না দলবল সঙ্গে এনেছে?

ফরিদউদ্দিন বুড্ডাকে ইশারা করলেন। বুড্ডার সঙ্গে আড়ালে কিছু কথা বলা দরকার। বুড্ডা তেলতেলে মুখে হাসছে।

'কেমন আছিস বুড্ডা?'

'জ্বে ওসি সাহেব, ভালো। আপনের শইল কেমন?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমার শরীর ভালো। আমি একটা বিপদে পড়েছি বুড্ডা।'
'বিপদ বলে বিপদ। এইখানে আইজ গজব হইব। পাবলিক গেছে উল্টাইয়া।'
'এখনো উল্টায় নি তবে উল্টাবে। কী করা যায় বল তো বুড্ডা?'
'আপনে আর কী করবেন? বাড়িতে গিয়া ঘুমান।'
'মিনিস্টার সাহেব রংপুর যাবেন— রাস্তা ক্লিয়ার হওয়া দরকার।'
'এইটা ভুইল্যা যান।'
'তুই কি একা এসেছিস, না তোর সঙ্গে লোকজন আছে?'
'আমি একলাই আছি। আল্লার কসম ওসি সাব। আমার সাথে আর কেউ নাই।'
'তুই এসেছিস কেন?'
মজা দেখতে আসছি।'
'তুই আমাকে একটু সাহায্য কর বুড্ডা।'
'ছিঃ ছিঃ এইটা কী কন। আমি কী সাহায্য করব?'
'নে সিগারেট নে।'
'সিগারেট ছাইড়া দিচ্ছি ওসি সাহেব। বুকে দরদ হয়।'
'তোর সাথে আর কেউ নেই তো?'
'আল্লাহর কসম। নবী করিমের কসম। আমি একলা।'
ফরিদউদ্দিন কোনো ভরসা পাচ্ছে না।
ফরিদউদ্দিনের কপাল বেয়ে টপ টপ করে ঘাম পড়তে লাগল। আকাশে চিল উড়ছে। এ কী বিপদ!

রেবেকা হাত ইশারা করে জহিরকে ডাকলেন। জহির গাড়িতে উঠে এল। রেবেকা উদ্বিগ্ন গলায় বললেন, 'হৈচৈ হচ্ছে কীসের?'

'একজন মহিলা ডাবের দাম বাবদ পাঁচশ টাকার নোট দিয়েছিলেন। ডাবওয়ালা সেই পাঁচশ টাকার নোট নিয়ে সটকে পড়েছে। ঐ নিয়ে হৈচৈ হচ্ছে। ভদ্রমহিলা সমানে ডাবওয়ালাকে — শুওরের বাচ্চা আর কুত্তার বাচ্চা ডাকছেন।'

'আমি ঐ হৈচৈয়ের কথা বলছি না। একটা লোককে মেরে রাস্তায় ফেলে দিয়েছে। লাল টাই-পরা একটা লোক। নীতুর আব্বাও সেখানে আছে।'

'কই, আমি জনি না তো! আচ্ছা খোঁজ নিয়ে আসি।'

'আমি দেখলাম নীতুর বাবা উঁচু গলায় কথা বলছে। ও কেন ঝামেলায় জড়াবে?'

'না কোনো ঝামেলায় জড়াবে না। আমি ওকে নিয়ে আসছি।'

৬

নীতু একটা রেন্টি গাছের নিচে বসে আছে। তাকে খানিকটা ক্লান্ত বলে মনে হচ্ছে। এখান থেকে তাদের মাইক্রোবাস দেখা যায়। মাঝে মাঝে সে তার মায়ের দিকে তাকাচ্ছে। রেবেকা চোখ বন্ধ করে আছেন বলে কিছুই জানতে পারছেন না। জহির দাঁড়িয়ে আছেন নীতুর সামনে। তাঁকে খুব উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে। যদিও উদ্বেগ চাপা দেয়ার চেষ্টা করছেন। পুরোপুরি চাপা দিতে পারছেন না। তাঁর মন বলছে, ঝামেলা শুরু হতে যাচ্ছে।

নীতু ডাকল, 'চাচা!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জহির কোমল গলায় বললেন, 'কী মা!'
'বাচ্চা দুটির নাম জেনেছেন?'
'না।'
তিনি মিথ্যা করে 'না' বললেন, কারণ ঐ বাচ্চা দুটির প্রসঙ্গ তিনি আনতে চাচ্ছেন না। নীতু বলল, 'সবাই গাড়ি থেকে নামল— মা নামল না কেন?'
'বোধহয় শরীর ভালো না। তোর কি খিদে পেয়েছে নীতু?'
'হুঁ।'
'খিদে পেলেও কিছু করার নেই। চুপচাপ বসে থাকতে হবে।'
'বসেই তো আছি।'
'চা পেলে খুব ভালো হত। নেক্সট টাইম আমরা কোথাও বের হলে সঙ্গে চা থাকবে। চিঁড়া থাকবে, মুড়ি থাকবে।'
'আপনার খিদে পেয়েছে, তাই না চাচা? খিদের সময় শুধু খাবারের কথা মনে হয়।'
'খিদে অবশ্যি পেয়েছে। বয়স হলে খিদে সহ্য করার ক্ষমতা কমে যায়। সন্ধ্যা পর্যন্ত তুই না খেয়ে থাকতে পারবি। আমি পারব না। ফ্ল্যাট হয়ে পড়ে যাব।'
'দাঁড়িয়ে আছেন কেন চাচা, বসুন না।'
জহির বসলেন। নীতু বলল, 'আপনাকে আমার অনেক কথা জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করে— শেষ পর্যন্ত সাহস হয় না।'
'সাহস হয় না কেন?'
আপনি যদি মনে করেন— এই বাচ্চা মেয়ে এসব কী বলছে?'
'এমন কিছু কি বলতে চাস যা বাচ্চা মেয়েদের বলা ঠিক না।'
'হ্যাঁ।'
'বলে ফ্যাল।'
'বাবাকে কি আপনি পছন্দ করেন?'
'অবশ্যই করি। তোর ধারণা হল কেন মনজুরকে আমি পছন্দ করি না?'
'আপনি বাড়িতে এলে বাবার সঙ্গে কখনো কথা বলেন না। আমার সঙ্গে এবং মার সঙ্গে গল্প-গুজব করে চলে যান— এই জন্যেই জিজ্ঞেস করছি।'
'তোর বাবাকে আমি খুবই পছন্দ করি।'
'কেন করেন?'
'তার চরিত্রে এমন কিছু কিছু দিক আছে যা সাধারণত দেখা যায় না।'
'উদাহরণ দিন।'
'যেমন সে কখনো মিথ্যা বলে না। আমি তাকে স্কুল জীবন থেকে দেখছি। সে মজা করার জন্যেও মিথ্যা বলে না।'
'মিথ্যা না বলতে পারাটা কি খুব বড় কিছু?'
'অনেক বড় ব্যাপার নীতু। তোর বাবা হচ্ছে কম্পুটারের মতো। কম্পুটার মিথ্যা বলে না। ভুল প্রোগ্রামে চলতে পারে না। তোর বাবাও সে রকম।'
'আপনার কথায়— বাবা একটা যন্ত্র। মানুষ যন্ত্র পছন্দ করে না। আপনি কেন করেন?'
'আমি করি, কারণ আমি জানি— এই যন্ত্রটার ভেতর একজন মানুষ বাস করে। চমৎকার একজন মানুষ। আমি যেমন জানি— তুইও জানিস। জানিস না?'
'জানি।'
'প্রশ্ন শেষ হয়েছে, না বাকি আছে?'
'বাকি আছে। আর একটা প্রশ্ন। আপনি কিন্তু রাগ করতে পারবেন না। এবং কাউকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনোদিন বলতে পারবেন না।— আমি আপনাকে এই প্রশ্ন করেছি।'

'আচ্ছা, শুনি তোর প্রশ্ন।'

'আপনি নিজে কি সত্যি কথা বলেন, না মিথ্যা বলেন?'

'আমি বেশির ভাগ সময় মিথ্যা বলি— কিন্তু তোর প্রশ্নের জবাবে সত্যি কথাই বলব।'

'কেন?'

'কারণ আমি বুঝতে পারছি— প্রশ্নটার সত্যি উত্তর জানা তোর দরকার। এর উপর হয়তো অনেক কিছু নির্ভর করছে। প্রশ্নটা কী?'

নীতু কিছুক্ষণ ইতস্তত করে বলল, 'আপনি বাবাকে বেশি পছন্দ করেন, না মাকে বেশি পছন্দ করেন?''

জহির হাসতে হাসতে বললেন, 'তুই খুব বুদ্ধিমতীর মতো প্রশ্ন করেছিস। একটি অশালীন প্রশ্ন করেছিস শালীন ভঙ্গিতে। জবাবটা এখন তোকে দেব। সত্যি জবাব। তোর মাকে আমি পছন্দ করি না।'

'কেন?'

'তোর মা মনজুরকে একটি যন্ত্র হিসেবে গ্রহণ করেছে। যন্ত্রের ভেতরের মানুষটাকে বের করার কোনো চেষ্টা করে নি। কাজটা জটিল নয়। সহজ কাজ। এই সহজ কাজ যে মেয়ে পারবে না— তাকে আমি পছন্দ করব কেন?'

'কাজটা সহজ ভাবছেন কেন চাচা? হয়তো কাজটা সহজ না। কঠিন কাজ।'

'খুব কঠিন বলে তো আমার মনে হয় না। তুই সেদিনের বাচ্চা মেয়ে। তুই পারিস। তুই পারলে তোর মা পারবে না কেন?'

'আমি পারি?'

'হ্যাঁ, তুই পারিস। তোর বাবার আমাদের সঙ্গে বেড়াতে আসার কোনোই কারণ ছিল না। কোনো পরিকল্পনাও ছিল না। তুই কিছু একটা করেছিস— যাতে সঙ্গে সঙ্গে সে রওনা হয়েছে। তোর মা এটা পারে না।'

'দোষটা হয়তো বাবার। বাবা হয়তো মার কাছে যন্ত্র হিসেবেই থাকতে চান।'

'তাও হতে পারে।'

নীতু থেমে থেমে বলল, 'বাবা যে কত ভালো এটা কেউ জানে না।'

'আমি জানি। যারা তার সঙ্গে মিশেছে তারা জানে। তোদের ড্রাইভার ইসমাইল জানে। তোর বাবা যদি এখন ইসমাইলকে বলে— ইসমাইল একটা চলন্ত ট্রাকের নিচে ঝাঁপিয়ে পড় - সে সঙ্গে সঙ্গে তাই করবে। করবে না?'

'হ্যাঁ করবে।'

'তোর বাবার চরিত্রের এই দিকটি সম্পর্কে তোর মা কেন জানবে না?'

'আপনি মাকে কখনো বলেছেন এসব?'

'না।'

'কেন বলেন নি?'

'আমার উপদেশ দিতে ভালো লাগে না। তাছাড়া আমি হলাম জিপসী। জিপসীরা উপদেশ দেয় না।'

'জিপসীরা কী করে?'

'তারা শুধু শোনে এবং দেখে। প্রশ্ন শেষ হয়েছে, না আরো কিছু আছে?'

'আরো আছে। আর মাত্র একটা। দি লাস্ট ওয়ান।'

'বলে ফেল।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বাবা আপনাকে বেশি পছন্দ করতেন— না জোছনা চাচিকে বেশি পছন্দ করতেন?'

'সেটা তো মা আমার জানার কথা না— তোর বাবার জানার কথা। তাকেই জিজ্ঞেস কর।'

'বাবাকে জিজ্ঞেস করতে পারব না।'

'আমার কী মনে হয় জানিস? আমার মনে হয় খটকা যখন লেগেছে তখন জিজ্ঞেস করাই ভালো। তোর বাবা সত্যি জবাব দেবে। সে মিথ্যা বলে না।'

'তাহলে আপনি একটু বাবাকে ডেকে দিন।'

'প্রশ্ন করার জন্যে এটা কি খুব ভালো সময় মা? চারদিকে ঝামেলা হচ্ছে।'

'আমার তো মনে হয় চাচা এটাই সবচে' ভালো সময়। দুঃসময়ে আপনা-আপনি অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। বাবার সঙ্গে আমার কিছু জটিল কথা ছিল। তা বলে ফেলেছি। আরো কিছু বলব। যাতে সব Crystal clear হয়ে যায়। আপনি বাবাকে খুঁজে এনে দিন।'

'আচ্ছা দিচ্ছি। তুই বরং গাড়িতে উঠে বোস— অবস্থা আমার কাছে ভালো মনে হচ্ছে না।'

'আমি গাড়িতে বসতে পারব না। অসহ্য গরম!'

'তাহলে তোর মাকে ডেকে আন।'

নীতু মাকে ডাকতে গিয়ে দেখল, তিনি কাঁদছেন। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। মুখে রুমাল চাপা দিয়ে আছেন। মাঝে মাঝে তাঁর শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে। নীতু ডাকল, 'মা!'

রেবেকা মুখ তুলে সহজ গলায় বললেন, 'কি?'

'নিচে আস মা। গাছের নিচে বস। ভালো লাগবে। বাতাস আছে।'

রেবেকা বললেন, 'না।'

তিনি আবার রুমালে মুখ ঢাকলেন। তাঁর শরীর ফুলে ফুলে উঠতে লাগল।

AMARBOI.COM

জহির মনজুরকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। পাচ্ছেন না। পাজেরো জিপটার পাশ দিয়ে যাবার সময় সানগ্লাস পরা যুবক আবার মাথা বের করে বলল, 'স্যার, লেটেস্ট খবর কি? এনি ডেভেলপমেন্ট।'

জহির থমকে দাঁড়ালেন। এই ছেলেটি তাঁকে নিয়ে এক ধরনের মজা করছে। মজার ধরনটা তিনি জানেন না। তিনি লক্ষ করছেন— গাড়িতে বসে থাকা তিনজন তরুণীর মুখেই চাপা হাসি।

জহির বললেন, 'আমার কাছে কোনো খবর নেই।'

'সে কি! আপনি নিগোসিয়েশন টেবিলে নেই?'

জহির জবাব দিলেন না। তরুণী তিনজন আর হাসি চেপে রাখতে পারছে না। পেছনের দুজনের একজন মুখে শাড়ির আঁচল চাপা দিল। তিনি এগিয়ে গেলেন। হাসির শব্দ শুনতে শুনতে তিনি এগুচ্ছেন। তাঁকে নিয়ে এরা কী রসিকতা করে তাঁর জানতে ইচ্ছা করছে।

সানগ্লাস পরা যুবকের নাম মোরশেদ। সে জহিরের নাম দিয়েছে 'মিস্টার গাধু।' গাধার মতো গম্ভীর ভঙ্গিতে হাঁটে বলেই গাধু। মোরশেদ রসিক মানুষ হিসেবে বন্ধুমহলে পরিচিত নয়। আজ এই তিন তরুণীর মধুর সঙ্গে তার রসবোধের দরজা-জানালা খুলে গেছে। জহির চোখের আড়াল হতেই মোরশেদ বলল, 'গাধু বাবাজি কেমন চোখ পিট পিট করছিল দেখেছ?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তরুণী একজন বলল, 'চোখ পিটপিট করছিল? লক্ষ করি নি তো।'

'শুধু যে চোখ পিটপিট করছিল তা-না। লেজও নাড়ছিল।'

'লেজ নাড়ছিল?'

'অদৃশ্য লেজ দিয়ে মাছি তাড়াচ্ছিল। হা-হা-হা।'

সবাই হাসিতে যোগ দিল। তিন তরুণীর একজন বলল, 'মোরশেদ তোমার পায়ে পড়ি, আর হাসিও না।'

'পায়ে পড়লে হবে না। আমার লেজে পড়। লেজে পড়লে কনসিডার করতে পারি।'

'হা-হা-হা।'

'হো-হো-হো।'

'হি-হি-হি।'

'আমরা বড্ড হাসছি। লোকজন কেমন করে যেন তাকাচ্ছে।'

'তাকাক না। আমরা হাসব এবং লেজ নাড়ব।'

'হা-হা-হা।'

'হি-হি-হি।'

৭

বুড্ডার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। মাথাভর্তি কাঁচা-পাকা চুল। রোগা-লম্বা মানুষ। ঝকঝকে চোখের তারা। হাঁটে খানিকটা কুঁজো হয়ে। বুড্ডা এখানে উপস্থিত হয়েছে ঘণ্টাখানিক আগে। এই এক ঘণ্টায় সে খোঁজখবর করেছে। অবস্থা বিবেচনা করেছে। বড় কোনো কাজ বিবেচনা ছাড়া করা যায় না। এখানকার কাজটা বড়। শুধু বড় না— বেশ বড়। এখান থেকে ফায়দা তুলতে পারলে মোটা ধরনের ফায়দা তোলা যাবে। তবে সমস্যা একটাই— সে একা। তার সঙ্গে দলবল নেই। শুধু ছোটন থাকলেও হত। ছোটনও নেই। ওসি সাহেবকে সে মিথ্যা বলে নি। আসলেই সে একা। এত বড় ব্যাপার সামাল দেয়া তার একার পক্ষে কষ্ট— তবু চেষ্টা করতে হবে। এমন সুযোগ হাতছাড়া করতে দেয়া যায় না। ইস্, শুধু যদি ছোটন থাকত! তবে খবর পাঠানো হয়েছে। সন্ধ্যা নাগাদ ঝামেলাটা ধরে রাখতে পারলে— ছোটন এসে পড়বে।

আন্দোলন হাতের মুঠোয় নিয়ে নিতে হবে। সেটা খুব জটিল হবে না। ওসি ফরিদউদ্দিন বাগড়া দিতে পারে। এই লোকটিও ধুরন্ধর। সমানে সমান। বুড্ডা সিগারেট ধরিয়ে চিন্তিত মুখে লাশ দুটির পাশে ঝিম ধরে বসে আছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে একটা নাটক করবে। নাটকের ক্ষেত্র তৈরি করা দরকার। ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে।

খাটিয়া চলে এসেছে। লাশ খাটিয়ায় তোলা হবে। মসজিদের ইমাম সাহেবও সঙ্গে আছেন। তিনি পুরোপুরি হকচকিয়ে গেছেন। বিড়বিড় করে কি যেন পড়লেন— কোনো দোয়া হবে। তারপর এগিয়ে এলেন লাশ তোলার জন্যে। বুড্ডা বলল, 'কী করেন?'

ইমাম সাহেব থমকে গেলেন।

বুড্ডা বলল, 'লাশে হাত দিবেন না!

ইমাম সাহেব বললেন, 'গোর দেয়া হবে না?'

'হবে, সময় হলেই হবে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইমাম সাহেব আশপাশে তাকালেন। কেউ কিছু বলল না। সবাই তাকিয়ে আছে বুড্ডার দিকে। বুড্ডা থু করে একদলা থুতু ফেলে বলল— 'আগে বিচার। তারপর লাশ তোলাতুলি।'

বুড্ডার কথা চারদিকে চাপা আলোড়ন তুলল। বুড্ডা এবার উঠে দাঁড়াল। থমথমে গলায় বলল, 'আমরা বিচার চাই। এই দুই মাসুম বাচ্চার জন্য দুই লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ।'

'ঠিক বলছেন! ঠিক বলছেন!'

'যে কুত্তার বাচ্চা এই দুই মাসুমের খুন করছে তারে পুলিশ আগে ধরব— তারপর অন্য কথা।'

'সঠিক বলছেন। সঠিক বলছেন।'

বুড্ডা গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, 'লাশ এইখান থাইক্যা সরাইয়া নিলে কিছুই হইব না। পুলিশ কিছুই করব না। বুঝছেন আপনেরা?'

'বুঝছি।'

'আপনেরা কি চান বিচার হউক?'

'চাই। চাই।'

'যদি চান তা হইলে থাকেন আমার পিছে। দেখেন বিচার হয় কিনা। বলেন— আল্লাহু আকবার।'

'আল্লাহু আকবার।'

বুড্ডা তার রক্তের মধ্যে এক ধরনের কাঁপন অনুভব করছে। সে জানে এই কাঁপন অন্যরাও বোধ করছে। মানুষগুলোকে এখন একটা ঘোরের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। ভয়ংকর কিছু করতে হবে। তাহলে ঘোর চলে আসবে। ভয়ংকর কী করা যায়? ভাঙচুর করা যায়। সব কটা গাড়ির কাচ ভেঙে দেয়া যায়— তবে এতে অনেকেই মনে করতে পারে, ব্যাপারটা উদ্দেশ্যমূলক। তারা পিছিয়ে পড়তে পারে। প্রতিটি কাজ করতে হবে সাবধানে।

বুড্ডা নিচু হয়ে একটা থান ইট তুলে নিল। তার দেখাদেখি অনেকেই ইট তুলে নিল। বুড্ডা বিকট চিৎকার করল—

'নারায়ে তকবির!'

প্রচণ্ড প্রতিধ্বনি হল—'আল্লাহু আকবার।'

ফরিদউদ্দিনের ওয়াকিটকি কাজ করছে না। তাকে দেখে মনে হচ্ছে সে প্রচণ্ড ভয় পেয়েছে। থানায় গিয়ে খবর দেয়া দরকার। পুলিশ ফোর্স লাগবে। মনে হচ্ছে— ঢাকা থেকে রিজার্ভ পুলিশ আনতে হবে। পিপাসায় তার বুক শুকিয়ে গেছে। এক গ্লাস পানি দরকার। সঙ্গের সিগারেটও শেষ হয়ে গেছে। মোটর সাইকেলে করে সেকেন্ড অফিসারকে থানায় পাঠিয়ে দেয়া যায়। সে থাকবে। তার যাওয়া ঠিক হবে না।

ফরিদউদ্দিন মোটর সাইকেলের দিকে গেলেন। সেকেন্ড অফিসার কবির আহম্মদ মুখ শুকনো করে মোটর সাইকেলের কাছে বসে আছে। কবির বলল, 'স্যার, অবস্থা তো খারাপ!'

'হুঁ খারাপ। খুব খারাপ।'

'কী করব? থানায় চলে যাব?'

'হুঁ। আর্মড পুলিশ লাগবে। ম্যাজিস্ট্রেট লাগবে। গুলির হুকুম দিতে হতে পারে।'

'স্যার, বুড্ডা কি একা, না তার সাথে দলবল আছে?'

'বুঝতে পারছি না। একা বলে মনে হচ্ছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিপদের সময় কিছুই কাজ করে না। মোটর সাইকেলও স্টার্ট নিচ্ছে না। স্টার্ট নিয়ে খানিকক্ষণ ভটভট করে থেমে যায়।

ফরিদউদ্দিন লক্ষ করল, বুড্ডা এগিয়ে আসছে। বুড্ডার চোখ লাল। হাতে থান ইট। পেছনে বিশাল জনতা! ফরিদউদ্দিনের গা বেয়ে শীতল স্রোত বয়ে গেল। বুড্ডা বলল, 'ওসি সাহেব, মনে হয় পালাইয়া যাওয়ার মতলব করতেছেন!'

ফরিদউদ্দিন চুপ করে রইলেন। এখন কথা বলা অর্থহীন। বুড্ডা খনখনে গলায় বলল, 'ওসি সাবের মোটর সাইকেল পুড়াইয়া দেও। যেন পালাইতে না পারে। বিচার না হওয়া পর্যন্ত যাওয়া-যাওয়ি নাই।'

মোটর সাইকেলে আগুন দিয়ে দেয়া হল। কালো ধোঁয়া উঠছে। বুড্ডা ইট হাতে দাঁড়িয়ে আছে। তার পেছনের মানুষদের মধ্যে ঘোর তৈরি করার জন্যে এই কাজটা দরকার ছিল। সবাই জানুক, সে কোনো কিছুরই পরোয়া করে না।

বুড্ডা বলল, 'আসেন দেখি আপনারা, আসেন আমার সাথে।'

সবাই ছুটছে বুড্ডার পেছনে। বুড্ডার পরিকল্পনা হল— রাস্তার দুই দিকই আটকে দিতে হবে। গাছ কেটে রাস্তায় ফেলতে হবে। ট্রাক এনে আড়াআড়ি রেখে চাকার হাওয়া ছেড়ে দিতে হবে। রাস্তার মাঝখানে বাস এনে উল্টে ফেলে দিতে হবে। রাস্তা পুরোপুরি বন্ধ করে দিলে চট করে পুলিশ এসে উপস্থিত হবে না। সময় পাওয়া যাবে। ইতিমধ্যে ছোটন এসে পড়বে। ছোটন এসে উপস্থিত হলে আর চিন্তা করার কিছু থাকবে না। চিন্তার দায়দায়িত্ব ছোটন নিয়ে নিবে।

ফরিদউদ্দিন লক্ষ করলেন, সেকেন্ড অফিসার কবিরের মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। এটাই স্বাভাবিক। অল্প বয়স। এত বড় ঝামেলায় এর আগে নিশ্চয়ই পড়ে নি। এই ঝামেলা কতদূর গড়াবে কেউ জানে না। মৃত্যু চোখের সামনে দোল খাচ্ছে। বুড্ডা যদি বলে বসে— 'মার পুলিশ মার! সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু। বুড্ডা কি এত বড় ভুল করবে? বুড্ডা প্রফেশনাল। প্রফেশনালরা ভুল করে না। ফরিদউদ্দিন চোখের ইশারায় কবিরকে শান্ত থাকতে বললেন। হঠাৎ উঠে যেন দৌড়াতে শুরু না করে।

'শুনুন, আপনি ওসি না? পুলিশের লোক না?'

পুলিশের পরিচয় ফরিদউদ্দিন এখন গোপন রাখতে চান। তার এখন যা করণীয় তা হচ্ছে দ্রুত সরে পড়া। অবিশ্বাস্য ঝামেলা এখন বাধবে। এই ঝামেলা তাঁর আটকানোর পথ নেই। একটা ক্ষীণ সম্ভাবনা— যদি নেতৃত্বের হাত বদল হয়। আরেকজন কেউ বুড্ডাকে চ্যালেঞ্জ করে নেতৃত্ব নিতে আসে। সেই সম্ভাবনা কতটুকু তিনি বুঝতে পারছেন না। চেষ্টা নেয়া যায়। তাতেও সময় লাগবে। সেই সময় কি তাঁর হাতে আছে?

'কথা বলছেন না কেন? আপনি ওসি না?'

ফরিদউদ্দিন মহিলার দিকে তাকালেন। বিপুল আকৃতি। রোজ কতটা করে মাছ-মাংস খেয়ে এই চেহারা বানিয়েছে কে জানে। ফরিদউদ্দিন ক্লান্ত গলায় বললেন, 'হ্যাঁ।'

'ডাবওয়ালাকে দেখেছেন? শুকনামতো একটা ছেলে। পাঁচশ টাকার একটা নোট দিয়েছিলাম। নিয়ে সটকে পড়েছে। বলেছে ভাঙতি নিয়ে আসবে।'

'ও।'

'ও মানে কি? আপনি ও বলে ছেড়ে দেবেন? পুলিশ হয়েছেন কী জন্যে? 'ও' বলার জন্যে? খুঁজে বের করুন হারামজাদাকে— এই লোকেলিটির কেউ হবে। আমি মিসেস মেহফুজ। আমার হাসবেন্ড হলেন . . .

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাসবেন্ড কে তা শোনা গেল না। হৈচৈ-এ চাপা পড়ে গেল। প্রচণ্ড শব্দে বোমা ফাটল।

ভদ্রমহিলা বললেন, 'কীসের শব্দ হল? টায়ার ব্রাস্ট করেছে নাকি?'

'বুঝতে পারছি না। বোমাও হতে পারে।'

'আপনি গাছের মতো দাঁড়িয়ে আছেন কেন? আপনাকে কী বললাম? লোকটাকে খুঁজে বের করুন। খালি গা— পরনে সবুজ লুঙ্গি। শুনুন আমি হচ্ছি মিসেস মেহফুজ, আমার হাসবেন্ড হলেন . . .

'আচ্ছা।'

ফরিদউদ্দিন এগুচ্ছেন। বোমার শব্দে তিনি নিশ্চিত হয়েছেন— বুড্ডার লোকজন চলে এসেছে। তার প্রচণ্ড পানির পিপাসা হচ্ছে। ডাবওয়ালার কথায় পানির পিপাসা আরো বেড়েছে। একটা ডাব খেতে পারলে হত।

৮

মোরশেদ শিস দিচ্ছে। তার পাশে বসা তরুণী বলল, 'এই শব্দ হল কীসের? বোমা নাকি?'

'হয় বোমা, নয় পটকা। দাঁড়াও, মিস্টার গাধু আসুক, তাকে জিজ্ঞেস করব।'

'শোন, আমার ভয়-ভয় লাগছে।'

মোরশেদ গুনগুন করে গাইল— 'নাই নাই ভয়, হবে হবে জয়।'

পেছনের তরুণীদের একজন বলল, 'ভুল সুর ভুল কথা।'

মোরশেদ সঙ্গে সঙ্গে কথা উল্টে দিয়ে গাইল—

'নাই নাই জয়, হবে হবে ভয়।'

তিন তরুণী আবার হেসে উঠল। এর মধ্যে দেখা গেল জহির যাচ্ছে। তারা সবাই গাড়ির জানালা দিয়ে মুখ বের করল। মোরশেদ গম্ভীর মুখে বলল, 'স্যার কোথায় যাচ্ছেন?'

'আমাকে বলছেন?'

'জ্বি স্যার।'

জহির কী বলবেন ভেবে পেলেন না। ওরা তাকে নিয়ে এক ধরনের মজা করছে। প্রচণ্ড বিপদেও এরা মজা খুঁজে পাচ্ছে। সেই মজা তিনি যোগান দিচ্ছেন। তাঁর চেহারায় তাঁর চালচলনে কমিক কিছু আছে তা তিনি আগে কখনো বুঝতে পারেন নি। আশ্চর্য ঘটনা তো বটেই!

'আমি কোথায় যাচ্ছি জানতে চাচ্ছেন?'

'জ্বি স্যার।'

'কোথাও না। বাচ্চা দুটির ডেডবডির কী অবস্থা দেখতে যাচ্ছি।'

'শব্দ কীসের হল?'

জহির বললেন, 'জানি না। হয়তো বোমার শব্দ।'

মোরশেদ গলার স্বর আরো গম্ভীর করে বলল, 'স্যার, আমার ধারণা বোমা না। অন্য কিছু। মনে হয় কেউ একজন পাদ দিয়েছে।'

জহির হতভম্ব হয়ে গেলেন। এ ধরনের কথা কেউ একজন তাঁকে বলতে পারে এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধরণাই তাঁর ছিল না। মেয়ে তিনটাও হকচকিয়ে গেছে। তবে তা সাময়িক। তারা হাসতে শুরু করেছে।

প্রচণ্ড হাসির শব্দে পাজেরো জিপ পর্যন্ত কাঁপতে শুরু করেছে।

জহির এগিয়ে গেলেন। আর এখানে দাঁড়িয়ে থাকার কোনো অর্থ হয় না।

ডেডবডি দুটির কাছে এখন কেউ নেই। দুটি মৃতদেহই কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে। অল্প কিছু লাল বড় বড় পিঁপড়ে ঘোরাফেরা করছে—। এরা খবর নিতে এসেছে। বিশাল পিপীলিকা বাহিনী অপেক্ষা করছে। খবর পাওয়ামাত্রই তারা ছুটে আসবে।

জহির কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পিঁপড়া দেখলেন— ফিরে যেতে ইচ্ছা করছে না। পাজেরো জিপের পাশ দিয়ে তাঁকে যেতে হবে। সানগ্লাস পরা ছেলেটি আবারো হয়তো কিছু বলবে। এবার সে কী বলবে?'

'ভাই, একটু শুনুন।'

জহির তাকালেন। কালো রঙের ছোট্ট একটা মরিস মাইনর গাড়ির ভেতর থেকে হাত ইশারা করে একজন মহিলা তাঁকে ডাকছেন।

'আমার হাসবেন্ড অনেকক্ষণ হয়েছে গেছেন— এখনো ফিরে আসছেন না। ড্রাইভারকে পাঠিয়েছিলাম, সেও আসছে না। আমার ছেলেটা খুব ভয় পাচ্ছে। ওর হার্টের অসুখ আছে – ভয় পেলে ওর প্রচণ্ড সমস্যা হয়।'

আট–ন বছরের বাচ্চা ছেলে। মার কোলে শুয়ে আছে। খুব ঘামছে। মুখ নীলবর্ণ হয়ে গেছে।

জহির বললেন, 'খোকা, কোনো ভয় নেই। আমি তোমার বাবাকে খুঁজে বের করছি।

ভদ্রমহিলা বললেন, 'আপনি ভিড়ের মধ্যে ওকে চিনবেন না। আপনি এখানে থাকুন। আমার খোকা কেমন জানি করছে।'

'পানি দিয়ে ওর মুখটা মুছিয়ে দিন।'

'পানি নেই। বোতলের পানি সব শেষ হয়ে গেছে।'

'আচ্ছা, আমি পানি নিয়ে আসছি। এক্ষুনি আসছি।'

'পানি আনতে হবে না। প্লিজ আপনি এখানে থাকুন।'

'আমি যাব আর আসব। গোলমাল পুরোপুরি না থামা পর্যন্ত ছেলের পাশ থেকে নড়ব না।'

'থ্যাংক য়্যু।'

'খোকা তুমি হাস তো। বিপদের সময় ছেলেদের শক্ত হতে হয়। তুমি তোমার মাকে সাহস দাও। পারবে না?'

'পারব।'

'মাকে বল— কোনো ভয় নেই। মাকে সাহস দাও। এই ফাঁকে আমি পানি নিয়ে আসছি।

জহির ছুটে চলে গেলেন। খোকা মার দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'উনাকে আমি কী ডাকব মা? চাচা ডাকব?'

'না উনাকে মামা ডাকবে। আমি মনে মনে তাঁকে ভাই ডেকেছি।'

'তোমার কি ভয় করছে মা?'

'করছে।'

'আমার করছে না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৯

নীতু বলল, 'কী হচ্ছে বাবা?'

মনজুর সাহেব বললেন, 'মনে হচ্ছে আমরা বড় ধরনের সমস্যায় পড়ে গেছি।'

'এখন কী হবে?'

'দেখি কী হয়। তোর কি ভয় লাগছে?'

'হ্যাঁ।'

'ভয়ের কিছু নেই।'

'আমি গাড়িতে গিয়ে বসব, বাবা?'

'না। ওরা গাড়ি ভাঙচুর করতে পারে। গাড়িতে না বসাই ভালো।'

'ওরা এখন গেছে কোথায়?'

'রাস্তা আটকাতে গেছে।'

'এরকম করছে কেন?'

'মানুষ ক্ষেপে গেলে কী করে সে নিজেও জানে না।'

'তোমার কি ভয় লাগছে না, বাবা?'

'নিজের জন্যে লাগছে না। তোর জন্যে আর তোর মার জন্যে লাগছে।'

'তোমার কি ধারণা ভয়ংকর কিছু ঘটবে?'

'ঘটতেও পারে। একটা লোককে দেখছি সবাইকে ক্ষেপিয়ে দিচ্ছে। তার মতলব ভালো না। বদ মতলবে ক্ষেপাচ্ছে— কাজেই ভয়ংকর কিছু ঘটতে পারে।'

নীতু বলল, 'বাবা তুমি কি আমার উপর রাগ করেছ?'

মনজুর সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, 'রাগ করব কেন?'

'এই যে আমি তোমাকে জোর করে নিয়ে এসেছি— না আনলে তো তুমি এই সমস্যায় পড়তে না।'

মনজুর শব্দ করে হাসলেন। মনে হল এত আনন্দের হাসি তিনি অনেকদিন হাসেন নি। নীতু খুবই অবাক হল— এমন পরিস্থিতিতে কেউ–একজন হাসতে পারে— সে চিন্তাও করতে পারছে না।

মনজুর বললেন, 'জহির কোথায়?'

'জানি না কোথায়। আমি উনাকে পাঠিয়েছিলাম তোমাকে খুঁজে আনতে। আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছিলাম।'

'কী প্রশ্ন?'

'এখন থাক বাবা। এখন আর কোনো প্রশ্ন–ট্রশ্ন করতে ইচ্ছা করছে না।'

'এখানে কি হচ্ছে না হচ্ছে তা নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনো দরকার নেই। বরং চারদিকে কি হচ্ছে না হচ্ছে ভুলে থাকার চেষ্টা কর।'

'ভুলে থাকতে পারছি না, বাবা। খুব ভয় লাগছে।'

'কী করলে তোর ভয় কাটবে?'

তুমি আমার হাত ধরে থাক। হাত ধরে থাকলে ভয় কমবে।'

মনজুর মেয়ের হাত ধরলেন। লক্ষ করলেন, মেয়ে অল্প অল্প কাঁপছে। নীতু বলল, 'বাবা, তুমি মাকে ডেকে নিচে নিয়ে আস। মাও নিশ্চয়ই ভয় পাচ্ছে।'

'আমি ডাকলে তোর মা আসবে না।'

'তবু তুমি ডাক। মা খুব কাঁদছিল বাবা। একা একা গাড়িতে বসে কাঁদছিল।'

'একা একা কাঁদাই তো ভালো। দলবল নিয়ে কাঁদা যায় নাকি?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তুমি মাকে নিয়ে আস, বাবা।'
'আচ্ছা দেখি ডেকে।'
'বাবা প্রশ্নটা করেই ফেলি। তুমি কি জোছনা চাচির প্রেমে পড়েছিলে?'
মনজুর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'হ্যাঁ। আর কিছু বলবি?'
'না।'

মনজুর স্ত্রীকে ডাকার জন্যে গাড়িতে উঠলেন। স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে কোমল গলায় বললেন, 'রেবেকা!'
'কি!'
'খিদেয় প্রাণ বের হয়ে যাচ্ছে। তোমার কাছে কি চকলেট আছে?'
রেবেকা চকলেটের প্যাকেট বের করলেন।
'পানির বোতলটা দাও।'
রেবেকা পানির বোতল এগিয়ে দিলেন।
'পানি কি এইটুকুই, না আরো আছে?'
'আরো আছে। তুমি খাও।'
মনজুর তৃষ্ণার্তের মতো পানি শেষ করলেন।
'রেবেকা!'
'হুঁ।'
'তুমি নিচে গিয়ে মেয়ের পাশে দাঁড়াও। ও ভয় পাচ্ছে।'
'আমার কোথাও যেতে ইচ্ছা করছে না।'
'গাড়ি থেকে নিচে নামা দরকার। এরা গাড়ি ভাঙচুর করবে বলে আমার ধারণা।'
'করুক ভাঙচুর।'
'নীতু খুব ভয় পাচ্ছে। তুমি হাত ধরে ওর পাশে দাঁড়ালে ও সাহস পাবে।'
'তুমি দাঁড়ালেই সাহস পাবে। তুমি দাঁড়িয়ে থাক।'
'আমি দাঁড়াতে পারব না। আমাকে ঐ লোকটার এনকাউন্টার করতে হবে।'
'কার এনকাউন্টার করতে হবে?'
'নাম হচ্ছে বুড্ডা। বদ লোক বলে মনে হচ্ছে— সবাইকে ক্ষেপিয়ে তুলছে। ভয়ংকর কিছু যদি ঘটে ওর জন্যেই ঘটবে।'
রেবেকা তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, 'ভয়ংকর কিছু ঘটলে ঘটবে। তোমার কী দায়িত্ব?'
'আমার দায়িত্ব আছে। এক অর্থে সমস্যার শুরু আমি করেছি। সব মিটেই গিয়েছিল। লাল টাই-পরা এক লোকের সঙ্গে হঠাৎ কিছু কথাবার্তা হল . . .'
'তোমার প্রয়োজন ছিল কি কথা বলার?'
'হ্যাঁ ছিল। আমাদের সবারই দায়িত্ব আছে। সেই দায়িত্ব পালন করতে হয়। মা হিসেবে তোমার দায়িত্ব হচ্ছে নীতুর পাশে দাঁড়ানো।'
রেবেকা তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, 'স্বামী হিসেবে তোমার কি কোনো দায়িত্ব ছিল না? তুমি কি তোমার দায়িত্ব পালন করেছ? রাতের পর রাত আমার ঘুম হত না। তুমি কি কখনো তার কারণ জানতে চেয়েছ?'
'না।'
'তুমি বন্ধু-পত্নীকে নিয়ে জোছনা দেখার জন্যে ছাদে উঠে বসে থাকতে। জোছনা কি আমি দেখতে পারি না? আমার কি ইচ্ছা করে না তোমার হাত ধরে জোছনা দেখতে?'
'রেবেকা, তোমার মেয়েটা একা নিচে দাঁড়িয়ে আছে।'
'থাকুক। একা দাঁড়িয়ে অভ্যাস হোক। কে জানে তাকেও হয়তো আমার মতো একা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একা জীবন কাটাতে হতে পারে।'

রেবেকা কাঁদতে শুরু করেছেন। শব্দ করে বাচ্চা মেয়ের মতো কাঁদছেন।

মনজুর স্ত্রীর মাথায় হাত রাখলেন। রেবেকা আরো শব্দ করে কেঁদে উঠলেন। আরেকটা বোমা ফাটল। মনজুর তাঁর কালো ব্যাগ খুলতে শুরু করলেন। তিনি এখন তাঁর নীল কোটটা গায়ে দেবেন। কারণ তাঁর মন বলছে— সময় হাতে বেশি নেই। জহিরের সিক্সথ সেন্সের চেয়ে তাঁর নিজের সিক্সথ সেন্স অনেক প্রবল। এই তথ্য জহির জানে না। রেবেকা কান্না থামিয়ে তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, 'এই গরমে কোট গায়ে দিচ্ছ কেন?'

'এমনি।'

'না এমনি না। অকারণে তুমি কিছু কর না। তোমার কোটের পকেটে কী আছে?'

'একটা রিভলবার আছে।'

'তোমার উদ্দেশ্যটা কী, তুমি কী করতে চাও?'

'ঐ লোকটাকে আটকাতে হবে। ও ভয়ংকর কিছু করবে।'

'ও যা ইচ্ছা করুক।'

রেবেকা শক্ত করে স্বামীর হাত চেপে ধরলেন। এমন কঠিনভাবে ধরলেন যে, মনজুরের হাত ব্যথা করতে লাগল। বুড্ডা ফিরে আসছে। তার পেছনে বিশাল জনতা। সবাই দৌড়াচ্ছে। তারা রাস্তার এক মাথায় দৌড়াচ্ছে। এখন যাচ্ছে অন্য মাথায়।

মনজুর স্ত্রীর হাত ধরে নিচে নেমে এলেন। নীতু থরথর করে কাঁপছে। মনজুর মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এত ভয় করলে পৃথিবীতে টিকতে পারবি না। আমার দিকে তাকিয়ে দেখ, আমি কি ভয় পাচ্ছি?'

'না।'

'তাহলে তুই কেন পাচ্ছিস?'

'বুঝতে পারছি না, বাবা— আমার মনে হচ্ছে আমি অজ্ঞান হয়ে যাব।'

'রেবেকা, তুমি তোমার মেয়েকে শক্ত করে ধরে থাক।'

নীতু বলল, 'জহির চাচা কোথায় বাবা?'

'আছে কোথাও। যথাসময়ে সে উপস্থিত হবে।'

জহির ছেলেটির মুখে পানি ছিটিয়ে দিচ্ছে। খুব কাছেই বিকট শব্দ হল। জহির বললেন, 'খোকা, ভয় নেই। এই দেখ, আমি তোমার হাত ধরে আছি। 'আব্বু কোথায়?'

'আব্বু আসবে। এক্ষুনি আসবে। তোমার কি ভয় লাগছে?'

'না।'

'বাহ্, এই তো সাহসী ছেলের মতো কথা।'

বুড্ডার ভাগ্য অসম্ভব ভালো। ছোটন চলে এসেছে। একা আসে নি, সঙ্গে আরো দুজনকে এনেছে। চিন্তাভাবনার দায়দায়িত্ব এখন ছোটনের। বুড্ডার আর কোনো দায়িত্ব নেই। ছোটন এসেই হাল ধরেছে। ঠিক করেছে, আটকে পড়া গাড়ি থেকে বেছে বেছে কয়েকজনকে ধরে দূরে কোথাও নিয়ে যাওয়া হবে। হোস্টেজ। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত এদের ছাড়া হবে না।

বেছে বেছে গাড়ির কিছু ড্রাইভার সরাতে হবে। মেয়েছেলেদের গায়ে হাত দেয়া যাবে না। মেয়েছেলের গায়ে হাত পড়লে পাবলিক উল্টা ক্ষেপে যাবে। ছোটনের আবার এই দোষ আছে— মেয়েছেলের বুকে হাত দেয়া। ছোটনকে সাবধান করে দিতে হবে।

ভালো বুদ্ধি। এরচে' ভালো বুদ্ধি আর কিছু হয় না। ছোটন গাড়ি নিয়ে এসেছে। গাড়িতে করে এদের সরিয়ে ফেলা হবে। মালদার সব পার্টি। এমন পার্টি যেন হেসেখেলে এক লাখ দিয়ে দিতে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাজ সারতে হবে দ্রুত। পুলিশ এসে ঘিরে ফেলার আগেই।

বুড্ডা ছোটনের সঙ্গে কানে কানে কি যেন বলল। তারপর ইট হাতে ছুটতে লাগল। তার সঙ্গে শ দুই মানুষ ছুটছে। প্রত্যেকের হাতে ইট।

বুড্ডা বলল, 'ভাঙ দেখি, গাড়ি ভাঙ। বড়লোকের গাড়ি সব শেষ কর দাও।'

'নারায়ে তকবির।'

'আল্লাহু আকবার।'

ঝনঝন শব্দে কাচ ভাঙছে। এক একজন উত্তেজনায় প্রায় পাগল হয়ে যাচ্ছে। গাড়ি ভাঙায় এত আনন্দ!

১০

জহির বললেন, 'আসুন, আমরা গাড়ি থেকে নেমে যাই— ওরা গাড়ি ভাঙছে। খোকাকে আমার কোলে দিন।'

ভদ্রমহিলা কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, 'দেখুন আমার খোকা যেন কেমন করছে।'

'আপনি কোনোরকম ভয় পাবেন না। সব ঠিক হয়ে যাবে। বাবা, তুমি শক্ত করে আমাকে ধরে রাখ।'

খোকা শক্ত করে জহিরের গলা জড়িয়ে ধরল।

'তোমার নাম কি খোকা?'

'আবীর।'

'বাহ্, কী সুন্দর নাম! আবীর। আবীর, তোমার কি ভয় করছে?'

'না।'

'এই তো সাহসী ছেলে।'

জহিরের বয়স হয়েছে। আবীরকে কোলে নিয়ে হাঁটতে তাঁর কষ্ট হচ্ছে। হোক কষ্ট, এই ছেলেটিকে ভালো করে তুলতে হবে। নীতুদের কথা এই মুহূর্তে না ভাবলেও হবে। নীতুর পাশে তার বাবা আছে। ইস্পাতের মতো মানুষ। নীতুর এখন তাঁকে দরকার নেই—।

'আবীর তুমি কোন ক্লাসে পড়?'

'ক্লাস টু।'

কাছেই আরেকটা বোমা ফাটল। আবীর শক্ত করে জহিরের গলা জড়িয়ে ধরল।

'ভয় লাগছে আবীর?'

'লাগছে।'

বোমার একটা টুকরা কি তাঁর গায়ে লেগেছে। তিনি হাঁটতে পারছেন না। ছেলেটা কেমন যেন নেতিয়ে পড়ছে। মুখ দিয়ে ফেনা ভাঙছে।

১১

নীতু বলল, 'ভয় লাগছে বাবা। আমার ভয় লাগছে।'

মনজুর মেয়ের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। সেই হাসিতে নীতু কোনো ভরসা পেল না। তার ভয় আরো বেড়ে গেল। কারণ তার কাছে মনে হচ্ছে, বাবা অন্য রকম করে হাসছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাবা এরকম করে কখনো হাসে না।

ইসমাইল বলল, 'স্যার আমি কি দেখব, গেরামের কোনো ঘর বাড়িতে আম্মা আর আফারে রাখন যায় কিনা।' মনজুর বললেন, 'দেখ।'

ইসমাইল দৌড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এল।

স্যারকে একা রেখে সে যেতে পারছে না।

রেবেকা বললেন, 'আমরা তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না। যা হবার এখানেই হবে।' মনজুর বললেন, 'রেবেকা শোন, আমার ব্যাপারে তোমার মনে কিছু প্রশ্ন আছে। প্রশ্নগুলো দূর করা দরকার।'

রেবেকা বললেন, 'এখন কোনো কিছুই দূর করতে হবে না। পরে বললেও হবে।'

'পরে বলার সুযোগ নাও পেতে পারি। তাছাড়া এখন একটা অদ্ভুত সময়। এই সময়ের একটা বিশেষ আবেদন আছে। শোন রেবেকা, জহিরের স্ত্রী এবং আমাকে নিয়ে তোমার মনে নানান সংশয় আছে।'

'তুমি চুপ কর। আমি শুনতে চাচ্ছি না।'

নীতু বলল, 'মার শোনা দরকার বাবা, তুমি বল।'

মনজুর সাহেব স্পষ্ট উচ্চারণে বললেন, 'পৃথিবীতে খুব অল্পসংখ্যক মানুষ জন্মায় যাদের কাছাকাছি গেলে মনে পবিত্র ভাব হয়। মীরা ছিল তেমন একজন মেয়ে। যারা তার কাছাকাছি গিয়েছে তাদেরই সে বদলে দিয়েছে। জহিরকে দেখ— স্ত্রীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয় কোনো মেয়ের দিকে ফিরে তাকায় নি। মীরা পৃথিবীতে এসেছিল অল্প আয়ু নিয়ে। অল্প আয়ুর প্রতিটি মুহূর্ত সে কাজে লাগিয়েছে। আমি তার কাছে ছুটে ছুটে যেতাম, কারণ, আমার কোথাও যাবার জায়গা ছিল না। চাকরি নেই, সহায় নেই, বাবা-মা নেই। ভয়াবহ দুঃসময়! আমি এমন হতাশ হয়েছিলাম যে, একবার ঠিক করলাম কোনো একটা চলন্ত ট্রাকের সামনে লাফিয়ে পড়ব। মীরা আমাকে এই অবস্থা থেকে উদ্ধার করে। আরো শুনতে চাও?'

রেবেকা বললেন, 'না আর শুনতে চাচ্ছি না।'

'আমি তাঁর প্রেমে পড়েছিলাম কিনা জানি না। হয়তো পড়েছিলাম। সেটা ভয়ংকর কোনো অপরাধ না।'

'বলছি তো আমি আর কিছু শুনতে চাচ্ছি না। তুমি আমার পাশে থাক। খবরদার নড়বে না।'

মনজুর হাসতে হাসতে বললেন, 'তুমি এত শক্ত করে আমার হাত ধরে আছ কেন? রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যাবে।'

'হোক বন্ধ। আমি ছাড়ব না। ছাড়লেই তুমি ঝামেলার মধ্যে জড়িয়ে পড়বে।'

'ঝামেলা থেকে দূরে থাকা ঝামেলা এড়ানোর কোনো পথ না।'

'বক্তৃতা দিতে হবে না। তুমি দাঁড়িয়ে থাক।'

১২

ছোটন পাজেরো জিপ থেকে কালো চশমা পরা যুবকটিকে টেনে নামাচ্ছে! তার মুখ রক্তাক্ত। কাচ ভাঙার সময় কাচের টুকরা এসে লেগেছে তার মুখে। গলগল করে রক্ত বের হচ্ছে। গাড়িতে বসে থাকা মেয়ে তিনটি মূর্তির মতো বসে আছে, কোনো শব্দ করছে না। ছোটন বলল, 'মাগী লইয়া ফুর্তি করতে বাইর হইছস। হারামজাদা!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছোটন একটি মেয়ের ব্লাউজ খামচে ধরল। বুড্ডা তাকে বার বার সাবধান করে দিয়েছে কিন্তু কিছু মনে থাকে না। সুন্দর সুন্দর মেয়ে— হাত নিশপিশ করে। এই যে ছোটন মেয়েটার বুক কচলে দিল, মেয়েটা কিছুই বলল না। অবাক চোখে তাকিয়ে আছে। গণ্ডগোলের এটাই মজা। অন্য সময় এই কাজের জন্যে তাকে লোকজন পিটিয়েই মেরে ফেলত। ছোটন আরেকবার মেয়েটির দিকে হাত বাড়াল। এখন এদিকে কেউ তাকাচ্ছে না। সবাই তাকিয়ে আছে কালো চশমাওয়ালার দিকে। তাকে মারা হচ্ছে। সবারই অংশ গ্রহণের সুযোগ আছে। এই ফাঁকে ছোটন তিনটি মেয়ের বুকই ছুঁয়ে দেখতে পারে। সহজে এমন সুযোগ পাওয়া যায় না। বুকে হাত দেয়ার পর মেয়েগুলোর মুখ কেমন বদলে যায়। এটা দেখতেও ভালো লাগে।

এমন ভয়ংকর ঘটনা যেখানে ঘটছে তার অল্প একটু দূরেই স্থূলকায়া মহিলা টাকা গুনছেন। ডাবওয়ালা ভাঙতি টাকা নিয়ে ফিরে এসেছে। ভদ্রমহিলা গজগজ করছেন, 'রাজ্যের ময়লা নোট নিয়ে এসেছিস। এই নোট চলবে?'

বুড্ডা এগুচ্ছে মনজুর সাহেবের মাইক্রোবাসের দিকে। ইসমাইল দুই হাত উঁচু করে ওদের আটকাল। সে বলল, 'মানুষ দোষ করে। গাড়ি দোষ করে না। গাড়িতে হাত দিয়েন না। খবরদার কইলাম। খবরদার।'

বুড্ডা লাথি দিয়ে ইসমাইলকে ফেলে দিল। ইসমাইলের গলা থেকে জান্তব শব্দ বের হয়ে এল। বুড্ডা ইট দিয়ে তার মাথা গুঁড়িয়ে দিয়েছে।

মনজুর সাহেব দূর থেকে দৃশ্যটা দেখলেন। তাঁর চোখ-মুখ শক্ত হয়ে গেল। তিনি বললেন, 'রেবেকা, আমার হাত ছাড়। আমাকে যেতে হবে।'

রেবেকা বললেন, 'না।'

নীতু বলল, 'মা, বাবাকে ছেড়ে দাও। বাবা যাক।'

মনজুর সাহেব এগুচ্ছেন। নীতু তার মাকে জড়িয়ে ধরে আছে। নীতু বলল, 'আমি যে আমার বাবাকে কতটা ভালবাসি তা কি তুমি জান মা?'

রেবেকা বললেন, 'জানি।'

রেবেকার চোখ ঝাপসা। তিনি সেই ঝাপসা দৃষ্টিতে দেখছেন— যন্ত্রের মতো একজন মানুষ এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সে যন্ত্র নয়। অসম্ভব সুন্দর একজন মানুষ যে লুকিয়ে থাকে যন্ত্রের আড়ালে। হঠাৎ হঠাৎ বের হয়ে আসে।

মনজুর সাহেব বুড্ডার সামনে এসে দাঁড়ালেন। যন্ত্রের মতো গলায় বললেন—স্টপ।'

তিনি কোটের ভেতরের পকেটে হাত দিলেন। আর ঠিক তখন তাঁর মনে পড়ল।— অনেক অনেক দিন আগে তেঁতুলিয়ায় কোন্ দৃশ্যটি দেখেছিলেন। জোছনা রাতে তাঁরা বসেছিলেন খোলা প্রান্তরে। আর তাঁদের মাথার উপর দিয়ে একসঙ্গে উড়ে গিয়েছিল শত শত শীতের পাখি। তারা খানিকক্ষণের জন্যে চাঁদের আলো ঢেকে ফেলেছিল। আহা কী অপূর্ব দৃশ্য! এই দৃশ্য এতদিন কী করে ভুলে ছিলেন? তিনি মনে মনে বললেন, যদি বেঁচে থাকি তাহলে রেবেকাকে ঐ দৃশ্য দেখাতে নিয়ে যাব। অবশ্যই নিয়ে যাব।

মনজুর সাহেব রিভলবার বের করলেন। বুড্ডাকে লক্ষ্য করে পর পর দুটি গুলি করলেন। ছোটন তাঁর দিকে দৌড়ে আসছে। তিনি রিভলবারে ট্রিগার চেপে ছোটনের জন্য অপেক্ষা করছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নবনী

১

দুপুরে গল্পের বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। মা এসে গায়ে হাত দিয়ে ঘুম ভাঙালেন। ব্যাকুল গলায় ডাকলেন, 'নবনী! নবনী!!' আমি চোখ মেলতেই তিনি আমার মুখের কাছে মুখ এনে কাতর গলায় বললেন, 'ওঠ্ মা। ওঠ্!'

আমি হকচকিয়ে উঠে বসলাম। মা এভাবে আমাকে ডাকছেন কেন? কিছু কি হয়েছে? বাবা ভালো আছো তো? খাট থেকে নামতে গেছি, মা হাত ধরে আমাকে নামালেন। যেন আমি বাচ্চা একটা মেয়ে। একা একা খাট থেকে নামতে পারি না। আমি বললাম, 'কী হয়েছে মা?'

মা জবাব দিলেন না, অস্পষ্টভাবে হাসলেন। বারান্দায় এসে দেখি, বাবা ইজিচেয়ারে আধশোয়া হয়ে আছেন। তাঁর গায়ে ইস্ত্রি করা পাঞ্জাবি। চুল আঁচড়ানো। আজ দুপুরেও গাল ভর্তি খোঁচা খোঁচা কাঁচাপাকা দাড়ি ছিল। এখন নেই, গাল মসৃণ, শান্ত পরিচ্ছন্ন একজন মানুষ! খুবই আশ্চর্যজনক ব্যাপার। মাস দুই হল তিনি শয্যাশায়ী। ডান পা অবশ হয়ে আছে। দেয়াল ধরে হাঁটাহাঁটি করেন। তবে বেশিরভাগ সময় খবরের কাগজ হাতে নিয়ে শুয়ে থাকেন নিজের ঘরে। কাগজ পড়ার ফাঁকে ফাঁকে কঠিন এবং তিক্ত গলায় এ-বাড়ির সবার সঙ্গে ঝগড়া করেন। যেন তাঁর এই অসুখের জন্যে আমরাই দায়ী। আজ কী হাসিখুশি লাগছে বাবাকে। আমার দিকে চোখ পড়তেই তিনি বললেন, 'দুপুরে ঘুম তো খুব খারাপ অভ্যাস রে মা। ব্যাড হেবিট। হাত-মুখ ধুয়ে আয় আমার কাছে।'

আমি হাত-মুখ ধুতে রওনা হলাম। বুঝতে পারছি কিছু একটা হয়েছে। বড় ধরনের কিছু। পুরো বাড়িটা বদলে গেছে। নিশ্চয়ই আনন্দময় কোনো ঘটনা ঘটে গেছে। বাবার সুখী সুখী গলা আবার শুনলাম, 'ওগো, আমাকে আর নবনীকে চা দাও। বাপ-বেটিতে একসঙ্গে চা খাই।' এত সুন্দর করে বাবা অনেক দিন কথা বলেন নি।

বাবা আজ আমার সঙ্গে চা খেতে চাচ্ছে কেন? আমার শরীর ঝিমঝিম করছে।

আমি চাপা উত্তেজনা নিয়ে বাথরুমে ঢুকলাম।

আমাদের বাথরুম সব সময় অন্ধকার। দুপুরবেলায়ও বাতি না জ্বালালে আয়নায় মুখ দেখা যায় না। আশ্চর্য! আমি সুইচটা খুঁজে পাচ্ছি না। আমার বুক ধক্ ধক্ করছে। তীব্র এক অজানা ভয়ে মন অভিভূত হয়ে যাচ্ছে। নিজেকে সামলাবার জন্যে আমি দরজায় হাত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাখলাম, আর তখন ইরা বাথরুমে ঢুকে বাতি জ্বালাল। ইরার হাতে সাবান, তোয়ালে। সাবানটা নতুন, এখনো মোড়ক খোলা হয় নি।

আমি বললাম, 'কী হয়েছে ইরা?'

ইরা হাসতে হাসতে বলল, 'তোমার এত বুদ্ধি, তুমি এখনো বুঝতে পারছ না?'

'না। বুঝতে পারছি না।'

'অনুমান করতে পারছ?'

'অনুমানও করতে পারছি না।'

ইরা ঝলমলে গলায় বলল, 'আজ তোমার বিয়ে। রাত দশটার ট্রেনে বর আসবে। রাতেই বিয়ে হবে। কোনো উৎসব-টুৎসব কিচ্ছু হবে না। তোমাকে নিয়ে তারা ঢাকা চলে যাবে সকালের ট্রেনে।'

আমি এক দৃষ্টিতে ইরাকে দেখছি। সে আজ তার সেই প্রিয় শাড়িটা পরেছে। সাদা রঙের শিফন শাড়ি। মা তাকে কখনো এই শাড়ি পরতে দেন না। এই শাড়িতে তাকে নাকি বিধবার মতো লাগে। কিন্তু আমি আর ইরা শুধু জানি এই শাড়িতে তাকে কত সুন্দর লাগে। ও বোধহয় ক্রমাগতই কাঁদছে। ওর মুখ শুকনো। চোখ ভেজা। সে হাসতে হাসতে কথা বলার চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না।

ইরা বলল, 'সবাই খুব খুশি। সবচে' খুশি বাবা। আপা, তুমি মুখটা নিচু কর, আমি সাবান দিয়ে তোমার মুখ ধুইয়ে দেই।'

' তোর মুখ ধুইয়ে দিতে হবে না। তুই যা।'

ইরা বলল, 'আপা শোন — বাবা যে সবচে' খুশি তা না। সবচে' খুশি হয়েছি আমি। খবরটা শোনার পর থেকে আমি আনন্দে শুধু কাঁদছি।'

'তুই এখন যা। আমি হাত-মুখ ধুয়ে আসছি।'

ইরা পুরোপুরি চলে গেল না। বাথরুমের বাইরে দাঁড়িয়ে রইল। আমি তাকালাম আয়নার দিকে। আয়নায় কী সুন্দর দেখাচ্ছে আমাকে! শান্ত সরল চেহারার একটা মেয়ের মুখ। আয়নার মুখ কখনো হাত দিয়ে ছোঁয়া যায় না। আমার প্রায়ই আয়নার মুখটাকে ছুঁতে ইচ্ছা করে। আজো করছে। আমি হাত দিয়ে সেই মুখ ছুঁতে গিয়ে আয়নায় সাবানের ফেনা লাগিয়ে ফেললাম।

আজ আমার বিয়ে।

আমার কেমন লাগছে?

এখনো বুঝতে পারছি না। আমার সমস্ত বোধ অসাড় হয়ে আছে। তবে এক ধরনের শান্তি বোধ করছি। আমার একটা সমস্যা ছিল, ভয়াবহ ধরনের সমস্যা। আজ হয়তো তা মিটে যাবে — এই শান্তি। বাথরুম থেকে বের হয়ে আমি সবার খুশি মুখ দেখব। এও তো কম না।

আমার বিয়ে নিয়ে সবাই খুব সমস্যার মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। সবাই ধরেই নিয়েছিল, আমার কোনোদিন বিয়ে হবে না। এমন কোনো দোয়া নেই যা মা আমার জন্যে পড়েন নি। আজমীর শরীফ থেকে আনা লাল সুতা এখনো আমার গলায় ঝুলছে। বিয়ে হয়ে যাবার পর এই সুতা খুলে ফেলতে হয়। যদি সত্যি সত্যি বিয়ে হয় তাহলে নিশ্চয় বাসর ঘরে ঢোকার আগে ইরা এসে কাঁচি দিয়ে সুতা কাটবে। সুতা কাটতে গিয়ে হয়তো সে কিছুক্ষণ কাঁদবে। ইরা খুব কাঁদতে পারে।

সত্যি কি আজ বিয়ে হবে? কেন জানি এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না। স্বপ্ন দেখছি না তো? গল্পের বই পড়তে পড়তে দুপুরে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হয়তো ঘুমের মধ্যেই স্বপ্ন দেখছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিয়ের স্বপ্ন আমি প্রায়ই দেখি। স্বপ্নের মধ্যেই একটা ঝামেলা হয়ে বিয়ে ভেঙে যায়। আমি দেখি একটা সুন্দর ছেলে আমার পাশে বসা। এক সময় সে উঠে চলে যায়। আমি চোখ ভর্তি জল নিয়ে জেগে উঠে খুব লজ্জিত হই। বাস্তব কখনো স্বপ্নের মতো নয়। বাস্তব অন্যরকম। বাস্তবে অনেক কথাবার্তার পর বিয়ে ঠিক হয়। আলাপ আলোচনা একটা পর্যায় পর্যন্ত যায়, তারপর তারা সুন্দর একটা চিঠি রেজিস্ট্রি করে পাঠায় —

গভীর দুঃখ ও বেদনার সহিত আপনাকে জানাইতেছি যে, আমার মধ্যমপুত্র হঠাৎ বলিতেছে সে এক্ষণ বিবাহ করিবে না। আমি এবং তাহার মাতা তাহাকে বুঝানোর প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া বিফল মনোরথ হইয়াছি। তাহার সহিত আমাদের কিঞ্চিৎ মনোমালিন্যও হইয়াছে। যাহা হউক, আপাতত বিবাহ অনুষ্ঠান স্থগিত রাখা ভিন্ন কোনো পথ দেখিতেছি না। পুত্র রাজি হইলে ইনশাআল্লাহ আবার ব্যবস্থা হইবে। তবে আপনারা অপেক্ষা করিয়া থাকিবেন না। যদি কোনো ভালো পাত্রের সন্ধান পান — কন্যার বিবাহ দিবেন। আমাদের দোয়া থাকিবে ইহা জানিবেন। শ্রেণীমতো সকলকে সালাম ও দোয়া দিবেন।

এইসব চিঠি সব সময় সাধু ভাষায় লেখা হয়। হাতের লেখা হয় প্যাঁচানো। চিঠির উপর আরবিতে লেখা থাকে ইয়া রব। প্রতিটি চিঠির ভাষা ও বক্তব্য এক ধরনের হয়। কেউ সাহস করে সত্য কথাটা লেখে না। কেউ লেখে না — আপনার মেয়ে খুব সুন্দর। আমাদের পছন্দ হয়েছে কিন্তু তার সম্পর্কে যে এত ভয়াবহ একটি গুজব আছে তা জানতাম না। জানার পর বিয়ে নিয়ে এগোতে আমাদের সাহস হচ্ছে না। আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন।

ইরা বাথরুমের দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলল, 'আপা, এত দেরি করছ কেন? হাত-মুখ ধুতে এতক্ষণ লাগে?'

আমি জবাব দিলাম না। আয়নায় নিজের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে নিজেকে দেখছি। আয়নার মানুষটার ভেতর মনে হয় প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়েছে। সে আমাকে অনেক কথা বলতে চাচ্ছে। এমন সব কথা যা আমি এই মুহূর্তে শুনতে চাই না।

'আপা, তোমার চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।'

আমি বের হয়ে এলাম। বাবা বললেন, 'নবু মাকে বসার কিছু দাও না।' ইরা ঘরের ভেতর থেকে মোড়া এনে দিল। বাবার সামনের ছোট্ট সাইড টেবিলে দুকাপ চা। একটা প্লেটে কয়েকটা পাঁপর ভাজা। বাবা নিজেই একটা কাপ আমার হাতে তুলে দিলেন। আমার লজ্জা-লজ্জা লাগছে।

বাবা চায়ে চুমুক দিয়ে খুশি খুশি গলায় বললেন, 'চা ভালো হয়েছে। ভেরি গুড। কি রে নবু, চা ভালো হয় নি?'

আমি হাসলাম। রান্নাঘর থেকে মা গলা বের করে বললেন, 'তোমরা ধীরেসুস্থে চা খাও — কুমড়ো ফুলের বড়া ভাজছি।'

কুমড়ো ফুলের বড়া আমার জন্যে ভাজা হচ্ছে। আমাদের বাড়ির পেছনে কয়েকটা কুমড়ো গাছ ফুলে ফুলে ভর্তি হয়ে গেছে। আমি কবে যেন কথায় কথায় বলেছিলাম — কুমড়ো ফুলের বড়া কর তো মা। মা বিরক্ত গলায় বলেছিলেন, সব ফুল খেয়ে ফেললে কুমড়ো আকাশ থেকে পড়বে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইরা আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। মা ইরার দিকে তাকিয়ে বিরক্ত গলায় বললেন, 'ইরা, তুই এখানে ঘুরঘুর করছিস কেন? তোকে কী করতে বলেছি?'

অর্থাৎ মা ইরাকে সরিয়ে দিলেন। বাবাকে সুযোগ করে দিলেন — যেন তিনি আমার সঙ্গে একা কথা বলতে পারেন। বুঝতে পারছি বাবা ছোটখাটো একটা বক্তৃতা দেবেন। এরকম বক্তৃতা তিনি আগেও কয়েকবার দিয়েছেন। এইসব ঘরোয়া বক্তৃতার শুরুটা খুব নাটকীয় হয়। বাবা এমন কিছু কথা দিয়ে বক্তৃতা শুরু করেন যার সঙ্গে মূল বক্তব্যের কোনো সম্পর্ক নেই। আজো সেই ব্যাপার হবে।

'নবনী!'

'জি বাবা।'

'সক্রেটিসের একটা কথা আছে। খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা। সক্রেটিস বলেছেন, মানুষের একটাই সৎ গুণ, সেটা হচ্ছে তার জ্ঞান। আর মানুষের দোষও একটা। দোষ হল অজ্ঞানতা — Ignorance. পশুদের কোনো গুণ নেই, কারণ তাদের জ্ঞান নেই। বুঝতে পারছিস?'

'পারছি।'

'সক্রেটিসের এই বাণী মনে থাকলে জীবনটা সহজ হয়। জটিলতা কমে যায়। ঠিক না মা?'

'হ্যাঁ।'

আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না। বাবা কী করে সক্রেটিস থেকে আমার বিয়ের ব্যাপারে আসবেন। তিনি নিশ্চয়ই চিন্তাভাবনা করে রেখেছেন। আমি বেশ আগ্রহ নিয়েই বাবার কথা শোনার জন্যে অপেক্ষা করছি। বাবা খুব গম্ভীর গলায় কলেজে লেকচার দেবার ভঙ্গিতে বললেন —

'বিয়ে নামক যে সামাজিক বিধি প্রচলিত আছে, তার মূল উদ্দেশ্য হল পূর্ণতা। একজন পুরুষ পূর্ণ হয় না যতক্ষণ না একজন সঙ্গিনী তার পাশে আসে। এই জ্ঞান পশুদের নেই। মানুষের আছে। বুঝতে পারছিস?'

'পারছি।'

'বিবাহ পশুদের প্রয়োজন নেই, মানুষের প্রয়োজন, কারণ সক্রেটিসের ভাষায় মানুষ সৎগুণসম্পন্ন প্রাণী। অর্থাৎ জ্ঞানী প্রাণী। পরিষ্কার হয়েছে?'

'জ্বি।'

'তোর বড় মামা খবর পাঠিয়েছেন। হাতে-হাতে চিঠি পাঠিয়েছেন। চিঠিটা পড়লেই তোর কাছে সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। মিনু, চিঠিটা দিয়ে যাও।'

মা সঙ্গে সঙ্গে চলে এলেন। মা রান্নাঘরে চিঠি আঁচলে নিয়েই বসে ছিলেন বলে মনে হয়। তাঁর এক হাতে চিঠি। অন্য হাতে প্লেট ভর্তি কুমড়ো ফুলের বড়া। এই খাদ্যদ্রব্যটি আমার একার নয় বাবারও প্রিয়। কোনো বিশেষ আনন্দের ব্যাপার হলে ফুলের বড়া তৈরি হয়। তখন শিশুদের মতোই বাবার চোখ চক্‌চক্ করতে থাকে।

বাবা গভীর আগ্রহে বড়া খাচ্ছেন। আমি চিঠি পড়ছি। মামার হাতের লেখা ডাক্তারদের লেখার মতো— অপাঠ্য। এই চিঠি যেহেতু তিনি অনেক বেশি যত্ন নিয়ে লিখেছেন সেহেতু কিছুই পড়া যাচ্ছে না— আমি চিঠিতে চোখ বুলাচ্ছি। মা আমার পাশে বসে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। অনেকদিন পর মার পরনে ইস্ত্রি করা সুন্দর শাড়ি। হাতে আজ দুগাছা সোনার চুড়িও পরেছেন। চুড়িতে সোনা সব ক্ষয়ে গেছে। তামা বের হয়ে আছে। তবু চুড়ি পরা হাতে মাকে সুন্দর লাগছে। মার হাত ভর্তি চুড়ি থাকলে বেশ হত। যেখানে যেতেন রিনরিন করে হাতের চুড়ি বাজত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দোয়াপর সমাচার,

তোমাদের একটি আনন্দ সংবাদ দিতেছি। পরম করুণাময়ের অশেষ কৃপায় — ঢাকার পার্টির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। তাহাদের নিকট হইতে খবর পাইয়া আমি ঢাকায় চলিয়া যাই এবং কথাবার্তা বলি। তাহাদের সহিত অনেক বিষয় নিয়া বিস্তারিত আলাপ হইয়াছে। আলোচনার ফলাফল নিম্নরূপ।

তাহারা নবনী মাকে পছন্দ করিয়াছে। ছেলে তাহার কিছু আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবসহ আগামী পরশু ১২ই আগস্ট রাতের ট্রেনে নেত্রকোনা পৌঁছিবে। আল্লাহ চাহে তো ঐ রাতেই শুভবিবাহ সুসম্পন্ন হইবে। পরদিন প্রাতে তাহারা নববধূ নিয়া ঢাকা যাত্রা করিবে।

আমি এই সংবাদ তোমাদের শেষ সময়ে দিতেছি, কারণ আমি চাহি না তোমরা এই সংবাদ নিয়া হৈচৈ শুরু কর।

পাড়া প্রতিবেশী, নিকটজন, পরজন কেহই যেন কিছুই না জানে। শুভকর্ম আগে সমাধা হোক, তখন সবাই জানিবে। দশজনের মতো লোকের খাবার আয়োজন করিয়া রাখিবে। মোজাম্মেল সাহেবকে বলিয়া তাঁহার জিপ গাড়িটি ইস্টিশনে রাখিবার ব্যবস্থা করিবে। বিবাহসংক্রান্ত কোনো আলাপ তাঁহার সঙ্গে করিবার প্রয়োজন নাই। অসীম গোপনীয়তা কাম্য।

বিবাহ পড়াইবার কাজী আমি সঙ্গে নিয়া আসিব। বিবাহ রেজিস্ট্রি হইবে ময়মনসিংহ শহরে।

খাওয়াদাওয়ার আয়োজনের মধ্যে পোলাও, কোরমা, ঝাল গোশত, মুরগির রোস্ট রাখিবে। চিকন চালের সাদা ভাত যেন থাকে। মুরব্বি কেহ থাকিলে সাদা ভাতই পছন্দ করিবেন। আমি বড় মাছ নিয়া আসার চেষ্টা করিব। মেছুনীকে বড় মাছের কথা বলিয়া রাখিয়াছি। ভাত এবং পোলাও বরযাত্রী আসার পর রাঁধিবে। দৈ-মিষ্টির ব্যবস্থা করার প্রয়োজন নাই। দৈ-মিষ্টি আমি সঙ্গে করিয়া নিয়া আসিব।

মুখ দেখার পর জামাইকে সেলামী হিসেবে এক হাজার টাকা দিলেই চলিবে। আমি একটি স্বর্ণের আঙটি প্রস্তুত করাইয়া রাখিয়াছি। স্যুটের কাপড় দিতে পারিলে ভালো হইত। আমি সন্ধানে আছি, ভালো কাপড় পাওয়া গেলে নিয়া আসিব।

নবনীকে চোখে-চোখে রাখিবে। যদিও জানি ইহার কোনো প্রয়োজন নাই। তাহাকে ভালোভাবে বুঝাইবে। অতীত নিয়া সে যেন চিন্তা না করে। গতস্য শোচনা নাস্তি। আমি নিজেও তাহার সঙ্গে কিছু কথা বলিব। গায়ে হলুদের একটা ব্যাপার আছে — ইহা মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নহে। গায়ে হলুদ হিন্দুয়ানী ব্যাপার, তবুও যেহেতু ইহা মেয়েদের একটা শখের ব্যাপার সেহেতু নিজেরা নিজেরা গায়ে হলুদের ব্যবস্থা নিবে। কাহাকেও কিছু জানাইবার কোনোই প্রয়োজন নাই। আসল কথা গোপনীয়তা। কেহ কিছু জানিবার আগেই কার্য সমাধা করিতে হইবে। আল্লাহ সহায় — অসুবিধা হইবে না।

নব-বিবাহিত দম্পতি যেহেতু তোমাদের বাড়িতেই রাত্রিযাপন করিবে সেহেতু তাহাদের জন্যে একটা ঘর আলাদা রাখিবে। খাটে বিছাইবার জন্যে আমি একটা ভেলভেটের চাদর সঙ্গে নিয়া আসিতেছি।

বরযাত্রীরা রাতে কোথায় থাকিবে তা নিয়াও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইবে না। পাবলিক হেলথের ডাকবাংলোয় আমি তিনটি ঘরের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছি। শুভ কার্যের পর পরই তাহাদের সেখানে নিয়া যাইব। বাকি আল্লাহপাকের ইচ্ছা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অতঃপর তোমাদের সংবাদ কী? আমার স্ত্রীর শরীর ভালো যাইতেছে না। সে বলিতে গেলে শয্যাশায়ী। শরীর খারাপের জন্য মন-মেজাজেরও ঠিক-ঠিকানা নাই। চিৎকার ও হৈচৈ করিয়া সবার জীবন সে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে। তাহাকে সঙ্গে আনা ঠিক হইবে না। আমি একাই আসিব।

যাহা হউক, শুভ কাজ যেন নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় সে জন্যে তোমরা আল্লাহপাকের দরবারে ক্রমাগত প্রার্থনা করিতে থাকো। আর বিশেষ কী লিখিব। দোয়া গো।

আমি চিঠি মার হাতে ফেরত দিলাম। মা আগ্রহ নিয়ে বললেন, 'সবটা পড়েছিস?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ।'

বাবা হৃষ্টচিত্তে বললেন, 'তোর বড় মামার কাজ সব গোছানো। কোনো ফাঁক নেই। ভেরি প্রাকটিক্যাল ম্যান। ভেরি ডিপেনডেবল। উনার ব্যবস্থা দেখেছিস? আগে থেকে কিছু বলবে না। সব ঠিকঠাক করে তারপর বলবে। মিনু, আরেক কাপ চা দাও দেখি। আজকের বড়াগুলোও হয়েছে মারাত্মক। মাখনের মতো মোলায়েম। মুখে দেবার আগেই গলে যাচ্ছে। নবনী, তোর জন্যে দুটা রেখে দিয়েছি, খা। তুই একটা নে, ইরাকে একটা দে।'

আমার বড়া খেতে ইচ্ছা করছে না তবু বাবাকে খুশি করার জন্যে বড়া হাতে নিলাম। হাত বেয়ে তেল পড়ছে। বিশ্রী লাগছে। মা চলে গেছেন চা বানাতে। মা যেভাবে ছোটাছুটি করছেন, মনে হচ্ছে তাঁর বয়স অনেকখানি কমে গেছে। তাঁর তাকানোর ভঙ্গি, ছোটাছুটির ভঙ্গি সব কিছুতেই একটা খুকি–খুকি ভাব চলে এসেছে। বাবা ঝুঁকে এসে বললেন, 'নবনী, তোর মামা একটা গ্রেট ম্যান, কী বলিস?'

'হ্যাঁ বাবা।'

'বিয়ের মতো এত বড় একটা ঝামেলা কিন্তু আমরা কিছুই বুঝতেও পারছি না। সব অটোসিস্টেম হয়ে যাচ্ছে। এই মানুষটা না থাকলে যে কী হত — ভাবতেও পারি না! আই লাইক হিম। অসাধারণ একজন মানুষ।'

বড় মামা অসাধারণ একজন মানুষ এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু বাবা তাঁকে পছন্দ করেন এটা ঠিক না। বাবা তাঁকে পছন্দ করেন না। মাও করেন না। আমরা কেউই বোধহয় করি না। শুধু আমরা না, তাঁর পরিবারের কেউই তাঁকে পছন্দ করে না। অথচ তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য অন্যের উপকার করা। আদর্শ মানুষ বলতে যা বোঝায় তিনি তাই। মনে হয়, আদর্শ মানুষকে কেউ পছন্দ করে না। আদর্শ মানুষ ডিসটিল্ড ওয়াটারের মতো — স্বাদহীন। সমাজ পছন্দ করে অনাদর্শ মানুষকে। যারা ডিসটিল্ড ওয়াটার নয় — কোকাকোলা ও পেপসির মতো মিষ্টি কিন্তু ঝাঁঝালো।

আমি উঠে আমার ঘরে চলে গেলাম। ইরা সেখানে কাপড় ইস্ত্রি করতে বসেছে। টেবিল ক্লথ, জানালার পর্দা ইস্ত্রি হচ্ছে। আমাদের একটা ইলেকট্রিক ইস্ত্রি আছে। বড় মামা দিয়েছেন। ইলেকট্রিসিটি বেশি খরচ হবার ভয়ে এই ইস্ত্রি আমরা কখনো ব্যবহার করি না। আজ ব্যবহার হচ্ছে।

ইরা আমাকে দেখে ইস্ত্রির প্লাগ খুলে রাখল। ইরাকে কেন জানি খুব কাহিল লাগছে। চোখের নিচে কালি পড়ে গেছে। ওর বোধহয় রাতে ঘুম–টুম হচ্ছে না। ইরা খুব চাপা ধরনের মেয়ে। ওর কী হয়েছে তা সে কাউকেই বলবে না। আমি বললাম, 'ইরা, তোর কুমড়ো ফুলের বড়া পড়ে আছে। খেয়ে আয়।'

ইরা বের হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এসে হাসিমুখে বলল, 'বাবা খেয়ে ফেলেছেন।' শরীর দুলিয়ে ইরা হাসছে — সুন্দর লাগছে দেখতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আপা!'

'কি?'

'তোমার কেমন লাগছে বল তো? এই যে হঠাৎ তোমাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে বলা হল — বিয়ে...।'

'কোনো রকমই লাগছে না।'

'সত্যি বলছ আপা?'

আমি হাসলাম। এই মুহূর্তে আমার কোনো রকমই লাগছে না। আমি সত্যি কথাই বলছি। হয়তো এমনও হতে পারে যে, ব্যাপারটা আমার কাছে এখনো বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে না। যখন সত্যি সত্যি বরযাত্রীরা চলে আসবে তখন হয়তো অন্য রকম লাগা শুরু হবে। বরযাত্রী কি আসবে শেষ পর্যন্ত? একবার রাত আটটায় বরযাত্রী আসার কথা। আমি সেজেগুজে অপেক্ষা করছি। রাত বারটায় খবর এল — তারা আসবে না। মা খবরটা শোনার পর হঠাৎ মেঝেতে পড়ে গেলেন। নাক দিয়ে গলগল করে রক্ত বের হতে লাগল। কী বিশ্রী অবস্থা!

ইরা বলল, 'কার সঙ্গে বিয়ে বুঝতে পারছ আপা?'

'না।'

'ভদ্রলোক ছিলেন রোগামতো। ফর্সা। চোখে লালচে রঙের ফ্রেমের চশমা। সারাক্ষণ রুমাল দিয়ে চশমার কাচ পরিষ্কার করছিলেন। বসেছিলেন বেতের চেয়ারে। উঠার সময় পেরেক লেগে তাঁর পাঞ্জাবি খানিকটা ছিঁড়ে গেল। তিনি তখন খুবই অবাক হয়ে ছেঁড়াটার দিকে তাকিয়ে রইলেন।'

'তুই এত কিছু দেখেছিস?'

'যাঁর সঙ্গেই তোমার বিয়ের কথা হয় তাঁকেই আমি খুব মন দিয়ে দেখি।'

'কেন?'

ইরা মাথা দুলাতে দুলাতে বলল, 'যার সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে তাঁর একটা ছবি আমার মনে আঁকা আছে। সেই ছবির সঙ্গে আমি মিলিয়ে দেখি।'

ইরা খাটে পা ঝুলিয়ে বসছে। বাচ্চা মেয়েদের মতো পা নাচাচ্ছে। সে মনে হয় আরো অনেক কিছু বলতে চায় কিন্তু আমার শুনতে ইচ্ছা করছে না।

'আপা।'

'হুঁ।'

'যাঁর সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে তাঁর চেহারা কেমন হওয়া উচিত তুমি জানতে চাও?'

'না।'

'জানতে না চাইলেও আমি বলি তুমি শোন— তোমার নিজেরও নিশ্চয়ই একটা কল্পনা আছে। তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখ। আমার ধারণা, এক শ ভাগ মিলে যাবে। তোমার বরকে হওয়া উচিত অবিকল শুভ্রের মতো।'

'শুভ্র কে?'

'শুভ্র হচ্ছে উপন্যাসের একটা চরিত্র। সবাই তাকে বলে কানাবাবা। চোখে কম দেখে এই জন্যে কানাবাবা। দেখতে অবিকল রাজপুত্রর মতো। অসম্ভব ভদ্র, হৃদয়বান ছেলে। পৃথিবীর সবকিছুই সে বিশ্বাস করে। খুব অসহায় ধরনের ছেলে।'

'অসহায় কেন?'

'তার পৃথিবীটা একদম অন্যরকম। তার পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের পৃথিবীর সঙ্গে মিল নেই। এই জন্যেই অসহায়। আপা, তোমার কল্পনার সঙ্গে আমার কল্পনা কি মিলেছে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'না।'

'তোমার কল্পনাটা কী?'

আমি কিছু বললাম না। ইরাও আর কিছু বলল না। কোনো কিছু নিয়ে চাপাচাপি করা ইরার স্বভাব না। সে পা দুলাচ্ছে। আমি খানিকটা অসহায় বোধ করছি। অন্যদিন বিকেলে ছাদে হাঁটাহাঁটি করতাম। আজ ছাদে যেতে ইচ্ছা করছে না। ঘরে বসে থাকতেও ভালো লাগছে না।

আমার বিছানার কাছে গল্পের বইটা পড়ে আছে। এই বইটা আর বোধহয় পড়া হবে না। বইটার নাম অদ্ভুত — 'তিথির নীল তোয়ালে।' তবে বইটা অদ্ভুত না। সাদামাটা গল্প। বইয়ের নায়িকা তিথির সঙ্গে একসঙ্গে তিনটি ছেলের প্রেম। তিথি আবার খুব নোংরা নোংরা কথা বলতে ভালবাসে। পড়তে খারাপ লাগছিল না। এখানকার পাবলিক লাইব্রেরির বই। ফেরত পাঠাতে হবে।

'আপা।'

'কি?'

'এস তোমার সুটকেস গুছিয়ে দেই। কী কী জিনিস নিয়ে তুমি ঢাকা যাবে বের করে দাও, আমি গুছিয়ে দেই।'

'আমি কিছুই নেব না।'

'এক কাপড়ে তো তুমি ঢাকায় উঠবে না। তোমাকে অনেক কিছুই নিতে হবে। তুমি জিনিসগুলো বের করে দাও, আমি গুছিয়ে দেই। এতে তোমার লাভ হবে আপা।'

'কী লাভ?'

'তোমার সময় কাটবে। সময় কাটানো এখন তোমার খুব সমস্যা। আমি তোমাকে দেখেই বুঝতে পারছি।'

যে মেয়ের এখনো বিয়ে হয় নি সে স্বামীর কাছে যাবার জন্যে সুটকেস গোছাচ্ছে — এই দৃশ্য ভাবতেও লজ্জা লাগে। আমি চুপ করে রইলাম। ইরা খাটের নিচ থেকে কালো রঙের বিশাল সুটকেস বের করে ঝাড়ামোছা করতে লাগল। বড় মামার স্বভাবের খানিকটা ইরার মধ্যে আছে। সেও খুব গোছানো। আমি কিছু বলি আর না বলি সে ঠিকই সুটকেস গুছিয়ে দেবে। আমি ঢাকায় পৌঁছে সুটকেস খুলে দেখব — আমার যা যা প্রয়োজন সবই সেখানে আছে।

মা এসে ঢুকলেন। তাঁর গা থেকে ভুরভুর করে এলাচের গন্ধ আসছে। মনে হয় পোলাও-কোরমা বসিয়ে দিয়েছেন।

'নবনী।'

'জ্বি মা।'

'আয় তোকে গোসল দিয়ে দি। ইরা তুই আয়।'

আমি নিঃশব্দে উঠে এলাম। বাথরুমটা ছোট। দুজন মানুষেরই সেখানে জায়গা হয় না। তার মধ্যে বড় একটা বালতি রাখায় দাঁড়ানোর জায়গা পর্যন্ত নেই।

ইরা বলল, 'মা, আপাকে বরং ছাদে নিয়ে যাই।'

মা ভীত গলায় বললেন, 'কেউ যদি আবার দেখেটেখে ফেলে?'

ইরা কঠিন গলায় বলল, 'দেখলে দেখবে।'

মা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'আচ্ছা যা, ছাদে নিয়ে যা। এই ভারি বালতি কে টেনে তুলবে? অন্তু তো এখনো এল না। কোনো একটা কাজ যদি সে ঠিকমতো করে। মোরগ এনেছে কালো হয়ে আছে পায়ের চামড়া। এক শ বছরের বুড়া মোরগ। দশ বছর ধরে জ্বাল দিলেও সিদ্ধ হবে না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইরা বলল, 'মুরগি সিদ্ধ না হলে না হবে। তুমি এত চিন্তা কোরো না তো মা। দরকার হলে ওরা ছুরতা দিয়ে মাংস কেটে খাবে। তুমি টেনশন ফ্রি থাক। অন্তু ভাইয়া আসুক। সে আসার পর গায়ে হলুদ হবে।'

মা বললেন, 'আচ্ছা।'

ইরা বলল, 'তাহলে সন্ধ্যার পরই গায়ে হলুদ হবে। সন্ধ্যার পর করলে কেউ কিছ দেখবেও না। ভাইয়াকে বাদ দিয়ে কি আর গায়ে হলুদ হবে?'

মা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'আচ্ছা আচ্ছা।' কেন জানি মা ইরাকে খুব ভয় পান।

'গোসল করে আপা হলুদ শাড়ি পরবে না? শাড়ি তো নেই। তুমি টাকা দাও, আমি হলুদ শাড়ি কিনে আনব।'

'তুই কিনে আনবি, কেউ যদি কিছু জিজ্ঞেস করে?'

'জিজ্ঞেস করলে বলব, আমার বড় আপার বিয়ে। আমি এমন ফকিরের মতো আপার বিয়ে হতে দেব না।'

'আচ্ছা আচ্ছা, যা, চিৎকার করিস না। অন্তু আসুক, ওকে নিয়ে দোকানে যাবি। তুই একটু রান্নাঘরে আসবি? আমাকে সাহায্য করবি?'

'না, আমি অন্য কাজ করছি।'

মা আবার রান্নাঘরে চলে গেলেন। ভাজা ঘিয়ের গন্ধ আসছে। কী কী রান্না হচ্ছে একবার গিয়ে দেখলে হত। এত কিছু রান্না সব মার একা করতে হচ্ছে। আমাদের কাজের মেয়ে দুদিনের ছুটি নিয়ে দেশে গেছে, এখনো আসছে না। আসবে বলে মনে হয় না। এক দোকানদারের সঙ্গে খুব খাতির ছিল। সেখান থেকে কোনো সমস্যা বাধিয়েছে কিনা কে জানে। ইরার ধারণা ঘোরতর সমস্যা। তাকে নাকি গোপনে বলেছে।

আমি বারান্দায় খানিকক্ষণ একা একা দাঁড়িয়ে রইলাম। বাবাকে দেখে মনে হচ্ছে তিনি ইজিচেয়ারে ঘুমিয়ে পড়েছেন। তাঁর কোলের উপর রাখা খবরের কাগজ ফরফর করে বাতাসে উড়ছে। তিনি দুপুরে অনেকক্ষণ ঘুমান। আজ সে সুযোগ হয় নি।

রান্নাঘর থেকে হাঁড়িকুড়ি নাড়ার শব্দ আসছে। আমি রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছি। আমাদের এ বাড়িটা হিন্দুবাড়ি। আমার দাদা এই বাড়ি জলের দামে এক হিন্দু ব্রাহ্মণের কাছ থেকে কিনেছিলেন। বেচারা এত সস্তায় একটিমাত্র কারণেই বাড়ি বিক্রি করে — দাদাজান যেন তার ঠাকুরঘরটা যে রকম আছে সে রকম রেখে দেন। সেই ঠাকুরঘরটাই আমাদের এখনকার রান্নাঘর।

মা আমাকে দেখেই বলল, 'তুই এখানে কেন? যা তো। যা।'

আমি বললাম, 'একা একা কী করছ? আমি তোমাকে সাহায্য করি।'

কোনো সাহায্য লাগবে না। তুই দরজা বন্ধ ঘরে চুপচাপ খানিকক্ষণ শুয়ে থাক।'

'রান্নাবান্না কদ্দূর করেছ?'

'দুটা তরকারি নেমেছে। চেখে দেখবি?'

'না।'

আমি নরম গলায় বললাম, 'মা, আমি বসি তোমার পাশে?'

'ধোঁয়ার মধ্যে বসতে হবে না। তুই যা।'

আমি বুঝতে পারছি মার প্রচণ্ড পরিশ্রম হচ্ছে। কিন্তু তাঁর চোখে-মুখে পরিশ্রমের ক্লান্তি নেই। মনে হচ্ছে তিনি খুব আনন্দে আছেন। প্রয়োজন হলে আজ সারারাত তিনি রান্না করতে পারবেন।

'নবনী।'

'জ্বি মা।'

'বৃষ্টি হবে নাকি রে মা?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বুঝতে পারছি না। হবে মনে হয়। আকাশে মেঘ জমছে।'

'অবশ্যই বৃষ্টি হবে। শুভদিনে বৃষ্টি হওয়া খুব সুলক্ষণ। তোর বাবা কী করছে?'

'ঘুমুচ্ছে।'

'তুইও শুয়ে ঘুমিয়ে পড়। যা এখন। চা খাবি? বানিয়ে দেব এক কাপ? পানি গরম আছে।'

'দাও, বানিয়ে দাও। দুকাপ বানাও মা। তুমি নিজেও খাও।'

মা কেতলিতে চা-পাতা ছেড়ে দিলেন। মার রান্নাবান্না দেখার মতো ব্যাপার। অসম্ভব রকম গোছানো ব্যবস্থা। আমি এখন পর্যন্ত কোনো মহিলাকে এত দ্রুত এত কাজ করতে দেখি নি।

'মসলা কি তুমিই বাটছ?'

'গুঁড়া মসলা আছে, কিছু নিজে বাটলাম। অন্তুকে বললাম, একটা ঠিকা লোক আনতে। কোথায় যে উধাও হয়েছে! কাজের বাড়ি, একজন পুরুষমানুষ থাকলে কত সুবিধা।'

'কিছু লাগবে?'

'জিরা কম পড়েছে।'

'আমি এনে দেই মা। রাস্তার ওপাশেই তো দোকান।'

'হয়েছে, তোর গিয়ে জিরা আনতে হবে না। চা নিয়ে চুপচাপ বসে খা।'

'তোমার পাশে বসে খাই মা?'

'আমার পাশে বসে খেতে হবে না। ধোঁয়ার মধ্যে বসে চা খাবি কি?'

'তোমার পাশে বসেই খাব।'

মা বললেন, 'আয় আয়, বোস।' আমি মার পাশে বসলাম। তিনি এক হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। হাসিখুশি মা হঠাৎ বদলে গেলেন। তিনি শিশুদের মতো শব্দ করে কাঁদতে লাগলেন। এই কান্না কোনো আনন্দের কান্না না, গভীর দুঃখের কান্না। আমাকে নিয়ে মার অনেক দুঃখ।

আমি বললাম, 'মা কান্না থামাও তো।' মা কাঁদতে কাঁদতেই উঠে গেলেন। আমি মার পেছনে পেছনে যাচ্ছি। মা গিয়ে দাঁড়ালেন বাবার সামনে।

বাবা জেগে উঠে অবাক হয়ে তাকাচ্ছেন। ব্যাপার কিছু বুঝতে পারছেন না। ইরাও এসেছে বারান্দায়। মা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললেন, 'এরকম ফকিরের মতো চুপি চুপি আমি আমার মেয়ের বিয়ে দেব না।'

বাবা হতভম্ব গলায় বললেন, 'কী বলছ তুমি!'

মা ধরা গলায় বললেন, 'অন্তুকে বল সে যেন ডেকোরেটরকে দিয়ে গেট বানায়। আলোকসজ্জা যেন হয়।'

'পাগল হয়ে গেলে নাকি?'

'হ্যাঁ, আমি পাগল হয়ে গেছি। আমি এই ভাবে মেয়ের বিয়ে দেব না। ইরা, তুই যা, সবাইকে খবর দে।'

বাবা পুরোপুরি হকচকিয়ে গেছেন। এমনভাবে তাকাচ্ছেন যে, দেখে মায়া লাগছে। তিনি নির্জীব গলায় বললেন, 'চুলার গরমে থেকে থেকে তোর মার ব্রেইন শর্টসার্কিট হয়ে গেছে। নেগেটিভ পজিটিভ এক হয়ে গেছে।'

মা তীব্র গলায় বললেন, 'আমার মেয়ে কোনো পাপ করে নাই। কেন তাকে আমি চোরের মতো বিয়ে দেব?'

বাবা ইরার দিকে তাকিয়ে প্রচণ্ড ধমক দিলেন, 'হাঁ করে দেখছিস কী? তোর মার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শরীর কাঁপছে দেখছিস না? তাকে ধর্। মাথায় পানি ঢাল্। বিছানায় শুইয়ে দে।'

আমরা দুজনেই মাকে ধরে ফেললাম।

বাবা হতাশ গলায় বললেন, 'আচ্ছা যাও, হবে। সবই হবে। অন্তু আসুক। গাধাটা গেল কোথায়!'

বাড়ির চেহারা পাল্টে গেছে। গিজগিজ করছে মানুষ। আমাদের যেখানে যত আত্মীয় ছিলেন সবাই চলে এসেছেন। শুনছি অতিথপুরে ছোট খালাকেও খবর দেয়া হয়েছে। তিনিও নাকি আসছেন।

বাড়ির সামনে শুধু যে গেট বসেছে তাই না। আলোকসজ্জা হচ্ছে। কাঁঠালগাছে লাল, নীল, সবুজ রঙের আলো জোনাকি পোকার মতো জ্বলছে নিভছে।

স্টেশন থেকে বর আনার জন্যে দুটা গাড়ি জোগাড় হয়েছে। ফুল দিয়ে সেই গাড়ি সাজানো হচ্ছে।

ইরার বান্ধবীরা এসেছে। তারা বাসরঘর সাজাচ্ছে। কাউকে সেখানে ঢুকতে দিচ্ছে না। আমার কোথাও বসার জায়গা নেই। বাবার পিঠের ব্যথা উঠেছে বলে তিনি তাঁর ঘরে শুয়ে আছেন। আমাকে ডেকে পাঠালেন। কাঁদ-কাঁদা গলায় বললেন — 'তোর মামা এসে কী যে করবে ভাবতেই হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। চুপি চুপি কাজ সারতে বলেছে, এসে দেখবে মচ্ছব বসে গেছে। কেউ কিচ্ছু বুঝতে চায় না। সব নির্বোধ। অন্তু নাকি ব্যান্ডপার্টি আনতে গেছে। শুনেছিস?'

'না।'

'কেউ কারো কথা শুনছে না। সবাই নিজের মতো কাজ করছে। এটা কি হিন্দুবাড়ির বিয়ে যে ব্যান্ডপার্টি লাগবে?'

'তুমি ডেকে নিষেধ করে দাও।'

'আমার নিষেধ কি কেউ শুনবে? কেউ শুনবে না। যার যা ইচ্ছা করছে। তোর বড় মামা আসার পর দেখবি গজব হয়ে যাবে। পুরোপুরি ইসলামিক কায়দায় আল্লাহু আকবর বলে আমাকে কোরবানি করে দেবে।'

বড় মামা এসেছেন। ব্যান্ডপার্টিও একই সঙ্গে উপস্থিত হয়েছে। তারা এসেই তুমুল বাজনা শুরু করল। মামা অবাক হয়ে কিছুক্ষণ কাণ্ডকারখানা দেখে বললেন, 'ঠিক আছে। বিয়েবাড়ি বিয়েবাড়ির মতোই হওয়া উচিত। চুপি চুপি বিয়ে দিলে ওরাও সন্দেহ করত। আল্লাহ যা করেন ভালোর জন্যেই করেন। আল্লাহ ভরসা।'

মামার এই কথাতেই বাবার পিঠের ব্যথা কমে গেল। তিনি ক্র্যাচে ভর দিয়ে নিজেই গেলেন ব্যান্ডপার্টি দেখতে। গম্ভীর গলায় বললেন, 'তোমরা সারাক্ষণ বাজনা বাজাবে না। বর আসার পর খানিকক্ষণ বাজাবে। ব্যস। তারপর কমপ্লিট স্টপ। মুসলমান বাড়ির বিয়ে, বাদ্যবাজনা ভালো না। দেখি তোমাদের বাজনা কেমন একটু শুনি। স্যাম্পল শোনাও।'

আমি আমার বাবাকে চিনি। বাচ্চারা যেমন ব্যান্ডপার্টি ঘিরে থাকে তিনিও থাকবেন বাচ্চাদের সঙ্গে। তাঁর একমাত্র তফাত হবে তিনি কিছুক্ষণ পর পর বলবেন — ব্যান্ডপার্টি আনার বেকুবি ক্ষমার অযোগ্য। এই বাক্য বলা ছাড়া ব্যান্ডপার্টি ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকা বাচ্চাদের সঙ্গে তাঁর আর কোনো তফাত খুঁজে পাওয়া যাবে না।

শ্রাবণ মাসের ১৩ তারিখ রাত ১১টা দশ মিনিটে আমার বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়ানোর সঙ্গে সঙ্গেই মুষলধারে বৃষ্টি নামল। মেয়েরা নেমে গেল বৃষ্টিতে কাদাখেলা খেলার জন্যে। উঠোন ভর্তি মেয়ে। এ তাকে কাদায় ফেলে দিচ্ছে, ও তাকে ফেলছে। সে এক ভয়াবহ দৃশ্য।

বাবা এক ফাঁকে বিরক্ত গলায় ব্যান্ডপার্টির লোকদের বললেন — 'আনন্দের একটা সময় যাচ্ছে, কাদাখেলা হচ্ছে, আর তোমরা চুপচাপ বসে আছ। এখন বাদ্য-াজনা না বাজালে কখন বাজাবে? কেউ মারা যাবার পর? তোমাদের টাকা দিয়ে আনা হয়েছে কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝিমানোর জন্যে? যত সব ব্রেইনলেস ক্রিয়েচার। বাজাও!'

তুমুল বাদ্য শুরু হয়ে গেল। বাবা হৃষ্টচিত্তে কাদাখেলা দেখতে গেলেন তবে মুখ শুকনো করে বললেন, 'খবরদার আমার গয়ে কেউ কাদা ছিটাবে না। সবকিছুর বয়স আছে। আমার এখন কাদা খেলার বয়স না। তাছাড়া শরীর দুর্বল। পিঠে প্রচণ্ড ব্যথা।'

বাবাকে কেউ কাদা মাখাতে গেল না। তবে তিনি যে মনেপ্রাণে এই জিনিসটি চাচ্ছেন তা আমরা সবাই বুঝলাম। আমি ইরাকে কানে কানে বললাম, 'কাউকে বল না বাবার গায়ে একটু কাদা মাখিয়ে দিক।'

ইরা বলল, 'ছোট খালা এসে পড়বেন। তিনি খবর পেয়েছেন। খালা এলেই বাবাকে তিনি কাদায় চুবাবেন। তুমি নিশ্চিন্ত থাক।'

বড় মামা এসে আমাকে বললেন, 'খুকি তুই আমার সঙ্গে একটু আয় তো। তোর সঙ্গে আমার কিছু জরুরি কথা আছে।'

বড় মামা আমাকে খুকি ডাকেন। আমি হচ্ছি বড় খুকি। ইরা ছোট খুকি। তার নিজের চার মেয়ে। তাদেরও নাম বড় খুকি, মেজ খুকি, সেজ খুকি, ছোট খুকি।

নিরিবিলি কথা বলার কোনো জায়গা নেই। মামা আমাকে ছাদে নিয়ে গেলেন। আমাদের কথা হল ছাদে ওঠার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে। ছাদে যাবার উপায় নেই। মুষলধারে বর্ষণ হচ্ছে। সিঁড়ি অন্ধকার, তবে মামা টর্চ হাতে উঠে এসেছেন। তিনি আমার মাথায় হাত রেখে নরম গলায় বললেন, 'বড় খুকি! তোকে কয়েকটা কথা বলা দরকার মা।'

'বলুন।'

'টর্চটা নিভিয়ে দেই। খামাখা ব্যাটারি খরচ। অন্ধকারে তোর আবার ভয় লাগবে না তো?'

'ভয় লাগবে না।'

বড় মামা বাতি নিভিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন। সম্ভবত কথা গুছিয়ে নিলেন।

মামা কিছু বলছেন না। টর্চ লাইটটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন। একবার জ্বালাচ্ছেন একবার নিভাচ্ছেন। তাঁর বোধহয় কাশিও হয়েছে। খুব কাশছেন। আমি বললাম, 'আপনার কি শরীর খারাপ মামা?'

'হুঁ। মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে। বোধহয় মাইগ্রেন পেইন শুরু হবে। টেনশান হলে এরকম হয়। বয়স হয়ে গেছে, এখন টেনশান সহ্য হয় না। বয়স তো মা কম হল না।'

'টেনশানের তো আর কিছু নেই মামা। বিয়ে হয়ে গেছে।'

'হুঁ।'

'জরুরি কী কথা যেন বলবেন?'

তেমন জরুরি কিছু না। বিয়েশাদী ভাগ্যের ব্যাপার। আল্লাহপাক যা ঠিক করে দেন তাই হয়। জোড়া মিলানোই থাকে। আমরা খামাখাই দৌড়াদৌড়ি করি, হৈচৈ করি। এর সঙ্গে বিয়ে ঠিক করি তার সঙ্গে ঠিক করি। নিতান্তই পণ্ডশ্রম করা হয়। যার যেখানে হবার সেখানেই হবে। তুই তোর বিয়ে নিয়ে মন খারাপ করিস না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমি মন খারাপ করছি না মামা।'

'তোর আরো ভালো বিয়ে হতে পারত। হওয়া উচিত ছিল। সম্ভব হল না। চেষ্টা কম করি নাই।'

আমি হাসতে হাসতে বললাম, চেষ্টা করেও তো লাভ হত না। আপনিই তো বললেন, জোড়া আগেই মিলানো।'

মামা বড় করে নিশ্বাস ফেললেন। মনে হচ্ছে তিনি নিজের কথা নিজেই বিশ্বাস করতে পারছেন না। আমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে জোড়া মিলানোর কথা বলছেন, তবে তাঁর বিশ্বাস অন্য।

'বড় খুকি।'

'জ্বি মামা।'

'ছেলে দরিদ্র, তবে ছেলে খারাপ না।'

'আমি এসব নিয়ে ভাবছি না। তোমাদের যে আমি মুক্তি দিতে পারলাম এতেই আমি খুশি।'

'আমি নিজে খাস দিলে আল্লাহপাকের কাছে দোয়া করেছি। তুই সুখী হবি। সুখটাই বড় কথা। তবে সুখী হবার জন্যে চেষ্টা করতে হয় রে মা। খুব চেষ্টা চালাতে হয়।'

'আমি চেষ্টা চালাব।'

'তুই বুদ্ধিমতী মেয়ে। তোর উপর আমার ভরসা আছে। তোর বরও বুদ্ধিমান। তোদের অসুবিধা হবে না।'

'মামা তুমি কি আমার সমস্যার কথা তাদের বলেছ?'

'পরিষ্কার করে বলি নি। তবে ইংগিত দিয়েছি।'

'পরিষ্কার করে বল নি কেন?'

মামা আবার কাশতে লাগলেন। টর্চের আলো এদিক-ওদিক ফেলতে লাগলেন। আমি বললাম, 'মামা আমি কি বলব উনাকে?'

'এখন বলাবলির দরকার নাই। তোদের দুজনের মধ্যে ভাব ভালবাসা হোক। তারপর বলবি। তাছাড়া দেখবি বলার দরকারও পড়বে না। চল নিচে যাই। সাবধানে নামিস — সিঁড়ি পিছল। ধর আমার হাত ধর।'

আমি মামার হাত ধরে সাবধানে নিচে নামছি। সিঁড়ির গোড়ায় ইরা দাঁড়িয়ে আছে তার সুন্দর সাদা শাড়ি কাদায় মাখামাখি হয়েছে। ইরা বলল, 'আপা যে কজন বরযাত্রী এসেছে তাদের সবাইকে কাদায় চুবিয়ে দেয়া হয়েছে। একজন দৌড়ে পালাতে গিয়েছিল সে নিজেই খাদে পড়ে গেছে। আমাদের কিছু করতে হয় নি। তার অবস্থাই সবচে' করুণ। হি-হি-হি।'

বড় মামা বললেন, 'কাজটা ঠিক হচ্ছে না ছোট খুকি। এরা সম্মানিত মেহমান।'

'সম্মানিত মেহমানদের অবস্থাটা একটু দেখে আসুন মামা। সম্মানিত মেহমানরা এখন মনের আনন্দেই কাদায় গড়াগড়ি করছেন। হি-হি-হি।'

২

বাসর ঘরে ঢুকতে ঢুকতে রাত দুটা বেজে গেল। এর মধ্যে কত সমস্যা যে হল। ইলেকট্রিসিটি চলে গেল। বরযাত্রী একজনের মানিব্যাগ হারিয়ে গেল। ইরার এক বান্ধবীর কানের দুল খুলে পড়ে গেল। কলেজে পড়ে মেয়ে অথচ আকাশ ফাটিয়ে কান্না। এটা তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মার দুল। মা নাকি তাকে জ্যান্ত কবর দিয়ে ফেলবে। আবার বড় মামার শুরু হল মাইগ্রেন পেইন। এই বিশেষ ধরনের মাথাব্যথা যে এমন পর্যায়ে যেতে পারে আমার ধারণা ছিল না।

বড় মামা মাথার যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করছেন, অন্তু প্রবল বেগে তাকে বাতাস করছে এই অবস্থায় আমি বাসর ঘরে ঢুকলাম। ইরার বান্ধবীরা খাট ভালোমতো সাজাতে পারে নি। কাগজের ফুল দিয়ে জবরজং কী বানিয়ে রেখেছে। মামা যে ভেলভেটের চাদর এনেছেন সেটা সাইজে ছোট হয়েছে। চারদিকে তোশক বের হয়ে আছে। চাদরে গোলাপ ফুল দিয়ে লিখেছে 'ভালবাসা।' তাকালেই লজ্জা লাগে। খাটের পাশে একটা বেতের চেয়ার। রাখলই যখন, দুটা বেতের চেয়ার রাখলেই পারত। একটা কেন রেখেছে? সেই বেতের চেয়ারে সে বসে আছে। আমাকে দেখেই উঠে দাঁড়াল। উঠে দাঁড়িয়ে আবার নিজেই লজ্জা পেল। ধপ করে বসে পড়ল। ইরার সব বান্ধবীরা জানালার পাশে উঁকি–ঝুঁকি দিচ্ছিল। ওরা হেসে উঠল খিলখিল করে। আমি খাটের উপর বসলাম।

খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার যে আমি বসলাম সহজভাবেই। লজ্জায় অভিভূত হলাম না। তার দিকে চোখ তুলে তাকাতেও আমার লজ্জা লাগল না। আমি তাকালাম আগ্রহ নিয়ে। এই জীবন যার সঙ্গে কাটাব তাকে ভালো করে দেখতে ইচ্ছা করল। ইচ্ছাটা কি অন্যায়?

বিশেষত্বহীন চেহারার একজন মানুষ। মাথা খানিকটা নিচু করে বসে আছে। এরকম মানুষ পথেঘাটে, ট্রেনে বাসে কত দেখি। আগ্রহ নিয়ে এদের দিকে কখনো কেউ তাকিয়ে থাকে না। যেহেতু কেউ তাকিয়ে থাকে না সেহেতু তারাও বেশ নিশ্চিন্ত জীবনযাপন করে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে কাটা তরমুজ কিনে সারা মুখে রস মাখিয়ে খায়। রাস্তায় যেতে যেতে শব্দ করে নাক ঝাড়ে।

ঘরে আলো কম। ইলেকট্রিসিটি চলে যাওয়ায় ইরা একটা হারিকেন এবং একটা মোমবাতি দিয়ে গেছে। বাতাসে মোমবাতি যেভাবে কাঁপছে তাতে মনে হয় যে কোনো মুহূর্তে নিভে যাবে। সে আমাকে দেখছে না। তার হয়তো লজ্জা লাগছে। সে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মোমবাতির দিকে। এক সময় মোমবাতি নিভে গেল সে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে মোমবাতি জ্বালাল। যেন বাতি জ্বালিয়ে রাখাই তার প্রধান কাজ। ইরার বান্ধবীরা আবারো হাসছে খিলখিল করে। সে খুব লজ্জা পাচ্ছে। অসহায়ের মতো তাকাচ্ছে আমার দিকে। আমি হেসে ফেললাম। কেন হাসলাম নিজেই জানি না। আমি হাসি শাড়ির আঁচলে লুকানোর চেষ্টা করলাম না। মনে হয় সহজভাবে হেসে আমি মানুষটাকে অভয় দিতে চেষ্টা করলাম। সে অন্যদিকে তাকিয়ে প্রায় অস্পষ্ট স্বরে বলল, 'তোমার মামার মাথাব্যথা কি খুব বেশি?'

আমার সঙ্গে এই তার প্রথম কথা। আমি বললাম, 'হ্যাঁ বেশি।'

সে তৎক্ষণাৎ বলল, 'আমার এক বন্ধুর স্ত্রীরও মাইগ্রেন আছে। ওর নাম অহনা। অকুপাংচারে চিকিৎসা করিয়েছিল, এতে কমেছে।'

মানুষটা কথা বলে সহজ হবার চেষ্টা করছে। আমি তাকে সুযোগ করে দেবার জন্যেই বললাম, 'অকুপাংচার কী?' যদিও আমি খুব ভালো করেই জানি অকুপাংচার কী।

সে নড়েচড়ে বসল। খুব আগ্রহের সঙ্গে বলল, 'অকুপাংচার হল এক ধরনের চায়নিজ চিকিৎসা। সুচ ফুটিয়ে দেয়।'

'ব্যথা লাগে না?'

'লাগে, খুব অল্প।'

তার কথা ফুরিয়ে গেল। সে এখন আবার তাকিয়ে আছে মোমবাতির দিকে। বোধহয় মনেপ্রাণে চাচ্ছে মোমবাতিটা নিভে যাক, তাহলে সে একটা কাজ পাবে, ছুটে গিয়ে মোমবাতি জ্বালাতে পারবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার বলতে ইচ্ছা করছে — তুমি মোমবাতি নিয়ে এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? তুমি আমার দিকে তাকাও। আমাকে এত লজ্জা পাবার কিছু নেই। তোমাকে আমার পছন্দ হয়েছে।

আসলেই মানুষটাকে আমার পছন্দ হয়েছে। সে ইরার উপন্যাসের নায়ক শুভ্র নয়। সে সাধারণ একজন মানুষ। অস্বস্তি, দ্বিধা এবং খানিকটা লজ্জা নিয়ে সে বেতের চেয়ারে চুপচাপ বসে আছে। কোনো কথা পাচ্ছে না বলেই অকুপাংচার নিয়ে এসেছে। সেই বিষয়েও বেচারা বোধহয় কিছু জানে না। জানলে আরো কথা বলত।

'সফিকেরও আমার সঙ্গে আসার কথা ছিল। সে হঠাৎ চলে গেল ব্যাংকক।'

'সফিক কে?'

'যার কথা একটু আগে বললাম — অহনা। তার স্বামীর নাম সফিক। আমার ছেলেবেলার বন্ধু। আমি ওর অফিসেই কাজ করি। আমার বস।'

'ও আচ্ছা।'

'আমার বস শুধু না প্রতিষ্ঠানের মালিকও —তবে আমার সঙ্গে ব্যবহার বন্ধুর মতো। বিরাট বড়লোক। তার বাড়ি দেখলে তোমার মাথা ঘুরে যাবে। ছাদে সুইমিং পুল।'

'খুব সুন্দর?'

'খুবই সুন্দর। মাঝে মাঝে জোছনা রাতে সুইমিং পুলের পাশে সে পার্টি দেয়। অপূর্ব লাগে।'

সে খুব আগ্রহ নিয়ে কথা বলছে। আমি লক্ষ করছি মানুষটার উপর আমার মায়া পড়ে যাচ্ছে। তার দিকে তাকিয়ে থাকতে ভালো লাগছে, তার কথা শুনতে ভালো লাগছে। শুরুতে তার চেহারা যতটা সাধারণ মনে হচ্ছিল এখন ততটা সাধারণ মনে হচ্ছে না। তার চোখ দুটা খুব সুন্দর লাগছে। মাথা ঝুঁকিয়ে কথা বলার ভঙ্গিও সুন্দর।

কেন এত অল্প সময়ে লোকটির উপর আমার মায়া পড়ল? এই মায়ার উৎস কী? এই ব্যাপারটা কি সব মেয়ের ক্ষেত্রেই ঘটে, না শুধু আমার বেলায় ঘটল? এই লোকটির সঙ্গে বিয়ে না হয়ে অন্য কারো সঙ্গে বিয়ে হলে তার উপরও কি এত দ্রুত মায়া পড়ে যেত? তার চোখও কি সুন্দর লাগত?

মোমবাতি আবার নিভে গেছে। সে উৎসাহের সঙ্গে আবার ছুটে গেছে। আমি তাকিয়ে তাকিয়ে তার মোমবাতি জ্বালানো দেখছি। দেয়াশলাইয়ের কাঠি বার বার নিভে যাচ্ছে। সে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমাদের এখানে খুব বাতাস। তোমাদের বাড়িটা কি দক্ষিণমুখী?'

'না।'

'তোমাদের এদিকে বোধহয় খুব বৃষ্টি হয়।'

'হ্যাঁ খুব বৃষ্টি।'

'যেভাবে বৃষ্টি হচ্ছে, শিওর বন্যা হবে।'

দরজায় ঠক্‌ঠক্‌ শব্দ হচ্ছে। সে আমার দিকে তাকাল। আমি উঠে গিয়ে দরজা খুললাম। কী আশ্চর্য! ছোট খালা। অতিথপুর থেকে ছোট খালা চলে এসেছেন। তিনি খবরই পেলেন কীভাবে, এলেনই বা কীভাবে? ছোট খালার হাতে ট্রে। ট্রেতে দু কাপ চা। ছোট খালা হাসিমুখে বললেন — 'চা দেয়ার অজুহাতে জোর করে ঢুকে পড়লাম। ও নবনী, তোর বরের সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দে।'

আমি ওর দিকে তাকিয়ে বললাম, 'উনি আমার ছোট খালা। আমার খুব প্রিয় একজন মানুষ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে পা ছুঁয়ে সালাম করল।

ছোট খালা বললেন, 'ও নবনী, তোর বর যে আমাকে সালাম করল — আমি খালি হাতে এসেছি। যাই হোক দেখি সকালে ব্যবস্থা করা যায় কিনা। তোরা দুজন দু মাথায় বসে আছিস কেন? বাবা, তুমি নবনীর পাশে গিয়ে বস। ছোটাছুটি করে মোমবাতি জ্বালাতে তোমাকে কে বলেছে? চা খেয়ে মোমবাতি হারিকেন দুটাই নিভিয়ে প্রাণভরে গল্প কর। মেয়েরা সব জানালায় ভিড় করে আছে। বাতি নিভিয়ে দিলে কিছু দেখা যাবে না। ওরা ভিড় কমাবে। বুঝতে পারছ?'

ছোট খালা ওকে হাত ধরে আমার পাশে বসিয়ে দিয়ে বললেন, 'নবনীর মতো সুন্দর মেয়ে কি তুমি এর আগে কখনো দেখেছ? বল হ্যাঁ কিংবা না।'

ও হাসল। ছোট খালা আমাদের চা খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত বসে রইলেন। যাবার সময় বাতি নিভিয়ে গেলেন। ও উঠে গিয়ে অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে ছিটকিনি লাগাল। খাটের দিকে আসতে গিয়ে চেয়ারের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। আমি উঠে এসে তাকে ধরলাম। ও লাজুক গলায় বলল, 'মোটেও ব্যথা পাই নি। তোমাকে ধরতে হবে না।'

আমি হাত ধরে তাকে খাটের দিকে নিয়ে যাচ্ছি। মনে মনে ভাবছি — ইরার উপন্যাসের সেই নায়ক শুভ্রকেও কি তার স্ত্রী ধরে ধরে খাটের দিকে নিয়ে যেত?

'নবনী।'

'উঁ।'

'তুমি খুব বেশি সুন্দর। আরেকটু কম সুন্দর হলে ভালো হত।'

'কম সুন্দর হলে ভালো হত কেন?'

'এমনি বললাম, কথার কথা। সফিক তার স্ত্রীকে সবসময় এই কথা বলে।'

'উনার স্ত্রী কি খুব সুন্দর?'

'হ্যাঁ খুব সুন্দর। কালো কিন্তু সুন্দর। তার নামটাও অদ্ভুত। অহনা। আর কোনো মেয়ের এমন নাম শুনেছ?'

'না।'

'নবনী।'

'কি?'

'আমি এর আগে কখনো কোনো মেয়ের হাত ধরি নি। এই যে তোমার হাত ধরেছি, কেমন যেন ভয় ভয় লাগছে। এই দেখ, আমার শরীর কাঁপছে।'

ওর কথা শুনে আমার কী যে ভালো লাগল! চোখে পানি এসে গেল। বাসর রাতে সব মেয়েই বোধহয় কোনো-না-কোনো উপলক্ষে চোখের পানি ফেলে। আমিও ফেললাম। আমার সেই চোখের পানিতে আনন্দ ছিল, সুখ ছিল। সেই সুখ ও আনন্দের তেমন কোনো কারণ ছিল না। অকারণ সুখ অকারণ আনন্দও তো মানুষের জীবনে মাঝে মাঝে আসে।

রাত এখন কত আমি জানি না। আমার হাতে ঘড়ি নেই। একটা ঘড়ি ছিল। ইরার বান্ধবীরা ঘড়ি খুলে নিয়েছে। বাসর ঘরে নাকি ঘড়ি নিয়ে ঢুকতে নেই। ঘড়ি নিয়ে ঢুকলেই কিছুক্ষণ পর পর ঘড়ি দেখতে ইচ্ছে করবে। বাসর রাতটা হবে এমন যেখানে সময় বলে কিছু থাকবে না। আমি ইরার বান্ধবীদের সঙ্গে কোনো তর্ক করি নি। ওরা ঘড়ি খুলতে চেয়েছে। আমি খুলে দিয়েছি। ওরা যদি ভাবে ঘড়ি খুলে রাখলেই সময় বন্ধ হয়ে যাবে — ভাবুক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও বিছানার একপাশে গুটিশুটি মেরে ঘুমাচ্ছে। খাটের একেবারে শেষপ্রান্তে চলে গেছে। আমার কেবলই ভয় হচ্ছে এই বুঝি গড়িয়ে নিচে পড়ে গেল। ইচ্ছে করছে তাকে নিজের কাছে টেনে নেই। ইচ্ছে করলেও সম্ভব না। মানুষের সব ইচ্ছা পূর্ণ হবার নয়। তবে আমি বেতের চেয়ারটি খাটের পাশে এনে রেখেছি। গড়িয়ে পড়লেও মেঝেতে পড়বে না। চেয়ারের উপর পড়বে।

বৃষ্টি কিছু সময়ের জন্যে থেমেছিল। এখন আবার প্রবল বেগে শুরু হয়েছে। বাতাসও দিচ্ছে। শোঁ শোঁ শব্দ হচ্ছে। এ বাড়ির কেউই বোধহয় ঘুমায় নি। বারান্দায় তাদের হাঁটাহাঁটির শব্দ পাচ্ছি। হাসাহাসির শব্দও হচ্ছে। সবচে' বেশি হাসছে ইরা। খিলখিল খিলখিল। হাসছে তো হাসছেই। ইরা বোধহয় আজ হাসির বিশ্ব রেকর্ড করল। কী নিয়ে তাদের এত হাসাহাসি? কাদাখেলা কি শেষ হয় নি? নাকি আজ সারারাতই চলবে?

আমার ঘুম আসছে না। আমি ভোর হবার জন্যে অপেক্ষা করছি। ভোরবেলা একা একা ছাদে খানিকক্ষণ হাঁটব। ও যদি জেগে থাকে — ওকেও সঙ্গে নেব। আমার ধারণা এই পৃথিবীতে অল্প যে ক'টি সুন্দর জায়গা আছে আমাদের বাসার ছাদটা তার একটা। উঁচু রেলিং দিয়ে ছাদটা ঘেরা। শ্যাওলা জমে রেলিং হয়েছে গাঢ় সবুজ। মনে হয় ইট পাথরের রেলিং নয় — সবুজ লতার রেলিং। বাড়ির পেছনের প্রকাণ্ড শিরীষ গাছটা বেঁকে এসে ছাতার মতো ছায়া ফেলেছে ছাদের উপর। গাছ ভর্তি টিয়া পাখি। সকাল এবং সন্ধ্যায় ঝাঁক বেঁধে টিয়া পাখি উড়তে থাকে। তীক্ষ্ণ গলায় ডাকে ট্যাঁ ট্যাঁ। টিয়া পাখিগুলো খুব অদ্ভুত। এরা মানুষের দেয়া খাবার কখনো খায় না। আমি কতবার ছাদে চাল ছড়িয়ে দিয়েছি — কাক এসে খেয়ে গেছে। টিয়ারা কাছে আসে নি।

ভোরবেলা যদি বৃষ্টি না হয় তাহলে আমি ইরাকে বলব আমাদের দুজনকে ছাদে চা দিতে। ইরা মনে মনে হাসবে। পরে হয়তো ঠাট্টাও করবে। করুক ঠাট্টা। এমন একটা সুন্দর জিনিস ওকে না দেখিয়ে নিয়ে যাব তা হয় না। তাছাড়া আমি ঠিক করেছি — চা খেতে খেতে ভোরের প্রথম আলোয় ওকে বলব — আমার জীবনের ভয়াবহ সমস্যার কথা। ওকে সমস্যাটা বলে রাখা দরকার। সব শোনার পর সে যদি বলে — নবনী! তুমি এখানেই থাক। তোমাকে আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাব না। তাহলে এখানেই থেকে যাব। বিশাল এই বৃক্ষের ছায়ায় বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে আমার খুব খারাপ লাগবে না। সেই মানসিক প্রস্তুতি আমার আছে।

ওকে আমি কীভাবে কথাটা বলব? শুরু করাটাই সমস্যা। একবার শুরু করলে বাকিটা আমি তরতর করে বলে যেতে পারব। শুরু করব কীভাবে? এইভাবে কি শুরু করা যায়?—

'এই শোন, আমার এক সময় একজনের সঙ্গে খুব ভাব ছিল।'

না এভাবে শুরু করা যায় না। পৃথিবীর কোনো স্বামীই বিয়ের পরদিন এ ধরনের কোনো কথা শুনতে চায় না। কোনো স্বামীই গোপন সত্য শুনতে চায় না। তারা শুনতে চায় মধুর মিথ্যা।

এক সময় একজনের সঙ্গে আমার খুব ভাব ছিল এটা এমন ভয়াবহ কোনো ব্যাপারও নয়। ভাব তো থাকতেই পারে। তবে খুব ভাব ছিল — সমস্যাটা এইখানেই। 'খুব' বলে একটা ছোট্ট বিশেষণ আছে। আমি ইচ্ছা করে বসাই নি। নিজের অজান্তেই চলে এসেছে।

উনার নাম ...।

থাক নামটা বাদ থাক। নামের দরকার নেই। উনি ছিলেন আমাদের কলেজের ইতিহাসের শিক্ষক। বয়স অল্প। পাস করে প্রথমেই এই কলেজে এসেছেন। এখানেই তাঁর চাকরি জীবনের শুরু। তাঁকে দেখে আমাদের মেয়েদের মধ্যে খুব হাসাহাসি পড়ে গেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাসাহাসির প্রধান কারণ তাঁর পরনে জোব্বা ধরনের পোশাক। গোড়ালি পর্যন্ত পায়জামা। থুঁতনিতে ছাগল দাড়ির মতো ফিনফিনে একগোছা দাড়ি। তিনি চোখে সুরমা দেন। ক্লাসে যখন পড়ান তখন কখনো মেয়েদের দিকে তাকান না। মেঝের দিকে তাকিয়ে পড়ান। হঠাৎ কারো চোখে চোখ পড়ে গেলে লজ্জায় লাল হয়ে যান। তবে পড়ান খুব সুন্দর। এরকম অল্পবয়স্ক একজন মৌলানাকে বেছে বেছে তারা মেয়েদের কলেজে কেন দিল কে জানে। কলেজের সব স্যারদের নাম থাকে। তাঁর নাম হল "চেংড়া হুজুর।"

আমরা নানাভাবে তাঁকে যন্ত্রণা করি। যেমন তিনি রেজিস্টার খাতা হাতে যখন ক্লাসে ঢোকেন তখন আমরা সবক'টি মেয়ে একসঙ্গে চেঁচিয়ে বলি — 'আসসালামু আলায়কুম।' আমাদের এই সমবেত চিৎকারে কলেজ কেঁপে ওঠে। তিনি ফ্যালফ্যাল করে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে অসহায় ভঙ্গিতে বলেন — 'ওয়ালাইকুম সালাম।' তাঁকে ভয়ঙ্কর সব পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। যেমন একদিন ক্লাসের পড়া শেষ করে বললেন, 'কারো কোনো প্রশ্ন আছে?' আমাদের ক্লাসের সবচে' স্মার্ট মেয়ে মকবুলা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'জি স্যার আছে।'

'বল।'

'আপনি এমন অদ্ভুত পোশাক পরে ক্লাসে আসেন কেন?'

'অদ্ভুত পোশাক তো না। আমাদের নবীজী এই পোশাক পরতেন।'

'নবীজী তো উটে চড়ে ঘোরাফেরা করতেন। আপনি উটে না চড়ে রিকশায় আসেন কেন?'

'উটের প্রচলন এখানে নেই। থাকলে হয়তো আসতাম।'

হো-হো করে আমরা হেসে উঠলাম। স্যার চোখ-মুখ লাল করে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে করুণ গলায় বললেন, 'আচ্ছা যাই — আসসালামু আলায়কুম।'

আমরা সমস্বরে হুংকার দিয়ে উঠলাম — 'ওয়ালাইকুম সালাম।' আমাদের হুংকারে কলেজ বিল্ডিং কেঁপে উঠল।

একদিন বিকেলে ছাদে হাঁটছি, মা এসে বলল, বাইরে এক ভদ্রলোক এসেছেন। তোর বাবা চা চাচ্ছে। চা দিয়ে আয়। আমি দুকাপ চা নিয়ে ঢুকে অবাক হয়ে দেখি — আমাদের চেংড়া হুজুর। আজ তাঁর পোশাক আরো চমৎকার। মাথায় পাগড়ি পরেছেন। বিয়ের আসরে ছেলেরা পাগড়ি পরে বলে জানি, কিন্তু কেউ যে পাগড়ি পরে অন্যের বাড়িতে বেড়াতে আসতে পারে তা জানা ছিল না। ভদ্রলোক কি উন্মাদ? তিনি আমাকে দেখে মাথা নিচু করে ফেললেন। বাবা বললেন, 'নবনী উনি মহিলা কলেজের একজন শিক্ষক। আমাদের যে বাড়তি দুটা ঘর আছে ঐ ঘর দুটা তিনি ভাড়া নেবেন।'

আমি বললাম, 'বাবা আমি উনাকে চিনি। উনি আমাদের ইতিহাস পড়ান।'

'ইতিহাস পড়ান? বলিস কী! আমি তো ভেবেছি এরাবিকের টিচার।'

স্যার মেঝের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জেনারেল হিস্ট্রিতে এম.এ. করেছি।'

বাবা উৎসাহের সঙ্গে বললেন, 'ও আচ্ছা। তাহলে তো ভালোই হল। গুড। ভেরি গুড। একসেলেন্ট।'

আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে বললাম, 'কেমন আছেন স্যার?' তিনি ঠিক আগের মতোই মাটির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ভালো। তুমি ভালো আছ নবনী?'

স্যার যে আমার নাম জানেন তা জানতাম না। আমি চমকে উঠলাম।

'চা নিন স্যার। চুমুক দিয়ে দেখুন চিনি হয়েছে কিনা।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্যার আমার দিকে তাকালেন। কী আশ্চর্য, এত সুন্দর চোখ! কী শান্ত! কী মায়াকাড়া! নাকি এসব আমার কল্পনা। স্যার চোখ নামিয়ে নিয়েছেন। আমার বলতে ইচ্ছা করছে, আপনি আমার দিকে তাকিয়ে চা খান তো স্যার। মেঝের দিকে তাকিয়ে আছেন কেন? মেঝেতে কী আছে দেখার?

টিয়া পাখির ট্যাঁ ট্যাঁ শোনা যাচ্ছে।

ভোর হয়ে গেছে। বৃষ্টি এখনো থামে নি। আমি দরজা খুলে বাইরে এসে দেখি আমাদের বিদায়ের আয়োজন চলছে। ভোরবেলা ট্রেন। এক্ষুনি রওনা না হলে ট্রেন ধরা যাবে না। বড় মামা সবাইকে তাড়া দিচ্ছেন।

আমার সমস্যার গল্প আজ আর বলা হল না।

৩

আমি ঢাকায় ওর বাসায় উঠে এলাম।

সেগুন বাগিচায় অফিসের সাথেই বাসা। একতলা দোতলা জুড়ে অফিস। দোতলার পেছন দিকে ওর বাসা। একটা মোটে ঘর। বারান্দার খানিকটা অংশ আলাদা করে রান্নাঘর। গ্যাসের ব্যবস্থা নেই। কেরোসিনের চুলায় রান্না। বারান্দার অন্য মাথায় বাথরুম। বাথরুম এবং রান্নাঘরের মাঝের ফাঁকা জায়গাটায় আট–দশটা ফুলের টব। সপ্তম আশ্চর্যের মতো সেখানে একটা পাখির খাঁচায় ময়না পাখি।

ও খুব আগ্রহ করে বলল, 'বুঝলে নবনী! এই ময়না মানুষের চেয়ে সুন্দর করে কথা বলে। দুদিন যাক, দেখবে তোমার গলা হুবহু নকল করবে। এ নকলে খুব ওস্তাদ।'

ময়না বেশ আগ্রহ নিয়ে আমাকে দেখছে। কোনো কথা বলছে না। আমি বললাম, 'কই, কথা বলছে না তো?'

'হঠাৎ তোমাকে দেখেছে — এই জন্যে। কয়েকদিন যাক, তারপর দেখবে ওর কথার যন্ত্রণায় থাকতে পারবে না। আমার বাড়িঘর তোমার পছন্দ হয় নি, তাই না নবনী?'

'হয়েছে।'

'পছন্দ যে হয় নি সেটা তোমার মুখ দেখেই বুঝতে পারছি। একা মানুষ তো, বিরাট বাড়ি নিয়ে কী করব? তাছাড়া বাড়িটা কিন্তু ভালো। খুব হাওয়া। ছাদে যাওয়ার সিঁড়ি আছে। ছাদে যাওয়া যায়। ছাদে যাবে? আচ্ছা, পরে তোমাকে নিয়ে যাব। টায়ার্ড হয়ে এসেছ, এখন রেস্ট নাও। আমি চা নিয়ে আসি।'

ও ঘর থেকে ফ্লাস্ক নিয়ে ব্যস্ত ভঙ্গিতে নেমে গেল। এই বাসার সবকিছুই ছোট ছোট। সে যে ফ্লাস্কটা নিয়ে বের হয়েছে সেটিও ছোট। এক কাপ চা ধরবে কিনা কে জানে। আমি ঘুরেফিরে তার সংসার দেখতে লাগলাম।

শোবার ঘরে একটা খাট। সেই খাটে একটাই বালিশ। আমার জন্যে দ্বিতীয় বালিশ কেনে নি। হয়তো আজ সন্ধ্যাবেলা বালিশ কিনতে যাবে। কিংবা কে জানে হয়তো একটা বালিশেই দুজনকে ভাগাভাগি করে ঘুমাতে হবে। একটা লেখার টেবিল খাটের সঙ্গে লাগানো। টেবিলের সঙ্গে চেয়ার নেই। কাজেই ধরে নেয়া যায় লেখালেখির কাজ খাটে বসে সারা হয়। টেবিলের পাশে মিটসেফের মতো আছে। সেখানে নতুন একটা টি–সেট। দেখেই বোঝা যাচ্ছে এই টি–সেট এখনো ব্যবহার করা হয় নি। কাপড় রাখার আলনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছে। আলনায় কাপড় নেই। কয়েকটা তোয়ালে এবং গামছা ভাঁজ করে রাখা। কে জানে হয়তো তোয়ালে রাখার জন্যেই এই আলনা।

দেয়ালে কিছু বাঁধানো ছবি আছে। একটি তার বাবার ছবি। চেহারার মিল থেকে বলে দেয়া যায়। তার পাশের ছবিটি বোধহয় তার মার। এই মহিলা খুব রূপবতী ছিলেন।

ফ্রেম বাঁধানো নজরুল ইসলামের একটা হাতে আঁকা ছবি আছে। ছবির নিচে লেখা Art by Noman Class VIII Section B. সাহেব তাহলে ছেলেবেলায় শিল্পী ছিলেন।

খাটের নিচে রাজ্যের জিনিস। তার মধ্যে মাটির পালকি এবং পুতুল আছে। এইগুলো কী জন্যে রাখা কে জানে। জিজ্ঞেস করতে হবে।

আমি হাত-মুখ ধোবার জন্যে বাথরুমে ঢুকলাম। বাথরুমটা ঝকঝকে। আমাদের নেত্রকোনার বাড়ির বাথরুমের মতো অন্ধকার এবং স্যাতস্যাতে নয়। সবচে' বড় কথা — বাথরুমের উপরের দিকে ভেন্টিলেটারের মতো আছে, যে ভেন্টিলেটার দিয়ে আকাশ দেখা যায়। গায়ে পানি ঢালতে ঢালতে আকাশ দেখার মতো আনন্দের আর কী আছে?

মুখে পানি ঢালতেই শরীর জুড়িয়ে গেল। হঠাৎ করে মনে হল আমাদের দুজনের জন্যে এরকম একটা ছোট্ট ঘরেরই দরকার ছিল।

ও শুধু চা আনে নি, একটা ঠোঙায় কিছু জিলাপি। আরেক ঠোঙায় কিছু নোনতা বিসকিট। সে মিটসেফ থেকে কাপ বের করছে। আমি দেখলাম, দুটা না, সে একটা কাপ বের করেছে। ঐ কাপটি সে এগিয়ে দিল আমার দিকে। নিজে চা ঢালল ফ্লাস্কের মুখে। যেন আমি খুব সম্মানিত একজন মেহমান। বাইরের কেউ।

'নবনী। টি-সেটটা নতুন কিনেছি। সুন্দর না?'

'হ্যাঁ, খুব সুন্দর।'

'সেট হিসেবে কিনলে দাম বেশি লাগে। আমি আলাদা আলাদা কিনে সেট বানিয়েছি অনেক সস্তা পড়েছে।'

'ও আচ্ছা।'

'বিকালে তোমাকে নিয়ে বের হতে হবে। টুকটাক অনেক জিনিস কিনতে হবে। বালিশ কিনতে হবে। তোমার কি কোলবালিশ লাগে?'

'না।'

'তোমার জন্যে একটা ড্রেসিং টেবিল কিনেছি। এগার তারিখ ডেলিভারি দেয়ার কথা ছিল, নিতে গেলাম, বলে — পালিশ হয় নাই। এখন বোধহয় পালিশ হয়ে গেছে, নিয়ে আসব। আরেকটু চা দেই, ফ্লাস্কে চা আছে। তিন কাপ চা আঁটে।'

আমি ওকে খুশি করার জন্যেই আরেকটু চা নিলাম। শরবতের মতো মিষ্টি চা। মুখে দিলেই পেটের নাড়িভুঁড়ি পর্যন্ত মিষ্টি হয়ে যায়।

'নবনী শোন, আমি অফিসে যাই। কিছু জরুরি কাজ ছিল। তুমি একা থাকতে পারবে তো?'

'পারব।'

'গোসল সেরে দরজা বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়। তুমি টায়ার্ড হয়ে আছ তোমার ঘুম দরকার।'

'আচ্ছা।'

'একা একা ভয় পাবে না তো?'

'ভয় পাবার কিছু আছে কি?'

'ভয় পাবার কিছুই নেই। খুব সেইফ জায়গা। অফিসের তিন জন দারোয়ান আছে। এরা সব সময় পাহারা দেয়। আর আমি তো আছিই। আমি মাঝে মাঝে খোঁজ নিয়ে যাব।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'খোঁজ নিতে হবে না। আমি ভালোই থাকব।'

'ছোট বাসা দেখে তোমার মন খারাপ হয় নি তো নবনী?'

'না।'

'দিন এরকম থাকবে না। নিজেই এক সময় ব্যবসা শুরু করব। এ্যাড ব্যবসার ব্যাপার-স্যাপার আমি এখন সবই জানি। সাহস করে শুরু করলেই হয়। আরেকটু চা দেই? ফ্লাস্কে আছে খানিকটা।'

ও চা ঢেলে দিল। তার মুখ হাসি হাসি। বারান্দায় ময়নাটার কাছে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে বলল — 'কথা বল, এই ময়না, কথা বল। বল দেখি— নবনী! নবনী!'

ময়না খাঁচার ভেতরে ছট্‌ফট্‌ করছে। কথা বলছে না। আমি খাটে বসে দেখছি, ও পকেট থেকে কলা বের করে খোসা ছাড়িয়ে সে ময়নাকে দিচ্ছে। গলার স্বর অনেকখানি নামিয়ে প্রায় অনুনয়ের ভঙ্গিতে বলছে — 'কথা বল না রে বাবা। বল — নবনী! নবনী! কী হয় কথা বললে?'

আমাকে শুনানোর জন্যেই বেচারার এই চেষ্টা। এই পৃথিবীতে তার যা কিছু দেখানোর আছে সবই সে আমাকে দেখাতে চায়। আমাকে অভিভূত করাই তার লক্ষ্য। তার প্রয়োজন ছিল না।

আমি বললাম, 'নজরুলের এই ছবি কি তোমার আঁকা?'

সে লজ্জিত গলায় বলল, 'হুঁ। ফেলে দেয়া উচিত। ফেলতে পারি না। মায়া লাগে।'

'ফেলার দরকার কী, সুন্দর ছবি তো। এখনো কি ছবি আঁক?'

'না না। কী যে তুমি বল। স্কুলে পড়ার সময় খুব আঁকতাম। নবনী আমি যাই। তাড়াতাড়ি চলে আসব।'

সম্পূর্ণ নতুন জায়গা, নতুন পরিবেশ। অচেনা ঘরের খাটে আমি শুয়ে আছি। ঘরের আলো কমে এসেছে। আবারো মেঘ করেছে। মনে হয় ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামবে। নামুক বৃষ্টি, সব ভাসিয়ে নিয়ে যাক। বৃষ্টি নামলে ময়নাটা ভিজবে। আমি কি ওকে নিয়ে আসব ভেতরে? নাকি ওর পানিতে ভিজে অভ্যাস আছে?

নিজের বাবা-মা, ভাই-বোন না, একটা পাখির কথা ভাবতে ভাবতে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। গাঢ় ঘুম। ঘুমের মধ্যেই শুনলাম বৃষ্টি পড়ছে। ঘুমের মধ্যেই পাখিটার ছটফটানি কানে গেল এবং এক সময় পাখিটা নবনী নবনী বলে আমাকে ডাকতেও লাগল। এটা হয়তো আমার ভুল। হয়তো আমার স্বপ্নের ক্ষুদ্র অংশ। কিছু কিছু সময়ে মানুষের স্বপ্ন ও সত্য মিলেমিশে এক হয়ে যায়। পাখিটা আমাকে ক্রমাগত ডাকছে— নবনী, নবনী। কী মিষ্টি, কী সুরেলা তার গলা! বৃষ্টিতে ভেসে যাচ্ছে চারদিক।

আমার ঘুম ভাঙল সন্ধ্যায়। বৃষ্টি নেই— চারদিক খটখট করছে। পুরোটাই তাহলে স্বপ্ন ছিল? আমি বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। নোমানকে দেখা যাচ্ছে— হাতে পলিথিনের দুটা ব্যাগ। ব্যস্ত ভঙ্গিতে গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকছে। সে কি অফিস থেকে আবার বাজারে গিয়েছিল?

বারান্দার দরজা খুলে আমি তার জন্যে অপেক্ষা করছি। ঘর অন্ধকার হয়ে আছে। ও আসুক। ও এলেই বাতি জ্বালাব।

'নবনী, খুব দেরি করে ফেললাম। অফিস থেকে বের হতেই সন্ধ্যা হয়ে গেল। নতুন একটা পার্টি এসেছে। কাজ নেই, শুধু বকর বকর করে। অফিস থেকে বের হয়েই একবার উঁকি দিয়েছি। দরজা বন্ধ। কয়েকবার ঠকঠক করলাম। দরজা খুলল না। বুঝলাম তুমি ঘুমাচ্ছ। চলে গেলাম ড্রেসিং টেবিলটার খোঁজে। ওদের সঙ্গেও নানান ঝগড়া।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ঝগড়া কেন?'

'আর বল কেন? এখনো পালিশ হয় নি। কারিগর নাকি ছুটিতে গেছে। পুরো টাকা অ্যাডভ্যান্স দেয়া, নয়তো অন্যখান থেকে কিনতাম। তোমার ঘুম হয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'চল আমরা বের হই। মেলা কাজ। টুকটাক জিনিস কিনব। রাতে আবার দাওয়াত।'

'দাওয়াত খেতে ইচ্ছা করছে না।'

'ইচ্ছা না করলেও যেতে হবে। উপায় নেই। আমার বস দাওয়াত দিয়েছে। সফিক। তোমাকে তো আগেই বলেছি আমার স্কুল জীবনের বন্ধু। তারই এ্যাড ব্যবসা। সফিকের আমার বিয়েতে যাবার কথা ছিল। যেতে পারল না — ব্যাংকক যেতে হল। ও আজ সকালের ফ্লাইটে এসেছে।'

'তোমার খুব ভালো বন্ধু?'

'অবশ্যই ভালো বন্ধু। তুই-তোকারি সম্পর্ক। আমি যে এত ছোট একটা কাজ করি, এটা নিয়ে তার কোনো মাথাব্যথা নেই। শুধু যে আমার সাথেই এই ব্যবহার করে তা না, সবার সাথে। অফিসের দারোয়ানের মেয়ের বিয়ে। অফিসের কেউ যায় নি — সফিক গিয়েছিল। তোমাকে নিয়ে এসেছি শুনে তৎক্ষণাৎ সে তোমার সঙ্গে দেখা করতে চলে আসছিল। তুমি ঘুমাচ্ছ ভেবে আনি নি।'

'এলে সমস্যাও হত। তাঁকে বসাতে কোথায়? শোবার ঘর ছাড়া এখানে আর ঘর কোথায়?'

'শোবার ঘরেই বসাতাম। সমস্যা নেই। ও পা মেলে মেঝেতে বসে কতদিন চা খেয়েছে। মানুষ হিসেবে ও অসাধারণ। দেখলেই বুঝবে। ফ্লাস্কটা দাও তো নবনী। চা নিয়ে আসি। চা খেয়েই বের হয়ে পড়ি।'

'ঘরে চা বানানোর ব্যবস্থা নেই?'

'না। আজ সব কিনব। আমি চা খাই না তো, এই জন্যে ব্যবস্থা রাখি নি। তুমি তো আবার খুব চা খাও।'

'কে বলল?'

'বাসর রাতে তোমার ছোট খালা চা নিয়ে এলেন, তুমি খুব আরাম করে খেলে — সবটা চা শেষ করলে। সেখান থেকেই বুঝলাম।'

ও হাসছে। সুন্দর করে হাসছে। আমার গোপন রহস্য ধরে ফেলেছে, সেই রহস্যভেদের হাসি। আনন্দ ও তৃপ্তির হাসি।

ফ্লাস্ক নিয়ে যাবার পথে ও আবার ময়নাটার সামনে দাঁড়াল। আবার সেই অনুনয়-বিনয় —'বল ময়না, বল, বল — নবনী। বল তো দেখি। সুন্দর করে বল — নবনী। ন-ব-নী। কলা খেতে দেব। কলা।'

ময়না কথা বলার সেই আশ্চর্য বিদ্যা গোপন করেই রাখল। একবার ডেকে ফেললে কী হয়? বেচারা এত চেষ্টা করছে কে জানে আমার সঙ্গে বিয়ে ঠিক হবার পর থেকেই সে হয়তো 'নবনী' ডাক শেখানোর চেষ্টা করছে।

ও ফ্লাস্ক নিয়ে চলে যাবার পরপরই ময়না ডেকে উঠল। অবিকল ওর মতো গলায় ডাকল — নবনী! নবনী! আমার সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। শরীর ঝিমঝিম করতে লাগল। কী অদ্ভুত ব্যাপার!

নোমান গেটের কাছ থেকে আবার ফিরে আসছে। হনহন করে আসছে। পাখির কথা শুনতে পেয়ে আসছে বলে মনে হয় না। পাখির গলা এতদূর যাবে না। অন্য কিছু হবে। হয়তো মানিব্যাগ ফেলে গেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'নবনী।'

'কি?'

'তোমার জ্বর–টর আসে নি তো? অফিস থেকে ফিরে তোমাকে দেখে মনে হচ্ছিল জ্বর এসেছে।'

'না, জ্বর আসে নি। তুমি কি জ্বরের খোঁজ নেবার জন্যে ফিরে এসেছ?'

'হ্যাঁ। দেখি কাছে আস তো। জ্বর আছে কিনা। দেখি।'

আমি ওর কাছে এগিয়ে এলাম। ও আমার কপালে হাত রাখল। বেচারা আমার শরীর ছুঁয়ে দেখার জন্যে ছুটে এসেছে। জ্বরের মতো একটা বাজে অজুহাত তৈরি করেছে। আমার বলতে ইচ্ছা করছে — শোন, তোমার যখনই আমাকে ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে করবে, ছুঁয়ে দেখবে। লজ্জা, দ্বিধা বা সঙ্কোচের কোনো কারণ নেই। আমি তা বলতে পারলাম না। কিছু কথা আছে যা অতি প্রিয়জনদেরও বলা যায় না। তবে ওর এই ছেলেমানুষি কৌশল আমি আমার পরবর্তী জীবনে অনেক অনেকবার কাজে লাগিয়েছি।

যখন আমার নিজের ইচ্ছে করেছে ও আমাকে ছুঁয়ে দেখুক, তখনি বলেছি — এই, দেখ তো আমার জ্বর কিনা। শরীরটা ভালো লাগছে না। ও আমার কপালে হাত রেখে বলেছে — গা পানির মতো ঠাণ্ডা, জ্বর নেই তো।

আমি হেসে ফেলেছি। ও আমার হাসি দেখে হকচকিয়ে গেছে তবে ব্যাপারটা ধরতে পেরেছে। বড়দের ছেলেমানুষি এক খেলা।

AMARBOI.COM

৪

'দেখলে কত বড় বাড়ি?'

সে এমনভাবে বলল যেন বাড়িটা ওর নিজের। আমি হাসলাম। ওর ছেলেমানুষিগুলো এখন আমার চোখে পড়তে শুরু করেছে। দোকানে কেনাকাটার সময় প্রথম চোখে পড়ল। যা দেখছে তা–ই দাম করছে। জাপানি একটা ডিনার সেট দাম করল। বাহান্ন পিসের সেট — দাম তের হাজার টাকা। সে গম্ভীর গলায় বলল, 'ফিক্সড্ প্রাইস?' ভাবটা এ–রকম যেন ফিক্সড্ প্রাইস না হলে সে দরদাম করে কিনে ফেলবে। দোকানদাররা মানুষ চেনে। কে কী কিনবে বা কিনবে না, তা চট করে ধরে ফেলে। সে জবাব পর্যন্ত দিল না। নোমান তাতে অপমানিত বোধ করল না বা রাগ করল না, পাশের দোকানে ফুলদানি দরদাম করতে লাগল। এক একটার দাম দুহাজার টাকা। এমন ভাবে দাম করছে যেন দুহাজার টাকা দামের ফুলদানি কয়েকটা কিনবে।

সফিক সাহেবের বাড়িতে ঢোকার পর থেকে সে আমাকে বুঝানোর চেষ্টা করছে যে এত সুন্দর বাড়ি এই শহরে আর নেই। বাড়িতে কটা ঘর, কটা বাথরুম সমানে বলে যাচ্ছে। আমরা বসার ঘরে বসে আছি। ঝাড়বাতি–টাতি দিয়ে এই ঘর এমন সাজানো যে এখানে বসে থাকতে ভালো লাগে না। মনে হয় সিনেমার একটা বাড়িতে বসে আছি। সফিক সাহেবকে খবর পাঠানো হয়েছে। তিনি এখনো নামছেন না। আমরা যেখানে বসে আছি সেখান থেকেই দোতলার সিঁড়ি চলে গেছে। ভদ্রলোক এই সিঁড়ি ধরেই নামবেন। মার্বেল পাথরের সিঁড়ি। এই সিঁড়িতে কোনোদিন হয়তো এক কণা ধূলিও পড়ে থাকে না। আমি সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে আছি।

'নবনী, বল তো এ বাড়ির বৈশিষ্ট্য কী?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ঢাকা শহরের সবচে সুন্দর বাড়ি।'

'তা তো বটেই, এ ছাড়া কী?'

'বলতে পারছি না।'

'এ বাড়ির ছাদে কী আছে বল?'

'ফুলের বাগান?'

'বাগান তো আছেই। রোজ গার্ডেন। এ ছাড়া কী আছে বল তোমাকে আগে বলেছিলাম। বাসর রাতে। মনে নেই?'

'মনে করতে পারছি না।'

'সুইমিং পুল। বিশাল সুইমিং পুল। বাড়ির ছাদে সুইমিং পুল থাকে কখনো শুনেছ?'

'না।'

'সফিকের আছে। চাঁদনী রাতে যে কী সুন্দর দেখা যায়! পানিতে চাঁদের ছায়া পড়ে। তখন বাড়ির সব বাতি নিভিয়ে দেয়া হয়। মেজাজ ভালো থাকলে অহনা ভাবি গান গান। উনি খুব সুন্দর গান জানেন।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ উনি টিভির এ গ্রেডের শিল্পী। তবে টিভিতে খুব কম যান। গত মাসে প্রোগ্রাম পেয়েছিলেন যান নি।'

সফিক সাহেব দোতলা থেকে নামছেন না। আমরা অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছি। নোমানের তাতে অসুবিধা হচ্ছে না। সে বাড়ির গল্প করেই যাচ্ছে। আমার অস্বস্তি লাগছে। মনে হচ্ছে খানিকক্ষণ পর দোতলা থেকে একটা কাজের লোক নেমে এসে বলবে, আজ উনার শরীরটা ভালো না, আরেকদিন আসুন। বুঝতে পারছি না আমরা কতক্ষণ বসে থাকব। নোমানের মনে হয় বসে থাকতে ভালোই লাগছে।

'নবনী।'

'উঁ।'

'ছাদের উপর এই যে এত বড় সুইমিং পুল কিন্তু সফিক এখন পর্যন্ত পানিতে নেমে দেখে নি।'

'কেন?'

'ও নাকি সুইমিং পুল বানিয়েছে পানি দেখার জন্যে। গোসলের জন্যে তার শাওয়ারই ভালো। অন্যের গোসল করা নোংরা পানিতে সে নামবে না। হা-হা-হা। ওর কথাবার্তার তুমি কোনো ঠিক পাবে না। তবে ও যা বলবে মনে হবে সেটাই সত্যি।'

'উনাদের ছেলেমেয়ে কী?'

'এখনো ছেলেমেয়ে হয় নি। মাত্র দুবছর আগে বিয়ে করেছে। ভাবি হলেন খুলনার মেয়ে।'

'ও আচ্ছা।'

'এত সুন্দর বাড়ি কিন্তু সফিকের পছন্দ না। ও তার নিজের ডিজাইনে আরেকটা বাড়ি বানাবে। ডিজাইন নাকি করা শুরু করেছে।'

'উনি কি আর্কিটেক্ট?'

'আরে না। পড়াশুনা করেছে বিজনেস ম্যানেজমেন্টে, তবে সে ইচ্ছা করলে বাড়ির ডিজাইন আর্কিটেক্টের চেয়ে অনেক ভালো করবে। যে কোনো আর্কিটেক্টের কান কেটে নিয়ে আসবে। ও পারে না এমন জিনিস নেই। এখন কী ঠিক করেছে জান? ছবি বানাবে। মুভি ক্যামেরা, লাইট ফাইট কিনে এলাহী কারবার করেছে।'

'তাই বুঝি?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'মুভি ক্যামেরার দামই পড়েছে ১৪ লাখ টাকা। টাকা অবশ্যি তার কাছে কোনো ব্যাপার না। ওর কাছে ১৪ লাখ যা ১৪ হাজারও তা।'

'উনি এখনো আসছেন না কেন?'

'আসবে। কাজে আটকা পড়ে গেছে আর কি? তোমার কি বসে থাকতে খারাপ লাগছে?'

'হ্যাঁ লাগছে।'

'এস তাহলে সফিকের লাইব্রেরিটা দেখ। লাইব্রেরি দেখলে মাথা ঘুরে পড়ে যাবে। দেখার মতো জিনিস। হেন বই নাই যা তুমি লাইব্রেরিতে পাবে না। আস তোমাকে লাইব্রেরি দেখাই।'

'লাইব্রেরি দেখতে ইচ্ছা করছে না।'

'ইচ্ছা করছে না কেন?'

'বুঝতে পারছি না। মনে হয় শরীর খারাপ করেছে।'

'মাথা ধরেছে?'

'হুঁ।'

'জ্বর নাকি দেখি, কাছে আস তো।'

সে আমার জ্বর দেখল আর তখনি সফিক সাহেব দোতলা থেকে নেমে এলেন।

ফর্সা লম্বা একজন মানুষ। মাথাভর্তি কোঁকড়ানো চুল। বড় বড় চোখ। তাঁর গায়ে নীল রঙের হাফ হাওয়াই শার্ট। পরনের প্যান্ট ধবধবে সাদা। ভদ্রলোক নামছেন হাসতে হাসতে। পায়ে চটি থাকার জন্যেই সিঁড়ির প্রতিটি ধাপে ফটফট শব্দ হচ্ছে। চটিতে এত শব্দ হবার কথা না। তিনি বোধহয় ইচ্ছে করেই শব্দ করছেন। কিংবা কে জানে বড়লোকেরা হয়তো এই ভাবেই নামে।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘদিনের পরিচিত ভঙ্গিতে বললেন, 'দাঁড়িয়ে পড়েছ যখন তখন আর বসার দরকার নেই — চল আমরা সরাসরি গাড়িতে উঠব। আর শোন নবনী, তোমাকে আমি তুমি করে বলছি। নোমানকে তুই করে বলি, তার স্ত্রীকে আপনি করে বলা সেই কারণেই শোভন না। তবু তোমার আপত্তি থাকলে এক্ষুনি বলে ফেল। প্রথমেই ডিসিশান হয়ে যাক। আপনি না তুমি?'

'আপনি আমাকে তুমি করেই বলবেন।'

'আমার ইচ্ছা ছিল এ বাড়িতেই তোমাদের খাওয়াব। আমার স্ত্রী সেই উপলক্ষে রান্নাবান্নাও করেছে। কিন্তু সন্ধ্যার পর ঝগড়া করে সে বাড়ি থেকে উধাও হয়েছে। কাজেই হোটেল ছাড়া গতি নেই। আমি যে নিচে নামতে দেরি করেছি তার মূল কারণ অহনাকে টেলিফোনে ট্রেস করার চেষ্টা করছিলাম। ঢাকা শহরে তার এক লক্ষ পরিচিত মানুষ। সে কোথায় গিয়ে বসে আছে কে জানে।'

নোমান বলল, 'ভাবি নেই! বলিস কী?'

'তুই দেখি আকাশ থেকে পড়লি! ও তো এরকম করেই।'

আমি বললাম, 'আজ না হয় বাদ থাকুক। আমরা অন্য একদিন আসব।'

'অন্য একদিন যে অহনাকে পাওয়া যাবে তোমাকে কে বলল? হোটেলে রিজার্ভেশন নেয়া আছে। চল যাই।'

ভদ্রলোক এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। অপরিচিত একজন মানুষ যখন এভাবে তাকিয়ে থাকেন তখন অস্বস্তি লাগে। কিন্তু উনি যে তাকিয়ে আছেন — তাতে অস্বস্তি লাগছে না। কেন লাগছে না, তাও আমি বুঝতে পারছি না। তিনি হঠাৎ বললেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'নবনী, এক মিনিট দাঁড়াও। তোমার একটা ছবি তুলে রাখি। এই মুহূর্তে তোমাকে সুন্দর দেখাচ্ছে। সৌন্দর্য কোনো ধ্রুব ব্যাপার না। ক্ষণে ক্ষণে বদলায়। আজ তোমাকে অপূর্ব লাগছে তার মানে এই না যে কালও লাগবে। সুন্দর যখন লাগছে তখন তা ধরে রাখা যাক। তুমি দাঁড়াও।'

আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। নোমান বলল, 'ওর আচার আচরণ আধাপাগলের মতো। তুমি ওর কথায় অস্বস্তি বোধ করছ না তো?'

'না।'

'অস্বস্তি বোধ করবে না। সফিকের স্বভাবই এরকম। ওর মধ্যে লোকাছাপার কোনো ব্যাপার নেই।'

এত বড় হোটেলে আমি আগে কখনো আসি নি। পুরোপুরি হকচকিয়ে যাবার মতো ব্যাপার। অথচ নোমান খুব সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে হাঁটাহাঁটি করছে। মনে হচ্ছে ও তার বন্ধুর সঙ্গে আগেও অনেকবার এসেছে। সফিক সাহেব হোটেলে পা দেবার পর থেকে আমার দিকে তেমন লক্ষ করছেন না। তিনি তাঁর বন্ধুকেই নিচু গলায় ক্রমাগত কীসব যেন বলছেন। সেও খুব চিন্তিত মুখে শুনছে। আমি যে তার সামনে আছি এটা বোধহয় এখন সে আর জানে না।

ডাইনিং হলের ঠিক মাঝখানে চারজনের টেবিলে আমরা আছি। আমি এবং নোমান পাশাপাশি বসেছি। সফিক সাহেব বসেছেন আমাদের সামনে। তিনি নোমানের সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে হঠাৎ আমাকে বললেন, 'চারজনের টেবিল কেন নিয়েছি জান নবনী? চারজনের টেবিল নিয়েছি, কারণ হঠাৎ অহনা এসে উপস্থিত হতে পারে। তার রাগ যেমন চট করে ওঠে আবার তেমনি চট করে পড়ে যায়। যদি এ রকম কোনো ঘটনা ঘটে, তাহলে সে খুঁজে পেতে বের করবে আমরা কোথায় আছি। তারপর হাসিমুখে উপস্থিত হবে। যেন কিছুই হয় নি। এ জন্যেই আমি খাবারের অর্ডার এখনো দিচ্ছি না। অপেক্ষা করছি। তোমার খিদে পায় নি তো?'

'জি না।'

'গুড। খিদেটা জমুক। খিদে ভালোমতো না জমলে খেতে পারবে না। যে হোটেল যত জমকালো তার খাবার তত খারাপ। নোমান, তুই মৃণালদের বাড়িতে একবার টেলিফোন করে দেখ তো। অহনা সেখানেও থাকতে পারে। আমি করেছিলাম, আমাকে 'নো' বলে দিয়েছে। তোকে বোধহয় বলবে না।'

ও উঠে চলে গেল। সফিক সাহেব সিগারেট ধরাতে ধরাতে আমার দিকে না তাকিয়ে হঠাৎ করে বললেন, 'নবনী শোন। তোমার সঙ্গে বিয়ের কথাবার্তা হবার পর নোমান আমার কাছে এসেছিল . . তোমার অতীত সম্পর্কে কী সব কথা শুনে ওর মনে বোধহয় কনফিউশন তৈরি হয়েছিল। আমি তাকে বলেছি এইসব কথাবার্তায় কান না দিতে। মফস্বল শহরে মোটামুটি যারা রূপবতী তাদের নিয়ে নানা গল্পগাথা তৈরি হয়। মেয়েগুলোর জীবন হয় অতিষ্ঠ। তুমি তো আর মোটামুটি রূপবতী না। ভয়ংকর রূপবতী। তোমাকে নিয়ে এক শ একটা গল্প তৈরি হবার কথা। যাই হোক আমি নোমানকে বলে দিয়েছি ও যেন তোমার অতীত নিয়ে কখনোই প্রশ্ন না করে। ও কি কিছু জিজ্ঞেস করেছে?'

'না।'

'একবার যখন না বলে দিয়েছি তখন আর প্রশ্ন করবে না। আর যদি করেও তুমি কিচ্ছু বলবে না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

‘আমার বলার মতো কিছু নেই।’

‘থাকলেও বলবে না। নতুন বিয়ে হওয়া মেয়েরা স্বামীর সঙ্গে দ্রুত ভাব করার জন্যে গড়গড় করে অনেক কিছু বলে দেয়। পরে সমস্যা হয়। নোমান ভালো ছেলে। আমি তাকে খুব পছন্দ করি। আমি চাই না — তুচ্ছ সব বিষয় নিয়ে ...’

সফিক সাহেব চুপ করে গেলেন, কারণ নোমান ফিরে আসছে। আমার বিরক্ত লাগছে। আমার সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপারে উনি কথা বলছেন কেন? তাছাড়া আমার সঙ্গে আজই তাঁর প্রথম কথা হচ্ছে। প্রথম আলাপে এ জাতীয় প্রসঙ্গ তোলার কোনো কারণ আছে কি?

সফিক সাহেব ওর দিকে তাকিয়ে বললেন — ‘পাওয়া গেছে?’

‘না।’

‘কোথায় আছে কিছু বলল?’

নোমান মিটিমিটি হাসছে। কোনো একটা আনন্দের খবর গোপন করতে গিয়ে বাচ্চা ছেলেমেয়েরা যেভাবে হাসে সে রকম হাসি। সফিক ওর হাসি দেখেই বললেন, ‘ও কি হোটেলের দিকেই রওনা হয়েছে?’

‘হ্যাঁ।’

‘গুড। তাহলে খাবারের অর্ডার দেয়া যাক। আমি আমার পছন্দেই খাবার দিতে বলি। এদের সব খাবার মুখে দেয়া যায় না। দু-একটা আইটেম শুধু এরা ভালো করে।’

সফিক সাহেব আমার দিকে ঝুঁকে এসে বললেন, ‘আমি যে একটা ছবি বানাচ্ছি নোমান কি তোমাকে বলেছে?’

‘জ্বি বলেছে।’

‘সেই ছবির নায়িকাকে কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখবে। তবে নায়িকার গায়ের রং কালো। কালো রঙের নায়িকা বাংলাদেশে চলবে বলে মনে হয় না। এদেশের নায়িকাদের গায়ের রং হতে হয় দুধে আলতায় এবং ওজন হতে হয় তিন মনের বেশি।’

আমি লক্ষ করলাম সফিক সাহেব আনন্দে ঝলমল করছেন। স্ত্রী আসছে এই খবরে কারো মুখ এত আনন্দময় হতে পারে আমার ধারণা ছিল না। ভদ্রলোককে এখন আমার ভালো লাগছে। অহনা নামের মেয়েটি মনে হচ্ছে খুব ভাগ্যবতী। আমি ভদ্রমহিলার জন্যে আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছি।

তিনি চলে এলেন দশ মিনিটের মাথায়। তাঁর গায়ের রং কালো। বেশ কালো। কিন্তু সেই কালো রঙেও একটা মানুষকে যে এত সুন্দর দেখা যায় আমি জানতাম না। হালকা কমলা রঙের সিল্ক শাড়ি পরেছেন। বেণি করা চুলের গোড়ায় ছোট ছোট নীল রঙের ফুল। নিশ্চয়ই প্লাস্টিকের ফুল। সত্যিকার ফুল নীল হয় না। তবে দেখাচ্ছে সত্যি ফুলের মতোই। তিনি হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকলেন। তাঁর ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ডাইনিং রুমটাও যেন হেসে উঠল।

সফিক সাহেব বললেন, ‘তুমি যে আসবে আমি জানতাম। এই দেখ তোমার জন্যেই ডাইনিং রুমের মাঝখানে টেবিল নিয়েছি। নবনী শোন, এই কালো মেয়েটা কোনার দিকের টেবিলে বসতে পারে না। ও সব সময় বসবে মাঝখানে।’

অহনা বললেন, ‘অবশ্যই আমি মাঝখানে বসব। এমনভাবে বসব যেন সবাই তাকায় আমার দিকে। এই দেখ এক্ষুনি তাকানো শুরু করেছে।’

আমি অবাক হয়ে লক্ষ করছি। ওরা নিজেদের মধ্যেই কথা বলছেন। আমরা দুজন যে আছি সেদিকে ওঁদের খেয়াল নেই। সফিক সাহেব একবার বললেন, ‘অহনা, নোমানের স্ত্রীর সঙ্গে কথা বল। ওর নাম নবনী। দেখ কী ভয়ংকর সুন্দর! প্রায় তোমার কাছাকাছি।’

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ভয়ংকর বলছ কেন? সুন্দর কি ভয়ংকর হয়?'

'মাঝে মাঝে হয়।'

অহনা আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন। হেসেই অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন — চিংড়ি মাছ খেলে কোলেস্টরেল বাড়ে না কমে এটা নিয়ে আলোচনা শুরু হল। অহনার ধারণা, কোলেস্টরেল কমে যায়। সফিক সাহেবের ধারণা তা না।

সফিক সাহেব বললেন, 'এত জিনিস থাকতে আমরা চিংড়ি মাছ নিয়ে আলোচনা করছি কেন?'

অহনা এতে খিলখিল করে হাসতে শুরু করলেন। যেন দারুণ মজার কথা। এদের সঙ্গে চুপচাপ বসে থাকতে আমার এত খারাপ লাগছে! নোমানের লাগছে না। ওরা যখন হাসছে নোমানও হাসছে। এরা যখন গভীর কোনো বিষয় নিয়ে কথা বলছে তখন সেও গম্ভীর মুখে কথা শুনছে। অহনা বললেন, 'নোমান, চিংড়ি মাছ সম্পর্কে তোমার কী ধারণা?'

'আমার কোনো ধারণা নেই ভাবি।'

'চিংড়ি মাছ খাওয়াটা কি মকরু না হালাল?'

'তাও জানি না।'

'তুমি দেখি কিছুই জান না। আচ্ছা একটা কাজ কর। চট করে হোটেলের শপ থেকে আমার জন্যে একটা জিনিস নিয়ে এস ... মাথা ধরার ট্যাবলেট। প্রচণ্ড মাথা ধরেছে। মাথা ধরা না কমলে কিছু খেতে পারব না।'

ও সঙ্গে সঙ্গে রওনা হল। আমার ভালো লাগছে না। আমার কেন জানি মনে হচ্ছে এই মহিলা খুব সূক্ষ্মভাবে আমাকে দেখিয়ে দিতে চাচ্ছেন যে আমার অবস্থান অনেক নিচে। তাঁদের চাকর-বাকরদের কাছাকাছি।

সফিক সাহেব কি বুঝতে পারছেন যে আমি নোমানকে এভাবে উঠিয়ে দেয়ার ব্যাপারটা পছন্দ করি নি। কারণ তিনি কেমন যেন লজ্জিত ভাবে আমার দিকে তাকাচ্ছেন। তিনি কোমল গলায় বললেন, 'নবনী।'

'জ্বি।'

'চিংড়ি মাছ সম্পর্কে তোমার কী ধারণা? এটা খাওয়া কি হালাল, মকরু না নিষিদ্ধ।'

'সামুদ্রিক চিংড়ি যদি হয় তাহলে হালাল। আমার একজন স্যার ছিলেন এই সব ব্যাপারে খুব ভালো জানতেন। তিনি বলেছেন কোরান শরিফের একটা আয়াত আছে তাতে বলা হয়েছে — ''সমুদ্রের শিকার ও তার খাদ্য তোমাদের জন্যে হালাল।''

'সমুদ্রে তো সাপও আছে। সেই সাপও কি হালাল?'

আমি কিছু বললাম না। সফিক সাহেব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। যেন আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বিশেষ কিছু ধরার চেষ্টা করছেন। উনি কি আমার স্যারের ব্যাপারটা জানেন? জানলে কতটুকু জানেন?

অহনা আমার দিকে ঝুঁকে এসে বললেন, 'আপনাদের বিয়েতে আমাদের দুজনেরই যাবার কথা ছিল। ও ব্যাংকক চলে যাওয়ায় যেতে পারি নি।'

আমি কিছু বললাম না। অহনা বললেন, 'আমি ডিনারের সঙ্গে রেড ওয়াইন নেব। এবং ডিনারের শেষে একটা সিগারেট খাব। আশা করি কিছু মনে করবেন না।'

'জ্বি না। কিছু মনে করব না।'

খাবার চলে এসেছে। কত পদের খাবার যে আসছে। আমার ভালোই খিদে কিন্তু কিছুই খেতে ইচ্ছা করছে না। নোমান ওষুধ নিয়ে ফিরে এসেছে। অহনা সেই ওষুধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টেবিলের এক কোনায় ফেলে রেখেছেন। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে না এই ওষুধ তিনি খাবেন।

অহনা বললেন, 'চিংড়ি মাছ বিষয়ে আমি একটা কথা বলতে পারি। এই কথা শোনার পর নবনী আর চিংড়ি মাছ খাবে না বলে আমার ধারণা। কথাটা হল — চিংড়ি, কাঁকড়া এবং মাকড়সা এরা তিন জনই একই গোত্রের প্রাণী। এদের ডিম থাকে শরীরের বাইরে। চিংড়ি মাছ খাওয়া আর মাকড়সা খাওয়া একই ব্যাপার।'

অহনার কথা শোনার পর আমি সত্যি সত্যি চিংড়ি মাছ খেতে পারলাম না। নোমান কয়েকবার সাধাসাধি করল। মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, 'খাও না, খাও না। কত বড় বড় চিংড়ি। এগুলো তো আর মাকড়সা না।'

অহনা কিছুই বললেন না। শুধু হাসলেন। সেই হাসি আমার ভালো লাগল না।

আমার খুব ক্লান্তি লাগছে। মনে হচ্ছে এই খাবার টেবিলেই আমি ঘুমিয়ে পড়ব। আমার এ রকম মাঝে মাঝে হয়। হঠাৎ নিজেকে অসহায় এবং খুব ক্লান্ত মনে হয়। আশপাশে কোথায় কী হচ্ছে, কে কী বলছে কিছুই বুঝতে পারি না। কারোর কোনো কথাবার্তাও তখন কানে আসে না। চারপাশের কোলাহলের শব্দ স্তিমিত হয়ে আসে। মনে হয় আমি একাকী দূরে কোথাও চলে যাচ্ছি। এই তো আমার পাশেই নোমান বসে আছে। সে মাঝে মাঝেই হো-হো করে হেসে উঠছে। গল্প শুনে হাসছে। হাসির গল্পগুলো যিনি বলছেন তাঁর নাম অহনা। কালো একটি মেয়ে। কালো হয়েও পৃথিবীর সব রূপ যিনি নিজের শরীরে নিয়ে নিয়েছেন। তিনি নিশ্চয়ই খুব ভালো গল্প করতে পারেন। কারণ গল্প শুনে শুধু যে নোমান হাসছে তা না। সফিক সাহেব হাসছেন, অহনা নিজেও হাসছেন। তাদের হাসির শব্দে আশপাশের সবাই ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে। মজার মজার সব গল্প কিন্তু আমার কানে আসছে না। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে। সফিক সাহেব হঠাৎ আমার দিকে ঝুঁকে এসে বললেন, 'নবনী তোমার কি শরীর খারাপ?'

আমি বললাম, 'না।'

'তুমি কিছু খাচ্ছ না। খাবার ভালো লাগছে না?'

'লাগছে।'

চামচ দিয়ে আমি খাবার নাড়াচাড়া করছি। চামচগুলো কি রুপার? ঝকঝক করছে। সারাক্ষণই ভয় হচ্ছে এই বুঝি হাত থেকে চামচ পড়ে যাবে। রুপার চামচ মেঝেতে পড়লে কেমন শব্দ হয়? রিনঝিন করে বাজে?

সফিক সাহেবের গাড়ি আমাদের বাসায় নামিয়ে দিল। নোমান বাসায় ঢুকতে ঢুকতে বলল, 'এরা কি রকম অসাধারণ মানুষ লক্ষ করলে? অহংকার বলে এক বস্তু স্বামী-স্ত্রী কারো মধ্যে নেই। ওয়াইন খেতে দেখলে তুমি অস্বস্তি বোধ কর, এই জন্যে অহনা ভাবি কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওয়াইন নেয় নি। সিগারেটও খান নি। অহনা সিগারেট ছাড়া থাকতে পারে না। নবনী। নাও এই খামটা যত্ন করে তুলে রাখ।'

আমি বললাম, 'কী আছে এই খামে?'

নোমান হতভম্ব গলায় বলল, 'কী আছে তুমি জান না?'

'না।'

'কী আশ্চর্য। অহনা নিজের হাতে এই খাম আমাকে দিল। তোমার সামনেই তো দিল। আমাদের বিয়ে উপলক্ষে গিফ্ট।'

'আমি লক্ষ করি নি।'

'লক্ষ করি নি মানে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'অন্যমনস্ক ছিলাম।'

'সফিক তাহলে ঠিকই ধরেছিল — তোমার শরীর খারাপ।'

'কী আছে এই খামে?'

'দশ হাজার টাকার একটা চেক আছে। ক্যাশ টাকা দিয়েছে আমরা নিজেরা যাতে নিজেদের পছন্দমতো কিছু কিনতে পারি। এই খাম নিয়ে কত কথাবার্তা হল — তুমি কিছুই শোন নি?'

'না।'

খাম হাতে নোমান বোকা বোকা মুখ করে দীর্ঘক্ষণ বসে রইল। আমার এই আচরণ সে যেন মিলাতে পারছে না। এক সময় বলল, 'চল ঘুমাতে যাই।'

আমি বললাম, 'তুমি ঘুমাও আমি একটু পরে যাব।'

'তুমি কী করবে?'

'নিজের হাতে চা বানিয়ে এক কাপ চা খাব। তারপর ইরাকে একটা চিঠি লিখব। আসার পর ইরাকে কোনো খবর দেয়া হয় নি। ও নিশ্চয়ই চিঠির জন্যে অপেক্ষা করছে।'

'চিঠি দিনের বেলা লিখলেই হয়।'

'দিনে আমি চিঠি লিখতে পারি না।'

'ও আচ্ছা।'

'তুমি কি চা খাবে? বানাব তোমার জন্যে?'

'আমি তো চা একেবারেই খাই না। রাতে খেলে ঘুম হবে না।'

'প্রতি রাতে ঘুমাতে হবে এমন তো কোনো কথা নেই। চা খেয়ে তুমি জেগে থাক। আমি এর মধ্যে চিঠি শেষ করে ফেলি। তারপর দুজন এক সঙ্গে ঘুমাতে যাব।'

'আচ্ছা।'

আমি চা বানাচ্ছি। ও বসে আছে বারান্দায়। ওর মাথার উপর ময়নার খাঁচা। খাঁচাটা এখন আবার কালো কাপড়ে ঢাকা। ময়নার খাঁচা নাকি কালো কাপড় দিয়ে না ঢাকলে ময়না ঘুমাতে পারে না। নোমান মাঝে মাঝেই তাকাচ্ছে আমার দিকে। সম্ভবত আমাকে বুঝতে চেষ্টা করছে।

ইরা,

এই কিছুক্ষণ আগে আমি আমার সংসার শুরু করেছি। কেরোসিনের চুলায় চা বানিয়েছি দুজনের জন্যে। আমাদের বিবাহিত জীবনের প্রথম রান্না। চা তেমন ভালো হয় নি। ও কোত্থেকে যেন সস্তা ধরনের চায়ের পাতা এনেছে। অনেকক্ষণ জ্বাল দেবার পরেও রং আসে নি। পানসে ধরনের চা খেয়ে সে বলেছে — এত ভালো চা সে জীবনেও খায় নি। এখন থেকে সে নাকি রোজ রাতে বারান্দায় বসে চা খাবে।

এখনো সে বারান্দায় বসে আছে। বেচারার বোধহয় ইচ্ছা আমাকে সঙ্গে নিয়ে ঘুমাতে যাবে। যেহেতু আমি চিঠি লিখতে বসেছি সে অপেক্ষা করছে বারান্দায়। একজন আদর্শ স্ত্রীর উচিত এই অবস্থায় চিঠি লেখা বন্ধ করে স্বামীর সঙ্গে ঘুমাতে যাওয়া। আমার মনে হয় আমি কোনোদিনও আদর্শ স্ত্রী হতে পারব না — কারণ তোকে চিঠি লিখতেই আমার ভালো লাগছে। ও অপেক্ষা করুক। অপেক্ষায় আনন্দ আছে।

তাছাড়া আমার মনে হয় বারান্দায় বসে থাকতেও তার ভালো লাগছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্তত বসে থাকার ভঙ্গি থেকে তাই মনে হয়। বসে থাকার মধ্যেই সুখী সুখী এবং দুঃখী দুঃখী ভঙ্গি আছে। ও বসে আছে সুখী সুখী ভঙ্গিতে।

আমি কেমন আছি এই দিয়ে শুরু করি। ভালো আছি। নিরিবিলিতে শান্তিতে আছি। আমাদের দুজনের ছোট্ট এক কামরার ঘর। দুটি মাত্র প্রাণী। ভুল বললাম, দুটি না তিনটি প্রাণী। একটা পোষা ময়না। ও বলছে ময়না নাকি রাজনীতিবিদদের মতো ক্রমাগত কথা বলে। তবে আমি এখনো তার কোনো কথা শুনি নি। ও আচ্ছা, একবার শুনেছি। ময়নাটা পুরুষের মতো গলায় বলেছে নবনী! ঠিক করেছি কাল ভোর থেকে সংসার গুছাব, তবে সংসার গোছানোরও কিছু নেই। সবই গোছানো। আমার কাজ হল, এই গোছানো সংসারে জায়গা করে নেয়া। সেই জায়গা করে নিতে খুব অসুবিধা হয় নি। কোনো মেয়েরই বোধহয় হয় না।

নোমান সম্পর্কে বলি (স্বামীর নাম ধরে লিখলাম বলে ভুরু কুঁচকাচ্ছিস না তো?) মানুষটা ভালোই। ওর মধ্যে সরল সরল ব্যাপার আছে। জটিলতা তেমন নেই। নেই বলেই ভয়ে ভয়ে আছি। আমরা মানুষের জটিলতা দেখেই অভ্যস্ত। সারল্যকে আমরা ভয় করি। কারো ভেতর ঐ ব্যাপারটি দেখতে পেলে থমকে যাই এবং আমাদের মনের একটি অংশ বলতে থাকে — নিশ্চয়ই কোনো একটা রহস্য আছে।

মানুষটার ভেতর রহস্য তেমন নেই। সাদাসিধা মানুষ। একটু বোধহয় কৃপণ। প্রতিটি পয়সা হিসেব করে খরচ করে। চা খাব বলে চিনি কিনে এনেছে — ছোট্ট একটা পুঁটলায় এতটুকু চিনি। তার ময়না পাখিটার জন্যে কলা কিনে এনেছে। একটা কলার অর্ধেকটা কেটে খাইয়েছে বাকি অর্ধেক পলিথিনের ব্যাগে মুড়ে রেখে দিয়েছে। পরে খাওয়াবে।

আমি বাথরুমে গোসল করলাম। সাবানটা মেঝেতে ফেলে এসেছিলাম। পরের বার ঘরে ঢুকে দেখি সেই সাবান সে সোপকেসে তুলে রেখে বাথরুমের মেঝে ন্যাকড়া দিয়ে মুছেছে যাতে মেঝেটা শুকনো খটখট করে। আমাকে অবশ্যি কিছু বলে নি। পৃথিবীর সব স্বামীই বিয়ের পর পর স্ত্রীদের উপর তাদের যে অধিকার আছে সেই অধিকার ফলাতে চেষ্টা করে। কেউ কেউ স্থূল ভাবে করে কেউ সূক্ষ্ম ভাবে করে। যেমন ধর হঠাৎ বলবে — এক গ্লাস পানি দাও তো। অথচ হাতের কাছেই হয়তো পানির গ্লাস। এই মানুষটা এখন পর্যন্ত তা করছে না। মনে হয় করবে না। শুরুতে যে করে না সে পরেও করে না। মানুষের চরিত্রের সব দোষ গুণ চব্বিশ ঘণ্টার ভেতরই ধরা পড়ার কথা।

ইরা, তোকে বসিয়ে রেখে আমি এখন বারান্দায় যাব। দেখে আসব মানুষটা কী করছে। এখনো জেগে আছে না ঘুমিয়ে পড়েছে। তাছাড়া কলমটাও বদলাতে হবে। এই কলম দিয়ে ভালো লিখতে পারছি না। আরেকটা কলম দরকার। ঘরে আর কলম আছে কিনা জানি না। ওকে বলতে হবে। যদি দেখি ও ঘুমিয়ে পড়েছে তাহলে আজ আর চিঠি শেষ হবে না। তোকে যে কথা দিয়েছিলাম পৌঁছেই চিঠি দেব তা আর সম্ভব হবে না। দেরি হয়ে যাবে। কাল হয়তো আর চিঠি লিখতে ইচ্ছা করবে না।

মানুষটা জেগেই ছিল। আমাকে দেখে আগ্রহ নিয়ে বলল, 'চিঠি লেখা কি শেষ?' আমার মায়াই লাগল, আহা বেচারা! কিন্তু মায়াকে প্রশ্রয় দিলাম না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্বিকার ভঙ্গিতে বললাম, 'ঘরে কি আর কলম আছে?' সে বলল, 'ড্রয়ারে আছে। দাঁড়াও আমি বের করে দি।' দুটা কলম টেবিলের উপর রেখে মুগ্ধ গলায় বলল, 'তোমার হাতের লেখা এত সুন্দর!' তার বলার ভঙ্গিটি এমন যেন আমি আমার মস্তবড় কোনো গুণ এতক্ষণ তার চোখের আড়াল করে রেখেছিলাম।

আমি বললাম, 'তোমার হাতের লেখা কি খুব খারাপ?'

সে বলল, 'না। আমার হাতের লেখাও খুব সুন্দর। দাঁড়াও তোমাকে দেখাই' — বলেই এক টুকরা কাগজ নিয়ে লিখল - নবনী! নবনী!!

ইরা তোকে বললাম না, লোকটা সরল ধরনের। সরল না হলে কখনোই কাগজ নিয়ে তার হাতের লেখার পরীক্ষা দিতে বসত না। বুদ্ধিমানরা এই কাজ কখনো করে না।

আমি বললাম, 'তোমার হাতের লেখা আমার চেয়েও সুন্দর। এখন এক কাজ কর বিছানায় শুয়ে থাক। আমার চিঠি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আর মাত্র দশ-পনের মিনিট। চিঠি শেষ করেই আমি চলে আসব।' ও বাধ্য ছেলের মতো ঘুমাতে গেল। আমি চিঠি নিয়ে বসলাম।

অনেক কিছুই তোকে লিখতে ইচ্ছা করছে। যেমন ধর, আমার যে আজ ওর এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হল তাঁর কথা। সেই ভদ্রলোকের নাম সফিক। তিনি ওর অফিসের প্রধান ব্যক্তি। অফিসটাই তাঁর। মানুষের কী পরিমাণ টাকা যে থাকতে পারে তা তাঁকে না দেখলে বোঝা যাবে না। ভদ্রলোক ওর ছেলেবেলার বন্ধু। এতে আমার আনন্দিত হওয়া উচিত কিন্তু আনন্দিত হতে পারছি না। আকাশের সঙ্গে পাতালের বন্ধুত্ব হয় না। হওয়া বোধহয় ঠিকও নয়। ভদ্রলোকের ব্যবহার চমৎকার, কথাবার্তা চমৎকার কিন্তু তবু আমার ভালো লাগল না। কেন লাগল না তাও বুঝতে পারছি না। ভদ্রলোকের স্ত্রীর নাম হল অহনা। আমি প্রথম ভেবেছিলাম — নাম গহনা। পরে শুনি অহনা। নামটা সুন্দর তাই না? এই ভদ্রমহিলার গায়ের রং কালো। কালো রঙের মেয়ে যে এত রূপবতী হতে পারে কে জানত? ইনাদের সম্পর্কে তোকে পরে আরো লিখব। আপাতত এইটুকু।

তোদের কথা আমি কিছুই জানতে চাচ্ছি না। জানি তুই নিজ থেকেই সব লিখবি। কিছুই বাদ দিবি না।

তোকে ছোট্ট একটা ধন্যবাদ দেয়া দরকার। সুটকেস খুলে দেখি লাইব্রেরি থেকে আনা উপন্যাসটা 'তিথির নীল তোয়ালে'। তুই সুটকেসে দিয়ে দিয়েছিস। বই পড়ার সময় পাচ্ছি না। কাহিনী কী তাও ভুলে গেছি। আবার গোড়া থেকে শুরু করতে হবে। তোর চোখকান এতটা খোলা তা বুঝতে পারি নি। তোর এত বুদ্ধি কেন?

ভালো থাকিস। ইতি তোর আপা।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি রাত দুটা দশ। ও বিছানায় শুয়ে ঘুমাচ্ছে। বারান্দার দরজা খোলা। তাকে যতটা সাবধানী এবং গোছানো বলে মনে হচ্ছিল, আসলে সে ততটা না। বারান্দার দরজা খোলা রেখে সে ঘুমাত না।

আমি বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। চাঁদের আলো পড়েছে বারান্দায়। সরল ধরনের আলো। আমাদের বাড়ির ছাদে গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে যেমন আলো আসত, সে রকম জটিল নকশাদার আলো নয়। ও জেগে থাকলে ওকে নিয়ে কিছুক্ষণ বারান্দায় বসা যেত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এমন চট করে ঘুমিয়ে পড়বে তা ভাবি নি। ওকে কি ডেকে তুলব?

আমি এসে তার গায়ে হাত রাখলাম। সে পাথরের মতো হয়ে আছে। ঘুমন্ত মানুষের গা স্পর্শ করলে সে একটু না একটু নড়ে উঠবেই। নোমান নড়ল না। সমান তালে তার নিশ্বাস পড়তে লাগল। আমরা দুজন পাশাপাশি হয়ে আছি। ওর গায়ের পুরুষ পুরুষ ঘামের গন্ধে আমি কি অভ্যস্ত হয়ে গেছি? আজ তো তেমন খারাপ লাগছে না। বরং ইচ্ছা করছে ওর গা ঘেঁষে ঘুমাতে। একটা হাত ওর শরীরে তুলে দিলে ও কি জেগে উঠবে? নাকি ঘুমের ঘোরে সে হাত সরিয়ে দেবে? দীর্ঘদিন ধরে সে নিশ্চয়ই একা একা ঘুমাচ্ছে। একা ঘুমিয়েই সে অভ্যস্ত। শরীরের উপর একটা বাড়তি হাতের চাপ কি সে সহ্য করবে?

জানালা গলে চাঁদের আলো আমাদের হাঁটুর উপর এসে পড়েছে। শরীরের একটি অংশ আলোকিত হয়ে আছে। নোমান বিড়বিড় করে কী যেন বলছে। দুঃস্বপ্ন দেখছে কি? বারান্দায় কালো কাপড়ে ঢাকা ময়নাটাও ছটফট করছে। কে জানে হয়তো ওরা দুজন একই সঙ্গে একটা দুঃস্বপ্ন দেখছে। পাখিদের স্বপ্ন ও দুঃস্বপ্ন বলে কি কিছু আছে?

আমি ওর গা থেকে হাত সরিয়ে নিজের মতো শুয়ে পড়লাম। শাড়ির আঁচলে শরীর ঢেকে শোয়া। পাশ ফিরতেই খাট নড়ে উঠল। এই খাটের পায়াগুলো সমান না, বড় ছোট আছে। একটু নড়লেই খটখট শব্দ হয়। আমি একটা হাত ওর গায়ে রাখলাম ও ধড়মড় করে উঠে বসে ভয়ার্ত গলায় বলল, 'কে?'

আমি বললাম, 'কেউ না। আমি, ঘুমাও।'

সে সঙ্গে সঙ্গে শুয়ে পড়ল। আবার তার নিশ্বাস ভারি হয়ে এল। সে যে উঠে বসে, কে বলে চেঁচিয়েছে, তা ঘুমের মধ্যেই করেছে। ঘুমন্ত মানুষের আচার আচরণ আমার মতো ভালো কেউ জানে না। রাতের পর রাত আমি অঘুমো কাটিয়েছি। আমার পাশে শুয়ে ঘুমিয়েছে ইরা। আমি খুব কাছ থেকে দেখেছি — ঘুমন্ত মানুষ কী করে। ঘুমন্ত মানুষের আচার আচরণের ব্যাপারে আমাকে একজন এক্সপার্ট বলা যেতে পারে।

আজো ঘুম আসছে না। প্রচণ্ড ইচ্ছা করছে ওকে ডেকে তুলে বলি — 'এই শোন আমার ঘুম আসছে না। আমার খুব খারাপ ধরনের একটা অসুখ আছে। আমার রাতে ঘুম হয় না। একা একা জেগে থাকতে আমার খুব কষ্ট হয়। তুমি এসে আমার সঙ্গে বারান্দায় খানিকক্ষণ বস। আমার জীবনের ভয়াবহ একটা গল্প আছে। গল্পটা এখনো তোমাকে বলা হয় নি — আজ খানিকটা বলব।'

চাঁদের আলো ওর হাঁটুর উপর থেকে সরে গেছে। এখন আলো এসে পড়েছে বিছানার উপর। যেন টর্চ ফেলে ফেলে কেউ বিছানাটা পরীক্ষা করছে।

আমি উঠে বসলাম। খাটটা আবার ক্যাঁচ করে শব্দ করে উঠল। ও বলল, 'কে?' আমি এবার কোনো জবাব দিলাম না। ও আবারো গভীর ঘুমে তলিয়ে পড়ল। খাঁচার ময়না পাখি খচখচ শব্দ করছে—

আশ্চর্যের ব্যাপার আমাদের স্যারেরও একটা পাখি ছিল। তিনি একটা কাক পুষেছিলেন। তাঁর কোনো খাঁচা ছিল না। কাকটা এসে প্রায় সারাদিনই রেলিঙে বসে থাকত। কাকটার বোধহয় বয়স হয়ে গিয়েছিল। খাবার খুঁজে বেড়াবার সামর্থ্য ছিল না। কিংবা কে জানে হয়তো স্যারকে তার পছন্দ হয়েছিল।

স্যার যখন আমাদের বাড়িতে থাকতে এলেন তখন ব্যাপারটা আমার তেমন পছন্দ হয় নি। মৌলানা টাইপের একজন লোক বাসায় থাকবে। নানা ধরনের উপদেশ দেবে। কী দরকার? বাড়ি ভাড়া দিয়ে আমাদের যে টাকা পেতে হবে এমনও না। কিন্তু বাবার তাঁকে খুব পছন্দ হয়ে গেল। তিনি দরাজ গলায় বললেন, 'সুফী টাইপের একজন মানুষ থাকছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাক না। অসুবিধা কি? পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বে। আল্লাহ বিল্লাহ করবে। এই বাড়ি থেকে তো আল্লাহ খোদার নাম উঠেই গেছে।'

মা ক্ষীণ গলায় বললেন, 'বাইরের একজন মানুষ!'

বাবা বিরক্ত গলায় বললেন, ' সে তো আর তোমার বিছানায় এসে শুয়ে থাকবে না। সে থাকবে তার মতো। উত্তরের দরজাটা পার্মানেন্ট বন্ধ করে দিলেই সে আলাদা হয়ে যাবে। নিজের মতো থাকবে। নিজে রান্না করে খাবে।'

উত্তরের দরজা আমরা ভেতর থেকে বন্ধ করে স্যারকে থাকতে দিলাম। তিনি তাঁর জিনিসপত্র নিয়ে একদিন দুপুরবেলা দুটা রিকশা করে উপস্থিত।

প্রথম কিছুদিন আমি শংকিত ছিলাম — হয়তো যখন তখন স্যারকে দেখা যাবে আমাদের বসার ঘরে বসে আছেন। হয়তো ছাদে গিয়েছি দেখব জায়নামায হাতে তিনিও ছাদে উঠে এসেছেন নামায পড়বার জন্যে। কিংবা কলেজে দেখা হলে তিনি পরিচিত ভঙ্গিতে বলবেন, 'এই যে নবনী খবর কী?' আর ক্লাসের সব ছাত্রী আমাকে ক্ষেপাবে।

বাস্তবে তার কিছুই হল না। স্যার কলেজে যান। কলেজ থেকে ফিরে বাসায় আসেন। আর তার কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না। আমাদের বাড়ির একটা অংশে যে একজন মানুষ বাস করে তা মনেই হয় না। শুধু ছাদ থেকে আমি মাঝে মাঝে দেখি তিনি বারান্দায় রান্না চড়িয়েছেন। একদিন তাঁর পোষা কাকটাকে দেখলাম। শুরুতে কাকটা রেলিঙে বসেছিল। তারপর রেলিং থেকে নেমে গম্ভীর ভঙ্গিতে হেঁটে স্যারের পাশে বসে থাকল। ভাবটা এ রকম যেন সেও রান্নাবান্না তদারক করছে। এ রকম মজার দৃশ্য আমি আমার জীবনে আর দেখি নি।

আমি যখনই ছাদে উঠতাম কিছুটা সময় কাটাতাম কাকটাকে দেখার জন্যে। কী করে সে এ বাড়ির একজন সদস্যের মতো চলাফেরা করে। গম্ভীর তার ভাবভঙ্গি।

একদিন ছাদে গিয়ে যথারীতি উঁকি দিয়েছি — দেখি বাঁশের চাটাই দিয়ে বারান্দার অংশটা ঢাকা। ছাদ থেকে বারান্দা দেখার কোনোই উপায় নেই। আমার খুব মেজাজ খারাপ হল। কাণ্ডটা নিশ্চয়ই স্যার করেছেন। যাতে বারান্দা থেকে তাঁকে একজন তরুণী মেয়ের মুখ দেখতে না হয়। ধর্মে বাধানিষেধ আছে। আমার কাছে মনে হল তিনি ইচ্ছা করে আমাকে অপমান করলেন।

সেদিন সন্ধ্যায় মা তালের পিঠা করেছেন। ইরাকে বললেন, 'মাস্টার সাহেবকে কয়েকটা পিঠা দিয়ে আয় তো ইরা। বেচারা একা একা থাকে। কী খায় না খায় কে জানে?' ইরা বলল, 'আমি পারব না। আপাকে পিঠা নিয়ে যেতে বল। ওর কলেজের স্যার। ওরই নিয়ে যাওয়া উচিত।'

আমি আপত্তি করলাম না। স্যারকে কিছু কঠিন কঠিন কথা শুনাতে ইচ্ছা করছিল। পিঠা দিতে গিয়ে সেই কথাগুলো শুনিয়ে আসা যাবে।

স্যার আমাকে দেখে এতই অবাক হলেন যে বলার কথা নয়। যেন এ রকম অস্বাভাবিক ঘটনা এর আগে তাঁর জীবনে কখনো ঘটে নি। আমি বললাম, 'স্যার, মা আপনার জন্যে কিছু তালের পিঠা পাঠিয়েছেন।'

তিনি হড়বড় করে বললেন, 'শুকরিয়া। শুকরিয়া। তোমার মাকে হাজার শুকরিয়া।'

স্যার আমাকে বসতে বলছেন না। আমি যে কথাগুলো বলব বলে ভেবে এসেছি, সেগুলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলে চলে যাওয়া যায় না। আমাকে কিছুক্ষণের জন্য হলেও বসতে হবে। আমি বললাম, 'স্যার আমি কি কিছুক্ষণের জন্যে আপনার এখানে বসতে পারি?'

'অবশ্যই পার। বোস। বোস।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি অতিরিক্ত রকমের ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। নিজেই ছুটে গিয়ে বারান্দা থেকে চেয়ার নিয়ে এলেন। আমি বসলাম না। কঠিন গলায় বললাম, 'স্যার বসতে ভয় লাগছে। আমার তো বোরকা পরা নেই। এই ভাবে আপনার সামনে আসাই হয়তো ঠিক হয় নি। মা পিঠা দিয়ে যেতে বললেন বলেই এসেছি। নয়তো আসতাম না। আপনাকে বিব্রত করার আমার কোনো ইচ্ছা নেই।'

'আমি বিব্রত হচ্ছি না।'

'অবশ্যই হচ্ছেন। বিব্রত না হলে বারান্দায় চাটাইয়ের বেড়া দিতেন না। এই কাণ্ডটা করেছেন কারণ চাটাইয়ের বেড়াটা না দিলে বোরকা নেই এমন একটা মেয়েকে মাঝে মাঝে আপনার দেখতে হয়। বিরাট একটা পাপ হয়। এত বড় পাপের শাস্তি হল দোজখ। আমাকে দেখার কারণে আপনি দোজখে যাবেন তা কি হয়? দোজখে সুন্দর সুন্দর পরী অপেক্ষা করছে।'

আমি এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে শেষ করলাম। কঠিন কিছু কথা বলার ছিল বলতে পারলাম না, কারণ আমি দেখলাম তিনি খুবই দুঃখিত ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। আমি বললাম, 'স্যার যাই।'

তিনি বললেন, 'একটু বোস। এক মিনিট। আমার উপর এ রকম রাগ করে চলে গেলে আমার খারাপ লাগবে। একটু বসে যাও।'

আমি বসলাম।

তিনি বললেন — 'চাটাইয়ের বেড়াটা আমি আমার জন্যে দেই নি। তোমার জন্যে দিয়েছি। আমার মনে হয়েছিল — তোমার একা একা ছাদে হাঁটার অভ্যাস — আমার জন্যে স্বাধীন ভাবে তা করতে পারছ না। তোমাকে এই সমস্যা থেকে মুক্তি দেবার জন্যেই এটা করেছি। তুমি যে এমন রেগে যাবে বুঝতে পারি নি। তোমার রাগ কি একটু কমেছে?'

আমি কিছু বললাম না। তিনি যেন নিজের মনে কথা বলছেন এমন ভঙ্গিতে বললেন, 'বোরকা নিয়ে তোমার মনে বড় ধরনের ক্ষোভ আছে বলে মনে হয়। এ রকম থাকা উচিত না। আমাদের প্রফেটের সময়ের যুগটা ছিল আলমে জাহিলিয়াতে যুগ। মানুষের প্রবৃত্তি ছিল পশুদের কাছাকাছি। মেয়েরা রাস্তায় বের হলে মানুষরা নানা ভাবে তাদের উত্যক্ত করত। মেয়েরাও যে ছেলেদের চেয়ে আলাদা ছিল তা না। তারাও এতে মজা পেত। তারাও চাইত যেন পুরুষরা তাদের উত্যক্ত করে, তাদেরকে দেখে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করে। কারণ যুগটাই হচ্ছে পশুত্বের যুগ। কাজেই আমাদের নবী এমন একটা ব্যবস্থা করলেন যাতে সবাই বুঝতে পারে — মুসলমান মেয়েরা অন্যদের মতো না। তারা পবিত্র। তারা আলাদা। তাদেরকে নিয়ে এইসব করা যাবে না। তারা তা চায়ও না। কাজেই নবী আদেশ দিলেন মেয়েরা যেন চাদরে তাদের শরীর ঢেকে নিজেদের অন্যদের চেয়ে আলাদা করে ফেলে। চাদরে ঢাকা একটা মেয়ে দেখলেই সবাই যেন বোঝে এই মেয়ে আর দশটা মেয়ের মতো না। এর সঙ্গে ভদ্র আচরণ করতে হবে। তুমি কি বুঝতে পারছ নবনী?'

আমি কিছু বললাম না। স্যার বললেন, 'বেহেশতে পরী পাওয়া সম্পর্কে তুমি যা বললে সেটা নিয়েও কথা আছে। তুমি যেমন স্থূল ভাবে বললে তা কিন্তু না। পরে তোমাকে বুঝিয়ে বলব।'

'আমাকে বুঝিয়ে বলার কোনো দরকার নেই। আপনি বুঝলেই হল।'

আমি উঠে দাঁড়ালাম। স্যার হেসে ফেললেন। এত সুন্দর করে আমি বোধহয় কাউকে হাসতে দেখি নি। আমার সারা শরীর ঝনঝন করে উঠল ঘণ্টা বেজে উঠার মতো শব্দ। এই ঘণ্টা সর্বনাশের ঘণ্টা। আমি প্রায় ছুটে চলে এলাম। মেয়েরা ঠিক কীভাবে ছেলেদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রেমে পড়ে, একজনের প্রতি অন্যজনের তীব্র আকর্ষণটা কীভাবে তৈরি হয়? গল্প উপন্যাসের ব্যাপার আর বাস্তবের ব্যাপার কি এক রকম না আলাদা? প্রতিটি মানুষ যেমন আলাদা তার ভালবাসাও কি আলাদা?

একজন আরেকজনকে দেখেই পাগলের মতো হয়ে গেল, এমন কি সত্যি কখনো হয়েছে? নাকি এগুলো শুধু কথার কথা?

আমার কী হয়েছে? আমি কি এই মানুষটির প্রেমে পড়ে গেছি? প্রেমে পড়ার মতো কী আছে এই মানুষটার? মানুষটি যদি বিবাহিত হত, তাঁর কয়েকটা ছেলেমেয়ে থাকত তাহলেও কি আমি ঠিক এই ভাবেই আকর্ষিত হতাম?

সারারাত আমার ঘুম হল না। জীবনে এই প্রথম আমার ঘুমহীন রাত্রি যাপন। কী যে এক ভয়ংকর কষ্ট! বিছানায় এপাশ-ওপাশ করছি আর ভাবছি ভোর হচ্ছে না কেন? ভোর হোক। মনে হচ্ছে ভোর হলে আমার কষ্টটা কমবে।

সূর্য ওঠার আগে আমি বিছানা ছেড়ে উঠলাম। দরজা খুলে বারান্দায় এসে দেখি মা ফজরের নামাযের জন্যে ওযু করছেন। আমাকে দেখে বললেন, ' কিরে আজ এত সকালে ঘুম ভাঙল যে।'

'একবার ভোরবেলা উঠে দেখলাম কেমন লাগে।'

'রোজ ভোরে উঠে ছাদে ঘোরাঘুরি করবি, দেখবি শরীরটা কেমন ভালো লাগে।'

'তুমি তাই কর নাকি মা?'

'হুঁ। তোরা ছাদে যাস সন্ধ্যাবেলায় আমি যাই ভোরবেলায়।'

মা আনন্দিত ভঙ্গিতে হাসছেন। আমি ছাদে চলে গেলাম। সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় মনে হতে লাগল, আচ্ছা ছাদে উঠে যদি দেখি স্যার ছাদে হাঁটাহাঁটি করছেন। তাহলে কী হবে? ব্যাপারটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। খুবই স্বাভাবিক। উনি নিশ্চয়ই নামায পড়ার জন্যে ভোরবেলায় উঠেছেন। একবার উঠলে ছাদে কি আর যাবেন না। এত সুন্দর একটা ছাদ।

ছাদে কাউকে পেলাম না। আশাভঙ্গের তীব্র কষ্টে প্রায় কান্না পাওয়ার মতো হয়ে গেল। আমার ইচ্ছা করতে লাগল — এক্ষুনি ছুটে গিয়ে উনার দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলি — 'স্যার আমাদের ছাদটা খুব সুন্দর। আসুন আপনাকে দেখাই। এখন থেকে রোজ ভোরবেলা ছাদে বেড়াতে আসবেন। এতে আপনার শরীর খুব ভালো থাকবে।'

'সিঁড়িতে কার পায়ের শব্দ? উনি কি আসছেন ছাদে? অবশ্যই আসছেন। উনি ছাড়া আর কে হবে? আমি আমার শাড়িটার দিকে তাকালাম। বেছে বেছে আজকের দিনে আমি এমন একটা বাজে শাড়ি পরেছি। আচ্ছা আমার চোখে ময়লা জমে নেই তো? আমার বুক ধকধক করছে। কী বলব আমি স্যারকে?

না, স্যার না। মা এসেছেন। মার হাতে দুকাপ চা। আমার জন্যে চা এনেছেন। এত ভালো আমার মা কিন্তু সেদিন ভোরবেলায় মাকে দেখে মনটা ভেঙে গেল। চিৎকার করে বলতে ইচ্ছা করল, তুমি এসেছ কেন মা? কেন তুমি এসেছ? কে তোমাকে আসতে বলেছে?...

চাঁদের আলো খাট থেকে নেমে গেছে। নোমানের ঘুম ভেঙে গেছে। সে উঠে বসতে বসতে অবাক হয়ে বলল, 'কী হয়েছে?'

আমি বললাম, 'কিছু হয় নি।'

'ঘুমাচ্ছ না?'

'না আমার ঘুম আসছে না।'

'শরীর খারাপ করেছে নাকি? জ্বর?'

সে হাত বাড়িয়ে আমার কপাল স্পর্শ করল। আহ্ ,তার হাতটা কী ঠাণ্ডা!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫

অনেকক্ষণ ধরে দরজার কড়া নাড়ছে।

আমাদের বাসায় কলিংবেল নেই। কেউ এলে কড়া নাড়ে। বিশ্রী খটাং খটাং শব্দ হয়। আমি বাথরুমে গায়ে পানি ঢালছি আর কড়া নাড়ার শব্দ শুনছি। কে এসেছে ভরদুপুরে? আমি কী করব? ভেজা গায়ে দরজা খুলব? কে হতে পারে?

তাড়াতাড়ি গায়ে কোনোমতে একটা শাড়ি জড়িয়ে দরজা খুলে দেখি বড় মামা। বড় মামার পেছনে ছোট্ট টিনের ট্রাঙ্ক হাতে ন দশ বছর বয়েসী একটা মেয়ে। আমি চেঁচিয়ে বললাম, 'বড় মামা আপনি?'

'কেমন আছিস মা?'

'ভালো।'

'সাথে এটা কে?'

'তোর জন্যে কাজের মেয়ে নিয়ে এসেছি। তুই ইরার কাছে চিঠি লিখেছিস। চিঠি পড়ে বুঝলাম ঘরে কাজের লোক নেই। তাই নিয়ে এসেছি। এর নাম মদিনা। তুই কাপড় বদলে আয় ভেজা গায়ে ঠাণ্ডা লাগাবি। জামাই কোথায়?'

'ও ঢাকার বাইরে আছে।'

'তুই একা?'

'জ্বি।'

'আচ্ছা যা কাপড় বদলে আয়। পরে কথা বলব।'

বড় মামা বেশিক্ষণ থাকলেন না। দুপুরে কিছু খেলেনও না। রোজা রেখে এসেছেন। সন্ধ্যাবেলা ইফতার করবেন। অফিসের কাজ নিয়ে এসেছেন। এখন কাজ সারতে যাবেন। রাতে আমার সঙ্গে দেখা করে ট্রেনে উঠবেন।

'চিঠি লেখার থাকলে লিখে রাখিস। হাতে হাতে নিয়ে যাব। জামাই কদিন ধরে বাইরে?'

'চার দিন।'

'আসবে কবে?'

'ঠিক নেই মামা। সপ্তাহখানিক লাগবে বলেছিল, ছবির কী একটা কাজ করছে।'

'একা ফেলে চলে গেল। এটা ঠিক হয় নাই। আমাকে খবর দিলে তোকে এসে নিয়ে যেতাম।'

'আমার অসুবিধা হচ্ছে না মামা। রাতে দারোয়ানের বউটা এসে বারান্দায় শুয়ে থাকে।'

মামা কৌতূহলী চোখে আমার সংসার দেখছেন। খাটের নিচটাও এক ফাঁকে দেখলেন। চেয়ারে বসেছিলেন, চেয়ার ছেড়ে খাটে বসলেন। খাটটা নড়ে উঠল। ব্যাপারটা বোধহয় পছন্দ হল না। তিনি নিশ্বাস ফেললেন।

'এখানকার খবরাখবর সব ভালো তো?'

'জ্বি ভালো।'

'জামাইয়ের আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে দেখা হয়েছে?'

'কয়েকজনের সঙ্গে দেখা হয়েছে। ও আমাকে নিয়ে গিয়েছিল।'

'ওরা আসে না?'

'জ্বি না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তোর আগের ব্যাপারট্যাপার জামাই কিছু জানতে চায় নি তো?'

'জ্বি না।'

'নিজ থেকে কিছু বলার দরকার নেই।'

'বাবার শরীর কেমন আছে মামা?'

'কিছু বুঝতে পারছি না। কখনো বলে ভালো। কখনো বলে মন্দ।'

'ইরার খবর কি?'

'ভালো। ওর বিয়ের সম্বন্ধ আসছে। জামাই মংলা পোর্টের ইনজিনিয়ার। দেখে গেছে। পছন্দ হয়েছে বলেই তো মনে হয়। দেখি আল্লাহ আল্লাহ করছি। বিয়েশাদীর ব্যাপার, কলমা না পড়ানো পর্যন্ত কিচ্ছু বলা যাবে না। তোর বাসাটা বড় থাকলে তোর এখানে এনে রাখতাম। বিয়ের কোনো আলাপ আলোচনা নেত্রকোনা হওয়া উচিত না। ফট করে কেউ কান ভাঙানি দিবে। তোর বাসাও তো ছোট।'

'জ্বি।'

'জামাই কী বলে? বড় বাসা নেবে, না এইখানেই থাকবে?'

'এই নিয়ে কথা হয় নি মামা।'

'তুই কিছু বলতে যাবি না। চাপ দেয়া ঠিক না । শুরুতে একটু কষ্ট করাই ভালো। কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না। সংসারে ভালবাসা থাকলে আর কিছু লাগে না। চাঁদের আলো ঢোকে ভাঙা ঘরে।'

'পাকা দালানের জানালা খুলে দিলেও আলো ঢোকে মামা।'

'তার জন্যে জানালা খুলতে হয় রে বড় খুকি। কয়জন আর জানালা খোলে? কেউ খোলে না।'

বড় মামা শুধু যে মদিনাকে নিয়ে এসেছেন তাই না। কয়েক ধরনের আচার এনেছেন। আমের আচার, তেঁতুলের আচার, চালতার আচার। এক টিন মুড়ি এনেছেন। হরলিক্সের কৌটায় এক কৌটা গাওয়া ঘি। একটা প্যাকেট খুলে দেখি ঘরে পরার দুটা শাড়ি। একটা গামছা।

'বড় খুকি!'

'জ্বি মামা।'

'জামাইয়ের জন্যে স্যুটের কাপড় কিনে দেব বলে ঠিক করেছিলাম। ওকে সাথে নিয়েই কেনার ইচ্ছা ছিল। স্যুট কিনে দোকানে দিয়ে দরজির খরচটাও দিয়ে দেয়া। নয়তো খাজনার থেকে বাজনা বড় হয়ে যায়। এখন কী করি বল তো।'

'স্যুটের কাপড় লাগবে না মামা। ও স্যুট পরে না। ছোট চাকরি করে। এই চাকরিতে স্যুট পরলে লোকে হাসবে।'

'ওর ছোট চাকরির জন্যে মন খারাপ করিস না মা।'

'এমনি বললাম, আমার মন খারাপ না।'

'আলহামদুলিল্লাহ্। শুনে ভালো লাগল। আচ্ছা পরের বার যখন আসব তখন বানিয়ে দিয়ে যাব।'

'মামা আপনার শরীর কেমন?'

'আছে — ভালোই আছে। মাথা ব্যথাটা হয়। টিউমার হয়েছে কিনা কে জানে। আমাদের ওখানে একজন ডাক্তার আছেন ওয়াদুদ সাহেব — বন্ধু মানুষ। তিনি বলছিলেন টিউমারের টেষ্ট ফেস্ট করাতে। কাগজে কী সব লিখেও দিয়েছেন।'

'করাবেন না?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'করাব। পরের বার করাব। ও আচ্ছা, ভুলে গেছি — ছোট খুকির চিঠিটা নে। জবাব লিখে রাখিস। বার বার বলে দিয়েছে জবাব নিয়ে যেতে। জবাব ছাড়া গেলে খুব রাগ করবে। আর মদিনাকে কিছু খেতে দে। ওর বোধহয় খিদে পেয়েছে। এদের কিন্তু পেটের আন্দাজ নেই। যা দিবি তাই খেয়ে পেটের অসুখ বাঁধাবে। হিসেব করে দিস। আমি এখন উঠি রে মা .....।'

মদিনাকে খেতে দিয়ে আমি ইরার চিঠি নিয়ে বসলাম। ইরা লিখেছে —

আপা,

তোমার চিঠি লিখতে এত দেরি হল কেন? তোমার এত কী কাজ? তুমি বিশ্বাস করবে না, আমি নিজে প্রতিদিন একবার পোস্টাপিসে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছি — চিঠি এসেছে কিনা।

এরমধ্যে এমন এক কাণ্ড হল — বাবা গভীর রাতে চেঁচামেচি শুরু করলেন — নবনী এসেছে। নবনী এসেছে। সে কী হৈচৈ! আমরা দরজা খুললাম। কেউ নেই। আসলে বাবা স্বপ্ন-টপ্ন দেখে এই কাণ্ড করেছেন।

বাবার শরীর আগের চেয়েও খারাপ হয়েছে। হলে কী হবে, চিকিৎসা করাবেন না। এখন কোনো ওষুধ খাচ্ছেন না। একজন জ্বিন সাধকের খোঁজ পাওয়া গেছে। তার কাছ থেকে ওষুধ নিচ্ছেন। সেই ওষুধ নাকি জ্বিনরা এনে দিচ্ছে কোহকাফ নগর থেকে। গাছের কী সব শিকড় বাকড়। মা সেসব হামানদিস্তায় পিষে পিষে দিচ্ছেন। আমি খানিকটা চেখে দেখেছি — বিশ্রী দুর্গন্ধ। খানিকটা মুখে দিলে মুখ আঠা আঠা হয়ে থাকে।

ভালো কথা — মা স্বপ্নে দেখেছেন তোমার ছেলে হয়েছে। ছেলের নামও স্বপ্নে দেখেছেন। ছেলের নাম জুলহাস। আমি মাকে বললাম — ছেলে হওয়া স্বপ্নে দেখেছ ভালো কথা। ছেলের নাম কীভাবে স্বপ্নে দেখলে? আর দেখলেই যখন একটু ভালো নাম দেখতে পারলে না?

অন্তু ভাইয়ারও খবর আছে। সে ফুটবল খেলতে গিয়ে মাথায় চোট পেয়েছে।

লোকজন বল খেলতে গিয়ে পায়ে চোট পায়। ভাইয়ার সবই উল্টা, সে চোট পেয়েছে মাথায়। তোমার ঘরটা এখন ভাইয়ার দখলে। এত সুন্দর ঘরটা সে যে কী করেছে, তুমি না দেখলে বিশ্বাস করবে না। তার উপর একদিন তার ঘরে ঢুকে দেখি — না থাক এখন বলব না। খুবই মজার ব্যাপার মুখোমুখি বলতে হবে।

আপা তুমি কবে আসবে? আমি দুলাভাইকে তার অফিসের ঠিকানায় খুব করুণ একটা চিঠি লিখেছি। এত করুণ যে চিঠি পড়ার পরপরই অন্তত কিছুদিনের জন্যে দুলাভাই তোমাকে আমাদের এখানে রেখে যাবেন।

আমার যে বিয়ের কথা হচ্ছে তা নিশ্চয়ই এর মধ্যে বড় মামা তোমাকে বলেছেন। ছেলে নিজেই আমাকে দেখতে এসেছে। গম্ভীর মুখে জিজ্ঞেস করল — রবীন্দ্রনাথ কবে নোবেল পুরস্কার পান বলতে পারেন?

আমার এমন রাগ লাগছিল যে ইচ্ছা করল বলি — রবীন্দ্রনাথ কে? নাম শুনি নি তো? এরকম বলতে পারি নি। শুধু বলেছি কবে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন জানি না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপা তুমি কি জান? আমার মনে হয় এখন আমার একটা সাধারণ জ্ঞানের বই দরকার। নয়তো কখন কী প্রশ্ন করবে — জবাব দিতে পারব না। বিয়ে আটকে যাবে।

তবে জবাব দিতে না পারলেও ঐ লোক আমাকে পছন্দ করেছে। সেটা আমি ঐ লোকের ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে থাকা থেকেই বুঝেছি। বড় কোনো সমস্যা না হলে এই শীতে বিয়ে হয়ে যাবে।

আপা কিছু ভালো লাগছে না। তুমি আস।

মামা বিকেলে একটা ইলিশ মাছ হাতে নিয়ে এলেন। তাঁর গায়ে জ্বর। বেশ জ্বর। ইফতার কিছু খেতে পারলেন না। আমি বললাম, 'চুপচাপ বিছানায় শুয়ে থাকুন। কাল যাবেন।' মামা রাজি হলেন না। রাজি হবেন না জানতাম। তাঁকে ফেরানো মুশকিল। নিজে যা ভালো মনে করবেন তাই করবেন। অন্যের কোনো কথাই শুনবেন না।

'বড় খুকি!'

'জ্বি মামা।'

'ছোট খুকির বিয়েটা মনে হয় হয়েই যাবে। ওরা মুখে অবশ্যি কিছু বলে নাই। ছোট খুকিকে কী সব প্রশ্নট্রশ্ন করেছে উত্তর দিতে পারে নাই। তারপরেও মনে হয় পছন্দ হয়েছে। বিয়েটা হয়ে গেলে দায়িত্ব শেষ হয়। একটু দোয়া করিস মা।'

'দোয়ায় কি কাজ হয় মামা?'

'অবশ্যই হয়। হবে না কেন?'

'আপনাকে লেবুর শরবত বানিয়ে দেব?'

'দে। লেবুর শরবত বলকারক। ঘরে কি লেবু আছে?'

'আছে।'

আমি লেবুর শরবত বানিয়ে এনে দেখি দরজায় হাতুড়ি পেটার শব্দ হচ্ছে। বড় মামা ঘরে ঢোকার মূল দরজায় হাতুড়ি দিয়ে কী যেন করছেন।

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'কী করছেন মামা?'

'ছিটকিনি লাগাচ্ছি। ডাবল প্রটেকশান থাকা দরকার। আগের ছিটকিনিটা দুর্বল।'

আমি অবাক হয়ে দেখলাম মামা হাতুড়ি, ছিটকিনি সব কিনে এনেছেন। একটা স্ক্রু ড্রাইভারও আছে। কী আশ্চর্য মানুষ!

'হাতুড়ি-টাতুড়ি সব কিনে নিয়ে এসেছেন?'

'হুঁ। কাজ ফেলে রাখলে তো হয় না রে মা। যখনকার কাজ তখন করতে হয়।'

মামা ছিটকিনি ফিট করে খাটটা ঠিক করলেন। খাটের পায়ার নিচে কাগজ দিয়ে পাগুলো সমান করলেন। লেবুর শরবত খেলেন। মদিনাকে দশটা টাকা দিয়ে নানান উপদেশ দিলেন। বিড়বিড় করে দোয়া পড়ে আমার মাথায় ফুঁ দিয়ে বললেন, 'এবার তাহলে যেতে হয় রে বড় খুকি। একটা কাগজ আন। জামাইকে দু লাইনের চিঠি লিখে যাই।'

দু লাইনের চিঠি লিখতে মামার অনেক সময় লাগল। টপ টপ করে মাথা থেকে ঘাম ঝরছে। পানি চেয়ে পানি খেলেন।

'আপনার শরীর কি বেশি খারাপ লাগছে মামা?'

'না। ঘাম হচ্ছে, জ্বর ছেড়ে দিচ্ছে বলে মনে হয়।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিঠি শেষ করে মামা উঠে দাঁড়ালেন। দোয়া পড়ে ফুঁ দেয়ার পর্ব আবার হল। আমি বললাম, 'মামা আমার ধারণা আপনার শরীর বেশি খারাপ, আপনি রাতটা থেকে যান।'

'না রে বেটি না। জামাই এলেই চিঠিটা দিবি।'

'আমি কি পড়তে পারব মামা?'

'অবশ্যই পারবি। না পারার কী আছে?'

ঘর থেকে বের হবার ঠিক আগে আগে মামা বাথরুমে ঢুকে বমি করলেন। আমি মাথা মুছিয়ে দিলাম। মামা বললেন, 'বমি হয়ে যাওয়ায় ভালো হয়েছে। শরীরটা ফ্রেশ লাগছে। তুই আমাকে নিয়ে শুধু শুধু চিন্তা করিস না।'

'কী হয় একটা রাত থেকে গেলে?'

'খালি বাসা ফেলে এসেছি। না গেলে হবে না।'

'খালি বাসা কেন? মামি কোথায়?'

'আর বলিস না। খামাখা ঝগড়া করে বাপের বাড়ি চলে গেছে। কয়েকবার আনতে গেছি, আসে না। ঝগড়া ঝগড়া করে জীবনটা শেষ করল। বড়ই আফসোস। ঝগড়া দিয়ে জীবন শুরু করলে— ঝগড়া দিয়ে শেষ করতে হয়। এটাই নিয়তি।'

মামা সিঁড়ি দিয়ে নামছেন— আমি তাকিয়ে আছি। আমার খুব খারাপ লাগছে। বিচিত্র একটা মানুষ, সবার সমস্যাই তাঁর সমস্যা। কিন্তু কেউ জানতে চায় না— এই মানুষটার নিজস্ব কোনো সমস্যা কি আছে।

নোমানের কাছে লেখা চিঠিটা পড়লাম। মামা লিখেছেন —

বাবা নোমান,

দোয়াপর সমাচার এই যে, ঢাকায় কার্যোপলক্ষে আসিয়াছিলাম। তোমার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। বড় খুকির নিকট সমস্ত বিস্তারিত জানিয়া সুখী হইয়াছি। এক্ষণে আমার একটি আবদার। বড় খুকিকে নিয়া এক দুই দিনের জন্য হইলেও নেত্রকোনা যাইবা। বড় খুকির মাতা তাহার কন্যার জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়াছে। তাহাছাড়া ছোট খুকিরও বিবাহের কথাবার্তা হইতেছে। এমতাবস্থায় দুই বোন কিছুদিন একত্র থাকিলে বড় ভালো হয়। বিবাহ সম্পন্ন হইলে কে কোথায় যাইবে কেহই বলিতে পারে না। হয়তো দীর্ঘদিন আর দুই বোনের সাক্ষাৎ হইবে না। কাজেই বাবা, এই বৃদ্ধের প্রস্তাব একটু বিবেচনা করিবে।

আমি দেখলাম বড় মামা চিঠিতে নাম সই করতে ভুলে গেছেন। তাঁর শরীরটা তাহলে সত্যি সত্যি খারাপ করেছে। এত বড় ভুল মামা কখনোই করবেন না। পরিষ্কার করে নাম লিখবেন। তারিখ দেবেন, ঠিকানা দেবেন। নাম তারিখ এবং ঠিকানা ছাড়া চিঠি আমিও লিখেছি। দুটা চিঠি। দুটাই স্যারকে লেখা। প্রথমটা যখন লিখি তখন থরথর করে আমার হাত-পা কাঁপছে। কী লিখছি নিজেই জানি না। কাউকে চিঠি লিখতে হলে গুছিয়ে লিখতে হয়, সুন্দর করে লিখতে হয়, এইসব কিছুই আমার মাথায় নেই। তাঁকে চিঠি লিখছি এই আনন্দেই আমার তখন শরীর কাঁপছে। প্রথম চিঠিতে তাঁকে কী লিখেছিলাম আমার কিছুই মনে নেই। আমার স্মৃতিশক্তি ভালো। সবকিছুই আমার মনে থাকে। কিন্তু ঐ চিঠিটির কথা কিচ্ছু মনে নেই। শুধু মনে আছে রুলটানা কাগজে চিঠিটা লেখা। যে বল পয়েন্টে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লিখেছিলাম সেই বল পয়েন্টটা ঠিকমতো কালি ছাড়ছিল না। অনেকগুলো অক্ষর ছিল অস্পষ্ট। চিঠি শেষ করে আমি দুহাতে মুখ ঢেকে অনেকক্ষণ কাঁদলাম। আমি পোস্টঅফিস থেকে নিজেই খাম কিনলাম। খাম কেনার সময় মনে হল যিনি খাম দিচ্ছেন তিনি সব বুঝে ফেলেছেন। তিনি জেনে গেছেন— এই চিঠি আমি কাকে দিচ্ছি। কী আছে চিঠিতে।

ইকনমিক্সের একটা বইয়ের ভেতর খামটা লুকিয়ে আমি যাচ্ছি চিঠি পোস্ট করতে, পথে বাবার সঙ্গে দেখা। বাবা বললেন, 'কই যাচ্ছিস রে?' আমার শরীর কেঁপে উঠল। আমা[illegible] হল বাবা বুঝে ফেলেছেন আমি কোথায় যাচ্ছি। তিনি জানেন, আমার এই বইটার ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় একটা খাম আছে।

'কি রে কথা বলছিস না কেন? কী হয়েছে তোর?'

'বন্ধুর বাসায় যাচ্ছি।'

'এখন কলেজ আছে না? কলেজ বাদ দিয়ে বন্ধুর বাসায়।'

'ওখান থেকে কলেজে যাব।'

'আচ্ছা যা। তোর কি শরীর খারাপ?'

'না বাবা শরীর ভালো।'

'আচ্ছা আচ্ছা।'

চিঠি পোস্ট করে আমি কলেজে গেলাম। থার্ড পিরিয়ডে স্যারের ক্লাস। আমি মাথা নিচু করে বসে আছি। স্যার ক্লাসে ঢুকলেন, সব মেয়েরা উঠে দাঁড়াল। আমি দাঁড়াতে পারলাম না। মনে হচ্ছে আমার হাত-পা পাথরের মতো শক্ত হয়ে গেছে।

স্যার রোলকল করছেন। মেয়েরা নানান রকম ফাজলামি করছে। ইয়েস স্যার না বলে সবাই বলছে হাজির হুজুর। একজন আবার বলল— বান্দা হাজির হুজুর। হাসির হল্লা শুরু হল। স্যার রোলকল বন্ধ করে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। মনে হল কিছু বলবেন। বললেন না। রোলকল করে যেতে লাগলেন। আমার রোল তিপ্পান্ন। যখন তিনি ডাকলেন রোল ফিফটি থ্রি। আমি বসে রইলাম। কোনো শব্দ করলাম না। স্যার আবার ডাকলেন রোল ফিফটি থ্রি আমি চুপ করে রইলাম। স্যার কৌতূহলী হয়ে আমার দিকে তাকালেন। আমি মাথা নিচু করে আছি। আমার ধারণা হয়েছে, স্যার আমার চোখের দিকে তাকালেই সব জেনে যাবেন। তখন আমি কী করব? এ লজ্জা আমি কোথায় রাখব?

স্যার সেদিন পড়ালেন সম্রাট বাবরের সিংহাসনে আরোহণ পর্ব। ক্লাসের হৈচৈ একসময় থেমে গেল। তিনি ভারি এবং খানিকটা কাঁপা গলায় গল্প বলার ভঙ্গিতে কথা বলছেন। কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে হাত নাড়ছেন—

'বাবরের মা'র নাম হযরত খানম।

দেখেছ কী অদ্ভুত নাম! এই নাম মনে রাখা সহজ না? খুব সহজ। আবার শোন, বাবরের মা হযরত খানম। ৯১০ হিজরীর কথা। রবিউস সানি।রবিউস সানি কী আগে একবার বলেছি। আজ আর বলব না।

এই সময় কী হল? হযরত খানম জ্বরে পড়লেন। মাত্র ছ দিনের জ্বরে তিনি মারা গেলেন। বাবরের বয়স তখন কত? কে বলতে পারে কত? নবনী তুমি বলতে পার?'

আমার শরীর কেঁপে উঠল। স্যার কী সুন্দর করে ডাকলেন নবনী? আর কেউ কি কোনোদিন এত সুন্দর করে আমার নাম ডাকবে?

'নবনী তুমি জান, তখন বাবরের বয়স কত?'

আমি চুপ করে আছি। আমার পেছন থেকে বেণু উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'স্যার নবনী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানে কিন্তু বলবে না।'

ক্লাসের সবাই হাসছে। স্যার সবার হাসি অগ্রাহ্য করে পড়াতে শুরু করলেন— 'হযরত খানমের মৃত্যুর চার দিনের দিন আরেকটি ঘটনা ঘটল .....

ঘটনা সামান্য হলেও মুঘল সাম্রাজ্যে তার ফল ছিল সুদূরপ্রসারী। আজ সেই সামান্য ঘটনা এবং তার পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ তোমাদের বলব ...। ইতিহাস থেকে আমাদের অনেক কিছু শিখতে হবে। আপাতত তুচ্ছ ব্যাপার যে এক সময় সাম্রাজ্য পরিবর্তনের মতো বড় ব্যাপারে রূপান্তরিত হতে পারে এই শিক্ষা বার বার ইতিহাস আমাদের দেয়।'

প্রথম চিঠিটি পাঠাবার এক সপ্তাহ পর আমি দ্বিতীয় চিঠিটি পাঠালাম। কোনো চিঠিতে নাম ঠিকানা ছিল না। তবু স্যার ব্যাপারটা বুঝে ফেললেন। একদিন কলেজে রওয়ানা হচ্ছি। উনার সঙ্গে দেখা। উনি বললেন, 'নবনী শোন। তোমার তো পরীক্ষা এসে গেল। এখন মন দিয়ে পড়াশোনা করা উচিত তাই না।'

'জ্বি।'

'তোমার হাতের লেখা সুন্দর। তবে হাতের লেখা সুন্দর হলেই তো হয় না— বানানের দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। মুহূর্ত বানানে হ য়ের উপর আছে দীর্ঘ উ-কার।'

আমি স্যারের দিকে তাকিয়ে কঠিন গলায় বললাম, 'আমাকে এসব কেন বলছেন আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

আমি সেদিন কলেজে গেলাম না। বাড়িতে ফিরে এসে দরজা বন্ধ করে সারাদিন কাঁদলাম। সন্ধ্যাবেলা ছাদে উঠে মনে হল— ছাদ থেকে যদি নিচে লাফিয়ে পড়তে পারতাম, তাহলে কী সুন্দর হত! কেন মানুষ শুধু শুধু পৃথিবীতে বেঁচে থাকে?

AMARBOI.COM

৬

সাতদিনের জায়গায় দশদিন পার করে নোমান ফিরল। রোদে পুড়ে চেহারা এমন হয়েছে যে তাকানো পর্যন্ত যায় না। এর সঙ্গে আছে কাশি। খুকখুক, খুকখুক কাশি লেগেই আছে। ঘরে ঢোকার পর থেকেই কাশছে।

'খুব পরিশ্রম হচ্ছে নবনী। ছবি তৈরি যে কী কঠিন কাজ তুমি ধারণাই করতে পারবে না। একটা সাধারণ দুই মিনিটের দৃশ্য করতে লাগল সারাদিন। দৃশ্যটা কী জান? দৃশ্যটা হল— নায়িকা পুকুর ঘাটে গোসল করতে গিয়েছে। একটা সবুজ কচুপাতায় তার গায়ে মাখা সাবানটা রাখা। হঠাৎ বাতাস লেগে সাবানটা পানিতে পড়ে গেল। নায়িকা পানিতে ডুব দিয়ে সাবান খুঁজছে।'

'অহনা তোমাদের নায়িকা?'

'হুঁ। আমাদের ছবিতে ওর নাম হল জাহেদা। গ্রামের মেয়ে হিসেবে তাকে যে কী মানিয়েছে তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। স্টিল ছবি নেয়া আছে, তোমাকে দেখাব। এখন ভালো করে চা কর দেখি, চা খাব। আউটডোরে থেকে থেকে চায়ের অভ্যাস হয়েছে।'

আমি চা বানিয়ে এনে দেখি খাটে পা ঝুলিয়ে সে ভোস ভোস করে সিগারেট টানছে। তার শুধু যে চায়ের অভ্যাস হয়েছে তাই না, সিগারেটের অভ্যাসও হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'নবনী।'

'উঁ।'

'গোসলের পানি দাও। গোসল করে বেরুব। অহনার খোঁজে যেতে হবে। ও রাগারাগি করে কাউকে কিছু না বলে চলে এসেছে। আমরা তো কিছুই জানি না। সন্ধ্যাবেলা শ্যুটিং। জাহেদা হাতে এক মুঠি পাটখড়ি নিয়ে যাচ্ছে। পাটখড়ির মাথায় আগুন, সেই আগুনের আভায় পথ চলছে ... দারুণ দৃশ্য। লাইট ফাইট করতে রাত দশটার মতো বেজে গেল। সফিক আমাকে বলল, যা অহনাকে নিয়ে আয়। আমি আনতে গিয়ে শুনি সে সন্ধ্যাবেলা ব্যাগ গুছিয়ে স্টেশনের দিকে গেছে। বোঝ অবস্থা।'

'তোমাদের শ্যুটিং হল না?'

'কীভাবে হবে? রাতে যে ফিরে আসব সেই উপায়ও নেই ... ট্রেন হল পরদিন ভোর সাতটায়।'

নোমান প্রায় এক ঘণ্টা লাগিয়ে গোসল করল।

মাথায় পানি ঢালে আর কাশে। কী বিশ্রী কাশি! এর মধ্যে এত ঠাণ্ডা লাগানো কি উচিত হচ্ছে? বাথরুম থেকে বের হয়ে সে কেমন জবুথবু হয়ে বসে আছে। মনে হচ্ছে কিছুতেই উৎসাহ নেই। বাসায় যে নতুন একটা কাজের মেয়ে আছে সেদিকে তার চোখ পড়ল না। তার পোষা ময়না সম্পর্কেও সে তেমন উৎসাহ দেখাল না। একবার শুধু বলল, 'ময়নাটাকে ঠিকমতো খাওয়াদাওয়া দেয়া হয়েছে নবনী?' ব্যাস এই পর্যন্তই।

নোমান বলল, 'আরেক কাপ চা দাও নবনী। গোসল করে শরীরটা ফ্রেশ হয়ে গেছে। তোমার একা একা অসুবিধা হয় নি তো?'

'না।'

'সফিক একবার বলছিল, তুই তোর বৌকে নিয়ে আয়— সে একা আছে।'

'নিয়ে গেলেই পারতে।'

'অহনা রাজি হল না।'

'রাজি হলেন না কেন?'

'অহনাকে বোঝা মুশকিল। ও কখন কী করে, খুব স্ট্রেঞ্জ মেয়ে। ইংরেজি সাহিত্যে এমএ। অনার্স, এমএ, দুটাতেই ফার্স্টক্লাস। ইউনিভার্সিটিতে চাকরি পেয়েছিল— বলল চাকরি করবে না। ঘর-সংসার করবে। বছর বছর বাচ্চা দিয়ে ঘর ভর্তি কর ফেলবে, ছেলেপুলেয় ... হা-হা-হা। এই যুগের কোনো মেয়ের মুখে এই জাতীয় কথা শুনেছ?'

'না।'

'ওর আরো অদ্ভুত ব্যাপার আছে। এক সময় বলব। কই চা দিলে না?'

আমি চা এনে দিলাম। নোমান চা শেষ করেই বের হয়ে গেল। তার চোখ টকটকে লাল। কে জানে হয়তো জ্বর এসেছে। মদিনা বলল, 'আম্মা লোকটা কে?'

আমি বললাম, 'কেউ না।'

ইচ্ছা করে বলা না। মুখ ফসকে বলে ফেলা।

নোমান জ্বর গায়ে রাত নটার দিকে ফিরল। চোখ লাল, জ্বরের ঘোরে শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে। আমি বললাম, 'অহনাকে পাওয়া গেল?'

'দেখা হয় নি, তবে খোঁজ পাওয়া গেছে। চলে গেছে রাজশাহী। তোমাকে বলেছি না— অদ্ভুত মেয়ে।'

'এস শুয়ে থাক। তোমার জ্বর বাড়ছে।

'ঘরে কি থার্মোমিটার আছে?'

'আছে তবে কাজ হয় না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কাজ হবে না কেন?'

'থার্মোমিটারের মাথাটা ভাঙা।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, মাথা ভাঙা থার্মোমিটার রেখে দিয়েছ কেন?'

'ফেলতে মায়া লাগে।'

রাতে সে কিছু খেল না। মাঝরাতের দিকে তার জ্বর খুব বাড়ল। আমি তার মাথায় জলপট্টি দিচ্ছি। সে বিড়বিড় করে নানান কথা বলছে — । জ্বরের ঘোরে বলছে বলেই আমার ধারণা।

'কোটিপতি হওয়া কঠিন কিছু না। ইচ্ছা করলে হওয়া যায়। দরকারটা কী বল? কোনো দরকার নাই। অহনার কথাই ধর— অহনাও কিন্তু কোটিপতি। গরিব ঘরের মেয়ে ছিল। কী যে ভয়ংকর গরিব চিন্তাই করতে পারবে না! অথচ এমন ভালো ছাত্রী। পড়াশোনার এত আগ্রহ। ইউনিভার্সিটিতে যখন পড়ত তখন হলের সিটরেন্ট দেয়ার পয়সা নেই। সফিক আমার হাত দিয়ে টাকা পাঠাত। সফিক একটা কথা বলে— নো ফ্রি লাঞ্চ'। এই পৃথিবীতে সবকিছুই নগদ অর্থে কিনতে হবে। হো-হো-হো। বুঝতে পারছ কিছু?'

'বুঝতে পারছি না। বুঝতে চাচ্ছিও না।'

'টাকা দিয়ে দিয়ে মেয়েটাকে সফিক কিনেছে। এখন চাকা ঘুরে গেছে— মেয়েটা কিনে নিয়েছে সফিককে। ঢাকা শহরে যত প্রোপার্টি সফিকের আছে সব কিন্তু ঐ মেয়ের নামে। এখন একবার যদি এই মেয়ে সফিককে ছেড়ে যায়— সফিক পথে বসবে। আজিমপুর কবরস্থানে বসে ভিক্ষা করতে হবে। সুর করে গান গাইতে হবে— 'আল্লাহুম্মা, সাল্লেআলা সাইয়াদেনা, মৌলানা মোহাম্মদ!'

'প্লিজ চুপ করে থাক। ঘুমানোর চেষ্টা কর।'

'আহা কথা বলতে ভালো লাগছে তো। শোন না কী বলি— দারুণ ইন্টারেস্টিং। আমি করতাম কি, মাসের দুই তিন তারিখে টাকা নিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করতে যেতাম। হল গেইট থেকে স্লিপ পাঠাতাম— জাহেদা খাতুন, সেকেন্ড ইয়ার অনার্স - রুম নাম্বার ...।

'উনার নাম তো অহনা।'

'অহনা পরে হয়েছে— তখন তার নাম ছিল জাহেদা খাতুন। বিয়ের পর হল অহনা। বুঝলে নবনী। খামে ভর্তি করে টাকা নিয়ে যেতাম। সব নতুন চকচকে নোট। জাহেদা টাকাগুলো হাতে নিত। আমি সঙ্গে করে মনিঅর্ডার ফরম নিয়ে যেতাম। সেইখানে বসেই সে মনিঅর্ডার ফরম পূরণ করত। দেশে টাকা পাঠাত। মনিঅর্ডার ফরমে লিখত— মা, তোমাকে কিছু টাকা পাঠালাম। এখানে দুটা মেয়েকে প্রাইভেট পড়িয়ে যা টাকা পাই তাতে আমার চলে গিয়েও কিছু থাকে।

'পানি খাব নবনী। পানি দাও।'

আমি পানি এনে দিলাম। দু চুমুক খেয়েই রেখে দিয়ে ক্লান্ত গলায় বলল, 'একটা ফ্রিজ কেনা দরকার। জ্বরজারি হলে ঠাণ্ডা পানি খেতে ইচ্ছা করে। একটা ফ্রিজ কিনতে হবে। ফ্রিজ কেনার টাকা আছে। কালই একটা ফ্রিজ কিনে ফেলব। কী বল?'

'আচ্ছা।'

'আর একটা ক্যাসেট প্লেয়ার। তুমি একা একা থাক। গান শোনার একটা কিছু থাকলে সময় কাটবে।'

'আচ্ছা কেনা হবে।'

'ড্রেসিং টেবিলটা এখনো দিয়ে যায় নি?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'না।'

'কী রকম হারামজাদা চিন্তা করে দেখ তো। ইচ্ছা করছে পিটায়ে লাশ বানায়ে ফেলি। জ্বর কমলে কাল সকালে একবার যাব—এমন পিটন দিব। অবশ্যি অহনাকে আনার জন্যে কাল রাজশাহীতেও যেতে হতে পারে। আমি হলাম তার চড়নদার। বুঝতে পারছ?'

'পারছি।'

'সপ্তাহের ছুটি যখন হত তখন অহনাকে আমি সফিকের কাছে পৌঁছে দিতাম। যেতাম রিকশা করে। ওর আবার সেই সময় পেট্রোলের গন্ধ সহ্য হত না। প্রথম প্রথম রিকশা করে যাবার সময় খুব কাঁদত। এই মেয়ে যে কী পরিমাণ কাঁদতে পারে তুমি বিশ্বাসও করবে না। আচ্ছা নবনী তুমি কী রকম কাঁদতে পার?'

আমি জবাব দিলাম না। জ্বরের ঘোরে ও ঝিমিয়ে পড়ল। আমি পাশেই জেগে বসে আছি। একটু দূরে হাত-পা ছড়িয়ে ঘুমাচ্ছে মদিনা। মেয়েটা খুবই শান্ত। দোষের মধ্যে একটাই, হঠাৎ দেখা যায় কাজকর্ম বন্ধ রেখে কাঁদতে বসে। আমি যখন জিজ্ঞেস করি—কাঁদছিস কেন রে?' সে দুহাতে চোখ মুছে কান্না বন্ধ করে ফিক করে হেসে ফেলে বলে, 'এমনেই কান্দি। অভ্যাস।'

ও আমাকে জিজ্ঞেস করেছে আমি কাঁদি কিনা। না আমি কাঁদি না। অতি বড় দুঃসময়েও না। কী হবে কেঁদে? প্রবল জ্বরের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে সে পড়ে আছে। আমি চুপচাপ বসে আছি তার মাথার কাছে। মানুষ কী আশ্চর্য প্রাণী! আজ আমি যার মাথার পাশে বসে আছি তার বদলে অন্য একজনের মাথার পাশেও বসতে পারতাম। পারতাম না? বিয়ে নামের একটা ব্যাপার দুজন অচেনাকে একসঙ্গে করে দিয়েছে। আমি তো স্যারের মাথার পাশেও বসে থাকতে পারতাম।

স্যারের কথা এই মুহূর্তে ভাবাটা কি ঠিক হচ্ছে? মুহূর্ত বানান কি যেন? হ য়ের উপর দীর্ঘ উ-কার। শুনুন স্যার, এই বানান আমি আর কোনোদিন ভুল করি নি। করবও না—শব্দটা মনে হলেই আপনাকে মনে পড়ে।

একজন মানুষ কি তার প্রতিটি মুহূর্ত আলাদা করতে পারে? আমি পারি। স্যারের সঙ্গের মুহূর্তগুলো আমি পারি। যদিও তাঁর সঙ্গে আমার তখন দেখাই হয় না। চাটাইয়ের যে ঢাকনি তিনি দিয়েছেন তা তিনি সরান নি। একদিন দেখি উত্তরের দরজাটাও তিনি তাঁর দিক থেকে বন্ধ করে দিয়েছেন। তখন তাঁর ঘরে যেতে হলে বাইরে দিয়ে যেতে হবে।

আমি নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করছি। ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা এসে গেছে। দরজা বন্ধ করে রাতদিন পড়ার ভান করি। বইয়ে একেবারেই মন বসে না। চিঠি লেখার একটা খাতা করেছি। রোজ একটা করে চিঠি লিখি। মজার মজার সব চিঠি। কোনোটাতে হাসির কথা থাকে। কোনোটাতে রাগের কথা থাকে। কোনো কোনো চিঠি লিখে নিজেই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদি। ঠিক করে রেখেছি এক বৎসরে ৩৬৫টা চিঠি লিখব। চিঠি লেখা শেষ হলে একদিন খাতা নিয়ে স্যারের কাছে যাব। তাঁকে বলব— স্যার দেখুন তো এখানে কী কী বানান ভুল আছে।

অতিথপুরে আমার ছোটখালার ননদের বিয়ে। খালা খবর পাঠিয়েছেন আমি যেন অবশ্যই যাই। মেয়েকে সাজিয়ে দিতে হবে। মা বললেন— 'নবনী যাবি?'

আমি বললাম, 'পাগল হয়েছ? আমার পরীক্ষা না? ইরাকে পাঠিয়ে দাও। ইরা যাক।'

'যা না মা, এত করে লিখেছে। তোকে তোর খালা কত পছন্দ করে। না গেলে মনে কষ্ট পাবে।'

আমার যেতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু যাব কী করে? যদি যাই তাহলে কি আর রোজ একটা করে চিঠি লিখতে পারব? তাছাড়া স্যারকে ফেলে রেখে আমার যেতে ইচ্ছা করছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না। তাঁর সঙ্গে আমার কথা হয় না। রোজদিন দেখাও হয় না, তবুও তো আমরা পাশাপাশি আছি। উত্তরের দরজার পাশে দাঁড়ালে তাঁর হাঁটার শব্দ কানে আসে। এটাই বা কম কি?

ঠিক হল ইরা যাবে। বাবা তাকে পৌঁছে দিয়ে আসবেন। যেদিন যাবার কথা সেদিন দেখি বাবা যাচ্ছেন না। ঠিক হয়েছে ইরাকে পৌঁছে দেবেন আমাদের স্যার। আমার বুক ধক করে উঠল। আমি মাকে গিয়ে বললাম— 'মা শোন, ইরা থাক। আমি যাব। আমি না গেলে ছোটখালা মনে কষ্ট পাবেন।'

মা বললেন, 'ইরা সব কাপড় গুছিয়ে রেখেছে, এখন তুই যাবি কী?'

আমি বললাম, 'আমার কাপড় গোছাতে এক মিনিট লাগবে।'

'না না তুই থাক, পড়াশোনা করছিস কর।'

ইরা স্যারের সঙ্গে চলে গেল। আমার মনে হল আমি যদি একটা ধারালো ছুরি দিয়ে ইরাকে ফ্যালাফ্যালা করে ফেলতে পারতাম। আমার জীবনের সবচে' কষ্টের মুহূর্ত কী যদি কেউ জানতে চায় আমি বলব— স্যারের সঙ্গে ইরার অতিথপুরে যাবার সময়টা।

তখন ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে। বাবা একটা রিকশা ডেকে এনেছেন। ইরা রিকশায় উঠে বসেছে। স্যার বললেন, 'আমি আরেকটা রিকশা নিয়ে আসি।' বাবা ধমকের স্বরে বললেন, 'আরেকটা রিকশা লাগবে কেন? তুমি এইটাতেই উঠ তো মাস্টার। তোমাদের বড় বাড়াবাড়ি।'

তারা দুজন একটা রিকশায় করে চলে যাচ্ছে। আমি পাথরের মতো মুখ করে তাকিয়ে আছি।

ইরা ফিরে এসে কত গল্প, আপা জান তোমার স্যার কিন্তু দারুণ রসিক লোক। এমনিতে বোঝা যায় না। কিন্তু এমন সব রসিকতা করেন যে হাসতে হাসতে গড়াগড়ি খেতে হয়। একদিন কী হয়েছে শোন, ছোটখালা স্যারকে খেতে দিয়েছেন। পাঙ্গাশ মাছের বড় একটা পেটি দেয়া হল। তখন স্যার ...

আমি বললাম, 'চুপ কর তো ইরা। কানের কাছে ভ্যান ভ্যান করিস না। পড়ার চেষ্টা করছি দেখছিস না?'

একদিন খুব কষ্ট লাগল। বড় মামা একটা টাঙ্গাইলের শাড়ি পাঠিয়েছেন। সবুজের উপর কালো ডোরা। শাড়ি পরার পর মা বললেন, 'ও আল্লা তোকে তো পরীর মতো সুন্দর লাগছে রে! ইরাকে নিয়ে যা তো স্টুডিও থেকে একটা ছবি তুলে আয়। বিয়ের কথাবার্তায় কাজে লাগবে।'

আমি ছবি তুলতে গেলাম না। তবে আমাদের বাড়ির সামনের বাগানে হাঁটতে গেলাম। বাগান থেকে স্যারের ঘরের ভেতরটা দেখা যায়। আমার মন বলছিল ভেতর থেকে স্যার আমাকে দেখতে পাবেন এবং অবশ্যি বাইরে বের হয়ে আসবেন।

সে রকম কিছুই হল না। আমি দেখলাম গভীর মনোযোগে তিনি কী যেন পড়ছেন। জানালার সামনে দিয়ে আমার বার বার যাওয়া-আসা তার মনোযোগ নষ্ট করতে পারল না। আমার ইচ্ছা করছে তাঁর ঘরে গিয়ে ঢুকি। তীব্র গলায় বলি— 'বেহেশতে আপনি যে সব পরী পাবেন তারা কি আমার চেয়েও সুন্দর? আপনি দিনের পর দিন আমাকে অগ্রাহ্য করবেন তা হবে না। না না না।'

এই সময় স্যার অসুখে পড়লেন। বাসার কেউ বুঝতে পারল না। কিন্তু আমি বুঝলাম। বুঝেই বা কী করব? আমি তাঁকে ঘর থেকে বের হতে দেখি না। তিনি কলেজেও যান না। আমি কলেজের অফিসে খোঁজ নিয়ে জানলাম অসুস্থতার জন্যে তিনি ছুটির দরখাস্ত করেছেন। আমার ভয়ংকর খারাপ লাগছে। একটা মানুষ অসুখ হয়ে পড়ে আছে, এ বাড়ির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেউ সেটা বুঝতে পারছে না কেন? এ বাড়ির সবাই কি অন্ধ? মার কি উচিত না খোঁজখবর করা? আমি নিজ থেকে কাউকে কিচ্ছু বলব না। মরে গেলেও না।

একদিন মা বললেন, 'কি রে তোর স্যারের কি অসুখ-বিসুখ করল নাকি? একজন ডাক্তারকে মনে হয় ঢুকতে দেখলাম।'

আমি বললাম, 'অসুখবিসুখ করেছে কিনা জানি না। করতেও পারে। আল্লাহর পিয়ারা বান্দাদেরও তো অসুখবিসুখ হয়।'

'খোঁজ নিয়ে আয় তো।'

'আমি খোঁজ নিতে পারব না, মা। আমার এত মাথাব্যথা নেই। অন্তুকে পাঠাও।'

অন্তু খোঁজ নিয়ে এল— চোখ বড় বড় করে হাসিমুখে বলল, 'মওলানা ফ্ল্যাট হয়ে গেছে বুঝলে মা— ছদিন ধরে বিছানায় শোয়া। কথা বলে চিঁচিঁ করে।'

মা বললেন, 'তাতে হাসির কী হল। হাসছিস কেন?'

'উনি কেমন চিঁচিঁ করে কথা বললেন ঐ জন্যেই হাসছি। উনার কথা শুনলে মনে হবে মানুষ কথা বলছে না। চিকা কথা বলছে। কথা শুনলে তুমিও হাসবে।'

মা তৎক্ষণাৎ তাঁকে দেখতে গেলেন। পৃথিবীর সমস্ত মাদের মতো তিনিও খুব দুঃখিত হলেন। একটা লোক দিনের পর দিন অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে, তিনি বলতেও পারেন না এই লজ্জাতেই মা অস্থির। মা বললেন, 'কেন তুমি আমাদের কোনো খবর দিলে না? তুমি রান্না করে কিছু খেতে পার না, আমাদের বলবে আমরা ব্যবস্থা করব। নাকি ইসলাম ধর্মে এরকম নিয়ম নেই?'

তিনি মিনমিন করে বললেন, 'আপনাদের কষ্ট দিতে চাই নি। ভেবেছি সেরে যাবে।'

'এখন থেকে তোমার সব খাওয়াদাওয়া এ বাড়ি থেকে যাবে। বুঝতে পারছ? কী খাও তুমি?'

'বার্লি আর সাগু এই দুটা ছাড়া আর কিছু খেতে পারি না।'

'তোমার হয়েছে কী? ডাক্তার কী বলল?'

'ডাক্তার রক্ত পরীক্ষা করতে দিয়েছে। এখনো কিছু বলতে পারছেন না।'

দুপুরে আমি খাবার নিয়ে গেলাম।

মামার পাঠানো সেই সবুজ শাড়িটা পরলাম। চোখে কাজল দিলাম। হাতে একটা ট্রে। ট্রেতে এক বাটি বার্লি, এক গ্লাস দুধ। স্যার আমাকে দেখে ভূত দেখার মতো চমকে উঠলেন। পৃথিবীর আশ্চর্যতম ঘটনাটা তিনি যেন ঘটতে দেখলেন। বিছানায় উঠে বসতে গিয়ে কাত হয়ে পড়ে গেলেন। আমি বললাম, 'স্যার আপনি উঠবেন না। চুপ করে শুয়ে থাকুন। আপনার খাবার নিয়ে এসেছি।'

'শুকরিয়া। অশেষ শুকরিয়া। রেখে দাও।'

'আপনি নিজে নিজে খেতে পারবেন? নাকি আমি চামচ দিয়ে খাইয়ে দেব?'

'না না পারব। আমি পারব।'

'স্যার আমার চামচ দিয়ে খাইয়ে দিতে কিন্তু অসুবিধা নেই। আপনি যদি অস্বস্তি বা লজ্জা বোধ না করেন, আমি খাইয়ে দিতে পারি। যদি পাপ হয় আমার হবে। আপনার হবে না। আপনি ঠিকই বেহেশতে যাবেন।'

তিনি দুঃখিত গলায় বললেন, 'তুমি আমার ধর্মকর্মটাকে এমন কঠিন দৃষ্টিতে দেখ কেন? আমি তো কারো কোনো ক্ষতি করছি না। আমি নিজের মতো থাকি। এই নিজের মতো থাকতে গিয়ে তোমাকে যদি কোনো কারণে কষ্ট দিয়ে থাকি, তুমি কিছু মনে রেখ না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি অস্বস্তির সঙ্গে বললাম, 'আপনি কষ্ট দেবেন কেন? আমি কথার কথা বললাম। স্যার আমি যাই।'

'একটু বোস নবনী। বসতে ইচ্ছা না হয়— দাঁড়িয়ে থাক। আমি কয়েকটা কথা বলব। এই কথাগুলো তোমার জানা খুব জরুরি। আমি মানুষ হয়েছি এতিমখানায়। এতিমখানার জীবনটা তো আদর-ভালবাসার জীবন না। কষ্টের জীবন। আমাদের একজন হুজুর ছিলেন, আমরা ডাকতাম মেজ হুজুর। তিনি আমাদের সবাইকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। ধর্মকর্মের প্রতি আমার এই অনুরাগ তাঁর কাছ থেকে পাওয়া। আমি মনে করি না এটা ভুল। মাদ্রাসা থেকে উলা পাস করে আমি কলেজে ভর্তি হই। আমার ভাগ্য ভালো ছিল, ইন্ডিয়া সরকারের একটা স্কলারশিপ পেয়ে যাই। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ করার একটা সুযোগ ঘটে। এমএ পাস করি।'

আমি বললাম, 'স্যার আমাকে এত কথা বলার দরকার নেই।'

তিনি খানিকটা উত্তেজিত গলায় বললেন, 'দরকার আছে। দরকার আছে বলেই বলছি— তোমরা আজ যে পোশাকে আমাকে দেখছ সব সময় এই পোশাকই আমি সারা জীবন পরেছি। মেজ হুজুর সেই নির্দেশ আমাকে দিয়েছেন।

'কেন দিলেন?'

'কারণ আমাদের নবী এই লেবাস পরতেন।'

'নবী আরবে জন্মেছিলেন বলে এই লেবাস পরতেন। তিনি যদি তুন্দ্রা অঞ্চলে জন্মাতেন তাহলে নিশ্চয়ই এই লেবাস পরতেন না। তখন গায়ে পরতেন সীল মাছের চামড়ার পোশাক। এই অবস্থায় আপনি কী করতেন? আপনিও কি সীল মাছের চামড়ার পোশাক জোগাড় করতেন ?'

'নবীজী যেহেতু তুন্দ্রা অঞ্চলে জন্মান নি কাজেই সেই প্রশ্ন আসে না। তাছাড়া নবীজীর পোশাক পরার অন্য একটা অর্থ হল— তাঁকে সম্মান দেখানো। সম্মান দেখানোয় তো দোষের কিছু নেই। রবীন্দ্রনাথকে সম্মান দেখাতে গিয়ে এক সময় অনেকে লম্বা দাড়ি রাখত বাবরি চুল রাখত।'

আমি চুপ করে গেলাম। স্যার সহজ ভঙ্গিতে বললেন, 'তুমি আমার সঙ্গে যুক্তিতে পারবে না নবনী। বোধহয় তোমার ধারণা ছিল এই জাতীয় পোশাক পরা টুপিওয়ালা লোক সব অল্প বুদ্ধির হয়। এই রকম মনে করার কোনো কারণ নেই। আমার বুদ্ধি ভালোই আছে। আমার পড়াশোনাও অনেক। তোমাকে এত কথা বললাম। কারণ ... কারণ ...।'

'কারণটা কী বলুন?'

'আরেকদিন বলব। আজ একদিনে অনেক বেশি কথা বলে ফেলেছি।'

'আপনি গুছিয়ে কথা বলতে পারেন।'

'না নবনী আমি গুছিয়ে কথা বলতে পারি না। তবে খুব গুছিয়ে চিন্তা করতে পারি।'

'একটা কাক যে আপনার কাছে আসত সেটা কি আর আসে না?'

'আসে। বিকালের দিকে আসে। একা আসে না তার কয়েকটা বন্ধুবান্ধব জুটেছে। সব ক'টাকে নিয়ে আসে। এরা কেউই আমাকে ভয় পায় না।'

'আপনাকে বোধহয় কাক মনে করে।'

'করতে পারে। পশুপাখির মনের কথা বোঝা বড়ই দুষ্কর। তবে কাক আমার খুব প্রিয় পাখি। এতিমখানায় যখন ছিলাম তখনো আমার কয়েকটা পোষা কাক ছিল।'

'কাক আপনার প্রিয় পাখি?'

'হুঁ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কেন?'

'কাকই একমাত্র পাখি যে মানুষের কাছাকাছি থাকে, অন্য কোনো পাখি কিন্তু মানুষের কাছে আসে না। তারা দূরে দূরে থাকে।'

'আপনার কি ধারণা আমাদের সবার কাক পোষা উচিত?'

উনি খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে হো-হো করে হেসে উঠলেন। কোনো মানুষকে এত আনন্দিত ভঙ্গিতে আমি হাসতে শুনি নি। আমার ইচ্ছা করতে লাগল আমি আরো কিছু হাসির কথা বলে স্যারকে হাসিয়ে দিই।

স্যার হাসি থামিয়ে বললেন, 'এক হাসিতে আমার অসুখ অনেকখানি কমে গেছে। এখন ঘরে যাও নবনী।'

'না আমি ঘরে যাব না।'

'তোমার পড়াশোনা আছে। পড়াশোনা কর। রোগীর পাশে এতক্ষণ থাকা ঠিক না।'

'আমার ঠিক অঠিক আমি বুঝব, আপনাকে এই নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না।'

তিনি একটু যেন ভয়ে ভয়ে বললেন, 'তুমি আমার কাছে কী চাও বল তো নবনী।'

'আমি কিছু চাই না।'

স্যার অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে ক্লান্ত গলায় বললেন, 'আমার কাছে দুটি চিঠি কি তুমি লিখেছিলে?'

'জানি না। [illegible]ারি।'

'শোন নবনী, তুমি একটা অসম্ভব ভালো মেয়ে। আমি চাই না আমার কারণে তোমার কোনো ক্ষতি হোক।'

আমি উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললাম, 'ক্ষতির কথা আসছে কেন? কী আবোলতাবোল কথা বলছেন? স্যার আরেকটা কথা, আমি কোনো চিঠি ফিটি কাউকে লিখি নি— আমার খেয়েদেয়ে কাজ নেই মৌলবীকে চিঠি লিখব। অসুখে আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আপনার এখানে আসাটাই আমার ভুল হয়েছে।'

স্যার অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমি বললাম, 'আমি আর আপনার কাছে খাবার নিয়ে আসব না।'

সেদিন রাতে খুব বৃষ্টি। আমি আবার তাঁর কাছে খাবার নিয়ে গেলাম। স্যারের ঘরে পা দেয়ামাত্র ইলেকট্রিসিটি চলে গেল। স্যার ব্যস্ত গলায় বললেন, 'দাঁড়াও দাঁড়াও মোমবাতি আছে। মোমবাতি জ্বালাচ্ছি।'

আমি অদ্ভুত গলায় বললাম— 'না মোমবাতি জ্বালাতে হবে না। অন্ধকারই ভালো।'

স্যার চমকে উঠে বললেন, 'নবনী ঘরে যাও। প্লিজ ঘরে যাও।'

আমি বললাম, 'না।'

কী প্রচণ্ড ঝড় হল সে রাতে। আমাদের শিরীষ গাছের একটা ডাল প্রচণ্ড শব্দে ভেঙে পড়ে গেল। হোক যা ইচ্ছা হোক, আজ আমার আর কিছুই যায় আসে না। প্রবল বর্ষণ হচ্ছে। হোক বর্ষণ। সারা পৃথিবী তলিয়ে যাক।

৭

আমাদের ড্রেসিং টেবিলটা চলে এসেছে। গাবদা ধরনের একটা জিনিস। আয়নাটাও বোধহয় সস্তা— মুখ কেমন বাঁকা দেখা যায়। যে পালিশের জন্যে এতদিন দেরি হল সেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পালিশে ড্রেসিং টেবিলের কোনো উন্নতি হয়েছে বলে মনে হল না। ম্যাটম্যাটে রং।

নোমান হাসিমুখে বলল, 'কি, জিনিসটা সুন্দর না?'

আমি বললাম, 'সুন্দর। খুব সুন্দর।'

'সস্তায় পেয়ে গেছি। সেগুন কাঠ। ঘুন ধরবে না। দু শ বছর পরেও কিচ্ছু হবে না।'

আমি বললাম, 'দু শ বছর পর্যন্ত আমাদের কোনো ড্রেসিং টেবিল কিনতে হবে না। এটা দিয়েই চালিয়ে দেব।'

সে তাকিয়ে রইল। তার চোখে-মুখে অস্বস্তি। আমার রসিকতাটা বোধহয় বুঝতে পারছে না। এটা দোষের কিছু না। অধিকাংশ মানুষই রসিকতা বুঝতে পারে না। আমার বাবাও পারেন না। অথচ তিনি যথেষ্ট বুদ্ধিমান।

নোমানকেও আমার বুদ্ধিমান মনে হয়। সরল ধরনের বুদ্ধি। এই জাতীয় বুদ্ধির মানুষ রসিকতা করতেও পারে না। রসিকতা বুঝতেও পারে না। এরা খুব কর্মঠ হয়। বিশ্বস্ত হয়। এরা যে প্রতিষ্ঠানেই কাজ করে সেই প্রতিষ্ঠানের জন্যেই অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তবে তাদের কোনো উন্নতি হয় না। নিজের অবস্থার উন্নতির জন্যে এদের মাথাব্যথা থাকে না। এরা অল্পতেই তুষ্ট।

ড্রেসিং টেবিলটা ঘরে আসার পর থেকে তার হাসিমুখ দেখে আমার খুব মজা লাগছে। এর মধ্যে গামছা দিয়ে সে দুবার এটা মুছল। কাছ থেকে, দূর থেকে নানান ভঙ্গিমায় নিজেকে দেখল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে খুব কায়দা করে চুল আঁচড়াল। তার চুল আঁচড়ানোই ছিল— দুই হাতে সেই চুল আউলা ঝাউলা করে আবার আঁচড়াল। আশ্চর্য ছেলেমানুষি।

'নবনী।'

'বল।'

'ড্রেসিং টেবিলের জন্যে একটা ঢাকনি বানানো দরকার। নয়তো ধুলা পড়ে পালিশ নষ্ট হয়ে যাবে।'

'ড্রেসিং টেবিলে ঢাকনি থাকে না।'

'কে বলল থাকে না। ড্রেসিং টেবিলে ঢাকনি বেশি দরকার। রাতেরবেলা আয়না ঢেকে রাখতে হয়। রাতেরবেলা আয়নায় মুখ দেখা খুবই অলক্ষণ। তুমি বোধহয় এইসব বিশ্বাস কর না?'

'না।'

'পামিস্ট্রি বিশ্বাস কর? হাত দেখা।'

'না।'

'অহনা আবার এইসব খুব বিশ্বাস করে। কেউ হাত দেখতে জানে বললেই হল, সে হাত মেলে দিবে।'

'ও আচ্ছা।'

'একবার সে খবর পেয়েছে হ্নীলা বলে একটা জায়গা আছে সেখানে খুব বড় একজন পামিস্ট থাকেন। যুগানন্দ আচার্য। স্কুলের সংস্কৃতের টিচার। সে সেখানে যাবেই। সফিক বিরক্ত হয়ে বলল, নোমান তুই ওকে নিয়ে যা। ঝামেলা চুকিয়ে আয়।'

'তুমি নিয়ে গেলে?'

'না নিয়ে উপায় আছে? অহনা মুখ দিয়ে যা বলবে তা করে ছাড়বে। সে বিরাট ইতিহাস। জায়গাটা হল টেকনাফের কাছাকাছি। অতি দুর্গম। আমি মাইক্রোবাস নিয়ে আগে চলে গেলাম। অহনা প্লেনে করে গেল কক্সবাজার। সেখান থেকে ওকে নিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাইক্রোবাসে করে রওনা হলাম। রাস্তা গেছে পানিতে ডুবে। রাস্তার দুই ধারে লাল ফ্ল্যাগ পুঁতে রেখেছে। ফ্ল্যাগ দেখে দেখে যাওয়া। এর মধ্যে টায়ার গেল পাংচার হয়ে।'

'শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল যুগানন্দ আচার্যকে?'

'মজা তো এইখানেই। কেউ এই লোকের নামও শোনে নাই। স্কুলই নেই। স্কুল টিচার কোত্থেকে আসবে?'

'তোমরা কী করলে, ফিরে এলে?'

'ফিরে আসব কী করে! সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ঐ সব অঞ্চলে সন্ধ্যার পর গাড়ি-ঘোড়া চলে না। ডাকাত পড়ে। তারচেয়ে বড় কথা কয়েকদিন ধরে পাহাড়ে বুনো হাতি নেমেছে, তিনটা মানুষ মেরেছে। আমার তো মাথায় বাড়ি। কী করব কিছুই বুঝতে পারছি না। হোটেল নেই, রেস্টহাউস নেই। কিছুই নেই। গেলাম টেকনাফ। সেখানে বনবিভাগের একটা রেস্টহাউস পাওয়া গেল। একটাই রুম। অহনাকে সেখানে রেখে আমি মাইক্রোবাসের ভেতর শুয়ে আছি। খবর পাওয়া গেছে রাস্তায় হাতি নেমে গেছে। সব বাতিটাতি নিভিয়ে দিতে বলেছে। বাতি দেখলেই নাকি হাতি ছুটে আসে। কত কাণ্ড! চা কর তো নবনী। চা খাই! আর তুমি এক কাজ কর পাউডার-টাউডার এইসব দিয়ে ড্রেসিং টেবিলটা সুন্দর করে সাজাও, অহনা দেখতে আসবে।'

'উনি এই ড্রেসিং টেবিল দেখতে আসবেন?'

'হ্যাঁ। তাঁকেও বলেছি।'

'ভালো করেছ।'

আমি চা বানাতে গেলাম। নোমান একটা মোড়া নিয়ে ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে রইল। আনন্দিত মুখ, সুখী সুখী চেহারা।

আজ তার অফিস আছে অথচ সারাদিন দিব্যি অফিস বাদ দিয়ে ঘরে বসে আছে। অফিসে তার কাজটা কী আমি জানি না। আমার ক্ষীণ সন্দেহ তার প্রধান কাজ বন্ধুর সঙ্গে সঙ্গে থাকা। ফুটফরমাশ খাটা। একদিন জিজ্ঞেসও করেছিলাম— অফিসে তোমার কাজটা কী বল তো?'

সে অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল। যেন খুব বোকার মতো প্রশ্ন করেছি।তারপর গম্ভীর মুখে বলল, 'যখন যে কাজ দেয় সেটাই করতে হয়। ধরাবাঁধা কিছু না। এ্যাড ফিল্ম করার জন্যে আর্টিস্টদের সঙ্গে যোগাযোগ। তাদের আনা নেয়া— কাজের কি শেষ আছে? প্রয়োজনে লাইটবয়ের কাজও করতে হয়।'

'সেটা কী?'

'আর্টিস্টের উপর লাইট ফেলা।'

'ও আচ্ছা। খুব কঠিন কাজ?'

'দেখে মনে হবে খুব সহজ কাজ, আসলে তা না। কঠিন আছে। টেকনিক্যাল কাজ সবই কঠিন।'

'তুমি যে কাজটা কর সেটার নাম কি?'

'তোমার কথাই বুঝতে পারছি না— নাম আবার কী?'

'অফিসে কত রকম পোস্ট আছে— কেউ ম্যানেজার, কেউ সুপারভাইজার, কেউ ক্যাশিয়ার, হেড ক্লার্ক ... তুমি কী?'

ও আমার অজ্ঞতায় হো-হো করে কিছুক্ষণ হেসে বলল—'আমাদের এসব কিছু নেই। তবে আমার বেতন হয় অহনার পিএ — এই খাতে।'

'তুমি অহনার পিএ?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কাগজে-কলমে তাই। আসলে অফিসের কাজ করে ফুরসত পাই না।'

'আজ অফিসে গেলে না?'

'আমার হল স্বাধীন চাকরির মতো— ইচ্ছা হল গেলাম, ইচ্ছা হল গেলাম না। আজ ছুটি নিলাম। চল বিকালে তোমাকে নিয়ে বের হব, মিরপুরের দিকে যাব।'

'তুমি না বললে অহনা আসবেন।'

'সে এলেও আসবে রাত ন'টার পরে। তার লেডিস ক্লাবের মিটিং আছে।'

'অহনার সঙ্গে তার স্বামীর যে সমস্যা ছিল সেটা মিটে গে

'হুঁ মিটে গেছে। এখন আবার গলায় গলায় ভাব।'

'তোমাদের ছবির শ্যুটিং শুরু হবে না?'

'হবে। এইবার তোমাকে নিয়ে যাব। তোমার অবশ্যি ভালো লাগবে না। খুবই বিরক্তিকর কাজ। ছবি মানে ধৈর্য পরীক্ষা— আর কিছু না।'

চা খেতে খেতে নোমান বলল, 'কাপড় পরে নাও চল ঘুরে আসি।'

'কোথায় যাবে, চিড়িয়াখানায়?'

'হ্যাঁ। আর কোথায়?'

এই পর্যন্ত আমরা ছ'বার বাইরে গেছি। এই ছ'বারের মধ্যে পাঁচবারই গিয়েছি চিড়িয়াখানায়। খানিকক্ষণ ঘুরেই সে এসে দাঁড়াবে বাঁদরের খাঁচার সামনে। মুগ্ধ বিস্ময়ে বলবে— কী আজিব জানোয়ার। সে অবাক হয়ে ''আজিব জানোয়ার'' দেখে, আমি দেখি তাকে। বাঁদরদের সঙ্গে সে নানা কথাবার্তা বলে, সেইসব শুনতেও মজা লাগে।

'এই লাফ দে। লাফ দে কিচ কিচ কিচ ... ঐ লম্বুটার ল্যাজ ধরে টান মার না। দেখছিস কী? আবার দেখি হাসে ... কিচ কিচ কিচ'

আমাদের চিড়িয়াখানায় যাওয়া হল না। কাপড়চোপড় পরে বেরুবার মুখে অহনা এসে উপস্থিত হলেন। চোখ ধাঁধানো উগ্র পোশাক। শাড়ি এমন পাতলা যে এই শাড়ি গায়ে থাকা না থাকা অর্থহীন। ব্লাউজটিও ভিন্ন ধরনের কাঁচুলি জাতীয়— নাচের মেয়েরা বোধহয় এরকম পরে। ঠোঁটে তিনি এমন লিপস্টিক মেখেছেন যে দেখে মনে হয় ঠোঁটে আগুন লেগে গেছে। এমন আগুন রঙা লিপস্টিক আমি আগে দেখি নি। অহনা এসেছেন নোমানের ড্রেসিং টেবিল দেখতে। তিনি নানা দিক থেকে ঘুরেফিরে ড্রেসিং টেবিল দেখলেন। মুগ্ধ স্বরে বললেন, 'অপূর্ব!'

নোমান বলল, 'অরিজিন্যাল সেগুন কাঠ— দু শ বছরেও কিছু হবে না।'

অহনা বললেন, 'সেগুন কাঠ ছাড়া এত ভালো পালিশ হত না। অদ্ভুত সুন্দর। আয়নাটায় একটু ঢেউ ঢেউ ভাব আছে। এটা এমন কিছু না।'

অহনা আমাদের খাটে পা ঝুলিয়ে বসলেন। পা দোলাতে দোলাতে বললেন, 'নোমান জিলাপি খাব। তোমার সেই বিখ্যাত জিলাপি নিয়ে এস। ভালো কথা তোমরা কি কোথাও বেরুচ্ছিলে?'

'হুঁ। আরেকদিন যাব অসুবিধা নেই।'

'যাচ্ছিলে কোথায়? বাঁদর দেখতে নিশ্চয়ই। বাঁদর দেখা মোটেই জরুরি নয়। আমি খুব জরুরি কাজ নিয়ে এসেছি। গোরানে একজন পামিস্ট আছে। আমি ঠিকানা নিয়ে এসেছি। তুমি আমাকে তার কাছে নিয়ে যাবে। পারবে না?'

'অবশ্যই পারব।'

অহনা আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, 'আপনার স্বামীকে কিছুক্ষণের জন্যে ধার নিচ্ছি। পামিস্টের কথা শুনলে আমার আবার মাথার ঠিক থাকে না। আমার পামিস্টপ্রীতির কথা নোমান আপনাকে বলে নি?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বলেছে।'

'পামিস্ট নিয়ে আমার অসংখ্য গল্প আছে। কিছু কিছু বোধহয় শুনেছেন। হুগীলাতে পামিস্টের খোঁজে গিয়ে যে পাগলা হাতির খপ্পরে পড়েছিলাম, সেই গল্প শুনেছেন?'

'শুনেছি।'

অহনা পা দুলিয়ে দুলিয়ে অনেকক্ষণ গল্প করলেন। জিলাপি খেলেন, চা খেলেন। মদিনার সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্প করলেন, ময়নাটার সঙ্গেও কিছু কথা বললেন। খাঁচাটাকে দোলা দিয়ে বললেন, 'এই ময়না বল দেখি, অহনা! অহনা! অহনা।'

ময়না সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'অহনা! অহনা! অহনা!'

যাবার সময় তিনি মদিনাকে একটা পাঁচ শ টাকার নোট দিয়ে গেলেন। বলা যেতে পারে মদিনার জগৎটা তিনি ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে গেলেন। মদিনা সারা সন্ধ্যা এই নোট হাতে বারান্দায় স্থানুর মতো বসে রইল।

মদিনা তার পাঁচ শ টাকার নোট নিয়ে চোখ-মুখ শক্ত করে বারান্দায় বসে আছে। আমি চলে এসেছি ছাদে। এই বাড়িটার ছাদটায় ওঠা এক সমস্যা। খানিকটা অংশ দেয়ালের গায়ে আটকানো খাড়া লোহার সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয়। শুরুতে এই ছাদটা আমার পছন্দ হয় নি। এখন পছন্দ। খুব নিরিবিলি। হঠাৎ কেউ ছাদে উঠে আসবে সে সম্ভাবনা নেই। কেউ আসবে না। তাছাড়া বাড়ির চারদিকে পুরোনো পুরোনো গাছ আছে বলেই ছাদটায় এক ধরনের আব্রু আছে।

ইরার গল্পের বইটা এক হাতে নিয়ে বেশ ঝামেলা করে ছাদে উঠলাম। গল্পের বই পড়ার জন্যে ছাদে আমি সুন্দর একটা জায়গা বের করেছি। পশ্চিম দিকে ছাদে পানির ট্যাংকে হেলান দিয়ে বসলেই হয়। খুব সুন্দর জায়গা। মজার ব্যাপার হচ্ছে, বই পড়ার এত সুন্দর জায়গা থাকলেও আমি এখনো পর্যন্ত একটা বইও পড়ে শেষ করতে পারি নি। তিথির নীল তোয়ালে বইটা কয়েক পৃষ্ঠা পড়ার পরই হাই ওঠে। বই বন্ধ করে চুপচাপ বসে থাকি। হাতে একটা বই থাকার সবচে' বড় সুবিধা হচ্ছে, সব সময় মনে হবে আমি অকারণে বসে নেই। আমার একটা কাজ আছে।

আমি পানির ট্যাংকে হেলান দিয়ে বসে আছি। গাছের মাথায় রোদ। এখনো ঘণ্টাখানিক সময় আছে। বইটা খুলতেই ইরার চিঠি বের হয়ে এল। অবস্থা এমন হয়েছে যে সে প্রতিদিনই একটা করে চিঠি দিচ্ছে। এটা সর্বশেষ চিঠি কিনা বুঝতে পারছি না। ইরার চিঠিতে তারিখ থাকে না।

আপা,

তোমার কী হয়েছে বল তো? তোমাকে এত করে আসতে লিখলাম, আসলে না। বড় মামা প্রচণ্ড জ্বর নিয়ে তোমার ওখান থেকে গেলেন। খুব ভুগলেন। প্রায় যমে-মানুষে টানাটানি। তুমি মামাকেও চিঠি দাও নি। আমাকে সেই যে প্রথম একটা চিঠি লিখলে তারপর আর না। বাবাকে দায়সারা গোছের একটা চিঠি দিয়েছ। বড় মামার ধারণা — তুমি সবার উপর রাগ করে আছ, কারণ তোমাকে গরিব ধরনের একটা ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেয়া হয়েছে। আসল কারণটা কী আপা বল তো? আমি ভাইয়াকে বলেছি আমাকে তোমার ওখানে নিয়ে যেতে। আমি নিজের চোখে দেখতে চাই ব্যাপারটা কী। ভাইয়া প্রতিবারই বলে — আচ্ছা। আচ্ছা। ফুটবল খেলতে গিয়ে সে মাথায় চোট পেয়েছে বলেছিলাম না? এখন বিছানায় শুয়ে শুয়ে তার কোমরে কী নাকি হয়েছে। সোজা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়ে দাঁড়াতে পারে না। বাঁকা হয়ে দাঁড়ায়। বাঁকা হয়ে হাঁটে। ঐ দিন বাবা কী কারণে ভাইয়ার উপর রাগ করে বললেন, 'এই যে বক্রবাবু, শুনে যাও।' এতে ভাইয়ার খুব লেগেছে। সে বিছানা-বালিশ নিয়ে চলে গেছে। তার এক বন্ধু আছে— সজল। এখন তাদের বাড়িতে থাকে। মাঝে মাঝে বাঁকা হয়ে আমাদের দেখতে আসে।

আমার বিয়ের ব্যাপারে যে কথাবার্তা হচ্ছিল তা আরো কিছুদূর এগিয়েছে। জামালপুর থেকে বরের বড় বোন আমাকে দেখতে এলেন। ওজন পাঁচ মনের কাছাকাছি। আমাদের খাটে বসলেন। খাটে মট্‌মট্‌ শব্দ হতে লাগল। আমি ভাবছি সর্বনাশ! এখন উনি যদি খাট ভেঙে পড়েন, তাহলে আমাদের খাটও যাবে বিয়েও যাবে।

যাই হোক, খাট ভাঙে নি তবে বিয়ে ভেঙে গেছে। ভদ্রমহিলার আমাকে পছন্দ হয় নি। কাজেই, আপা, তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ বিয়ে ভেঙে যাওয়ায় আমার মন খারাপ। তোমার পায়ে পড়ি, আমার মন ঠিক করার জন্যে হলেও এস।

ইতি
ইরা।

পুনশ্চ আপা, তুমি আসার সময় অবশ্যি লাইব্রেরির বইটা নিয়ে আসবে। অনেক ফাইন হয়ে গেছে।

AMARBOI.COM

ইরার বিয়ে ভেঙে গেছে — এটা বড় ধরনের দুঃসংবাদ। বিয়ে একবার ভাঙতে শুরু করলে শুধু ভাঙতেই থাকে। তখন বিয়ের কোনো সম্বন্ধ এসেছে শুনলেই আতঙ্ক লাগে।

ইরার বিয়ে কি আমার জন্যে ভাঙল? সে যদিও কিছু লিখে নি, তবু আমার তাই ধারণা। তবে আমার বড় মামা যতদিন আছেন ততদিন কোনো চিন্তা নেই। তিনি একের পর এক সম্বন্ধ আনতেই থাকবেন এবং এক শুভলগ্নে দেখা যাবে ইরারও বিয়ে হয়ে গেছে। মামা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলবেন, 'যাক, দায়িত্ব শেষ হয়েছে।'

এই পৃথিবীতে কেউ কেউ প্রচুর দায়িত্ব নিয়ে জন্মায়, আবার কেউ কেউ জন্মায় কোনোরকম দায়-দায়িত্ব ছাড়া। যেমন আমার বাবা। তাঁর জীবনের একমাত্র দায়িত্ব সম্ভবত খবরের কাগজ পড়া। এই দায়িত্বটি তিনি খুব ভালোভাবে পালন করেন। ইলেকশনের সময় এলে হঠাৎ দেখা যায় তিনি স্বতন্ত্র দল থেকে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। বাবার যুবক বয়সের কালো চশমা-পরা একটা ছবির পোস্টারে সারা নেত্রকোনা শহর ঢেকে ফেলা হয়। গুণ্ডাপাণ্ডা ধরনের কিছু ছেলেপুলে এই সময় আমাদের বাড়িতে চা-নাশতা খেতে থাকে এবং হাতখরচ নিতে থাকে। তারা প্রত্যেকেই নাকি বিরাট অর্গানাইজার। এতসব অর্গানাইজার চারপাশে নিয়েও বাবা যথারীতি ফেল করেন। বেশিরভাগ সময়ই তাঁর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়। ইলেকশনের রেজাল্টের পর তিনি দরজা বন্ধ করে ঘণ্টা দুই-তিনেক শুয়ে থেকে গম্ভীর মুখে মাকে ডেকে বলেন, 'বুঝলে মিনু, এই দেশে রাজনীতি করে লাভ নেই, বরং ছাতা সেলাই করাতেও লাভ। রাজনীতি আর করব না। হাত সাবান-পানি দিয়ে ধুয়ে ফেললাম— No more politics. যে দেশের মানুষ সৎ-অসৎ বোঝে না, সেই দেশে কীসের পলিটিকস?'

মা জানতেন, আমরাও জানতাম, এগুলো বাবার কথার কথা। আবার কোনো একটা নির্বাচন চলে আসবে। বাবার চারপাশে কিছু লোকজন জুটে যাবে, যারা খুব সিরিয়াস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভঙ্গিতে বাবাকে বলবে— 'আরে চৌধুরী সাহেব, আপনি না দাঁড়ালে কে দাঁড়াবে! একটা-দুটা সৎ মানুষ তো থাকা দরকার, যাদের পিছনে আমরা থাকব। সৎ মানুষের সঙ্গে হারতেও আনন্দ।'

বাবা বলবেন, 'না না, ইলেকশনের নাম আমি শুনতে চাই না। আমার শিক্ষা হয়ে গেছে। আমি কানে ধরেছি।'

'চৌধুরী সাহেব, আপনার শিক্ষা হলে তো হবে না। দেশবাসীর একটা শিক্ষা হওয়া দরকার। এইবার আমরা জিতে এই শিক্ষাটা দেব।'

'না না, টাকাপয়সাও নেই।'

'টাকাপয়সা নিয়ে মোটেও চিন্তা করবেন না। দশের লাঠি একের বোঝা। এইবার আমরা পকেট থেকে খরচ করে ইলেকশন করব। আপনাকে ঘর থেকে বের হতেও হবে না। আপনি দরজা বন্ধ করে নাকে তেল দিয়ে ঘুমান। দেখেন আমরা কী করি।'

বাবা তখন খানিকটা নরম হয়ে জিজ্ঞেস করেন – 'দাঁড়াচ্ছে কে কে কিছু খবর পেয়েছ?'

'যারা দাঁড়াচ্ছে তারা কেউ আপনার নখের কাছাকাছিও না। আপনার সামনে চেয়ারে বসার যোগ্যতাও তাদের নেই। তারা একটা জিনিসই পারে – রিলিফের গম বেচে দেয়া। একজনের তো নামই পড়ে গেল আবদুল মজিদ গমচোরা।'

'মজিদ ইলেকশন করছে? চক্ষুলজ্জাও দেখি নাই।'

'তবে আমরা আপনাকে বলছি কী?'

বাবা নড়েচড়ে বসেন। গলা উঁচিয়ে আমাকে ডাকেন, 'নবু কইরে, তোর মাকে বল চা বানাতে।'

আমরা বুঝে ফেলি – আবারও বাবা কিছু ধানী জমি বিক্রি করবেন।

আমার দাদাজান মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অমানুষিক পরিশ্রম করে যে সম্মানজনক বিষয়-সম্পত্তি করে গিয়েছিলেন আমার বাবা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তার সর্বনাশ করে যাচ্ছিলেন। সবই শেষ করে দিতেন, বড় মামার জন্যে পারলেন না। নেত্রকোনায় আমাদের একটা বড় ফার্মেসি, একটা রাইস কল এবং দুটা বাড়ি বাবা অনেক চেষ্টা করেও বিক্রি করতে পারলেন না। পারলেন না মূলত বড় মামার জন্যে। মামা এইসব যক্ষের ধনের মতো আগলে রাখতেন। বাবা ভীরু ধরনের মানুষ ছিলেন। বড় মামাকে যমের মতো ভয় পেতেন। তাঁকে অগ্রাহ্য করার মতো সাহস তিনি কোনোদিনই সঞ্চয় করে উঠতে পারেন নি।

আমার এই সরল ধরনের রাজনীতিপাগল বাবার কাছে এক সকাল বেলা আমার স্যার উপস্থিত হলেন। বাবা তখন বারান্দায় চায়ের কাপ এবং আগের দিনের বাসি কাগজ নিয়ে বসেছেন। স্যার বাবার সামনে বসলেন এবং অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বললেন, 'আপনার কাছে আমার একটা প্রস্তাব আছে।'

বাবা খুব উৎসাহের সঙ্গে বললেন, 'বল। বল।'

'আমি আপনার বড় কন্যাকে বিবাহ করতে চাই।'

বাবার মুখ হাঁ হয়ে গেল। তাঁর কোল থেকে খবরের কাগজ মাটিতে পড়ে গেল। এই সম্ভাবনা হয়তো তাঁর কল্পনাতেও ছিল না। বাবা বললেন, 'কী বললে?'

'আমি ওকে অত্যন্ত পছন্দ করি। সেও করে . . .।'

'কী বললে তুমি? নবনী পছন্দ করে। নবনী নবনী . . .'

বাবা চটি ফটফট করে আমার খোঁজে এলেন। আমি তখন পড়তে বসেছি। বাবা রাগে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাঁপতে কাঁপতে বললেন, 'মৌলানা এসব কী বলছে?'

আমি শংকিত গলায় বললাম, 'কী বলছেন?'

'তোকে বিয়ে করার কথা বলছে কেন?'

'আমি তো জানি না বাবা কেন?'

'এই হারমজাদার কথায় তো আমার মাথায় রক্ত উঠে গেছে। বলে কি নবনী আমাকে পছন্দ করে। ব্যাটা তুই কোথাকার রসগোল্লা যে আমার মেয়ে তোকে পছন্দ করবে? তুই নিজেকে ভাবিস কী ? চাল নাই চুলা নাই। মানুষ হয়েছিস এতিমখানায়, তুই কোন সাহসে এত বড় কথা বললি?'

বাবার চিৎকারে মা ছুটে এলেন, ইরা ছুটে এল। আমাদের কাজের মেয়ে বিন্তি এল। মা সব শুনে ভীত গলায় বললেন – 'ও এই সব কেন বলছে রে নবনী?'

আমি বিড়বিড় করে বললাম, 'আমি জানি না মা।'

ইরা বলল, 'আপা যে উনার কাছে রোজ দুবেলা করে খাবার নিয়ে যায়, এই জন্যেই বোধহয় তাঁর ধারণা হয়েছে, আপা তার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে।'

বাবা বললেন, 'হাবুডুবু খাওয়া আমি বের করছি। কত বড় সাহস। কানে ধরে আমি তাকে চর্কি ঘুরান ঘুরাব।'

আমি ভীত গলায় বললাম, 'এইসব করার কোনো দরকার নেই বাবা – তুমি উনাকে বড় মামার কথা বল। বলে দাও বিয়ে টিয়ের ব্যাপার সব বড় মামা জানেন।'

মা বললেন, 'এইটাই ভালো। লোক জানাজানি করার কোনো দরকার নেই। আজেবাজে কথা ছড়াবে।'

বাবা হুংকার দিলেন, 'ছড়াক কথা। আমি কি কাউকে ভয় পাই?'

নির্বোধ মানুষরা কাউকে ভয় পায় না। যা মনে আসে করে ফেলে। বাবাও তাই করলেন। স্যারের জিনিসপত্র নিজেই ছুড়ে ছুড়ে রাস্তায় ফেলতে লাগলেন। চারদিকে লোক জমে গেল। স্যার বললেন, 'আপনি অকারণে বেশি রকম উত্তেজিত হয়েছেন।' আপনি শান্ত হয়ে আমার দুটা কথা শুনুন।'

বাবা হুংকার দিলেন, 'চুপ, যথেষ্ট হয়েছে।'

স্যার বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন।

ঘটনা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। এমন মুখরোচক ঘটনা মফস্বল শহরে সচরাচর ঘটে না। লোকজনদের উৎসাহের সীমা রইল না। সন্ধ্যাবেলায় চলে এল বাবার অতি পেয়ারের লোকরা। তারা গম্ভীর মুখে বলল, 'এইসব কী শুনছি চৌধুরী সাহেব?'

বাবা ফ্যাকাসে হাসি হেসে বললেন, 'কিছু না। কিছু না।'

'শুনলাম আপনার মেয়ের গায়ে হাত দিয়েছে। অশ্লীল প্রস্তাব দিয়েছে।'

'না না এসব কিছু না। অন্য ব্যাপার।'

'জারজ সন্তানের কাছ থেকে এরচে' বেশি কী আশা করা যায়? এখন বলুন কী করব?'

'কিছু করার দরকার নেই। বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছি। আর কি?'

'আপনি ক্ষমা করলে তো হবে না। আমাদের একটা দায়িত্ব-কর্তব্য আছে না?'

'বাদ দেন। ঘটনা যা ভাবছেন তা না। বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল। ভদ্রভাবেই দিয়েছিল।'

'শাক দিয়ে মাছ ঢাকার কোনো দরকার নাই চৌধুরী সাহেব। ঘটনা সবই জানি। আপনি কাটান দেয়ার চেষ্টা করলেও লাভ হবে না। উচিত শিক্ষা দেয়া হবে।'

লোকজন বাড়তেই লাগল। সবাই আমার সঙ্গে কথা বলতে চায়। মা আমাকে নিয়ে ঘরে তালাবন্ধ করে রাখলেন। অন্তুকে পাঠানো হল পোস্টঅফিস থেকে বড় মামাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টেলিফোন করার জন্যে। তিনি যেন এক্ষুনি চলে আসনে।

রাত দুটার দিকে হাজার হাজার মানুষ গিয়ে স্যারকে ধরে নিয়ে এল। আমি কাঁদছি এবং সমুদ্রের গর্জনের মতো মানুষের গর্জন শুনছি। কী হচ্ছে বাইরে? সব কোলাহল ছাপিয়ে স্যারের গলা শুনলাম – আতংকে অস্থির হয়ে তিনি চিৎকার করে ডাকছেন – 'নবনী! নবনী।'

তাঁকে তখন রাস্তায় ছুড়ে ফেলা হয়েছে। একদল মানুষ চেষ্টা করছে ইট দিয়ে মাথাটা ফাটিয়ে দিতে। মা ছুটে গেলেন স্যারকে বাঁচানোর জন্যে। ইরাও ছুটে গেল।

স্যারের মৃত্যু হয় সীমাহীন অপমান ও সীমাহীন যন্ত্রণায়। প্রথমে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় নেত্রকোনা হাসপাতালে। সেখানের ডাক্তাররা জবাব দেবার পর তাঁকে পুলিশ প্রহরায় নিয়ে যাওয়া হয় ময়মনসিংহে। পথেই তাঁর মৃত্যু হয়।

মজার ব্যাপার হচ্ছে স্যারকে যে ট্রেনে ময়মনসিংহ নেয়া হচ্ছিল আমিও সেই ট্রেনেই বড় মামার সঙ্গে ময়মনসিংহ যাচ্ছি। অথচ আমি কিছুই জানতাম না। আমাকে বলা হয়েছে স্যার নেত্রকোনা হাসপাতালে আছেন। মাথায় চোট পেয়েছেন, তবে এখন ভালো হওয়ার পথে। ভয়ের কিছু নেই।

সে বছর আমার পরীক্ষা দেয়া হয় নি, কারণ আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি। সে অসুখ বিচিত্র এবং ভয়াবহ। আমি মাঝে মাঝেই কাউকে চিনতে পারতাম না। পরিচিত কারো সঙ্গে হয়তো কথা বলছি, হঠাৎ এক সময় অস্বস্তি এবং বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করি, যার সঙ্গে কথা বলছি তাকে চিনতে পারছি না। ভয়ে শরীর যেন কেমন করতে থাকে। আমি কথা বলা বন্ধ করে দেই, আর তখনি দেখি দু–তিনটা কাক অপরিচিত মানুষটার চারদিকে গম্ভীর ভঙ্গিতে হাঁটছে। এদের মধ্যে একটা কাককে আমি চিনি – বুড়ো কাক। কাকগুলো হাটে অবিকল মানুষের মতো। যেন এরা কাক না। ছোট ছোট মানুষ যারা কালো রঙের চাদর গায়ে দিয়েছে। মাঝে মাঝে আমি স্যারকেও দেখতাম — । তাঁকে দেখে মোটেও ভয় লাগত না। বরং ভরসা পাওয়া যেত। তিনি আমার সঙ্গে কথা বলতেন এমনভাবে যেন তাঁর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে। আমরা স্বামী–স্ত্রী। তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা হত খুব ঘরোয়া ধরনের। যেমন, তিনি এসে বললেন, 'নবনী, পেন্সিলটা কোথায় রাখলাম দেখেছ?'

আমি বললাম, 'না তো। কলম আছে। কলমে হবে?'

'না, হবে না। আমার দরকার পেন্সিল। একটু আগে কাজ করছিলাম। হঠাৎ কোথায় গেল! বাবু নিয়ে যায় নি তো?'

'নিতে পারে।'

'ছেলে তো বড় দুষ্টু হয়েছে। ডাক তো দেখি। আজ একটা ধমক দেব।'

'না না, ধমকাতে পারবে না। ছেলেমানুষ।'

'অতিরিক্ত আদর দিয়ে তুমি ওকে নষ্ট করছ।'

'নষ্ট করছি ভালো করছি। আরো নষ্ট করব।'

'এ কী! রেগে গেলে কেন?'

'রেগেছি ভালো করেছি। আরো রাগব

আমাদের সঙ্গে সব সময় একটা শিশু থাকত। কখনো সে ছেলে, তার নাম বাবু; কখনো–বা মেয়ে, নাম টিনটিন। এদের অবশ্যি আমি কখনো দেখি নি।

আমি কতদিন অসুখে ভুগেছি আমি নিজেও জানি না। কেউ আমাকে কখনো পরিষ্কার করে কিছু বলে নি। আমি শুধু অস্পষ্টভাবে জানি, আমার এই অসুখ দীর্ঘদিন ছিল। বড়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মামা আমাকে চিকিৎসা করান। আমার পেছনে টাকা খরচ হয় জলের মতো। তিনি তাঁর চাকরি-টাকরি বাদ দিয়ে আমাকে নিয়ে ঢাকায় বাসা ভাড়া করে থাকতেন। কেউ যেন অসুস্থ অবস্থায় আমাকে বিরক্ত করতে না পারে, সে জন্যে ঐ বাসার ঠিকানাও তিনি কাউকে দেন নি। বাবা-মা, ইরা, অন্তু কেউই আমাকে দেখতে যেতে পারত না। এক সময় আমি সুস্থ হয়ে উঠি। বড় মামা আমাকে ফিরিয়ে দেন বাবা-মার কাছে।

বড় মামা সব সময়ই কম কথার মানুষ। আমাকে সুস্থ করে বাবা-মার কাছে রেখে যাবার সময় হঠাৎ তাঁর কী হল, তিনি বললেন, 'বড় খুকি, আয় তোকে আদর করে যাই।' আমি এগিয়ে গেলাম। বড় মামা গম্ভীর গলায় বললেন, 'শোন্ বড় খুকি, তুই নিশ্চিন্ত মনে থাকবি। তোর অসুখটা পুরোপুরি সেরে গেছে। আর কোনোদিন হবে না। ডাক্তাররা আমাকে বলেছেন। তারচেয়েও বড় কথা, আমি খাস দিলে আল্লাহ্পাকের কাছে দোয়া করেছি। আমার দোয়া আল্লাহ্পাক কবুল করেছেন। বুঝলি বড় খুকি, আমি যতদিন বেঁচে থাকব, ততদিন মাগরেবের ওয়াক্তে শুধুই তোর জন্যে দু'রাকাত নফল নামায পড়ব। আচ্ছা এখন যা।'

আমি বললাম, 'আদর করবার জন্যে ডাকলেন— কই আদর তো করছেন না।'

বড় মামা হাত বাড়িয়ে আমাকে কাছে টেনে নিলেন না বা মাথায়ও হাত রাখলেন না। তিনি যেভাবে বসে ছিলেন সে ভাবেই বসে রইলেন। শুধু দেখা গেল, তাঁর চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি পড়ছে। তিনি পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখ মুছে বললেন, 'ট্রেনের সময় হয়ে গেল, চলি রে।'

৮

প্রায় ন মাস পর বাড়িতে গিয়েছি।

নিখুঁত হিসাব হল আট মাস সতের দিন। নোমান আমার সঙ্গে আসতে পারে নি। তার ছবির কাজ পুরোদমে চলছে। তাদের নাকি দু মাসের মধ্যে ছবি শেষ করতে হবে। চল্লিশ মিনিটের ছবি। তারা চেকোস্লোভাকিয়ায় শর্টফিল্ম ফেস্টিভ্যালে ছবি পাঠাবে। সময় পেলে ইংরেজিতে ডাব করবে। সময় না পেলে সাব টাইটেল করা হবে।

নোমানের উৎসাহ এবং ব্যস্ততা দেখার মতো। মনে হচ্ছে সে-ই ছবির পরিচালক, সে-ই নায়ক এবং সে-ই ক্যামেরাম্যান। যদিও আমার ধারণা তার মূল কাজ ছোটাছুটি করা এবং অন্যদের ধমক খাওয়া। কিছু কিছু মানুষ আছে যাদের দেখলেই মনে হয় এদের ধমক দিলে এরা রাগ করবে না। এদের ধমক দেয়া যায়। শুধু ধমক না, অতি তুচ্ছ কাজও এদের দিয়ে করিয়ে নেয়া যায়। নোমান সেই জাতীয় একজন মানুষ।

আমাদের সঙ্গে মদিনাও দেশের বাড়িতে যাচ্ছে। তার গায়ে নতুন জামা। পায়ে নতুন রবারের জুতা। তার আনন্দ চোখে দেখার মতো। মনে হচ্ছে এই মেয়েটির জীবনে এমন আনন্দময় মুহূর্ত আর আসে নি।

আমাদের নিয়ে যাচ্ছে অন্তু। নোমান স্টেশনে তুলে দিতে এসেছে। ট্রেন আজ এক ঘণ্টা লেট। আমরা অনেক আগেভাগে এসে পড়েছি। নোমানের মুখ শুকনো। বুঝতে পারছি তার মন খারাপ লাগছে। সে এই মন খারাপ ভাবটা লুকোতে পারছে না। সে অন্তুকে বলল, 'তোমাদের টিকিট দুটা দাও তো অন্তু।'

অন্তু বলল, 'টিকিট দিয়ে কী করবেন?'

'আহা দাও না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্তু টিকিট দিল। সে টিকিট নিয়ে হনহন করে চলে গেল। অন্তু বলল, 'আপা দুলাভাই টিকিট দিয়ে কী করবে?'

আমি বললাম, 'জানি না।'

'দুলাভাই সঙ্গে গেলে খুব ভালো হত। সবাই আশা করে আছে, তোমরা দুজন একসঙ্গে যাবে।'

'ছবি নিয়ে ব্যস্ত। ছবি না থাকলে যেত।'

'কী ছবি?'

'ওর বন্ধু একটা শর্টফিল্ম বানাচ্ছে।'

'তা তো জানি। গল্পটা কী?'

'নির্দিষ্ট কোনো গল্প নেই। গ্রামের একটা মেয়ে পুকুরে গোসল করতে করতে একসময় ঠিক করল সে তার স্বামীকে খুন করবে। ঠিক করার পর থেকে খুন করার আগ পর্যন্ত মেয়েটার মনের অবস্থা।'

'স্বামীকে খুন করবে কেন?'

'সেটা কখনো বলা হয় না। ছবির জন্যে এটা নাকি অপ্রয়োজনীয়।'

'অভিনয় কারা করছে?'

'একজনই অভিনেত্রী। সফিক সাহেবের স্ত্রী অভিনয় করছেন। তাঁর নাম অহনা।'

'ছবিটা কি ভালো হচ্ছে?'

'নোমানের ধারণা অসাধারণ হচ্ছে। এই ছবি দেখলে নাকি মৃণাল সেনের ব্রেইন ডিফেক্ট হয়ে যাবে। সত্যজিৎ রায়ের মাইন্ড স্ট্রোক হবে।'

নোমান আসছে। তার হাতে একগাদা ম্যাগাজিন। দু প্যাকেট বিসকিট। পানির বোতল। অন্তু বলল, 'টিকিটগুলা কী করলেন দুলাভাই?'

'চেঞ্জ করে নিয়ে এসেছি। ফার্স্টক্লাস করে আনলাম। আরাম করে যাও। তোমরা চা খাবে নাকি?'

অন্তু বলল, 'না।'

'ট্রেন ছাড়তে তো এখনো দেরি আছে, চল না খাই। এখানে ভালো রেস্টুরেন্ট আছে।'

অন্তুর যাবার তেমন ইচ্ছা নেই। আমি বললাম, 'অন্তু তুই জিনিসপত্র নিয়ে এখানে বসে থাক। আমি চা খেয়ে আসি, আমার চা খেতে ইচ্ছা করছে।'

আমরা চা খেলাম। ও একটা সিগারেট ধরিয়ে শুকনো মুখে টানতে লাগল। আমি বললাম, 'তুমি কি ছবি বানানোর এক ফাঁকে চলে আসতে পারবে?'

'মনে হয় না। আমি চলে এলে কাজকর্মের খুব ক্ষতি হবে।'

'ক্ষতি হলে থাক।'

'এদিকে অহনাকে আবার সামলে সুমলে রাখতে হয়। ওর মেজাজের তো কোনো ঠিক নেই।'

'তুমি ছাড়া আর কেউ ওকে সামলাতে পারে না?'

'তা না। ও আমার কথা শোনে। অনেকদিন থেকে দেখছি তো।'

'ও আচ্ছা।'

'তারপর ধর হঠাৎ তার মাথায় এসে গেল কোনো একজন পামিস্টের কাছে যাবে তখন তাকে সেখানে নেয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই। কে নিয়ে যাবে?'

'সেটা বিরাট সমস্যা তো বটেই। তাহলে তুমি একটা কাজ কর তাঁকে বল নেত্রকোনায় বড় একজন পামিস্ট আছে তাহলে দেখবে সব ছেড়েছুড়ে তোমাকে নিয়ে নেত্রকোনায় চলে আসবে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে কিছু বলল না। চুপ করে রইল। আমি বললাম, 'ট্রেন ছাড়তে কত দেরি?'

'এখনো কুড়ি মিনিট। আরেক কাপ চা খাবে?'

আমি বললাম, 'খাব। আর দেখ তো আমার জ্বর কিনা কেমন জানি জ্বর জ্বর লাগছে।' সে আমার কপালে হাত রেখে বলল, 'জ্বর না তো!'

আমি হেসে ফেললাম। সেও হাসল। জ্বর দেখার আমাদের এই পুরোনো এবং একান্ত গোপন কৌশল ব্যবহার করতে এত ভালো লাগে। রেস্টুরেন্ট ভর্তি মানুষ— এরা কেউ কিচ্ছু ভাববে না। সবাই জানবে একজন অসুস্থ মানুষের জ্বর পরীক্ষা করা হচ্ছে।

ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। ও প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে। ওর দিকে তাকাতে আমার খুব কষ্ট লাগছে। আমি ব্যস্ত হয়ে ম্যাগাজিনের ছবি দেখছি। শুধু অন্তু গলা বের করে খুব হাত দোলাচ্ছে। হঠাৎ অন্তু বিস্মিত গলায় বলল, 'আপা দেখ দেখ দুলাভাই কাঁদছে।' আমি অবাক হয়ে দেখলাম ও সত্যি সত্যি পাঞ্জাবির হাতায় চোখ মুছছে। আমাকে দেখে সে চলন্ত ট্রেনের সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে শুরু করল। আমি অন্তুকে বললাম, 'তোর দুলাভাইকে এইভাবে হাঁটতে নিষেধ কর— পরে হুমড়ি খেয়ে ট্রেনের চাকার নিচে পড়বে।'

বলতে বলতে আমার গলা ধরে গেল। চোখ ভিজে উঠল। ট্রেনের গতি বাড়ছে— আমার মনে হচ্ছে আমি এই পৃথিবীর সব প্রিয়জন ছেড়ে অনেক দূরে চলে যাচ্ছি। ট্রেনের চাকায় ঘড়ঘড় শব্দ হচ্ছে। ট্রেনটা যেন তালে তালে বলছে— ভালবাসি। ভালবাসি।

আমাকে দেখে বাড়িতে একটা হৈচৈ পড়ে গেল। মা আমাকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে কাঁদতে লাগলেন। বাবা ভুরু কুঁচকে বললেন, 'মরাকান্না জুড়ে দিলে কেন? বড়ই যন্ত্রণা হল তো। ইরা তোর মাকে নিয়ে যা তো।' মা আমাকে আরো শক্ত করে জড়িয়ে ধরল।

কেউ আমাকে ছাড়ছে না। সবারই মনে অসংখ্য কথা জমা হয়ে আছে। সবাই আমাকে একসঙ্গে সব কথা শোনাতে চায়।

ইরা চাচ্ছে আমাকে নিয়ে ছাদে চলে যেতে। তার নাকি অসম্ভব জরুরি কিছু কথা এক্ষুনি না বললেই না। তার জরুরি কথার আভাস পেয়েছি। মা কাঁদতে কাঁদতেই এক ফাঁকে আমাকে বলে ফেলেছেন। ইরার ভাঙা বিয়ে আবার জোড়া লেগেছে। ইরার ভাবী বর নাকি বলেছে, এই মেয়ে ছাড়া আর কাউকে সে বিয়ে করবে না। প্রয়োজন হলে সবার অমতে সে কোর্টে বিয়ে করবে।

এদিকে বাবারও অনেক কথা বলার আছে— তিনি আবার ইলেকশন করবেন বলে স্থির করেছেন। তবে এবার স্বতন্ত্র না। আওয়ামী লীগের টিকিটে। নমিনেশন পাওয়া যাবে এই বিষয়ে তিনি নিশ্চিত।

'বুঝলি নবনী ময়মনসিংহের যে কুদ্দুস সাহেব আছেন, এডভোকেট। উনি হলেন বঙ্গবন্ধুর ফ্যামিলি ফ্রেন্ড। শেখ হাসিনা তাঁকে দেখলে ছুটে এসে কদমবুসি করেন। কুদ্দুস সাহেবই বললেন, নমিনেশনের ব্যাপারটা আমার উপর ছেড়ে দিন, এটা নিয়ে চিন্তা করবেন না। এটা কোনো ব্যাপারই না।'

আমি বললাম, 'আওয়ামী লীগের টিকিট পেলে তো মনে হয় জিতে যাবে।'

'জেতাটা বড় কথা না। ইলেকশনে জেতা আমার উদ্দেশ্য না। আমার উদ্দেশ্য এই দেশের জন্যে কিছু করা। বড়ই অভাগা দেশ।'

'তুমি এবার তাহলে খুব জোরেশোরে ইলেকশন করছ?'

'মানুষের চাপে পড়ে করতে হচ্ছে। সবাই তো চায় সৎ লোক পাস করে আসুক। চাওয়াটা তো অন্যায় না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তা তো বটেই।'

'এদিকে তোর বড় মামা চিঠি লিখেছে আমি যেন ইলেকশন-ফিলেকশন নিয়ে মাথা না ঘামাই। কঠিন ভাষায় লেখা চিঠি। আশ্চর্য কথা, আমি কী করব না করব, এটা বাইরের একজন এসে বলে দেবে কেন?'

'বড় মামা তো বাইরের কেউ না বাবা।'

'অবশ্যই বাইরের। আর বাইরের না হলেও আমার স্বাধীন চিন্তায় তিনি হস্তক্ষেপ করতে পারেন না। ফার্মেসি থেকে এক পয়সা আয় হয় না— বিক্রি করে দিতে চাচ্ছি, বিক্রি করতে দেবে না। এই সম্পত্তিগুলো আমার না তাঁর তাই তো বুঝলাম না।'

সবচে' ভালো লাগছে ইরাকে দেখতে। সে খুব সুন্দর হয়েছে। মনে হচ্ছে এই আট মাসে সে খানিকটা লম্বাও হয়েছে। ইরা ক্রমাগত কথা বলে যাচ্ছে। গা ধুতে বাথরুমে গিয়েছি, সে তোয়ালে হাতে বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। এত কথাও থাকে একটা মানুষের পেটে? তার সব কথাই তার বিয়ে নিয়ে। সব নদী যেমন সমুদ্রে পড়ে, তার সব কথাই তেমনি বিয়েতে গিয়ে শেষ হয়।

'বুঝলে আপা, একদিন সন্ধ্যাবেলা ছাদে হাঁটছি— নতুন কাজের মেয়েটা এসে বলল, "একটা লোক আসছে, আপনারে ডাকে।" আমি তো অবাক! এই সন্ধ্যাবেলা আমাকে কে ডাকবে। নিচে নেমে আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। ও বসে আছে।'

'ও-টা কে?'

'ও-টা কে তুমি তো বুঝতেই পারছ। আমি স্তম্ভিত। বিয়ে তো ভেঙেই গেছে। এখন আমার সঙ্গে কী কথা? রাগ লাগছে। এদিকে দেখি বাবু আবার খুব সেজেগুজে এসেছেন। গায়ে সেন্ট দিয়েছেন। সেন্টের গন্ধে চারদিক ভুর ভুর করছে। আমি ভান করলাম যেন চিনতে পারছি না। বললাম, আপনি কাকে চাচ্ছেন? হি-হি-হি ...।'

স্যার যে ঘরে থাকতেন সেখানে দেখি নতুন একজন কে। অল্প বয়সী একটা ছেলে। ব্যাংকে চাকরি করে। একদিন তাঁকে দেখতে গেলাম। আপা বসুন, আপা বসুন বলে সে খুব খাতির যত্ন করল। আমি বললাম, 'আপনার কছে কি একটা বুড়ো কাক আসে?'

সে বিস্মিত হয়ে বলল, 'কাক আসবে কেন?'

আমি বললাম, 'এমনি বলেছি। ঠাট্টা করছি।'

রাতে ঘুমের সময় খুব অসুবিধা হতে লাগল। মা আমার সঙ্গে ঘুমাতে চান। ইরা কিছুতেই দেবে না। সে আমার সঙ্গে শোবে। অনেক রাত পর্যন্ত গল্প করবে। আমাকে চোখের পাতা এক করতে দেবে না।

মা একদিন সুযোগ পেলেন। গভীর রাতে আমার চুলে বিলি কাটতে কাটতে বললেন, 'কোনো খবর আছে রে মা?'

'কী খবর জানতে চাও মা ?'

'নতুন কোনো খবর। খোকা খুকুর খবর।'

'চুপ কর তো মা।'

'বল না রে মা। আছে কোনো খবর?'

'তুমি তো বড্ড বিরক্ত করছ মা। সেদিন মাত্র বিয়ে হল, এখনই কীসের খবর?'

'আমি যে স্বপ্নে দেখলাম।'

'রাখ তো তোমার স্বপ্ন। ঘুমাও।'

মা ক্লান্ত গলায় বললেন, 'তোর একটা খোকা খুকু হলে বেশ হয়। বাচ্চা না হওয়া পর্যন্ত বিয়েকে বিয়ে বলে মনে হয় না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'মা চুপ করবে?'

'নবনী তোর অসুখটা তো আর হয় না?'

'না।'

'আর হবে না। আচ্ছা শোন, জামাই কি তোর স্যারের ব্যাপারে কোনোদিন কিছু জানতে চেয়েছে?'

'না।'

'এতদিন যখন চায় নি আর চাইবে না।'

'মা ঘুমাও।'

মা ঘুমালেন না। অনেক রাত পর্যন্ত আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন।

সাত দিনের জন্যে বাড়ি গিয়েছিলাম। সাত দিনের জায়গায় দশ দিন কাটিয়ে ফিরছি। রওনা হবার সময় মার কাছে একটা চিঠি লিখে গেছি। শর্ত হচ্ছে এই চিঠি মা ট্রেন ছাড়ার আগে পড়তে পারবে না।

চিঠিতে লিখেছি—

মা, তুমি খবর জানতে চেয়েছিলে। হ্যাঁ খবর আছে। তুমি ঠিকই স্বপ্নে দেখেছ। মুখে বলতে লজ্জা লাগল। তোমার পায়ে পড়ি মা— আর কাউকে জানিও না।

৯

মানুষের চরিত্রের একটা অংশ উদ্ভিদের মতো।

উদ্ভিদ যেমন মাটিতে শিকড় ছেড়ে দেয়, মানুষও তাই করে। কিছুদিন কোথাও থাকা মানে সেখানে শিকড় বসিয়ে দেয়া। মাটি যদি চেনা হয় আর নরম হয় তাহলে তো কথাই নেই।

দশ দিন মার কাছে ছিলাম। এই দশ দিনে শিকড় গজিয়ে গেল। সেখান থেকে উঠে আসা মানে শিকড় ছিঁড়ে উঠে আসা। কী তীব্র কষ্ট! পুরুষরা এই কষ্টের স্বরূপ জানে না। এই কষ্ট আরো অনেক কষ্টের মতো একান্তই মেয়েদের কষ্ট।

আমি এসেছি একা। অন্তুর আমাকে নিয়ে আসার কথা ছিল। সে হঠাৎ জ্বরে পড়ায় তাকে রেখে এসেছি। বাবা তাঁর একজন চেনা লোককে বলে দিয়েছিলেন। তিনিও ঢাকায় আসছেন। তাঁর উপর দায়িত্ব আমার দিকে লক্ষ রাখা। ভদ্রলোক শুধু যে লক্ষ রাখলেন তাই না একেবারে আমাদের বাসার দরজায় নামিয়ে দিলেন। আমি বললাম, 'চাচা আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। এখন আপনি চলে যান।'

উনি বললেন, 'মা তুমি দরজা খুলে ভেতরে ঢোক তারপর যাব।' কড়া নাড়তেই নোমান এসে দরজা খুলে দিল। সে অপ্রসন্ন মুখে ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে রইল।

আমি ভদ্রতা করে বললাম, 'আপনি কি ভেতরে এসে বসবেন? চা খেয়ে যাবেন?'

তিনি বললেন, 'না। আমি পরশুদিন নেত্রকোনা চলে যাব। তোমার বাবাকে বলব তুমি ঠিকমতো পৌঁছেছ।'

'জ্বি আচ্ছা।'

নোমান আমার সুটকেস, ব্যাগ ভেতরে এনে রাখছে। তার মুখ এমন অন্ধকার হয়ে আছে কেন কিছু বুঝতে পারছি না। আমি বললাম, 'তুমি ভালো ছিলে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে বলল, 'হ্যাঁ।'

'সাত দিনের জায়গায় দশ দিন থেকে এলাম। রাগ কর নি তো? তারা কিছুতেই ছাড়বে না। অতিথপুর থেকে আমার ছোট খালা এসেছিলেন, উনি আবার এক দিনের জন্যে অতিথপুর নিয়ে গেলেন।'

'মদিনা। মদিনাকে আনলে না?'

'ও আসল না। ওর নাকি এখানে থাকতে ভালো লাগে না।'

'ভালো লাগালাগির কী আছে? থাকবে, বেতন পাবে।'

'তুমি এমন রেগে আছ কেন?'

'রেগে আছি কোথায়?'

'চোখ-মুখ শক্ত করে আছ। জ্বরটর না তো— দেখি কাছে আস তো?'

ও কাছে এল না। ভুরু কুঁচকে তাঁকিয়ে রইল। আমি বললাম, 'চা খেতে ইচ্ছা হচ্ছে। চুলার কাছে যেতে ভালো লাগছে না। ফ্লাস্কে করে একটু চা এনে দেবে?'

সে কিছু না বলে ফ্লাস্ক হাতে বের হয়ে গেল। আমার কাছে সব কেমন যেন অন্য রকম মনে হতে লাগল। ঘরের সাজ-সজ্জাও পাল্টানো। খাটটা জানালার কাছ থেকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। জানালার কাছে এখন দুটা বেতের চেয়ার।

ড্রেসিং টেবিলটার জন্যে ঢাকনি বানানো হয়েছে। কোনো জানালার আগে পর্দা ছিল না। পর্দার প্রয়োজনও ছিল না। বাইরে থেকে কিছু দেখা যেত না। এখন দেখি সবকটা জানালায় বেগুনি রঙের পর্দা। এমন কি বাথরুমের জানালায় পর্দা ঝুলছে।

সবচে' যেটা আশ্চর্যের ব্যাপার, মাথার উপর ফ্যান ঘুরছে। ও ফ্যান কিনেছে। শুধু ফ্যান না ওয়ার ড্রোবের উপর একটা ক্যাসেট প্লেয়ার।

নোমান চা নিয়ে ফিরে এল। চায়ের সঙ্গে গরম জিলাপি। আমি দেখলাম তার মুখের কঠিন ভাবটা আর নেই। সে চায়ের কাপে চা ঢালতে ঢালতে বলল, 'আগে চা খাও। চা খেয়ে তারপর জিলাপি খাও। আগে জিলাপি খেলে চায়ের স্বাদ পাবে না। তোমার স্বাস্থ্য ভালো হয়েছে নবনী। বাপের বাড়িতে খুব আরামে ছিলে, তাই না?'

'হুঁ। তুমি কি কষ্টে ছিলে?'

'কষ্ট মানে— দোজখের ভেতর ছিলাম। সফিক আর অহনার মধ্যে এমন ঝামেলা বেধে গেল। শ্যুটিং ফুটিং কিছুই হয় নাই।'

'তুমি মিটমাটের চেষ্টা চালাচ্ছ না?'

'চালাচ্ছি। কাজ হবে কিনা বুঝতে পারছি না। সফিক এখন আমাকেও ঠিক বিশ্বাস করে না। অবশ্যি বিশ্বাস না করার কারণ আছে। অহনা করল কী সফিকের সঙ্গে ঝগড়া করে রাতদুপুরে আমার এখানে এসে উপস্থিত। আমার বাসায় নাকি লুকিয়ে থাকবে। লুকিয়ে থাকার জন্যে এইটাই নাকি আদর্শ জায়গা। সফিক সব জায়গায় খুঁজবে এইখানে খুঁজবে না।'

'তুমি রাজি হলে?'

'রাজি না হয়ে উপায় আছে? অহনাকে তুমি এখনো চিনলে না।'

'কদিন ছিল?'

'দু রাত ছিল। দু রাতের জন্যে পর্দা দিতে হয়েছে। ফ্যান লাগাতে হয়েছে। রাতে গান না শুনলে তার ঘুম আসে না। শেষে একটা ক্যাসেট প্লেয়ার কিনে আনতে হল। অহনা টাকা দিল। এতটুকু একটা জিনিস দাম নিয়েছে ন হাজার টাকা।'

'গান শুনবে নবনী?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'শুনব।'

নোমান খুশি মনে ক্যাসেট চালু করে দিল। নিচু গলায় গান হতে লাগল —

আমি কেবলই স্বপন
করেছি বপন বাতাসে
তাই আকাশ কুসুম
করিনু চয়ন হতাশে ॥

'নবনী!'

'কি?'

'অহনার সঙ্গে থেকে থেকে আমারও বিশ্রী অভ্যাস হয়ে গেছে। রাতে গান না শুনলে ঘুম আসে না। এইসব বড়লোকি অভ্যাস কি আর আমাদের মতো গরিবের পোষায়?'

'অহনা যে তোমার এখানে ছিলেন, সফিক সাহেব টের পান নি?'

'পাগল, কোথেকে টের পাবে? সফিক চলে পাতায় পাতায় অহনা চলে শিরায় শিরায়। তবে দু রাত ছিল বলে রক্ষা। এরচে' বেশি থাকলে ধরা পড়ে যেত। থার্ড নাইটে রাত একটার সময় সফিক এসে উপস্থিত। অহনার একটা খোঁজ নাকি পাওয়া গেছে, আমাকে নিয়ে যাবে। আমি মনে মনে বলি আল্লাহ্ রক্ষা করেছে।'

'এখন উনি কোথায় আছেন?'

'জানি না কোথায়। আমি জানি না, সফিকও জানে না, তবে সফিকের বোধহয় ধারণা হয়েছে আমি জানি, তার কাছে লুকাচ্ছি।'

রাতের খাবার জন্যে ভাত রাঁধতে বসেছি, নোমান পাশে এসে বসল। নরম গলায় বলল, 'জার্নি করে এসেছ। এখন চুলার কাছে বসতে হবে না। চল বাইরে কোথাও যাই, খেয়ে আসি। চাইনিজ খাবার আমার অসহ্য লাগে— তবু চল যাই।'

আমরা বাইরে খেতে গেলাম। ও খাবারের মেনু অনেকক্ষণ চোখের সামনে ধরে রেখে বলল, 'শালার দাম কী রেখেছে। খেয়ে না খেয়ে দাম। এক বাটি স্যুপ তার দাম এক শ কুড়ি টাকা। পানি ছাড়া এর মধ্যে আর কী আছে। নবনী চল এক কাজ করি এক বাটি স্যুপ খেয়ে চলে যাই। টাকা-পয়সা এখন খুব সাবধানে খরচ করতে হবে। আমার ধারণা সফিক আমার চাকরি নট করে দেবে। গেটআউট করে দেবে।'

নোমান চিন্তিত মুখে স্যুপ খাচ্ছে। আমার খুব মায়া লাগছে। আহা বেচারা শুধু স্যুপে কি তার পেট ভরবে?

'নবনী।'

'কি?'

'অচেনা একটা লোককে নিয়ে বাসায় এসেছিলে রাগে আমার গা জ্বলে গেছে। ঐ দিন অফিসে এক লোক এসে উপস্থিত। তোমাদের ওদিকে বাড়ি। তোমাদের সবাইকে চেনে। আমি যত্ন করে বসিয়েছি— চা খাইয়েছি তারপর ব্যাটা বলে কী নবনীর প্রথমপক্ষের সন্তানটি কি আপনার সঙ্গে থাকে?'

'তুমি কী বললে?'

'আমি তো হতভম্ব। সফিক আমার সঙ্গে ছিল, সে বলল, হ্যাঁ ওর সঙ্গেই থাকে। কেন দেখা করতে চান?' শুধু যে এই একজন তা না। আগেও আরেকজন এসেছে। আমাকে পায় নাই অফিসের লোকজনের সঙ্গে গল্প করে গেছে, বিশ্রী সব কথাবার্তা।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি চুপ করে আছি। নোমান বলল, 'স্যুপ খেয়ে ক্ষিধে আরো বেড়ে গেল। এ কী যন্ত্রণা বল দেখি! একটা ফ্রায়েড চিকেন নিয়ে নেই?'

'না।'

'নবনী তুমি আগের চেয়ে আরো সুন্দর হয়েছে। এত সুন্দরী বৌ পাশে নিয়ে হাঁটাহাঁটি করতে অস্বস্তি লাগে। লোকে এমনভাবে তাকাচ্ছে যেন আমি তোমাদের বাড়ির দারোয়ান। তুমি বাইরে বেরুবার সময় সাজগোজ একেবারেই করবে না।'

'আচ্ছা যাও করব না।'

'এত ভালো লাগছে তোমাকে দেখে!'

আমি বললাম, 'আমাকে দেখে এত ভালো লাগছে, তাহলে আজ আমাকে দেখে মুখটা এমন কালো করে ফেলেছিলে কেন?'

'মন মেজাজ অসম্ভব খারাপ। সফিক চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দিলে খাব কী? একা থাকলে অসুবিধা ছিল না। এখন আমরা দুজন।'

আমি চাপা গলায় বললাম, 'বাড়তেও পারে। কিছুদিন পর হয়তো দেখা যাবে তিন জন।'

নোমান বলল, 'হ্যাঁ তা তো হবেই। চাকরি চলে গেলে তো ভিক্ষা করা ছাড়া উপায় থাকবে না।'

'ভিক্ষা করতে হলে করব। এই দেশে ভিক্ষা করা এমন অন্যায় কিছু না। সবাই ভিক্ষা করছে। আমরাও না হয় করব। তুমি এখন আরাম করে খাও তো। শুধু শুধু চিকেন খাবে কী করে, কিছু ভাত নাও।'

নোমান হাসিমুখে বলল, 'যা থাকে কপালে চল খাই। খাওয়াদাওয়ার পর আইসক্রিম খাব। আইসক্রিম খেতে ইচ্ছা করছে। যাহা বাহান্ন তাহা তিপ্পান্ন খরচ হচ্ছে যখন হোক।'

রাতে দুজন ঘুমাতে গেছি। নোমান গান দিয়ে দিয়েছে। আমি বললাম, 'গান থাক। এস তোমাকে দারুণ একটা খবর দেই।'

'কী খবর?'

'দিচ্ছি এত তাড়া কীসের? তুমি আগে আমাকে একটু আদর কর। তারপর খবর শুনবে। আচ্ছা আমি যে কিছুদিন পাগল ছিলাম তা কি তুমি জান?'

'জানব না কেন। জানি।'

'কে বলেছে?'

'অহনা বলেছে।'

'উনি কীভাবে জানেন?'

'অহনা সব জানে। তোমার সঙ্গে যখন বিয়ে ঠিক হল তখনি সব খোঁজখবর করেছে। তারপর বলেছে — মেয়েটা বেশ কিছুদিন মাথা খারাপ অবস্থায় ছিল। এখন সুস্থ, তুমি বিয়ে করতে পার, ভালো মেয়ে। বেশ ভালো।'

আমি কঠিন গলায় বললাম, 'তিনি অনুমতি দিলেন। তারপর তুমি বিয়ে করলে?'

নোমান জবাব দিল না। আমি ওর গায়ে হাত দিয়ে দেখি সে ঘুমিয়ে পড়েছে। তৃপ্তির ঘুম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১০

ক্রিং ক্রিং করে কলিং বেল বাজছে।

আমাদের বাসায় তো কলিং বেল ছিল না। কলিং বেল কোত্থেকে এল? নতুন কলিং বেল লাগিয়েছে নাকি? আমি অবাক হয়েই দরজা খুললাম। কে এসেছে সেটা দেখার চেয়ে কলিং বেলটা দেখার জন্যেই আমার আগ্রহ বেশি।

দরজা খুলে দেখি সফিক সাহেব দাঁড়িয়ে আছেন। আজো তাঁর গায়ে নীল হাফ শার্ট। তিনি কি নীল রঙের শার্ট ছাড়া আর কিছু পরেন না? তিনি চোখের সানগ্লাস খুলতে খুলতে বললেন, 'কেমন আছ নবনী!'

আমি বলালাম, 'ভালো।'

'কর্তা কোথায়?'

'ও বাজারে গেছে। কাঁচা বাজারে।'

'আমি কি অপেক্ষা করব তার জন্যে?'

'জ্বি বসুন। ওর আসতে মনে হয় দেরি হবে। হেঁটে গেছে। হেঁটে ফিরবে।'

সফিক সাহেব ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, 'হোক একটু দেরি। এই ফাঁকে আমি বরং তোমার হাতের চা খাই। নোমানের ধারণা এই পৃথিবীতে তোমার চেয়ে ভালো চা আর কেউ বানাতে পারে না।'

তিনি সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে ঘরে ঢুকলেন। বসলেন বারান্দায়। আমি বললাম, 'আপনি ভেতরে গিয়ে বসুন। বারান্দায় বসেছেন কেন?'

'কারো শোবার ঘরে ঢুকতে ভালো লাগে না। শোবার ঘর হচ্ছে খুবই ব্যক্তিগত ব্যাপার। বাইরের লোকের সেখানে প্রবেশাধিকার থাকা উচিত না। তোমাদের বারান্দাটা সুন্দর।'

আমি চা বানিয়ে দিয়েছি। একটু অস্বস্তি লাগছে কারণ শুধু চা দিতে হয়েছে। ঘরে কিচ্ছু নেই। একটা কিছু থাকলে ভালো হত। আমি দেখেছি খুব যারা বড়লোক তারা সাধারণ খাবার বেশ আগ্রহ করে খায়। তিনি চায়ে চুমুক দিতে দিতে বললেন, 'নবনী! আমি নোমানের কাছে আসি নি। আমি আসলে তোমার কাছেই এসেছি। অফিস থেকে দেখলাম নোমান বাজারের ব্যাগ হাতে বেরুল। আমিও সঙ্গে সঙ্গে তোমার কাছে চলে এসেছি। যাতে ওর সঙ্গে দেখা না হয়।'

আমি শংকিত গলায় বললাম, 'আমাকে কিছু বলবেন?'

'হ্যাঁ। লম্বা বক্তৃতা দেব। ধৈর্য ধরে তোমাকে শুনতে হবে। কথার মাঝখানে হাই তুলতে পারবে না। দেখ নবনী, আমি নোমানকে খুব পছন্দ করি। সে হচ্ছে জটিলতাবিহীন একজন মানুষ এবং ইন্টারেস্টিং মানুষ। স্কুলে একসঙ্গে পড়েছি তারপর আর কোনো যোগাযোগ ছিল না। একদিন গাড়ি কিনতে বিজয় নগরের একটা শো রুমে গিয়েছি। হঠাৎ লক্ষ করলাম এক ভদ্রলোক গম্ভীর ভঙ্গিতে লেটেস্ট মডেলের গাড়ির দরদাম করছেন। আমি কাছে গিয়ে বললাম, নোমান না? এখানে কী করছিস?'

সে লজ্জিত গলায় বলল, 'কিছু করছি না।'

'আমাকে চিনতে পারছিস তো?'

'পারছি সফিক।'

'চাকরি বাকরি কি করছিস?'

'কিছু করছি না।'

'বেকার?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'হুঁ বেকার।'

'গাড়ি দাম করছিস কী জন্যে?'

সে হাসল। আমি বললাম, 'দে তুই পছন্দ করে একটা গাড়ি কিনে দে। আজ তোর পছন্দেই কিনব।'

সেই থেকে সে আমার সঙ্গে আছে। Unconditional loyalty বলে একটা ব্যাপার আছে যা মানুষের মধ্যে দেখা যায় না। নিম্নশ্রেণীর প্রাণী কুকুরের মধ্যে খানিকটা আছে। সেই শর্তহীন আনুগত্য আছে নোমানের মধ্যে। পাশবিক গুণ হলেও এটা অনেক বড় গুণ। নোমানকে পছন্দের আমার এই একটা কারণ।

সম্প্রতি তার মধ্যে আমি একটা পরিবর্তন লক্ষ করছি। সে আমার কাছে অনেক কিছু গোপন করছে। যেটা আমার একেবারেই পছন্দ না। আমি খুব রাগ করেছি। অসম্ভব রাগ করেছি।'

সফিক সাহেব থামলেন। সিগারেট ধরালেন।

আমি বললাম, 'আপনি কি ওকে বিদেয় করে দিচ্ছেন?'

'হ্যাঁ দিচ্ছি। সে জানে আমি অহনার চিন্তায় অস্থির হয়ে আছি। তারপরেও সে তাকে তার বাসায় লুকিয়ে রাখে অথচ আমাকে কিছুই বলে না। সে আমাকে বোকা ভাবে। মনে করে আমার বুদ্ধিও তার স্তরে। অথচ আমি তার ঘরে পা দিয়েই বুঝেছি অহনা এখানেই ছিল। বেগুনি ওর প্রিয় রং। বেগুনি রঙের পর্দা নোমানের ঘরে ঝুলবে আর আমি কিছুই বুঝব না?'

আমি বললাম, 'সফিক ভাই, আপনি এসব কথা ওকে সরাসরি না বলে আমাকে বলছেন কেন?'

'তোমাকে বলছি তার কারণ আছে। অহনা একটা ভয়ংকর খেলা খেলার চেষ্টা করছে। এই খেলায় নোমানের একটা ভূমিকা আছে। সে তা জানে না। সে কিছুই বুঝতে পারে না। সে জানে না যে অহনা তার ভ্যানিটি ব্যাগে ইদানীং একটি ছোট্ট পিস্তল রাখে। এই পিস্তলটা সে কেন রাখে? সেলফ প্রটেকশনের জন্যে না। তার উদ্দেশ্য অন্য।'

'উদ্দেশ্যটা কী?'

'আমি পরিষ্কার জানি না। একটা অনুমান আমার আছে। অনুমানটা স্পষ্ট নয়। অস্পষ্ট। ওকে ওর জীবনের শুরুতে আমি নানানভাবে ব্যবহার করেছি। আমি ফেরেশতা না— আমার অনেক দোষত্রুটি আছে। অহনার উপর কিছু অন্যায় আমি শুরুতে করেছি। পরবর্তী সময়ে সে অন্যায় আমি দূর করার চেষ্টা করেছি। ওকে বিয়ে করেছি। ভালবাসায় ভালবাসায় ডুবিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছি। তুমি বোধহয় জান না— আমার যাবতীয় বিষয় সম্পত্তি ওর নামে লিখে দেয়া হয়েছে। সবটা অবশ্যি ভালবাসা থেকে করা না, ট্যাক্স ফাঁকি দেয়াও একটা উদ্দেশ্য।

বুঝলে নবনী! অহনা হচ্ছে পারদের মতো, যত তাঁকে ধরতে যাওয়া যায় ততই সে পিছলে যায়। আঙুলের ফাঁক দিয়ে সহস্র খণ্ড হয়ে ঝড়ে পড়ে। আমি অঞ্জলি পেতেই তাকে ধরতে চেয়েছিলাম। সম্ভব হল না। সে এখন যেটা চাচ্ছে তা হচ্ছে আমাকে কঠিন শাস্তি দেয়া। কীভাবে সে তা দেবে আমি জানি না। নোমান জানে, সে আমাকে বলবে না। অহনা নোমানের উপরও পুরোপুরি ভরসা করছে না। তার আরো লোক আছে। প্রাইভেট ডিটেকটিভ ধরনের লোকজন। ওরা আমার পেছনে পেছনে ঘুরছে। শুধু যে আমার পেছনে ঘুরছে তাই না— তারা আরো কিছু কাণ্ডকারখানা করছে যার কারণ আমি ধরতে পারছি না। যেমন তারা এতিমখানায় এতিমখানায় ঘুরছে। শুনতে পাচ্ছি আমার ধানমণ্ডির বাড়িটায় অহনা একটা মহিলা দুঃস্থ কেন্দ্র করবে। এটা কি অদ্ভুত পাগলামি না?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সফিক সাহেব চুপ করলেন। হাতের আধখাওয়া সিগারেট ফেলে দিয়ে আরেকটা ধরালেন। তাঁকে খুব অস্থির লাগছে। আমি বললাম, 'আপনি কি আরেক কাপ চা খাবেন?'

'হ্যাঁ খাব।'

আমি চা ঢেলে দিলাম। তিনি বললেন, 'থ্যাংকস— রাগের মাথায় হড়হড় করে তোমাকে অনেক কথা বলে ফেললাম।'

'এখন কি আপনার রাগ কমেছে?'

'আমার স্বভাব অহনার মতো না। আমি যেমন চট করে রাগি না, তেমনি চট করে আমার রাগ পড়েও না। যাই হোক নবনী শোন— আমি নোমানকে আমার কাছে আর রাখব না। তোমার জন্যে সবচে' ভালো হবে তুমি যদি ওকে নিয়ে দূরে কোথাও চলে যাও। অহনার Sphere of Influence-এর বাইরে। আমি কিছু টাকা-পয়সা দিয়ে দেব যাতে ও ছোটখাটো ব্যবসা ট্যবসা করে খেতে পারে।'

সফিক সাহেব ওঠে দাঁড়ালেন। আমি বললাম, 'আমি কি নোমানকে আপনার সিদ্ধান্তের কথা আজই বলব?'

'না আজ না। আমার ছবির অল্প কিছু কাজ বাকি আছে। কাজটা শেষ হোক। তারপর বলবে। নবনী যাই। ভালো কথা, তোমার যে ছবি তুলেছিলাম সেই ছবি খুব সুন্দর এসেছে। আমি বাঁধিয়ে রেখেছি— আজ সন্ধ্যায় পাঠিয়ে দেব। আরেকটা কথা, অহনা এখন আমার বাসায়। কাল তাকে নিয়ে শ্যুটিঙে যাব। নোমনকে বলবে সেও যেন যায় এবং আমি চাচ্ছি তুমিও থাক। ছবি শেষ করাটা আমার জন্যে খুব জরুরি। এই জীবনে আমি কোনো কাজই আধাআধি করে রাখি নি। তোমার চা খুব ভালো হয়েছে। মেনি মেনি থ্যাংকস!'

যাই বলেও সফিক সাহেব দাঁড়িয়ে রইলেন। মনে হচ্ছে এতগুলো কথা বলার তাঁর ইচ্ছা ছিল না। বলার পর বিব্রত বোধ করছেন। আমার স্তরের একটি মেয়েকে তাঁর এত কথা বলার প্রয়োজনও নেই। তিনি ইতস্তত করে বললেন, 'নবনী একটা শেষ কথা না বললে তুমি অহনাকে ভুল বুঝতে পার। তুমি ভাবতে পার অহনা বোধহয় পিস্তল নিয়ে ঘুরছে আমাকে মারার জন্যে।'

'আমি এ রকম কিছু ভাবছি না।'

'না ভাবাই ঠিক। ঘৃণা থেকেও ভালবাসা জন্মায়। আমার প্রতি ওর যে প্রবল ভালবাসা তা উঠে এসেছে ঘৃণা থেকে। সমস্যা এইখানেই। এই পৃথিবীতে দু ধরনের মানুষ খুন হয়। প্রবল ঘৃণার মানুষ এবং প্রচণ্ড ভালবাসার মানুষ। কাজেই অহনা যদি আমাকে মেরেও ফেলে তাতে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।'

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, 'উল্টাটাও তো হতে পারে।' তিনি তৎক্ষণাৎ বললেন, 'হতে পারে। অবশ্যই হতে পারে।'

১১

নোমান বলছিল ছবির শ্যুটিং খুব বিরক্তিকর। আমি দেখছি ব্যাপারটা মোটেই সে রকম না। আমার বিরক্তি তো লাগছেই না বরং মজা লাগছে। আমি ছবির কিছুই জানি না, তবু বুঝতে পারছি সফিক সাহেব ছবির কাজ খুব ভালোই বোঝেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একেবারে এলাহী কারবার। দিনেরবেলা কাজ হচ্ছে অথচ মাঠের মাঝখানে মাঝখানে লাইট জ্বলছে। বড় বড় রাংতামোড়া বোর্ড হাতে লোকজন ছোটাছুটি করছে। এই বোর্ডগুলো রিফ্লেকটর।

ক্যামেরাম্যান একজন বিদেশি, কলিন্স বোধহয় নাম। অসীম ধৈর্য এই সাহেবের। ঝাঁঝা রোদে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে।

সারাদিন ধরে একটা দৃশ্য হচ্ছে। জাহেদা ছুটতে ছুটতে বনে ঢুকে গেল।

সফিক সাহেব বললেন, দৃশ্যটা এমনভাবে নিতে হবে যেন দর্শকের মনে ভয়ের ছাপ পড়ে। মেয়েটা যখন দৌড়ে যাবে তখন মাঠে কয়েকটা ছাগল থাকবে। মেয়েটার দৌড়ে যাওয়া দেখে ছাগলগুলো উল্টো দিকে ছুটতে থাকবে। এতে দৃশ্যটি অন্য রকম হয়ে যাবে। মেয়েটা যখন বনে ঢুকবে তখন বনের পাখিরা কিচকিচ করে উঠবে। এতে ভয়টা আরো বাড়বে।

উনার কথাগুলো আমার ভালো লাগল। বলতে ইচ্ছা করল, 'বাহ্ বেশ তো।' অহনা অভিনয়ও করছে এত সুন্দর! ছাগলগুলো যখন তাকে দেখে ছুটছে তখন সে এক পলকের জন্যে দাঁড়িয়ে পড়ল। তাকাল ছাগলগুলোর দিকে, তারপর আবার ছুটতে শুরু করল। দাঁড়ানোর কথা সফিক তাঁকে বলেন নি। এটা সে করেছে নিজ থেকে।

সফিক বললেন, তোমার দাঁড়িয়ে পড়াটা খুব সুন্দর হয়েছে। ওয়ান্ডারফুল।'

ক্যামেরাম্যান সাহেব বললেন, 'Well done!'

অহনা হাসতে হাসতে বলল, 'থ্যাংকস।'

সফিক বললেন, 'আজকের মতো প্যাক আপ। কাল সকাল থেকে আবার শুটিং। আশা করছি কাল দিনের মধ্যে শেষ করে ফেলব।'

অহনা বললেন, 'আমি আজ আরো খানিকক্ষণ কাজ করতে রাজি আছি। আজ আমার কাজ করতে খুব ভালো লাগছে।'

সফিক বললেন, 'আজ থাক। আমি টায়ার্ড। কলিন্সের দিকে তাকিয়ে দেখ রোদে টমেটোর মতো লাল হয়ে গেছে। নোমান বেচারাও টায়ার্ড। ছাগলের পেছনে দৌড়ে দৌড়ে তার অবস্থা কাহিল। এস নৌকায় বসে সবাই চা খাই।'

অহনা বললেন, 'চল যাই।'

সফিক বললেন, 'আজ চাঁদনী আছে। রাতের খাবার পর আমরা কিছুক্ষণ নৌকায় করে ঘুরব। কী বল অহনা?'

'আচ্ছা যাও ঘুরব।'

'রাতে নৌকায় গানের আসর হবে। অহনা দু-একটা গান কি আজ আমাদের শুনাবে?'

অহনা হাসতে হাসতে বললেন, 'খুব ভালোমতো অনুরোধ করলে শুনাতেও পারি।'

'অনুরোধ মানে তুমি চাইলে আমি সবার সামনে দূর থেকে ক্রলিং করে এসে তোমার পায়ে ধরতে পারি।'

সফিক হাসছেন। আহনা হাসছেন। কে বলবে এদের মধ্যে কোনো সমস্যা আছে। এদের হাসি কৃত্রিমও নয়। সহজসরল হাসি। এই হাসির উৎস ভালবাসা। অন্য কিছু নয়। সেই ভালবাসার জন্য যদি ঘৃণাতেও হয় তাতে কিছু যায় আসে না।

রাতে অনেকক্ষণ গান হল। নৌকা ঘাটে বাঁধা। বেশ বড় নৌকা। ছাদ খোলা। পাটাতনে তিরপল বিছিয়ে দেয়া হয়েছে। আমরা চারজন শুধু আছি। সাহেব গান শুনতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসেন নি। তিনি নাকি একা একা গাঁজা খাবেন। বাংলাদেশে এসেছেন আরাম করে গাঁজা খাবার জন্যে। নোমান আজকের দিনে পরিশ্রমের জন্যেই বোধহয় পাটাতনে কাত হয়ে শুয়ে ঘুমাচ্ছে। বেশ কয়েকটা তাকিয়া আছে। বেচারার মাথার নিচে একটা দিয়ে দিলে আরাম করে ঘুমাতে পারত। আমার দিতে লজ্জা লাগছে।

সফিক সাহেব বসেছেন অহনার পাশে। আমি অন্য দিকে। অহনা পর পর তিনটি গান করলেন। সবার শেষে গাইলেন –

নিশীথে কী করে গেল মনে কী জানি, কী জানি।
সে কি ঘুমে, সে কি জাগরণে কী জানি, কী জানি ॥

গাইতে গাইতে টপটপ করে তাঁর চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগল। চাঁদের আলোয় কান্নাভেজা মুখ এত সুন্দর দেখায়? আমি মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছি। মনে মনে ভাবছি এমন একটি গুণী মেয়েকে ভালবেসে কষ্ট পাওয়াতেও আনন্দ আছে। এদের তো অঞ্জলি পেতেই ধরে রাখতে হয়।

অহনা শাড়ির আঁচলে চোখ মুছে হঠাৎ কঠিন স্বরে বললেন, 'রাত একটার সময় এখান থেকে একটা ট্রেন যাবে ঢাকায়। আমি ঐ ট্রেনে চলে যাব। নোমান যাবে আমার সঙ্গে।'

সফিক অবাক হয়ে বললেন, 'তার মানে?'

অহনা বললেন, 'মানেটানে জানি না। আমার ভালো লাগছে না। এই নোমান ওঠ তো। ওঠ। তুমি আমাকে নিয়ে ঢাকা যাবে।'

সফিক বললেন, 'তোমার যদি যেতেই হয় তুমি যাবে কিন্তু একা যাবে কেন? আমরা সবাই যাব। তুমি চলে গেলে আমরা এখানে থেকে করব কী?'

'না, আমি একা যাব। তোমরা পরে আসবে। শুধু নোমান আমার সঙ্গে যাবে।'

সফিক সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, 'দেখ অহনা— নোমানের স্ত্রী এখানে আছে। সে তার স্ত্রীকে ফেলে চলে যাবে এটা তুমি কেন ভাবছ? হঠাৎ করে তোমার কী হয়েছে, আমি জানি না তবে তুমি পাগলের মতো আচরণ করছ।'

'মোটেই পাগলের মতো আচরণ করছি না। যা করছি ঠাণ্ডা মাথায় করছি।'

'নোমান তোমার সঙ্গে যাবে, আর তার স্ত্রী এখানে থাকবে?'

অহনা তীব্র গলায় বলল, 'হ্যাঁ এতে তেমন কোনো সমস্যা হবার কথা না। আশা করা যেতে পারে গভীর রাতে তুমি তার ঘরের দরজায় ধাক্কা দেবে না। আর যদি দাও তাতেও ক্ষতি নেই, এই মেয়ের অন্য পুরুষের সঙ্গে শুয়ে অভ্যাস আছে।'

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি। কি বলছে এই মেয়ে? সে কি সত্যি এসব বলছে না আমি ভুল শুনছি?

সফিক চিৎকার করে বললেন— 'চুপ কর। You are out of your mind.'

'তুমি চেঁচিও না। I am not out of my mind. I never was. যা বলছি ঠিকই বলছি। এই দারুণ রূপবতী এবং পুণ্যবতী মহিলার একটি অবৈধ মেয়ে আছে। এতিমখানায় বড় হচ্ছে।'

আমি মূর্তির মতো বসে রইলাম। নোমানের ঘুম বোধহয় ঠিকমতো ভাঙে নি। সে হতভম্ব হয়ে একবার আমার দিকে তাকাচ্ছে একবার তাকাচ্ছে অহনার দিকে। আমার শরীর থরথর করে কাঁপছে। আমি কি পানিতে পড়ে যাচ্ছি? সফিক ছুটে এসে আমাকে ধরে ফেললেন। শান্ত স্বরে বললেন— 'নোমান তুই অহনাকে নিয়ে যা। আমি নবনীকে দেখব। তুই চিন্তা করিস না। যা প্লিজ যা।'

নোমান অহনার সঙ্গে চলে যাচ্ছে। আশ্চর্য সে একবারও পেছনের দিকে তাকাচ্ছে না। সফিক বললেন, 'নবনী তুমি কিছু মনে কোরো না। ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এরকম করে। আমি হাতজোড় করে ওর হয়ে তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।'

আমি ক্লান্ত গলায় বললাম, 'সফিক ভাই! আপনি কি আমাকে আমার বড় মামার কাছে পৌঁছে দেবেন?'

'অবশ্যই দেব। তুমি যেখানে আমাকে নিতে বলবে আমি সেখানেই তোমাকে নিয়ে যাব। অহনার ব্যবহারে আমি যে কী পরিমাণ লজ্জিত তা তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না।'

'আপনার লজ্জিত হবার কিছু নেই। আমি দীর্ঘদিন মানসিকভাবে অসুস্থ ছিলাম। আমার জীবনের একটা অংশ আমার কাছে অস্পষ্ট। আমার ধারণা অহনা ভাবি সত্যি কথাই বলছেন।'

আমার এমন লাগছে কেন? শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। আমি নৌকার উপর বসে আছি। নৌকাটা খুব দুলছে। এত দুলছে কেন নৌকাটা? নৌকার পাটাতনে এটা কি কাক না? ঐ বুড়ো কাকটা না? আবার কতদিন পর কাকটাকে দেখলাম— আমি বললাম 'এই এই আয়।'

তলপেটে তীব্র ব্যথা হচ্ছে। আমার শরীরে একটি শিশু বাস করছে। ওর কোনো ক্ষতি হচ্ছে না তো? ও ভালো থাকবে তো? প্রচণ্ড মানসিক যাতনায় নাকি আপনাআপনি এবোরশান হয়ে যায়। এটা যেন না হয়। সবকিছুর বিনিময়ে আমি তার মঙ্গল চাই।

'নবনী তোমার কি খারাপ লাগছে? এক কাজ কর এই পাটাতনে শুয়ে পড়। তাকিয়াটা মাথার নিচে দাও।'

সফিক ভাইয়ের কথা খুব অস্পষ্ট শোনাচ্ছে। তিনি আমাকে শুইয়ে দিলেন। চাঁদটা এখন ঠিক আমার চোখের উপর। চাঁদের আলো এত তীব্র হয়? আমার চোখ ঝলসে যাচ্ছে।

নদী থেকে পানি নিয়ে তিনি আমার চোখে-মুখে দিচ্ছেন। শান্তি শান্তি লাগছে। নদীর পানি এত ঠাণ্ডা?

'নবনী শোন, হাঁ করে নিশ্বাস নাও। হাঁ করে নিশ্বাস নিলে ভালো লাগবে।'

আমি নিজের জন্যে না আমার বাচ্চাটির জন্যে হাঁ করে নিশ্বাস নিচ্ছি। এই পৃথিবীতে তাকে আসতেই হবে।

আমার ঘুম ঘুম পাচ্ছে। আমি প্রায় ফিসফিস করে বললাম, 'সফিক ভাই। আমার পেটে তিন মাসের একটা শিশু আছে। আমার কেন জানি মনে হচ্ছে এবোরশান হয়ে যাবে। প্রচণ্ড ব্যথা হচ্ছে।'

'তুমি নড়বে না। যেভাবে আছ সেইভাবে শুয়ে থাক। একটুও নড়বে না।'

তিনি দৌড়ে চলে যাচ্ছেন। একটু বাতাস নেই, তারপরেও নৌকাটা এত দুলছে কেন? মনে হচ্ছে আমি গড়িয়ে পানিতে পড়ে যাব। নৌকার পাটাতনে বুড়ো কাকটা গুটি গুটি পায়ে আসছে আমার দিকে। আমি বললাম, 'এই যা যা।' কাউকেই এখন আমার কাছে আসতে দেয়া যাবে না। নিজেকে রক্ষা করতে হবে। শিশুটির জন্যেই নিজেকে রক্ষা করতে হবে। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে। আধো ঘুম আধো জাগরণে বুঝতে পারছি— আমার শরীরের ভেতর ঘুমিয়ে থাকা শিশুটিকে রক্ষা করার যে প্রচণ্ড তাগিদ অনুভব করছি, এরকম তাগিদ আগেও একবার অনুভব করেছিলাম। আমার আজকের অনুভূতি নতুন নয়। আরো একবার জীবন বাজি রেখেছিলাম একটি শিশুর জন্যে। অস্পষ্ট ধোঁয়ার মতো স্মৃতি, গাঢ় কুয়াশায় ঢাকা। বড় মামা আমাকে নিয়ে অনেক দূরে কোথাও চলে গিয়েছিলেন। যেন কেউ আমার খোঁজ না জানে। মামা কেন এই কাণ্ডটি করেছিলেন এখন স্পষ্ট হচ্ছে।

কেমন আছে আমার ঐ বাচ্চাটা? কত বড় হয়েছে? ও কি ওর বাবার মতো হয়েছে? পরিচয়হীনা ঐ মেয়েটির মাথায় ভালবাসার মঙ্গলময় হাত কেউ কি ফেলবে না?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাঁদটা মনে হচ্ছে আকাশ থেকে নেমে আসছে। কী তীব্র তার আলো? চাঁদের আলোয় কাকটার একটা দীর্ঘ ছায়া পড়েছে।

রক্তে আমার শাড়ি ভিজে যাচ্ছে। এত রক্ত মানুষের শরীরে থাকে ?

পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। অনেকের পায়ের শব্দ। নোমান কি আসছে? সে যদি আসে তাহলে তাকে একটা কথা বলে যেতে চাই। কথাগুলো বলার মতো শক্তি আমার থাকবে তো? আমি বলব, 'এই দেখ আমি মরে যাচ্ছি। যে মানুষ মরে যাচ্ছে, তার উপর কোনো রাগ, কোনো ঘেন্না থাকা উচিত না। আমি অনেককাল আগে একটা মানুষকে যে ভাবে ভালবেসেছিলাম তোমাকেও ঠিক সেইভাবেই ভালবেসেছি। ভালবাসার দাবি আছে। সেই দাবি খুব কঠিন দাবি। ভালবাসার সেই দাবি নিয়ে তোমার কাছে হাতজোড় করছি। আমার একটা মেয়ে আছে। কোনো একটা এতিমখানায় বড় হচ্ছে। তুমি কি ওকে তোমার কাছে এনে রাখবে? প্রথমে হয়তো তাকে ভালবাসতে পারবে না। কিছুদিন পর অবশ্যই পারবে। ও তো আমারই একটি অংশ। আমি তো তোমাকে ভালবেসেছি।'

একখণ্ড বিশাল মেঘ চাঁদটাকে ঢেকে দিয়েছে। চাঁদের আলো এখন আর চোখে লাগছে না। চারদিক কী সুন্দর লাগছে! কী অসহ্য সুন্দর! হতাশা, গ্লানি, দুঃখ ও বঞ্চনার পৃথিবীকে এত সুন্দর করে বানানোর কী প্রয়োজন ছিল কে জানে?

AMARBOI.COM

নবনীর প্রতিটি চরিত্র কাল্পনিক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~